

182. 06. 923. 2 (5)

বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

754

# শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

( প্রথম ভাগ )

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত  
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১।।০ টাকা।]



182. 06. 923. 2 (5)

বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

754

# শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

( প্রথম ভাগ )

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত  
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[মূল্য ১।।০ টাকা।]



# চক্র

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে স্থানি চ দুঃখানি চ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

## উৎসর্গ

হে আমার শৈশবের সুখময় দিবারাতি !  
অম্লান তারকা সম তোদের বিমল-ভাতি,  
আজিও এ প্রাণ মন রহিয়াছে উজ্জ্বলিরা ।  
স্মরণে আসিয়া আজও উঠে চিত্ত উথলিরা ॥  
স্নেহময় পিতামহ দেব-দেবী পিতামাতা,  
ত্রিভুগতে অভুলনা ; দিদির স্নেহের গাথা,

কচি ভাই-বোনেদের হাসিভরা চাঁদ-মুখ,  
আজিও স্মরণে ভাসে, সুখে ভ'রে ওঠে বুক ।  
আজ সবই একে একে আবারে ছাড়িয়া যায় ;  
আজ শুধু প্রাণভরা হাহাকার হায় হায় ॥  
দুঃখের তমিস্রা-মাঝে তুই তড়িতের আলো ।  
তাই আজ সব চেয়ে তোরেই বেসেছি ভালো ॥

হে মৌর সুখের দিন !—হে মৌর সুখের স্মৃতি !

আমাদেরই স্মরণে আজি ঢালিছ প্রাণের প্রীতি ॥

## নিবেদন

“চক্র” ১৩২৭ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার  
বিড়ম্বনায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই ; সে জন্য আমার স্নেহান্বিত  
সম্পাদকবৃন্দের নিকট আমি অপরাধী হইয়া আছি ; কিন্তু এত দিন পরে আবার  
প্রাণে দেখা দিলেও পাঠকবর্গ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে না পারাই সম্ভব বোধে  
আমারই পুস্তকাকারে ছাপাইতে বাধ্য হইলাম । বইখানিতে ছাপার তুল  
আগাগোড়া প্রক দেখা ঘটে নাই ।

পঞ্চম অংশটুকু পাঠে কৌতুহলী হইরা যাহারা ইহা শেষ করিবার জন্য  
করিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইলেই আমি সুখী হইব ।

শ্রী



# চক্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ-বর্ষীয় এক বালকের সঙ্গে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রী ডাকিলেন, “বোমা! অ বোমা!” তাহার সে উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতা বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল।

নীলেদের প্রকাণ্ড চক মিলানো বাড়ী—অন্ধর-মহলের দ্বিতলের বারান্দার মোটা মোটা জোড়া খামের পাশে কাঠের রেলিং ধরিয়া একটি নবম-বর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বাটার গৃহিনীর ডাক শুনিয়া সে মেয়েটি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পরিহিত পাঁচপেড়ে কাঁচাধারী শাড়ীর প্রান্তটুকু তাহার মাথার খাটো চুলের উপর ঢাকা ছিল, তাহা সেইরূপই রহিল; আর বেশী বাড়িল না। বালিকার ক্ষুদ্র ললাট জুকুটি-কুঞ্চিত হইল, সে তাঁর চকল নেড়ে শাওড়ীর সজীব্যাহারী বালকের পানে বারেক ফুটিল।

“কি মা?”

“আজ আবার তুমি বিহুর গায়ে হাত তুলেছ? দেখ দেখি, বাহার মুখখানা আঁচড়ে-পিঁচড়ে কি ক’রে দিয়েছ! ছি ছি ছি। তোমার যত বলি, যত শেখাই, কিছুতেই কি তুমি কিছু শিখবে না বাছা! এমন করলে আমি তোমায় কি ক’রে পেরে উঠবো!”

তিরস্কৃত্য বধুমাতা বারেক তাজ্জীল্য-ভরে স্বামীর মুখের উপর নিজের কৌত্তি-চিহ্ন দেখিয়া লইল। সমস্ত নখকত তখনও রক্ত-সরস রহিয়াছে; দেখিয়া সে কিছুমাত্র সজ্জা বোধ করিল না, বরং তাঁর রোষে জলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে কহিল, “আহা

আমিই যেন শুধু ঐ রকম ক’রে দিয়েছি,

আমি ছেলেটি যেন কিছুই করেন নি!

আমার পিঠে বুকে খামচে ছাল

“হ্যাঁ?” এই বলিয়া সে সত্য

করিয়া দেখাইল,

সে উন্টাইয়া

হ্যাঁ রে হতভাগা! তুইও তো ওকে কম শাস্তিটা দিস্ নি। দেখ্ দেখি, কি করেছিস্, খুনে কোথাকার!”

মাতার সহানুভূতি পাইয়া পুল্ এতক্ষণ রোরুদ্রমান হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল, এখন মায়ের সহানুভূতির গতি সহসা পরিবর্তিত দেখিয়া নিজের দিক্‌টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়া সে বলিল, “ও যে আমার আগে মেরেচে, তার বেলায়—?”

“মিথ্যাক! মিথ্যাক! আমি আগে মেরেচি! না মা! ওর সব মিথ্যে কথা! তুমি শুনো না। —ও আগে আমার চুল ধ’রে টেনেছিল,—এমন জোরে টেনেছিল,—যে, আর একটু হ’লেই আমি মুখ খুবড়ে প’ড়ে যেতুম।”

“ইস্। চুল ধ’রে টানলে নাকি আবার মুখ খুবড়ে প’ড়ে যার। মুখ খুবড়ে যে

নিজের কানেই তুমি শুন্তে পাচ্

আমি তো আর খুব জোরে চুল ধ’রে

ও কেন আমার মুখে অত জোরে

উঃ! যা জালা কর্চে” বলিয়া বাল

হাত বুলাইল।

ইহা দেখিয়া মা বলিলেন,

তুমি একেবারে মুখখানায় আ

রাখোনি। মেরেমানুষের অত

বধু এইবার কান্নায় ক্রো

উঠিয়া সগজ্জনে উত্তর দিল, “

ছেলেটি কি না, তুমি তো ও

বধন আমার চুল ধ’রে ট

দোষ হোল না?—হ্যাঁ,

বেলায়।”

“তুই কেন আমার

“খুব করেছি নি

আমার কাপড় ছি

সে কথা বলি

আমার



কতখানি ছিঁড়ে নিয়ে কালি মোটা হয়েছে,—তাই তো আমি কলম ভেঙ্গে দিয়েছি। বেশ করেছি—আবার দেখতে পেলেনই দেব।”

“আমিও তো তাই চুল ধ’রে টেনেছি—এবার এমন চুপি চুপি পেছন থেকে এক টান দেব সুবিধে পেলেনই যে, ধপাস্ ক’রে প’ড়ে সখের সব চুড়িগুলি মুড়্ মুড়্ ক’রে ভেঙ্গে যাবে। দেখবে তখন মজা!”

“তবে আমিই বা মারবো না কেন?”

“মা! আমিও কিছু বললে রাখ্‌চি, এবার ওর বত কাপড় আছে, সব আমি কুটি কুটি ক’রে ছিঁড়ে রেখে দেবো, ওর চুল কেটে নেব, ওর পিঠের চামড়া বেতের বাড়ি দিয়ে তুলে নেব, তবে আমার নাম।” এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ঠাকুরাণীর সেই বিনয়-নামধারী পুত্রটি মহাবেগে বোধ করি বেজ্ঞান্বেষণেই প্রস্থান করিল। তখন অপর-পক্ষও মহা আশ্চর্য্যে আততায়ীর বিরুদ্ধে কিরূপে শোধ তোলা যাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থায় জিহ্বার একেবারে মা সরস্বতীর বৈঠক বসাইয়া দিল। সে তাহার বইয়ে আশুন ধরাইয়া দিবে, যুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত ভাঙিয়া, আরও কত কি করিয়া তাহাকে কতিপয় এবং মাষ্টারের নিকট মার খাওয়াইয়া যে নিজের নাম রক্ষা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃহিণী আর কি করিবেন? তিনি অগতাই একটু হাসিয়া “ছোটোই সমান জুটেচে!”—বলিয়া বধুর দিকে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, “আর পাগলি, আর। আমার পাকা চুল তুলে দিবি, আর।”

“হ্যাঃ আমি দিলুম তো! কেন আমি তোমার পাকাচুল তুলে দেব? তুমি কি আমার মা? তুমি যার মা, তাকে তোমার চুল তুলে দিতে বলো গে না, সে দেবে এখন! আমি আমার বাবার চুল তুলে দেব, তোমার তো দেব না,—তুমি ভারী একচোখি!”

“হারামজাদির মুখ দেখ! কি একচোখোমি করেছি রে ক্যাপার বেটি? নে, আর, এখনি আবার ছোটোতে লেগে যাবে। একদণ্ড যে চোখ বুজে শোব, সে তো হবার ঘোটি নেই! কাল থেকে ছোটোকে হ’বের দোর বন্ধ ক’রে রেখে দিয়ে তবে নিজে শোব। দাঁড়া না।”

“আমি কাল ভাত খেয়েই সইমাদের বাড়ী পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে-টিপে না এসে—”

“আচ্ছা, এখন তো আর নয়—সে তখন যা হয় করিস। কি মেয়েই যে তুই হয়েছিস, উশ্মিলা! লোকে কি বলবে, বল দেখি? লোকের বউরা কেমন শান্ত লক্ষ্মী, আর তুই দিন দিন বেন ধিঙ্গি হচ্ছিস!”

“বেশ কর্‌চি, ধিঙ্গি হচ্ছি তো হচ্ছি! তুমি ওদের লক্ষ্মী-বউ একটা চেয়ে নাও না বাবু, এতই যদি ভাল লেগে থাকে। আমার না হয় দূর ক’রে তাড়িয়ে দাও বাড়ী থেকে।”

“বালাই! যাট!”—বলিয়া মেহমতী শান্তী হাসিতে লাগিলেন। বধুর ধিঙ্গিপদ-প্রাপ্তির আসক্ত হেতুই যে ঐ সর্ব-অপরাধ-সমর্থনকারী সর্বনেশে হাসিটুকুই, এটুকু জানা থাকিলেও ইহাকে পরিহার করিতে তাহার সামর্থ্য ছিল না। বালিকা বধুর তাই এত প্রশ্রয়!

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রে শরন-মন্দিরে মায়ের দুই পাশ দুই জনে অধিকার করিয়া শুইত। সে রাত্রেও তাই হইল। বিনয় মায়ের গলা জড়াইয়া মাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, উশ্মিলাও তদনুকরণ করিতে যাওয়ার সে তাহার হাতটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, “খবরদার, আমার মা গায়ে হাত দিলে, দিলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।”

উশ্মিলা এ শাসনে অভ্যস্ত; সে নির্ভরে উত্তর দিল, “ইস্, ওঁর একলার মা কি না!”

একলার না তো কি? তুই-ই তো তখন বলেছিস্, আমি মা’র আপনার ছেলে—তা, হলেনই হলো না, মা তোর পর?”

“হ্যা হলো বই কি! কখনো হলো না,—হ্যা মা, হলো মা? তুমি ওর একলার মা, মা? আমার মা নও?”

জগদ্ধাত্রী বধুকে নিজের বুকে টানিয়া তাহার মুখে চুষন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, “নাঃ, কে বলে,—আমি তোদের দুজনকারই মা।”

“শুন্তে পেলো! মা, তুমি কা’কে বেশী ভাল-বাস মা?”

মা পুনরায় সেই রকম পরম পরিতুষ্ট মেহের হাসি হাসিলেন, উত্তর দিলেন—

“দুজনকেই সমান ভালবাসি রে।”

বিনয় সমস্তে কহিল, “উহঃ, তোমার মনে নেই



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মা, তুমি আমাকেই ওর চাইতে একটুখানি বেশী ভালবাস। সেই যে আমার অস্থির সময় তুমি দিন-রাত আমার কাছে থাকতে, কেবলি হরিকে ডাকতে—ওর কাছে গুতে না, আমি ভাল হ'লে কত সন্দেশ-বাতাসা হরির লুট দিয়েছিলে।”

মা শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু অশ্লীলতাটি এ অপমান সহ্য করিল না, সে-ও তেমনি আগ্রহে আর একটি উদাহরণ বাহির করিল।

“আমার পান-বসন্তর সময় ডাক্তারবাবু মাকে আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলেন, মা কি তা শুনেছিল? তোমার তো শুধু জর, সে তো ঘোবের নর, আমার কাছে মা দিন-রাত থাকতেন, থাকতে না তুমি মা?”

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, “তা থাকবো না বাছা, তোমার মা-বাপ কেউ কাছে নেই,—আমিই তো তোমার মা। সে মা যা করতো, আমি কি তা না করে থাকতে পারি! উঃ, যা অস্থির করেছিল—পোরাতির বাছাকে যে নীতলা শেতল করে দিয়েছেন, এই আমার মহাভাগি।”

জননীর কৃতজ্ঞতা-গদগদস্বরে এই বলিয়া সেই রক্তাকারিণী দেবীর উদ্দেশে দুই হাত বোঁড় করিয়া নিজের গলাট স্পর্শ করিলেন। তা দেখিয়া তাঁহার এই ছুটি সন্তানও তাঁহার অনুকরণ করিল এবং এই আকস্মিক দেব-ভক্তির অতর্কিত আবির্ভাব উভয়ের চিত্তেই কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একটা ঘেন শান্তির প্রভাৱ বহিষ্কৃত গেল। তখন তাহারা পরস্পরকে ঠকাইতে পারা সম্ভব নর দেখিয়াই হোক, অথবা যে জন্তাই হোক, একটা মধ্য-পথ অবলম্বন করিল। বিনয় কহিল, “আর তবে, আজকের মত হ'জনে ভাব করি—বলু ডাব—”

“ডাব।”

“তোমার সঙ্গে আমার ভাব। মা! এবার একটা গল্প বলো না?”

‘তাবে’র প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই। ঝগড়া চলিলে গল্প শোনার বাধা পড়ে। তা এমন ঝগড়া ও ভাব তাহাদের এই বিবাহিত দুইটি বৎসর ব্যাপিয়া নিত্যই চলিতেছে। কতবারই গাড়ী ডাকিয়া আড়ি হয়।—কতবারই ডাব আনিয়া ভাব হইয়া যায়। তা তাহারা তো ছুটি কচি ছেলে,—সমস্ত সংসারই তো এইরূপ সন্ধি-বিচ্ছেদ মিলন-বিরহাস্তক।

বিপিনবিহারী শীল দেশের মধ্যে এক জন বিশেষ গণ্য-মান্য বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার চালানী ও তেজারতির মস্ত কারবার। তা ছাড়া সামান্ত কয়েকখানি তালুক ইত্যাদিও আছে। ঘরে ছেলেদের অল্প-বজ্রের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ পিতার জায় তিনিও ছেলেদের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখানোর পক্ষপাতী হইয়া পড়ায়, বড় ছেলেটি প্রথমে কলিকাতাবাসী হয় এবং পরে পিতার বিনামূল্যে বিলাত পর্যন্ত পলাইয়া গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে আর কিরিয়া আইসে নাই। বিলাতেই প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। টাকাকড়ির নিতান্ত অনাটন হইলে গরু আইসে এবং রাগ-ঝগড়া করিয়াও পিতা তাহার খরচপত্র প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে চালাইয়া দেন। বিদেশে থাকিয়া যে সদভ্যাসটি তিনি করিয়াছেন, নিজের উপার্জনে তাহারই খরচ আঁটে না। তাহার উপরে একটি বিলাতী দ্বী।

ছোট ছেলে বিনয়কুমারের উপর আশা-ভরসা ইহাদের কোন দিনই বেশী ছিল না, এখন তো আরও একটু কমিয়াছে। বড় ছেলে অজয়কুমার বিলাতে বসিয়াই জটনৈক মালবার-শোণিত-মিশ্রিত ইউরেনীয় রক্তা বিবাহ করিয়া বসিলে, দশ বৎসরের ছোট ছেলে বিনয়কুমারের এখানে এক সাত বৎসরের স্ব-ঘরের মেয়ের সহিত শুভ-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। আমাদের পূর্বোক্ত নায়ক-নায়িকাই এই শুভ-বিবাহে সমস্ত সম্পতিবৃন্দ—বিনয়কুমার ও উর্দীলা। এক্ষণে ইহাদের বয়স বৎসর কতক করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; তবে স্বভাবটা ঠিক তেমনিট আছে।

দশটা বাজিলে স্নান সারিতে বাটীর মধ্যে আসা বিপিনবিহারীর চিরস্তন নিয়ম। তা ঘড়িতে সেই দশটা বাজিতে না বাজিতেই পুত্রবধু উর্দীলা-সুন্দরী সেই বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে বর্ণন দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, “ওগো বাবা! আজ কি তোমার চান করবার সময় হবে না, না কি গো?”

এই রকম সে প্রায়ই ডাকিতে আসে। বারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বিপিনবাবু তখন চোখের উপর চশমা লাগাইয়া কি সব কতকগুলো পুরাতন হিসাবের কাগজ-পত্র পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; সামনে এক তাড়া খেরো-বাঁধা খাতাপত্র বিছাইয়া তেজারতির গোমস্তা



সিদ্ধা; বধু-ঠাকুরাণীর সশব্দ আগমন ও সদর্প আহ্বান-শব্দে কুণ্ঠিত হইয়া সে বেচারী মাথাটা একটু হেঁট করিল। চক্ৰবৰ্ত্তী-ঘণ্টাই শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠের অন্ত্যাস, তাই এ ডাক তাঁহার কানে পশিলেও মনে পৌছিল না। তিনি ছুইটা সই ঠিক এক রকম দেখাইতেছে কি না, একমনে তাহাই পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে মিলাইতে লাগিলেন।

“বাবা! বলি, ও বাবা, ডাকটি, তা কথা কইছো না যে বড়? শুনে পাচ্ছ না, না কি?”

“বিপিনবাবু অর্ধ-অজ্ঞমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, “আ? কি রে পাগলি?”

“মা—গো! এতক্ষণ পরে বলা হলো কি না, —কি রে পাগলি! চানটান করতে হবে না বুঝি আজ?”

“হ্যাঁ রে, হবে বই কি। এই যে বাই।”

জবাব দিয়া বুদ্ধ বধাকার্য্যেই ডুবিয়া রহিলেন। তখন উন্মীলা বিশেষ রাগিয়াছে, সে দরজার ধাক্কা দিয়া একটা চমকপ্রদ শব্দ করিয়া সরোষ-গর্জনে চোঁচাইয়া উঠিল, “বাবা রে বাবা! ছেলে যেন একজামিনের পড়া পড়েন! এই চল্লুম আমি, থাকো তুমি তোমার বই নিয়ে বসে।”

বিপিনবাবু তটস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ খাতাপত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৎসিত বালকের মত করুণ-কণ্ঠে প্রশ্নানোত্ততা বালিকা বধুর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, “ওরে, না রে না, বাসনি, বাসনি—এই যে আমি উঠেছি রে! ওহে গোষ্ঠ! তুমি ওসব এখন তুলে-টুলে রেখে দাও। এর পর এক সময় ওসব নিয়ে আবার বসা যাবে এখন, এখন আর হচ্ছে না, আমার ছোট্ট-মা টি এখন বেজায় কেপেছে।”

উন্মীলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বপ্নের মন্তব্যটুকু কানে ঢুকিতেই সমস্তাত স্বপ্নবিলম্বী ভিজা চুলের রাশি নাড়া দিয়া স্বাক্ষর করিয়া কহিল, “হ্যাঁ, আবার বলা হচ্ছে,—কেপেছে! কেপেবে না তো কি? সেই কখন থেকে ডাকাডাকি করে গলা ফাটানি—বল তো, রাগ হয় না বুঝি?”

বিপিনবাবু চটি-জুতা ছুইটার মধ্যে পা গলাইতে গলাইতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আর তো দেখি, গলাটা কতখানি ফাটলো? কৈ, কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তো!” এই বলিয়া হাসি-হাসি-মুখে সমীপবর্ত্তিনী বধুর কণ্ঠমালা-পর্য্যন্ত কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি বিস্তারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং আর

একটু মাথা নাড়িয়া যেন আশ্চর্য্যভাবেই কহিলেন, “হায় রে, ও শানিয়ে গলা না কি আবার ফাটবে!” —মন্তব্য শুনিয়া উন্মীলা খিল খিল করিয়া এবং বুদ্ধ গোমস্তা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল।

উন্মীলা স্বপ্নের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, “যাও, তুমি বড় ছুঁ হইছে। অমন করে কথা বলো ত তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, তা কিন্তু বলে রাখছি।”

“তা হলে আমি যদি বসে বসে কাঁদি?” বিপিনবাবু ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া অন্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। উন্মীলা স্বপ্নের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বুদ্ধ-বালকটির মুখে সেই সঙ্গীত উত্তর শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং ছটামি-মাথানো সমস্ত মুখখানিকে তাহার এক মুহূর্ত্তেই গভীর করুণামণ্ডিত মেহে উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণনেত্র স্বপ্নের মুখে স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা! বাবা! তুমি কেঁদো না। একটুও কেঁদো না। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে আড়ি করে থাকতে পারি? তুমিই বল তো, পারি কি? সে বরু মার সঙ্গে হলেও হতে পারে, তোমার সঙ্গে হবে না।”

বিপিনবাবুর চোখের কোণগুলো হঠাৎ যেন সত্যকার বালকের মতই তাঁহার এই কুজ মাঝে এই সাধনা-মেহ-প্রকাশে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনিও নিবিড় মেহভরে ভিন্ন নীড়ের কুজ পাখীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের উপর নত হইয়া চুষন করিলেন; তার পর মমতামণ্ডিত মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র করুণা কথা উচ্চারণ করিলেন, “তুমি যে আমার মা!”

কথা কহিতে কহিতে ছই জনে বাটার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বাবুকে আসিতে দেখিয়া বাবুর চাকর মধু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তেলের বাটি ও তেল-ধুতি-হাতে ছুটিয়া আসিল। তখন শীতকাল, রৌদ্রে সেবিত বারান্দার ছোট একটি পাটি পাতিয়া তেল মাখা বিপিনবাবুর নিয়ম। গড়গড়ানু তামাক সাজা ছিল, আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আগুন জ্বল নিশ্চয়। উন্মীলা সে দিকে বারেক চাহিয়াই মধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, “ও তামাক সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা, তুই শীগগির এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আর; আমি ততক্ষণ বাবুকে তেল মাখাই।”



বলিয়া তেলের বাটি টানিয়া লইয়া খণ্ডের পায়ের খানিকটায় সে তেল মাখাইয়া দিল। মধু কি বলিতে যাইতেছিল, উন্মীলা বাম হাত নাড়া দিয়া অপ্রসন্ন-স্বরে বলিল, “না, ও পুড়ে গেছে। তুই ভাল ক’রে সেজে নিরে আর গে যা।—বা” বলি, তাই কর দেখি।”

এই ক্ষুদ্র মনিবটির হুকুম যে কত বড় অজ্ঞান্য মধুর, মধুর তাহা ভালরূপই জানা ছিল, সে অসন্তুষ্ট হইলেও আর দ্বিধা করিল না। কলিকটা উঠাইয়া লইয়া অপ্রসন্নতা-বাজক মশক চরণে চলিয়া গেল এবং ফিরিতেও যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিল।

মধু দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে খণ্ডের নয় পিঠের উপর তেলমাখা হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বধু ডাকিল, “বাবা।”

বিপিনবাবু তখন তামাকের তৃণায় জ্বয় বিধর। মুখের নিকট প্রসারিত চুখন-প্রয়ানী আলবোলায় নল মুহূর্মুহ সাদরে আহ্বান করিতেছে—অথচ প্রেয়সী প্রাণময়ী নহেন! অক্লমনকভাবে তিনি উত্তর দিলেন, “মা।”

“সত্যি, বাবা?”

“কি মা?”

উন্মীলা একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে বলিল, “এই যে তুমি বললে।” বিপিনবিহারী জ্বয় বিধিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বললুম, রে?”

“মা গো! তুমি বড় ভুলে যাও! এই এখনি বললে না?”

“হ্যাঁ, বলেছি তো রে! তবে বুড়ো হয়েছি কি মা, তাই কি যে বলি, মনে থাকে না। তবে আর মা হয়ে কি চলো, যদি বুড়ো ছেলের ভুল-টুলই না শুধরে দিবি।”

উন্মীলা মুখের আগ্রাস্ত কল্যাণের স্নেহ-হাতে মর্জিত করিয়া জোরে পিঠের উপর তৈলাক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, ঐ কথা। ঐ কথাটা কি সত্যি বাবা?”

“কৈ, কোন্ কথা রে?”

“আঃ, বড় বোকা তুমি!” এই বলিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াই হঠাৎ বিনীত ও কোমল কণ্ঠে জ্বয় লজ্জার সহিত যেন সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, “সত্যি কি আমি তোমার মা হই?”

বিপিনবাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শোন একবার কথা! মা হয়ে আমার বেটি বলে কি না, সত্যিকারের

মা হই?”—মা বুঝি কার আবার মিথ্যেকারে হয়?”

উন্মীলা এই উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইল। আনন্দাতিশয্যে সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খুব খানিকটা তৈল লইয়া সেই স্বস্ত্রসাব্যস্ত হওয়া বুদ্ধ ছেলের সঙ্কীর্ণ পৃষ্ঠে সে চাপড়াইয়া দিল। বিপিনবাবু হাসিয়া কহিলেন, “মা গো, আবার কি আমার তুই তেলে-রোদে শক্ত করছিস্ মা? কত তেল ঢালছিস্, বল দেখি।”

তখন নিজের কীর্তি চোখে পড়িতে লজ্জা পাইয়া মাঠাকুরাণী ছেলের সেই তৈল-সিক্ত পিঠের উপরই নিজের লজ্জিত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, এবং এই উপায়েই তাঁহার পিঠের তিন ভাগ তৈল বধু মুখে মাখায় ও কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া উহাকে রক্ষা করিল। এ দিকে ততক্ষণে তামাক সাজিয়া মধুও আসিয়া পৌছিয়াছে।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন এমনি করিয়াই কাটিতে লাগিল। মাতৃ-ঘের শরীরের মধ্যে কোথাও যদি একটা মস্তবড় বা থাকে তো, বাহিরে হাজার চাপা দিলেও একটু নড়াচড়াতেই তাহাতে চাড় লাগে। কিন্তু দীর্ঘ-কালের অভ্যাস সেটাকেও কালে সহনীয় করিয়া তোলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকটে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতারণিত হইয়া বিপিনবিহারী ও জগদ্ধাত্রী মর্মে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রচণ্ড একখানা ক্ষতের মতই সে আঘাতের বেদনা তাঁহাদের চিত্তে চিরসঞ্চিত হইয়াই রহিল; কিন্তু কালের প্রলেপ যে উহার দাহ-জ্বালা অনেকখানি প্রশমিত করিয়া দিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মুখের স্তম্ভভাবেই ব্যক্ত হইতেছিল। বিশেষ জগতের সর্বপ্রধান শোক চিরাপগত প্রিয়তমের অভাবও মাতৃঘর যখন সহনীয় করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন এ তো তবু তাঁহাদের অপ্রতিবিধের তুঃখ নয়। ছেলে বাঁচিয়া আছে, হয় তো সে সুখেই আছে। চাই কি—এমনও আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এক দিন সে নিজের ব্যবহারে-অনুতপ্ত হইয়া মা-বাপের কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিবে। অবশ্য অজয়কুমারের কোন ব্যবহারে সে আশা পূর্ণ হইবার মতই কোন লক্ষণ এ যাবৎ দেখা যায় নাই।

কর বৎসরে বিনয় ও উন্মীলার মধ্যেও কিছু



পরিবর্তন ঘটতেছিল। বিনিবাবকে বুড়ী যদিও এখনও তাহাদের চোর চোর বা জল-ডজি খেলা হইয়া থাকে, তবু সদরের বাগানে আর সে খেলা চলে না; তাহার পরি-অন্দরের সুবহুং আঙ্গিনা বা ছাদ রঙ্গভূমির অধিকার করিয়াছে। কলহ-বিবাদ উভয়ের কিছুমাত্র কমে নাই বটে, তথাপি মারামারি এখন তাহাদের নিত্য-কর্ম নয়, কদাচিৎ তাহা ঘটে। এ দিকে উর্মিলার খাটো চুল লম্বা হইয়া প্রায় পিঠ ছাড়াইয়া পড়ে, সেই চুলে আজকাল সে সোনা-বাধান কাচের চিকুণী গুঁজিয়া মাথাজোড়া খোঁপা বাঁধে। তাহার সর্ষশরীরের অপূর্ণতা এখন দেখিতে দেখিতে বর্ষায় ঢল-নামা পাহাড়ে-নদীর মত ভরিয়া উঠিতেছিল।

উর্মিলার মামার বাড়ী নিকটেই,—ঘণ্টা-কয়েক ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাস। মামাতো ভাইএর বিবাহে দিন-কয়েকের জন্ত সে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতরের কয়েকটা ভাল ঘরের মধ্যে একটার সাজ-সজ্জার আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘরখানা অব্যবহার্যরূপে কতকগুলি সিন্দুকবাক্সের ও ছেঁড়া গদি-বালিসের গুদাম হইয়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়া ছিল। হঠাৎ আজ সেখানে বেশ একটি লোভনীয় শোভনতা বিরাজ করিতেছে। উর্মিলা কোতুলী হইয়া ঘরটার ঢুকিয়া পড়িল, এবং ইহার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

তা ঘরখানায় দেখিবার জিনিসও নেহাৎ কম ছিল না। প্রশস্ত কক্ষের এক পাশে একখানা বকবকে পালক, তাহাতে একটি ধবধবে বিছানা—দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া বুপ করিয়া গুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে—মশারিটা—মা এই সে দিন যেটি সেলাই করাইয়াছেন।—ওঃ, ঐ মন্তলবে বুঝি তৈরি করা হইয়াছিল? ঘরের অপর দিকে খাটখানার ঠিক সাম্নাসাম্নি ঘরের মেঝের খুব বড় গোছের একখানা আগ্রা বা লক্সোজাত কার্পেট পাতা। তার কোণ চারিটায় ফুটন্ত গোলাপ এবং মধ্যস্থলে একটা সতেজ সবল আরবী ঘোড়া আঁকা। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকাইয়া সামনের লিয়ার দৌড়িবার জন্ত উত্তত-তঙ্গীতে সচরাচর মাঝের ক কার

জন্ত নামানো হইয়াছে গো? এ আবার কি! বাহিরের ঘরের একটা ছোট টেবিল মাথার কালো বনাত-আটা, এ দিকে সে দিকে সাতটা খাপখুবরি, টানা, দেওয়াল, সেটাও যে আসিয়াছে।—উর্মিলা চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে দেখিল, সেই টেবিলটার উপর বিনয়কুমারের সযত্ন-সজ্জিত এবং উর্মিলার বহুদিনকার বিশেষ লোভনীয় অনেকগুলি পদার্থ, যথা—আগ্রার শ্বেত-প্রস্তরের তৈয়ারী প্রবাল-কারু-খচিত কাগজ-চাপা, দোয়াতদান, কাশী হইতে খণ্ডর কর্তৃক আনীত পিতলের দোয়াত-কলম, চুনায়ের ফুলদানী ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে।

“বাঃ বাঃ! ও হচ্ছে কি? দেখো, যেন আমার জিনিসপত্র সব লোপাট করে ফেলো না।”

“আমি যেন চোর! তোমার জিনিস চুরি করতেই এসেছি। না?”

ভীষণভাবে ভীষণ অভিযোগের এই প্রত্যুত্তর দিয়া উর্মিলা শ্রিং-এর মত ছিটকাইয়া ফিরিয়া আততায়ীর সহিত ঠিক মুখামুখী দাঁড়াইল। তাহার মুখেচোখে যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে আহতের আঘাতটা যে কোন্‌খানে, সেটুকু বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাউতেছিল। সহস্রবার পূর্বরোপিত চৌধ্যাপবাদ যে উর্মিলাকে এমন অতর্কিত অধিশিখার পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছিল, তাহার স্বামীটির মনের প্রান্তে এক লহমার জন্তও এমন অজ্ঞার বিশ্বাস জাগে নাই। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই সে উচ্ছ্বাস করিয়া বলিল,—

“তার পরে উর্মিলাসুন্দরী! চুপি চুপি কখন আসা হলো? টুক-টুক করে চেয়ে চেয়ে দেখে কি?—এ ঘর আমার!—ওধু আমার এক—এই টেবিলে বসে এবার থেকে আমি একলা লেখাপড়া করবো!—ঘুম পেলে ঐ খাটে একা একাই ঘুমিয়ে পড়বো।”

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া বারেক জেঁই সামনের চৌকিখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া এবং আবার তখনই উঠিয়া সগর্ভ-শুধ খাটের সম্মুখে আসিয়া চটিজুতা-জোড়াটা ধপাস করিয়া তত্পরি গুইয়া পড়িল। পরাজিত এবং একান্ত বিষম প্রতিবন্ধীর পূর্ণ দীপ্ত সহানু চক্ষুর ফিরাইয়া হা কি “দেখলি তো? এ সব আমার!” উর্মিলার মুখ জঁর্জায় কালো হইয়া



সন্দিগ্ধ ভগ্ন-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “কে তোমাকে এ সব দিলে?”

“কে আবার দেবে! আমার মা দিয়েছে।”  
শুনিয়া উন্মীলা হাড়ে হাড়ে জলিয়া উঠিয়া উচ্চ চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল, “মা! ও মা!—”

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ঘরের বাহির হইতেই যেমনি মায়ের সাড়া আসিয়া পৌছিল, এবং সন্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখে ও সম্মুখে চোখে চাহিয়া যেমনি তিনি ঘরে ঢুকিলেন, অমনি হৃদয়ের ক্রোধ ও অভিমানের সমুদ্র উন্মীলার অপমানাহত ক্ষুব্ধ বক্ষে উদ্ভাস হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং এইরূপেই শাওড়ীকে জানাইয়া দিল যে, সে তাহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে।

জগদ্ধাত্রী এ সব মান-অভিमानে বেশ অভিভূত আছেন। ছই এক বৎসর পূর্বে ইহারা স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিত যে, “আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি।” এখন আর সেরূপ করে না, কিন্তু এই একটা স্পষ্টভাবে এখনও নিজেদের কার্য সম্পন্ন করে।

কাছে আসিয়া থপু করিয়া বধুর মাথাটা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, “রাগ হলো কেন রে?”

উন্মীলা জবাব দিবে না। মনে করিয়াছিল; তবুও স্বভাববশতঃ আচম্কা ফসু করিয়া বলিয়া ফেলিল, “যাও—তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কথাই কবো না।”

মা আবার হাসিয়া বলিলেন, “কেন রে পাগলী? কথা কবিনে কিসের জন্তে? কি বলি বন্ তো?”

“কেন রে পাগলী বই কি!—কিছু যেন মনে না।”—উন্মীলা নিজের পুটে-ঘেরা পাশু মাথাটা শাওড়ীর কবল হইতে মোচন-র একটা ঝটকা মারিল। খোঁপার-আটা কাটার ঘুমুরগুলা অমনি বম্-বম্ করিয়া মা উঠিল।

দেটে শুইয়া বিনয় এতক্ষণ হাসিয়া কুটি-কুটি ল। সে মায়ের পরাস্তব দেখিয়া অধিকতর

হুতব করিয়া হো হো শব্দে হাসিতে উঠিয়া উঠিল, “বুঝ্তে পার্চো না?

মিঃ এই ঘর দেখে তোমার পাগলী সেরে আসে পুড়ে মরচেন!”

মা!”

“যাও, যাও, আমি তোমার মা নই,—  
আমার বাবার মা। তুমি নিজের ছেলে  
ঘরটির সব দিয়েছ। আমার দিয়েছ কি?”

গৃহিণী হাসিয়া সম্মুখে বধুর ললাটে  
করিয়া বলিলেন, “নে পাগল কোথাকার।  
তো সব রে। তোকে আবার আলাদা  
আমি দোব কি?”

উন্মীলা সবেগে মুখখানা সরাইয়া লইয়া উ-  
কণ্ঠে বলিল, “ও-সব বাজে কথা আমি শুনে  
চাইনে। আমারও তুমি এই রকম একটা ঘর  
দেবে কি না, শীগ্গির করে বলো?”

বিনয় তাড়াতাড়ি খাট হইতে উঠিয়া মা’র  
দিকে ছুটিয়া আসিয়া ছই হাত বোড় করিয়া  
উচ্চকণ্ঠে চোঁচাইয়া উঠিল, “দিও না মা। তোমার  
পায়ে পড়ি মা! ওকে একটা ঘর দিও না।”

মা বলিলেন, “সে কি রে! ও যে আমার  
ঘরের লক্ষী! তা এ ঘর তো তোদের দু’জনকেই  
দিয়েছি। এইখানে আজ থেকে তুইও তো রাতে  
শুবি রে পাগলি।”

বিনয় অমনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,  
“ও বাবা রে! সে হচ্ছে না। ওকে আমি আমার  
ঘরে শুতে দেবো না। ওর মাথার তেলে আমার  
ঘরের বালিস নোংরা হয়ে যাবে, ওর মল-পরা পা  
মাঝরাতিরে আমার ঘাড়ে এসে চড়ে বসবে—  
সে আমি পারবো না রে, বাবা! তার চাইতে  
গাছতলায় শুতে যাব, সেও বরঞ্চ ভাল।”

মহা অবমানিত ও কোপে আরক্ত হইয়া  
উন্মীলা শাওড়ীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া  
সতর্জনে বলিল, “মা! তুমি জানো তো, ঘুমুতে  
ঘুমুতে কে কার ঘাড়ে এসে পড়ে? সারা রাত  
তোমায় পাশ-বালিস করে আঁকড়ে ধরে তোমার  
ঘুম ভাঙিয়ে দেয়? তবু কি না তুমি বল্চো  
আমার তার সঙ্গে শুতে? বেশ ত তুমি মা!”

মা বলিলেন, “ওরে, তোরা যে বড় হচ্চিস।  
চিরদিনই কি মা’র আচলের তলায় থাকবি?”

বিনয় বলিল,—“তা থাকি, আর নাই থাকি,  
তা ব’লে তো আর ওই রাফুসীর আচল ধরতে  
পারিনে।”

ইহার শোধ লইবার জন্তই উন্মীলা পাল্টা  
গাছিল, “বাপু রে বাপু! ছেলে মা ঘাড়ে  
মতন নাক ডাকান! রাতে ঘুম  
কত দিন যে আমি—সেই



“আমার একটা আলাদা  
না, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে  
দাও, আজ থেকে তোমার ঘরেও  
শোব না। বামুন-মেয়ের কাছে,  
কাছে গিয়ে শোব।—দেবে!—আচ্ছা,  
দেবে এসো।”

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাবা, তোমার আজ চান করতে আসতে  
অনেক বেলা হয়েছে। হবেই তো, এখন তো  
আর আমার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার ঘরে  
আনবার ঘোড়ি নেই।”

“না রে পাগলি! না, বেলা কেন হবে?  
ঠিক সময়েই এসেছি।”

“কখনো নয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বরং  
ঘড়ি দেখ।—আনবো ঘড়ি?”

“না, না, থাক। আচ্ছা, কাল থেকে—”

“সে তোমার দ্বারা হবে না বাবা! দেখেই  
না একবার কতখানি বেলা হল।”

“তবে আন।”

উন্মিল উৎসাহসহকারে ঘড়ি আনিয়া সম্মুখে  
ধরিলে বিপিনবিহারী দেখিলেন, বহুমূল্য ও সুদৃশ্য  
সুইস ঘড়িটি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙা!—বিস্মিত  
হইয়া বধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি!  
ঘড়ি কেন ভাঙা, মা? তুই ভেঙ্গে ফেলি না কি?”

বধু নীরবে মাথা নাড়িল,—“না।”

বিপিন বাবু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তবে  
ভাঙলো কেন ক’রে? একেবারে দফা-রফা হয়ে  
গেছে যে! জানো, কে ভেঙ্গেছে?”

বধু মন্তক হেলাইয়া জানাইল যে, সে জানে।  
আর কিছুই বলিল না। তখন বিপিন বাবু ব্যথিতে  
পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, “বিনে!  
নিশ্চয় সেই বিনে হতভাগার কাজ। কই,  
রাঙ্কেলটা গেল কোথায়?”

বিনয় অত্যন্ত গম্ভীর-মুখে আসিয়া বলিল, ঘড়ি  
সে ভাঙে নাই। কে তাহাকে ভাঙিতে দেখি-  
য়াছে?—রোধ করিয়া এই কথা বলিরাই উন্মি-  
লার চোখের উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ সে খতমত  
থাইয়া ঢোক গিলিতে লাগিল।

ঘড়ি-ভাঙা এবং মিথ্যা বলা,—এই দুইটা অপ-  
কর্মই বিপিন বাবু, বৎসরোনাতি তীব্র

ভৎসনা করিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। মোহ-বীকার  
এবং মিথ্যার ভৎসিত হওয়ার অত্যন্ত অব-  
মানিত বোধ করিয়া ইহার যে মূল, তাহার দিকে  
অগ্নি-দৃষ্টিরই অনুরূপ একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া  
ছমছম শব্দে পা চুকিয়া সে চলিয়া গেল। পুত্র  
ঘরের অন্তরালে গেলে-ছোট একটা নিখাস ফেলিয়া  
বিপিন বাবু আশ্রয়িত ভাবেই বলিলেন, “ছোট্টই  
সমান গৌরার। এটারও মানুষ হবার লক্ষণ  
দেখি নে!”

স্বামীর সেই কোপদৃষ্টি এবং নিষেধ অপরাধ  
শ্রবণ করিয়া সে দিন সারাদিনই উন্মিল লুকুচিয়া  
লুকুচিয়া বেড়াইল। কিন্তু এখন আর কেন সে  
এমন করিয়া অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেও  
পারিতেছিল না। এইবার স্বামীর নিকট ধরা দিয়া  
কৃতকার্যের শাস্তি বহন করিতে প্রাণ তাহার  
উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। সারা-  
বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে  
বাহির হইয়া আসিল। অন্তরালে থাকিয়া আত-  
তায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে চিত্ত তাহার  
বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এই ভয় যে, এই  
একটু পূর্বেই এরূপ স্থলে যেমন ঘটয়াছে, এবার  
তাহার কোন লক্ষণই যেন দেখা গেল না। বিনয়  
তর্কে তর্কে উন্মিলার সন্ধানই ব্যাপৃত থাকে এবং  
তাহাকে বাহির হইতে বেধিলেই বাধের মত গর্জিয়া  
আসিয়া তার বাড়ে পড়ে। তারপর হড়াহড়ি  
মারামারি—সে সব অনেক কাণ্ডই ঘটয়া যায়।  
কিন্তু আজ তার তো কই কিছুই হইল না! গোপন  
আবরণ ছাড়িয়া অবশেষে এমন কি, সারা বাড়ীসহ  
উন্মিল বুরিমা বেড়াইয়া অধীর আগ্রহে খুঁজিয়া  
আসিল, শত্রুপক্ষের যে দেখাই নাই। ব্যাপার-  
খানা কি? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও যে  
ভয় হয় না।—যদি ঠিক সেই সময়টিতেই সেই  
অশেষিত ব্যক্তিটি আসিয়া পড়িয়া তাহার কথা-  
গুলো শুনিতে পার।

সন্ধ্যার পর কি একটা দরকারে উপরতালার  
ভিতরকার বারান্দার দিকে ঘাইতে ঘাইতে উন্মিল  
দেখিল, বিনয়ের ঘরের মধ্যে আলো জলিতেছে।  
দেখিয়াই তাহার বিষম-মুখে অমনি আশার  
আলোক জগিয়া উঠিল এবং ছৎপিঙটা একে-  
বারে উৎসাহে লাফাইয়া দ্রুত করিয়া উঠিল।  
দেখিতে দেখিতে তিন লাফে ঘরের সমীপবর্তী  
হইয়াই সে বন্ধন রবে মনের শব্দ করিয়া ঘরের  
চুকিয়া পড়িল, কিন্তু তখানি পুত্রের পৃষ্ঠার



অথবা মনোযোগ-নিবন্ধন বিনয়কুমারের দৃষ্টি তাহার পানে ফিরিল না! বোধ করি, চারগাছা মলের সে খন্ খন্ রব তাহার কর্ণগোচর না হইয়াই বা থাকিবে?

উন্মিলা নিজের প্রতি উহার মনোযোগ আকর্ষণের কোন সুযোগ খুঁজিয়া না পাইয়া খোলা দরজাটাকে টানিয়া খনান করিয়া বন্ধ করিল। তারপর তাহাতেও বিপক্ষ-পক্ষকে অটল দেখিয়া অসহিষ্ণু ধৈর্য-হারা হইয়া ছুটিয়া যে চৌকি-খানায় সে বসিয়াছিল, সেইখানার হাতা ধরিয়া বিপুল বলে একটা ধাক্কা মারিল। পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া বিনয় তখন বিছাতের মতন তাহার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ গম্ভীর-বলিয়া উঠিল, “খবরদার! আমার ঘরে ঢুকেছ,—কি ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি।”

উন্মিলা আসিয়াছিল বিনয়ের কাছে ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু পূর্বের সমস্ত সঙ্কল্প নিজেই যখন মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকীটুকুর বখাও বিস্মৃত হইয়া গিয়া তেমনি খর-দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সে-ও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, “ইস—তোমারই না কি একলার ঘর? জানো,—মা বলেছে, আমারও এতে সম্পূর্ণরূপ ভাগ আছে।—শুধু তাই নয়; তোমার সব জিনিসে আমার ভাগ আছে, মা বলেছে।”

বিনয় নিজ-নামের সম্মান সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়া ভীষণ-দৃষ্টিতে জ্বর পানে চাহিয়া তেমনই ঘরে গর্জিয়া বলিল, “বেরোও বলছি, এ ঘর থেকে। ভাল চাও তো একনি বেরোও!—আমি ‘স্পাই’কে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনে।”

এ কথার উন্মিলার অহঙ্কার-প্রদীপ্ত মুখের দ্বিবি এক মুহূর্তে রাহগ্রাস-কবলিত শশকের মতই নিশ্চিন্ত হইয়া গেল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিসে যে কি ঘটে কেহ জানে না, এই যে কাণ্ডটা ঘটয়া গেল, একেবারেই ইহা অপ্রত্যা-পিত এবং অস্বাভাবিক! সারাদিন ধরিয়া উন্মিলা য ভয়ে চোরের মতন চুরী করিয়া লুকাইয়া বেড়াইয়াছে, সে কিন্তু এ

ইতঃপূর্বে আর কখনই কি এমন ঘটনা ঘটে নাই? তা ঘটয়াছিল বৈ কি। বিবাহের পরদিন

হইতেই তো ■ দম্পতির মত নিত্যই চলিতেছে—তবে এখানেই বিশেষ ঘটনা ঘটিল, যাহাতে চিরন্তন টাই ওলোট-পালোট হইতে বসিয়া একবার ঠিক এই রকমে সে বিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তখন অবশ্য নেই আরও দু’তিন বছরের করিয়া ছোট। খুঁজের কাছ হইতে ফিরিয়া ৭ উন্মিলা তার কলতরঙ্গ মলকে ঝলমল খন্ বাজাইয়া উচ্ছ্বাসে ছুট দেয় এবং এ ছুটিয়া গিয়া, তরকারি কুটিতে ■ শাওড়ীর ঘাড়ের উপর আশ্রয় লয়।

জগদ্ধাত্রী বলিষ্ঠা বধূ—আচম্কা জড়াইয়া ধরার প্রবল উচ্ছ্বাসে সবেগে বটির উপর মুখ খুঁড়াইয়া পড়িতেছিলেন, কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া বটি কাৎ করিয়া কহিলেন, “একুনি দু’জনেই কেটে মরেছিলুম গো! মা গো মা! কি দস্তি-মেয়ে তুই উন্মিলা! প্রাণে একটু ভয়-ভরও কি নেই রে?”

উন্মিলা অদূরে বিনয়ের শুন্ শুন্ পায়ের শব্দ অনুভব করিয়াই প্রাণপণ-বলে শাওড়ীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁর কোলের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে করিতে চোঁচাইয়া উঠিল, “প্রাণে ‘ভয়-ভর’ আছে ব’লেই তো তোমার কাছে এসেছি রে বাপু! ঐ দেখ না, একুনি তোমার গুণধর ছেলে এসে আমার ঠেঙ্গাবেন। ও মা! আমার তোমার আঁচল দিয়ে ঢেকে দাও,—ও মা! ঐ আস্চে!”

মা ঈষৎ হাসিয়া বধূর উত্তমাজটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তুই কি কচি খুকি আছিস রে উমি! যে তোকে আঁচল-চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবো?”

বলিতে বলিতেই এ দিকে তাহার শত্রুপক্ষ ততক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে খরগোসের মতন মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা-পরায়ণায় সকল চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়া তার পা ছুঁইটা ধরিয়া টান দিতে দিতে আশ্ফালন ও গর্জন করিতে লাগিল,—“আমার মার খাইয়ে এসে মজা ক’রে মার কোলে লুকোনো হয়েছে। বাবু, কচি লুকিয়ে থাকা,—দেখ না এক বার কি মজা আজ করি। কীচকবধ করবো। মা! দাও ওর মাথাটা তোমার কোল থেকে হুন্ ক’রে মাটিতে ফেলে, যাক্ একুনি পাকা বেলেয় মজা



ফেটে। দিলে না! আচ্ছা, তা হ'লে এই হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাই।”

জগদ্ধাত্রী আশ্রিতাকে বন্ধার চেষ্টায় তাঁর শিখাসাধাই করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জোয়ান ও হুঁদাঙ্গ ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়েমানুষ আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? হেঁচকা টানের চোটে উন্মিলার মাথাটা বাস্তবিকই আছড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া সেটাকে তিনি নিজেই মাটিতে আন্তে আন্তে নামাইয়া দিলেন। তা দেখিয়া উন্মিলার সকল ধৈর্য্যই টুটিয়া গেল। প্রবলের কাছে পরাভূত হইলে যা হয়;—সে সব দোষ শাণ্ডীর পুত্রপীতির ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের সেই প্রচণ্ড আক্রমণের ভিতরেই তাঁহার উপর অমুপায় কোথের জালা প্রদর্শিত করিতে লাগিল। কাদিতে কাদিতে অমুযোগ করিয়া বলিল, “তুমি আমার কোল থেকে ফেলে না দিলে, ও কক্ষণো আমার এত লাগিয়ে দিতে পারতো না। তোমারই তো দোষ, তোমার নিজের ছেলে ব'লে তুমিই তো তাকে জ্বিতরে দিলে। বা রে আচ্ছাদে মেয়ে!”

তারপর নাকে-কানে খত দিয়া ও দাঁতে কুটি ধরিয়া যখন বিনয়ের সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেল, দুই সখা-সখীতে হাত-ধারাধরি করিয়া রাস্তাঘরে ভাত খাইতে আসিল, তখনও উন্মিলা শাণ্ডীর উপর মুখখানা ফুলাইয়া রহিল এবং তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রুকুটি করিয়া থাকিয়া উত্তর এড়াইয়া গেল। তা' দেখিয়া জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বামুন-মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “কলি কাল কি না! বেধলে মেয়ে! বেটীর আমার বিচারটা দেখলে?”

এবারেও উন্মিলা সেই রকমেরই আর একটা অভিনয়ের আশঙ্কা ■ প্রত্যাশা করিতেছিল। চারগাছা মল্কে হাঁটুর নীচে গুঁজিয়া সে যে সারাদিনই চোরের মতন এখানে সেখানে লুকাইয়া ফিরিতেছিল; এর মধ্যে সব সময়েই তার বুক ছর্ ছর্ করিতেছিল যে, হঠাৎ কোন সময়ে বিনয় কোথা হইতে বাঘের মত লাফাইয়া আসিয়া তার টুটিটা টিপিয়া ধরে, অথবা পিঠের উপর ছড় দাড় করিয়া কিলের বজা ছুটাইয়া দেয়! তা বরং দিক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, পাছে তার সারি-বেধান

চোটে কান কাটিয়া দিয়া শেষে নিজেই আবার তাহাকে ‘কান-কাটা’ বলিয়া ফেপায়,—সেই সব ভয়েই সে তখন অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন তার মনে হইল, এর দশ-দশটা মাকড়ি-সম্বত দুই দুইটা কানই যদি তার বিনয় তার পেনসিল বাড়ী ছুরী দিয়া কাটিয়া লইত, তো যেন এর চেয়ে সে-ও অনেক ভাল ছিল! লজ্জা যে এত বড় হইয়াও সংসারের কোথাও জমান থাকিতে পারে, এ যেন উন্মিলার ধারণাতেও ছিল না।

সেই যে সে দিন উন্মিলা খুঁজরকে বড়ি-জাদার কথা জানাইয়া স্বামীকে লাহিত করাইয়াছিল, তাহার পক্ষে এ কিছু নতুন নয়, কিন্তু এবারে এ কাজটা সে যে কি অশুভক্ষণেই করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাহার ভাগা-নিরজ্জা যিনি তাহার বুদ্ধিকে ওই পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনিই জানেন। তবে ইহার ফলটা যে এতখানি কটু হইয়াই দেখা দিবে, সে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ রাখিলে নিশ্চয়ই এমন কর্ম সে কখনই করিতে বাইত না। সেই যে সে দিন সুগভীর স্বপ্নাতরে গুপ্তচর বলিয়া বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই উন্মিলার দুই পারে কে যেন জোর করিয়া একগাছা মোটা লোহার বেড়ি আঁটিয়া দিয়াছে। বিনয় সেই একটবার মাত্র গর্জিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক হানিয়াই সেই যে আবার পিছন ফিরিয়া বই লইয়া বসিয়াছিল, সেই যে বিদ্যুৎ সে হানিয়াছিল, তার কাছে জগতের আর কোন রকমের মৃত্যু-বাণই বুঝি বেশী নির্ঘাত নয়। শুনা যায়, তাড়িতের প্রবাহের মতন অত শীঘ্র মানুষ মারিবার শক্তি নাকি আর কাহারও নাই। বিদ্যুৎস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের চেয়েও অল্প সময়ে দেহের প্রত্যেক লোম-কূপটিকে পর্যাপ্ত স্থির রাখিয়াই জীবন চলিয়া যায়। তা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার ■ কেহ সেখানে ছিল না তাই, থাকিলে দেখিতে পাইত যে, এই চঞ্চলা মেয়েটিরও অবস্থা প্রায় সেই রকমই হইয়াছে। ঐ একটি মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড তিরস্কারের লজ্জায় তাহার বুকটা যেন কালো হইয়া পড়িয়া গেল এবং তাহাকে মরিয়া যাইবার ■ যেন প্রলয়-ঝড়ের গর্জনেই সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল। ■ চেয়ে সে যদি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণভূষা-যন্ত্র কান দুইটা বেধে কামিনী-■ ডাইয়া ধরিত,



খানিকটা যদি ইহাতে করিয়া পড়িত,—চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া পিঠে অজস্র-ধারার কিল-বুঘি লাগাইত—বুঘি, ঠিক এইটি ছাড়া আর যা-কিছু করিত, তাহাতে উন্মিলাকে এমন করিয়া মরার ব্যাধি হইতে হইত না। কতক্ষণ সে সেই দরজাটা ধরিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে কতটা সময়, সে অনুভব-শক্তিও বোধ করি ঠিক তাহার ছিল না। তার পর সেইরূপ থাকিয়া অনেকক্ষণ পরে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া যখন সে মুখ তুলিল, তখনও তাহার আততায়ীকে তাহার সেই নিজস্থানেই ঠিক সেই একই অবস্থায় নিবিড় মনোযোগের সহিত পাঠময় দেখিয়া সহসা তাহার সেই স্বভাবাধীন অস্তরের উপর যেন আবার একবার নুতন করিয়া তপ্ত শেলের আঘাত লাগিল। এই অকথ্য লজ্জার ঝঞ্ঝা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এবার সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরের গিরা একেবারে অন্ধকার বিছানার মধ্যে উপুড় হইয়া গুইয়া পড়িল।

সে রাতে শীলেনের বাড়ীর বাধা-নিয়মেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

বিপিন বাবুকে আজ আর কেহ আহ্বান করিতে ডাকে নাই। জগদ্ধাত্রী কাজ-কর্মের তদারক সারিয়া বামুন-মেরেকে ডাকিয়া কার পাতে মাছের মুড়া, কার পাতে ভাজাখানা, খোলে বা অম্বলে কোন্ বড়িগুলি দিতে হইবে, সে সবেগ পুরাদস্তর হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া মালা লইয়া যেমন বসেন, তেমনি বসিয়া ছিলেন; কর্তা যখন বাড়ীর মধ্যে খাইতে আসেন, তাঁহাকেও উন্মিলা আসিয়া খবর জানায়; আজ আর উঠিবার কোন তাগিদই নাই। মালার পর মালা ফিরিয়াই চলল। বামুন মেরে এ দিকে রান্নাঘরে রান্না সারিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে বিরক্তিতে অস্থির হইতেছে, শেষকালে আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরের ঝিকে বিড়াল তাড়াইবার বসাইয়া, গৃহিণীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া আসিয়া হাঁক পাড়িল, “বলি, হ্যাগা মা! আজ আমাদের বোরানী কি বাড়ী নেই না কি গা? সব খাওয়া দাওয়া হবে কখন?”

গৃহিণীর মনটা যেন এই রকম একটা কিসের সন্দেহের আমেজে অপের সংখ্যা ভুল করিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ‘নামের’ মালা ষোড়-করতক মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আহিকের সজ্জা বখান্ধানে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে প্রণের উত্তরে

ইহং চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, “কি জানি মেরে! আমিও তাই ভাবছি। বলি, পাগলীর বেটা আজ গেল কোথায়?”

এমন সময় চটিজুতা ফটর ফটর করিতে করিতে আসিয়া তীক্ষ্ণ-পলার বিনয় হাঁকিল, “বামুন-মেরে! বলি, আজ কি খেতে পাবো না, পেট যে জলে গেল।”

“এই যে দাদা! এই যে খাবে এসো না তাই! ওরে দাদাবাবুর আসন দে। হ্যাগা দাদা! আমার বৌদি’মনি আজ সন্ধ্যা থেকে কোথায় গা? দিন সাতবার বে রূপকথাই শুন্তে ছুটে ছুটে আসে, আজ বে বড় লাড়াটি নেই? তানার জন্তে ব’সে ব’সেই তো এত রাত হয়ে গেল। বলি, সময় হ’লেই তিনি আপনাদের ডেকে ডেকে আনবেন খ’ন।”

জগদ্ধাত্রীও ব্যস্ত হইয়া বিনয়কে প্রশ্ন করিলেন, “হ্যা রে, বোমা কোথায়?”

বিনয় ততক্ষণে আসনে গুট হইয়া বসিয়া সাবহিতচিত্তে আহ্বারে মনোনিবেশপূর্বক গভীর-মুখে উত্তর দিল,—“‘হার-হাইনেসে’র টুয়ের প্রোগ্রাম আমার জানা নেই।”

তন্মাসে যখন জানা গেল যে, উন্মিলা তার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিতা, তখন গৃহিণীর আর ভয়-ভাবনার পরিসীমা রহিল না। ঐ দৃষ্টি ঘেঁষেটির ঘুম যে কত দুঃখেই আনিয়া দিতে হয়, সে তাঁহার বিলক্ষণই জানা আছে। নিশ্চয়ই বড় বেশী অনুস্থ হইয়াই সে এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে? স্থূল শরীর ও ব্যস্ত মন লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপর-তলার উঠিয়া “উন্মিলা”! “উন্মিলা”! হাঁক পাড়িতে পাড়িতে তিনি তাহার ঘরে আসিলেন।

“ও মা, তুই ঘুমুচ্ছিস! এমন সময় কেন ঘুমুলি মা?”—বলিতে বলিতে হৃদয়-তরঙ্গ অগাধ মেহ লইয়া মেহময়ী শাওড়ী বধুর মুখের উপর ফুঁকিয়া পড়িলেন।

উন্মিলা বোধ করি বা ঘুমাইয়াছিল, ডাকা-ডাকিতেই যেন তাহার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল; এমন ভাবেই গা ভাঙিয়া নিদ্রালস-জড়িত-কণ্ঠে “উ!”—বলিয়া একটা উত্তর দিয়াই সে আশ্বাস তাল করিয়া গুইল এবং শাওড়ীর অজস্র প্রশ্নের, অনুরোধের, শাসনের উত্তরে শুদ্ধমাত্র একই উত্তর দিল যে, তার বড় অনুস্থ করিতেছে।—সে আজ খাইবে না, উঠিবে না।

মা চমকিয়া গারে হাত দিয়া দেখিয়া শেবে



সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “নাঃ! বেশ আছে! নে বাপু ভক্তি রাখ, গা’তো তোর কনকন করছে। অমুখ হয়েছে না ছাই হয়েছে। সারাদিন দস্তি-বুত্তি করিস, রক্ত-মাংসের শরীরে আর কতই সময়? তাই ঘুমিয়ে পড়েছিস। ওই ভ্রম্ভেই তো বলি বাছা! যে বড় ইচ্ছিস, হুপুর-বেলা আমার কাছে এসে হুদু শৌ, বোস, তা’ তো তোর কুষ্টিতে লেখে নি। কাল থেকে হুপুর বেলা ঘুমুস দেখি একটু, গায়েও তা’তে ‘গতি’ লাগবে।”

উন্মীলা শাণ্ডীর হাতখানা নিজের গায়ের উপর হইতে ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিল এবং একটু চুপ হইয়া থাকিয়া তিস্ত-কণ্ঠে বলিল, “অর তো আর আমার হয় নি, যে, তুমি গা হাতড়াচ্চো! আমার যা ভয়ানক রকম পেট ব্যথা করছে।”

গৃহিণীর বিলম্ব দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বামুন-মেরে উহাদের সন্ধানে আসিয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে অমনি বক্তার দিয়া উঠিল, “কাম-ডাবে না পেট? বলি, পেট তো আর ক্যান্ডি-সের ব্যাগ নয়, যে, যা খুসী তাতে ভরে দিলেই হ’ল! বল্‌বো কি না, তোমার বললে না পেটার যাবে, দাদাবাবু আর এই আমাদের বোঁ-রাণীটি না আর জন্মে যে কে ছিলেন, তা দেবতারাই জানে। এমন সব অখাতি দেখিনে না! বা ওঁদের পেটে যায় না। কাল দেখি না আমড়া-পাতা-গুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুন দিয়ে দিয়ে খেতে লেগে-ছেন। আমি বারণ করলুম বলে বোরানী তো আমার ভেংচে টেংচে এক করলে; দাদাবাবু আবার বলে কি, জানো? বলে কি না, খেয়ে দেখ তো বামুন-মেরে, এ খেলে আর কখনো ভুলতে পারবে না। তা ও-সব খেলে আর পেট-ব্যথা—”

উন্মীলা হাত-পা ছুঁড়িয়া অধৈর্য্যসহকারে চেঁচ-ইয়া উঠিল, “না গো, বাবা গো, সবাই মিলে এই মধ্যে চেঁচাতে ঢুকলো! যাও শীগ্গির তোমরা, না হ’লে আমি একুনি ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ ক’রে ওয়ে থাকবো, তা বলে দিচ্ছি। অমুখ করেছে বল্‌চি, তা একটু ঘুমুতেও দেবে না।”

জগদ্ধাত্রী একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, “তা হলে একটু জোনে-মুনে খা দেখি, না হয় তো—”

বধু এবার উঠিয়া বসিয়া সরোদনে “না হয় তো খানিকটা উঠনের ছাই এনে দাও, খাচ্ছি—” বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া গুমচ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ ডালিল; এবং কাঁদা-কাঁদা-ধরে বলিতে

লাগিল, “বল্‌চি আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না আমার সব ছেড়ে দাও, তোমাদের সে হবে না। আমার অত আদরে দরকার নেই গো, দরকার নেই! যাও দেখি তুমি আমার ঘর থেকে।”— বলিতে বলিতেই গুমচ বিগুণ বেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন অগ্রতিতের এক-শেষ হইয়া স-পার্বদ গৃহ-কর্ত্তী বধুর ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু সে রাত্রের অবশিষ্ট কাজকর্মের মধ্যে আর বেন তিনি নিজের মনটাকে কোনমতেই লাগাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কর্ত্তা আজ সন্ধ্যাবেলায় আফিম খাইতে পান নাই, তাঁহার শরীর বিবম-বে-একর হইয়া রহিয়াছে—পদসেবা নাই, বাতের শরীর ব্যথার আড়ষ্ট। তার উপর বধুর অসহ্যতার সন্ধান মনটা বেন তাঁহার কি এক রকম হইয়া গেল। সে রাত্রের খাওয়ার মধ্যে কোন রসই তিনি পাই-লেন না,—সাতবার করিয়া গৃহিণীকে বলিতে লাগি-লেন, “হ্যাঁগা, পাগলী বেটীর যদি সত্যি সত্যি বেশী অমুখ হয়? হ্যাঁগা, হরিদাস ডাক্তারকে না একবার ডাকাওই না।”

বিনয়কে সাইকেল লইয়া দাঁড়িতে বসিয়া, সে শুন্ হইয়া জবাব দিল, “আমি কি তোমার বউ-এর খানসামা নাকি যে তাঁর চুল টনটন করছে বলে এই রাত্রে অমনি স্নানের মুখে বাতের মুখে পড়তে দৌড় দোব? ভাল এক আত্মরী ফুটেচে।”

ভরে আর জগদ্ধাত্রী স্বামীকে এ কথা জানিতে দিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার মনটা এ-রাত্রে শুধু একটু পেট-ব্যথার ডাক্তার ডাকার হাজার আশ্রয় পোহাইতেও খুব বেশী রাজী হইল না। তিনি বলিলেন, “দেখা বাক, চুপ ক’রে থেকে ঘুমিয়ে যদি সেরে যায় তো আর অত নেঠা কেন?”

কেবল বিনয়ই শুধু এ বাড়ীর মধ্যে সর্কাসপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে আহারকার্য্য সমাধা করিয়া নিজের স্বস্তর শয়নাগারে নিদ্রা দিতে চলিয়া গেল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর হইতে চক্রের গতি যে কেমনই সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল, বেন এক ইচ্ছাশালী উন্মীলা সে দিনের সেই অগ্রত্যাগিত হুসহ লজ্জার বেদনার এমনই মুসুড়িয়া পড়িল এবং নিজের মনের সঙ্কোচে নিজের সান্নিধ্যকে সে এমন করিয়াই



পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, এক এক সময়ে তাহার নিজের কাছেই এটা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মতই অদ্ভুত ঠেকিল। বিষয়ে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা' শত চেষ্টাতেও কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই, কেমন করিয়া সেই এত বড় তরুণ কার্য্য আপনা হইতে সে করিতে পারিতেছে? ইহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা যেন একটা অকথ্য ও প্রচণ্ড ব্যথায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে। কতবারই বিষয়টাকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া চিত্তকে লঘু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া নিজেকে ভীক্ বলিয়া গালি দিয়াছে। নিতান্ত সহজ ভাবেই ঝড়ের মত ছুটিয়া বিনয়ের পাঠাগারে ঢুকিয়া পড়িয়া ভালর-মন্দে কলহে-কাতরতার এই বিষম অভিশপ্ত মৌন-বিদ্রোহের একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার ■■■ যে সে নিজের সমস্ত শরীর-মন-প্রাণকে ক্রুর উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত বুঝি সে নিজেও তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যে সে দিনের বজ্রপাত করিবার পর হইতেই বিনয়ের মুখ-খানা নিরেট মেঘের মতই কঠিন হইয়া আছে, অতি গোপন-সম্বন্ধে সেই মুখখানার দিকে চুপ্ত করিয়া চোখ তুলিলেই উন্মিলার অটল হৃদয় কেনই যে পদ্মপত্রের সঞ্চিত জল-বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকে, সে কথাও ঠিক বুঝা যায় না। আসল কথা, যে কখনও সত্যকার কোন পাপ করে নাই, সে যদি একটা স্বার্থ অন্তায় আচরণ করিয়া বসে, তাহা তার শান্তি যতটা বাহির হইতে সে পায়, তদ-পেক্ষায় সহস্রগুণে উপভোগ করিয়া থাকে সে নিজের মনে। এই যে অজ্ঞাত তাড়নাটা সে অহরহই ভোগ করিয়া চলিল, এটা যেন তার নিজেরই বিবেকের তাড়না।

আবার ও দিকে ইংলও ফ্রান্স প্রভৃতির ইতি-হাসে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের বহর দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়ের মতটাও ইদানীং বেজায় রকম কড়া হইয়াই উঠিয়াছিল। কোন যুদ্ধের এক জন পাণ্ডা লিখিয়াছেন, শত্রুপক্ষকে ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর গৃহ-পক্ষকে দণ্ড দিতে কত ক্রোশ পার্বত্যপথ ছুটিয়াছিলেন; এই অসতর্কতার স্মৃতিই এ দিকে তাঁদের পরাভব ঘটে। ইত্যাদি। সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়াই স্থির করিল যে, এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ইতিহাস-সম্মত ভাবে যখন উন্মিলাকে তার প্রাণদণ্ড দিবার উপায় নাই,

তখন অন্ততঃ উহারই একটুখানি কাছাকাছিও পৌছান আবশ্যক। শুণ্ডচরকে ছেলেরা একেই একটু বিশেষরূপে ঘৃণা করিয়া থাকে, তার উপর বিনয়ের আবার সেই ঘৃণার মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত সীমায় পৌছিয়াছিল। তার উপর আবার যখন সে দেখিল, দিনের পর দিন কাটিলেও সেই অপরাধিনী,—সেই ঘৃণিত জীব, তাহার হুই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পর্য্যন্ত আসিল না,—বরং তেজ ■ উদ্ধতা দেখাইয়া দূরেই সরিয়া রহিল, তখন সে সেই অন্তরস্থ তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের বশে একরকম পাগল হইয়াই নিজের মনের কাছে শপথ করিয়া বসিল যে, এ-জন্মে আর কখনও উন্মিলাকে তাহার ক্ষমা করা হইবে না, এবং এই প্রতিজ্ঞার পর হইতেই অসম্ভব মনোযোগ-সহকারে সে বিজ্ঞানাভ্যাসে যত্নবান হইয়া বই খাটিয়া, বই পড়িয়া গৃহবাসী সকলের ও স্কুল-মাষ্টারদের চমক লাগাইয়া দিল।

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিল। উন্মিলার পেট যদিও গাঁদালপাতার ঝোল ও বিটুগুণ দেওয়া যোয়ান-বড়ির ভয়ে আর কামড়াইতে পথ পায় নাই, তথাপি অ-ক্ষুধাটা তার খুবই জোর করিয়া-ছিল। দিনে রাতে বার পাঁচ-ছয় পেট চিরিয়া খাওয়াইয়াও বার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইত না, সারাদিনই তেঁতুল, কুল, কান্নুন্দি, আলুপোড়া ভুট্টাভাজা, চানাচুর, কুলপি-বরফ ইত্যাদির মতলবে মতলবেই বাকে ঘুরিতে দেখা যাইত; সে এখন নিতান্ত স্বেবোধ বালিকার মত নিজের খাবার-টুকু খাইয়া বার, আবার তাও খানিক খানিক পাতে পড়িয়া থাকে। কচি আম, কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে পিষিয়া ঝালের চোটে ছ'টোক-ভর্তি ■ লইয়া সে যখন তাহার সঙ্গীটির সঙ্গে পরম্পর উপ-ভোগ করিত, জগদ্ধাত্রী তা' লইয়া অবশ্য অনেক রাগরাগিও করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে বৈশাখী ঝড়ের পড়্টি আম ভাঙারের ডালায় রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল, অথচ উন্মিলা তার একটাতেও হাত দিল না, এতে যে তাঁর মনটা কতই কাঁদিল, সে যে অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেউ জানিল না। না; যে বয়সে কাড়িয়া লুটিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার কথা, তখন যদি ছেলেমেয়েরা গো-বেচারী বা বুদ্ধ-দেবে পরিণত হইয়া বসিয়া পড়ে, সে আর বার ভাল লাগিতে ■ লাগুক, মায়ের কখন তা' লাগে না—তাঁরা হুই শ্বামি-দ্বীতেই তাঁদের এই পাগলী বউ-টিকে লইয়া বড়ই বিব্রতা হইয়া রহিলেন। কবিরাজ



বলিলেন, নাড়িতে কোন রোগের চিহ্ন নাই, পেটও আর কামড়ায় না যে তাকেই একটা বড় রকম আক্রমণ দেওয়া যায়; অথচ ওই যে মুখটি ভারভার, চোক দুটি ছলছলে, হাসি নাই, ফুর্তি নাই, যে লাফালাফি মারামারির চোটে বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ থাকিত, সে সবেম কিছুই নাই, এ কি কখন ভাল লাগে? বিপিন শীলও এই স্বর ও মৌন প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হন, প্রাণ তাঁহার ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠে, মাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করেন, “হ্যাঁগা মা! অমন করে রবে-ছিঁস কেন? তোর কি হয়েছে রে?”

এই মেহ-সম্ভাষণে উর্মিলার বক্ষ যেন উথলাইয়া উঠিতে থাকে। নাক-চোক জ্বালা করিয়া জলের প্লাবন বাহির হইয়া আসিতে চায়। গলার ঠেলিয়া ওঠা কঠিন আবেগটাকে কোন মতে নিরুদ্ধ রাখিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া হাসির ধরণ দেখাইয়া সবেগে মাথা নাড়ে,—“কিছুই না”—এবং আত্মগোপনের জন্তই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া পালায়।

ইহার পূর্বে আর কখনও তো এমনটা ঘটে নাই, তাই এতবড় কাণ্ডটা ঘটিতে থাকিলেও এই বালক-দম্পতীর প্রবীণ অভিব্যক্তির চিত্তে কোন সন্দেহের রেখাপাতই করিতে পারে নাই। উর্মিলা মুখ ফুলাইয়া থাকে, বেশীর ভাগ সে বিছানাতেই পড়িয়া থাকে, এই বলে পেট-বাথা, এই বলে মাথার যন্ত্রণার প্রাণ গেল, ভাল কথাটি বলিতে গেলেও সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দশটা মন্দ শুনাইয়া দেয়। স্বপ্ন-শাওড়ী তো বউ লইয়া একরকম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ছেলের যে আজকাল তার পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যেই অথও মনোযোগের সঞ্চার হইয়াছে, কোন রকম বদমায়েসীর মধ্যেই আজকাল আর তাহার সাড়াটি অবধি পাওয়া যায় না; হঠাৎ এক দিন এই তত্ত্বটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইহার মূল তথ্যটিও জানা গেল—অর্থাৎ কি না তাহার ঘাড়ের অবিভাগটির স্বরূপ ত্যাগ করাতেই এই সুযোগটুকু ঘটিয়াছে; এটুকুও জানিতে বাকী রহিল না,—তখন এই একমাত্র কারণেই গুণু প্রিয়তমা বধূটির ক্রগিয়া পড়াটাকে তাঁহার কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইতে পারিলেও মনে মনে তাহার জন্ত তাঁহাদের আর উদ্বেগের অন্ত রহিল না। রোগের কষ্টেই যে সে তাহার স্বামি-রক্তটিকে ভূতের মত অনুসরণ করা হইতে মুক্তি দিয়াছে, এ বিষয়ে

সন্দেহের ছিলই বা কি? ইহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ কবি-বাক্যকে সার্থক প্রমাণ করিয়া তাহাদের “যখন হতো ঝগড়া-ঝাঁটি, হতো প্রায়ই লাঠালাঠি,—গতিক দেখে ছোটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকতো”—গোছের হইয়াছে। আজ সহসা তাহারা এত কি বড় হইল যে—

কিন্তু একটি পূরা দিন-রাত্রির অবসানে এই হের অবজ্ঞার গুপ্তচরীটির ‘বিরহ’ বেদনা তার বিচারকে এমন করিয়াই পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা প্রায় অসাধ্য হইয়াই উঠিল। তার ঘুম ভাঙ্গা হইতে ঘুম আসা পর্যন্ত সমস্ত দিনটার সকল কিছুই যেন নিরুপদ্রবে, সুনিয়ন্ত্রিতায় অসহ্য বিরক্তিকর হইয়া পড়িল। কানের মধ্যে ‘টু’ করিয়া, অথবা জুই পা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আর কেহই ঘুম ভাঙ্গায় না। পড়ার সময় পিছন হইতে অলক্ষিতে আসিয়া চোক চাপিয়া ধরা, আচম্কা আসিয়া পড়িয়া ফস্ করিয়া বই কাড়িয়া লওয়া এবং তাই লইয়া খানিকটা মারামারি হড়াহড়ি ও তত্ত্বপলক্ষে কোন কোন দিন তিরস্কারভাষ, কোন কোন দিন পাঠ্য-পুস্তক-খানাকেই ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করা, ভাতের খালা সামনে লইয়া যে কোন একটা তুচ্ছ বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া—আর তো তেমন করিয়া ভাত-ছড়াছড়ি, জলের গ্লাস উল্টাইয়া কত না অনাস্থাষ্টি অকর্ম্মের সৃষ্টি করা এবং সেই সব অস্ত্রায় অপচয়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে উত্তরেরই ভৎসিত হওয়া। এ সব যেন কোন স্বপ্নের কাহিনী হইয়া উঠিল যে! বিনয়ের প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। উর্মিলার সে দিনকার সেই ভীম মুখচ্ছবি স্মরণে আসিয়া তাহাকে তাহার উপর যেন অকস্মাৎ মমতায় ভরাইয়া দিল। উর্মিলার দোষের বিচার করিয়া সে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছে; কিন্তু কত দিনই যে এই উর্মিলা তার কত শত অস্ত্রায় অত্যাচারকে নিজের বকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই প্রাপ্য তিরস্কার নিজে সহিয়া গিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার নিম্ন হইতে সে যে কতবার বলিয়াছে—“তুমি করেছ জানলে বাবা বেশী রাগ করবেন, তার চেয়ে বলি যে আমি করেছি।”—বিনয়ের এই সত্যের বৎসর বৎসরের জীবনে হঠাৎ আজ সে সব কথা মনে পড়িয়া অত্যন্তই লজ্জাবোধ হইল। এতবড় কাপুরুষতা



তার কোথা হইতে জাগিয়াছিল, যে, মেয়েমানুষের আড়ালে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে—তার বোধ হইল, তবে তো উন্মিলার তাহাকে ধরাইয়া দিবার স্তায়-সঙ্গত একটা অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সে যে তার কাছে নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছিল! এই কথা মনে হইতেই নিজের পরে ক্রোধে উন্মিলার সম্বন্ধেও বিরক্তিতা প্রবল হইয়া দেখা দিল। তা' যাই হোক, 'স্পাই'কে তা' বলিয়া কোনমতেই ক্ষমা করা চলে না। আবার তার উপর দোষ করিয়া—অতবড় দোষ করিয়া উন্মিলা আবার উন্মিতা কি না এমনি ভাবখানা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন, যেন বিনয়ই তাঁর কাছে কত বড়ই অপরাধী! বেশ থাকুন। জন্মে আর কখনই সে উহার সহিত সখ্যতা-স্থাপন করিবে না। সে এই জন্মের মতই শেষ হইয়া গেল।

অকস্মাৎ এই সমরটিতেই একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।—বিনয় আসিয়া বলিল, “বাবা, আমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে চাই, আমাদের স্কুল থেকে চার জন ছেলেকে পাঠাচ্ছে, আমারও খুব ইচ্ছা যে বাই, আমার যেতে দিন।”

বিনয়ের এক জন অধ্যাপক নিজে আসিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন : এবং বিনয়কে পাঠাইবার বিশেষ ভাবেই অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, “পড়া নিয়ে ব'সে কাটাবার চেয়ে আর সকল বিষয়েই ওর শক্তি বেশী। বিশেষ, আপনার ঘরে পরসার জুখ নাই; এ অবস্থায় বিনয়ের মতন ছেলেরই ভাল ডাক্তার হবার সুযোগ অধিক, আমি দেখেছি ওর দয়া-ধর্মটা খুবই প্রবল। পথের তিথারীদেরও ও ডেকে কথা কর, তুলে বসায়। ওকে জীবন সার্থক করবার এ অবসর দান করুন। বিশেষ এমন সুযোগ পাচ্ছে।”

বিপিন শীল ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনুমতি দিয়া ফেলিলেন।

জগজ্ঞাতী কঁাদো-কঁাদো-গলায় বলিলেন, “হ্যাঁগা, ছেলেটাকে আবার তুমি কাছ-ছাড়া করতে চাইচো? তোমার কি নেই প্রাণে একটুও?”

বিপিন বাবু মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “সে তো বটেই। কিন্তু কি জানো, ছেলেটা পড়া-শোনার তো তেমন নথ, অথচ এ দিকে বেশ একটু শক্তি আছে, দেখলে না, সে দিন চট্ট করে সেই তারার ছিঁড়ে পরা মিজীটাকে এক মুহুর্তে কেমন ব্যাঙে

বেঁধে রক্ত বন্ধ করে দিলে, আর ওর বাঁটারটাও সবাই বলছেন যে, ওর যখন একটা স্বাভাবিক শক্তিই রয়েছে, ও-বিষয়ে আবার এমন একটা সুযোগ উপস্থিত, তখন আর বাধা দেওয়াটা উচিত হয় না। দেখ, গোবিন্দ কি আর বারে-বারেই আমাদের কঁাদাবেন! তাঁর নাম নিয়ে যাতে মজল হয়, তাই হ'তে দাও!”

তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। যা ছেলের কাছে কাদিয়া গিয়া পড়িলেন; বলিলেন, “আমি কাকে নিয়ে থাকবো রে? তোর মুখ দেখেই যে শুধু পাশানে প্রাণ বেঁধে বেঁচে রয়েছে।”

ছেলে হাসিমুখে জবাব দিল, “কেন, তোমার তো আর এক জন রয়েছে। তাকে নিয়ে খেক, আমার যেতেই হবে।”

তিনিরা উন্মিলা চিলের ছাদের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া খানিক কাদিল, তারপর দিনে রাতে এদিক-সেদিকে উসখুস করিয়া ফিরিতে লাগিল। যে, যদি এই বিদেশ যাত্রা উপলক্ষ্যেও তাহাদের মধ্যকার এই সহস্রাগত, অথচ ইহারই মধ্যে যেন প্রায়জরুজ্জ্বা বিরাট মৌনতার নির্মম প্রাচীরটা কোন মতে ভাঙিয়া পড়ে! যদি তেমন ঘটতে পারে, তবে বুঝি উন্মিলার কাছে এই দীর্ঘদিনের ছাড়াছাড়ির নিদারুণ ভীতিও আনন্দ-সংবাদে মতই মধুর হইয়া উঠে।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়কুমারের কলিকাতা-গমন উপলক্ষ্য করিয়া তাহার নিজের বাড়িতে পড়সী-গৃহে যখন যাত্রার আয়োজনে ছোটখাট ঘটনা উঠিয়াছে; উন্মিলার মনের ভিতরে সে সময়ে নিরন্তর একটা অতি ভীষণ অশ্রু-পাত চলিতেছিল। তার মনে হইল, তার উপর রাগ করিয়া বিনয় যেন এই রকমে তাহাকে জন্মের মতন ফেলিয়া বাইতেছে। তার অপরাধেরই যেন প্রায়শ্চিত্ত। আর এই যে তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে, পর আর কখন—কোন দিন কোথাও দিরাই বা যেন তাহাদের মধ্যকার এই ব্যবধান ঘুচিবে না, এমনি একটা প্রবল আতঙ্কমিশ্র জুখ সে তাহার বালিকাচিত্তে এতই তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহা সহ্য করিয়া থাকা তার পক্ষে



একান্ত দুঃখ হইয়া দাঁড়াইল। এবার আর নিজেকে স্মরণ করিয়া রাখিবার চেষ্টামাত্র না করিয়াই সে যেন একান্ত অসহায়ভাবেই অস্তর্ভৌগিক হস্তে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া কান্নার আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়া বিছানা লইল। বামুন-মেয়ে ভাত খাইবার জন্ত ডাকিতে গিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত যখন জানাইল, “আহা গো! দাদাবাবু কলকাতার ‘থাকতে’ যাচ্ছেন কি না, তাই জন্তে বৌদিমণি কান্দিতে নেগেচে গো! আহা, তানারও মুখটি এতটুকু হয়ে শুকিয়ে গেছে।”—তখন উন্মিলার সকল দুঃখ যেন বাঁধ-ভাঙ্গা বর্ষা-জলের মত তার বুক ছাপাইয়া পড়িয়া দামোদরের বস্তার মতই ছুঁ শব্দে ছুটিয়া বাহির হইল। কান্নার কান্নার সে যেন আপনাকে এবং দর্শকেও অবসর করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া তুলিল।

কিন্তু বিনয় তার এই নীরব কান্নার কোন খবর না জানিয়া অথবা বামুন-মেয়ের মুখে শুনিতে পাইয়াও এটুকুকে পর্যাপ্ত বোধ করিতে পারিল না। তার কলিকাতা যাওয়ার খবরেও যখন অপরাধিনীকে লজ্জা-বিপর ও ভয়ভ্রম করিয়া তার পায়ের তলায় টানিয়া আনিয়া না, তখন তার ক্রোধটা যেন দগুণ বাড়িয়া গেল এবং সেই ক্রোধ যতটা হইল, তদপেক্ষায় চারিগুণ বেশী হইয়া দেখা দিল অভিমান। ‘উন্মিলা’—যে উন্মিলার জন্ত সে তার মা-বাবারও কত সময় অবাধ্যতা করিয়া থাকে, তার ছোট-বেলার বন্ধু মাধব, কালু, সুশীল এ সবাইকে যার জন্ত সে কত দূরেই সরাইয়া দিয়াছে—পাঠশালার অগ্রাহ্যের তো সীমাই নাই; সেই উন্মিলা নিজে অত বড় দোষী হইয়াও কি না তার উপর রাগ করিয়া মুখ ফুলাইয়া বসিয়া রহিল। সে কত দিনের মতন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তা দেখিয়াও তার কাছে ঘাট মানিতে আসিল না! উন্মিলার জন্তই সে স্কুল পলাইয়া আসে! এরই চিলের ছাদে উঠিয়া আকাচ-কাপড়ে মায়ের সাধের আচার চুরি করিয়া আনিয়া মাকে মনঃক্ষুণ্ণ করে! নাঃ! ■ জন্মে আর নয়—যদি মরিবার পরেও এক জায়গার থাকিতে হয়, তখনও—সে কোনমতেই আর উন্মিলাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।—

তখন অত্যন্ত দৃঢ় ও নিবিষ্টচিত্তে সে নিজের ভবিষ্যৎকে গুড়িয়া লইতে বসিল। অদূর-ভবিষ্যতের

কলিকাতাকে সে নিজের হৃদয় দিয়া গঠিত করিল। সেখানে কত হাসি, কত আমোদ, কতই না বন্ধুজনের সাদর-কোলাকুলি। তার পর: পড়া-শুনা, কতই নূতন নূতন শিক্ষা, নব নব সমাজের মধ্যে মেলা-মেশা; দরকার কি তার মধ্যে উন্মিলার কথা ভাবিবার?—শেষকালে যখন বিনয়—ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে, খুব নামজাদা ডাক্তার। ছু-তিনখানা মোটর, চার-চারটে কম্পাউণ্ডার, মস্ত বড় ডিম্পেনসারী, আরও ■ কি! ভোর হইতে তার দরজার—উঃ! সে কি ভিড়,—কি ভিড়! বৈকালেও ওয়নি। ওদের দেখা-শুনা করিয়া তৈরী মোটরে এই এখানে—ওই সেখানে, সারা সহরটাতেই যেন ঘোড়দৌড় করিয়া বেড়ানো, বাড়ী ফিরিয়া ছুটি নাকে-মুখে শুঁজিতে না শুঁজিতেই তখনি আবার দেশের সব চাইতে বড় লোকের বাড়ী হইতে ডাকের উপর ডাক। বাড়ীর লোকেরা তার পরিশ্রম দেখিয়া কাতর হইয়া বলিতেছে, “হ্যাঁগা, দেশে কি আর কোনই ডাক্তার নেই? তাদের কারকে ডাক না, বাবু যে খেটে খেটে মারা যাচ্ছেন।” উত্তর হইল, “আজ্ঞে, ডাক্তার ঢেরই আছেন, কিন্তু ■ মরা-বাঁচানর শক্তি তো আর তাদের নেই। কাজেই শুঁকে আমরা ছাড়তে পারি নে। দোহাই ডাক্তার-বাবু, শীগ্গির করে একটিবার চলুন, না হ’লে আমাদের বে সর্বনাশ হয়ে যায়।” আর কি খাইতে পারে? বিনয় উঠিয়া ছুটিল, সে জুতা পরিবার দ্বারা সহ্য না। তার ■ হইয়া বা তার উন্মিলাকে কিসের প্রয়োজন? নাঃ—কিছু দরকার নাই।

আচ্ছা, উন্মিলার যদি অসুখ করে? তারি কঠিন পীড়া, তাহাকে তার মা আসিয়া খবর দিলেন, সে কি করিবে?—সোজা মায়ের মুখের উপর—বলিয়া দিবে যে, “আমি কি জানি।—তোমাদের বউমার অসুখ, তোমরা ভাল ভাল দেখে ডাক্তার আনাও না; আমি ছাড়াও তো অনেক আছে। আমি আর এমন কি ভাল!”

ভাল ভাল ডাক্তাররা আসিল, রোগ-নির্ণয় হইল না; শেষে এমন হইল যে, উন্মিলার আর জীবনের কোনই আশা রহিল না, এক দিন তো তাকে ঘেরিয়া এ বাড়ীর ও তার বাপের বাড়ী হইতে আগত লোকেরা কাঁদা-কাটা পর্যন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন, তখন বিনয় কি করিবে? সে তখন নিশ্চয়ই তার বাপকে গিয়া বলিবে যে,



যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, এখন আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি; অবশ্য জীবন-মরণের দায়িত্ব ও অবস্থায় আমি লইতে পারি না।—এবং তার পর বিনয়কুমার শীলের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য চিকিৎসা-কৌশলে সেই মৃত্যুমুখীন রোগীকে সে অবলীলাক্রমেই বাঁচাইয়া তুলিল। তখন উন্মীলা তরুণ, কি করিবে? ডাক্তারবাবুর হুঁই পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া আর পায়ের উপর মুখ ঝুঁজিয়া নাঃ, ক্ষমা সে তাকে তবুও করিবে না! খাড়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টভাবে তাকে জানাইবে যে, তুমি মরিতে বসিয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমার প্রাণ দিলাম, তাই বলিয়া যে সেই সঙ্গে ক্ষমা করিতে হইবে, তেমন কথা—অন্ততঃ আগাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে তো লেখে না।

উন্মীলাকে ক্ষমা, সে তো কোন দিনই করা চলিবে না।—তার যেমন কর্ম, তেমনই তো কল হওয়া চাই। নতুবা ঈশ্বরের আইন যে ভাঙিয়া যায়। জগৎ হইতে পাপের প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্ত বে উঠিয়া যায়।

■ দিকে যে দিন ভোরের ট্রেণে বিনয়কে তার প্রফেসরের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, তার পূর্ব্বরাত্রে উন্মীলা তার অত্যন্ত নিদ্রাসক্তি-সঙ্গেও কোনমতে একটি বারের জন্ত চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না।

জগদ্ধাত্রীর ক্লাস্ত শরীর-মন সারাদিনের কার্য-কাটি ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে বিছানায় পড়িতেই ঘুমে এলাইয়া পড়িল। তখন উন্মীলা উঠিয়া চুপি চুপি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া চোরের পিঁপিয়া ছাদে উঠিল এবং সেখানের একটা কোণে প্রাচীরের গায়ে মিশিয়া বসিয়া মুক্তহৃদয়ে কাদিয়া বাঁচিল।

রাত্রি গভীর, চরাচর নিস্তর ঘুমন্ত। শীলদের নিদ্রাক্ষর প্রকাণ্ড বাড়ীটার পিছনে প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি লইয়া সুরহৎ উদ্ভান। তার শেষ দেখা যায় না, কেবল চারিদিক দিয়া বড় বড় গাছের মাথাগুলো স্থানটাকে প্রাচীরের মতন ঘিরিয়া আছে, এইটুকুই দেখা যায়, বাতাস আছে কি না বুঝিতে পারা কঠিন, কিন্তু কদাচিৎ একটা সরল দেবদারু উন্নত-শীর্ষ ঈষৎ নত হইয়া অতি-মৃদু-মর্ম্মর শব্দে শুনিত পায় যাইতেছিল। তাদের আলো নাই, কিন্তু অতি উজ্জল ও অসংখ্য নক্ষত্রের আলোর একটা অশ্রুট জ্যোৎস্নার মতই আলো ফুটিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার মৃদু ও স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভানের সুপ্রশস্ত

দীর্ঘিকাটি যেন একখানা প্রকাণ্ড রূপার পাত্রে মতন স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ও জ্যোৎস্নার আলোর মিশিয়া আলো-আধারের জাল বুনিয়া যেন সেখানের সহস্র-শীর্ষ বৃক্ষ-রাজীর মাথার উপরের লজ্জা-বস্ত্রের মতই বিছাইয়া ধরিয়াছিল। উন্মীলা অনেকখানি শান্ত হইয়া তাদের চিরদিনের শত সঞ্চয়পূর্ণ সেই পাথরে-বাঁধান ঘাটের দিকে চোখ স্থির করিয়া চাহিয়া রহিল। ■ বাগানে কত লুকোচুরি, কত জল-ডেঙ্গাডেঙ্গি, কত কাণা-মাছি খেলা, আর ঐ পুকুরের জলকে গ্রীষ্মের প্রভাত অপরাহ্নে তারা কি তোলপাড়ই না করিত। দস্ত-বাড়ীর ছ'জন মেয়ে তাদের সঙ্গে খেলিতে আসিত, কিন্তু তারা তো আজ তার মতন এমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে না, উন্মীলারই যে সব গেল।

প্রকৃতিকে যতখানি স্পষ্ট ও শান্ত বোধ হইয়াছিল, ঠিক যেন ততখানি নয়। প্রকাণ্ড ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা পুরাতন বটগাছের মাথার কাণার অনুরূপ একটা কর্কশ চীৎকারে উন্মীলার বুকের মধ্যে ভীতি উদাহরণ পাঠাইয়া দিয়া কাল-পেঁচাটা ঝটপট শব্দে ডানা ঝাড়িয়া উড়িয়া গেল। উন্মীলা ইহাতে আচম্কা অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই ও-পাশের রাস্তা হইতে বিশ্ববখাট তাদের পাড়ারই একটি ছেলে গোবরার গানের শব্দ সে শুনিত পাইয়া যেন অনেকখানিই আশ্বস্ত হইয়া আবার সেইখানেই যেমন তেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই অন্তর বাহিরের সর্ব্বশৃংখার মাঝখানে একটা ক্ষমন্ত মানুষের ওইটুকু সাঁড়াকেই তার আজ যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল; নতুবা গান শুনিলার মতন মনের অবস্থা বা সাধ সে সময়ে তার একেবারেই ছিল না।

কিন্তু থাক বা না থাক, গনটা তার কানে আসিয়া পৌঁছিল।—

“কেন রাই একলা ব’সে বয়ান ভাসে নয়ন-জলে,  
কৈদে কি পাগল হবি, শ্রাম কি লো তোর

আসবে ফিরে?”

গানটা তার পরিচিত। বিনয়ের গান গাও-য়ার যথেষ্ট সখ ছিল এবং বোধ করি, এই গোবর্দ্ধনের মুখে শুনিয়া তার অর্দ্ধেক সঙ্গীতের সংগ্রহ। বাগানের ঐ বাঁধাঘাটে বসিয়া কত দিনই যে সে তার এই ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটিকে নিজের নূতন নূতন শেখা গানগুলি সাগ্রহে শুনাইয়া গিয়াছে। শুনিতা উন্মীলা যখন তো হইয়াছেই, অধিকন্তু নিজেও যেগুলি গোপনে



গোপনে আস্ত করিতে চেষ্টা হইয়া নিফল হওয়ার ফলও বড় কম হয় নাই। সেই গামেরই একটা আজ এমন অসময়ে অন্তের মুখে ওনিয়াই তার বুক ঘেঁষে কাটে কাটে হইল। “কাঁদিয়া পাগল” হইবারই বুঝি সে আবার উপক্রম করিল। গায়কের সন্ধেহের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি নিষ্ঠুর শব্দে তাহারও অন্তরের মধ্য হইতে কে ঘেঁষে প্রতিশব্দ করিতে লাগিল,—আর কি তার কাছে সে কিরে আসিবে? কলকাতার কত কি আছে। সে কি সেখানে থেকে উর্শিলাকে আর কখনও মনে করিবে? আবার—আবার সুদূর হইতে নৈশ-সন্ধ্যার একটুখানি শব্দ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিয়া তার কানের তারে ধাঁ দিল।—

“ঘরুনা-পুলিনে বসে, কাঁদে রাধা-বিনোদিনী,—

বিনে সেই—বিনে সেই—রাকী

শশী—বাঁকা শ্রাম।”—

এ কি! কান্নার কি আজ সারা-জগৎ শুকই ভরিয়া গিয়াছে না কি? উর্শিলা প্রাণের ক্রন্দন কি আজ সমস্ত বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শুধু মুর্ছনা তুলিতেছে? তার আসন্ন-বিরহের অপরিণীত ও অসহ্য বেদনা-জ্বালা কি আজ চির-বিরহ-বিধুরা রাধার অকুরন্ত অশ্রু-জলের মধ্য দিয়াই এমন করিয়া তাহাকেই কাঁদাইতে দেখা দিল। এ কান্নার কি তার কখন আর শেষ হইবে না? সেই ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি চির-বুগবুগাস্তর ধরিয়া চির-সাধকের সাধনার মধ্য দিয়াই অকুরন্ত এই অশ্রু-নিষ্কার অনন্তকালের জন্যই কি ঝরিতে থাকিবে? অশ্রু-সাগরের কুলকিনারা কি এই ত্রিধামা যামিনীর মধ্য-ধামে এই নিজামত বিশ্বের অনন্ত কেন্দ্রের অন্তর অঙ্গকারে আজ চিরদিনের মতই হারাইয়া গেল? ব্রজ-বিরহিণীর মতই কি এই পরিতাপ্তা অনাদৃতা উর্শিলা সে সীমা-সন্ধিহীন বিপুল বেদনা-সমুদ্রের তীরে আর কোন দিনই পৌঁছিতে পারিবে না?—ঠিক এই কথাগুলি নাই হোক—ঠিক এই ভাবেরই একটা এলোমেলো ও ধাপছাড়া রিক্ততা ও আতঙ্কে ক্ষুদ্র বক্ষকে ঘেঁষে নির্দয়ভাবেই ঐ অশ্রুসজল গানের গুর দিয়া চাবুকের পর চাবুক মারিয়া গাহিয়া চলিল,—

“শুকাল কমল-মালা, বাড়িল বিরহ-জ্বালা,

কাঁদে যত ব্রজবালা, বি-নে-কালী গুণমণি।”—

উর্শিলা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া দমবদ্ধ হইয়া হাঁকাইয়া হাঁকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—

তার মনে হইল, তার সঙ্গে ঘেঁষে সবাই কাঁদিতেছে। ঐ পশ্চিম-দিগন্তে নব আগন্তুক কলাবশেষ ক্ষীণ দেহচন্দ্রেই দেন কাঁদিয়াই অমন হইয়াছে, নক্ষত্রদেরও আর সে জ্যোতি নাই, বাতাস বিলাপের মর্মরে—দেবদাক ও চাঁপা গাছের কাছে বুঝি তারই কথা বলিল? তাহারই সাদার এই শোকের সভার যোগ দিয়া ঘেঁষে ভোরের পাখীরা অধীর কুঞ্জে ডাকিয়া উঠিল। বকুলে অশোকে গলাগলি করিয়া ফুলের জলে ঝড়ঝড় করিয়া সহানুভূতির জল ঠেলিল। তার উপর অদূর-পূর্বাকাশে উষার সিন্দুর-বিন্দুর লোহিত আভার কোটো কোটো হইতেই তার বেদনাশ্রু শিশির-বিন্দুর রূপে সারা-জগতের বুকের উপরে পড়িতে লাগিল। গভীর বেদনা, বিলাপ ও দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত প্রকৃতি ঘেঁষে এতটুকু একটি বালিকার সেই অব্যক্ত ও অকথ্য লজ্জামিশ্রিত শোকের উচ্ছ্বাসে পরিতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া রহিল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার সে বুকভালা দৃষ্টে চাহিয়াও দেখিল না!

তার পর অনেকখানি শান্ত হইয়া উর্শিলা উঠিয়া বসিয়া একান্তমনে হরি-স্মরণ করিতে লাগিল। ঘোড়হাত করিয়া সে বলিল, “একুনি ঘেঁষে আমার কলেরা হয় ঠাকুর! হে ঠাকুর! কাঁদি তা হ’লে তোমায় পাঁচ দিকার হরির লুট দোব। একুনি আমার কলেরা ক’রে দাও, তা হ’লে ওর কলকাতা যাওয়া বন্ধ হয়। আমি না হই ম’রেই গেলুম, তবুও তো আমার উপর রাগ ক’রে চ’লে যেতে পারবে না। আর আমি মরবার সময় তো ওকে ব’লে যেতে পারবো যে, তুমিই আমার সঙ্গে রাগ ক’রে থাকলে ব’লে আমি হরিকে ডেকে ডেকে ইচ্ছে ক’রে ম’রে গেলুম। তা হ’লে তো সে জন্ম হবে।—ঠাকুর! ওগো ঠাকুর! তুমি তাই কমা গো তাই কমা!”

পূর্বাকাশে উষার থোলা কনকহারের মধ্য দিয়া দিব্যোজ্জল-বেশধারী ভাস্করের ভাস্কর মূর্তি দেখা দিল। তখন জগতের অঙ্গকার শোকভরা কাটিয়া আলোকোন্মাদিত আনন্দের রূপ ব্যক্ত হইতেছে।

### নবম পরিচ্ছেদ

জগদ্ধাত্রী বাঁ-হাতে চোখের জল মুছিতেছেন, ডান হাত তার ছেলের খাবারের বাসে তার তিন দিনের খোরাক ঠাসিতেছে; তার পাতে সন্দেশ, পানতুয়া, কচুরি, লুচির স্তূপ সাজাইয়া দিতেছে।



বামুন-মেয়ে ফৌস করিয়া নিখাস ফেলিল, “জোটের পারয়া ছুটি একসঙ্গে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতে—গো; আহা, এমন জোট-ছাড়া হয়ে ছুটিতে ছ’ জায়গার কেমন করে থাকবে! তাই ভাব্‌চি গো!”

বিনয় একমুখ খাবার ঠাসিয়া ভারিগালে হাসিয়া বলিল, “বামুন-দিদি! সেখানে আমার খুব মজার দিন কাটবে; কত কি দেখবার, শোনার, শেখবার আছে! সে কি এমন জঙ্গল! থাকবার আবার ভাবনাটা কি সেখানে?”

“হাজারও থাক্‌ ভাই! তবু ঘরের চাইতে কি আর কোথাও কিছু ভাল লাগে রে দাদা! নতুন তো ছ’ দিনেই পুরনো হয়ে উঠবে, তখন আবার দেখবে ওই পুরনো! এই জন্তেই প্রাণের মধ্যে হিঁচড় নেগেছে। এখানে যে বৌদিগিরি রাজা মুখটুকু বাধা রইলো, সেটি তো আর ওখানে পাচ্ছে না।”

বিনয় এতবড় দার্শনিক রসিকতাটাকে কুলান ঠোটের সাব্যস্ত অহঙ্কারে উড়াইয়া দিয়া সবগে বলিয়া উঠিল, “রাজা মুখ না কালা-মুখ।”

“বাট বাট! এমন কথা ঠাট্টার ছলেও মুখে এনো না দাদা! আহা, আমার সোনামুখী মেয়ে!”

আড়ালে দাঁড়াইয়া উর্মিলার বন্ধ দীর্ঘশ্বাসের ভারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

সে দিন শেষ-মুহুর্তেও উর্মিলা আশা করিতেছিল, শেষ-মুহুর্তেও হয় তো বিনয় তাহাকে কাছে ডাকিয়া বিদায় লইবে।

কতবার নিজেরই সে তার কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কমা চাহিতে মনে মনে প্রস্তুত হইল, কিন্তু কিছুতেই কি পারা গেল না।—

কিন্তু তাহা ঘটিল না। উর্মিলার বিষম লজ্জার বেদনাকে প্রচণ্ড গর্কে ভুল করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুপ্ত-চরের কার্যের সহিত তুল্য-মূল্য করিয়া তুলিয়া বিনয়কুমার জীর নিকটে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ করিল।

বিনয় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়াছে, চারি দিন পরে কলেজ খুলিবে, এই কয় দিনের জন্য সে বাড়ী আসিয়াছিল। বাড়ী সে আসিয়াছে বটে; তথাপি কয় দিনে কলিকাতা-বিনয় এমনি গণ্যমান্ত হইয়া আসিয়াছিল যে, সমস্ত পাড়া ঘুরিতেই তার দিন কাটিয়া যায়। নূতন গান সে থিয়েটার-বাড়ী হইতে

শিখিয়া আসিয়াছে, উর্মিলাকে শোনাইবার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, অথচ বাড়ীতে গাহিলে পাছে বিপিনবাবু ভনিতা পান, সেই ভয়ে গাহিবারও উপায় নাই, অগত্যা কালুদের বাড়ী গিয়াই গাহিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে পুনর্বিদায়ের দিনও দেখা দিল।

জনে জনে বিদায় লইয়াও হঠাৎ যেন কতই প্রয়োজনীয় কি একটা মন্ত কথাই মনে পড়িয়া বাওয়ার বিনয়কুমার আবার একবার ছুটিয়া আসিয়া নিজের ঘরটার চুকিয়া পড়িল। তারও যে এই বাজা-কালটার সহিতে পরা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। উর্মিলা! উর্মিলা! এখনও তোমার অভায় ও অসম্মত রাগ পড়িল না! কমা চাহিলে না! আচ্ছা, জব্ব হও তুমি, বিনয় কখন আর এ জন্মে তোমায় কমা করিবে মনে করিয়াছ? অসম্ভব! অসম্ভব!

এ কি রে বাবা!—সে প্রায় নাচিয়া লাফাইয়া উঠিল। তার টেবিলের উপর প্রায় সাইন-বোর্ডেরই লেখার সাইজের অক্ষরে পুরা একখানা ফুলফুল কাগজে গোটা কতক কি যেন লেখা পড়িয়া রহিয়াছিল। তাই দেখিয়া দৌড়িয়া সেখান। বিনয় গিয়া একরকম যেন ছোঁ মারিয়াই তুলিয়া লইল। তাহাতে শুধু এই করটা কথা লাল-কালিতে জল-জল করিতেছে, “আমি যোর অভায় করেছি। আর কখন এমন কাজ করবো না। এবার করলে আমার তুমি তুকুনি দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিও। এবারকার মতন আমার কমা করো।—উম্মি।”

বিনয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন আক্সায়ে দোল খাইয়া উঠিল। তার মনে হইয়া গেল, সে যেন ধর্ম্মাসনে আসীন মুকুটধারী কোন রাজা আর এই উর্মিলা তাহার বিচার-সভায় আনীতা অনুতাপিতা অপরাধিনী। করযোড়ে সে নিজ হৃৎকতির কমা-ভিক্ষা চাহিতেছে। কালের সঙ্কীর্ণ মত তখনও সে উত্তমরূপে শিক্ষা করে নাই। তাই দোষ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হইলেও যে ফাঁসী দেওয়া রদ্ হয় না—তেমনতর অনুদারতা তাহার জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ খোস-মেজাজে সেইটার উল্টা-পিঠে উহারই অনুকরণ করিয়া লিখিল—

“এবারকার মতন কমা করিলাম। আর কখন এমন কাজ করিলে তোমায় প্রস্তাবমত কার্য



করা যাইবে।” অত্যন্ত লবুচিভ এবং তেমনি লঘুতর ও অসুগতি হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া তাঁর গলাটা হ’হাতে জড়াইয়া ধরিল, “থেকে যাই, কি বলো মা! কলকাতার আর যার না।”

মা চোখ মুছিতেছিলেন, আবার সেই রাজা হ’চোখ বলে ভরিয়া উঠিল। “তখনই তো বারণ করেছিলুম বাছা, কেন এমন বিদ্রুটে মথ করলি! তা না হয়—কর্তার কাছে একবার ব’লে দেখ না।”

বিনয় কানে হাত দিয়া লাকাইয়া উঠিল, “ওরে বাবা! তা হ’লে আর রক্ষা আছে!—তক্ষুনি

গলা-খাঁকা!—দেখ মা! এ বেলা আর যাবো না, ভারী মাথা ঘুরচে, জর হবে না কি! ভাল থাকলে ও বেলা তখন যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি কিছু বাবাকে বলো। বলবে তো? আচ্ছা!”

ক্ষণপরে শীলেন্দরের বাগান-বাড়ীর বাধাঘাট বিনয় শীলের তরুণ-কণ্ঠের স্বভাব-মধুর সঙ্গীত-মহরের আর উখিলার প্রশংসাসূচক মিষ্ট-হাস্তের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া রহিল। তাঁদের সেই অনেক দুঃখের পরের পাওয়া সুখের মিলন দেখিয়া পাখীরা আনন্দের গান গাহিতে লাগিল, বাতাস সুখের সন্মের তুলিল, ফুলেরা সুরভিখাস ছাড়িল।



## দ্বিতীয় অংশ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

এক জন বিশিষ্ট রাজ-আত্মীর ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে দেশে দেশে সমারোহ চলিতেছিল ; তাহারই একটা বড় রকমের ঢেউ আসিয়া পড়িয়াছিল ভূতপূর্ব ভারত-রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপরে। সহরে পত্রপত্রিকার পুষ্পমালা, রক্তনিশানে স্ততিবাঁকা, উজ্জ্বল আলোকমালায় সম্ভ্রিত ভক্তি-অর্থ—কোন কিছুই অভাব ছিল না। ঘরের দৈন্ত এবং অন্তরের বিষাদ-ব্যথা আলোক-লহরী নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সারা সহর একটা আলোকোৎসবময় নাট্যশালায় পরিণত হইয়াছে।

এই রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য কলিকাতার কোন, বড় রাস্তার উপরকার একটা বড় বাড়ীতে এক ধনাঢ্য গৃহস্থামীর পরিচিত জনকয়েক আত্মীয়-বন্ধুর নিমন্ত্রণ ঘটয়াছিল। নিমন্ত্রিতগণ নির্দিষ্ট সময়ের একটু সামান্য পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গৃহস্থামী তাঁহাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। রাস্তার ধারের চওড়া বারান্দায় সারি সারি কেন্দারা পাতা, দেবদারু মালা ও গাঁদাফুলের স্তবক-ঝুলান থিলানের ভিতরদিকে যে সকল পাতলা নেটের পর্দা একটুখানি করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার হই ধার রেশমী-ফিতায় বেশ শোভন করিয়া বাঁধা; মধ্যে মধ্যে ছুঁতিনটা মার্বেল ত্রিপদীতে রোপ্য-আধারে ফুটন্ত গোলাপের তোড়া, তাহারই এক ধারে কটকী রূপার থালায় সুগন্ধি সিগারেট ও সিগার, ঐ দেশজ স্বর্ণমণ্ডিত উত্তম কারু-কার্যবৃত্ত ডিবা ও রেকাবে সোনাগি পাতজড়ান পান, দেশী এবং বিদেশী কায়দার আতিথ্য-পালনসম্বন্ধীয় সকল জিনিসই প্রস্তুত রহিয়াছে। অতিথিবর্গ আসন গ্রহণ করিবামাত্র বিলাতী-ধরণে গরম চায়ের সহিত রসনা-রস-সঞ্চারী কেক-বিস্কুটেরও আমদানী হইতে বাকী থাকিল না।

অভ্যাগতদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বড় বেশী নয়; মাত্র জন পাঁচ-ছয়। নামজাদা প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ করের তরুণী পুত্রী মিসেস্ কর সিঁড়ি উঠিবার সময় একবার এবং বারান্দায় পৌঁছিয়া

আর একবার আশে-পাশে চাহিতে চাহিতে আত্মগতই প্রশ্ন করিলেন—“কই ‘বেবি’কে দেখেছি নে যে!”—পরক্ষণেই ভয়হর্ষে সম্মুখে আগত দ্বিতীয়া মহিলাটিকে (তিনি পাটনা হাইকোর্টের নূতন জজ মিঃ নিয়োগীর স্ত্রী মিসেস্ নিয়োগী) সন্বোধন করিয়া সাগ্রহ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “এ কি রকমটা হলো! মিঃ লাহার বাড়ী নেমস্তন্ন, আর বেবিই আসে নি?”

সন্বোধিতা মিসেস্ করের এই বিস্ময়-বিপর্যয় লক্ষ্যে ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, “এখনও যথেষ্ট সময় আছে, এলা! এর মধ্যেই তুমি হাল ছাড়্‌চো কেন?”

হুজনেই মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল; ঠিক পার্শ্বেই দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তিটির কর্ণও ইহাদের আলোচনা হইতে বিরত ছিল না, ইহাদের হাসির আভাস তাঁহার মুখকেও একটুখানি রঞ্জিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

রাস্তার দু’ধারি বন্ধুকারী সিপাই ঠিক এক হাত অন্তর সারি দিয়া চিত্রাঙ্কিতবৎ দাঁড়াইয়া আছে। তা’ ছাড়া ওপু পুণিসের যে কত জন লোকই বিভিন্ন সাদা পোষাকে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, তার হিসাব পুণিসের বড় কর্তারা ভিন্ন আর কেই বা জানে? তাঁদের সে দিন বোধ করি মরিবার মতনও ‘কুসংস্কার’ ছিল না, দ্রুত-গতি-চালিত মোটরে সমুদয় রাস্তাটার আগ্রাস্ত না হইবে তো অন্ততঃ এক শতবারও তাঁহারা পরি-ক্রমণ করিয়া অটুট শান্তিরক্ষার একান্ত অশান্তিতে নিজেকে অস্থির ও অন্ধকেও বিরত করিয়া তুলিতেছিলেন, গাড়ী-ঘোড়া লোক-চলাচল বন্ধ হইবার সময় অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল। রাস্তার দু’ধারের ছাদ ও বারান্দা লোকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, যে দিকে চোখ ফিরাও, কেবল নর-মুণ্ডেরই লহরী।

মিসেস্ করের চঞ্চল দৃষ্টি পুনাপুনই দৃষ্টমান রাজপথটার এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতেছিল; এইবার আরও একবার সে নিজের মনের উদ্বেগ-কৌতুহল প্রকাশ করিয়া ফেলিল—“বেবি তা হ’লে আর এলো না। বলি, তার আজকে আবার হলো কি? অ্যা! কত দিন



ধরে এই সব যোগাড়-যন্ত্র সেই তো ক'রে রেখে গ্যাছে!”—

আর একটি কম-বয়সের মেয়ে ইহার ঠিক পাশেই আসন লইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “বেবি, কার বেবি, এলাদি? তোমার বেবিকে বুঝি নিয়ে আসতে ব'লে এসেছিলে?”

এই কথায় ছ'চারি জন শ্রোত্রী কলকল হাসিয়া উঠিলেন, শ্রোতাদের অধরপ্রান্তও ঈষৎ হাস্যকুঞ্চিত হইল, তবে ভদ্রতার খাতিরে হাসি তাঁদের ঠোঁটের বাহিরে আসিতে পাইল না, এলা লজ্জাবিপন্নতার জ্ব কুঞ্চিত করিয়া মুহু তিরস্কারে কহিয়া উঠিল, “আহা ম'রে বাই! আমার ‘বেবি’ কেন হ'তে গেল! মিস্ মল্লিককে সবাই ‘বেবি’ ব'লে ডাকে না?”

এলার প্রবাস-প্রত্যাগতা বন্ধুটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর করিল—“তা কেমন ক'রে জানবো ভাই। তিনি আবার কে?”

এলা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল—“আহা, মিঃ লাহার বাড়ী নেমন্তন্ন এসেছেন, আর ‘বেবি’কে চেনেন না! ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে কৃষ্ণা মল্লিক গো, চেনো না নাকি?”

“ওঃ, তাই বলা, কৃষ্ণা মল্লিক। সেই যে খুব উৎকৃষ্ট পিরানো বাজাতে পারে তো? ক'বছরই উপর উপর লরেটোর মিউজিকের পরীক্ষায় ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল না? সেবারে তখনকার প্রিন্স এখানে আসতে সেই যে ছোট মেয়েদের দিয়ে ‘প্লে’টা করান হয়েছিল; তাইতে অফিলিয়া সঙ্গে কি সুন্দর অভিনয়ই যে করেছিল! সে যেন আমার আজও চক্ষের ওপর ভাসছে। মা গো, মরণটা অবধি যেন আশ্চর্য্য সুন্দর!—করেছিল অতটুকু মেয়ে।...” এই বলিয়া সমুজ্জল পূর্বস্মৃতিকে আর একবার স্মৃতিপথে আনিয়া উৎফুল্ল-মুখে মেয়েটি এবার সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, “হা কৃষ্ণা—মিস্ মল্লিক আসবেন তো? একবার দেখাও হয়ে যাবে তা হ'লে! ও কিন্তু আমাদের চেয়ে কিছু ছোটই হবে। আমার তো ছ-ক্রাস নীচেই পড়তো তখন। দেখতেও অনেকটা ছোট ছিল। পাতলা একহারা গড়ন, টকটকে কাঁচা সোনার মতন গায়েব রং, একপিঠ কোঁকড়ান চুলে প্রায়ই একটা সাদা না হয় খুব হালকা রংয়ের ফিতে বাঁধা, সাদা ভিন্ন কোন রংয়ের ফ্রক পরতে কখনো দেখিইনি, আর তাতেই যেন তাকে পরীটির মতন দেখাত। মেমগুলো তো ওকে আদর ক'রে ক'রে

অস্থির ক'রে দিত। রূপটাও খুব বেশী ছিল, আবার তার সঙ্গে গলাও ছিল কি তেমনি চমৎকার! ওকে বুঝি বাড়ীতে ‘বেবি’ ব'লে ডাকে? সে আমি জানতুম না, আসচে না কেন? আসবে তো? আচ্ছা, কি যে বলছিলে, ওই যে মিঃ লাহার বাড়ী এসে ‘বেবি’কে না জানাটা কি নাকি একটা বোর অপরাধের সামিল না কি?”

“নিশ্চয়।”

মেয়েটির নাম মুরজা, মুরজা কিছু সরলা অর্থাৎ বোকা,—সে বিস্মিত হইয়া কহিল—“তার মানে?”

এলা হাসিয়া কেলিল, “তার মানে কিছুই না, আবার সবই, অর্থাৎ কি না—”

পাশের ঘরে বুট-জুতার খটখট শব্দ শ্রুত ধ্বনিত হইল, এক মুহূর্ত্ত পরে গৃহস্থানী মিঃ লাহা ঘরের পরদা সরাইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন।

“আপনাদের সব অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রাখতে জোর ক'রেই বাধ্য হয়ে পড়েছিলুম—মাপ করবেন, মিসেস্ নিয়োগী!—মাপ করবেন মিঃ ব্যানার্জী! মিঃ বোষ! আপনাদের সবাইকার কাছেই হাত ধোড় করছি,—কটা দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, অথচ কাজ এখানেও ছুটে তাড়া ক'রে এসেছে। করি কি বলুন?—ওঃ, এই যে মিসেস্ আতর্ষি! আপনিও অনুগ্রহ ক'রে পায়ে ধুলো দিয়েছেন। তোমার এতক্ষণ চিন্তেই পারি নি যে, কে,—সতীশ? মুরজা! এই যে তুমি। আগ্রা থেকে কবে এসে পৌঁছিলে? কৈ মিঃ চৌধুরীকে দেখেচিনে যে?—ওঃ, তিনি ছুটি পাননি! তুমি একাই এসেছ? বাই হোক, অনেক দিন পরে দেখাটা তো হয়ে গেল! তুমি আমার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ, এতে কত যে আনন্দ হলো, বলতে পারিনে।”

মিঃ লাহা যতক্ষণ ভদ্রতার আদান-প্রদান করিতেছিলেন, কাহারও সহিত কর্মর্দন, কাহাকেও নমস্কার, কাহারও প্রতি শুদ্ধমাত্র একটুখানি টানিয়া-আনা, ভদ্রতার হাসি ইত্যাদি যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়নের মধ্যেও সকল সময়েই তাঁহার উদ্গ্রীব ও চঞ্চল দৃষ্টি চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহাকে অবেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। গহন বনে হারা-ইয়া যাওয়া রক্তের মতই তাঁহার সেই হারান ধন কিন্তু খুঁজিয়া মিলিল না। আগ্রহ ও আবেগে আরক্ত ও উৎফুল্ল মুখের ছবি তাহার সমস্ত উজ্জলতা হারাইয়া অকস্মাৎ শ্লান ও গভীর হইয়া উঠিল। সমাগত সম্মানিত বন্ধুবর্গের প্রতি নিভাস্ত অবজা



না দেখাইতে পারিলেও, তাঁরা যে ইহার নিকট একান্তই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছেন, সেটা বেশ বুঝা গেল।

রাস্তায় লোক-চলচল বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক এমনি সময়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের বাঁশী বিপুল শব্দে বাড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে সেই কালো রংয়ের প্রকাণ্ড “মিনার্ভা” গাড়ীখানাকেও দেখা গেল। গাড়ীটা চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে লাহা-প্রাসাদের সম্মুখীন হইয়া থামিবার উদ্দেশ্যে করিল, এবং ততক্ষণে মিঃ লাহা ছুটাছুটি নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার লোকেরা, কি মেয়ে—কি পুরুষ—একটু বাগ্ন কোতুহলের সহিত লোহার রেলিংএর উপর ঝুকিয়া পড়িয়া এই নব আগন্তুকদের দেখিতে লাগিলেন। যারা কিছু দূরে ছিলেন, আগ্রহ-দমনে অপূরণ হইয়া উঠিয়া আসিলেন। কেহ কেহ অকস্মিকভাবে পার্শ্ববর্তীকে গুনাইয়া অথবা নিজেকেই গুনাইতে চাহিয়া মন্তব্য করিল, “নিশ্চই ‘তাঁরা’।—”

পুরুষ-দলের মধ্যে মুরজার মতন আর কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন, “কারা হে?”

“কেন, মিটার আর মিস্ মল্লিক, তা ছাড়া আবার কে হবে?”

লোকটি একটু অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিটার আর মিস্ মল্লিক ওর কে হন?”

ভদ্রলোকটি একটুখানি মুচ্কি হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে জবাব দিলেন, “হন না—হবেক ‘কেউ’ শব্দই।”

“ওঃ, মিস্ মল্লিকের সঙ্গেই বুঝি তরুণের বিয়ে হবে?”

“সেই রকমই তো উভয় পক্ষের চেষ্টা—আজ ক’বছর ধ’রেই চ’লে আসছে—”

“এত দিন তবে হয় নি কেন?”

ভদ্রলোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সমধিক যত্ন-কণ্ঠে কহিল, “বাঃ! হবে কেমন ক’রে? সে শুড়ে ধে বালি! তরুণ ছেলোটি তো আর জাত-সাহেব নয়, ও যে স্বকৃত-ভঙ্গ!”

“সে কি রকম?”

“বাপ ওর হিন্দু-সমাজের লোক। বিয়ে হয়েছিল ওর ঠিক সত্তর বছর বয়সে এক এগার বছরের মেয়ের সঙ্গে। তার পর বয়স হ’তে না হ’তে তরুণ হঠাৎ সাহেব হ’ল, বাপকে গিয়ে বললে, সে বিলাত যাবে। বিস্তর কারা-কাটনা, রাগ-দুঃখ, শেষে প্রাচীনের পরাভব। তরুণচন্দ্র

বছর কতক পরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি, সি, ল’হা হয়ে ফিরে এলেন।”

শ্রোতা কিছু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, “আর বউটার?”

“বউটা তার খণ্ডরের বাড়ী রৈল। যুগীরোগী আধ-পাগলা মেয়েটা তরুণ চ’লে যাবার পর থেকেই প্রায় অন্ন-জল ভাগ ক’রে প’ড়ে থাকতো, মাথা আরও খারাপ হয়ে গেছলো। তরুণ যখন ফিরে এলো, তখন সে “আন্ডার সেন্টেন্স অফ্ ডেথ্”, “অর্থাৎ?” [যত্নান্বিতের অধীনে।]

“তার দুর্বল শরীরে মনের অত্যন্ত আঘাতের ফলকে ডাক্তার কন্সলমন্ ব’লেই স্থির ক’রে দিয়েছিল। দিনে দিনে ক্ষয় হ’তে হ’তে সে তখন যত্নের প্রতীক্ষার দোরের কাছেই ব’সে ছিল। শুনেছি, সে দৃশ্য সহিতে পারবে না ব’লে—তরুণ তাকে একবার চোখের দেখা দেখতেও যায় নি। বাপের সঙ্গে দেখা ক’রেই চাকরী-স্থানে চ’লে গেছলো। বাড়ীর লোকেও ভয়ে বউকে কিছুই বলে নি; কিন্তু তবু সে না কি ওর পারের শব্দ দূর থেকে চিন্তে পেরেছিল, ও তাই নিশ্চয়ই মহা হাদ্যম করেছিল। সে যাক, এ বিয়ে তারই যত্নের প্রতীক্ষায় এখনও হ’তে বাকী আছে। বিশ্বস্ত-স্বত্রে শোনা গেছে, বিলাত যাবার আগে থেকেই না কি এদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে; মেয়েটি তখন অবশ্য কনভেন্টের ছাত্রী; আর ছেলেমানুষও ছিল। বাপের টাকা ও ছেলের বিভাবুদ্ধি দেখে বাপ তখনই মতলবে প’ড়ে—ওকে ভজন-সজন দিয়ে বিলাত পাঠায়,—তখন অবশ্য জানতো না যে, ও বিবাহিত।”

“তরুণ কিছু বলে নি?”

“না।”

“তার পর কি ক’রে জানলে?”

“তরুণের ক্ষিপ্তে কিছু দেবী হয়, সেখানে ক’বছর চাকরী করে—তার পর কাজে পাকা হয়ে না ও এলো, ফিরে এসেই মিঃ ফীন্স হ’ল। মেয়ে তত দিনে ডাগ হয়েছে, বিয়ের কথা উঠতেই ও বললে, আরও কিছু দিন যাক। মল্লিক তাঁতে আপত্তি তুললে। তখন-আধমরা জীটার খবর দিতেই হ’ল এবং প্রথম একটুখানি মন-কষা-কষির পর অগত্যা মিঃ টি সেরাফে মরতে সময় দিতে হচ্চে। শুনেছি, মল্লিকের মেয়ে নাকি এক দিন অনেক জেদাজেদি ক’রে জীটাকে দেখতেও পাঠিয়েছিল।”



“তা মেয়েটা তো তা হ’লে ভাল বলতে হবে?”

“ওঃ, ও-সব ডাইনীর মায়া হে! মনে মনে মতলব বোধ হয় যে, মরতে কত দেবী, সেইটাই যাচা।”

“বউটা কি করলে?”

“ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি, সেই দিন থেকেই তার রোগ খুব বেড়ে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, সে এখন মরণাপন্ন।—এর উদ্দেশ্য হয় তো মন্দ না-ও থাকতে পারে; কিন্তু ফলটা হ’ল ওরই সপক্ষে। কারণ, ডাক্তারে বলচে—হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনার জন্য অতিশয় দুর্বল লাগে—”

“—ওরা বোধ হয় আসচে।—”

মোটর থামিতেই একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে নামিয়া পড়িল এবং তাহার প্রসারিত কোমল হস্তের অবলম্বনে বিনি কষ্টে নামিয়া আসিলেন, তিনি এক জন পলিত-কেশ বৃদ্ধ। প্রথম-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বয়সের চেয়ে জরা তাঁহাকে অনেক বেশী প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে এবং তিনি অন্ধ।

“আমুন, আমুন—মিঃ মল্লিক! ওঃ, আমার কি সৌভাগ্য যে, আপনিও আজ এখানে পাবের ধুলো দিয়েছেন!—এত দেবী ক’রে আসতে হয়!”

মিঃ লাহা প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই নিজের সর্বজন প্রতীক্ষিত অতিথিব্যয়ের সহিত উল্লিখিত সম্ভাষণ করিলেন। শেষ-কথাটা অবশ্য একটু নিম্নস্বরে অপরাধ প্রতিই প্রযুক্ত হইল, বৃদ্ধকে নহে। মিঃ লাহার সুন্দরী অতিথি তাঁহার ঔৎসুক্য-চঞ্চল ও আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে একটা চকিত কটাক্ষ করিয়াই ঈষৎ গভীর ও বিমগ্ন হইয়া গিয়া ভ্রিত-কণ্ঠে উত্তর দিল—“বড্ড দেবী হয়ে গেল, মাপ করবেন। আচ্ছা, আপনি বাবাকে নিয়ে উপরে যান,—আমি একনি যাচ্ছি।”—এই বলিয়া সে গাড়ীর সোফারকে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ইসারায় ডাকিল।

মিঃ লাহা এই সংক্ষিপ্ত ক্ষমা-প্রার্থনা ও কৈফিয়তে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; মল্লিকের সান্নিধ্য হইতে একটুখানি সরিয়া আসিয়া মুহম্মদ স্বরে তিনি ক্ষমা-প্রার্থনাকারিণীকে অমুযোগের সহিত কহিলেন—“আমায় তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে, তার শাস্তি নিতে হবে, অমনি ছেড়ে দেবো না, এমনি মনে হচ্ছিল, কার এ সব বল তো?”

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া চাহিল। তখন

(ক)—৪

তাহার মুখের ঈষৎ বিবর্ণ প্রাণিয়া ভেদ করিয়া তাঁরের পাণ্ডতার উপর সূর্যালোকের মতই প্রসন্নমিত হাস্তের আগোকদীপ্তি বলয়ল করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকে যেন সুন্দরতর দেখাইতেছিল। সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল দীর্ঘ পদ্মে ঘেরা ছুটি চোখে বিপুল কৃতজ্ঞে আনন্দ ভরিয়া সেই যে সে বারেক চাহিয়া দেখিল, সেই-টুকুতেই যেন ইহার সমস্ত হৃদয়-প্রাণ একেবারে তারে তারে বাজিয়া বঙ্কার দিয়া উঠিল। সমুদয় অন্তর বাহির যেন সেইটুকু হাসি-চাহনিতেই একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া কানায় কানায় উপছিন্না পড়িতে গেল। স্থানকাল সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়া তিনি মিস্ মল্লিকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার অর্ধ-অনার্যত শুদ্ধি-শুদ্ধ যুগল বাহমূলে একটা অতি মৃদু সোহাগের টিপুনি দিয়া আদরে-গলানো মৃদু স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “আবার হুটু মি ক’রে হাসি হচ্ছে!”

বারান্দার উপরে যে শত চক্ষু অদম্য কৌতুহল চাহিয়াছিল, সেই দিকে বারেক চোখ তুলিয়াই কৃষ্ণা উহাকে মলজ্ঞ শাসনে অহুচ্চকণ্ঠে সান্বধান করিয়া দিল—“ওঃ—ডোন্ট বেক ইউ ফুল! কত লোক চেয়ে আছে দেখ দেখি!”

মিঃ লাহা দিব্য সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া প্রকল্প-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমাদের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত কার? যদি কার থাকে, সে-ও আজ ভাল ক’রে জানুক, তাতে আমার লাভ বৈ লোকসান নেই।”

মুগ্ধের কলধনু তুল্য ভ্রুগলে শুণ চড়াইয়া বক্র-কটাক্ষে চাহিয়া সে কলঝঙ্কারে ধনক দিয়া উঠিল, “যান, যান, অত আর কণ্ঠ বলতে হবে না!”

তার পর ডাইভার্সকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে লাগিল। ততক্ষণে গৃহস্থানী তাঁহার গৃহ-গত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির পরিচর্যা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ-অভ্যাগতের শোভাযাত্রা রাজোচিত ধুমধামের সঙ্গেই বাহির হইয়াছিল। সর্বপ্রথম বিশালকার, ভীমকান্তি, দেশবাসীর ভীতিদায়ক কলের কামানের সারি, তার পর অশারোহী ও তৎপরে পদাতিক অস্ত্রধারী গোরা-সৈন্তের শ্রেণী,



স্বাক্ষরিত তাহাদের মাথার মুকুট-প্রতিমা খাতুম্বর শিরদ্বাণ ও হস্তধৃত মুকুট কিরীচ শত সূর্য-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া জলিতেছে, তাহাদের দর্পিত গতি, নির্ভীক ও নিশ্চয় দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের বক্ষে কি যেন এক অজ্ঞাত শঙ্কায় একটা শিহরণ স্বতঃই আনিয়া দিয়া যাইতেছিল। শত শত রাজকুমারবৃন্দের বড় বড় রাজকর্মচারীগণের বহুতর শরীর-রক্ষীর মধ্যগত হইয়া রাজ্যভূমির ধনি দেখা গেল, হিন্দুর দেব-প্রতিমার মতই তাহা নীরব নিশ্চল; চারি দিকের স্থখে-স্থখে নির্বিকার উদাসীন,—উচ্চনাদে জয়ধ্বনি উঠিয়া বাজধ্বনি টাকিয়া দিল। মহরগতি চলন্ত ট্রেনের মতই শৌভীষীয়া নিজের গতিপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে চলিয়া গেল।

আড়ালে বসিয়া ‘রাজা-উজীর-মারা’ চিরন্তন রীতি; এই সম্মতন-প্রথার ব্যতিক্রম কেহই আশা করিতে পারে না।—তার পর আর একটা কাজের কথা উঠিল।

“তোমার দরবার দেখতে বাবার কি হলো?”

এলা মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, “বলো কেন? পরশু বাবার দিন, এখন পর্যন্ত এই নিয়ে তর্ক করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে বাবার যোগাড়। আমার মামাতো-দেওর সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরে আমাদের ওখানে এসে উঠেছে না? সে এই শুনে পর্যন্ত একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে। বলে, ‘কর্মীদের না হয় চাকরীর খাতিরে যেতে হয় হলেও কিছু তোমরা কেন অনর্থক ওই সব বড় বড় সভা-সমিতিতে অনর্থক ফ্যানসান কিন্তে চাল খরাপ করতে বাও? এই সব রাজা-রানী লাট-দরবারে মেশা-মিশি করে শুধু মেজাজগুলো বড় হয়ে ওঠে; খরচের অস্ত্র থাকে না এবং তোমাদের দেখে সমস্ত সমাজে বিলাসিতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব জগ্রে এখন ধনীর ধন দেশ-হিতকর কোন কাজেই লাগতে পার না।”

কৃষ্ণা বলিল, “তার মতে কি দেশ-হিতের জন্য সর্বস্ব খরচায় ক’রে দিয়ে, দেশভক্ত লোক ফকিরী নেবে? যার আছে, সে কেন ভোগ করবে না? যেয়েই বা কেন চিরদিন ধরে কুপ-মণ্ডুক হয়ে থাকতে যাবে? এ সব ওদের বাড়াবাড়ি।”

এলা কহিল, “বাড়াবাড়ি না বাড়াবাড়ি! একেও কি কম বল্চে। বলে, যারা আমাদের জাতকে জাতগুরু তুলে গাল দিতে ছাড়ে না; যাদের কাছে দেশের সর্বপ্রথম-শ্রেণীর বিদ্বান,

বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, মানী — ধনী ব্যক্তিদেরও সমস্ত সম্মান — তাদের দেশের অতি সাধারণ শ্রেণীর এক জন সাধারণ কর্মচারীর দ্বারাও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে বাধে না; এবং তার ভাববিচার না হয়ে অস্ত্রের অবিচারই হয়, তাদের দরবারে যে আমাদের কতটা মান, সে যে এক জন শিশুতেও বুঝতে পারে! এই যে জাতের গায়ে জুতোর ঠোঁকর মেরে তোমার বা আমার একটু আপ্যায়ন করা, এতে কি স্পষ্টই বলা হয় না যে, ‘তোমার সাত-গাঙ্গী সব পাজি; তবে তুমি? তা যখন আমার সেবা করতে ইচ্ছুক, তখন কতক ‘ভজ-লোক,’ এমন বিধিয়ে বিধিয়ে বলবে, তুই বাবি বোধ হয়?”

কৃষ্ণা কিছু উত্তর হইয়া কহিল, “হ্যাঁ ভাই, আমি যাবো। আমার গায়ে লতমোনিয়া; লিঙ্গের হাওয়া লাগে নি তো! ভগবান যাদের ছোট-বড় ক’রে তৈরী করেছেন, তারা সবাই ঠিক এক হবে কেমন ক’রে? ভুল বিশ্বাস! আমি বলে এরই মধ্যে সাতশো টাকা দিয়ে একটা নতুন বেনারসীর সূটই করালুম! আর ওই মুকুটও এই জন্য কেনা।”

এলা নিজের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া ব্যগ্র হইয়া কৃষ্ণার কণ্ঠশোভিত মুক্তামালাটি পরীক্ষা করিতে লাগিয়া গেল।—“তারি চরংকার তোকে মানিয়েছে ভাই! তাই বা কি বল্বে, তুই বা পরিস, তাতেই মনে হয়, এমন সুন্দর বুঝি আর কিছুতেই দেখাত না! তোর দেখে দেখে এমন কত জ্যাকেট, শাড়ী, গহনা আমরা তৈরী করিয়ে শেষে পরতে গিয়ে হেসে মরি। আমাদের গায়ে তৈরী ক’রে মানাবে কেন? আচ্ছা, সে দিন তাই তুই যে আসমানী রংয়ের শাড়ী আর ব্লাউজটা পরেছিলি, সেই যে খুব হাস্য কান্দিত্যের কাজকরা, সেটা ভাই কোথায় তৈরী করিয়েছিস বল তো? চুনির ব্রেসলেটটাও তোর খুব সুন্দর হয়েছে! কত পড়লো বল তো?”

“সে ভাই বেনারস থেকে বাবা আনিয়া দিয়েছিলেন। আর এই চুড়িটা, ওটা—ওটা—”

“বুঝেছি গো, বুঝেছি! ওটা তোমার এক জনের ‘প্রেজেন্ট’ করা! তা সেটা স্পষ্ট ক’রে বললেই তো হয়, আমার কাছে আবার অত লুকোচুরি কেন শুনি?”

পরংকালের রক্ত-স্তব্ধ মেঘের কুঞ্জ যেমন অন্ত-স্বর্গের রক্তালোকে রঞ্জিত হইয়া উঠে, সখীর



পরিহাসে কৃষ্ণার গুহ-মুখ তেমনি লোহিতাভা ধারণ করিল, “না ভাই, ওরকম ক’রে বলছিস কেন? এবারকার জন্মদিনে তোরাই কি আমায় ‘প্রেজেন্ট’ করিস্ নি? উনি দিলেই বুঝি যত না দোষ হয়? যাঃ! আবার হাসছিস্! যাঃ ভাই! তোর অত হাসি আমার ভাল লাগে না!”

এলা হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, তুই রাগ করছিস্ কেন বল তো বেবি? বেশ তো করেছেন, দিয়েছেন তার হয়েছে কি? হ্যা ভাই! লাহাদের শুনেছি নাকি কতকাল পূর্বের একটা যুদ্ধমালা আছে, এখন নাকি সেটার দাম হুতিন লাখ টাকাও উঠতে পারে, সত্যি?”

কৃষ্ণা আরক্তমুখে উত্তর দিল, “কি জানি ভাই, শুনেছি তো ভাই।”

“তোর খুব আনন্দ হচ্ছে বোধ হয়! এক দিন তো সব তোরই হবে!”

কৃষ্ণার মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল, “যাঃ!—তা’ সে ভাই যখন হবে তখন হবে, এখন তার কি! তবে উনি আমাদের সঙ্গে খুবই বন্ধুর মত ব্যবহার ক’রে থাকেন; কিছুতেই তাই না বলতে পারিনে! বললেও এত হুঁপিত হন, সে কি বলবো। এই দেখ না, দরবার দেখবার ইচ্ছে জানিয়েছিলুম, একেবারে সব ঠিকঠাক ক’রে কলেচেন; বলচেন, ওর সঙ্গে যেতে হবে,—”

“তা কি এমন অভ্যাস করেছি, বলুন তো মিসেস্ কর! আমাদের দেশেও যে ইউরোপীয়ানদেরও লজ্জা দেবার মত সৌন্দর্য থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে এক আখটা অভিজ্ঞতা কি ওদেরও পাওয়া উচিত নয়? নগ্ন-মাণিক্য সবই যদি আমাদের লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকে, তা হ’লে অগত্যাই ওদের ধারণা না জন্মাবে কেন যে, এটা শুধু—”

এলা হাসিয়া কেলিল, “কয়লারই খনি,—কেন না? শোন বেবি! শোন! মাই ফ্রেণ্ড! লজ্জা পাবার কিছু নেই, উচিত কথাই তো বলছেন! সত্যি আমাদের মত রূপ নিয়ে মেম-সাহেবদের মহলে গিয়ে দাঁড়ান শুধু দেশকে কল্যাণদ কর। তা সত্যি, বেবির মত রূপই রাজ-রাজড়ার দেখবার যোগ্য!—”

“যাঃ! তুইও আবার তেমনি। ভাঁড়ির সাক্ষী হাতাল! রাজা-রাজড়াদের তো আমাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখবার জন্তে ঘুম হচ্ছে না!”

“আহা, বড় হুঁপ বে গো! মিষ্টার লাহা! শুনেচেন তো বেবির হুঁপের কথাটা। সাবধান!”

“যাঃ, তুই খালি, খালি যা’ তা’ বলবি তো আমি এফুনি চ’লে যাব।”

“ওগো না না, যেও না, এখনই এক জন চক্ষে সব অন্ধকার দেখবেন। তুমি যখন আসো নি, সে কি মুখই যে হ’য়ে উঠেছিল! ও মা! ওরা কে গো! কি খীচ করচে শোন তো!”

রাস্তা খোলা পাইয়া ততক্ষণে আবদ্ধ জনতা জন-স্রোতের মতনই গতায়ত আরম্ভ করিয়াছিল, হুঁএকটা পুলিশ ভিন্ন অস্ত্রধারী রক্ষীদের আর কাহাকেও দেখা যায় না। সেই জনতার এক ধারে, অপর দিকের ফুট-পাথের উপর তরুণ-বয়সীদের একটা ছোটখাট ভিড় জমিয়াছিল, এবং তাহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি সুদর্শন যুবক উচ্চ-কণ্ঠে সেই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছে দেখা গেল। কি বলিতেছে, শুনিবার সকলেই একটু কোতুলক হইয়া চুপ করিতেই এই কথা শুনা কানে আসিল।

“হৃদয়ের লীলাভূমি, বস্তার সহচর, মহামারীর মহানন্দক্ষেত্র,—আর এ সকল ছর্কিপাকের মূলভূত বিবিধ কারণসমূহ যে দেশকে উৎসাদিত করিতে বসিয়াছে, তার সেই রোগ-বিস্কত শরীরে এত সজ্জা দেখিলে দর্শকের সন্দেহ জন্মানও আশ্চর্য্য নয়-বে, হয় তো তাহার মস্তিষ্কেরই স্থিরতা নাই! যে দেশ দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ রোগ-শোকে অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে, সে দেশে মুদ্রা সেই রোগ-দারিদ্র্যানাশের কথঞ্চিৎ চেষ্টায় ব্যয় না ক’রে, আলোক-মালায় বাজী-বাজনার ভয়ভূত করতে দেখলে শরীর-মন কি শিহরিয়া উঠে না? আর—বে দেশের মেয়ে বিবস্ত্রা হবার ভয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তারই দেশ-ভগিনীগণ সহস্র সহস্র মুদ্রা নিজের বিলাস-ব্যসনে অকাতরে ব্যয় ক’রে দরবার দেখতে চলেছেন! এই কি সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ? এরই ত্যাগের সাহায্য না এক দিন সমস্ত পৃথিবীময় বিদ্যো-ষিত হয়েছিল? আর আজ? হায় মা ভারত-লক্ষ্মীগণ! তোমরা পশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে প’ড়ে এর স্বাভাবিক দয়া-ধর্মকেও কি পৃথিবীর সকল দেশেরই পায়ের তলায় বিসর্জন দিলে?—”

শ্রোতীবৃন্দ ঈষৎ অসন্তোষের সহিত প্রায় ঔষধ গেলার মতন করিয়া এই ঘৃষ্ট বক্তার ঘৃষ্টতা সহ্য করিতেছিল। এলা হঠাৎ ক্রুদ্ধবরে কহিয়া উঠিল,



—“ওরাই তো ওই সব ব’লে ব’লে দেশের লোকেদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। ধরে—ছেলেটাকে পুন্সি!”

কথাটা জনতার এবং জনতার মধ্যবর্তী সেই ছেলেটিরও কানে গেল। গৌর লম্বাট তাহার এক মুহুর্তে টকটকে লাল দেখাইল, ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞার তীব্র-হাস্তে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর বিভাসিত হইয়া উঠিল, উচ্চ ও অকম্পিত-কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল,—  
“দেশের যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, নারীর পতনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! যে ভারতনারী মেহে, প্রেমে, ভক্তিতে, কাঙ্ক্ষা—নিষ্ঠায় ও ত্যাগে মুক্তিমতী দেবীর স্তায় প্রতীয়মানা হইতেন, আজ তিনি কি? আমি জানি, নিকটবর্তী কোন প্রাসাদ-মন্দিরে এমন এক জন হৃদয়হীনা মহিলা অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি মাত্র এই ছ’একটি বস্তু পূর্বেই বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রস্তুত কোন মারাত্মক গাড়ীর চাকায় এক অসহায়ী অক্ষমা বৃদ্ধার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়া অনারাসেই লবু হস্ত-পরি-হাস ও আহা-বিহারে আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছেন! পাছে দর্শনেন্দ্রিয়-পরিভূষণের সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটয়া যায়, সেই ভয়ে তাঁহারই রথচক্রে মর্দিত হইয়া সে হতভাগিনী প্রাণ হারাইল কি না, সেইটুকু সংবাদ লওয়ারও যে প্রয়োজন থাকা সম্ভব—”

“ও কি, বেবি! ও কি ভাই! চ’লে যাচ্চিস্ কেন?”

“আমার ভারী নীত করছে এলা! আমি ঘরে বাই।”

“এই তুচ্ছ কথাটাও সেই সম্মানিতা শিক্ষিতা মহিলাটির স্বরণেও আসিল না!—ধিক্ এই সব শিক্ষা-দীক্ষায়! ধিক্ সেই রূপ ও ঐশ্বর্যাভিমানিনী নারীকে!—যারা ভারত-রমণীর বীর-পূজ্য কীৰ্ত্তি-গাথাকে আজ মসী-মলিন করিতে উত্তম!—তবে সেজন্য দায়ী অবশ্য তাঁরা নিজে নন; আজ এই যে আদর্শের বিকৃতি ঘটাইতেছি, এর জন্ত দায়ী আমরা নিজেরাই! আমি জানি, এমন অনেকে-নেক কৃতবিদ্য উচ্চ-পদস্থ শিক্ষিত পুরুষ আছেন, যাদের ব্যবহারে তাঁদের হতভাগ্য দেশবাসী যত-দূর নিপীড়িত, তার শতাংশের একাংশও তাঁরা বিদেশী রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন না। বস্তুতঃ দেশবাসীর প্রতি যে অত্যাচার অবিচার নিয়-তই ঘটতেছে, রাজার জাতি অপেক্ষা আমাদের নিজের জাতিই তার অধিকতর দায়ী। আমার মেয়েদেরও এই সুখোচ্ছানের রঙ্গীন

প্রজাপতি সাজিয়া আজিকার এই হৃদ্দিনে যে অনর্থক বিলাস-ব্যসনে প্রচুরতর অর্থব্যয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাঁর জন্তও দায়ী এঁরা! দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা দেশের দুর্বস্থায় দৃকপাত না করিয়া আত্ম-সুখ-সাধনকেই সর্বস্ব করিতে শিখিলেন কাদের প্ররোচনায়? ইহা হিন্দু-নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি তো ছিল না।—আমি শুনিয়াছি, এখনকার মত এমন হৃদ্দিনেও কোন ধনশূন্য ধনি-কত্যা তাহার প্রিয়পাত্র কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্বক নিজের দরবারের পোষাক তৈরী করাইতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। বঙ্গ-নারীর—হিন্দু-নারীর এই অবনতি অতঃপর আমাদের দেখিতে হইল।”

চারিদিকে একটা ধিক্ ধিক্ শব্দ উঠিয়া ক্রমশঃ সেটা ধামিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের দল তাঁদের দলপতিকে লইয়া পায় পায়ে চলিয়া গেল। ইহাদের পিছনের বাড়ীর সদর-দ্বারের পাশে—কাপড়ে সাজা একটি ভদ্রলোক হাঁটুর উপর থানা কাগজ রাখিয়া বড় হেঁট করিয়া বসি অত্যন্ত দ্রুতহস্তে কি লিখিয়া বাইতেছিল, সে যে কাগজখানা পকেটে ফেলিয়া জনতার পিছু লইল।

গাড়ী-বারান্দার উপরে মিঃ লাহা দাঁত দি-ঠোট চাপিয়া সেই অদৃশ্যপ্রায় জনতার দি-চাহিয়া ছিলেন; মিসেস্ কর হ’পাশের ভিড় সর-ইয়া তাঁহার ঠিক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া অরে-অশ্রাব্য যুহুয়রে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, “হুঃখিত হ’লাম মিঃ লাহা! আজকাল ঐ ক্যান্সান হয়েছে দেখছি! তা’ ওর—আমাদের কান্না আমাদের ব্যাঘাত হচ্ছে না। আপনি বাড়ী এসে আজ আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম তা’ও—আপনি আর কি করবেন, আপনি হুঃখি-হবেন না।”

“আমি!”—মিঃ লাহা সদন্তে মিসেস্ করের সহিত মুখামুখি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।—“আমি আমি ওদের সিকি পরসারও গ্রাহ্য করিনে। র-কুকুর ব’লেই মনে করি। তা’পর পরণ্ড যা-তো?”

মিসেস্ কর কহিলেন, “আমার তো ইচ্ছা, দেখি কি হয়।”

“আপনারাও সোসিয়ালিষ্টের দলে ভিড় না-কি?”

“ওঃ, না, আমি ঠিকই যাব, দেখে নেবেন তাইএর মন্ত্রণায় মন্ত্রণায় ওনারও মাথা থা-”



হবার যোগাড় করছিল, বলছিলেন, অনর্থক নাই গেলে, দেশের ক'জন বড়লোক বিপন্ন, এ সব সময় আমাদের আশ্বাস-প্রশ্রুতি বতটা না করলে চলে, না করাই উচিত।—বিশেষ যাতে ক'রে ওদের সঙ্গে কো-অপারেশনে আসতে হয়। আমি তো তাই গুলুম। বাঃ! চিবদিন যেন আমরা কুপ-মণ্ডুক হয়েই থাকবো। কিছুই দেখো না, জানবে না;” “চললেন আপনারা! ওঃ, আপনারাও যাচ্ছেন তা হ'লে! নমস্কার! বড় আনন্দ দিয়েছেন এসে। মুরজা বে! চল না কি? ওঃ, আচ্ছা, অনেক দিন পরে দেখে খুব আশ্বাস হলো, এখন আছ তো? এক দিন দেখা করে আসবো গিয়ে, ক'নস্বর ঝাউতলা? পঁচিশ! আচ্ছা, এই নোটবুকে টুকে রাখলুম। দেখ, নিশ্চয় যাব।”—

দলে দলে অভ্যাগত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা-বৃন্দ বিদায় অভিনন্দনের আদান-প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, এলা ও মুরজা দুই সখীতে হাত ধরাধরি করিয়া ‘ডুইংকমে’ যেন কাহার অশ্রুধারা প্রবেশ করিয়াই ধমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে শীতের সন্ধ্যায় ‘ইলেকট্রিক পাখা’ খোলা ও একখানা কোচে বসিয়া পড়িয়া মিস মল্লিক নিজের হাতের কমালখানা ঘুরাইয়া নিজের মুখে জোরে জোরে হাওয়া করিতেছে।

এলা হাসিয়া জনান্তিকে মুরজাকে কহিল, “বাইরে তখন শীত করচে ব'লে ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে এলেন, এখন হাওয়া খাবার ঘটাখানা দেখেছিস?”

মুরজা তেমনি ভাবে জবাব দিল, “তা তো দেখছি, তবে ব্যাপারটা যে কি, সে তো কিছুই বুঝতে পারচিনে!”

এলা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, “ওগো, প্রেমে তো কখন পড়তে সুযোগ পাওনি, ও সব প্রেমের লীলা-কলা বুঝবে কি ক'রে? যে বোঝবার, এইবার সে নিজে এসেই বুঝুক।”—প্রকাশ্যে কৃষ্ণার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার বাসুভরে বিপর্যস্ত কেশে অর্ধ-আচ্ছন্ন ও অস্তরের কোন অজ্ঞাত ভাবোত্তে-জনার ক্ষণ-বিবর্ণ, ক্ষণ-আরক্ত মুখখানা হ'হাতে তুলিয়া ধরিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, “সত্যি বলছি বেবি! তোর আজকের এই মুক্তিখানা যে দেখবে, সেই মাথা ঘুরে মরবে! তুই রাস্তাধারে দাঁড়িয়ে না থেকে যে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসেছিলি, সে খুব বিবেচনারই কাজ করেছিলি ভাই! অনর্থক জীব-হত্যার লাভ কি? কাল

গিয়ে তাই তোর নতুন শাড়ীটাড়ীগুলো দেখে আসবো।”

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে মুরজার গা টিপিয়া ঠোট উল্টাইয়া বলিয়া গেল, “দেখলি তো কেমন মায়াবিনী! একেবারে মানুষধরা ফাঁদ পেতে নিয়ে বসে আছে। তা এতটুকু লজ্জাও করে না! যেন ‘তিমোত্তমা’ কুমার জগৎ-সিংহের ধ্যানে বসেছেন! এতে কি আর গরীব বেচারী মুমূর্ষু বউএর খবর কেউই রাখতে পারে?”

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিমজ্জিত সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, কৃষ্ণা উঠিয়া চলন্ত পাখাখানা বন্ধ করিয়া দিল। তার পর মুখের উপর কমাল চাপিয়া কোচের হাতার মধ্যে মুখ শুঁজিয়া সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ ফাটিয়া তাহার হ হ শব্দে কান্না আসিতেছিল, ক্ষোভ, ক্রোধ ও অভিমানে মিলিয়া বুকের মধ্যটাকে যেন আবেগে পড়া নোকার মতই বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল। জীবনে এত বড় অপমান আর কখন যেন তাহার ঘটে নাই।

কাহার জুতার শব্দ বাহির হইতে ঘরের মধ্যে আসিতে শোনা গেল, সেই বহু-পরিচিত শব্দটা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া থামিল। নিকটে যেন গানের উপরেই কাহার নিশ্বাসের বাতাস অনুভূত হইতে লাগিল। পরক্ষণে গভীর অনুরাগে ও আগ্রহে মথিত-কণ্ঠ কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, “এ কি, বেবি! এমন ক'রে গুরে আছ কেন? কি হয়েছে?”

বিজ্যৎপৃষ্ঠের জায় কৃষ্ণা ছিটকাইয়া উঠিয়া পড়িল। আগুনজলা চক্ষে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, —“তুমি কি সত্যিকারেরই কচি খুকী ব'লে আমার মনে করো না কি যে, ওই অপমানের পরে ‘বেবি’ ব'লে ডেকে আমার ডুলাতে এলে?”

তরুণচন্দ্র বিহ্বলপ্রায় হইয়া গিয়া স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে রাগরক্তিমায় অধিকতর মনোহর মুখের পানে চাহিয়া থাকিলেন, পরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, “অপমান!—তোমার!—কে করলে বেবি?”

কৃষ্ণা তখন সম্মুখে এক জনকে পাইয়া এতক্ষণ-কার নিরুদ্ধ বিষয়ের উষ্ণ উৎস খুলিয়া দিয়াছে, সে এই ব্যগ্র বেদনার তিলমাত্র অক্ষেপ না করিয়াই এক ঝলক অনলোদগিরণের মত উর্ধ্বরে

কহিয়া উঠিল,—“এ সবই তোমার জন্ত বটলো! তোমার এখানে আসার জন্ত! তা’ না হ’লে তো আর যার তার মুখে আমার এত অপমান সহ্যে হ’তো না! তোমার যেমন, আমি না হ’লে কিছুটিই হবার যো’ নেই!”—মর্শ্বস্থলে আবার প্রাপ্তে চমকাইয়া উঠিয়া তরুণচন্দ্র উচ্চারণ করিল, “আমার জন্ত! আমার বাড়ীতে এসে! বেবি! বেবি! কি বল্চো!”

কৃষ্ণা নিজের উদগত অশ্রু দমন করিতে করিতে বলিল,—“তোমার জন্তে নয় তো আর কার জন্তে? —তোমার বাড়ীতে আমার জন্তেই না এত সব হ’লো! একেই আমার মন কি রকম যে ধারাপ হয়ে রয়েছে, তার উপর—” কৃষ্ণার গলা ধরিয়া আসিল।

তরুণচন্দ্র সাধনা দিতে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, “এর জন্ত তুমি—” “সবটা শোন তো আগে, তার পর ‘কমেন্ট’ করো। বাবার তো আর বের হবার সময়ই হয় না। যখন হলো— ভাড়াভাড়া ক’রেই আসছি, তোমার বাড়ী থেকে হুঁশো গজ হবে কি না হবে, ঐ মোড়টার মাঝার একটা খুড়খুড়ে বুড়ী এসে গাড়ীর তলায় পড়লো।—তখন আর মোটে সময় নেই,— তা’ পর বাবা ঐ অসুস্থ মানুষ, তক্ষনি আবার রাস্তাও বন্ধ হবে, ঐ অবস্থায় আমি মাঝপথে ব’সে কি করি বল তো? কাজেই এখানে চ’লে এলুম, কিন্তু এসে আমি নিশ্চিত হই নি, তক্ষনি সোফারটাকে সেখানে যেতে ব’লে দিয়েছি। বুড়ী মরেছে কি না দেখবে, তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে, যা খরচপত্র হয় করবে, নিজে ধরা দেবে, সব কিছু ব’লে দিয়েছি। তার পরও কি না ওরা শুধু শুধু আমার অমন ক’রে অপমান ক’রে গেল! আমি কি ওই খুড়খুড়ে বুড়ীকে রাস্তায় ঝার হ’তে পরামর্শ দিয়েছিলুম, না তাকে হাত ধ’রে টেনে এনে গাড়ীর চাকার তলায় কেলে দিয়েছিলুম! আমার কি দোষ?”

মিঃ লাহা চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, “তোমার দোষ কি?”

“তা হ’লে কেন ও-লোকটা আমার অনর্থক যা’ তা’ ব’লে গেল? আমি কিন্তু সহ্যে না, তা’ তোমার ব’লে রাখছি! কি অস্ত্রায় স্পর্ধা! লোকটাকে টুকুরো টুকুরো ক’রে কেটে কুবুয় দিয়ে খাওয়ালেও আমার রাগ যায় না! এর উপর শেষকালের সেই কথাগুলো বলি, সেগুলোও কি তোমার কানে

যায় নি? না তারও অর্থবোধ করতে পার নি বোধ হয়? দরবারে যাবার জন্ত কে এক জন তার প্রিয়-পাত্রীর পোষাকে কত হাজার টাকা খরচ করেছে ব’লে যে হিসাব দাখিল ক’রে গেল,—সেটা কা’কে বলা হলো শুনি? সে কি তুমি ছাড়া আর কেউ?”

মিঃ লাহার চোখের তারায় ক্রোধের আভাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও কণ্ঠস্বরে তাহার কণামাত্রও ব্যক্ত হইল না, বিনীত অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, “বুঝ্লেই বা আমার উপায় কি? হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাংয়েতেও তাকে লাখি মেরে যায়। আমার গলার ফাঁসী যখন খোলবার উপায় আমার নেই, তখন অগত্যাই তার টানও আমায় সহ্যে হবে। কিন্তু তা’তে আমার কি অপরাধ?”

কৃষ্ণার রাগ পড়ে নাই। সে তীব্রস্বরে জবাব দিল, “তোমার অপরাধ নয় তো কার অপরাধ?— কার জন্তে এত কথা আমার গুন্তে হলো? আমি কক্ষনো এ রকম অপমান সহ্যে পারবো না, সে তোমার এই ব’লে দিলুম। এর যদি প্রতীকার না হয়, দেখো তুমি, এবার থেকে আর আমি, তোমার—”

মিঃ লাহা তার কোচের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, “তা’ হ’লে যাতে আর কেউ কিছু না বলতে পারে, তারই উপায়টা আগে করা যাক। অনেক দিন ধ’রেই যখন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আরও দিন যে বাকী, তারও যখন কিছুই নিশ্চয়তা নেই, তখন সকল সমাজের সকল লোককে অপর কথা বলতে না দেওয়াই ভাল। যদিও তা’তেও একটা আন্দোলনের নেহাৎ কম হবে না,—কিন্তু দেশটার সময় হিন্দু-মসজিদ নীরব থাকবে। বাকীটা আমার পূর্বসূরীর মৃত্যুতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

কৃষ্ণা কণকাল নীরবে কি ভাবিয়া লইয়া একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিল। অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কহিল, “সে না, তোমার সে স্ত্রী মরা পর্যন্ত আমাদের যেমন ক’রেই হোক অপেক্ষা করতেই হবে।”

“তা হ’লে এ রকম হ’লে একটা বাজে লোকের বাজে কথা সহ্য করাও অনিবার্য! আর তা’তে অধৈর্য হবারই বা কি আছে? বিশেষ তুমি মনের মধ্যে নিশ্চিতরূপেই জান, এক দিন আমাদের পরস্পরেরই হবো; জগতে এমন কিছুই নেই— যা’তে আমাদের মিলনে বাধা দেবে। এখন হ’লে বৈব-হুর্কিপাকে যদিই তোমার একটু সন্তান



হয়, আমার ■ সে কি তোমার পক্ষে এতই কঠিন বেবি ?”

কৃষ্ণা এসব কথায় কর্ণপাত করিল না, সে ঝাঁকিয়া কহিল, “না, আমি কারও কথা সহিতে পারবো না। লোকে যে ঐ রকম ঠাট্টার শুরু করে, তোমায় জড়িয়ে নিয়ে কথা বলবে, সে আমি কিছুতেই সহিতে পারবো না।”—

মিঃ লাহা হুঃখিত ও কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “তোমার ■ আমি এক জী বর্তমানে আমার হিন্দুধর্মে বিবাহ করে—সিবিলিয়ানীর অধ্যক্ষ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাও শুনে না, অথচ কে একটা রাস্তার কুকুর-কি বলে চোঁচিয়েছে, তাই নিয়ে আমার দায়ী কর্চো,—এতে আর আমি কি করতে পারি বলো ? সবাকার মুখ তো আমি বেঁধে রাখতে পারি নে।”

এই অপ্রিয় সত্য বাক্যটা কৃষ্ণার বুকে বিধিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল। কান্না-ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিল,—“দাও, আমার একটা গাড়ী ডাকিয়ে দাও, শীগ্গির দাও—একনি আমি বাবাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ;—আর কখনোই তোমার বাড়ী আমি আসবো না। তুমি নিজেকে শুধু আমার অপমান করলে।”

“সে কি বেবি ! সে কি ? তোমার আমি অপমান করলুম ? এ কি বল্চো ? দেখ, পৃথিবীতে এসে মুখ কাকে বলে, কখনও জানি নি। ছোট-বেলা না মরেছিল, বাপ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ছেলের খবর রাখবার অবসর তাঁর মোটেই ছিল না। তার পর পিতৃ-কর্তব্যের মধ্যে মাত-তাতাডাড়া একটা পাগল ধরে বিয়ে দিয়ে সকল সুখেরই চূড়ান্ত করে রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীতে এসে পাইও নি কিছু, দিইও নি কোথাও,—শুধু এই একটি জায়গায়, এই একটি আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছি। তাই এখান থেকেও যদি না পাই, যদি আশা না মেটে—তা’ হলে সে কি সহ্য করা যায় ? তুমিও যদি চিরদিনই আমার ‘পরে’ অমনি করে বিমুখ হয়ে থাক, তা হলে আমি বাঁচি কেমন করে, তাই আমার বলো তো ?”

কৃষ্ণার মুখের কঠিন তাজিলোর ভাব পরিবর্তিত হইয়া তাহার স্থলে সুগভীর সহানুভূতিপূর্ণ করুণা জাগিয়া উঠিল। সলজ্জভাবে কহিল,—“আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমার তুমি মাপ করো।”

তরুণ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, “কষ্ট তুমি আমার দাও নি

বেবি ! বলেছি তো তুমিই আমার একমাত্র জীবনের সুখ। হুঃখ আমার বন্দভাগ্যই আমার দিচ্ছে। আমার যে জী মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করেও অর্ক-মৃত হয়ে বেঁচে আছে, হুঃখ দিচ্ছে আমার সেই, তুমি নয়। যে বাঁচবে না, মৃত্যুই যার শাস্তি, অনর্থক কেনই যে সে এমন করে বেঁচে রইলো, এর কোন অর্থই যদি আমি বোধ করতে পারি !”

“ছিঃ, লাহা ! নিজের স্বার্থের জন্য, তুমি-আর এক জনের মৃত্যু-কামনা কর্চো ! কি নিষ্ঠুর তুমি ?”

“নিষ্ঠুর আমি ! কিসে আমি নিষ্ঠুর ? যার মৃত্যু-কামনা হৃর্ভাগ্যক্রমে আমার করতে হচ্ছে, সে আমার পারের বেড়ি ভিন্ন আর কি কোন কিছু কবে কি তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি যে, তারই বিনিময়ে তার এই জীবনমৃত অবস্থাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে সম্মান করবো ? তার কাছে যা পেয়েছি, তাতে তার মৃত্যুরই প্রতীক আমার করতে হচ্ছে ; তা ভিন্ন আর কি করতে পারতুম, তাই বল দেখি ?”

কৃষ্ণা দ্রব্য চিন্তিতমুখে কহিল, “তা, আমি জানি নে, তবে হয় তো, কিছু পারতে, হয় তো, তা’কে ভালবেসে, তাকে মায়ুষ করে তুলতে তুমি চেষ্টা করলে, না পারতে, এমন নয়। শুনেছি সে না কি পাগল হ’লেও তোমায় খুবই ভালবেসেছিল। তোমার বিলাত যাবার খবরেই তার রোগ শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও সেই থেকে সে মৃত্যুশয্যাই পেতেছে।—তবে অবশ্য বলা যত সহজ, একটা মৃগীরোগী উম্মাদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা ততদূর সোজাও নয়, কিন্তু তা’ ভিন্ন আর উপায়ই বা কি ?”

“উপায় রয়েছে, তুমি আমার স্ব-জাতীয়া, অনার্যসেই আমাদের হিন্দুবিবাহ হতে পারে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উম্মাদ ও চিরকথা জী বর্জনীয়। তবে এ নিয়ে যদি—এমন কি, গবর্ণমেন্টের কান্ধে ও-কথাটা যায় যে, এক জন সিবিলিয়ান এক-জী বর্তমানে আমার বিয়ে করেছে, তবে সমস্ত খবর না জেনে একটু আন্দোলন হবে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ রূপেই আমার ব্যাপার, তোমার এতে এতটুকুও অংশ থাকবে না।”—

কৃষ্ণা পুনশ্চ একটুখানি নীরব হইয়া চিন্তা করিল, তার পর নিজের দীর্ঘ পল্লবাক্ষর দৃষ্টি ভ্রমিবদ্ধ করিয়া আরক্ত-গণ্ডে জবাব দিল,—“কান্ধে নেই—থাক। তিনি আর কত দিনই বা আছেন। একদিন তো পাবেই—”

“একদিন পাইবে”—এই সামান্য শব্দটি

তরুণচন্দ্রের বিরস-চিত্ত যেন একটি ক্ষণের মধ্যেই প্রচুরতর আনন্দরসে সরস করিয়া তুলিল।

এই যে রূপসী রূপ-বোবনের অনন্ত-সাধারণ সম্পদে শিক্ষা-দীক্ষার গৌরবে যে আজ কলিকাতার স্বাধীন-সমাজের মুকুটমণি, সেই শতজনবাস্তিতা সুন্দরী নিজের মুখেই স্বীকার করিতেছে—“একদিন তো পাবেই”—তবে আবার কিসের দুঃখ? এত দিনের সহিষ্ণুতার এই তো সমুচিত পুরস্কার! গভীর আনন্দে কলকাক হইয়া সে শুধু অনিমেয়-মুগ্ধনেত্রে সেই লজ্জাবনত মুখের পানে আপনা হারাইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার বাক্যদুর্ভি হইলে অধীর আবেগে কি একটা বলিতে যাইতেই, তাহার বেহারা করিয়া দ্বারের বাহির হইতে সেলাম জানাইল।

বিরক্ত ও কিছু বিষণ্ণচিত্তে তরুণচন্দ্র ভৃত্যকে ভিতরে আসিতে আদেশ দিলে, সে আসিয়া পুলিশ-ইন্সপেক্টরের আগমন জানাইল।

“তাকে বসাতো গে, আমি যাচ্ছি”—

ভৃত্যের পশ্চাতে তরুণও উঠিয়া পড়িল।

“পুলিস-ইন্সপেক্টর কি এসেছে? তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে?”

মিঃ লাহা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্তমুখ সগর্বে তুলিয়া উত্তর দিল, “তুমি কি মনে করো—তোমার অপমানিত করে গিয়ে সে নির্কিয়ে তার ঘরে পৌছে স্বচ্ছন্দে ঘুমতে পারে?”

এক মুহূর্তের জন্তও কৃষ্ণার আহত গর্বে বিকৃত-চিত্ত প্রতিশোধের আনন্দগৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব-সমক্ষে বিশেষভাবে যে ‘ব্যক্তি-বিশেষের প্রিয়পাত্রী’ বলিয়া তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইটাই তাহার কোমার-গর্বে অটুট গৌরবে অত্যন্ত আঘাত করিয়া বাজিতেছিল। সে লজ্জা, সে অপমান যেন তাহার গোপন করিবারও স্থল ছিল না। কারণ, ইহার মধ্যে যে একটুখানি ক্ষুদ্র অংশ ছিল। এই প্রলোভনীয় নিমন্ত্রণ-সভার জন্তই বিশেষভাবে তাহাদের এই ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার লইতে হইয়াছে, তা’ এমন মধ্যে মধ্যে হয়ও। অবশ্য কস্তার পিতা বরাবরই এর এই লোককে একখানা করিয়া ছাওনোট দিয়া থাকেন; এবং এ ধারটা অল্প লোকের নিকট লওয়া হইতেছে, এই রকম কথা-বার্তায় প্রকাশ পায়, ইনিও প্রথম প্রথম বিস্তর আপত্তি করিয়া এক্ষণে কি তাবিয়া বলা যায় না, নিরাপত্তিতেই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; সে

সব কথা এই তিনটি লোকের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোকে ইহা কোথা হইতে রটনা করিল, ইহাতেই তাহার বিশ্বাস সীমা ছাড়িয়াছিল এবং যেখানে ব্যাধা, আঘাতটাও বড় প্রচণ্ড হইয়াই ঠিক সেইখানে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার এ বিজয়ানন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। এক মুহূর্ত পরেই যেন কিসের একটা অশান্তিতে সমস্ত মনটা অস্থির হইয়া উঠিল, উঠিয়া প্রস্থানোত্তত মিঃ লাহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, “শোন, শোন, আচ্ছা, ওকে তুমি কি গ্রেপ্তার করতে বলবে?”

মিঃ লাহা ফিরিয়া আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন; ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, “তা’ না দিলে সে যে নিজেকে এসে ধরা দেবে, এমন আশা আর কেমন করে করি?”

কৃষ্ণা কহিল, “কিসের চার্জ দেবে ওকে? ও তো ‘সিডিসন’ কিছুই বলে নি?”

মিঃ লাহা একটুখানি বিজতার হাসি হাসিয়া আশ্বাসের স্বরে উত্তর করিলেন, “তার জন্ত ভাবনা নেই, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো, আমি আসছি।”

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে ঈষৎ ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে স্থির-কণ্ঠে কহিল,—“না, অস্তায় ক’রে এক জনকে তুমি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিতে পারবে না। ও যা’ বলেছে, তা’তে ব্যক্তিগত বিষয়ই ব্যস্ত হচ্ছে। দেশের ধনী ও বিলাসী লোকদের গায়ে সে চাবুক মেরেছে, তা’তে অনেকেরই গা-জালা করতে পারে; কিন্তু ফিয়ার্ভারও তো তাকে কোনই পথ নেই, কিছু কি সে মিথ্যা বলেছে? ভেবে দেখলে কি ওর প্রত্যেক কথাটিতেই নির্ভীক সত্যের অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখতে পাওয়া যায় না?”

“বেবি! তুমি কি বলচো? তোমার আমার একসঙ্গে কত বড় মিথ্যা অপমান ও ক’রে গেল, সে কি তুমি এক্ষুনি ভুলে গেলে? এই যে বলছিলে, ‘ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও তোমার রাগ যায় না?’”

কৃষ্ণার কালো চোখে দু-চোখ ভর্তি জলের মধ্যে আগুন দেখা দিল,—“বলেছিলুমই তো! —বলেছিলুম কেন, সে তো এখনও বলছি!—আমি ওর কি করেছি যে, ও এত লোক সংসারে থাকতে শুধু শুধু—যা নয় তাই বলে আমার সঙ্গেই লাগতে এলো? ওর খুব বেশী রকম একটা শাস্তি



হওয়াই উচিত। কিন্তু দেখ, এখন ওকে আর শ্রেণীর করে কাজ নেই। যদি আদালতে এই সব কথা বলে, আমার নাম যদি স্পষ্ট করে পবলিকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে,—ওরে, বাবা রে! তা হ'লে আমি ম'রেই যাব।”

“তবে থাক, আমাদের হাত ও ছাড়াতে পারবে না,—কাদ তৈরী থাকলে এক সময় না এক সময় তাতে পড়তেই হবে।”

“সে মন্দ নয়। এখন আর এতে ওর দণ্ডই বা কি হবে? মাঝে থেকে লোকে এই সব কথা নিয়ে কি না কি আলোচনা চালাতে পারে। ওর পক্ষের উকীল-ব্যারিষ্টাররা হয় তো খুব ফাঁদালো করে এই সব কথার ব্যাখ্যা করতে লেগে যাবে। সবাই হয় ত বলবে, গায়ের জালায় তুমি শুধু শুধু নির্দোষীর উপর পীড়ন করাচ্ছো। চাই কি নিষ্কর্মা খবরের কাগজের সম্পাদকের দল এরই উপর রং-চং ঢেলে সাতটা বড় বড় আর্টিকেল লিখেই কাগজে কাগজে ছাপিয়ে দেবে।—রাস্তাঘাটে আমার দেখতে পেলো সবাই হয় তো একটু মুখ টিপে হাসবে।—উঃ—সে আমি সহ্যে পারবো না। তার চাইতে মরণই ভাল।—”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মে ডিকেল-কলেজ-হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডের সম্মুখে একখান ভাড়া করা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া একটি মেয়ে স্বরিতপদে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটির বেশভূষা আড়ম্বর যে বেশী কিছু ছিল, তা নয়, তথাপি তাহার মূল্যবান পার্শি শাড়ী ও খুব সৌখীন কাট-ছাঁটের জ্যাকেট, পায়ের গোড়ালী উচু বিবিয়ানী-জুতা, মাথায় রাশিকরা ভ্রমরকৃষ্ণকেশে সযত্নচিত্রিত সব চেয়ে আধুনিক এলো খোঁপা, নিতান্ত অগম্য হ'লেও বহুমূল্য অলঙ্কার তাহার ধনবত্তার ও সৌখীনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছিল; এ ছুইট জিনিসেরই এ কালের অগতে একটা বিশেষ মর্যাদা আছে; ঘর এদের কাছে আপনিই খুলিয়া যায়, পথ দেখাইবার অগ্রদূতের কোন অপরিচিত রাজ্যে গেলেও অভাব ঘটে না।

মেয়েটি এখানের হাউস সার্জনের কাছে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইবামাত্রে সবিশেষ সম্মান ■ আগ্রহের মধ্যে পথ চিনাইয়া তাহার গন্তব্যস্থানে

তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সে জায়গাটা কিন্তু এই সুবেশা ও সুন্দরীর পদস্পর্শের ঠিক উপযুক্ত স্থান নয়। এ কথাটা কলেজের কর্তৃপক্ষ হইতে একান্ত তরুণ ছাত্রবৃন্দ অবধি সবাই-কারই মনের মধ্যে একবারটি উদিত হইতে ছাড়ে নাই, তা' তাদের মুখের ঈষৎ অপ্রতিভ ■ মলজ্জ ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, অর্থাৎ সে দিকটা নিতান্ত দরিদ্র অভাগাদের থাকার জায়গা, সেখানে কেনই যে এই মালস্মীর বয়স্কী আজ পায়ের ধূলা দিতে আসিয়াছেন, সে কথা হঠাৎ বুঝিতে পারা একটুখানি কঠিন তো বটেই।

একটি ব্লেচসেবক সাগ্রহ আনন্দে ব্যগ্র হইয়া উহার পথপ্রদর্শকের কার্যে অগ্রসর হইয়া গেলে, পিছন হইতে এই নব অভ্যাগতার সম্বন্ধে একটা যত্নকণ্ঠের চাপা আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।—

“কে রে? বেন দেখা মুখ মনে হচ্ছে না?”—  
“কি জানি ভাই, অমন কত মুখই তো পথেঘাটে দেখা যায়।”

“না, তা ব'লে এ মুখের হাটেবাটে ছড়াছড়ি নেই হে! এ যাকে বলে বিউটী!”

“চেনো না? উনি যে ডাক্তার মল্লিকের মেয়ে মিস্ মল্লিক।”

—“কে? কে? কোন্ ডাক্তার? বুড়ো ডাক্তার মল্লিক বুঝি? যিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? বটে—বটে!”

“হঁ, তাঁরই মেয়ে!”

“ওঃ, ওর নামটা কি?”

“কৃষ্ণা মল্লিক, বিজ্ঞাবুদ্ধিরও খুব খ্যাতি আছে; ও-মহলে চেহারাখানি তো খুবই চমৎকার।

“তা' এখানে কি উদ্দেশ্যে এলেন?”

“জানাই যাবে।”

“ওদের মতন সৌখীন জীবদেহও আবার এর মধ্যে কিসের দরকার থাকতে পারে?”

“খুব সৌখীন বুঝি?”

“দেখ্‌চো না, রোগী দেখতে আসারই সজ্জা!”

“তা ভাই, ঠিক বলতে পারিনে; সুন্দর মানুষকে যেটুকু পরলে সাজা মনে হয়, এক জন সাধারণ চেহারার লোকে তার ছুণ করলেও তার ধারেও যায় না। সে থেকে বিচার ঠিক হয় না। আমি দেখছি, আমার মা আর খুড়ী-মা দুজনে একই ছোড়ার শাড়া পরেন; কিন্তু মা'র গায়ে সেই লাল বা কালো পাড় শাড়ীখানারই জেলা বেন সাতশুণ খুলে যায়।”

“তা সত্যি! রূপ থাকলেই সেটা প্রতীক্ৰমে অনেকখানি বেড়ে উঠে!”

নিজের অভ্যস্তিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃষ্ণাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। স্বজন গত দিকের ‘মোটর-বিভাগে’র খবর আনিতে। সহজেই পূর্বেদিনের সেই মোটর-চাকার আহত বুড়ীটার কাছে ইহাকে পৌছাইয়া দিল।

একেই অসমর্থ অক্ষয় শরীর, তাহার উপর সাম্প্রতিক আঘাতের অসহ্য বহুগা। আর্ন্তনাদে ও বিলাপে অপরাপর রোগীদের অশান্তির এক-শেষ করিয়া সকলকার নিকটেই সে তিরস্কার ও গালি খাইতেছিল। হাতে, পায়ে, কপালে, বুকে সর্বদেহেই প্রায় তাহার পাঁচ সাতটা ব্যাধাজ বাঁধা, হু-একটা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণা অনিচ্ছুক অথচ যেন তাহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কুণ্ঠিত-সলজ্জ-মুখে আসিয়া উহার মাথার শিরে দাঁড়াইল। স্বজন সন্নিহনে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু করতে পারি?” কৃষ্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া রোগীর বহুপাক্ষিত বিকৃত মুখের পানেই বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যথিত স্নানচক্ষু তুলিয়া উহার মুখে স্থাপন করিল; তার পর কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, “এখন নয়; দরকার হয় তো বলবো।”—তার পর দৃষ্টি নত করিয়া আবার সেই আহত হতভাগিনীর মুখে তাহা স্থাপন করিল। স্বজনকুমার ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া লম্বা ঘরটার অপর প্রান্তে খোলা বারান্দার বাহির হইয়া দাঁড়াইল।

“উহুহুঃ!! মা রে! হাড়গুলো যেন সব পিষে যাচ্ছে! ওরে বাবা! একেবারে যদি পোড়ামুখোরা মেরে ফেলে যেত তো সে এর চাইতে ঢের ভাল হতো রে!”

কৃষ্ণা বুকের ভিতর যেন জাঁতাকলের চাকা চলিতেছে—এমনি তাহার শ্বাসকুপ্ততা বটিতে লাগিল। অনেক কষ্টে হাঁপ লইয়া সে ক্ষণকালে উচ্চারণ করিল, “বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে! কি করলে একটু কমবে, আমার বল না!”

আহত চমকিত হইয়া চোখ মেলিতে গেল, বোধ করি, কপালে কি চোখেই আঘাত লাগিয়া থাকিবে; চোখের পাতা খুলিতে পারিল না; নিম্নলিখিত চক্ষু উপরে টানিয়া উঠাইয়া তাহার কণ্ঠ লক্ষ্যে রূঢ় কর্কশ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—“কে তুই? খিষ্টানী খাই মাগী না কি? কেন,

কষ্ট হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা’ দেখতে পাচ্চিস নে! কষ্ট দেহের হাড়গোড় সব ভুঁড়িয়ে দিলে, তার কষ্ট না হয়ে কি সোয়াস্তি হবে না কি! আ-মর কানা মাগী কোথাকার! উহুহুহুঃ! মা রে, মাঃ!”

কৃষ্ণার সর্বদেহে মনে কি যে একটা প্রবল বহুগা পূর্ণ ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল, সে যেন সে ভাল করিয়া অনুভবও করিতে পারিল না। বুক যেন তাহার ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের মতই ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে হইল; গলদেশ-রক্তপ্রায় কাতরভাবে সে কহিয়া উঠিল—“ওগো, তুমি বলো, কি করলে তোমার এ কষ্ট ক’মে যাবে—আমি এমুনি তাই করবো!”—আর কিছুই সে বলিতে পারিল না; আর কোন সাহসনার কথাই তাহার মনে বা মুখে আসিল না। আর করিবারই বা এ ক্ষেত্রে কি আছে, তাও তো তাহার মনে পড়িতেছিল না।

বুড়ী অক্ষুণ্ণ-গর্জনে বিকৃত পশুর মতই আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল—“যে হতভাগারা হাওয়াগাড়ী চেপে মানুষের বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে হাওয়া খেতে যার—ওদেরও যদি আমার মতন দশা হয়, তবেই না এ কষ্ট কমে। এমুনি ক’রে যদি ওদের বুকের হাড় মড়মড়িয়ে ভুঁড়ো হয়, তবেই না আমার এই ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে।—ওরে মা রে মা! ওরে মা রে, মা! জল! ওরে ও খিষ্টানী মাগী! তুই যেন দিসনে, গরীব বটি, তবু সজ্জাতের মেয়ে তো, মরণকালে খিষ্টানের জল খেয়ে মরতে যাব কেন? যদি ভাল লোক থাকে তো বল, ওরে মা রে মা! ওরে—”

আতঙ্কে কৃষ্ণার সর্বশরীরের স্পন্দন প্রায় ধারিয়া আসিবার উপক্রম করিল, সে অগণকাল অজপদার্থের মতই বিমূঢ়বৎ থাকিয়া পরক্ষণে উহারই আর্ন্তনাদে সন্নিহ-লাভান্তে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিল।—তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল স্বজন-কুমারকে। সে যে অবাচিতভাবেই তাহার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, এখন সে কোথায়? যে দিক দিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে ক্ষুণ্ণপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্য হইতেই সে উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল, “আপনি একবার এখানে আসবেন কি?—কোথার আছেন? শীগ্গির একবারটি আসুন না!”

স্বজন বাহিরে দাঁড়াইয়া অপর একটি আগন্তকের সহিত কথা কহিতেছিল। ইহা কথার তাহার



আলোচনা করিতেছিল, বোধ করি, ঘরের মধ্যকার এই আস্থানের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব থাকিবে, কেন না, এই ডাক তাহার কানে চুকিতেই তাহাকেই যে ডাকা হইতেছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াই সে তাহার বক্তব্য বিষয়টাতে আরও একটু জোর চড়াইয়া প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিল, “ঐ শোন! বোধ করি কোন কিছু সাহায্যের জন্যই ডাকছেন। না ভাই, ও তোমার মিথ্যে প্রেছুডিস্! সৌখীন ও স্বাধীন ঘরে হ’লেই নির্মম হয় না। মায়াদেয়া ওটা স্বভাব-ধর্ম।”—এই বলিয়াই সে ঘরের দিকে চাহিয়া উঁচু-গলায়,—“এই যে যাচি আমি”—বলিতে বলিতেই দরিত্রপদে চলিয়া আসিল।

“দেখুন, বুড়ী একটু জল খেতে চাইছে,—পারবেন কি একটু দিতে?”—বলিতে বলিতে কক্ষের দু-চোখভরা টাস্টেসে জল পড়ো-পড়ো হইয়া উঠিল।

“নিশ্চয়! একুনি আনুচি।”—বলিয়া সূজন-কুমার প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কক্ষা বধ্যভূমে বন্দীর মতই সত্য-অনিচ্ছায় বৃদ্ধার শয্যা-পার্শ্বে প্রথগতিতে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধার নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে সে নিজের আগমন প্রকাশ করিতে ভরসা করিল না; এমন কি, খাস-প্রখাস পর্য্যন্ত সাবধানে লইতে লাগিল। সে যে কে, এ কথা জানাইয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে যদি সম্ভব হয়, তাহার পরিবারবর্গের জন্য কিছু অর্থসাহায্য, এখানেও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেই সে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু সব কয়টাই এখন তাহার পক্ষে কঠিনতর বোধ হইল—কেমন করিয়া ইহার কাছে সে আত্মপ্রকাশ করিবে? পূর্বে এ কার্যটাকে তাহার এত বড় দুঃস্বপ্ন বলিয়া আদৌ সন্দেহ হয় নাই। শুধু ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে ত্যাগের দিকটাকে উজ্জল ও মহৎ বোধ করিয়া সেইটাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়াছিল; নিজের দিক হইতে নিজেকে অপরাধীর মধ্যে একজন বলিয়া স্বীকার করিতে যে লজ্জা, সেইটাকেই সে জোর করিয়া ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া আরও একটা নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সক্ষম করিতে হইয়াছে। শুধু তাহার পক্ষ হইতেই নয়, উহার পক্ষ হইতে এই অভিব্যক্তিতে যে সুবিধা আনয়ন করিবে না, তাহা বেশ স্পষ্টই হইয়া উঠিতেছে। অবস্থার কেমন করিয়া সে নিজেকে প্রকাশ করে।

যজ্ঞধার বৃদ্ধার নুগিত মুখ যেন ক্রমশঃ বিকৃতাকার ধারণ করিতেছিল; সে হঠাৎ আবার জোরে চোঁচাইয়া উঠিল, “ওরে মাগী! জল দিলি নি! তোকে ছুঁতে মানা করেচি ব’লে রাগ হয়েছে বুঝি? ওরে তেঁড়ার বুক শুকিয়ে মরি যে রে! ওরে বড়া নিয়েও তোদের খেলা করা! —মাগী, এই মাগী! ওরে মা’ রে মা! ওরে—”

“ও মা! আমি কি করি!” আতঙ্কে এই কথা বলিয়াই কিরিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার পিছন-দিকে খানিকটা দূরে এক জন কমবয়সী ছেলে দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ তাহাদেরই কার্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে নিজের মনের ভর-ভাবনা-উদ্বেগে উহার মুখের দিকে না চাহিয়াই, বয়সেরও হয় তো বা একটুখানি গঠন-সাদৃশ্যেও—ইহাকেই তাহার পূর্বপরিচিত সূজন বোধে অনেকখানি আশঙ্ক্যভাবে ইহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাগ্র-ব্যাকুল-তার কহিয়া উঠিল, “কৈ, কৈ, জল এনেছেন? ওর যে বড্ড তেঁড়া পেয়েছে, শীঘ্র—”

ঠিক এই সময়ে একটা বড় এনামেলের প্লাসডিস্টিক লইয়া সূজনকুমার ঘরে ঢুকিয়া অবস্থিত হইল,—“এই যে আমি নিয়ে এনেছি।”

—“ওঃ এসেছেন আপনি, আঃ—অনেক—অনেক—ধন্যবাদ! চলুন তো, ওকে জল খাওয়াবেন।”

আগন্তকের দিকে বারেকমাত্র চকিত-কটাক্ষে চাহিয়াই সে পূর্ব-পরিচিতের সমভিব্যাহারী হইল; কিন্তু সেই এক নিমেষের দৃষ্টিটুকু সে যে কোন অপরিচিতের মুখের উপর নিবদ্ধ করে নাই, সেটুকুও সেই একটিনাত্র মুহূর্ত্তেই বোধ করিয়া গেল। মুখখানা চেনা। তবে কোথায় এবং কবে দেখা, সে সব কথা ভাবিবার অবসর না থাকায় মনে পড়িল না।

“আচ্ছা, অত বড় গেলাসত্ত্বে জল কি ক’রে খাবে? মাথা কি তুলতে পারবে?—পারবে? আহা, না, পারবে না, দেখুন না! ঐ দেখুন, চেষ্টা করতে গিয়েই ব্যাঙেজটা ভিজে গেল, আর একটা কিছু ছোট-খাট গেলাস কি বাটি—ফিডিং কাপ—সে কি আর হবে?”

“আচ্ছা, আমি একুনি নিয়ে আসছি।”—এতটুকুও অসম্ভব না হইয়া বরং এই সাগ্রহ অমুরোধে প্রকৃতভাবেই সেই স্বেচ্ছাসেবকটি একদোড়ে আদেশ-পালনে চলিয়া গেল।

জলপানে অপারগতার আহতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বখাশক্তি চীৎকারশব্দে তাহার এই দুরবস্থার

মূল যাহারা, তাহাদের অকথ্য-ভাষার গালি পাড়িতেছিল। সে সব শুনিতে শুনিতে ইহার কষ্টে ■ নিজের অপমানে মিলিয়া কৃষ্ণার চোখের জল আর কোনই বাধা মানিতেছিল না, ছ'চোখের ধারায় তাহার আরক্ত গণ্ড শিশিরাক্ত গোলাপের আকার ধারণ করিল। একবার সে সচেष्ट-ধৈর্য্যে কৃষ্ণার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, “শোন, আমি খুঁটান নই,—আমি তোমার জল খাইয়ে দোব কি? তুমি চিং হয়ে হাঁ করলে, খুব একটু একটু ক'রে দিতে পারবো! দিই না?”

তাহার মিনতিপূর্ণ করুণকণ্ঠে—তা' ছাড়া কৃষ্ণার অসহ্য কষ্টে অনেকখানি নরম হয়ে বৃদ্ধা নিঃশব্দে হাঁ করিল, ও ঘেন কৃতার্থবোধ করিয়া কৃষ্ণা সেই জলের গ্লাসের খানিকটা জল মাটিতে ঢালিয়া দিয়া, সেই গ্লাস হইতে অল্পে অল্পে তাহাকে প্রায় অর্ধপরিমিত গ্লাস জল পান করাইল।

জল পান করিয়া বৃদ্ধী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিল, ■ সেই সঙ্গেই তাহার বিদ্রোহ-ভাবটাও একটুখানি কমিয়া আসিল। একটা স্বস্তির শ্বাস-গ্রহণপূর্ব্বক “আঃ”—বলিয়া সে পাশ করিয়া গুইল এবং হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“আঃ, রাজরাণী হও।”

কৃষ্ণার হাত কাঁপিয়া—বাকী জল শুষ্ক গ্লাসটা ঠক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সে নিজেও সেই জলে ভেজা মাটির উপর অবসন্নবৎ বসিয়া পড়িয়া নিজের মুখখানাকে হুই হাতে ঢাকিয়া মাটির সঙ্গেই প্রায় মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিল।—এতই অল্পে তুট এয়া?—

“এই যে আমি কিডিং কাপ এনে,—কৈ, কোথায় গেলেন?—”

কৃষ্ণা খড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে নিজের সিকের লাড়ীরই একটা প্রান্ত টানিয়া লইয়া চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াই অশ্রুজলে ভেজা কীর্ণস্বরে জবাব দিল, “জল আমি এখন খাইয়ে দিগেছি;—” তার পর ভাল করিয়া মুখ মুছিয়া মুখ ফিরাইবামাত্র তাহার নজর পড়িয়া গেল,—সুজন ভিন্ন আরও এক ■ অপরিচিত লোকের দুইটি বিশ্বাসার্চর্য্য সমুজ্জল চোখের উপরে। সে যে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত কার্য্যাবলীই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে,—তাহা তাহারই সেই নির্ঝক চিন্তায় স্তব্ধমূর্ত্তিই বিশেষভাবে বলিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণার পদ-নখ হইতে ■ কেশাগ্র অবধি লজ্জার ও

বিরক্তিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তার সে সম্পূর্ণ মানসিক চাঞ্চল্য—এই একটা কোথাকার কে বাহিরের অচেনা লোক—এ কি হিসাবে নিতান্ত অভদ্রের মতই ইহার সাক্ষী হইতে আসিল! ছি ছি! সেই বা কি? মনে এতটুকু বল নাই? আশ্র-সংবরণের শক্তি তাহার এতই কম? সম্মুখে চাহিতেই সুজনের দৃষ্টির বিশ্বয় অস্পষ্ট রহিল না। লজ্জার প্রভাত-সূর্য্যের মত রক্ত ও তপ্ত মুখ নত করিয়া ইহাদের চোখের ভাষা হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া সে মৃদু নম্রকণ্ঠে সুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—“আপনি আমার জন্য অনেক করলেন; কিন্তু আর একটা অনুরোধ—”

বাধা দিয়া সুজনও সমস্তই উত্তর করিল, “আপনার ■ আর কি করলুম, এ তো আমারই ‘ডিউটি’। তবে যদি কিছু করবার থাকে, স্বচ্ছন্দে বলুন, যথাসাধ্যই চেষ্টা করবো।”

কৃষ্ণা মুখ আরও নত করিয়া তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, “এর বাতে ভাল ক'রে সেবা ও চিকিৎসা হয়, তার ■ কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না? অবশ্য আমি টাকা দিতে রাজী আছি।”

মৃদু হইয়া গিয়া ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে শিকানবীস ডাক্তার কহিয়া উঠিল, “টাকার দরকার হবে না, এমনিই এর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।” অশ্রুহলহল স্নেহভর দৃষ্টি দ্বারা তাহার অতীত কথা প্রকাশ করিয়া—মাত্র এইটুকুই সে ফুটিয়া বলিল, “অনেক ধন্যবাদ!”

তার পর নত হইয়া একবার আহতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে নিম্নিত মনে হইতেই নিঃশব্দ-পদে সে নিকটকর্ত্তী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, “আজ আমি যাই, আবার কাল সকালে আসবো।—”

যে ছেলোটি এতক্ষণ ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সে এতই আশ্চর্য্য ও দিশাহারা হইয়াছিল যে, ইহারা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ তেমনি করিয়াই দাঁড়িয়া রহিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যখন যে মানুষের সঙ্গে কি হিসাবে কারবার করে, সে বোঝা বড় সহজ নয়। তবে পচা রুদি মালের কারবার যে সে করে না, এটুকু বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছে।



মেডিকেল-কলেজের এই সার্জিকাল ওয়ার্ডে আনাগোনা করিয়া কৃষ্ণা কয়েক দিনেই এ সম্বন্ধে বেশ একটুখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। সেই অহতা বুড়ীটা—নাম তার ‘নবার মা’—তা’ সে নবার মায়ের কঠিন প্রাণ তাহার দৈন্তগ্রস্ত জরা-বার্দ্ধক্যময় দেহের মায়া ভাগাই করিতে পারিল না, অথবা যমরাজের ঘরে এ সব অপ্রয়োজনীয় জীবনের মূলা এই সংসারেরই হিসাবে বেজায় সস্তা বলিয়াই হোক, মৃত্যু তাহাকে ধরি ধরি করিয়াও স্পর্শ করিল না, স্পর্শ করিল না বটে। কিন্তু বড় নির্মম পরিহাস করিয়া গেল। অক্ষম ভিখারীর ছুটি চক্ষু-রক্তকে সে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইল। প্রথম যে দিন এ সংবাদ কৃষ্ণা ডাক্তারের মুখে জানিতে পারিল, সে তাহার পক্ষে এক ভীষণ মুহূর্ত। সেইক্ষণে তাহার মনে হইল, কে যেন ছুইটা তপ্ত শলাকা বিধিয়া তাহারই দুটো চোখ চড় চড় করিয়া উপড়াইয়া আনি-তেছে। হুঁচোখে অন্ধকার দেখিয়া সে টলিয়া পড়ি-তেছিল; ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।—

বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই, সে আপনাকে সামলাইয়া লইবার বিপুল উত্তমের সহিত লজ্জা-কুণ্ঠিতমুখে জবাবদিহির ভাবে কহিল, “মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। থাক, ব্যস্ত হবেন না, সেরে গেছে।” এই বলিয়া নিজের দুই কম্পিত পারের অবাধ্যতা জোর করিয়া রোধ-চেষ্টার সহিত, কম্পিত-কণ্ঠকে স্বাভাবিক করিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, “আচ্ছা, চিকিৎসা ক’রে ওর চোখ আরাম করা যায় না?”

ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন, “না—”

“যদি খুব অনেক দিন ধ’রে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়?”

ডাক্তার নিশ্চিত বিশ্বাসে উদাস-কণ্ঠে জবাব দিলেন, “কোন রকমেই না। চোখের ভিতরকার দু’একটি নার্ড রাপচার হয়ে গেছে। অন্ধ না হয়ে উপায় নাই।”

অর্ধ-ব্যক্ত বিলাপের মতই কৃষ্ণার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, “এর চেয়ে যে ওর মৃত্যুও ভাল ছিল!”

ডাক্তার কহিলেন, “তা’ বৈ কি! উন্ছিলুম, ভিক্ষাই ওর জীবিকা।”

কৃষ্ণা কাতরস্বরে কহিল, “ওর যে কেউ নেই।—”

ডাক্তার কহিলেন, “সত্যি। তবে তো বড্ডই—”

একটি নূতন রোগী লইয়া কয়েক জন কুলী

আসিয়া খবর দিল। ডাক্তার উহাদের ধমক দিয়া বলিলেন, “যা, যা, উপরে নির্যেং, ছেলেরা দেখবে এখন, আজকাল মোটরে-কাটা আর ট্রামে-চাপার শেষ নেই দেখছি! ‘এপিডেমিকে’ লোক মরে কি না মরে!”

সে দিন নবার মা’র ঘরে ঢুকিতে কৃষ্ণার পা যেন অধিকতর বাধিয়া যাইতেছিল। একেই তো উহার সান্নিধ্য তাহার মনের উপর বিশ মণ পাষাণ-ভার চাপাইয়া রাখে; তার উপর—আজ যখন তাহার ‘ময়ার বাড়ী’ পরিণামের কথা সে মনে পাইল, তখনই অপ্রতিবিধের অপরাধের সঙ্কোচে মন তাহার যেন এতটুকু হইয়া গেল।

ঘরে পা দিতেই একজোড়া উজ্জল ও উৎসুক নেত্র তাহাকে যেন নীরব অভিনন্দন জানাইয়া দিল। এ চোখ-জোড়া তাহার চেনা;—যতই অশ্রমবদ্ধ থাক, এ দৃষ্টিকে আজ তাহার বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে করিতে বাধা পড়িল না। এ বাহাকে সে দিন-তিনেক আগে প্রথম আসার দিনে এই ঘরেই দেখিয়াছিল, সেই।

লোকটি বোধ করি নবার মা’র সঙ্গেই কি কথা কহিতেছিল, বোধ করি, তাহার গৃহ-প্রবেশের ক্ষুতার শব্দেই মুখ তুলিয়া চোখের দৃষ্টি ঝারের দিকেই ফিরাইয়াছিল। এখন তাহাকে সঙ্কুচিত দেখিয়া নিজে সে একটু সরিয়া গেল, কিন্তু যর ছাড়িয়া চলিয়া গেল না। চলিয়া তো গেলই না এবং শীঘ্র বাইবে, তাহাও বোধ হইল না, অগত্যা কৃষ্ণা তাহার সান্নিধ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই বুড়ীর বিছানার কাছে আসিয়া পৌছিল।

“কেমন আছ?”

“ঘরে আর দু’খানা খাট ভর্তি হইয়াছিল। একটা রোগী আচম্কা চীৎকার করিয়া উঠিল,— ‘জল! জল! জল!’”

“শীগগির একটু দাও গো—”

নবার মা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, “আরে মলো! এখানে কি তোর মা-বোন জলপাত্তর ভ’রে নিয়ে বসে আছে না কি, যে, অত জোর তাগিদ দিচ্ছিল?”

কৃষ্ণা অকম্পিত-হস্তে নবার মা’র জন্ত রক্তিত জল সেই ময়লা কাপড়-পর্যাপ্ত অপরিচিত লোকটির বিছানায় গিয়া বসিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল, “হাঁ কর, আমি জল এনেছি! আরও চাই?”

“আর না, আঃ! কে মা তুমি? জল

দিয়ে বাঁচালে? হাঁসপাতালে এমন যত্ন ক'রে কথাই বা কে কার সঙ্গে কয়?"

কৃষ্ণার মুখ আনন্দের উচ্ছ্বাসে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। এই যে কয়টি প্রশংসার বাণী সে এক জন অতি সাধারণ লোকের মুখ হইতে শুনিল, পূর্বে স্বয়ং লাট সাহেবের নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়া অনেক মহারাজ ও বড় বড় সাহেব-সুবার মুখে শুনিয়াও ইহার মত সুখ তাহার কখনও যেন ■■■ নাই। উত্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, আর এক জনের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া নিরুত্তরেই রহিয়া গেল।

“খিষ্টানী-বিবি! বলি ও মা খিষ্টানী-বিবি! হ্যাঁ গা মা, আমার কথা শুন্তে পাচ্চো? বলি, কত দিনে আমার চোখের বাঁধন ওরা খুলে দেবে, বলতে পার কিছু? আঁধারে থেকে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি, দিনে, রাত্রে, ক'দিনে এই ‘কাণা-মাটি’ খেলার থেকে রেহাই পাব গা মা?”

কৃষ্ণা তাহার আহ্বানে কাছে আসিয়াছিল, প্রশ্ন শুনিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া তাহার একটিও কথা বাহির হইল না। এই যে অন্ধকার হইতে মুক্তি পাওয়ার একান্ত ব্যাকুল অধীরতা, এর উত্তরে সে কি তাহাকে জানাইবে যে, সে আলো—সেই উদ্বেগ-প্রতীক্ষিত আলোকের রশ্মি এ জীবনে আর কখনই সে দেখিতে পাইবে না।—এ কথা কি বলা যায়?—আর তাহারই মুখ দিয়া ইহা বাহির করিতে হইবে?—

কিছুক্ষণ উত্তরের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া বড়ী আত্মগতই সমাধান করিয়া লইল, “ও মা, মিথ্যা ক'রে মরুচি! মাগী বুঝি চ'লে গেছে! হবে। ত'বাই হোক, মাগীটা লোক ভাল! তবে বরেন্স বোধ হয় উটকো হবে; নইলে যেমন তড়'বড়িরে আসা, তেমনি হুড়মুড়িরে যাওয়া! একটু যে ব'সে ছটো সুখ-দুঃখের কথা শুন্বে কান দিয়ে, সেটি নেই! যা' হোক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে তো তেড়ে মারতে আসে,—বলে, ‘তা'তে তোর দরকার কি? তুই চুপ্ ক'রে থাক না।’ ও মাঃ! বলে কি? আমার যদি দরকার নেই তো কি আমার চোখে তোর দরকার? আ খেলে যা! মাগী হাজারই হোক মেয়ে-মানুষ তো, গোরার মতন মেজাজখানা নয়, ভাল ক'রে জেনে নিতুম!”

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মতন নিঃশব্দে

কৃষ্ণা বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দার রেলিং ধরিয়া শূন্ত-চক্ষে চাহিয়া তরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উঃ! একটা অন্তারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়া ■■■ পাপই না তাহাকে করিতে হইতেছে! এই মিথ্যা, এই প্রতারণা—এ অন্ধ বলিয়াই তো সে অনায়াসে উহার সহিত করিতে পারিল? আর সে অন্ধতাপ্রাপ্তি আজ তাহার কাহাদের জন্ত?—আচ্ছা, এই জন্তই কি ভগবান তাহার পিতাকেও অন্ধত্ব দান করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন? তাহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। হয় তো তাই, হয় তো তাহাদের দ্বারা এই রকম ঘটনা ঘটিবে বলিয়াই পূর্ক হইতে ইহার বিচার ও দণ্ডও—নির্দিষ্ট হইয়া তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে।—হয় তো জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল কার্যেরই প্রত্যেক ছোট-বড় খুঁটি-নাটি, সকল অন্তর, তা' সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, সকলেরই জন্ত এমনই কত শত কঠিন, কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থাও সেই অবিচ্ছিন্ন ত্যাক-বিচারকের বিচার-সভায় কবে হইতে স্থিরীকৃত হইয়া আছে। হয় তো একটার পর একটা—হয় তো একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াই বা তাহারা অকস্মাৎ তাহার মাথার উপর কোন সময় অতর্কিতে ভাজিয়া পড়িবে। উঃ!

“মিস্ মল্লিক!”—

চকিতে মুখ ফিরাইয়া সমস্ত হরিণের ■■■ ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই সেই আধেক-চেনা মুখখানা পুনশ্চ চোখে পড়িয়া গেল। ইহার কথাটা এতক্ষণ তাহার স্মরণই ছিল না!

“মিস্ মল্লিক! আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাহিতে এসেছি। পারবেন কি আমার মার্জনা করতে? ভাল ক'রে না জেনে কোন খোজ খবর না নিয়েই শুধু অপর লোকের মুখে শোনা গুজব থেকে, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম এবং সে ভুল যে আমি নিজের মনের মধ্যে আপনি না রেখে, সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি—আমার অপরাধ এইখানেই সম্পূর্ণরূপে অমার্জনীয়।”

কৃষ্ণার প্রথমোদিত বিষয় এইবার নিশ্চিত ধারণার অসংশয়ে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেই গভীর বিবেকে তাহার সারা চিত্ত যেন এক নিমেষেই ভরিয়া উঠিল। তাই বটে!—সে-ই বটে! এই জন্তই প্রথম-দর্শনাবধি—ইহার মুখ তাহার চেনা-চেনা বোধ হইয়াছিল।—কিন্তু মুখের চেয়ে কণ্ঠ, —এ তো আর ভুলিয়া যাইবার জিনিস নয়,



অগ্নি-তপ্ত শলাকার মতই বে উহা তাহার দুই কানের ভিতর দিয়া অহোরাত্রই তাহার প্রাণের মধ্যে বিঁধিয়া রহিয়াছে। ঐ কণ্ঠের উত্তপ্ত স্বরে সেই নির্ঘাত অপমানের প্রত্যেক কথাটি প্রতি আঙনের টুকরার মতই তাহার বুকখানাকে বে ছাই করিয়া দিল। সে দিনের সেই বক্তৃতা কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নামোল্লেখ না থাকিলেও সে দিনে সেখানে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ-গণের কল্যাণে এ লইয়া তাহার পশ্চাতে অনেক হাসি-রঙ্গও যেন চলিতেছে, আবার উহাদেরই কুপায় সে সংবাদটাও তাহার কাছে উহু নাই,— তবে কেমন করিয়া সে ভুলিবে? আঙনে তাতিলে সোনার বে রং হয়, তাহারও মুখ তেমনি টকটকে লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধে অধীর হইয়া কল্পিত-অধরে খুব কঠিন করিয়া কিছু বলিতে গিয়া সে শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে সমর্থ হইল—“বেশ করেছেন, বলেছেন! আপনারা পুরুষদের কিছু পারেন না, কাজেই বাদের পারা সহজ, তাদের সঙ্গে না লাগলে আর কাঁদের সঙ্গে লাগতে বাবেন? তার আর মার্জনা কিসের?”

ছেলেটি বেজায় অপ্রতিভ হইয়া রহিল এবং পরে লজ্জিত ধীরকণ্ঠে কহিল,—“আমি তো প্রথমেই বলেছি, আমি ভুল করেছি। সে দিন আপনাদের নর-হত্যার পর অনাগ্রাসেই আমোদে মাত্তে দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেছলো। সেই সময়েই একটি লোক আরও একটি কঠিন মন্তব্য করলে, এখন আমি সে মন্তব্যও আমার ভুল জানতে পেরেছি। হঠাৎ সেটা বিশ্বাস করাও আমার খুবই অজ্ঞার হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি—কাঁকে আমি কি মনে করে কত বড় অপমান করে কলেছি! সে জন্য আমি যে কি পর্যন্ত অনু-তপ্ত, তা’ বলতে পারিনে। যা’ করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাও আমি করতে রাজী আছি।”

কিন্তু তার আহত অন্তরের তীব্র দাহজালা এই একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণকারী অপরাধীর সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ও অনুতপ্ত মুখভাবে প্রশমিত হইয়া আসিল। তথাপি ■ তো তাহার গোপন লজ্জা নয়; সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত, সমালোচিত—হয় তো কত লঘুচেতার দ্বারায় উপহাসিত সেই

দাগ কি, নিশ্চিহ্ন হইয়া নিকংসাহভাবে কাঁ হয়ে গেছে, তার প্রাণ করবেন? সে হয় না।”

ছেলেটি কথার উপর আঙরের সহিত কহিয়া উঠিল, আমি ‘পাব্লিকের’ সামনে অধম ছাপিয়ে আমার ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যভাবেই আপনার ক্ষমা চাই?”

উহার মুখে ও কণ্ঠে সরল সত্যের স্নিগ্ধ-সহিত নির্ভীক তেজস্বিতা ব্যক্ত হইয়া উঠিল। এ ব্যক্তি বাহা করে, অন্তরের সহিতই করে, গ্লিবেটুকু উচিত বোধ করে, তাহাতে সে কোনরূপেই কুণ্ঠিত নয়; এই পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণার মনের বিধিষ্টভাবও বহু পরিমাণেই পরিকণ্ঠিত হইয়া তাহার হলে যেন একটুখানি সশ্রদ্ধভাবও দেখা দিতে লাগিল।—সে-ও একটু ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, “না, না, অমন কাজ করবেন না। আমার নাম নিয়ে কোন রকম আলোচনাই আমার সহ্য হয় না। ওতেও আর একবার ওই সব পুরনো কথার আন্দোলন হবার সুযোগ দেওয়া হবে।”

ছেলেটি তখন যেন কতকটা হতাশ হইয়া গড়িয়া বলিয়া ফেলিল, “তবে আর আমি কি করতে পারি বলুন?” তার পর আবার বলিল, “কিন্তু আমি নিজে বড়ই অনুতপ্ত হয়েছি, এটা আপনি অবশ্য বিশ্বাস না করলেও আপনাকে আমি দোষ দিতে পারিনে,—কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য।”

কৃষ্ণা এ কথাটা একটুও অবিশ্বাস করিল না, করিবার উপায় ছিল না, সে মুখে ও কণ্ঠে কৃত্রিমতার সংশয় অতি বড় সংশয়াত্মক করিতে পারে না।

দুজনে একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর এবার কৃষ্ণা নিজেই প্রথমে কথা কহিল, ক্ষুণ্ণস্বরে সে কহিল, “ডাক্তার বলেছেন, নবার না একেবারেই—”

—“হ্যাঁ, অন্ধ হয়ে যাবে।”

“আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে—আপনিও এ কথা তা হ’লে জানেন? ডাক্তার আপনাকেও ওই কথাই বলেছেন?” কৃষ্ণার কণ্ঠে বিষম ধ্বনিত

## । দেবীর গ্রন্থাবলী

নন, আর  
ওর ছ'চোখেরই

প্রায় আত্মগতই কহিল,  
এক জন ডাক্তার।”

কহিয়া উঠিল, “না, আমি  
এখানেই এক জন ‘এক ষ্টুডেন্ট’  
সর পড়েছিলুম।”

৪-২-স-র!—তবু ডাক্তার নন!—সে  
৪।”

ছেলেটি হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, “অর্থাৎ  
কাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগের মাসেই কলেজ  
ছেড়ে দেওয়া গেছিলো, তাই ডাক্তারীর কোন  
ডিপ্লোমা পাওয়া যায় নি।”

কৃষ্ণা এই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির পরিচয়ে  
ক্রমেই কৌতূহলী হইয়া পড়িতেছিল, সে আবার  
সামান্যেই প্রশ্ন করিল, “তাতে কি লাভ হলো?”

সে উত্তর করিল, “হলো ঠা কি! ডাক্তারীর  
ডিপ্লোমা না থাকলে সরকারী বা বেসরকারী কোন  
রকমের চাকরী করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না,  
অথবা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতে গেলেও  
ডিপ্লোমা-হীন ডাক্তারকে লোকে ভিজিট দিয়ে  
ডাকবে না, লাভ এইটুকুই হবে।”

বিশ্ময় ঘেন সীমাতিক্রম করিতেছিল। কৃষ্ণা  
যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়াই গভীর কৌতূহলের  
সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “লোকে ভিজিট দিয়ে  
ডাকবেই না যদি, তা হ'লে ডাক্তারী শিখে কি  
হলো?”

ছেলেটি তাজ্জীল্যভাবে উত্তর করিল, “ধারা  
ভিজিট না দিয়েও ডাকবে, তাদের জন্তু শেখা গেল।  
তার সংখ্যাও তো কম নয়।”

কৃষ্ণা অবাক হইয়া তাহার নির্লিপ্তবৎ শান্ত  
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুহূ-মুহূ যেন আত্ম-  
গতই কহিল, “ও, আই সি!—আচ্ছা, আপনি  
কি সেই জন্তুই এখানে আসেন? আমার মনে  
হচ্ছিল, আমার গতবিধি পর্যবেক্ষণ করাই  
আপনার উদ্দেশ্য।”

ছেলেটির মুখে প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তেজনা এক  
মুহূর্তে অলস হইয়া দেখা দিয়াই পরক্ষণে যেন ঝটিকা-  
প্রহত দীপ-শিখার মতই নিমিষে নির্বাপিত হইয়া  
গেল। সে শুধু অত্যন্ত অবজ্ঞার ভাবেই অব্যব-  
হাতি, “আমার ততদূর ধৈর্য্য ও সময় থাকলে, আজ  
সে শিক্ষার জন্তু আপনার কাছে কমা চাইতে

আসতে হতো না।”—তার পর সম্পূর্ণরূপেই আপ-  
নার উপরে জয়লাভ করিয়া লইয়া দিবা হাসিমুখে  
পুনশ্চ কহিল, “তা' নয়, এইখানেই তো পড়ে গেছি।  
এর সব খবরই আমার তো জানা আছে।  
গরীবদের উপর পৃথিবীর সর্বত্রই সমান আদর হয়ে  
থাকে। এই যে সার্জিক্যাল ‘ওয়ার্ড’ দেখছেন, এখানে  
অ্যাক্সিডেন্টের পেসেন্ট এলে, সর্বত্রই যেমন—  
সহজে ডাক্তারের নাগালই তারা পায় না। কুলীরা  
ছাত্রদের খবর দিয়ে গেল, এখন ছাত্রেরা যদি ছদ্ম-  
বান বা কর্তব্যপরায়ণ না হন, তা হ'লেই রোগীটি  
হয় তো প'ড়ে প'ড়ে ম'রেই গেল।—অবশ্য যারা  
সুখী। আর যাদের প্রতীক্ষা সর, তারা যথাকালের  
■ অপেক্ষা ক'রে তো থাকতেই পারে। তাই সন্ধ্যা-  
সকালে এক-আধবার এসে ওই রকম হতভাগা-  
গুলোর এক-আধটুকু খবর নিয়েও যাই আর বেড়িয়েও  
যাই। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি, আর এক  
জায়গায় যেতে হবে। আপনি তা হলে আমার কমা  
করতে পারবেন, কেমন? যদিও পারাটা হয় তো  
খুবই কঠিন, আমি হলে বোধ করি পারতুমই না।”

ছেলেটির কথা বলার ধরণে ■ সরলতার কৃষ্ণার  
মনের রাগ-দুঃখ যে কোন সময়ে কোথায় ভাসিয়া  
চলিয়া গিয়াছিল, সে খবর সে জানিতেও পারে  
নাই। এখন পূর্ব-কথার উল্লেখ সে কথা মনে  
পড়িতেই সে যেন এক অপূর্ব বিষয়ে অবাক  
হইয়া গিয়া ভাবিল, ইহার উপর অবার রাগ করিবে  
কি? কমা না করিবার তো কোন উপায়ই  
এখানে নাই?—প্রকাশ্যে ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া  
প্রীতি-মধুর কণ্ঠে উত্তর দিল,—“বেশ, তাই হবে।  
আচ্ছা, আপনি কি এনাকিষ্ট?”—প্রশ্ন করিয়াই  
সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।—কেহ  
নাই। শুধু একটা ভূত এনামেলের একটা বড়  
গামলা ভরিয়া ধোঁয়া-ওঠা গরম জল লইয়া বারান্দার  
শেষপ্রান্তে আর একটা ঘরে ঢুকিয়া গেল।

প্রশ্ন শুনিয়াই কিন্তু ছেলেটির মুখের ভাব একে-  
বারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের  
কোণে ও অধরপার্শ্বে যেন কৌতূকের সহস্র উৎস  
কেবলমাত্র একটুখানি ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া  
আছে—এমনি বিজ্ঞপ হাসির আভাস চক্ৰমকে  
তাহার চেহারাটাকে দেখাইল। কিন্তু সে উদ্দাম  
হাস্ত-শ্রোতকে জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া  
সে মাত্র মুহূ-হাস্তের সহিত স্কোভুক প্রশ্ন করিল,  
“এনাকিষ্ট আপনি কাকে বলেন?”

সলজ্জার কৃষ্ণা জবাব দিল, “রাজা এবং



রাজ্যের ব্যাধি উচ্ছেদ-কামনা করে। প্রগতি যে সম্ভব হয় না, তাহা প্রমাণ করিবার অর্ধ-নিমেষমাত্র পরেই সে বুদ্ধিতে পারিয়া নিরতিশয় লজ্জা পূর্বেই পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিপুল হইয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসিত এবার আর হাসিল না, বরং সহসা উদ্ভিত গাভীর মতো মেঘে নিজের স্বকুমার মুখকান্তি গাভীরামের করিয়া তুলিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষের প্রাণের উত্তরে এই জবাব দিল, “রাজ্য তো নয়ই; রাজ্যেরও উচ্ছেদ-কামনা বা তদ্বিবরক কার্যো আমরা লিপ্ত নহি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, “স্বরাজ” লাভ। আর তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নয়; এমন কি, বিবাদ-কলহ পর্যন্ত নিরপেক্ষতামাত্র আমরা অবলম্বন কর্তব্য পক্ষপাতী। একে যদি ‘এনাকীজম্ বা রাজদ্রোহী’ বলেন, বলতে পারেন।”

কক্ষ এই স্পষ্টবাদী ও তেজী ছেলেটির প্রতি-বাক্যে ও প্রত্যেক ব্যবহারে তাহার অন্তরস্থ ত্যাগ ও নির্ভীকতার মহাবীর পরিচয়ে নিজেকে ইহার কাছে অত্যন্তই লম্বা ও হীন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। সে তাহার সম্বন্ধে যে অবিচার করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—তার জন্য অপকটে অসঙ্কোচে সে এই অপরিচিতার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিতেও দ্বিধামাত্র করে নাই; কিন্তু বাস্তবিকই কি সে দিন সেই যে কথাগুলো সে উত্তেজনার মুখে বলিয়াছিল, সেগুলো একেবারেই মিথ্যা! ভিত্তিহীন? কেমন করিয়া সে কথা বলা চলে? উহার সে দিনকার কোন কথাটা মিথ্যা? এই একটা পাপের না হয় সে সামান্য প্রায়শ্চিত্তই করিতে আসিয়াছিল। তাও সেই তীক্ষ্ণ স্মরণে না বিধিলে কি এতটাই করিত? আর কবে সে গগীষের জন্য এতখানি করিতে সমর্থ হইয়াছে? কবে? কখনও না! তবে?—কিসের এ মিথ্যা গৌরব? কিসের অহঙ্কারে এই ত্যাগবীপ্ত অন্তরের সুপবিত্র অমৃত্যু সে অবহেলার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? সে তো এ বস্তু পাওয়ার যোগাই নয়।

এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুখের ভাব-টাকে সহজ ও প্রকৃত দেখাইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—“তা হ’লে আপনাকেও আমি তুল বুঝে আপনার পুরে অবিচার করেছি।—যাক, হৃদয়কারই অন্তর্যের শোধ-বোধ হয়ে গেল, এবার থেকে আমাদের মধ্যে—” বলিতে বলিতে নিজের মনের উত্তেজনাকে নিজেরই কাছে হেঁয়ালির

ঠেকিয়া ধাইতেই সে মনে মনে জিব্ কাটিয়া নীরব হইয়া গেল; কিন্তু ততক্ষণে অপরপক্ষ ঠিক তেমনি উৎসাহিত আনন্দে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া অসমাপ্ত পদ পূরণ করিয়া দিয়াছে,—“বন্ধু-স্থাপন হয়ে গেল,—কেমন?”

তখন কোনমতে নিজের অন্তরস্থ অস্থিরতা গোপন করিয়া নত-চক্ষে কক্ষা উত্তর দিল, “হঁ।” তার পর ফিরিয়া আসিবার — প্রস্তুত হইয়া সে হৃৎক পা চলিতে আরম্ভ করিয়াই বারেক ধম-কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু-কুণ্ঠিতবচনে জিজ্ঞাসা করিল, “কি বললে আপনার খোঁজ পাব? এই ধরুন, যদি আপনার কোন ‘স্পীচ’ই শুন্তে গেলুম।—”

উহার কণ্ঠে বিজ্রপের সুর লুকান ছিল না, কিন্তু সেই সন্দেহ সবার গৌর-গ্রীবা দ্বিগুণ রঞ্জিত করিয়া দিল। সে উত্তর দিল,—আমার নাম বিনয়-কুমার শীল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙিয়া বিছানার বসিয়া জগদ্ধাত্রী-ইষ্টদেবতা ইত্যাদির নাম স্মরণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় তাঁহার কানে একখানা ভাড়া-টীয়া গাড়ীর ধনুধনে আওয়াজ এবং সদর-দেউড়ীতে সেখানা ধামার শব্দ একসঙ্গে প্রবেশ করিল। এত সকালে কে আসিল? এই কথা মনে করি-তেই মনটা উৎসুক হইয়া ‘অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী’-প্রভৃতির পুরাণ-গাথা বিস্তৃত হইয়া গিয়া খুব আধুনিক একটি মেয়েকেই স্মরণ-পথে টানিয়া আনিয়া এবং জিহ্বামূলেও তাহারই নামটা ঠেলিয়া পাঠাইল,—“বোমা! দেখ তো গা, গাড়ী ক’রে কে এলো?”

ঠিক পাশের ঘরেই দেওয়ানে লাগান কাঠের আন্টা হইতে একখানা লালপেড়ে গরদের শাড়ী টানিয়া লইয়া বোমা ‘উজ্জ্বলা’ তখন নীচে নামি-বার উদ্দেশ্যে ব্যাপ্তা ছিল; শাড়ীর হুকুমেও বটে এবং নিজের কোতুহলেও বটে, কাপড়-গামছা ছুঁড়িয়া ভূমে ফেলিয়া কে আসিল দেখিবার জন্য উর্দ্ধ্বাসে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়া দিল। গাড়ীখানা ইতোমধ্যে গাড়ী-বারান্দার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ায় উপর হইতে দেখিতে পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চটাপট চটাপট চটজুতার শব্দ শোনা গেল।  
—উন্মিল্লা নিজের গতিবেগ সংযত করিয়া ফেলিয়া ভদ্রভাবে মাথায় কাপড় তুলিয়া ঢাকা দিল এবং আত্মগতই কহিল, “নিশ্চই ঠাকুর-মশাই! তা’ আজ এলেন কেন? সরস্বতী পূজোর তো এখন সাত-আট দিন দেবী আছে!—এতদিন ধ’রে ব’সে ব’সে কেবলই সকল তা’তেই খুঁৎ ধ’রে খিটমিট করতে থাকবেন। বাবা রে বাবা!”

পায়ের চলনটাকে বন্ধ ও স্থলদেহধারী ‘ঠাকুর-মশাই’এর চলন নহে বলিয়া সন্দেহ জাগিতেই যেমনি নবজাত কোতুলে তিনটা সিঁড়ি টপকাইয়া সে একেবারে ধুপুন্ করিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই চটজুতার অধিকারীটির সহিত তাহার চোখে চোখে মিলন ঘটয়া গেল।—

“হরিবোল হরি! তুমি! এই শীতকালের ভোরের বেলায় চটজুতো পায়ে দিয়ে! বাবা রে বাবা! এ আবার কি খেয়াল চেপেচে ঘাড়ে শুনি?”

আগন্তুক এই খেয়াল-চাপার ইতিবৃত্ত শুনাইবার কোন উত্তোগ না দেখাইয়া ভদ্রভাবে এই প্রশ্ন করিল, “ভাল আছিন্ তো বাদরি?”

উন্মিল্লা ঠোট ফুলাইয়া—“বাঃ-ও! চিরকাল ধরেই কি আমার তুমি ঐ সবই বলবে না কি?”

বিনয়কুমার দোপানারোহণ-চেষ্টায় সিঁড়ির একজোড়া ধাপ বাদ দিয়া একেবারে তৃতীয় পৈষ্ঠায় লম্বা ঠাং তুলিয়া খুব নিকটস্থিত উন্মিল্লার বাম-গণ্ডে নিজের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনি দ্বারা একটা টোকা মারিয়া ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, “নাঃ, ঠুংক এখন থেকে মুরজাঁহাবেগম অথবা রাজ্য ক্রিওপেট্রা ব’লে ডাকতে হবে।”

কোন ‘মুরজাঁহা’র সম্বন্ধে যদি বা ঈষৎ একটুখানি জানাও থাকে, ‘ক্রিওপেট্রা রাণী’র বিষয়ে উন্মিল্লার কোন খবরই জানা ছিল না, কাজেই সেই ছই নামে তাহাকে ডাকা সম্বন্ধে সে বেশ স্পষ্ট করিয়া আপত্তি বা নিরাপত্তি জানাইতে সমর্থ হইল না, শুধু একটুখানি অপ্রতত্ত ‘হবো হবো’ করিয়া সবেগে মস্তবড় গোঁপা-গুচ্ছ মাথাটাকে নাড়া দিয়া সজোরে কহিয়া উঠিল, “ধেং। ওসব তোমাকে কে বলতে বলচে? তা ব’লে ঐ ছাড়া আর যেন কিছু বলবার কথা বিশ্ব সংসারে নেই।”

বিনয় সিঁড়ি-ওঠা বন্ধ রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, কৃত্রিম গাভীরো মুখ ভারী করিয়া

জবাব দিল,—“হঁ-উ”, তা আবার :নেই! বিশ্ব-সংসারে বলবার এত কথা আছে যে, সে শুন্তে গেলে এক বিষয় মুদিল বেধে যাবে। আচ্ছা, ছই একটা শুন্বি? তবে বলি শোন, এক রাফুসী, ছই পেত্রী, তিন হনুমানী, চার—”

উন্মিল্লা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া স্বরিত-হস্তে বিনয়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে গেল, মুখখানা ফুগাইয়া ভীষণত্বের চাকের মতন করিয়া বলিয়া উঠিল,—“যাও, যাও, আর তোমায় বলতে হবে না। খবরদার বল্চি, আমার তুমি যদি কোন নাম ধ’রে ডাকবে তো আমিও কেটে ফেললে তোমায় জবাব দেব না, তা’ ব’লে দিচ্চি।”—

বিনয় মুখের উপর চাপা দেওয়া হাতখানা মুঠায় চাপিয়া রাধিয়া সকৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, “বেশ, তাই সই! আমি তা’ হ’লে তোকে এবার থেকে ‘বিনামা’ ব’লে ডাকবো, কেমন রাজী?”

নামটির ভিতরকার নিহিতার্থটা উন্মিল্লার জানা ছিল না। কাজে কাজেই সে বেচারী মন্দের ভাল হিসাবে, মনে মনে ইহাতেই অর্কসম্মতগোছ হইয়া অবগু বাহিরে ঘাড় বাঁকাইয়া জোড়া ভুরুর গুণ উর্কে চড়াইয়া হাসি-মাখা মোহাগে-ভরা চোখের তারার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-শর ফেপণ করিয়া আব্দারে গলিয়া পড়িয়া বলিল, “বাঃ-ও! আমার নাম কি নেই, যে আমার বিনামা ব’লে ডাকবে? উন্মিল্লা না বলতে পারো, তবু ‘উমি’ বললেও তো চলে। তোমার শুধু আমাকে জালাবার ফন্দি বই তো নয়!—”

বিনয় এই দীর্ঘ বক্তৃতার বিনিময়ে তাহার গোলাল মুখের ছোট নখটি ধরিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিয়া ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ইতি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় উপরের সেই ঘরটার মধ্য হইতে ডাক শোনা গেল।—

“বোমা! বলি বোমা! কই, কে এলো রে? গাড়ী ক’রে কে এলো? ওরে, ও উন্মিল্লা?”

“ঐ রে! একেবারে সব ভুলে গেছি! ওমা! মা! আচ্ছা, আমি কাছে গিয়ে বল্চি। বেশ তো তুমি মজার লোক! চুপ্‌ট ক’রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হৃদশা দেখে হাস্‌চো! মা’কে নিজে তো ডেকে বললেই পারতে যে, আমি এসেছি!”—

বিনয় বলিল, “আমায় তো মা জিজ্ঞেস করেনি



যে আমি বলতে বাবো। তুমিও তো বললেই পারতে যে, 'বিনয় এসেছে।'

“আহা ম'রে যাই, কি কথাই ছিরি!”—  
ঠোট বাঁকাইয়া, ক্র কুঞ্চিত করিয়া স্বামীর দিকে একটা কিল উঠাইয়া দেখাইল,—তার পর সে দ্রুতপদে শাওড়ীকে খবর দিবার উদ্দেশ্যেই কোনদলে খামা-চাপা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বিনয়ও তাহার পিছনে উঠিতে উঠিতে দূর হইতেই ডাক দিল,—“মা!”

জগদ্ধাত্রী ততক্ষণে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, আন্তে-বাস্তে কাছে আসিতে আসিতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “কে রে, আমার বিনয় এলি!”

বিনয় পাঁচ বৎসরেরও কিছু বেশী কাল কলিকাতার পড়িতে গিয়াছে। এই দীর্ঘকালমধ্যে খুব অল্প সময়ই সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে পাইয়াছিল, ডাক্তারী পড়ার ছুটি কম, কামাই চলে না, তারও উপর কলিকাতার নানান হজুগে মাতিয়া ঘরের কথা তাহার মনে বড় কমই পড়িত। প্রথম ছ'এক বৎসর ছুটি-ছাটায় আসা-যাওয়া ছিল, ক্রমে পড়ার চাপ বাড়িল, অবসর বড়ই কম। পড়ার ছেলের এতটা মন হইয়াছে দেখিয়া বাপ-মাও বড় বেশী জিদ দেখাইতেন না। তার পর বিপিন শীলের মৃত্যু হইল। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে মধ্যে মধ্যে ছ'এক দিনের জন্ত আসা যাওয়া তাহাকে বিষয়-কার্যব্যাপদেশে করিতেই হয়। বাপের কারবার সে উঠাইয়া দিয়াছে, তবে মায়ের খোঁজ-খবর ও খরচ-পত্রের লেনা-দেনার খাতিরেই যদুচ্ছাক্রমে বাড়ী আসা অনিবাধ্য। নহিলে যখন হইতে সে পড়া শেষ করিয়া বিনা-জিজিটের এবং বিনা-ডাকের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে তাহার সময়ই বা কোথায়, যে, সে বাড়ী আসিয়া বসিয়া থাকিবে? মাকে বুঝাইল, সে দেশের কাজ করিতেছে, এর মত পুণ্য আর কিছুতেই নাই। মা বুঝিবার ■■■ তো বসিয়া আছেন, উর্শিলা খুব কাঁদিতে লাগিলেন। উর্শিলা ঠোট ফুলাইয়া বলিল, “বেশ তো দেশই যখন তোমার সব, তখন তাই কর।”

সেই দিনই বিনয়ের না কি ফিরিবার কথা। জগদ্ধাত্রী সে কথাটার বিরুদ্ধে এমনি কাতর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, অবশেষে ব্যস্ত হইয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “কি মুন্সিলা! তুমি মানুষের দরকার অ-দরকার বোঝ না! আচ্ছা বাবু, না হয় আজ না-ই যাব।

হ'একটা রোগী ম'রে যার, না হয় গেলই, তুমি তো এখন থামো। আমার মার বদলে না হয় তাদের মারাই কাঁছক।”

মা বলিলেন, “হু-মুখো ছেলের কথা শোন একবার?”

চোক মুছিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া গেলেন এবং ডাক পাড়িলেন, “বোমা! অ-বোমা!”

উর্শিলা পুতুলের জন্ত ছেঁড়া জাকড়া নীলবাড়ির জলে রঙ্গাইতেছিল, সেই মূর্তিতে ছুটিয়া আসিলে, হাসি চাপিয়া ফেলিয়া মুখ তার দেখাইবার সচেঁষ্ট আয়োজনের সহিত শাওড়ী বলিলেন, “ঐ জন্তেই তো ছেলেটা ঘরবাসী হ'তে চায় না। তুই যদি একটু মানুষ হতিস্ উর্শিলা।”

উর্শিলা সাহস্বারে নথ-নাড়া দিয়া জবাব করিল, “কেন বাপু, কি আমার দোষটা?”

শাওড়ী একটু বেজার হইয়া বলিলেন, “সে যদি তুমি দেখতেই পাবে, তা হ'লে আর আমার ভাবনাই বা কি? এতকাল পরে সোয়ামী ঘরে এলো, আর তুমি অত বড় সোমন্ত মেয়ে কোথায় সাজ-সজ্জা ক'রে তার কাছে কাছে থাকবে, যা'তে তোমার দিকে ওর টান হয়—তাই করবে, তা নয়, কোথায় বেরাল-ছানা নিয়ে, জাকরা ক'রে, কোথায় পুতুল নিয়ে নীল-বাদের সঙ্গে, কচি খুকির মতন বেড়াতে লাগলে।”

শাওড়ীর মুখের এই একদেশদর্শী ভৎসনায় উর্শিলার মনটা কিছু তিক্ত হইয়া উঠিল। একেই নিজের ভিতরটা তাহার এই বিষয় লইয়া কিছু উদ্ভাক্ত হইয়াই ছিল,—তাই যত্ন-স্বাক্ষরে সে অন্তরের সেই স্তম্ভ অভিমান কতকটা ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল,—“বাদের এনে ঘরে পুরে রেখেছ, বাদের না সঙ্গে আর সাজবো কি? কি ছাই জানি আমি? শিখিয়েছ কিছু?”

জগদ্ধাত্রী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, “অমন অধর্ম্যে কথা বলিস্নে উমি! তোকে শেখাবার জন্তে কম কিছু চেষ্টা করিচি? পাড়ার মেয়েদের কাছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে গিয়ে পড়াবার জন্তে, উল বোনা, সেলাই ফোঁড়াই শেখাবার জন্তে কত দিন ধস্তাধস্তি করেচি, মনে ক'রে বল দেখি? তোর হড়করা ছাড়া ছনিয়া-সংসারে আর কিছুতেই মন বসলো না, তা আমি কি করবো বল? এখন দেখছিস্ তো? পিটো-পিটির মতন খুশ্টি করলেই কি স্বামীকে খুসী

করা যায়? একটু বদল আভিও কি করতে পারিসনে ছাই? মেয়েমানুষেরই একটু গায়ে-পড়া হ'তে হয়। দেখছি সু তো, ও একটা আপনা-ভোলা পাগলা ছেলে।”

রাগ করিয়া উন্মিলা মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিয়া উঠিল, “কেন, তোমরা অত ছোট-বেলায় আমাদের বিয়ে দিয়েছিলে?” বলিয়া চলিয়া গেল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

উন্মিলা নিজের সঙ্কটাবস্থা ইদানীং ক্রমেই একটু একটু করিয়া বৃদ্ধিতে পারিতেছিল। সম-বয়সীদের বরের চিঠি, তাদের ফিস্ ফিস্ করিয়া হাসি-চাহনির মধ্যেও সমবয়সী পরস্পরের সহিত গোপন কথা কওয়া, এ সব দেখিয়া হ্রস্ব লোভের আকর্ষণ পিপাসায় সে যেন উন্মুখ চাতকের মতই তাহারও ‘বরের’ তাহারও ‘প্রিয়ের’ প্রতীক্ষা করিত। আড়ালে বসিয়া শুল্ল-শয্যার শুইয়া সখীদের মুখের শোনা কথা-গুলি চুরী করিয়া এক একটা করিয়া বুনিয়া বুনিয়া সেগুলিকে লইয়া নানাভাবে নানারূপে সাজাইত। তাহাদের ইচ্ছামত ভাদিত গাড়ত, আবার একত্র করিয়া মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার এই অনুকৃতির মতে নবীন কোন সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যই তাহার ছিল না। সে তো নিজের অনুভূতি হইতে স্বামীর আদর, স্বামীর প্রেমামুরাগে পরিপূর্ণ তৃপ্তিস্পর্শ, তাহার উন্মাদনার ভরা অজস্র সোহাগ-বাণীর কিছুই কখন অনুভব করে না। তার সকল কিছুই যে পরের কাছে ধার করা, সবই যে তার বুটা, মানিক তো তার গলার হারের নয়, পথের ধুলার কাচ কুড়াইয়াই তাহাকে খেলার সাধ মিটাইতে হইতেছে যে, তাই যখন-তখন দারুণ অতৃপ্তিতে চিত্ত তাহার ভরিয়া উঠে, প্রাণের মধ্যে বিপুল নিরানন্দতার সহিত একটা ব্যাকুল বেদনা অভিমানের তরঙ্গে সারা-মনঃপ্রাণকে আহত করিয়া থাকে। বাহিরের সংসার যেন তার তলায় পড়িয়া ধূসর ও ধুলি-মলিন হইয়া যায়।—অথচ যখন সুযোগ আসে, অর্থাৎ বিনয় কিংবা বিনয়ের পত্র আসে, তখন আশৈশবের অভ্যাস-বশতঃ উন্মিলার মনোবীণার তারে তাহার

কিছুই বেশুরা বাজে না। বরং যদি কিছু উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, তা সে-ও তো উন্মিলা বারম্বার কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছে, আরে ছিঃ!—সে আবার কেমন হইবে? যদি বিনয় তার চিঠিতে “উমি হনুমানি!”—না লিখিয়া যেমন—“খোঁপার ফুলের” বর লক্ষ্মীবাবু তার চিঠিতে লেখে, তেমনি করিয়া লেখে, “প্রিয়তমা উন্মিলা!” রাম বল! তার চাইতে বই পড়িলেই তো চুকিয়া যায়! আচ্ছা, সে দিন দত্ত-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া সে যে আড়ি পাতিয়া তার মিতিনের বরের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়াছে, বর বলিতেছে—‘আমি তোমায় বত ভালবাসি, তুমি কি তার অর্ধেকও বাসতে পারবে?’ আর বউ জবাব দিল, ‘আমার অর্ধেক তুমি বাসো কি না সন্দেহ!’—শুনাই তো উন্মিলার আকৈল গুডুম! না বাবু,—বিনয়ের সঙ্গে কোন ভ্রমও এই সব ভালবাসা-বাসির কথা সে তো তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও কাহাতে পারবে না। ওরে বাবা, ও আবার কি রে বাপু?—তথাপি মনের মধ্যে যৌবনের দ্বিগুণ-বাতাস শীতের কোয়াসা কাটাইয়া দিয়া বহিতে থাকে, হাজার ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া উঠে; এবং মন একা একা নিরালস্য হইয়া কাঁদিতে থাকে। চিরপরিচিত জীবনের সমস্ত স্বাদই তিক্ত ও বিরস হইয়া যায়।

তাই আজ শাওড়ীর কাছে খোঁচা খাইয়া উন্মিলার নারীত্বের নবোন্মেষে অর্ধ-বিকসিত চিত্ত যেন নিজেকে ফুটাইবার জন্ত খুঁজিয়া পাইল বলিয়া অনুভব করিল। বিনয় আসিবার পূর্বে সে যে সব গাড়িয়া সাজাইয়া রাখে; সে আসিলেই সব-খানি তার উন্টাইয়া যায়। চিরাত্যন্ত রীতিতে জগদ্ধাত্রীর ভাষায় ‘পিঠোপটির’ মতই তখন তাহাদের মধ্যে খুঁটিনাটি ঝগড়া কলরবের কাকলী জাগিয়া উঠে ও তার পর বিনয় চলিয়া গেলে, কিছুদিন মনের সঙ্গে সুখও তাহার বেজায় অন্ধকার হইয়া থাকে। এই চিরন্তনীর আর কিছু বড় তফাৎ পড়ে না। তা এবারটায় জগদ্ধাত্রী যখন সমস্ত থাকিতেই চেতাইয়া দিলেন, তখন মানসিক সঙ্কোচের উপর খুব কড়া রকম চোক রাজাইয়া দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উন্মিলা-সুন্দরী আয়না পাড়িয়া সেই নীলমাথা-হাতেই চুল বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বিনয় বাড়ী আসিলে, তার সঙ্গে বেরাল-ছানা ধরিতে লাকাইয়া বেড়ানের ব্যস্ততার উক্ত কার্যটি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু আর



সে সব ছাব্‌লামীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না,—তাহাকে জোর করিয়া লাগিতে হইবে।

প্রথমে যথারীতিতে সে নিয়মমত চুল আঁচড়াইয়া লইয়া সাদাসিদা খোঁপা বাঁধিল, তার পর আরসী দেখিয়া মায়ের সাজসজ্জা করার কথা শ্রবণে আসিতেই দাঁতে জিব্‌ কাটিয়া টান দিয়া খোঁপা খুলিল এবং গন্ধতেল, ভিছা গামছা, গলান মোম ইত্যাদি জোগাড় করিয়া আনিয়া খুব ঘটা লাগাইয়া দিল।

বিনয় বাড়ী থাকিলে নিজের সেই ঘরখানিতেই সে শয়ন করিত। তাহার অবিদ্যমানে এ ঘর চাবি-বন্ধ থাকিত। উন্মিলা বড় একটা এ ঘর-খানায় ঢুকিত না, এর দুইটা কারণ ছিল।—এক তো বিনয়ের শত স্মৃতি-পূর্ণ তাহারই গৃহ, উন্মিলার চোখের জলের উৎসকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে বড়ই ওজর করিত। আর তা ভিন্ন এই সর্ব্বনেশে ঘর-খানার মধ্যে পা ঢুকাইতে গেলেই উন্মিলার বুকে ঢেঁকির ঘা মারিয়া বহুদিনের পুরাতন সেই একটি অবিদ্যুত শব্দ আজও তাহার মনের কানে হাঁকিয়া উঠে—বাধা দেয়—“খবরদার, ঘরে ঢুকেছ কি, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিবেছি!—স্পাইকে আমার ঘরে ঢুকতে দিই নে।”

আজ সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাধাটাকেও মনের জোরে একপাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উন্মিলা একটা পানের ডিবা হাতে করিয়া নিশীথ অভিসারে তাহারই স্বামি-গৃহের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় তখন সেই ঘরের সেই টেবিলটার ধারে একখানা চৌকিতে বসিয়া হাতের উপর কপাল রাখিয়া কি যেন একটা কঠিন বিষয়েরই চিন্তার নিমগ্ন ছিল। ল্যাবেণ্ডারের খর-গন্ধ বা, অনেকগুলি ঝুরো-চুড়ির ঝিলিমিলি তার ধানের বর্ষে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।—

■ থাক, উন্মিলা ইহাতে ছাখিতা হইল না। প্রবেশ-পথেই যদি বিনয় তাহার কুসুমী-রংয়ের ছোপান শাড়ীর, তাহার ললাট-সজ্জিত কেশের রচনা, তাহার লজ্জার রক্তিমায় স্বতঃই রঞ্জিত গণ্ডের উপরকার রচনা করা গোলাপী আভা, তাহার কানে, গলায়, হাতে আটপোরের বদলে পোষাকী, নূতন অলংকারের সমাবেশ, হার উপর হাতে জাটা-তাবিজের বদলে ফোরেবর অনন্ত, এই সমস্তই যদি এক নিমেষে

দেখিয়া লইয়া উচ্চহাস্তে বিজ্ঞপ করিয়া বসিত, তাহা হইলে—নিশ্চয়ই তাহা হইলে উন্মিলাকে সেই যে দিন তাহাকে ‘স্পাই’ বলিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, সেই দিনেরই মত তত বড়ই লজ্জায় আঘাত দিয়া তাহার গৃহপ্রবেশ রুদ্ধ করা হইয়া যাইত। মনের এ রকম বিপর্যয় দুর্বলতার মধ্যে সে যে সেই তীব্র উপহাসের বাণবৃষ্টি সহ করিয়া নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইবার লড়াই চালাইতে পারিত, তা বোধ হয় না। প্রথম ধাক্কার বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইতে পাওয়ার সে অনেকখানি লজ্জা-জ্বালায় হাত এড়াইতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল ও এই সুযোগটাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার এতকণকার সকল সঙ্কল্পই প্রায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া বসিল। সে যে সেই অবধি অনেক ভাঙ্গাগড়া করিতে করিতে স্থিরসত্তর হইয়াছিল, যে, আজ সে ঘরে ঢুকিয়া তাহার নিজের স্থান জোর করিয়া দখল করিবে, কেমন করিয়া? তা, সে কি আর সবার সঙ্গেই বসিয়া বসিয়া হিসাব-নিকাশ করা যায়? লজ্জা করে বে! সমরমত প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হিসাব মতন ঘটিল না। বিনা-বাধায় ঘরে ঢুকিতে পাইয়াই তাহার চিরদিনের কোতুক-বৃত্তি তাহাকে জোর করিয়া ধরিল। তখন নিঃশব্দ-পদে পিছনে আসিয়া সে দুই হাতে বিনয়ের চোক চাপিয়া ধরিল।

বিনয় আকস্মিক চিন্তা-ভঙ্গে প্রথমে একটুখানি চমকিয়া উঠিয়াছিল, তার পরই হাত বাড়াইয়া উহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—“পেঁচোর-মা!” হাত সরিল না,—“বিশে মালি!” হাত সরিল না দেখিয়া, তখন যেন বিশেষ চিন্তিতভাবে কহিয়া উঠিল,—“আচ্ছা, তা হ’লে হরে ধোপার বউ—না তো গরলানী ধানির মা!—

“বাঃও!”—বলিয়া সতর্কভাবে উন্মিলা তাহার করাবরণ উন্মোচন করিয়া লইয়া মুখখানা হাঁড়ির মতন করিয়া ছোট নখটা ঘুরাইয়া বলিল, “আমার হাত বুঝি বিশে মালির মতন শক্ত? না হরে ধোপানীর মতন মোটা? না পেঁচোর মায়ের মতন শুকনো?”

বিনয় তত্বত্বেরে শুধুই বলিল, “ওঃ, তুমি!”

উন্মিলা তখন পূর্ব্বসত্তর সবই ভুলিয়া গিয়াছে। বিনয়ের জবাবে সে রীতিমত চট্টয়া উঠিয়াই তাহাকে আক্রমণের ভাবে কহিল, “হ্যা, তা

বৈ কি, নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছিলে। আমার জ্বালাবীর জন্তে শুধু ঐ সব বলতে লাগলে, কেন বলো দেখি, তুমি আমার অমন যা'তা' বলো?"

বিনয় না হাসিয়া মুখ গভীর করিয়া উত্তর দিল, "বাস্ রে! তোমার না কি আসি যা'তা' বলতে পারি! তুমি হচ্ছে! মহারানী 'ক্লিও-পেট্রা'।"

উন্নিলা বন্ধ করা পানের ডিপেটা স্বামীর গায়ের উপর ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল-- "যাঃ-ও! তুমি কি যে ও-সব বলো! পেট্রা টোষ্ঠরা আমি হ'তে চাইনে!"

বিনয়কে সেই কঁাসার ডিবাটা যে আঘাতটুকু দিয়াছিল, সেটুকুকে সে তুচ্ছ করিয়া ডিবা হইতে ছড়াইয়া পড়া পান কয়টা কুড়াইয়া তাহারই ছ'একটা মুখে পুরিতে পুরিতে মুখ তুলিয়া উন্নিলাকে অভিমানী মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "খাঙ্কি ইউ? হারু হাইনেস্ আজ যে বড় দাতা হয়েছেন, দেখতে পাই!" এই বলিয়া পুনশ্চ পান কুড়াইতে মনোনিবেশ করিল।

পানগুলার স্বকৃত ছরবস্থা দেখিয়া উন্নিলাকে আবার পূর্বকথা স্মরণ হইল। এই পান সাজিয়া আনার একটুখানি ক্ষুদ্র-ইতিহাস আছে। তার সেই কাঞ্চনের মুখে সে গুনিয়াছিল, সে যখন স্নাত্রে ঘরে গুইতে যায়, একটি ডিবা সাজা পান সে হাতে করিয়া লইয়া যায়। পানগুলি সে প্রাণ ঢালিয়া সমস্তে বিবিধ উপাদানে সাজিয়া লুকাইয়া রাখে। একসঙ্গে বসিয়া সেগুলি পরম পরিতোষে তাহার ছ'জনে গল্প করিতে করিতে উপভোগ করে। কাঞ্চনের বর বলিয়াছেন, যতগুলি পান সে আনিতে পারিবে, ততগুলি নূতন নূতন গল্প তিনি তাহাকে গুনাইবেন। তা সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ এক এক স্নাত্রে তাহাদের তিন-চার ঘণ্টাও জাগিয়া গল্প গুনাতনি করিতে হয়।—আজ উন্নিলাকে ইচ্ছা ছিল, এই সমস্ত-সজ্জিত পানের খিলি সে-ও তার স্বামীর মুখে নিজের হাতে তুলিয়া দিবে, পরিবর্তে স্বর্গীয় যেটা লভ্য হয়; হয় তো—কে জানে—একই ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান কি এক রকমেরই হয় না?—কল্পনা-কল্পনের এই পরিণাম-লক্ষ্যে তাহার বুক ঠেলিয়া একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস উখিত হইল।

বিনয় পানগুলি জড় করিয়া যে কয়টা মুখের মধ্যে আটিল, মুখেই তরিয়া দিল, তার পর বাকিগুলি

অঞ্জলি ভরিয়া উন্নিলাকে সামনে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্তে নিরে যাওয়া হচ্ছিল? এই নাও, নাও, আর রাগ করতে হবে না, বেশী খাই নি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, না হ'লে আরও গোটাকতক খেতুম।"

উন্নিলাকে বাক্য-বিমুখ ও নতমুখী দেখিয়া তাহাকে ক্রুদ্ধ বৃষ্টিয়া পান কয়টা ডিবার ভরিয়া রাখিয়া দিল ও তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার মতলবে ঘোড়হস্তে স্তর করিয়া আরম্ভ করিল, "যা দেবী সর্বভূতেষু ক্রোধরূপেণ সংস্থিতা—নমস্তস্তৈ, নমস্তস্তৈ, নমস্তস্তৈ নমোনমঃ। যা—দেবী——"

"যাঃ-ও! তুমি আমার কেবল জ্বালাতন করবে, আমি একুনি চ'লে যাচ্ছি—"

বিনয় অত্যন্ত কোমল ও আগ্রহের স্বরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"চ'লে যাচ্চিস্! আহা, তা হ'লে আমি একুনি ঘুমিয়ে বাঁচবো রে! কাল সারা রাত জেগে এসেছি। আজ সারা ছপুর গোমস্তার সঙ্গে ব'সে হিসাবপত্রের করা গেছে। ঘুমটি বা এসেছে—সে কি আর বলবো তোকে।"

উন্নিলাকে পদতল হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত গজ্জার ঘেন শিহরিয়া উঠিল।—ছি ছি, কি ঘণা! পুরুষের চিন্তে যেখানে এত বড় বিকাররাহিত্য, —নারী কি না সে ক্ষেত্রে একেবারেই নিলজ্জা উপ-যাচিকা! সে একটি কথাও আর না কহিয়া নিঃশব্দে পিছন ফিরিল।

বিনয় বলিয়া উঠিল—"রাফুসি! আমার মশারি ফেলা হয় নি, তুই ফেলে দিবি, না—"

কথা শেষ না হইতেই উন্নিলা ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলবার উদ্যোগ করিল এবং যথাকার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বিনয়কুমার একবার ঈষৎ বিম্বিত-দৃষ্টিতে তাহার মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নত নেত্রের ছুই কোণ ছাপাইয়া অশ্রু-নিখার ঝরো ঝরো হইয়া আসিতেছিল, সে তাহাদের দেখা পাইল না।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছপুরবেলা রোগা বাপকে ঘুমাইতে দিয়া কৃষ্ণা তাহার বসিবার পূর্বতন ঘরটাকে একটু আধটু শুছাইয়া রাখিতেছিল, এমন সময় একটা ভারী



জুতা পায়ের চলনের আওয়াজ তাহার কানে ঢুকিল এবং শব্দটা শ্রুতমাত্রেই তাহার অধিকারীকে সে চিনিতে পারিল।

“ফুকন্! মিন্ সাব কিধার হ্যায়!”—এই জিজ্ঞাসার পরক্ষণেই ফুকনের কণ্ঠ হইতে “হুজুর!”—এইটুকুমাত্র শোনা গেল এবং তাহার অশ্রুত বাকী সংবাদটা কানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই ঘরের মধ্য হইতে ডাকিয়া কৃষ্ণা আদেশ দিল, “ফুকন্! একটো ঝাড়ন লে’আও!”

“ওঃ, তুমি এখানে? কি কর’চা?” বলিতে বলিতে পর্দা সরাইয়া মিঃ লাহা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ে বেন বেতাহতের মতই চম্কাইয়া উঠিলেন, “এ কি! এ আবার কি নূতন সখ হয়েছে! ছি ছি ছি; একটা নোংরা মোটা শাড়ী পরে, নিজের হাতে নোংরা কাজগুলো কেন করতে এসেচ! চ’লে এসো, চ’লে এসো—ধুলো লেগে সর্দি হবে যে।”

কৃষ্ণা নিজের কোমরে-জড়ান তাঁতে-বোনা মোটা ও-কোরা শাড়ীর আঁচল খুলিয়া গায়ে টানিয়া দিল, তার পর যথা-কার্য্যে রত থাকিয়া নতমুখেই জবাব দিল, “বাবার ঘরটা বড্ড অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখি। ফুকন্! ঝাড়ন হামকো দেও, তোম দোসরা কাম পর যাও।—”

মিঃ লাহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, “আহা-হা, হাতে ধুলো ঝাড়বার ভারটাই নয় দিখে লাও না। কি এমন কঠিন কাজ যে ওদের সাধো কম পড়বে।”

ফুকন্ দোটারায় পড়িয়া হতবুদ্ধিতাবে মুনিব-কন্ঠার কাছে হাত পাতিতেই ধমকু খাইল,— “নেহি, নেহি, তোম্ চলা যাও।”

নিরন্তরে সে প্রস্থান দিল।

মিঃ লাহা মুখখানা খুব ভার করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন এবং সেই বৈঠকখানা-ঘরের একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া নিজের সিগারকেসটা বাহির করিয়া একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া একমনেই টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তার পর যখন দেখা গেলো তার চাইতেও তিম খরচে তুমি সংসার চালাবে! বল কি তুমি বিবি? তা হ’লে দেখছি না খাইয়ে তুমি আমাকেও মারবে আর নিজেও মরবে!”

কৃষ্ণার ঠোঁটের পাশে একটি কোঁটা ক্রোধের

মে (ক)—৭

“কি! ‘আজ’ ধুলোই খাওয়াবে, না, পেয়লা চা’টাও পাবো?” ঘরের ভিতর হইতে কৃষ্ণার কন্ঠ-বাস্ত-কণ্ঠ জবাব দিল, “চা’ থাকেন! আচ্ছা,—ফুকন্! ওরে অ-ফুকন্! সাহেবকো আস্তে দু কাপ চা বনায় দেও”—ফুকন্ ছুটিয়া আসিতে আনিতে “জী!” বলিয়া জবাব দিল ও হুকুমটা সব শোনা শেষ হইয়া গেলে, দৌড়া দৌড়ি আবার হুকুম তামিল করিতে ফিরিল। কৃষ্ণার ঝাড়ঝুড়ি শেষ হইয়াছিল, সে বই ও ডাক্তারী-বস্ত্র-পাতি যথাস্থানে ঝুছাইয়া রাখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া আহত-গর্ভ তরুণচন্দ্র ক্রোধ-প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “বলি, বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এলে তাকে লোকে একবার এস বোসও তো বলে। ঐ আবর্জনাগুলোর চেয়েও কি এক দিনের ভেতরে আমি তোমার বেশী অ-দরকারী হয়ে পড়েছি?”

কৃষ্ণার এ ঘরের কাজ শেষ হইয়াছিল, তা কোন ছলেই আর অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, তথাপি সে সেই সাজান জিনিসগুলোকেই পুনরায় নাড়াচাড়া করিয়া মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল,—“আপনি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসে থাকেন তো বলি; তার কোনই দরকার নেই। আমার সময়ও কম।”

তরুণের মুখ ক্রোধের রক্তে আরক্ত হইয়া উঠিল। আধ-পোড়া সিগারে জোরে ছুঁটা টান দিয়া তার পর সেটা আঙ্গুলে ধরিয়া রাখিয়া তিনি গরম সুরেই বলিয়া ফেলিলেন, “তা আমি জানি যে আমার কথাকে এখন তোমার ঝগড়া ব’লে মনে হয়, আর আমার কথায় শোনারও সময়ের তোমার পাড়সাছেন, ঘটে থাকে, আমি না করিয়া মিঃ মল্লিক ওন্তে চাই যে, এরকম ব’লে যে ভিকিরী মতন

মিঃ লাহার কথা তারও তো কিছু মনে নেই। নিতান্ত ক্ষমতা হাল করেচ! নিজের যে কিছু হচ্ছে, সে আমার চোখে দেখবার উপায় নেই, এই একটু সুবিধে! ফ্রেঞ্চ গবর্ণেসটাকে তো বিদেয় ক’রে দিয়েছ জানি, আবার তারও তো কোনই সাড়া পাইনে। সে দিন দাই দাই ক’রে কাকে যে ডাকছিলে, তা’ও জানিনে। আমার তো আর চোখে দেখবার কোন উপায় নেই।

বাঁধাচো বল দেখি? শুধু শুধুই সে দিন দর-  
বারের নেমন্তন্ন-বাপারে যতদূর নয় ততদূর  
অপ্রতিভ আর অপদস্থ তো আমার করলেই,  
তার পর সেই দিন থেকে কি ভূতই যে তোমার  
ঘাড়ে ভর করেছে,—গড়া পরুচা, বাঁটা  
ধরুচা, কোথায় না কোথায় হাঁসপাতালে কুগী  
যেঁটে, ছোট লোকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে  
তাদের মধ্যে তাঁত-চরকার বক্তৃতা দিয়ে, ঐ  
সব বিলি ক'রে,—আবার না কি? বাড়ীতেই  
পাড়ার যত হাড়ি-মুচি-কাওয়ার পাঠশালাও  
খুলে দিচ্ছে শুন্চি!—এ সব তোমার হলো  
কি শুনি?”

সেই রাঙ্গা-মুখেই চাপা-বিরক্তিতে কিছুকণ  
নতমুখে টুপিচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তার পর  
একটুখানি ঔদাস্যের হাসি হাসিয়া কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা  
করিল;—

“বাস! হয়ে গেল তো?”

লাহা হতাশভাবে দরজার গারে হেলিয়া  
পড়িয়া বলিলেন, “নাঃ, তোমার সঙ্গে আর  
পারলুম না!”

মুহূ হাসিয়া ও ঘরের দিকে খানিকটা  
অগ্রসর হইয়া আসিয়া কৃষ্ণা কহিল;—

“বেশ, হার যেনে নিলেন তো? তা হ'লে  
চলুন এখন চা' খাবেন।”

পথ ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি আশ্রয় এবং  
তাহারই সহিত মিশ্রিত ঈষৎ অভিমানপূর্ণ-কণ্ঠে  
তরুণ কহিলেন, “এতকণে হতভাগটার প্রতি  
অগ্রগ্রহ হলো, তা হ'লে? সেই যে কোন্  
ভোরে ট্রেনে চেপেচি, তা খেয়ে এসেছি কি  
পাস্ ক'রেই আছি, সে সব খবর একবার  
দরকারও তোমার মনে হয় না

ত দাঁড়াইয়া পড়িয়া  
কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,  
না খেয়ে এসেছেন,  
—গান

“আর ছ' এক রকম আমিও বুঝতে পারছি  
কিষণ! তাদের কাছে আমার ভাবনাই দেখছি  
নেহাৎ পুরণো হয়ে দাঁড়িয়েচে!”

অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কঠিন  
কিছু বলিতে গিয়াই অকস্মাৎ কৃষ্ণা নিজেকে  
সম্বরণ করিয়া লইল। তাহার মনে পড়িল,  
এ ব্যক্তিকে সে ও তাহার বাপ অনেক দিন ধরি-  
য়াই একরূপ স্পষ্টিত হইবার সুযোগ দিয়াছে, ইহা  
ছাড়াইতেও সময়-খরচ করিতে হইবে বিস্তর।  
কিছু না বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

### নবম পরিচ্ছেদ

টাদের আলোর সন্ধ্যাটা যেন আশ্চর্য্য সুন্দর  
হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের বাগানে  
পাখীদের সম্মিলিত-কণ্ঠে বসন্তের বন্দনা-গান উঠিয়া  
যেন দিকে দিকে নব-বসন্তের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত  
হইয়াছে। শেষ-কালনের উদানী বাতাস জ্যোৎস্না-  
ধারায় স্নান করান, হাজার ফুলে আলো করা  
শাছের গারে পুলক-আবেগে কাঁপন তুলিতেছে।  
ঘরের মধ্যের সব দিকের জানালা খোলা, পর্দা  
সরানো, বিজ্ঞানের আলো বন্ধ করা, শুধু সেই  
বসন্ত-জ্যোৎস্নার সুধা-ধবলিত অপকূপ আলোর  
ধারায় ঘর স্নাত ও আলোকিত। কিন্তু এ  
সকলেই অনতিজ্ঞ থাকিয়া ডাক্তার সাহেব সম্মুখে  
ছই হাত বাড়াইয়া দিয়া যেন কাহার স্পর্শ খুঁজিতে  
চাহিয়া ডাকিলেন, “বেবি!”

“বাবা!” বলিয়া জবাব দিয়া কৃষ্ণা পাশের  
ঘর হইতে ব্রহ্মচর্য্যভিত্তিতে ছুটিয়া আসিল।

“তরুণ এ-কদিন কেন এলো না বল দেখি,  
বেবি? তার তো এখনও ছুটি থাকবার কথা  
না? বলেছিল যে চা'র দিন ছুটি।”

কৃষ্ণা বোধ করি, কিছু সেলাই করিতে করিতে  
চলিয়া আসিয়াছিল; তার আঙ্গুলে একটা হাতীর  
দাঁতের ‘অঙ্গুলী-রক্ষক’ পরান ছিল, সেইটা খুলিয়া  
—রাখিয়া দক্ষিণহস্তে বাপের কেশ-বিবল  
করিতে তাহাকে সান্তনা



চেষ্টে ব'সে থাকবো! দেখ মা! তুমি কাল ভোরেই তাকে একটা আর্জেন্ট তার ক'রে দাও। হ্যাঁ, আর 'রিপ্লাই-প্রিপেড' দিও। তা হ'লেই সে ঠিক ক'রে আমাদের তাকে পাও বুঝতে পারবে, আর নিজের ভুলের দরুনীও পাবে যথেষ্ট।"

অন্ধ পিতার চোখের অন্ধকার তাঁহার মেয়ের মুখের বিপন্ন ভাব জানিতেও পারিল না। তাহার নীরবতাটাকে লজ্জাক্রমে ভুল করিয়াই পুনশ্চ জোর দিয়া দিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, —"শোন মা! তুমি এতে কিছু লজ্জাবোধ করো না। এক দিন না এক দিন যে তোমার স্বামী হবেই, তাকে ছ'দিন আগে থেকে একটু যদি তুমি যত্ন দেখাও, তা'তে লজ্জার কি আছে, আমি তো ভেবে পাইনে!—আর দেখ, ওকে যত্ন জানাবার নেইও তো কেউ। তুমি যদি না করবে, তা হ'লে করবেই বা কে? মানুষ একটা কারকে আপনার না কর্তে পেলো কি থাকতে পারে? আমার যেমন কপাল! তা না হ'লে আমিই কেন করি না? তা আমারই তো এখন হাতটি তুমি না ধরলে একটা পা'ও নড়তে পারিনে, তার আমি আর কার জন্তে কি করবো বলো? তা দেখ মা কিষণ! খরচের টাকার জন্তে তো তা হ'লে একটু মুস্তিলে পড়তে হবে? শিবপুরের পৈতৃক বাড়ীখানা বেচে যে টাকাটা পাওয়া গেছলো, তা'তে হাজারীমল খোলামলোদের সুদের আট হাজার গিরে বাকী হাজার তিন থেকে এ তিনটে মাস তুমি তো খুব বাহাদুরী ক'রেই চালালে, কিন্তু এখন তো—"

কৃষ্ণা ধীরভাবে বাপের কথাগুলি শুনিতেন, এখন তেমনি শান্তস্বরেই বাধা দিয়া বলিল, "তার ~~কি~~ তুমি অত ভেবো না বাবা! সে আমি চালিয়ে নোব। বাজে খরচ অনেক কমিয়ে দিয়েছি, এবার থেকে মাসে এক হাজারেরও কম খরচে আমাদের চ'লে যাবে।"—

ডাক্তার মল্লিকের মুখখানা ভরার্তের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যেন তাঁহার 'পরে নিতান্তই অত্যাচারের উপক্রম হইতেছে, এমনিভাবেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এক হাজার টাকার চাইতেও কম খরচে তুমি সংসার চালাবে! বল কি তুমি বিবি? তা হ'লে দেখছি না খাইয়ে তুমি আমাকেও মারবে আর নিজেকেও মরবে!"

কৃষ্ণার চোখের পাশে একটি ফোটা ~~কণা~~

হাসি ফুটিয়া উঠিল, "কেন, বাবা! এ ক'মাস কি আমি তোমার খেতে দিই নি, না নিজেই উপোস ক'রে আছি? অনেক বাজে খরচই তো আমাদের ছিল, সেইগুলো গেলেই খরচও ~~সস্তা~~ পড়বে অথচ খেতেও কম পড়বে না।"

এ সাধনার বিখ্যাত বিদ্যাসী ডাক্তার সাহেবের সম্ভ্র-চিত্ত কিছুমাত্রও প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রায় কঁাদো-কঁাদো-গলায় বলিতে লাগিলেন, "এ তিন মাসে যা' হাল আমার করেছে, সে আর ব'লে কাজ নেই বাবা! রোজ রোজই কি না মস-গাড়ীখানা ক'রে বেড়াতে নিরে যাবে, তারপর আমার সেবা করবার আট জন চাকরের বদলে কি না মোট দুটি লোক ক'রে দিলে।—"

"—কেন বাবা! তোমার সেই আট জন চাকরের হাতের সেবার চাইতে কি এখন তোমার কিছু অম্বত্ব হচ্ছে?" মেয়ের কঠোর বোধের স্বাক্ষর ছিল।

ডাক্তার নিজের অপছন্দ গোপন-চেষ্টা না করিয়াই সোজা বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলিয়া ফেলিলেন, "তা' হয় বৈ কি! তাদের আমি সর্বদা ফাইকরমাস করতে পারতুম, তোমার কি তাই পারি? রাতে শুধু পালা ক'রে এক এক জন থাকে, অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, কষ্ট আর হয় না। অতঃপর যি তুমি কি ভেবেই কর্চো, তা যদি আমার বোধবার কোন উপায় আছে!"

পিতার কথার কৃষ্ণার মনের মধ্যে আঘাত পাইলেও তাঁহার অবস্থা অমূল্য করিয়া তাঁহার জন্ত ব্যথিত ~~তাঁহার~~ অপছন্দ কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার লজ্জাও একটুখান সে বোধ করিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া অবশেষে যত্ন-কণ্ঠে শুধু বলিল, "এ সব না করলে চালাবো কি দিয়ে বলো?"

যেন আকাশ হইতেই ধসিয়া পড়িয়াছেন, এমনিভাবে মুখের ভাবখানা করিয়া মিঃ মল্লিক কহিয়া উঠিলেন, "তাই ব'লে যে ভিকিরী মতন বেঁচে থাকতে হবে, তারও তো কিছু মর্জি নেই। আমার তো এই হাল করেচ! নিজের ধৈর্য হচ্ছে, সে আমার চোখে দেখবার উপায় নেই, এই ~~একটু~~ সুবিধে! ফ্রেঞ্চ গবর্ণেসটাকে তো বিদেয় ক'রে দিয়েছ জানি, আরাটায়ও তো কোনই সাড়া পাইনে। সে দিন দাই দাই ক'রে কা'কে যে ডাকছিলো, তা'ও জানিনে। আমার তো আর চোখে দেখবার কোন উপায় নেই।

তোমারই একরকম মজা হয়েছে!” অন্ধ একটি গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, “শেষে কি না আমার বাড়ীতে নোংরা একটা শাড়ী-পরা, গা-খোলা দাই ঘুরে বেড়াতে লাগলো! আর আমি তোমার জন্তে ছোটো ইউরোপীয়ান্ গবর্ণেস্ রেখেছিলুম।”

বিক্র-কণ্ঠে কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল, “বাবা!”

কিন্তু বিরক্ত বৃদ্ধ সে ডাক আমলে আনিলেন না, মনের খোঁকেই বলিয়া বাইতে লাগিলেন, “এ বাপু তোমার বাড়াবাড়ি! কেন, চলবার ভাবনা তোমার কেন? সে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমিই কেন ভাবি না? তার পর তুমি তরুণকে বিয়ে করলে তোমার আবার ভাবনাটা কি? ম্যাজিষ্ট্রেট্ থেকে সে ছ’দিনে কমিশনার হয়ে যাবে, খাশা ছেলে সে। তা’ ছাড়া ওদের জমাদারী আছে। মাসে দু’তিন হাজার হিসেবে বোধ হয়, ওর অংশে নিটু আয়। তুমি এই বয়স থেকে অত হিসেবী হ’লে ওর মানমর্যাদাই বা রাখবে কেমন করে? লোকে যে তোমার ছোট-লোকের মেরে ব’লে ঘেঁষা করবে। নাঃ, তোমার ও-সব ছোট চালে চলা চলবে না, বেবি! ম্যাডাম কামাকে তুমি আবার চিঠি লিখে আনিবে নাও। আর সন্ধ্যাবেলাই আগে উঠে ওই তারটা ক’রে দেবে। কি লিখবে জান? ঠিক এই কথাগুলি লিখে দেবে—হোয়াই দিস্ সাইলেন্স? এক্সট্রামলী অ্যাংস্ রিপ্লাই সার্প—কম্ ইমিডিয়েটলী ইফ্ পসিবল্ [চুপচাপ কিসের জন্ত? অত্যন্ত উদ্বেগে আছি। অবিলম্বে প্রত্যুত্তর দিও, ও যদি সম্ভব তো এসো]। কেমন, মনে থাকবে তো? না হয় জে এইখানে ব’সেই লিখে নাও না কেন?”

অনেক দিনের রোগীর মুখ যেমন ক্লান্ত রক্ত-হীন হইয়া পড়ে, এই পরিপূর্ণ বোবনের অটুট স্বাস্থ্য লইয়াও কৃষ্ণার সুন্দর তরুণ মুখটি ঠিক তেমনি করুণ দেখাইল। মনের যে ভাবটাকে সে তাহার এই অন্ধ বৃদ্ধ জীবন্ত পিতার সমক্ষে চাপিয়া রাখিবার জন্ত ক্রমাগত কয় মাস ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছিল, সেটা যেন আর গোপন রাখা যায় না বলিয়াই তাহার মনে হইয়া তাহাকে একান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। মানসিক সংগ্রাম বৃদ্ধ করিবার ■ সে চোট কামড়াইয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, বাপের আদেশের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা কহিল না।

মঃ মল্লিকের তখন আর এক প্রকার সন্দেহ

হইল। তিনি ঈষৎ চকিত হইয়া তাতাতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “বেবি! তুমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করো নি তো? না না, দেখ, সে সব কিছু গোলমাল করে বসে না যেন! দেখ মা! তরুণের মতন সুপাত্র সহজে কি খুঁজে মেলে? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, বড় চাকরে, ধনী আবার তোমা-অন্ত প্রাণটি তার! কেবল ঐ একটি দোষেই সব মাটি ক’রে রেখেছে। সে হতভাগা মেয়েটা ম’রে যে কবে ওকে মুক্তি দেবে, তা কে জানে! তা না হ’লে তো যত দিন থেকে ওর সঙ্গে এ বিষয়ের পাকা কথা দিয়ে রাখা হয়েছে, বিয়ে হ’লে তো এত দিনে তোমার দু’চারটি ছেলোপিলেও হ’তে পারতো। তা দেখ, যদি কিছু মন-কষাকষি হয়ে থাকে তো তুমি জ্বালোক, তোমারই মা আগে হ’তে নরম হওয়া দরকার। যাও, কাগজ-কলম এনে বেশ ক’রে একখানি চার পাঁচ পাতার চিঠি লেখ। আর ঐ তারটুকু ক’রে দাও, নিশ্চয় তার রাগ প’ড়ে যাবে। সে তেমন ছেলেই নয়।”

কৃষ্ণা তথাপি একটি কথাও কহিল না, নড়িল না, যেমন তেমন দাঁতে চোট চাপিয়া হাতে হাতে বাধিয়া কাঠের পুতুলের মতন স্থির চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার উপরে যে দারুণ ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, সে কথা সে অনেক আগেই বুঝিয়াছিল এবং সে জন্ত সে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এই অনন্তসহায় দুর্বলচরিত্র, অক্ষম অন্ধ পিতা তাহার; তাহার অবাধ্যতা, তাহার বিজ্ঞোহ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন; ইহার অনিবার্য ফলে উদ্ভতপ্রায় ভাষণ জীবন-সংগ্রামের কঠোর অংশ কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন; তাই ভাবিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া রহিল।

এ দিকে ডাক্তার সাহেব তথাপিও কণ্ঠার সম্মতি না পাইয়া এবার কিছু বিরক্ত কিছু বিপন্ন-ভাবে ঈষৎ করুণ-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন—“বেবি! বেবি! বোকামী ক’রে সব নষ্ট ক’রে ফেলিস্ নি। তোর যতই রূপ-গুণ, বিদ্যে-বুদ্ধি থাক, তোর বাপের টাকা নেই। দেখ্‌ছিস্ না—কি যে, আমাদের সমাজের ছেলেরা বড় অভিভাবক বা টাকা না পেলে বিয়েই করে না। ও তোকে ভালবাসে, ■ আমাদের ঘরের খবর সবই জানে, এমন কি, আজ পর্যন্ত আমি ওর কাছে প্রায় হাজার পাঁচশেক টাকাও ধারি, এ রকম সময়ে তুমি যদি ওকে চটিয়ে দাও, কি রকমটা হবে বলো তো?”

কৃষ্ণাকে কে যেন চাবুক তুলিয়া সজোরে



মারিল। এমন করিয়াই সে চম্কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখ দিয়া বিলাপ-আর্তনাদের মত বাহিরে আসিল—“উঃ, কি করেছ! বাবা! বাবা!—” বাহিরের চাঁদ উর্ধ্বে উঠিয়া উজ্জলতর কিরণধারায় সারা বিশ্বের অন্ধ আলোর পিচ্-কারীতে ভরাইয়া দিতেছিলেন। সেই রক্ত দেখিতে রক্ত-পাংগল কাব্য-রসিক দশ জনকে ডাকাডাকি বাধাইয়া কোকিল-পাণিরার তো গলা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই চাঁদের আলোর ডুবিয়া গিয়াও কক্ষের হঠাৎ মনে হইল, তাহার চারিদিকে কি নিবিড়—কি হুশ্ছন্ন—কি বিপুল অন্ধকার! আর তাহাকে ইহারই মধ্যে এ জনের মত—হয় তো বা চিরজন্ম-জন্মান্তরের মতই ডুবিয়া থাকিতে হইবে! তার উদ্ধারের কোন আশাই যেন এই অসীম বিস্তৃত অন্ধকার-সাগরের তলদেশ খুঁজিয়া পায় না। তার সারা প্রাণ যেন কিসের একটা অজানিত মহাতরে আড়ই হইয়া উঠিল। তার নূতন জাগরণ-উষার সোনালী আলো যেন বর্ষার ঘন মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

### দশম পরিচ্ছেদ

পর দিন বাপের আদেশমত একখানা তার সে মিঃ লাহাকে পাঠাইল; কিন্তু তাহাতে তাহার আদেশাণুযায়ী ঠিক ঠিক কথাগুলি লিখিতে সে কিছুতেই পারিল না। “বাবা তোমার সংবাদ চান,”—এইটুকুই সে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। উত্তরে ইহারই জবাব পাওয়া গেল,—“তাকে জানাইয়াও আমি ভাল আছি।”—টেলিগ্রামখানা হাতে করিয়া আসিয়া সে বাপকে বলিল, “যশোর থেকে খবর এসেছে।”

“এসেছে!” বলিয়া বৃদ্ধ এমনি বালকোচিত আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন যে, বোধ হইল, যেন, তিনি তাঁর সব চেয়ে দামী হারানিধিটি আবার ফিরিয়া কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না হোক তবু দশবারও এই তারের জবাব আসার খবর তিনি উৎকণ্ঠিত উদ্যোগে ডাকাডাকি বাধাইয়া লইয়াছেন ও প্রত্যেকটি বারের জিজ্ঞাসার শেষে ব্যর্থতার নিরাশ্রমে বুকটি তাঁহার আধহাত করিয়া দমিয়া গিয়াছে। সে দেখিয়া কক্ষের

মধ্যে যে কি বাড়ই বহিতেছিল, সে শুধু সেই জানে। এক-দিকে তাহার নবোন্মেষিত হৃদয়বেগে পরিপূর্ণ নবজীবন। নূতন স্বপ্নলোক, নব-জাগরণ উষা, নবীন আশাপ্রবাহ,—তার আত্মগৌরব, আত্মপ্রতিষ্ঠা, তার উদ্বোধিত শক্তির একাগ্র সাধনা! আর অপর পক্ষে তাহার এই সুখবিলাসের অপরিণাম অপব্যয়ে নিঃস্ব ফতুর, অথচ চিরাত্যস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দু ত্রুটি সহিতে একান্ত অসমর্থ ও অসহিষ্ণু অন্ধ পিতা! কোন্ পথ সে অবলম্বন করবে, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিবে, ভাবিয়া সে যেন কোন কূল-কিনারাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এত দিন সে যে নিজের আশৈশবের সকল অভ্যাসের শক্তি একটার পর একটা করিয়া বিধাপ্ত সর্বল হস্তে কাটিয়া কেলিয়া নিজেকে মুক্ত করিতেছিল। অর্ধশত ধনি-গৃহের ধারকরা ঐশ্বর্য প্রাচুর্য কঠিন করে চূর্ণিত আস্বাবের মত পথের ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া নিজের সুখলালিত ঐশ্বর্য-মণ্ডিত শরীর-মনের উপর সে যে কৃচ্ছ-সাধনের গৌরব-দাপ্তি অমূল্য করিতেছিল এবং সেই গুঢ় তপস্তার বলে অমুপ্রাণিত হইতে হইতে ভবিষ্যতের বিষয়েও নিজের কর্তব্যও সে যে কি বিখ্যস্ত-মনেই স্থির করিয়া কেলিয়াছিল, গত রাতে পিতার একটি কথার ঘরে তাহার সেই সাক্ষান বাগান এক ঝলক তপ্ত হাওয়ার স্পর্শের মতই এক নিমেষে শুকাইয়া দিয়া গিয়াছে। গত রাত্রি হইতে তাহার নূতন-গড়া জীবনের ছায়াচিত্র শূন্যে মিলাইয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে আবার সে পুরানো ছবিখানা ফোটো ফোটো হইয়া উঠিতেছিল, লজ্জায় ও ভয়ে কক্ষা সেখানার দিকে আর ভাল করিয়া যেন চাহিয়া দেখিতেও সাহস করিতেছিল না। বারম্বার বুক খালি করিয়া করিয়া দীর্ঘশ্বাসগুলো উঠিয়া আসিয়া এই কথাই তাহার কানে কানে বলিয়া যাইতেছিল যে, যাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা আর কখনই জোড়া লাগিবে না। এত দিন যে নিজেকে না বুঝিয়াই তাহার সহিত নিজের জীবনটাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সে এক রকম স্বপ্নের ঘোরের মত ভুলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এখন, এখন সে তক্ষা ছুটিয়া গিয়াছে, তখন আর কেমন করিয়া সে একটা লজ্জাকর ভ্রমের পশ্চাতে, একটা হীনতাপূর্ণ অগৌরবের অস্ত্রভাগে ধরিয়া রাখিয়া নিজের

সমস্ত নারী-মহিলাকে ধূলাবলুণ্ঠিত হইতে দিবে? আর তো সে তা পারে না। সে যে আজ বড় স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এত দিন যে মায়ার রঙ্গিন নেশায় তাহার অভিভাবকের হুকুমে তাহার ভবিষ্যৎকে সে সাজাইয়া রাখিয়া দেখাইয়াছিল, এখন তাহার পক্ষে শুধুই সেটা মক-মরীচিকার মত স্বপ্নমাত্রই নয়; তেমনি শুষ্ক ও কঠোরও বটে। অরুণচন্দ্র আজ দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া তাহার কর্ণকূহরে যে প্রেমের বন্দনা গান প্রতিনিয়ত শুনাইতে শুনাইতে তাহার চপল কিশোর চিত্তকে তাহারই অভিমুখে টানিয়া লইতেছিল, অকস্মাৎ একটি দিনের সামান্য একটুখানি পরীক্ষায় সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া জানিতে পারিল যে, সে আকর্ষণটা মোটেই তাহার অন্তরস্পর্শী হইতে পারে নাই। জলে-ভাসা পানার মতই সে শুধু উপরে উপরেই ভাসিয়া বেড়ায়, মূল যে তাহার কি রকম আলগা, সেই বুঝিয়া মনের মধ্যে সে অত্যন্তই ভীত হইল। তার পর আর একটা ব্যাপার ঘটিল। এত দিন সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ও অত্যধিক ঐশ্বর্যের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে: যে সমাজে আহার বিহার আচার ও ব্যবহার সমস্তই জাগতিক সম্পদেরই বাহ্য-আড়ম্বরের মধ্যবর্তী; সেই আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় নরনারীর সাহচর্যেই তাহার জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সেখানে বসিয়া তাই মিস: লীহাকে কোন দিনই তাহার বিসদৃশ ঠেকে নাই। যে সমাজের অধিকাংশ মেয়েরাই বিলাত-ফেরত, বিশেষতঃ ম্যাক্সিয়েট্ট স্বামী পাওয়ারকে নারী-জীবনের চরম প্রাপ্তি বোধ করিয়া থাকেন; সেখানে বসিয়া অন্তের ঈর্ষ্যার চক্ষে নিজের ভবিষ্য মৌভাগ্যকে সেও খুব বড় করিয়াই দেখিয়াছিল। তার উপর তরুণের ঘরে টাকা আছে, বুনিয়াদী বড় ঘরের বধু হইতে এ সমাজের মেয়েদের দু-একটা সুযোগের খাতিরে লোভটা বিলম্বই থাকে, কৃষ্ণারও ছিল। অর্থ-স্বচ্ছন্দতা এবং সেকালের সেই সব ছন্দ হারা মতি একালে যা হাজার হাজার টাকা দিলেও সম্বল মিলে না, বনেদী-ঘরে পড়িলে সেইগুলো পড়িয়া মেয়েমানুষ হওয়াটা সফল করিয়া লওয়া যায়।—কাজেই বহুতর বন্ধ বৎসমাজের অনূঢ় কস্তার প্রার্থিত বর তরুণচন্দ্রকে এত দিন মিস: মল্লিকের মনে না ধরিবার বড় একটা কারণও দেখা যায় না। আর যে সস্তবড় বাধাটা তাহাদের

মিলন-পথের প্রহরী হইয়া মাঝখানে লাঠী তুলিয়া খাড়া হইয়াছিল সেই দুর্ভাগ্য বাবধানটার অন্তত বোধ করি কৃষ্ণার ঐ পাত্রটিকে তাহার সকল পাণিপ্রার্থীর চাইতে বেশী পছন্দ হইয়াছিল। বাহির হইতে ইহার সহিত একটা ভবিষ্য সম্বন্ধের আভাসে উত্তরপক্ষই নিশ্চিত রহিল, অথচ ভিতর হইতে কাহারও কোন দাবী-দাওয়া রহিল না, স্বাধীন-সন্তার বিলোপ ঘটিল না। এই বা এক রকম মন্দ কি?

কিন্তু মন্দ যে কি, সে অদূর-ভবিষ্যতেই এক দিন প্রমাণ হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনাজালে জড়িত কৃষ্ণার নব-জাগ্রত মন নিঃসন্দেহেই অসুভব করিয়া বসিল যে, সে তরুণচন্দ্রকে ভালবাসে না, এবং এমন কি, কোনও দিনেও বাসিতে পারা অসম্ভব!—মাথার উপরে তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি নিয়তি-পরিচালিতের মতই নিজের মনের সে অদম্য উচ্ছ্বাসকে সে কোন মতেই প্রতিরোধ করিয়া উঠিতে পারিল না, ভাবের উচ্ছ্বাসে কঠোর বাস্তবকে সে আশ্রয় করিতে না পারিয়া যে অমৃতস্পর্শে 'নবজাত' হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অমৃত-স্রোতেই নিজেকে ভাসাইয়া দিল। নিজের সমস্তকে সে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িল এবং দেখিল, তার মধ্যে আর তার সে পরিত্যক্ত পুরাতনের কিছুই আর খাপ খায় না।

ডাক্তার মল্লিক ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “কি লিখেছে যে তরুণ? কি তার করেছে পড়তো শুনি?” সংক্ষিপ্ত বার্তাটুকু শোনা হইয়া গেলে মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া উঠিলেন, “এ কি রকম হলো! তুমি তাকে আস্বার কথা লিখলে, আর সে যে তার জবাবটি পর্যন্ত এড়িয়ে গেল, এটি তো ভাল লক্ষণ বোধ হচ্ছে না বেবি!”

কৃষ্ণা ডাক্তার-সাহেবের সহিত লক্ষণের ভাল-মন্দ লইয়া কোনই উত্তরপ্রত্যুত্তর না করিয়াই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিল। জানিত, তর্কাতর্কি করিতে বাওয়া বুঝা। তা ভিন্ন সে বাধ্য হইয়া নিজের বাপকেই ছলনা করিতেছে—এটা তাহার সারা চিত্তকে একান্তই পীড়িত করিতেছিল, এই বেদনার স্থানকে নাড়া-চাড়া করিতে তাই তাহার ব্যথিত অন্তরও সায় দিল না।

যেয়েকে চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া এ দিকে কিন্তু মেয়ের বাপের মনের সন্দেহ ও তুসঙ্গিক বিরক্তিতাও প্রবলতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাহার অন্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধিনীর অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া তাঁক



মাঃস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন, “কি যে তুই কাণ্ডটি ক’রে বসলি বেবি! তার আমি যদি কিছুটি বুঝতে পারিচি! তা না হ’লে সেই ছেলে, তোমার নাম করতে যার গলার স্বর কেঁপে ওঠে,—সে কি না তুমি আসবার কথাটি লিখতেও তার জবাব দিলে না! নাঃ, তুই আমার ভাবালি বেবি! কোথায় ভেবেছিলুম, বাকী দিনক’টা একটু নিশ্চিন্ত হবো। তা নয়, নিজের তো আমার এই দশা হলো, আবার এর উপর আইবড় এক ধেড়ে মেয়ের জন্ত রাত্রিদিনই ব’সে ব’সে ভাবতে হবে। নাঃ, অস্থির করেছে দেখছি!”

কৃষ্ণা পাথরের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বাপের এতটুকু কথা কখনও তাহার সহিত না, আজ এতবড় লাঞ্ছনাটাও সে নিঃশব্দে হজম করিয়া লইল।

মল্লিক-সাহেবের বিরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, “বেবি! শুনতে পাচ্চিস আমার কথা! একুনি তুই আর একখানা তার শীগ্গির ক’রে দে। এতে লেখ—“একটি মল্লি রিপেন্টেন্ট কর্গিড্ এণ্ড কম্ অ্যাঙ্ক্ সার্প্ অ্যাঙ্ক্ পসিবল্।” [নিরতিশর অনুতাপিত হইয়াছি, ক্ষমা করিয়া যত সম্ভব আসা সম্ভব আসিবে]। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরও একটুখানি এই রকম যোগ ক’রে দিলে মন্দ হয় না—”

বাস্তবিকই কৃষ্ণা আর সহ্য করিতে পারিল না, সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অশ্রু-বৃষ্টি-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“বাবা! বাবা! একটা অনিশ্চিত সুদূর-ভবিষ্যতের আশার ভুলে তুমি আমার মান মর্যাদা সমস্তই ঐ লোকটার হাতে তুলে দেওয়াচ্ছো, এ কি ভাল করছো?”

মল্লিক-সাহেব অবাক্ আশ্চর্য হইয়া গিয়া দৃষ্টিশূন্য হই চোখ কপালের দিকে টানিয়া তুলিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ভাল করচিনে! কিসে মন্দটা করছি শুনি? তোমার সমস্ত মান-মর্যাদা তরুণের মত বড়লোকের ছেলে—একটা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌দস্ত হয়ে থাকার দরুণ নষ্ট হচ্ছে কি রকম ক’রে? সেইটুকু শুধু বুঝিয়ে দিতে পারবে? আর ভবিষ্যতের আশা! সে জিনিসটা কি একটুখানি স্পষ্ট ক’রে বলো তো?—ওঃ, ওর সেই আধমরা বউটোর কথা বল্চো বুঝি?”

কৃষ্ণা তাহার অন্তর-বাহিরের অন্ধ পিতার সহানুভূতি প্রাপ্তির ক্ষণিক দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, “হুঁ।”

“ওঃ, সেই জন্ত তুমি বিরক্ত হচ্ছে? তা সেটাকে তো খুবই অস্বাভাবিক বলতে পারিনে! তোমাদের বয়সে ও-রকম অসহিষ্ণুতাটাই যে স্বাভাবিক। এত দিন ধ’রে যে তুমি সেই পাগলীর মরণ-প্রতীক্ষায় ওকে কি ক’রে ঠেলে রেখে দিয়েছ, সেইটেকে তো আমার চোখে নেহাৎ পাকাময়ী ঠেকছিল। তা হ’লে এক কাজ করা যাক, সমাজের লোকে হাসে তার আর হবে কি?—তোমাদের হিন্দু-বিবাহ হ’লেই সব দিক দিয়েই সকল গোল মিটে যার। আচ্ছা, ওকে তুমি আসতে বলো, তুমি না পারো আমিই তাকে এ কথা বলবো। আর বত শীঘ্র সম্ভব, বিয়েটা চুকিয়েই ফেলবো। আমাদের পক্ষে বাধা তো আর নেই এতে, তবে লোকের কথা!”

মেয়ের মনের কথায় বিপরীত বুঝিয়া মল্লিক-সাহেব এক দিকে ঘেমন হুট হইয়া উঠিলেন, অপর পক্ষে বাপের এই বিষম সান্দ্রনাবাক্যে কৃষ্ণার অন্তরের সমস্তটুকু বগ-ভরসা যেন কোথায় উড়িয়া গেল। বন্ধোবিদ্ধ লুপ্ততা বিহঙ্গীর মর্দ-কাতরতার মতই সে অত্যন্ত যত্ন আর্ন্ত-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, “না, বাবা! তা বলো না, সে আমি পারবো না, মেয়ে ফেললেও পারবো না।”

“তবে তুমি চাও কি? কি তোমার মতলব, সেইটাই বেশ স্পষ্ট ক’রে ব’লে ফেল না হয় শুনি?” কৃষ্ণা কথা কহিল না।

“তুমি চাও, তরুণের সঙ্গে মিথো একটা খিটি-মিটি বাধিয়ে তাকে তুমি ছেড়ে দেবে। একে তোমার বিষম একগুঁয়েমীতে তার ধৈর্যের বাধ কত দিন বাধা থাকবে, তা কিছুই বলা যায় না, কারণ, হিন্দু-ধর্মে মেয়ের অভাব নেই। শুধু সে তোমার ভালবেসেই তোমার জন্ত অপেক্ষা করচে।—তার উপর যদি কিছু অনিষ্ট আচরণ ক’রে থাক, আর তার ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে না নাও, তা হ’লে তোমার ভবিষ্যৎ যে সর্বনাশের বেড়া-আঙুনে জলবে, সে আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তরুণের কাছে আমার পঁচিশ-হাজার টাকা দেনা, সে তোমায় বলেইছি। তাতে এক পরসাত্ত সে সুদ নের নি; কিন্তু এই বাড়ী বাধা দিয়ে সে অল্প লোকের কাছ থেকেও যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিইয়ে দিয়েছিল, সুদে সুদে সেটাও প্রায় সমস্ত আশী হাজার কি আরও বেশী হয়ে উঠলো। সব তরু জড়িয়ে দেড় লাখ হবে, বোধ হয়। আর যে ক’রে

ছাড়তে চাইচো, আমার হাত ধরে দাঁড়াবে কোথায় বল তো শুন? দেখ, ও-সব মতলব ছাড়, তোমার উপর আমি অনেক টাকাই খরচ করেছি, ঢের ভরসাই আমার ছিল; ভগবান আমার মারলে, তুমি গুরু আর মেরো না। যাও, ওঠো,—তারিট ভাল ক'রে শুছিয়ে লিখে পাঠাও গে, বেশ বড় ক'রেই না হয় লেখ, না হয় দশ-পনের টাকাই খরচ হবে। অত কল্পনাই করবার কোন দরকারই নেই, তরুণের স্ত্রী হ'লে তোমার পরমার চুখ পেতে হবে না। ই্যা যাও, আর আমার এক গ্লাস স্ট্রাম্পেন দিতে ব'লে যেও। আঃ—তোমার সঙ্গে ব'কে ব'কে আমার মাথা ধরে উঠলো দেখছি! তোমার মা ছিল এক জন লেডী,—তুমি তার পেটে জন্মে কোথেকে যে এমন ইতুরে নজর পেলে, তাই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। অ্যা!”

### একাদশ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলাকার ডাকে যশোহর হইতে একখানা মোটা খামের চিঠি কৃষ্ণা মজিকের হাতে আসিল। অনেক বৎসর ধারয়াই তো আসে, কিন্তু ইতঃপূর্বে এই লেখকের পত্র-সম্বন্ধে তাহার চিন্তে উপেক্ষা বা প্রতীকার ভাব কোনটাই খুব বেশী প্রবল ছিল না যে, সেটা আজিকার এই পত্রখানা হাতে পাড়িতেই সে বেশ স্পষ্ট করিয়া সেটা জানিতে পারিল—চিঠি ইংরাজীতে লেখা, তার ভাবার্থটা এই। আমার প্রিয় বেবি!

তোমার হুঁখানি টেলিগ্রামই পাইয়াছি। তোমার বাবা আমার সংবাদের বিশেষ উৎসুক, সেটা তাঁর পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তুমি নিজেও যে তাঁর দোস্তের মাঝখানে একটুখানিও গোপন অংশ লও নাই, এমন অসঙ্গত কথাটা আমার জোর করিয়াও কেহ বিশ্বাস করাইতে পারিবে না! তোমার দ্বিতীয় তারের খবর 'তুমি না বলিয়া চলিয়া যাওয়ার বাবা বিশেষ দুঃখিত, সুবিধা হইলেই তোমাকে তিনি আসিতে অনুরোধ করিতেছেন।'—এর মধ্যেও যে আমি তোমার লজ্জা-প্রচ্ছন্ন অন্তরের সুগভীর আবেগ-ভরা আমন্ত্রণ অনুভব করিয়া পরম সুখে অভিভূত হইয়া রহিলাম।

বেবি! তোমায় না দেখে এবার যে হঠাৎ

চ'লে এসেছি, তার জন্তে ক্ষমার পর ক্ষমা চাইলুম। সত্যি বেবি! মনে বড় অভিমান তৈরিছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিলুম যোধ হয়, না? তুমি ছেলে-মানুষ, সব সময় নিজের মনটাফেটে নিজে তো বুঝে উঠতে পারো না। বিশ্ব-সংসার এ সময়টার তোমার কাছে একটা ছেঁয়ালীর মত জটিল, ছায়া-বাজীর মতই ক্ষণপরিবর্তিত। নানা রকমের উত্তেজক উপভাস আধুনিক দেশী-বিদেশী হজুকওয়াল। নিকোদেহ ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তোমাদের চোখে হঠাৎ এক একটা কল্পনার গন্ধর্ব্ব-লোক সৃষ্টি ক'রে তোলে। আর তোমরা দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অমনি রাতারাতি কেউ বা যীশুখ্রীষ্ট, কেউ বা খান্সর রানী লক্ষ্মীবাই হয়ে উঠতে ছুটে যাও।—কিন্তু ও-সব ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখাই সব চেয়ে সুবিধে, বরং এর ছ'একটা উপভাসের পল্টু ক'রে নেওয়াও চলে, তবু বাস্তব-জীবনে এর কোনই সুবিধা বা সাধকতা যে নেই, এটা খুবই সত্য। যাই হোক, আমার ছোট্ট কিশোরটি, আমার শিশু-শাস্ত্র বেবিটি যে নিজের নভেলী-খেয়াল ত্যাগ ক'রে তার নিশ্চয় অনাদরে জীবন-সাধকের পানে আবার চোক দুটি তুলে চেয়েছেন, এই তার পরম-ভাগা! সে দৃঢ়রূপেই জানতো যে, এ দুদিন তার বেশীক্ষণ থাকবে না, আর সেই সুসময়েরই প্রতীক্ষায় সে তার চির-অভ্যন্তর সহিষ্ণুতা নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল। সে জানতো, তার স্বপ্নলোকের রাণীটি তার মরীচিকা-পূর্ণ স্বপ্নবালী ভুলে আবার শীঘ্রই সত্য ও সুন্দর জাগ্রতাবস্থায় ফিরবেই, আর তার বুদ্ধিমান ও স্নেহময় বাপও তার এ প্রত্যাবর্তনের সহায় হবেনই হবেন।—যাই হোক বেবি! এমন আনন্দের পাত্রটি আমার কানায় কানায় আমি এই মুহূর্তে ভরিয়ে নিতে পারলুম না, এইটুকুই বড় আপশোষ থেকে গেল। তোমার পায়ের তলায় বসে [আমার পক্ষে এই পরম লাভবান ও অপরিমিত আনন্দ-গৌরবে পরিপূর্ণ] তোমার মনের উদ্বেগটুকুর জন্ত ক্ষমা চেয়ে নেওয়া—সে আমার মনভাগ্যে ঘটে উঠলো না। ছুটি তো এখন একেবারেই নেই, এক দিনের জন্তও জেলা ছেড়ে যাবার মোটেই এখন উপায় নেই আমার। এখানে স্বদেশী-প্রচারের হজুকটা বড়ই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে, একবেলার জন্তও চ'লে গেলে, যদি কিছু ঘটে তো চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে। তোমার বাবাকে স্বতন্ত্র পত্র দিয়েছি, তাঁকে পড়ে শুনিও।

তোমার চিরানুগত—তরুণ।



মিঃ মল্লিকের পত্রখানার এর চাইতেও অনেক বেশী বিনয়-নম্রতার সহিত তাঁহাদের দিন-কয়েকের জন্ত যশোহরের বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে যে তাঁহার চিরভৃত্য ও একান্ত স্নেহাস্পদ সন্তানকে কত বড় আনন্দ ও গৌরব দান করা হইবে, তাহা লেখনী-মুখে জানানই যে অসম্ভব! আর এই অনিবার্য বিচ্ছেদে যে বেবির চিত্তও ক্রিষ্ট হইয়াছে এবং এ মিলনে যে সেও নিরতিশয় সুখী হইবে, এ আভাসও এ পত্রে অতিশয় সঙ্গপণেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর একটা কথাও উল্লেখ ছিল। সেটা এই—“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার হতভাগিনী প্রথমা পত্রীর দীর্ঘ-জালা শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া পূর্ণ শান্তি-লাভের আশা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, আর তিন চারি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার অভিশপ্ত জীবনের শেষ হওয়ার সম্ভব। অতএব আর দীর্ঘকাল বোধ হয় আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।”

আপনার বিশ্বস্ত ও বিনীত ভৃত্য—তরুণ।

পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একটা দীর্ঘ—দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ-মধ্যাহ্নের আশুনে-ভরা ঝড়ের মতই কক্ষার তপ্ত বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিত হইল। সে সেই স্থানা চিঠি কোলে করিয়া—মরা ছেলে কোলে করিয়া মা যেমন করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি তার মুহমান হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সন্তো-জাগ্রত সমস্ত আশা, তাহার অন্তরের সমুদয় সঞ্জীবিত স্বধারস যেন এই সঙ্গে কে জোর করিয়া মোচাকের মধুর মতই নিঃস্রব করে নিঙড়াইয়া লইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এই চিঠি বাপের হাতে পাড়লে তার পর তার ভাগ্য কোন্ পথের পথিক হইবে, সে কি আর তাহার জানা নাই! যশোহরের নিমন্ত্রণ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। সেখানে সর্বদা তাহার চোখে চোখে কাছে কাছে থাকিয়া তাহার প্রণয়-নিবেদনের সহস্র খুঁটিনাটি তাহাকে সহিতেই হইবে, উপায় নাই। কিন্তু আজ সে প্রেমের প্রলাপ-ধ্বনিতে যে তাহার বিহ্ব-হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে। তাহার কাতরাচিত্ত পাগল হইয়া পলাইতে চাহিবে, সে তাহাকে ঠেকাইবে কি দিয়া? এত দিন সে উহাকেই নির্বিচারে নিজের ভবিষ্যৎ স্বামী মনে করিয়া উহার কাছে একজুনো-চিত আদর-আল্লাস করিয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে তাহার দিকু হইতে এমন কোন প্রেমের

নিশানা প্রদর্শিত হয় নাই, বাহার স্মৃতি তার কোমর-চিত্তে এক বিন্দুও সঙ্কোচের লজ্জা আনয়ন করিতে পারে; কিন্তু সে পক্ষ হইতে যে অজস্র প্রণয়-স্মৃতি ও তার সঙ্গে সমান ওজনে মাপিয়া অনন্তসাধারণ হীরা-মতির উপহার তাহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে, সে তো নিজের জিনিস মনে করিয়াই দ্বিধাহীন সানন্দচিত্তেই সে সব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে ক্রটি করে নাই! এই অপরিমিত অপরাধের কা লমা মুখে লইয়া আজ কোন্ মুখেই বা সে তাহার সেই উৎসাহপ্রাপ্ত যত্নে বর্দ্ধিত উদ্যম আশালতার মূলে বিমূঢ় চিত্তের কুঠার তুলিয়া ধরিবে? আজ নিজের অন্তরেব সত্য তাহার কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে তাহাকে ভালবাসে না,—অর্থাৎ প্রেম বাহাকে বলে, সে জিনিস তাহার হৃদয়-যন্ত্রটাকে কাটিয়া কুচি-কুচি করিয়া ফেলিলেও তাহার মধ্য হইতে উহার উদ্দেশ্যে এক কোটা বাহির হইবে না,—কিন্তু বাহিরটা যে তাহার বালা-চাপল্যের অজ্ঞতাজনিত মিথ্যার জালে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কোথায়? উপায় কোথায়? উপায় কি নাই?

ঘরের পর্দার বাহিরে একটা চটি-জুতার শব্দ হঠাৎ ধামিয়া গেল। সর্ব-শরীর-মনে চমকিত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ-মুখে কক্ষা উঠিয়া পড়িয়া মানসোদ্বেগে দ্রুত-কম্পিত-স্বরে বলিয়া উঠিল—“আমুন!” তাহার কণ্ঠে অকূলে নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির আকস্মিক কুল-প্রাপ্তির সপ্রচুর আশা ও অনির্বচনীয় আনন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল বিনয়।

“বাঃ! আপনি বুঝি আমাদের কাজ থেকে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে ছুটি নিরে যসুলেন? বেশ তো! তা হবে না! চলুন চলুন, আপনাকে না হলে আমাদের তো কিছুতেই চলবে না—”

হাসিমুখে এই কথা বলিতে বলিতে সে কক্ষার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে ধামিয়া গেল, ও জীবৎ অপ্রতিভের ভাবে আস্তে আস্তে বলিয়া ফেলিল—“আমি এ রকম অকস্মাৎ নাদির শার মতন এসে পড়ে হয় তো আপনার অনেক আনন্দের ব্যাঘাত করে ফেলুম, না?—আমার কেমন মন্দ স্বভাব, ঘোঁকের মাথায় কিছুই হুঁস থাকে না।”—এই বলিয়াই সে করুণচক্ষে কক্ষার হাতের মুঠায় চাপিয়া

রাখা চিঠিগুলার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখের ও আলোর আভা তখনই মলিন হইয়া গিয়াছে।

সে দৃষ্টি ও তার সঙ্গে বিনয়ের ঐ অর্থ-নিহিত আশ্র-তিরস্কার কৃষ্ণার মনের ক্ষতে যেন ভীমরুলের ফুটাইয়া দিল, এমনি ব্যাধা-কাতর ব্যাকুল চোখে সে তড়িৎ-বিকাশের ক্ষুধার মতই নিমেষমাত্র উঠার পানে চাহিয়া দেখিল, নিজের মুখের উপকার আতপ্ত-রক্তিম। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সে-ও সে তাহার ভিতরের রক্তোচ্ছ্বাসের দ্রুত উত্থান হইতেই অনুভব করিয়া বিব্রত নতমুখে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া অনিশ্চিত দ্রুতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “না না, আপনি এসে আমার কত যে উপকার করেছেন, সে আপনি জানেন না। আমি এ কটা দিন মোটে বেরুতে পারি নি, আজ যাব ভেবেছিলুম।”—এ কথাটা সে মিথ্যাই বলিল! আজ বাহির হইবে, এই মুহূর্তের পূর্বে সে কথা ভাবিতে সে অবসরও পায় নাই।

শিশু-সুলভ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয় প্রায় নাচিয়া উঠিবার যোগাড় করিয়া তুলিল এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “আপনাকে পেয়ে অবধি আমাদের যে কাজ কতখানি এগিয়ে গেছে, সে জানলে আপনি অবাক হইয়া যাবেন! আপনার নাম শুনেই কত লোক বলতে থাকে, সেই মল্লিক-সাহেবের খুব সুলভী আর ফ্যানানেবল্ মেয়ে! তিনিও এতে যোগ দিয়ে ‘গড়া’ পড়বেন! তবে আমরাই বা না পারবো কেন।—কেউ বলে, তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিসটার মধ্যে সার আছে, শুধুই একটা হজুক নয়! অত সুখী বিলাসী লোক বারা, তারাই যখন এই কচ্ছসাধনের পথে ফিরে দাঁড়াচ্ছে, তখন বিশেষ কোন লাভের আশা না থাকলে, আনন্দ না পেলে, শুধুই অসার কল্পনার পথে ঐ সব বস্ত্রজীবী লোকরা আসবে কেন? ওরা তো বোকা নয়, মূর্থ নয় এবং গরীবও নয়। দেখুন, আপনার এই একটি আদর্শই দেশের ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছেন। আপনার মত আর ছ-চারজন এলে তখন আরও কত সহজ হবে, ভাবুন তো!”

বিনয়ের এই সরল অভিযুক্তিতে তাহার কর্ম-জীবনের সাফল্যজনিত আনন্দরস যেন উপচিয়া পড়িতে গেল, কিন্তু এই অপরিমেয় আনন্দের কাকলী যেন কৃষ্ণার তৃষিত-অন্তঃকরের সব তৃষ্ণা মিটাইয়া তুলিতে প্রচুর বলিয়া তাহার মনে হইল

না। সে অপরিবৃত্ত ঔদাস্তে অথচ একটুখানি স্নান-হাসি হাসিয়া কহিল—“তা হলে আমি আপনাদের ননকো-অপারেশনের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছি বলুন?”

হৃদয়-খোলা সুপ্রচুর উচ্চ হাস্য করিয়া বিনয় উত্তর দিল, “তা একরকম বৈ কি!—” তার পর সেই হাসিমুখেই একটুখানি নিম্নস্বরেও যেন কতকটা আপনা-ভোলা ভাবে সে কহিয়া উঠিল, “তা ছাড়াও আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে বেশ একটু উৎসাহ পাই, আনন্দও পাই। সেটুকু কিন্তু আপ-নার আড়ালে হয় না।—”—আবার সেই প্রকার কলহাস্ত করিয়া উঠিয়া বালকের মতন আগ্রহভরে চঞ্চল হইয়া কহিল—“এই ক্ষুধাই দেবাসুরের যুদ্ধে পরাস্ত দেবসেনাপণের দেবী-আরাধনার প্রয়োজন ঘটেছিল, এবং মহাশক্তিকে সহায় না করা অবধি তাঁদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইতে, তা জানেন?”

কৃষ্ণার সেই টকটকে রাজা গাল যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, বুকের মধ্যেও তাহার ঠিক এই একই রকমে গরম রক্তের তোলপাড় চলিতেছিল;—ঈশ্বরের চাকার ওলায় পড়ার জল যেমন সমুদ্রের মতন কল্ কল্ শব্দ করে, তেমনি করিয়া তাহারও ছুই কানের মধ্যে তাহার নিজের বুকের চেউএর গর্জন শোনা যাইতে লাগিল। একটা শব্দও তাহার সেই শোণিত-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠ দিয়া বহির্গত হইতে সমর্থ হইল না।

বিনয় নিজের মনের উচ্ছ্বাসেই শ্রোত্রীর বিপরা-বস্থায় লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়াই বালগা যাইতে লাগিল।—“কিন্তু দেখুন, একটা জিনিস পাবলিক—এই সাধারণ লোকে ঠিক বুঝতে পারে না—আর আমারও কেমন খটকা লাগে। আপনি এই যে বিদেশী শিল্প, বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জন করবার শপথ নিলেন, কিন্তু যখন আপনি মিসেস লাহা হবেন, তখন কি করবেন? তিনি যে এ দিকে মন দিবেন, সে তো বিশ্বাস করতে পারা যায় না। এই আজকেরই.....কাগজে দেখবেন যে, তাঁর সম্বন্ধে ‘এডিটোরিয়ালে’ কি সব লিখেছে। কাছাকাছি মাঠে বন্দে মাতরম্ বলে চৈতানর জন্তে তিনি না-কি তিন ছোট ছোট ছেলেকে এক মাস করে জেল দিয়েছেন। এক জন আমলা তাঁকে দেখে সেলাম করে নি বলে চাপরাসী দিয়ে তার কান ধরে দোড় করিয়েছেন। তা এই লোককে যে ক্রি ক’রেই আপনি সহ্য ক’রে চলবেন, ও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন, তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, এবং—এবং—”



বিনয় হঠাৎ নিজের অন্তর-উৎসারিত বাক্য-শ্রোত কক করিয়া ফেলিয়া হুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিল,—“আপনার কি অস্থখ কর্চে না কি?”

“হু”—বলিয়াই কৃষ্ণা পাশের চেয়ারখানার উপর এলোমেলোভাবে বসিয়া পড়িয়া চোক বুজিল। যে সমস্তাটা তাহার জীবনে আজ সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে,—বিনয়—এই সরল সত্যবাদী ও নির্ভীক বিনয়,—ঠিক সেইখানেই যে ধাক্কা মারিয়াছিল! উঃ কেমন করিয়া,—সত্যই তো কেমন করিয়া এই দুইটি জীবন-পথের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন লক্ষ্য-পরিচালিত নরনারী একান্তর পূণ্য-লপথ গ্রহণপূর্বক পতি-পত্নীত্ব বৃত্ত হইবে? পরস্পরের আশা উদ্দেশ্য আনন্দ সবই যখন আজ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন কত বড় মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াই তাহাদের বলিতে হইবে যে, আজ হইতে ‘তোমার আমার হৃদয় অভিন্ন!’—কৃষ্ণার সেই প্রভাত স্থল-কমলের মত সরস মুখ নিমেষে স্নান-পদ্মের মতই স্নান ও বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একটা গভীরতর আত্মক্লান্ত সজোরে টানিয়া সেটাকে অবরুদ্ধপ্রায় বকের মধ্যে প্রেরণ-চেষ্টা করিল। নহিলে যেন দম বন্ধ হইয়া ঘাইবার উপক্রম করিতেছিল।

বিনয় এইবার তাহার আগাগোড়ার অদ্ভুত ব্যবহারটাকে যেন নিজের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিয়া ইহার মানাক্রম কারণ করনামাজে সব চেয়ে সঙ্গত ও সহজ যেটাকে তাহার সর্বপ্রথম মনে হইল, ফস্ করিয়া সেইটাকেই সে অসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল—“উঁহু, তা নয়! মিঃ লাহার সম্বন্ধে ঐ সব নিন্দা করার আপনি বোধ হয় চটেছেন! কেমন,—ঠিক ধরেছি কি না?”

বিনয়ের এই শিশুসুলভ অকৃত্রিম সরলতা ও তাহার কণ্ঠের এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অন্তরপ্রাপ্ত বেদনার স্বকারে কৃষ্ণাকে যেন তাহার তলাইয়া-পড়া গভীর অবসন্নতা হইতে এক মুহূর্তেই তুলিয়া দিল। সে এই কথায় চম্ফাইয়া উঠিয়া ঠিক নিজের সহজ অবস্থায় যেন সুপ্তোখিতের মতই ফিরিয়া আসিল, এবং সমুদয় মানসিক সংগ্রামকে একই ক্ষণে জয় করিয়া লইয়া শান্তভাবে কহিয়া উঠিল,—“না, বিনয়বাবু! সত্যকে সহ্য করে নেবার শক্তি আমি পেয়েছি। আর সে আপনার হাতের চাবুক খেয়েই পেয়েছি। আপনার

কথার কোনখানেই কোন রাগ-অভিমানের উপায় নেই; কারণ, এর সবখানিই সত্য! জোর করে উড়িয়ে দিলে, রাগ করলে তা নিয়ে লড়তে গেলেও সত্য কোন দিন মিথ্যা হবে না। অস্বীকার করবো না, আমিও আপনার মতই আমার নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বড় বেশী ভাবনার পড়ছি, আর তারই আমার সকল কাজেই এ রকম এলোমেলো ভাব দেখছেন! যেহেতু জীবনটাই এখন আমার জটপাকান গোলমালে হয়ে পড়েছে।—আচ্ছা, কি করি বলুন তো?”

বিনয় উহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উহার সহিত সমন্বয়ে ও সহানুভূতিতে বিগলিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, এই অপক্লম-চরিত্রা কৃষ্ণার কথা—তাহার জীবনের এই মহাসঙ্কটের ভাবনা—সে নিজেই যে আজ কয় দিন দিন-রাত্রি ধরিয়া না ভাবিয়া পার পাইতেছে না! তাহার প্রতি নিজের অবিচার ধরা পড়িয়াযাত্রা যে অমৃতপুণ্ড বেদনার সে ইহার ‘পরে নিজের অশ্রু অস্তরকে অবনত করিয়া দিয়াছিল, ইহার অত্যধিক দ্রুত উত্থানশক্তি, অপরিণীত ত্যাগ-মাহাত্ম্য, অধাবসার কষ্ট-সহিষ্ণুতা-দর্শনে প্রতি-নিয়ত সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির উৎসে উৎসারিত হইতে হইতে সহস্র-ধারার নিজের সারা-চিত্ত প্রাণ সুধাসিক্ত করিয়া দিয়াই যে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার হস্তস্পর্শে কঠিন কন্দ-ভূমি সরস হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সাহচর্য্যে তাহাদের কর্মোদ্দীপনা শতগুণেই বর্ধিত হইতেছিল। এই শক্তিময়ীকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নিজেদের শক্তিকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ বলিয়া নিজেরাই পূর্ণোত্তমে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই অকাল-বোধিত শক্তি পাছে প্রবল-হস্তে অপহৃত হইয়া তাহাদের নবোদ্দীপিত আশার পিখাটুকুকে নির্দোষিত করে, সেই সম্ভাবনার অমঙ্গল-হেতুকে সে বা তাহারা কেহই বে একবারও ভুলিতে পারিতেছিল না; সেটা আর বিচিত্র কি? তাদের রাহুর মতই সে যে ইহারও পিছনে লাগিয়া আছে।

কৃষ্ণার এই সহজ সাগ্রহ-অভিযুক্তিটুকু তাহার কানেও তাই বড়ই মধুর ঠেকিল এবং ইহাকেও তাহার অকৃত্রিম সাহায্য প্রার্থনা বলিয়াই বিশ্বাস জন্মানয়, সে তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরগত চিন্তা-ধারারই অধুবর্তনে তৎক্ষণাৎ এই উত্তর

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিল, “আপনি যদি মনে বুঝে থাকেন যে, এ বিবাহে সুখী হ’তে পারেন না, তা হ’লে সে বিয়ে করতে যাবেন কেন? আপনারা তো রক্ষণ-শীল সমাজের লোক নন, আর কম বয়সের বাপ-মায়ের দেওয়া বিয়েও তো আপনাদের হয় না। তা হ’লে আর বাধা-বাধকতাটা কার কাছে!”

বিমর্ষ-মুখে হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল,—“দেখতে শুনতে কতকটা উপর উপর তাই বটে, কিন্তু এ সমাজেও মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। অত্যন্ত গরীব বা সামান্ত লোককে মেয়ে যদি হঠাৎ পছন্দ ক’রে ফেলে, তার কর্তৃপক্ষরা তার নিরীচ-চন নিশ্চয়ই যে মঞ্জুর করবেন না, এটা অনেক সময় দেখেছি। তবে সুখের বিষয় যে, মেয়েরা প্রায়ই তেমন বোকা হয় না। যাই হোক, আমার সম্বন্ধে সে ভুল যখন হয় নি, তখন যে আমি এক কথার ছাড়ান পাবো, এমন আশা করতে পারা—” কৃষ্ণা এই সামান্ত দিনের পরিচিত নবীন কর্ম-বজুর নিকট এতখানি খোলাখুলি কথাবার্তা কহিতে গিয়াও আচম্কা যেন কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

বিনয় তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি একবারমাত্র বিষদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেই তাহার সঙ্কট-অবস্থা সবটাই না হোক, তবু যেন বহুল পরিমাণেই অনুভব করিতে পারিয়া তাহার অত্যন্ত বেদনা ও নিজের জ্ঞাত তেমনি একটা নিরা-নন্দতার ডুবিয়া গিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত বিমর্ষ নতমুখে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিল। তার পর সহসা যেন কি একটা আগন্তুক আশা ও আনন্দে, উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া সে প্রায় লাফাইয়া উঠিবার জোগাড় করিয়া সোলাসে বলিয়া উঠিল, “দেখুন! আমি এর একটা পথ পেয়েছি! ‘নন-কো-অপারেসন, এণ্ড নন-ভারোলেন্স্ বট্ প্যাসিভ্ রিজিস্ট্যান্স্’। আপনার এই কেস্টোতেও তাই খাটবে!—কি বলেন?”

কৃষ্ণা এই ছেলেটির কথার রকমে কৌতুক বোধ করিয়া অত হুঃখের মধ্যেও হাসিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ঠোঁটের হাসি ঠোঁটের পাশেই মিলাইয়া বুকের মধ্যে আশার তড়িৎ চকিত হইয়া উঠিল। এই অসহযোগিতার পথই হয় তো তাহার সকল ক্ষেত্রেই অবলম্বনীয় মুক্তির পথ হইতে পারিবে।

মিঃ লাহার লিখিত ডাক্তার মল্লিকের নামের চিঠিখানা চুরি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার কৃষ্ণার মন লোভ-চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও অদূর-ভবিষ্যতে ধরা পড়িবার ভয়েই সেখানা সে বাপকে গিয়া পড়িয়া শুনাইল; শুনিয়া যে বিগতক্ষমী ডাক্তার-সাহেব আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, সে কথা না বলিলেও চলে। কম দিন হইতে দিনের পর দিনেই তাঁহার চিন্তে তাঁহার একমাত্র সন্তান ও অবলম্বন এই মেয়েটির প্রতি গভীর অপ্রসন্নতা জন্মিয়া উঠিতেছিল। সে তাঁহার ছয় জন প্বেবককে ছাড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহার গ্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে তাড়াইয়াছে, তাঁহার খাবারের ফল কমদামী, মাংসর চেয়ে ক্রটির পরিমাণ বেশী ও পানীয়ের মধ্যেও সোডা অধিক ঢালিতেছে, ইহা বেশ জানা গিয়াছে। আর যে কোথায় কি হইতেছে, সে সব অন্ধ বলিয়া তাঁহার দেখিতে পারিবার উপায় নাই। হয় তো তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার সাংসা-রিক ছরবস্তার চিহ্ন তাঁর এই অপরিণামদর্শী মেয়েটার খেরালে দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইবে। তখন লজ্জার তিনি মুখ লুকাইবেন যে কোন্‌খানে, সেই ভাবিয়াই মুখ মাথা তাঁহার ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জলিয়া উঠে।

সে দিন সকাল-বেলাতেই ডাক্তার সাহেবের বিশেষ বন্ধু এবং মিসেস্ করের পিতা মিঃ হাল-দার আসিয়া তাঁহার মনের আগুনে বেশ ছুখানা ইন্ধন জোগাইয়া গেলেন। তিনি আসিয়াই কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এ কি!—তা হ’লে পাঁচ-জনে যা বল্চে, তার তো কিছুই মিথ্যে নয়। বেবি! এ তোমার কি সম্ব? গড়া প’রে খালি পা ক’রে তুমি না কি ছোট লোকদের মধ্যে ‘প্রীচ্’ ক’রে বেড়াও, আমি সে কথা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি; কিন্তু এখন তো স্পষ্টই চক্ষের উপর তোমার সেই বেশই দেখছি। তা হ’লে তুমিও ওই গুণ্ডামের দলে মিশেছ?”

কৃষ্ণা তাঁহার চা তৈরী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া যুহু যুহু অনুযোগ করিল।—“গুণ্ডা তাদের কেন বলছেন জ্যোতামশাই? তারা তো লাঠী-সোটা নিয়ে বেড়ায় না।”

মিঃ হালদার চোক কপালে তুলিয়া ফেলিলেন, “বলো কি বেবি! লাঠী না থাকলেই কি গুণ্ডামী করতে কিছু কম পড়ে? তারা জবরদস্তি লোককে



খদ্দর পরাবে? না হোক অমনি হরতাল ক'রে  
—লোককে আফিস-ইস্কুল ঢুকতে দেবে না, এ কি  
মগের মুলুক পেয়েছে না কি?”

কৃষ্ণা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল, “না জ্যোতা-  
মশাই! মুলুক যে ‘মগের’ নয়, সে বেশ দেখা  
যাচ্ছে। তা—সে যার মুলুকই হোক না কেন,  
দেশের লোককে হাতে-কাটা স্ত্রীতর কাপড় পরতে  
বা তৈরী করতে বলায়, এই অন্ন-বস্ত্র-সমস্তার  
দিনে অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিদেশী জিনিস বর্জন  
করতে জোড়হাতে অমরোধ করার এবং জাতীয়  
ঐক্যতার অমরোধে একটুখানি স্বার্থহানি করবার  
জন্ত উপদেশ দিতে যাওয়ার যদি শুভানী করা  
হয়, তা হ'লে সমস্ত পাশ্চাত্য-জগতের সমস্ত লোক-  
গুলো যে কত বড় বড়ই শুভা, আর এ জগতে  
কাজ সাধ্য নেই বটে, তা হ'লেও এক জন মাত্র  
যার তাদের বিচার করবার শক্তি আছে, তাঁর  
পরকারে ওদের কি না কঠোর দণ্ডই হওয়া উচিত,  
তাই আমি ভাবছি।”

মুখ লাল করিয়া হালদার সাহেব যেন কুই-  
নি-মিক্‌চার খাইতেছেন, এমনি ধরণেরই মুখ-  
খানা করিয়া তা খাইতে লাগিলেন, এবং কৃষ্ণার  
আড়ালে তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া তাহার মর্মান্বিত  
বাপের সহিত অনেককণ ধরিয়াই তাঁহার বেশ  
একটি হস্ত-আলোচনা চলিতে লাগিল। হালদার  
সেই অল্প অসহায় বন্ধুটিকে অনেক উপদেশ ও  
সাহসনা দিয়া তাঁহার এই অসাধ্য অসাধ্য কন্ডার  
সমস্ত শাসনভারই যে এই সময় হইতেই মিঃ লাহার  
হাতে তুলিয়া লইতে দেওয়ার সহায়তা করা একান্ত  
কর্তব্য, এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতাদান করিয়া  
তাঁহার মনের একান্ত বাকি বিধাটুকুও নষ্ট করিয়া  
দিলেন। তার পর চুপে চুপে হুই বন্ধুতে মিলিয়া  
কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইল। তার সার মর্ম্ম  
এই প্রকার;—মিঃ লাহার জীবন্যুতা জী যদি  
এই সপ্তাহে মরিল তো উত্তম, যদি না মরে, তাহা  
‘যেন তেন প্রকারেণ’ কৃষ্ণাকে বুঝাইয়া ইউক, না  
বুঝাইয়াই ইউক, তাহাকে অন্ততঃ হিন্দুবিবাহপদ্ধতি  
অনুসারে তরুণচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফেলা  
আবশ্যক, এবং ইহা করিতেই হইবে।—তাহাতে  
সন্দেহ নাস্তি! বন্ধুবান্ধবেরা প্রথমটার নিন্দা  
করিবে, হয় তো এই মিঃ হালদারও লোক দেখাইয়া  
তাঁহাকে মুখে হুইটা ভৎসনা করিতেও পারেন,  
তাহাতে কি আসিয়া যায়? মেয়েটা তো রক্ষা  
পাইল। তা তির ইহার এই নিদিত আদর্শ

হইতে ইহাদের পাঁচ জনার ঘরের বধু-কন্যাগণও  
রেহাই পাইবে। আর স্বার্থ এবং সুযোগের  
খাতিরে অনেক বড় বড় লোকেই যেখানে মত  
ও আদর্শকে খর্ব করিয়া কন্যা-পুত্রের ভবিষ্যৎমাত্র  
দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন মিঃ মল্লিক আর কোন্  
ছার? এক-জী বর্তমানে হিন্দু-বিবাহ চলে, অত-  
এব হিন্দুই মানি বা না মানি, হিন্দু বলিতেই বা  
দোষ কি? জাতি বা ধর্ম্মের জন্ত তো আসিয়া  
যায় না, সুযোগটাই সকল ক্ষেত্রে সব চাইতে  
পরকারী।

অতএব মিঃ লাহার প্রথম পত্র পাইবামাত্রে সাজ  
সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং তাঁহার দ্বিতীয় পত্র বখন  
চাপরাসী-বাহিত হইয়া আসিল, তখন ‘পর্যন্ত  
ছাড়িয়া সিদ্ধুর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত নদীকে’ যেমন  
‘রোধিতে পারা’ কাহারও শক্তি-সাক্ষেপ নহে,  
তেমনি করিয়া মিঃ মল্লিক ভাবী-জামাত-গৃহোদ্দেশ্যে  
ছুটিয়া বাহির হইবার যোগাড় করিয়া তুলিলেন।  
কৃষ্ণা প্রথমে মিনতি করিল, তার পর অস্বস্তি করিয়াছে  
বলিয়া বিছানায় কবল সুড়ি দিয়া শুইল, তিনি  
চাকরের হাত ধরিয়া সেখানে শুক আসিয়া পড়িয়া  
মহা গোলমাল বাধাইয়া তুলিলেন। তার পর  
চাকরকে সরাইয়া দিয়া ছেলে-মামুষের মতন হাউ-  
মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মেয়েকে বলিলেন,  
“তুই যদি এমন ক'রে আমার এত সাধে বাদ  
সাধিস্ বেবি! তা হ'লে আমি নিজের মাথা  
নিজে কাটিয়ে ম'রে যেতে বাধ্য হবো।—তুই  
কি চাস্ যে তুই ওকে কাটিয়ে তুলে ঐ দেড় লাখ  
টাকার দেনার দায়ে আমার ও পথে বার ক'রে  
দেয়? তোর এখন বয়সের জোর আছে, গায়ের  
রক্ত গরম আছে, তা'তেও তোর দুকপাত না  
হ'তে পারে, কিন্তু আমার যে মনে হ'লে বুক ধ'ম্‌মে  
ধায়! এই ব্যেঙ্গে, এই শরীরে কাণা-মামুষ আমি,  
তার উপর চিরদিন আমি ভাল থেয়েছি, ভাল  
পরেছি, ঐ ‘একটা অভ্যাস’ হয়ে গেছে,—আমার  
কি দশা হবে, তাই বল তো? তোর কি আমার কথা  
মনে ক'রেও কোন মায়া হয় না, দেশ উদ্ধার  
করতে গেলে কি বুড়ো বাপকে মেরে ফেলতে হবে,  
এমন কোন্ নূতনতর বিধান বার হয়েছে?”

কৃষ্ণা ইহার বিরুদ্ধ-যুক্তি লইয়া একটুও তর্ক করিল  
না। তাহার হুহু-গৌরব এখন অসহায়  
অনুপ্রোষায় অক্ল পিতার মর্মান্বিত আবেদনে  
যেন বিধা বিভক্ত হইয়া বাইতেছিল। লজ্জায়  
অনুতাপে তাহার

মধ্যে জাগিতে ছিল। এই বাপের সুসময়ের সকল সুযোগই তো সে নির্বিচারেই নিজের জন্য গ্রহণ করিয়া গিয়াছে; আর আজ তাহার বিচার শীল অম্বর তাহার পুরীভাসকে ঘূণাপূর্বক পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে বলিয়াই কি না—সে সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজের—অসহায় বাপের কথা—তাঁহার লাভক্ষতি, অভ্যাস-অনভ্যাসের সকল ক্রটি পর্যন্ত মমতাবিহীন বিষয়ে নিজের স্বার্থের খাতিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে? এই কি সঙ্গত? সে যে পথকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছে, সে পথে তাহাকে চলিবার চেষ্টা যথোচিতভাবেই করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পূর্বে তার বাপের পথকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া যাওয়া হইবে না। তাঁর সর্বস্বামী সুযোগটুকুকে বাধিয়া দিয়া তবেই সে তার নিজের চক্র সূত্র করিতে পারিবে। এর ■■■ যদি পথ একটু বাঁকা হয়, কিছু বিলম্ব ঘটে, সহিতে হইবে। সে গায়ের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিল এবং নিজের বাঁকা মনকে জোর করিয়া রাশ-টানা ঘোড়ার মতই ফিরাইয়া রাখিয়া সে এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—“তা হ’লে, চলো।”

মল্লিক-সাহেবের মোটর দেখা গেল, রাস্তার পাশেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতীক্ষিত-নেয়ে চাহিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ নিগূঢ় আনন্দের আভাষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; কুমার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখে জ্বলন্ত বিরক্তির ছায়া ফুটয়া উঠিল। সেই লালপেড়ে মোটা শাড়ী এবং তেমনি মোটা হাত-কাটা ফিকা গৈরিক-বর্ণের লালপেড়ে শাড়ীর পাড়-লাগান জ্যাকেট এবং গোটা-কয়েক চাপা ফুলে গাঁথিয়া গড়া ছোট্ট দুখানি পায়ের পাতা বাহির করিয়া শুধু দুইটা চামড়ার চটি-জুতা। কিন্তু গায়ের রংয়ে জামার রংয়ে মিশিয়া গিয়া এত সাধারণ—এত মোটাসোটা পোষাকেও যে তাহার অনুপম লাভ্যাকে কিয়ৎপরিমাণেও স্নান করিতে পারে নাই, এই সঙ্গে সেইটুকুকেও লক্ষ্য-ভূত করিয়া তুলিয়া এই বিপন্ন প্রেমিকের বেশুরা চিত্ত-বোণায় আবার আশারাগিনী বাজিয়া উঠিতেও বিলম্ব ঘটিল না। মন এই কথা বলিয়া সেই সুবোধ ব্যক্তিটিকে সাবধান দিল যে, ‘এ ভাব রবে না চিরদিন’—অতএব এ লইয়া অনর্থক এই জ্বিদের মুখে একটা কার্টান-ছাড়ান করিয়া ফেলিও না যেন? আগে গোড়া বাধিয়া লও, তার পর

সবুরে মেওয়া ফলিতে থাকি থাকিবে না। অতএব ‘কুরু বৈধ্যং’!

মিঃ মল্লিক বিস্তর ছন্দোবন্দে তরুণচন্দ্রের এবারকার না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া আসায় তিনি এবং তাঁহার কত্তা যে মনের মধ্যে কত বড়ই বিষম-বেদনার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষে দুজনে মিলিয়া কি কি করিয়া কোন্ কোন্ কথা বলিয়া তাঁহার ‘পরে’ নিজদের আশ্চর্য্য ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছিলেন, সেই সব কাহিনীই ঝড়! ছুটি ঘণ্টা ধরিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। সেই আশখানা-মিথ্যা ক্লাস্তিকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে তরুণচন্দ্র পুনঃপুনই নত-বদনা কুমার বিরক্তি-বিপন্ন লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ইহার সম্পূর্ণ অবসারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লইলেন! কুমার ভাবতদ্বি যে আজও সেই পূর্ণ বিজ্রোহের অভিযুক্তী হইয়াই রহিয়াছে, এই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে যে তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতেই তাহার পিতা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং এইরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হওয়ার সে যে তাঁহার ‘পরেও খুবই সম্ভট নয়, এ কথাটাও বুঝিমান্ তরুণচন্দ্রের বুঝিতে থাকি ছিল না। মনে মনে ক্ষুধাধীন পরিত্যাগ করিলেন। মনটা যে নবীন আনন্দের গাঢ় পীযুষ-রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবটুকুই যেন নিম্নতরু ছুঁইয়া দিয়া গেল। ‘হু’ এক-বারের দৃষ্টিতেই তাঁহার কয়দিনকার বিমান-বিরচিত সমস্ত-গঠিত সু-উচ্চ প্রাসাদ ভূমিস্তাৎ হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই ভয়ভূতপূর্ণ মাঝখানে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার আশাহত চিত্ত কাতর অর্জুনাদে কাঁদিয়া বলিল, “এই কনকপ্রতিমার কাঞ্চন-গঠিত দেহটা তোর যঃরর মধ্যে তুলিয়া বসাইলি বটে, কিন্তু মনটুকু তার সে কোথায় রাখিয়া আসিল? সেটুকু তো তোর জন্য এ সঙ্গে করিয়া আনে নাই।”—তাঁর বোব হইল, তাঁর বাপের বাড়ী যে দুর্গাপ্রতিমা আনা হইত, এর চেয়ে তার গড়া মূর্তিতেও যেন মানবোত্তর বেশী প্রস্তুত থাকিত। একেই কি সে এত দিনের অবিচলিত সহিষ্ণুতার সর্বস্ব-পণে আপন করিতে চাহিতেছিল?

মনের মধ্যে বড়ই অভিমান হইল, এততেও তিনি এই একটা মনকে বাধিতে পারিতেছেন না। এত দিন তো সে তাহার ভালবাসা আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিদানে,—তা এক জন ভদ্রবরের কুমারী মেয়ের পক্ষে প্রতিদানে



আর কতটুকু দেওয়া সম্ভব? যেটুকু সম্ভব, সে তো কই দিতেও কার্পণ্য করে নাই? তাঁহাকে সে এত দিন ভালবাসিত বৈ কি! তবে হঠাৎ আজ কাল আবার হইল কি? গড়া পরিলে কি মানুষের মনটাও ঐ রকম কঠোর হইয়া যায়? অথবা—আরও কিছু? আর কি কেহ আমার এত দিনের আসন দখল করিয়া—এ আবার কি ভাবনা? আমিও কি জেলাস্ হলাম না কি? ইচ্ছা করে প্রমীলাকে কোন রকম করে—না, আমায়ও সে পাগল করে দেবে দেখছি!

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রকাণ্ড বাংলোখানি পুরাদস্তুর সাহেবী কেসায় আগাগোড়াই সাজান ছিল। যে দিন কৃষ্ণা মল্লিকের নিমন্ত্রণ পত্র এখান হইতে গিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে সাজসজ্জার সবটাই ঘেন তরুণচন্দ্রের চোখে অসম্পূর্ণ ও বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। কড়া হুকুমে রাজমিস্ত্রী ও ছুতার লাগাইয়া সে সরকারী বাংলোখানার ছ'দিনের মধ্যে চূণ-ফেরান ও রং-লাগান সারািয়া ফেলিল। কালেক্টরীর নাজীর ও কয়েক জন পেয়াদার উপর সকল ভার পড়ার হুকুম তামিল স্তোত্ররূপেই হইয়া গেল, বাগানে ফুলের কেয়ার করা হইল, গাছে বিচিত্র আকারে ছাঁট পড়িল, নুতন কয়েকটা বহুমূল্যের আসবাব, তার গোটা-কয়েক লেড'লর বাড়ী হইতে ক্রীত হইয়া ছ'একটা নিজের কলিকাতার বাড়ী হইতে বাহিত হইয়া নবীন্য অতিথির সম্মানার্থ এখানে আসিয়া হাজির হইল। ড্রইংরুম কাঠের টেবিলের বদলে মার্বেল টেবিলে পাঁচশো টাকার ফ্রেঞ্চ কার্ফার্যের টেবিল-বুথ, ড্রেসিংরুমে নিজের যা ছিল রহিল, আর একটা ঘরকে জ্বীলোকোচিত ড্রেসিংরুম তৈরি করা হইয়া গেল। তাহারই জন্ত দুইটা সর্বোৎকৃষ্ট নমুনার আয়না লাগান মেহগির আলমারি, মার্বেল পাথর-বসান মেহগির আরসির টেবিল, আরও ছোট-বড় নানারকমের জিনিসপত্র কিনিয়া আসিল। নিজের শয়ন-গৃহের অবস্থা তাঁহার মোটেই সুসঙ্গত নয়। ঘরজোড়া সতরঞ্চ বিহীন, ঘরের মধ্যে এক-খানা স্প্রিংয়ের গদি-অঁটা লোহার খাট, একটা ছোট ত্রিপদীতে একটা কাঁচের কুঁজার এক কুঁজা

জল, আর কিছুই না। পাশের দিকের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে সেগুলোকে ডাক্তার মল্লিকের নির্ধাচিত করিয়া দিয়া এই বড় ঘরখানাকে তিনি বড় সাধেই সাজাইয়া তুলিলেন। তিন আঙ্গুল পুরু গালিচার ঘরের মেজে ঢাকা পড়িল, মাঝখানে সব চেয়ে হাল-ফ্যাসানের বিলাতী তৈরি জোড়া-খাট, ছান-বিলম্বিত চওড়া কাঠের ফ্রেমে লম্বিত রেশমী নেটের মশারি। খাটের সামনে একখানা সাতফুট লম্বা বেগওয়ারি আয়না এবং ছোট একটা রূপার ফুলদানে মস্তবড় একটা গোলাপের তোড়া। ঘরের পর্দাগুলোও আনকোরা নূতন ক্রাসের আমদানী।

কৃষ্ণা তাহারই জন্ত যত্ন-আহরিত এবং সাদর-সজ্জিত এই সকল বহুমূল্য ও তাহার চির-অভ্যন্ত বস্ত্রজাতের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বুকের মধ্যে কি যে একটা অনিখসিত যন্ত্রণাবোধ করিতে লাগিল, সে ঘেন সেটা ভাল করিয়া সহিয়া, বহিয়াও খেড়াইতে নিজেকে অক্ষম বোধ করিতেছিল। এই যে সব প্রণয়-নিদর্শন স্তরে স্তরে তাহার চারিদিকে বেড়িয়া থাকিয়া সুস্পষ্ট সোহাগে তাহার চিত্তকে ঘেরিয়া ধরিতে চলিতেছিল, ঐ যে ফুল-গন্ধময় বাতাস তাহারই গায়ের উপর দিয়া যে হাতে ইহাদের চরন করিয়া আনিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে সাজাইয়া দিয়াছে, তাহারই হাতের মেহের পরশের মতই বুলাইয়া যাইতেছিল, ঐ যে বিকশিত ফুল-গন্ধ, সে-ও তো সেই তাহারই বুকভরা অমুরাগ সুরতির মতই তাহার বুকের বেদনার তারে স্পন্দিত হইয়া তাহার অন্তরের ক্ষতে লবণাক্ত করিয়া দিতেছিল। জানালার পাশে পাশে বাগানভরা বসন্তের ফুলে ফুলে মোমাছিদের ঘেন তাহারই এই একনিষ্ঠ চিরসহিষ্ণু প্রণয়-বার্তা তাহাকে জানাইয়া দিয়া তিরস্কারের ছলেই গুন্ডগানির আর শেষ ছিল না। ইহার মধ্যেও ঘেন সেই অকুরন্ত প্রেমের গুঞ্জনই তাহার ছই কানের তারে বাজিয়া বাজিয়া তাহাদের বধির করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। চারিদিক দিয়া এতবড় প্রেমের উপাসনা, সে ঘেন তাহার কাছে অপরাধী চিন্তের মধ্যে সহ্য করিতেও পারিতেছিল না। একটুখানি আড়াল পাইতেই সে একেবারে ছুটিয়া গিয়া বাথরুমের মধ্যে ঘর রুদ্ধ করিয়া দিল। সেখানেও চোখ তুলিতেই সেই তাহার হৃদয় মথিত মেহের সমুদ্র চারিদিক দিয়া উধলিতেছে, দেখিতে পাইল। এনামেলের নূতন কেনা প্রকাণ্ড মানের চৌবাচ্চা, প্রকাণ্ড আয়না, প্রসাধনের

কিছু মূল্যবান বস্তু সভা-সমাজে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব, সে সকলি। এমন কি, নতুন কেনা গামছা-তোয়ালেগুলি পর্যন্ত নব-ক্রীত আলনার ছলিতেছে। একখানি মাত্র সবুজ রংয়ের চামড়া-আঁটা চৌকির উপর অবসরশরীরে বসিয়া পড়িয়া সে কাতর হইয়া কাঁদিল।

যখন ঘণ্টা দুই পরে তাহারই জ্ঞাত নব-নিযুক্ত আয়া আসিয়া ঘরের কাছ হইতে তাহার কার্যে সাহায্য করিবার অনুমতি চাহিল, তখন চোবাচ্চা হইতে এক আঁজলা জল লইয়া তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে দিয়াই কৃষ্ণা ধড়-মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, একটিও কথা না কহিয়া হতবুদ্ধি নব-সেবিকার পাশ দিয়া সোজা ড্রইংরুমেই ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে তখন তাহার বিলম্ব দেখিয়া মিঃ লাহা তাহার পথ-শ্রান্ত ও কিছু অসুস্থ পিতাকে চা প্রভৃতি খাওয়াইয়া এখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে একটা স্ন্যাম্পেন গ্লাস ভরিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সেইটি ইচ্ছা-সুখে চাখিয়া চাখিয়া পান করিতে করিতে নিমন্ত্রকের সহিত যুহুযুহু বোধ করি কোনরূপ বিশেষ কাজের কথাই কহিতেছিলেন। পর্দার কাছে আসিতেই এইটুকু কৃষ্ণার কানে গেল,—“দেখ তরুণ! আমি বলি কি, ওকে অত সমীহ ক’রে চল্‌বার তোমার কিছু দরকার নেই। শ্রেষ্ঠ জোর করবে। আমি যখন তোমার দিকে রয়েছি, তখন তোমার ভাবনা কিসের? এই ক’দিনের মধ্যেই আমার ইচ্ছা যে—”

কৃষ্ণার নিকটবর্তিতা কিরূপে বলা যায় না—অসুতব করিয়াই সম্ভবতঃ মিঃ লাহা তাঁহার অস্পর্শ-পূর্বক সতর্ক যুহু-স্বরে কহিলেন, “এখন থাক।”—

কৃষ্ণা আসিয়া দাঁড়াইবারাত্র তাহার দিকে নিমেষমাত্র তীক্ষ্ণ-চক্ষে চাহিতেই তাহার এতকণকার কার্য্য-কলাপ সমস্তই একখানা আয়নার প্রতিবিম্বের মতই মিঃ লাহার মনের চ’খে বিদ্যিত হইয়া গেল। বেশভূষা তাহার অপরিবর্তিত, এ ন কি, মোটরে আসার সময়ে চুলে ও কপালে যে ধূলা জমিয়াছিল, তাহাও ধোত বা মার্জিত হয় নাই। কেবল দুইটি চোকে ঈষৎ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তিন জনের মধ্যে কোন রকমেই কথাবার্তা জমিল না। পথপ্রশ্নে মনের উদ্বিগ্নে অসুস্থ ডাক্তর শীঘ্রই ঘুমাতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া মিঃ লাহা আসিয়া তাঁহার হাত

ধরিলেন, একটু হাসিয়া কহিলেন, “আজকে ঠুঁর সেবার ভার আমারই নেবার কথা।”—তার পর তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তাঁহার জ্ঞাত নির্দিষ্ট শয়ন-গৃহে পৌছাইয়া এক জন ভৃত্যের হস্তে সঁপিয়া দিয়া বোধ হইল যেন উর্দ্ধ্বাসেই বা ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণা ঠিক সেইখানে ঠিক সেই একই ভাবে যেমন তেমনই বসিয়া আছে, উঠিয়া পলাইবার কোন আগ্রহই তাহার সেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে দিয়া প্রকাশ পাইল না। বেথিয়া মিঃ লাহা কথঞ্চিৎ আশ্রিত এবং একটুখানি বিষ্ময়ও পোষণ করিলেন।

সাদা দিবার ভাবে একটু কাশিয়া একটা মোরে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা লাগাইয়া মিঃ লাহা অবশেষে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। “তোমার শোবার ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে, বেবি? বেশী ক্লান্তবোধ কর্‌চো কি? আমারকে ডেকে দিয়ে যাব? না একটু বসবে?”

কৃষ্ণা তাহার ক্লান্ত চোখের তারা ধীরে ধীরে উন্নমিত করিল।—“আমার তো আমার আর দরকারই হয় না, বাড়ীতেও তো আমি এখন আমার মাদ্রাজী আমারটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু একটা হিন্দুস্থানী দাই আছে।—”

মিঃ লাহা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও চূপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “তোমার বাবার শরীরটা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে—দেখছি। তিন নিজেই বুঝতে পার্‌চেন যে, তাঁর হার্ট খুব বেশী দুর্বল হয়েছে।—”

কৃষ্ণা শুধু উত্তর করিল, “বোধ হয়।”—তার পর আবার হুঁজনেই নীরব।

রাত্রি মধ্য বসন্তের, বাহিরে যুহু জ্যোৎস্নায় মন্দ-বায়ু-হিল্লোলে মিঃ লাহার পুপোস্তানে ফুলের মেলা বসিয়াছে। ঐ বাগানের গোলাপ-কুঞ্জের ধারে কত সাধ করিয়াই গৃহস্থামী একখানি মন্দির-বেদি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল, অপরাহ্নে হুঁজনে সেইখানে বসিয়া মঞ্চোখিত অজস্র সাদা ■ হরিদ্রা-গোলাপের শোভা ও সুরভির মধ্যে অন্তরের ভাব-বিনিময় করিবেন, কিন্তু কোথায় বা সেই কাব্যোচিত কল্পনা, আর কোথায় এই কঠোর বাস্তব!

অবশেষে মিঃ লাহা ডাকিলেন, “কিষণ!”

কৃষ্ণা আবার নত-দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে চাহিল।



“আমার উপর রাগ ক’রে আছ?”

তাহার কণ্ঠস্বরে কৃষ্ণার বুকে বাধা বাজিল, তাহার মানসিক চাকল্যে দুর্বল বন্ধ মথিত করিয়া চোখের পাতা সজল করিয়া আনিল, বিষাদপূর্ণমুখে সে শুধু ঘাড় নাড়িল,—না!

তবে কেন অমন ক’রে রয়েছ? কেন ভাল ক’রে একটা কথাও কইছো না? কত আশা ক’রেই যে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি, তা কি একটুও বুঝতে পারলে না? সত্যি কি এত দিন পরে এতই অবুধ হয়ে গেছ তুমি? বোঝ নি কি, তুমি আস্তো জেনে মন আমার কি আনন্দেই নেচে উঠেছে!—কি স্বপ্ন,—নন্দন মনের মধ্যেই রচনা ক’রে নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছি। কিবু! আমার নিরাশ করো না।”

আবার সেই ব্যথিত-কণ্ঠের আবাঁত-ব্যথা! কৃষ্ণার সঘন আন্দোলিত চিত্তে দুই বিপরীতমুখী চিন্তার আঘাতে অস্থির হইয়া উঠিবার যোগাড় করিল। আবার সে চোখের জল সামলাইল।—সে আনন্দ যে এখানের ধূলান-বাতাসে ছড়াইয়া গিয়াছে—কেমন করিয়া সে না বুঝিবার ভাণ দেখাইবে? আর এই যে নিরানন্দ-হৃদয়ের সুবিপুল অভিমান-ব্যথা, এ-ও তো কিছু লুকান জিনিস নয়!—সে নিজেকে বড় অসহায়, বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল।

“বেবি! বেবি! হ’তে পারে, তোমার আমার আজ মতের একটা অনৈক্য ঘটেছে। হ’তে পারে, তাই নিয়ে আমাদের অনেকগুলো আনন্দসরস দিনরাত্রি নীরস তর্ক-গবেষণায় নষ্ট ক’রে ফেলতে হবে। কিন্তু তার জন্তে আমাদের মনের মিল কেন নষ্ট হ’তে বসেছে? বল,—কথা কও? কি এমন ঘটলো, যার ■■■ তুমি—সেই তুমি আমার একেবারে হৃদয়ে ঠেলে ফেলে দিচ্চো? আমার সঙ্গ তোমার বিষ ঠেকুচে। আমার ভালবাসা তোমার অবজ্ঞার জিনিস হয়েছে। আমার ঘর তোমার কারাগার ব’লেই বোধ হচ্ছে। কি এমন আমি করেছি, যার ■■■ এই যে দেখা হলো, তা একবার তুমি চোখ তুলে আমার—আমার মুখের দিকে চেয়েও দেখলে না, একটি মিষ্টি কথাও আমার বললে না।—” তরুণচন্দ্রের গলা কাঁপিয়া গেল।

কৃষ্ণা এবার জোর করিয়া সকল দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল, মুখ না তুলিয়া তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াই সে একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “—আমায় আপনি অনেক দিন ধ’রে অনেক বড়ই

ক’রে এসেছেন, কিন্তু আমার আপনার এইবারে মাপ করতে হবে।”

কথাটার শেষ পর্যন্ত না শুনিয়াই উল্টা বুঝিয়া তরুণচন্দ্র উল্লসিত আগ্রহে বুঁকিয়া পড়িয়া তাহার একখানি সুগোল হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহ-কম্পিত কোমল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “মাপ কে কাকে করবে বেবি! মাপ করবার তো কিছুই নেই। তুমি ছেলেমানুষ, আমি তোমার কতদূর ভালবাসি, সে তুমি সব সময় হয় তো বুঝতেও পা না। ঝাক, ও-সব কথা ব’লে আমি তোমায় বিরক্ত করতে চাইনে। শুধু একটা কথা—তোমার বাবা আমার কাছে আজ একটি প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, তিনি তোমাকেও তা বলেছেন।—” একটু নীরব থাকিয়া মিঃ লাহা জোর করিয়া স্ফোটক সরাইয়া ফেলিয়া পুনশ্চ যোগ করিলেন—“তার ইচ্ছা—এইখানে এই হুটার মধ্যে তোমাকে আমার হাতে: সম্প্রদান ক’রে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান, বিয়ে অবশ্য হিন্দুমতেই হবে। তোমার কি মত?” মিঃ লাহা কৃষ্ণার হাতখানা নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে ঈষৎ আবেগভরে নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

বাঘের খাবার মধ্যে হাতটা অকস্মাৎ গিয়া পড়িয়াছে জানিলে মানুষ যেমন আংকাইয়া উঠিয়া সেটা সবেগে টানিয়া লয়, তেমনি করিয়া মিঃ লাহার হস্তমধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কৃষ্ণা নিজেরও কতকটা অজ্ঞাতে খানিকটা সরিয়া বসিল। দেখিয়া মিঃ লাহা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন ও দ্ব্যধিত্বেরে বলিলেন, “বুঝেছি, তোমার মত নেই;—সে আমিও জান্‌তুম—ও কি, অমন ক’রে চাইচো কেন?—তুমি মনে কর্তো, তোমাদের এখানে নিয়ে এসে আর তোমার বাবাকে সহায় পেয়ে, তোমাকে ছলে-বলে আমি আশ্রয় ক’রে নোব। তাঁকেও বলেছি,—তা আমি করবো না। তা করলে এত-দিন, যখন তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ হয় নি, তখন তার জন্ত চেষ্টা কর্তাম। আমি চাই, তুমি ভালবেসে আমার তোমার নিজের হাতের বরণ-মালা আমার গলায় আদর ক’রে পরিবে দেবে। আমি তো শুধু জ্বী চাইনে। সে তো আমার ঘরেই আছে। আমি তোমার যে হৃদয় এত দিন পেয়েছিলুম, সেইটুকুই ফিরিয়ে পেতে চাই। যদি তোমার মত না থাকে, না হয় বিয়ে তোমার ইচ্ছামত আমার পূর্ব-জীব যত্নের পরেই হবে।

এখন শুধু একটি কথা,—একবার নিজের মুখে তুমি আজ আমার এইটুকু বল যে, তুমি আমার ভালবাস। তা হ'লেই আমি নিশ্চিত হয়ে অপেক্ষা করবো, যত দিন বন্বে অপেক্ষা করবো।

কুম্ভা এতক্ষণে ঘেন কতকটা সাহস পাইয়া কহিল—“তবে আমারও কিছু বলবার আছে।”

“বলো।”

“বলি,—” বলিয়া একটুখানি ধামিয়া তার পর কুম্ভা নতনেত্রে আরম্ভ করিল—“আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। আমি আমার পূর্বাভাস জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'বে, এখন হ'তে সহজ সাধারণভাবে চলতে চাই।”

মিঃ লাহা শুধু বলিলেন, “বেশ!”—

কুম্ভা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“অন্তঃসারশূন্য দেউলে-পড়া বড়লোকের দেখান আমার চক্ষে এখন অমার্জনীয় অপরাধ। আর তার পক্ষে সব চেয়ে সহজ যা পথ তাই-ই আমি নিরেছি। বিলাসিতার সর্বপ্রকার প্রায়শ্চাত্তা বিদেশী-ধরণের জীবনযাত্রা ও তার জন্ত বিদেশী-শিল্পের যতদূর সম্ভব সংশ্লিষ্ট বর্জন আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।—”

মিঃ লাহা শাস্তভাবেই কহিলেন,—“আচ্ছা।”—

কুম্ভা এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে এলে আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি? আপনি তা সহিতে পারবেন কি? তাই বলছি যে, আমাদের দুজনের পথ যখন বিভিন্ন, তখন আমাদের এক না হওয়াই ভাল। কেমন, এই না?”

“বেবি! তোমার গায়ের ঐ দু'দিন পরা মোটা গড়াখানা কি তোমার এই আট বছরের পরিচিত আমার চেয়েও বেশী প্রিয় হয়ে উঠলো? এই শেষ তিন বৎসর ধ'রে যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এক দিনের একটা ছজুকে প'ড়ে তাকে তুমি এত বড় অপমান করতে পারবে? কিন্তু তুমি পারলেও তো আমি পারবো না। কাজেই যদি শুধু বাড়ীর মধ্যে এই রকম থেকে বাইরে আমার মর্যাদার জন্তে রাজী হও, আমি তোমার খাতিরে তাও না হয় সহিবো, তা ব'লে তো তোমার মত অনায়াসে এত দিনের প্রেমের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।—তুমি জানো, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তোমায় আমি কেমন ক'রে মতের জন্ত আমার জীবন থেকে বিদায় দিই?”

“কিন্তু—”

“আবার কিসের ‘কিন্তু’? এক জন ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের পক্ষে তার নিজের বাড়ীতে ‘খদ্দর’ ব্যবহার করতে দেওয়ার দায়িত্ব কত বড়, তারও আজ আন্দাজ করতে ভুলে গেছ?”

“আরও বাধা আছে। আপনি দয়া ক'রে আমার বাবার না বুঝে-সুঝে কথা দেওয়া ফিরিয়ে নিন, আর অবস্থা, অবোধ সংসার-নভিজ্ঞ সামান্য জ্রীলোক জেনে আমারও ক্ষমা করুন। আমাদের যে অলোক অনন্তাবিত সপ্নের প্রত্যাশার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার জন্ত—অপনার কথাতেই বলি, সকল সমাজের সব লোকেই নিন্দা করছে, সেটা থেকে আমার মুক্তি দিন, আমাদের দু'জনেরই পক্ষে সাধারণের হাতাম্পদ সে অবস্থাটা মোটেই প্রার্থনীয় নয়। আমার ছেড়ে দিন, আপনার জীকে ভগবান বাচিয়ে রাখুন, আমি কেন কাক-শকুনির মত তার মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকবো।”

মিঃ লাহা ক্ষণকাল ত্তর থাকিয়া পরে অসহিষ্ণু-ভাবে কহিয়া উঠিলেন,—“কিন্তু পোক-নিন্দা যদি কিছু উঠেই থাকে, আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই কি সেটা খেমে যাবে?”

কথাটার মধ্যকার নির্ঘাত সত্যের তীক্ষ্ণ খোঁচাটা বিধিয়া কুম্ভার মুখের ছবি ম্লান হইয়া আসিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বিজয়-দৃষ্ট-চঃণে একটুখানি কাছে আসিয়া উঁচু-গলায় আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে মিঃ লাহা পুনশ্চ কহিলেন, “ভেবে দেখ বেবি! এখন যদি আমরা নির্লিপ্ত হয়ে স'রেই থাকি, তাতে আমাদের নামে যদি কোন দাগ প'ড়ে থাকে, সে কোন দিনই আর মুছা যাবে না। চিরদিনের জন্তই অনর্থক সাধারণের মনে একটা দাগ থেকে যাবে। থাক, আজ তুমি ক্লান্ত হয়েছ, যাও বিশ্রাম কর গে। আর এক দিন তখন শাস্তভাবে এ সব কথার আলোচনা করলেই হবে।” মিষ্টার লাহা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই তিন পরের একটা অপরাহ্নে মিঃ লাহার সম্ভ্রমিত গোলাপলতায় যখন সাদা ও হলুদে গোলাপের আশ্চর্য প্রাচুর্য্য পথগামী পথিকের নেত্র প্রশংসার বিষয়ে বিক্ষারিত হইয়া



থাকিতেছিল, তখন সেই লতাবিতানের পাশে গৃহস্থানী তাঁহার সুন্দরী ও তরুণী অতিথিটিকে লইয়া নিজের সমস্ত অন্তর ও বাহিরে ঐশ্বর্যের জাল পাতিতে বাস্তু। লতানিয়া বৃক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত পুষ্পক্ষেত্র ব্যাপিয়া মটিকৃষ্ণ, ভিক্টোরিয়া, চায়না-রোজ, মার্শেল নীল, কুইন, মসরোজ, মাঙ্করোজ ইত্যাদি নানা মনোরম ক্ষুদ্র ও সুবৃহৎজাতীয় ধ্বংস, রক্ত, হরিজ্ঞা, বিচিত্র গোলাপী ও মিশ্রবর্ণের গোলাপ-গাছ অপূর্ব শোভায় আগ্রাস্ত ভূষিত হইয়া আছে। এদিক ওদিকে শ্রামল তৃণাক্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তখনও পপি, ডেকোডিল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঋতুপুষ্প বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছিল। অদূরে কয়েকটা কলমের আমগাছ নবোদগত যুকুলের সুবাসে স্থানীয় মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি ও পাখীর দলের উৎসব-মন্দিরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ফুল ও ফলের অহস্ত আলোচনা হইতে সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হঠাৎ মিঃ লাহা বলিয়া উঠিলেন, “তোমার আয়ার কাছে শুনলুম, তুমি তাকে কিছুই করতে দাও না, নিজে না কি বিছানাতেও শোও না,—এ কি সত্যি বেবি?”

কৃষ্ণা প্রথমটা জবাব না দেওয়াই স্থির করিয়া থাকিয়া পরে যুহু-হাস্তের সহিত উত্তর দিল, “আপনি যে শোবার পথ বন্ধ করেই ব্যবস্থাটা করে রেখেছেন।”

“আমি! কি করেছি?”

“সবই যে আনুকোরা নতুন বিলিভী জিনিস কিনে এনেছেন, কাজেই দেশী গাল্চেখানাতে বোম্বাই মিলের চাদর পেতে গুতে হয়।”

মিঃ লাহা ঈষৎ বিরক্তি-ভিত্ত-স্বরে কহিলেন,— “কিন্তু তোমার নিজের শোবার ঘরে যে ঠিক ঐ রকমই খাট-বিছানায় তুমি শোও, সে তো আমি তোমার অস্ত্রের সময়ে দেখে এসেছি।”

কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিল,— “তখন তো আমি ফ্রেঞ্চ বা চায়না-সিঙ্ক ভিন্ন আর্টপোরে পোষাক কমই ব্যবহার করতাম।”

মিঃ লাহার ললাটে নেত্রে ক্রোধের রেখা সুব্যক্ত হইলেও কণকাল পরে তিনি যখন কথা কহিলেন, তাহাতে উহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না।— “আমায় বললে না কেন? তা হলে সেই রাত্রেই আমি তোমার একসেট ‘খেরোর’ই বিছানা না হয় আনিয়া দিতাম।”

তাঁহার স্বরে কিছু অভিমান ■ অনেকখানি বিজ্ঞপ্তি প্রকটিত হইল। কৃষ্ণা তাহা বুঝিয়াই তাঁহারই সাক্ষনার হিঁসাবে একটুখানি সহ্যভূতি

দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, “আমার জন্ত বড্ড হঃখ করছেন, আর নিজের কি দশা? একটি ছোট্ট ঘরে, একখানা দেড়হাত চওড়া কাম্প খাটে, নাকের উপর একটি মশারি ঝুলিয়ে বড্ডই বৃষ্টি আরামে ঘুম হয়? পাশ ফিরতে গেলেই পড়ে যাবার ভয় করে না?”

তরুণের মুখ স্ত্রের প্রসন্নতার দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সে তাহা হইলে তাহার এই আত্মত্যাগ দেখিতে পাইয়াছে! দেখিয়া অন্তরে অল্পতব করিয়াছে! তবে তো কষ্ট সার্থক? যুহু-হাস্তের সহিত উত্তর দিলেন,— “অভ্যাস করচি, না হ’লে এর পরে কবল শয্যা সহিবে কেন?”—কথাটার গুঢ় নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেই কৃষ্ণার হাসি-মুখ গভীর হইয়া আসিল।

সে রাত্রে মিঃ মল্লিককে তাঁহার ঘরে রাখিয়া মিঃ লাহা নিজের সেই ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহটির উদ্দেশ্যে বাইতে বাইতে ড্রইংরুমের মধ্যটার একবার উকি দিয়া বাইতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণা তখনও উঠিয়া যায় নাই।—গোভে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া সেই ঘরে আসিলেন। এ কয়দিন সে মিঃ মল্লিকের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া যাইতেছিল।

মিঃ লাহা আসিয়া হাসি-মুখে বলিলেন, “কি বেবি! আজকের নতুন খদ্দেরের বিছানার বেতে হেবে অস্থির হচ্চো যে। মোটা ও কোরা চাদরের গন্ধে ঘুম কিন্তু আজ হবে না, তা ব’লে রাখছি।”

কৃষ্ণা মুখ তুলিতেই মিঃ লাহার মুখের আলো তাহার ছায়াপ্রতিভত হইয়া প্রায় কালো হইয়া আসিল। তিনি ছই পদ পিছাইয়া গিয়া বেন কঠিন আঘাত প্রাপ্তের ব্যথিত-কণ্ঠে সবিম্বরে কহিয়া উঠিলেন, “বেবি! বেবি! কীদছিলে?”

কৃষ্ণার চোখ দিয়া তখনও ফোটার পর ফোটা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা রোধ করিতে চেষ্টাই করিল না, অথবা করিতে পারিল না, তা বলা যায় না। দেখিয়া নিজেদের মাঙ্ক-খানের এ কয়মাসের সকল বাবধান ও বিরাগ সব বিস্মৃত হইয়া গিয়া তরুণচন্দ্র তাহার সোফার পাশেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবার জন্ত তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখ তুলিতে গেলেন। “বেবি! আমি সব পারি, শুধু তোমার চোখের জল আমার অসহ্য! কেন কিষণ! অমন করে কীদচো কেন?”—

আন্তে আন্তে তাঁহার হাতের স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া নিজের আঁচলেই মুখ মুছিয়া ফেলিয়া অশ্রুজলে-ভেজা কাতর-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, “মিঃ লাহা! আমাদের মধ্যে সে পুরনো দিন, যখন আর ফিরিয়ে আনতে পার্চিই না, তখন এমন ক’রে শুধু সেইগুলি নিয়ে থেকে হুঁজনকারই কতি হচে,—আজ থেকে আপনি আমার ছুটি দিন, আমি আপনার কাছে এই জোড়হাত ক’রে মুক্তি-ভিক্ষা চাইছি, আমার মন থেকে বিদায় দিন আপনি। আপনার অনেক টাকাই বাবার কাছে পাওনা, আমি তা জেনেছি। সে টাকা আমাদের বাড়ী বেচে আপনি নিয়ে নেবেন। শুধু বাবার জীবনের ক’টা বছর আপনাকে একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে। তার পর যখন খুশী আপনি—”

মিঃ লাহা এতক্ষণ পুরে বাকশক্তি ফিরিয়া পাইয়া বহুপাবিক উচ্চ-কণ্ঠে বাধা দিলেন, “তারও পর? তার পরও—তোমার এই হৃদয়হীন খেলার অবসান হবে না? বেবি! বেবি! কি তোমার মনের ভাব আমি আজ একটু স্পষ্ট ক’রে জেনে নিতে চাই!—এমন ক’রে বুক তুমি আমার কেন যে হুঁপিয়ে মাড়িয়ে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে দিচ্চো, এর কি অস্ত্র কোন কারণ আছে? অথবা শুধুই তোমার এ একটা নির্দয় খেলা?”

অনেকক্ষণ ঘরটা নিতরু হইয়া থাকিল। মিঃ লাহার কথাগুলো সে ঘরের বাতাসে যেন বহুক্ষণ মুক্ত বেদনার মতই ধ্বনিত হইয়া রহিল, তার পর কৃষ্ণা নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল,—“আপনার সঙ্গে আমার বাগ্‌দান ফিরিয়ে নিই, আমাদের—আমাদের বিয়ে কোন দিন হ’তেই পারে না!”

মিঃ লাহার ছুই চোকের মধ্যে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহার বকের মধ্যে গুপ্তঘাতকের ছুরি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তিনি যথাসাধ্য স্থির থাকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—“আমার জীবন যত্নের পরেও না?”

কৃষ্ণা মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, “না!”

“কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, “পারেন,” কিন্তু কথা কহিতে তাহার একটু বিলম্ব ঘটিল।—সে বলিল, “প্রথমতঃ আপনার ও আমার জীবনের লক্ষ্য ও পথ ঠিক আর এক নেই।—আপনি এক জন গবর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী,

আপনি রিপ্রেসনের পক্ষে—আর সেই রিপ্রেসন আমাদেরই উপর। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবাহিত হই, তা হলে সে মিলন শুধু কি দৈহিক মিলনই হবে না—যাতে আপনার কৃতি নেই বল-ছিলেন?”

মিঃ লাহা ঈষৎ একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—“বেবি! তুমি কি মনে কর, বর্তমান গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তোমরা দু’চারটে ছেলেমেয়ে মিলে একটা হৈ চৈ করলেই, সেটা গুঁড়িয়ে প’ড়ে যাবে? ভলে হলে অন্তরীক্ষে অজস্র ব্রিটিশ-সিংহ তোমাদের মত অসহায় গর্ভের ইঁদুরের উৎপাতে সোনার ধনি ভারত-সাম্রাজ্যের মৌরসী-পাট্টা তোমাদের হাতে ফেরৎ দিয়ে নিজের বাসার ফিরে গিয়ে ঘুমবে?”

কৃষ্ণা ঈষৎ লজ্জাবোধ করিলেও দুর্বলতা অনুভব করিল না, সে সাগ্রহে বলিল,—“তা করিমে; সেইজন্য বর্তমান গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিজ্রোহ আমরা তো করতেও চাইচিনে। আমরা, দুর্বলের মধ্যেও যে একটা প্রবল শক্তি আছে,—ইউরোপীয় অনেক জাতিই যাকে সহায় ক’রে উঠেছে, সেই একমাত্র সম্বলকেই কেন্দ্রীভূত করতে চাইছি। বর্ধার্থতঃ এতে আমার ধর্ম বা আইন কিছুই বাধা দিতে পারে না। এতে কার উপর কোন অত্যাচার নাই, অথচ নিজের দেশের পক্ষে উন্নতির অপরিহার্য আশা রয়েছে। এর একমাত্র বিদেশী শিল্পের নিত্য আবশ্যকীয় কল-কজা বৈ ও ঔষধ প্রভৃতি ছাড়া আর সব বর্জনেতেই যে এই গরীব দেশের গরীব জাতের কত লাভ, তা আমি নিজে এই চার মাসের মধ্যেই প্রভূত রকমে জানতে পেরেছি। এ চার মাস আমার বাবাকে আপনার কাছ থেকে এক পরস্যাও ধার নিতে দিই নি, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন?”

মিঃ লাহা শেষ-কথাটা কানেই আনিলেন না, পূর্বলোচনার অনুসরণে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা বেবি! এই জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে তুমি কি ইউনিটির বর্ধার্থ আশা করো? যে দেশের ছোটো লোকের মধ্যে একটা নেই, তাদের সবাইকার মনে দেশাত্মবোধ জাগবে, এবং তারা সকল স্বার্থ পরিত্যাগ ক’রে সজ্জবদ্ধ হবে, এটা কি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা-কুসুম নয়?”

কৃষ্ণা কহিল,—“দেখুন, সংসারে আকাশ-কুসুম কি, আর কি নয়, তার কথা কেউ আগে থাকতে বলতে পারে না। জাতিভেদ প্রভৃতির কথাও



আমরা ইংরেজ প্রভুতির মুখ থেকে গুনে গুনে কপ্‌চাচ্ছি, ওর কোন ভিত্তি নেই। এই দেশেই চিরদিন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাদগী পাইক ছিল ও আছে। দরকার হ'লে তারা মনিবের প্রাণ দিয়েওছে এবং দিচ্ছেও। আবার জাতিভেদহীন মোগল-পাঠানও পরস্পরের বুকে শতাব্দী শতাব্দী কাল ধরে ছুরি-মারামারি করতে ক্রটি করে নি। ইউরোপের ইতিহাসেও বাহ্যতঃ জাতিভেদহীন জাতির পরস্পরে ৪০ ঘরে ঘরে গলাকাটাকাটি রক্ত-ছড়াছড়ি কম যাচ্ছে না, তবে আমাদের দেশের পুরান শিক্ষাদীক্ষায় শোণিত-তৃফাটা কম থাকায়, বিষয়-বৈরাগ্যাটা বেশী থাকায়, অস্ত্র রক্ত কম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা নূতন শিক্ষকের হাতে পড়ে যখন নূতন হয়ে গড়ে উঠছে এবং অবস্থাও যখন প্রাণ-সঙ্কট হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন একাত্মতা যে আসতেই হবে। তা হোক স্বরিতে, হোক বিলম্বে। না এসে আর উপায় নেই।”

ঈশ্বর একটুখানি কৃপার হাসি তরুণচন্দ্রের চোঁটের আড়ালে চকিত হইয়া মিশাইয়া গেল, শিশুর প্রলাপকে বিজ্ঞ-ব্যক্তি যেমন সক্রমণ স্নেহে সহিয়া লইয়া থাকেন, তেমনি করিয়াই এই সব জটিল সমস্যার সমাধান-চেষ্টা না করিয়াই তিনি কথা উল্টাইয়া কহিলেন, “তা, না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, এক দিন তোমাদের স্বপ্নই সফল হ'বে উঠবে। কিন্তু তার মাঝখানে, তত দিন পর্যন্ত কি বিরুদ্ধ মতের পিতাপুত্র একত্র হবে না? স্বামি-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকবে?”

‘স্বামি-স্ত্রী’ কথাটা কৃষ্ণাকে অত্যধিক উত্তেজিত ও বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে উদ্ধত-স্বরে উত্তর দিল, “স্বামি-স্ত্রী এ অবস্থায় পড়লে কি করবেন, তা তাঁরা ভেবে দেখুন গে, কিন্তু আমাদের অবস্থা এখনও অতটা সঙ্কটাপন্ন হয় নি, তাই আমি বুকুতে পার্চি, এত বড় মতবৈধের মধ্যে আমাদের মিলিত হওয়া উচিত নয়।”

“কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রয়েছে, তখন এটুকু বিরোধকে আমরা অন্ততঃ একটুখানি সহনীয় ক'রে নিয়েও অনায়াসে ধরকরা করতে পারবো। উভয়পক্ষ থেকেই না হয় কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করা যাবে। কি বল? আর দেখ, ভালবাসা জিনিসটা বাইরে থেকে হঠাৎ এক দিনে পাওয়া যায় না; নিশ্চয়ই যথাকালে তার আবির্ভাব হবে, যদি এখন তার অভাব—এই ঘটে থাকে, আমার বিশ্বাস যে তা ঘটে নি।”

কৃষ্ণা সমুচিত-স্বরে কহিল, “সেটা আপনার ভাস্তিও হ'তে পারে তো?”

“কোনটা আমার ভাস্তি বেবি? তোমার ভালবাসা? অথবা আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? ওঃ! তুমি কি আমার আজ বোঝাতে চাও যে, এই তিন বৎসর ধ'রে তুমি আমার সঙ্গে যে আচরণ ক'রে এসেছ,—সে সমস্তই তোমার ছিলনা?”

নিজেকে অবমানিত বোধ করিলেও এই আঘাতের কোন কঠিন প্রত্যাঘাতই সে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। শুধু অপরাধী ভাবেই কহিল, “নিজের মন হয় তো আমি জানতুম না।”

যন্ত্রণাহত কাতর মুখচ্ছবি লইয়া তরুণচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া রক্ত-বাক্সের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমায় যে কখনও ভালবাস নি, এটা এখন কেমন ক'রে হঠাৎ জানতে পারলে? বেবি! বেবি!—কিবেণ! আজ দীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই কথা তুমি আমার বললে? আমার কখন ভালবাস নি?—কখনও না? কখনও না! এই কি সত্য?”

কৃষ্ণার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, রক্তস্বরে কহিল, “আপনি—যে ভাবে বলছেন, তেমন ক'রে বোধ করি কখনই বাসি নি। তা হ'লে—”

“হ্যাঁ, ‘তা হ'লে’ কি আর এমন নির্মম আঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে দিতে পারতে!—এই বোধ হয় তোমার দ্বিতীয় আপত্তি? বেশ,—আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল ভোরেই আমার মফঃস্বল বেরুতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে—তোমার তৃতীয় বাধার কথাটাও শোনা যাবে।—যাও—আজ শোও গে যাও।—তোমার খুসী করবার বৃথা-চেষ্টার অনেকগুলো টাকার ‘চট্ট-ক্যাশিস্’ও কিনিয়ে আনিয়েছিলুম, আমার উপর দয়া ক'রে সে ক'টা অন্ততঃ ব্যবহার করো, মাটিতে পড়ে থেকে কষ্ট পেরো না।”—

এই বলিয়া মিঃ লাহা নিজেকে জোর করিয়া দমন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধোত্তেজিত উপহাসপূর্ণ কণ্ঠ, তাঁহার হতাশা-দ্রষ্ট অস্তরের প্রবল উত্তেজনার গুরুপদক্ষেপে, কৃষ্ণাকে কতক্ষণের জন্যই যেন সেখানের জমীতে অচল করিয়া দিল, তথাপি অন্তরের মধ্যে সে যেন আজ অনেকখানি লঘুবোধও করিল। বোধ হইল যেন একটা অক্ষমণীয় জুরাচুরীর হাত হইতে সে নিজেকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনটাই সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিষতিক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। মোটরে বাহির হইবার সময়েই গাড়ীর দরজাটা কষিয়া থাকার মতো মোটর-স্ক্রীনারটাকে বুটের একটা ঠোঁকর মারিয়া গাড়ী চড়িলেন, পথে একটা ছাগলছানার ঘাড়ের উপর দিয়া গাড়ীখানা সগর্বে চলিয়া আসিলে, সোফারটা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি তিরস্কৃত হইল। যে মোকদ্দমটার তদারকে গিয়াছিলেন, তাদের সে দিন লাঞ্চার আর অবধি রহিল না। সাক্ষীদের মধ্যে যে দুজন খন্দর পরিয়া আসিল, তাহাদের সাক্ষ্য “অবিস্বাস্য”—এই চিহ্ন দিয়া রাখিলেন।—কিরিবার পথে একদল স্কুলের ছেলে ‘বন্দে মাতরম্’ বলিয়া একটুখানি ফুটি করিয়া লইতেছিল, সঙ্গে পুলিস-ইন্সপেক্টরকে হুকুম দিলেন, “রাজদ্রোহসূচক শব্দ ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবমাননা দেখাইবার জন্যই বিশেষভাবে করা হইয়াছে, অতএব উহাদের গ্রেফতার করা দরকার।”

বাড়ী কিরিতেই দেখা গেল, ফটকের সামনে একটা ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত ভিখারী তারস্বরে ভিক্ষা চাহিয়া চেষ্টাইতেছে, তাহার এবং তাহাকে এতক্ষণ তড়াইয়া দিতে অসমর্থ দরওয়ানটার পিঠে চাবুকের ছই চারিটা ঘা পড়িল; এবং রাজে চুরীর মতলবে যে ভিখারীশুলা দিনের বেলায় ভাগ্যবানদের ঘরের খবর লইতে আসে, তাহাকে খানায় পাঠান হইয়া গেল। বুট খুলিতে গিয়া সাহেবের মুখ দেখিয়া বেসারটা তাই-শুদ্ধ লাথি খাওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইতে থাকিলেও কিন্তু তাহার কোন্ সঞ্চিত পুণ্যবলে সে বেচারী রক্ষা পাইয়া আড়ালে গিয়া হাঁপ লইল।

অপরাত্নে চারের টেবিলে কক্ষার সহিত দেখা হইল। মিঃ মল্লিক অনেক আদর-আপ্যায়নে সকাল-বেলার পঞ্চশ্রম ইত্যাদির বিষয়ে খুঁটিয়া নিংড়াইয়া খবর জানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এত বড় কার্যের দায়িত্ব, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিলেন; কিন্তু নীরব শ্রোতা-সুগলকে লইয়া তাঁহার নিজের অধ্যবসায় বজায় রাখা দায় হইল। আহা রাস্তে কক্ষা উঠিয়া চলিয়া গেলে, মিঃ মল্লিক ডাকিলেন—“তরুণ!”

“আজ্ঞে!” বলিয়া জবাব দিয়া মিঃ লাহা একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

“বেবির জন্ত বড় ভাবনায় পড়েচি বাবা!”

“হঁ”—বলিয়া তরুণচন্দ্র পুনশ্চ নিজেরই চিন্তা-শ্রোতে ডুবিয়া রহিলেন।

“সে কালই বাড়ী ফিরতে চায়। বলে, সে না কি তোমাকে সব কথাই বলেছে; তুমি না কি আর তার চ’লে যাওয়ার অমত করবে না।—আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথাই সে আমার আজ বলেচে।—আমায় মেরে ফেলেচে!”

আগ্রহহীন নীরস-কণ্ঠে মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলেচেন?”

“সে না কি তোমায় বিয়ে করতে পারবে না, আর এই কথা না কি তোমার মুখের উপরেই সে বলে দিয়েছে?—পাগল হয়ে গেছে তরুণ! মেয়েটা বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে!”

ডাঃ মল্লিকের কণ্ঠে বিলাপের করুণ মূর্ছনা শ্রুত হইল। “কত বোঝালুম, বল্লম—তোমার শেষ-টার আমার শুলী খেয়ে মরতে হবে দেখছি। তাতেও তার ঐ এক কথা! কিন্তু আমি যে এই ঋণের বোঝা ঘাড়ের ক’রে রাস্তার কেমন ক’রে দাঁড়াব; আমার দেশহিতৈষিনী মেয়ে সে কথার তো কোন জবাবই দেন না! বলেন কি জানো? ‘আত্মগর্বে মেয়েটা বলে কি না,—‘চিরদিন কি সবার সমান যার? গরীব হয়েছে, তাতে লজ্জা কিম্বা? বাড়ী বেচে গরীবের মতনই থাকবো’।—সে না হয় তুই পারতে পারিস—তোমার সখ, আমি সে পারবো কেন বলো দেখি?”—বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ সম্ভাবনায় গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়া মিঃ মল্লিক ভূতভয়াহত অসহায় শিশুর মতই ফোঁপাইতে লাগিলেন। “মাই বর! মাই বর! হোয়াট আন্স আই টু ডু? হোয়াট উইল বি কম্ অফ্ মি!”

মিঃ লাহা নিজের মনের পূর্ণ বিরক্তি ও ক্রোধ দমনে রাখিয়া উঁহাকে সাহুনা দিয়া বলিলেন, “আমি বতর্কণ আছি, আপনাকে আমি হুঃখ পেতে দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!—আপনার মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবার আর কোন কারণ দেখালেন?”

ডাক্তার-সাহেব মহা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে বলিলেন, “কারণ আবার ও দেখাবে কি? অসংলগ্ন শুধু শুধুই আমাদের হুঃখ দেবে ব’লেই দিচ্ছে বৈ তো নয়। বলে, ‘ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই!’ আরও বলে, ‘বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাগদত্তা হয়ে থাকার লজ্জায় আমি ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতেই পারিনে!’ যে পাতকের হাতের



পড়বার ভদ্র-সমাজের সমস্ত আইবড় যেরে আকুল হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে ওঁর নাম লোকের মুখে উচ্চারিত হ'তে শুনে উনি না কি 'লজ্জার ম'রে যেতে চান! উঃ, কি ভয়ানক কালসাপকেই আমি গায়ের দিয়ে তৈরী করেছি! সর্বশ্ব খুইয়ে মানুষ করেছি! ওঃ, কি অকৃতজ্ঞ, কি স্বার্থপর সন্তান!"

মিঃ লাহা এই সমস্ত পিতাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য পর্য্যন্ত না বলিয়াই একটা সিগার ধরাইয়া নিস্তান্ত অন্তমনস্কে সেটা ধীরে ধীরে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আবার একটা কাতরোক্তি শোনা গেল, "তরুণ! চ'লে গেলে বাবা?"

"আজ্ঞে, না,"—বলিয়া মিষ্টার লাহা কিরিয়া বলিলেন।

"তুমি কি ওকে ছেড়ে দেবে? ওরই এক-ওয়েমীর—বেচ্ছাচারের স্রোতে ভেসে যেতে দেবে? ওকে টেনে তুলবে না?"

"আমি কি করতে পারি বলুন?"

"তোমার যা খুসী! আমি তো ওকে তোমার হাতেই দিয়েছি।"

মিঃ লাহার অধরপ্রান্তে একটু হুঃখের হাসি দেখা দিল, "আপনার দেবার ক্রমতা নেই, আপনার মেরে না'বালিকা নয়।"

"ওঃ!" বলিয়া এই শেষ আশ্বাসভঞ্জে ডাক্তার-সাহেব একেবারে যেন এলাইয়া তাঁহার আরাম-চৌকিটার গায়ে হেলিয়া পড়িলেন। "তা হ'লে ওরই জিদ বজায় থাকবে? কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল বে-আইনী হাঙ্গামাকারীর দলে মিশে হয় তো কোন্ দিন জেলেও তো যেতে পারে? অ্যাঁ! তরুণ! তুমি ওকে এ লজ্জা, এ অপমান থেকে রক্ষা কর, বাবা!"

বৃদ্ধ অন্ধ হাতড়াইয়া মিঃ লাহার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিবার জোগাড় করিলেন। "সেভ'হার—মাই চাউল্ড!"

তাঁহার মাসে খানিকটা পানীয় ঢালিয়া দিয়া মিঃ লাহা উঠিয়া পড়িলেন, স্থির স্বরে কহিলেন, "আমি তাকে রক্ষা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভোর-বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গরম বোধ হওয়ার খোলা জানালার কাছে আসিয়া কৃষ্ণ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো তখনও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারেরও জমাট ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। নৈশ-নীবরতা

তখনও চরাচরের বন্ধকে শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া ছিল। শেষ-রাত্রে মূর্খ জোৎস্না-ধারায় দূরের গোলাপ-বিতান যেন শুভ্র বসনাচ্ছাদিতা বৈরাগ্য-বেশধারিণী নারী-মূর্তির মতই দেখাইতেছিল। সরকারী রাস্তা-ধারের যেন সমান করিয়া ছাঁটা স্তব্ধ অশ্বখ, বট ও পাকুড়ের শ্রেণী ঘন অন্ধকার গায়ে রাখিয়া মানুষের হাতে-গড়া প্রাচীরের মতই দেখাইতেছে। রাজপথ হইতে কদাচিৎ একখানা গো-যানের বা পথযাত্রী পথিকের আসা-যাওয়ার সাড়া কচিৎ উঠিতেছিল। ভার্যাকান্ত-চিত্তে যাগানের ভিতর চাহিতেই কৃষ্ণার দুই চোখের দৃষ্টি বিষ্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। কে এক জন পুরুষমূর্তি না—গভীর শব্দহীনা স্তম্ভরাত্রে একাকী বিনিমুগ্ধে উর্দ্ধে তারকাখচিত আকাশে চাহিয়া ধীরপদে পরিক্রমণ করিতেছে! নক্ষত্রালোকে সেই সুপরিচিত দীর্ঘমূর্তি কৃষ্ণা একবার চাহিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। কাহার চিন্তায় সেই পুরুষ নিজের সাক্ষা-সজ্জা বদল পর্য্যন্ত না করিয়া সেই প্যান্ট-কোট, সেই টাই-কলার, এমন কি, পায়ের ভারি জুতা জোড়া পর্য্যন্ত মা খুলিয়া সারা রাতই হয় তো এই রকম পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এ কথা মনে হইয়াই কৃষ্ণার পদনখ হইতে কেশাণ্ড পর্য্যন্ত যেন একটা অসহায় কাতরতাপূর্ণ ভয়ে ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। এ কি কঠিন বেড়াঝালের মধ্যেই উহার সঙ্গে তাহার এই অভিশপ্ত জীবন জড়িত হইয়া গিয়াছে! কেমন করিয়া এ পাশ সে ছিন্ন করিয়া লইবে? কেমন করিয়া—ও গো, কেমন করিয়া? অথচ—অথচ না নিলেও এর চেয়েও যে ঢের বড় হুঃখের ঝঞ্ঝার তার নিজের জীবনের দিবানিশি একাকার হইয়া যাইবে, সে-ও তো আর মিথ্যা নয়! সেই বা সে সহিবে কেমন করিয়া?

পুরুষমূর্তি বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারই জানা-লার দিকে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে অপ-মৃত হইয়া আসিল এবং দেখিতে পাইল, তরুণচন্দ্র সতৃষ্ণ চোখে সেই জানালাটার দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন। তখন নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে সে মুখ যেন বড়ই নিরাশা-কাতর, বড়ই বেদনা-বিধুর মনে হইল।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সকাল-বেলা হঠাৎ বড় উঠিয়া এক পশলা দৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আকাশের এখনও কালোয়-সাদায় ধূসরে মেশান রুষ্টি-আনা মেঘের পুঞ্জ ইত-ত-ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাছ ভিজা, মাটি ভিজা, পাখীর বাসাগুলি ঝড়ে উলটিয়া গিয়া সেই ভিজা মাটিতে আর্দ্র হইয়া লুটাপুটি খাইতেছে। ঝড়ে ছিঁড়িয়া-পড়া গোলাপবাগানের ফুল ও থসিয়া-পড়া রানীকুত পাপড়ি, তাহাদের পূর্ব-সন্ধ্যার বর্ণ-বৈচিত্র্য হারাইয়া কাদা-মাথা হইয়া পথের উপর ছড়াছড়ি বাইতেছে। লতাবিভানগুলি ঝড়ের হাওয়ার লগ্ন-ভগ্ন, এবং সমরশায়ী বীরের মতই একটা সরল ঋজু দেহ দেবদাক্ষ সমুলোৎপাটিত হইয়া পথের উপর পড়িয়া।

প্রাতঃস্নানের পোষাকে বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার চড়িতে গিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃষ্টি সেদিনকার মত আমিত ডাকের তাড়ার উপর পতিত হইল। চাপরাসী, সাহেবকে প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল, কাগজ-পত্র উল্টাইয়া এক গাদা সরকারী খাম ও বে-সরকারী সংবাদপত্র ব্যতীত একখানি মাত্র পত্র দেখিতে পাইলেন। সাধারণ ডাকঘরের ছাপান খামের মধ্যে পত্র, উপরে বাংলা অক্ষরে নাম ইংরাজীতে ঠিকানা লেখা, চিঠিখানা কৃষ্ণা মল্লিকের নামে। চাপ-রাসীর হাতে সেখানা ফেরৎ দিতে গিয়া কিসের একটা অনিবার্য লোভে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিত্ত একটি বে-আইনী কাজ করিয়া ফেলিবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

চিঠিখানা মাত্র পকেটে ফেলিয়া তিনি ঘোড়ার কোবে পা তুলিয়া দিলেন এবং অর্ধ-মুহূর্তের মধ্যেই তাঁহার বাহন তাঁহাকে পিঠে লইয়া বাগানের পথ ছাড়াইয়া পথে পড়িয়া ছুটিল।

সে চিঠিখানায় এই রকম লেখা ছিল,—  
সবিনয় নিবেদন—

আপনি যদিও আপনাকে আমার অ-পছন্দ মিস্ মল্লিকের বদলে কৃষ্ণা ব'লে সম্বোধন কর্তেই হুকুম দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু সে আদেশটা রাখতে পারলুম না,—দোষ নেবেন না। 'মিস্' ব'লে এ দেশের মেয়েকে উল্লেখ করা আমার কানে ভাল শোনায় না বটে,—অথচ আমাদের মধ্যে ঐ রকমের কোন কিছু ডাকবার সহজ পন্থাও তো নেই। সেকেলে লোকেরা হয় তো এ রকম ক্ষেত্রে

অনারাসে ব'লে বসতেন, "কেন, মল্লিকের 'মিস্' অথবা একটু শুদ্ধ ভাষায় 'মল্লিককুমারী' বলেই হয়!"—কিন্তু যতই হোক, আমরা—আধুনিকরা এত দিন ধরে দেশের ঠাকুরের চাইতেও বিদেশী কুকুরের পক্ষপাতিত্ব করে এসে হঠাৎ একেবারে সব-খানি উল্টে ফেলে পুরো সেকেলে ব'নে যাওয়া,—তা আমি যদিও এর খুব পক্ষপাতী আছি,—তবে আপনি কি অতটাই একেবারে বরদাস্ত করতে পারবেন? বরসে বড় হ'লেও না হয় 'দিদি' বলাই যেত, এ তো তারও পথ বন্ধ!

বেশ মজা করে ব'সে ব'সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী খুব ভোজটোজ তো খাচ্ছেন! এ দিকে যে বড়বাজারে কলের কুলীরা ম্যাক্কেটারকে রাজগী লিখে দিলে ব'লে! আসছেন কবে শুনি? মাড়োয়ারী জাতটা মোটেই আমাদের মানে না। তাদের ~~ক'রে~~ রাখতে পারে এক রাজা, আর যদি রানীর জাতি আপনারাই কিছু পারেন,—দেখুন দেখি চেষ্টা করে?—আমুন—শীত—শীত—শীত—ফিরে আসুন। আপনার কর্মভূমি—আর আপনার কর্মসঙ্গীরাও ব্যাকুল-প্রাণে আপনাকেই যে ডাকছে। আর দেয়ী কল্পবেন না।—দোহাই আপনার!—

বিনয় শীত।—

সে দিন কিরিবার পথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়া ও তার সহিসটা অনাবশ্যকেই কশাহত হইল। সে দিন এজলাসে গিয়া তিনি যখন বিচারাসনে বসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ কাগাস্তক যম বলিয়াই মনে হইল। সে দিনকার তিনটা বোকদমার মধ্যে প্রথমটা ছিল এই স্বামী মাতাল—জীকে বৃথা সন্দেহে বেদম মার মারিয়া আধমরা করিয়াছে। জীর চীৎকারে পাহারাওয়াল বাড়ী ঢুকিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে এবং আশ্রয়-গৃহে পৌছাইয়া দেয়। অণ্ডক ক্ষত-চিহ্ন প্রমাণ ছিল, বিশেষ বিশেষ সাক্ষ্য-সাবুদে জীর কথাই প্রামাণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু রায় বাহির হইল উল্টা! জীর চরিত্র সন্দিক্ত, এ ক্ষেত্রে স্বামিগৃহেই তাহার বাস করা কর্তব্য বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায়ের মধ্যে টিপনী কাটিলেন। বিজয়ী বীরের মতই ভীষণ মুর্জিতে স্বামী গিয়া ভারতী জীর হাত ধরিল। এজলাসের বাহিরে পা দিয়াই দণ্ড করিয়া বলিল,—“শুনলি ভো, ধর্ম্মাবতার কি বলেন? চল ঘরে, এবার তোকে কোতল করবো, তবে ছাড়বো।”



দ্বিতীয় মোকদ্দমাটার এই রকম নিষ্পত্তি হইল।  
—কেরামত সেখ, গাঁয়ের মোড়ল গোছের, সে  
‘জুমা’র দিনে (শুক্রবারে) তার এলাকার সব মুসল-  
মানকে ‘খদ্দর’ পরিয়া আসিতে হুকুম দিয়া দেয়।  
সবাই পরে, পরে নাই শুধু কালেক্টরীর দপ্তরী ফৈজু  
ও তার কুটুমসম্পর্কীয় জনকয়েক লোকে। দ্বিতীয়-  
বারে কড়া হুকুম জারি করা হয়, তাহাতে ফৈজু  
না কি গাঁয়ের অনেক লোকের সাম্নেই বলিয়া  
বেড়াইয়াছে যে, ওর হুকুম মান্তে গেলাম কোন্  
ছাথে? উনি জেলার জজ না ‘ম্যেজেষ্টার?’—এবং  
নমাজের সময় নূতন কেনা ম্যাগেণ্টারের ছাপ লাগান  
ধুতি, কুর্তা পরিয়া সে নমাজ করিতে যায়, কিন্তু  
মসজিদে ঢুকিতে পার না। তার পর হইতেই  
তাহারা দুইটি দলবদ্ধ হয়। সেখের দল ফৈজুর  
দলকে ‘এক ঘরে’ করে, ইহার মধ্যে ফৈজুর সখী  
এবং তার ছোট স্ত্রী-ও সংযুক্ত ছিল! অতঃপর বার-  
পিট বেশ রীতিমতই হইয়া গিয়াছে। ক্রোধাক্ত  
ফৈজু ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হইতে গুলি জমা করিয়া  
সেখের দলকে হঠাৎ আক্রমণে জখম করিয়া  
দিয়াছে।—নিজের সখীকে আধমরা করিয়াছে—  
খুন অবশ্য কাহাকেও কেহ করে নাই।—শরীরে  
চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে জানা  
গিয়াছে, সখীর আঘাত কিছুই মারাত্মক নহে।  
বিচারে ফৈজু বেকসুর খালাস পাইল। ‘অত্যাচারী’  
দলস্থ — আষ্টেক লোক লইয়া দলপতি বুড়া  
করিম সেখ এক বৎসরের জন্য জেলে চলিলেন,  
সেখানে তাঁহাকে খাটিতে হইবে।

তিনেরটার কপালে হয় তো বা কিছু সুখ ছিল,  
সেটা দিনির ভেপুটীর হাতে চালান পাঠাইয়া দিয়া

সাহেব কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। বুক-  
পকেটের চিঠিখানা তাঁহাকে আর সুস্থির হইয়া  
বসিতে দিল না।

বাড়ী গিয়া কুখাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ঘরের  
মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে আসিলে খাম-খোলা  
চিঠিখানা হাতে দিয়া সে দিনের বিচারের ব্যয়  
দেওয়ার মতই মুখ করিয়া তেমনি স্বরেই কহিলেন,  
“তোমার তিনের নম্বর ‘বাধা’র কথাটা তুমি না  
বলতেই আমার শোনা হয়ে গিয়েছে। অন্তমনস্ক  
খামটা ছিঁড়ে ফেলেছিলুম,—মাপ করো;—অবশ্য  
তখন মোটেই সন্দেহ করি নি যে, তারই মধ্য থেকে  
কাল-সর্প বার হয়ে এসে আমাকেই ছোবল  
মারবে!”

বলিতে বলিতে কুখার মুখ তীক্ষ্ণ অগ্নিবর্ষা চোখে  
চাহিয়া দেখিলেন, এবং এও দেখিলেন, অপরাধের  
গুরু লজ্জাকারে আনমিত সেই কমনীর মুখে আরও  
একটা কোম কিছু রমণীয়তা অতি গোপন  
আনন্দে সন্ধ্যাবেলার গোলাপের মতই ধীরে  
ধীরে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। আর নিজেরও  
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কম্পিত আঙ্গুলগুলো  
হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই খামের মধ্যের চিঠিখানাকে  
টানিয়া লইতে চাহিতেছিল, ইহার সান্নিধ্যকেও  
তাহারা যেন সম্মান বা সন্মোচন করিতে সমর্থ হইতে-  
ছিল না, এটুকুও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে  
পারিল না।

ঈর্ষ্যার শত সহস্র বৃন্দিকের তীব্র-দংশনে তরুণ-  
চন্দ্রের সমস্ত হৃদয়-প্রাণ যেন অসহনীয় বস্ত্রণার ফাটিয়া  
পড়িতে গেল। তবে এই — তাঁহার স্নেহের  
স্বপ্ন ভোর হইতে চলিয়াছে।

## তৃতীয় অংশ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ছপুরবেলা কৰ্ম-কাজ সমাপনান্তে ঘোঁত ও মার্জিত স্নানঘরের দালানে বসিয়া বায়ুন-মেয়ে থাকির-মা দাসীকে দিয়া টাকপড়া মাথার পাকাচুল বাছাইয়া লইতে লইতে ছ'জনে মিলিয়া মুনিক-বাড়ীর দোষগুণ গুণন্বরে আলোচনা করিতে নিবিষ্ট হইয়া আছে। উপরের সেই মোটা মোটা থামদেওয়া চওড়া দালানের এক পাশে গিন্নীর ঘরের পাখরের ঠাণ্ডা মেজের মহলন্দ মাজুর পাতিয়া শোকে ও চিত্তার অকাল-বৃদ্ধা গৃহিণী দিবানিদ্রায় ভ্রাতাইয়া পড়িয়া আছেন। যুবতী বধুটি এতক্ষণ তাঁহার গায়ের থামাচি খুঁটিতেছিল, এতক্ষণে তাঁহাকে নিদ্রিতা এবং নিজের পোষা বিড়াল রতনমণিকে ল্যাজ ছলাইয়া নিকটে আসিতে দেখিয়া সেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

সেই দালানেই সারি সারি পাখীর খাঁচা ঝোলান। তাহার গলার সাড়া পাইয়াই একটি লোহার খাঁচার বন্ধগলার তিন-বন্ধা তে-নরির কণ্ঠস্বীকা চন্দনা আধহাত লম্বা পুচ্ছ নাচাইয়া শব্দ করিয়া উঠিল, “রুপু! রুপু! রুপু!”

উন্মিলার কক্ষতলে সোহাগী বিড়ালীটার চোখ এই শব্দে চক্চকে হইয়া উঠিয়া গলা হইতে ধ্বনি উথিত হইল, “পরু!”—

“কি রতুমনি! ঈশ! নোনা যে স্ক স্ক করুচে!” বলিয়া সেই লোভাতুরের গালে দুই আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া সে পাখীর উদ্দেশে মুখ তুলিয়া তাহারই অনুকরণ করিল,—“রুপু! রুপু! রুপু!”

ডাকটা ফেরত আসিল, মাঝে হইতে একাঙ পিতলের দাঁড়ে-বসান কাকাতুষাটা তাহার হাঁড়ির মতন মোটা গলায় আওয়াজ বাহির করিয়া মুকব্বি-চালে হাঁকিল, “রুপো—রুপো—রুপো!” পাখীটির নাম তাহার রূপের গরবে ‘রুপসী’ রাখা হইয়াছিল, ডাক নামটি “রুপু।”

পাখীর শব্দ বিড়াল-বাচ্চাকে ঘাড়ে করিয়া তখন আর অধিকক্ষণ অরি-মিত্র যোগ না করিয়া উন্মিলার ‘রতুকে’ লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল

এবং সেখানে তাহার নাহশব্দ নরম দেহটি নিজের কোলের মুখে ফেলিয়া জাহ্নু দোলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল। ছটো ডব্‌ডবে সবুজ চোখের উপর করতলের মূহ মূহ আঘাত দিতে দিতে ঘুম-পাড়ানিয়া ছড়া বলিতে আরম্ভ করিল—

“আর চাঁদ আর!

বাঁশবনের ভিতর দিয়ে

চাপাগাছের উপর দিয়ে

নীলসাগরে সাঁতার দিয়ে

আর চাঁদ আর!—

দে রে ধরা চাঁদের কাঁদে—

নইলে বে রে চাঁদ কাঁদে—

আঁচল-কোণে রাখ্‌ব বেঁধে——”

সিঁড়িতে এবং তার পর দালান দিয়া জুতার মস্‌মস্‌ রব তুলিয়া বে লোক এই ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরের ভিতরকার এই দৃশ্যটি চোখে পড়িতেই সে ব্যক্তি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“বাঃ! বাঃ! উন্মিল! বেশ তো তোমার চাঁদটি! আহা! বেন ষোল কলার পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ।”

নিজকণ্ঠের কলরবে এতক্ষণ উন্মিলার কণ্ঠ ইহার জুতার শব্দে ছিল, এখন পরিচিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সে অকস্মৎ ভীষণ ভাবে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল এবং ইতাবসরে তাহার কক্ষ-স্থিত বিড়ালশিশুও নিজের অনিচ্ছা-সেব্য আদরের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেই এক লাফ দিয়া নামিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।—তাহা দেখিয়া আগন্তুক ব্যক্তি আর একবার তেমনি করিয়াই উচ্চ কোঁতুক-হাস্তে সারা কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

ইহার ভিতরে উন্মিলার নিজের কোমরে-জড়ান মল্ল ছোবান বৃন্দাবনীছাপা সাড়ীর আঁচল খুলিয়া মাথায় তুলিয়া দিয়াছে, এবং কিছু বিষম-ভাবেই অবাচ্‌ চোখে এই অদ্ভুত আচরণশীল অপরিচিত ব্যক্তিটিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এর সম্বন্ধে কোন পথ যে সে অবলম্বন করিবে, তাহার কিছুই এখনও ভাবিয়া পায় নাই।



নিম্নগণের অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই লোকটি কিন্তু দিয়া প্রতিভমুখে ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া অপর আসনের অভাবে বিছনা-পাতা খাটের উপরেই সটান বসিয়া পড়িলেন ও বিষয়ে ইতবুদ্ধিপ্রায় উর্শ্বিলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কি গো, ‘উর্শ্বিরাণি!’ বলি, চিন্তেই পারলে না যে! আমি কিন্তু সিঁড়ি উঠতে উঠতে তোমার ঐ ‘দে রে ধরা চাঁদের কঁাদে’র স্বর শুনেই তোমার চিন্তে পেরেছিলুম! তুই তো এতবড়টা হয়েছিস, তবু কিছুই তো প্রায় বদলাস্ নি।”

উর্শ্বিলা বিবম সমস্তায় পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া পুনশ্চ কপালভাবে তিনিই বলিলেন, “নাঃ! এ মেয়ে-মানুষের জাতের কাছে মনে রাখানর দাবী করতে যাওয়ার মতন ছরাকাজকা দেখছি নসারে আর কিছুই নেই! অস্বি বিষয়-বিষুটে! তরুণ-চক্র লাহা নামক কোন অভাগা—আমরকের কথাটা কি একটুও স্মরণ হয়? অথবা—”

“ওহো! বুঝতে পেরেছি—এইবার বুঝতে পেরেছি,—আপনি বড় জামাই-বাবু! ও সেই জন্তেই যেন আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছিল, অথচ—”

“তোমার মুণ্ডু হচ্ছিল। কোথায় ‘চিনি চিনি’ করছিলি রে? মুখখানা তো বেজায় ‘তেতো তেতো’ করেই চোক বার করে চেয়েছিলি! অচ্ছা, এখন চিন্টি তো? আর এইখানে বসবি আর। ভাল করে তোকে একটু দেখি।”

এতকণে উর্শ্বিলার হারাণ সাহস কিরিয়া আসিয়াছিল। প্রায় যুগাকরের পরপার হইতে তাসিয়া আসা এই প্রায় অচেনা আপনার লোকটিকে যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন থাকিতেও পারে, তেমন কথা মনের মধ্যে তুলেও না ভাবিয়া সে এই আকস্মিক প্রাপ্তির গভীর আনন্দে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সানন্দ কলরব করিয়া বলিতে লাগিল, “তা চিন্বেই বা আপনাকে কেমন করে? কতকাল হয়ে গেল আপনাকে যে চক্ষেই দেখি নি, সেইটি বলুন দেখি? ন’বছর দশ বছর তো খুব হবে। আর তখন তো আপনি সারেসও ছিলেন না! আপনার তখন গোঁফ ছিল, খুঁটি-টুটি পরুতেন! তা’ এতকাল পরে যে বড় আমার কথা আপনার আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল? কি ভাগ্যি!”

শেষ কথাগুলো সে ঈষৎ অতিমানের স্বরেই বলিল।

তরুণচক্র জুতা-পরা পা দোলাইতে দোলাইতে মুহ-মুহ হাসিতে হাসিতে সেই সকল সন্দেশ অসু-যোগ ভিত্তিতেছিলেন, শেষ কথাগুলো ও তার স্বরটুকু গায়ে না রাখিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়াই বলিলেন, “তুই বুঝি গোঁফ রাখার খুব পক্ষপাতী? তোমার বরটির বোধ হয়, চাড়া দেবার মতন খুব ভাল রকম গোঁফের জোড়াটি? হ্যাঁ রে, তোমার বরটি কোথায়? তাকে একবার ডাক না, তার সঙ্গেও একটু ভাব করি।”

‘বরের’ কথায় লজ্জায় মাথাটি নামাইয়া উর্শ্বিলা মোম হইয়া রহিল।

“ও কি রে উমি!—তোমার বিয়ের দিনেই বুঝি তোকে সে-ই শেষবার দেখেছিলুম? তখন তো ‘বরের’ আঙ্লান্দে তোমার ছ’পাটি দাঁতের একটিও যদি ঢাকা পড়ছিল! সে দিন তুই আমার কি বলেছিলি মনে আছে? আমি তোকে ‘কনে’ বলতুম কি না,—তোমার বর আসতেই গিয়ে বল্লুম, ‘হ্যাঁ রে উমি! তোমার যে বর এলো রে, এখন আমার দশাটা কি হয়?’ তুই তখন বল্লি—”

একটা বিসদৃশ কিছু বলিয়া থাকিবার আশঙ্কার মাথার সঙ্গে নাকের নথটা জীবন বেগে দোলাইয়া উর্শ্বিলা ঝাঁজিয়া উঠিল, “ধান্ ধান্! ওসব আমি শুন্তে চাইনে। আচ্ছা বহন আপনি, আমি ছুটে গিয়ে বাকে একটু খবর দিয়ে আসি।”—বলিয়া বথার্থই সে আনন্দ-মগ্ন বালিকার মতন নাচিতে নাচিতে ছুটিল! তাহার চলন্ত-মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তরুণচক্র মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ অমুত্তব করিলেন।—একটা নিখাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন:—“আমার জীটা যদি এমনও হতো; তা হ’লে কি আর আমার আজ এমন করে—”

উর্শ্বিলা শাওড়ীর কাছে সব কথা জানাইয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাঁহাকে শুদ্ধ নিজের পিছনে পিছনে টানিয়া আনিয়াছে। সে আসিয়া দেখিল, তাহার ‘জামাইবাবু’ তখন বরের দেওয়ালে ঝুলান একটা ছবি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। উহার আগমন জানিতে পারিয়া মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এরা কারা রে? তুই আর তোমার বর বুঝি?”

“যাঃনু”—বলিয়া ঝঙ্কার করিয়া উর্শ্বিলা পুনশ্চ শাস্ত্রবরে কহিল, “না এয়েচে।”

তরুণচক্র কিরিয়া গৃহিনীকে প্রণামপূর্বক ভক্তি-ভরে পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, “এসো বাবা এসো। দীর্ঘজীবী হও, রাজা হও, মনের সুখে থাকো! হ্যাঁ বাবা! প্রেম আমার একটু সার্চে-টার্চে?”

“তেমন, কই।”—বলিয়া উত্তর দিয়াই তরুণচন্দ্র উন্মিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এক গ্রাস খাবার আন তো উমারিণি!”

উন্মিলা চলিয়া গেলে স্বর কিছু ছোট করিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “প্রমিলার দুঃখময় জীবনের শেষ হয়ে এসেছে, তার আর বাঁচবার আশামাত্র নেই।”

গৃহিণী বলিলেন, “আ—হা!”

তখন তরুণচন্দ্র আরও একটু নিঃস্বরে ও স্বরিকণে কহিলেন, “দেখুন, বিনয়ের সম্বন্ধে আমি ছটো খবর পেয়ে আপনাকে তাই জানাতে এলাম। দেখা শোনা নাই থাক, তবু সে আমার আপনার লোক তো বটে! আপনি তাকে কলকাতার হজুগে পড়ে মাটি হাতে দিয়ে রেখেছেন কেন?”

জগদ্ধাত্রী মাতৃ-হৃদয়ের সন্তপ্ত অভিমানের উৎস এই কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—“আমি তাকে ফেলে রাখবার কে বাবা! যে ফেলে রাখবো?—সেই যে এখন এ বাড়ীর হর্তা, কর্তা, সেই তো আমাদের হৃদয়কে বনবাস দিয়ে রেখে যা তার মন চাইচে তাই করে বেড়াচ্ছে!”

তরুণ অবাক হইয়া গিয়া কহিলেন, “আপনার কথা সে শোনে না, না কি?”

“হ্যাঁ—আমার কথা শুন্বে! যার বাড়ী নেই, সেই তাঁকেই বড় মেনে ছিল! ‘বিনে’ ‘বিনে’ করে যে পাগল হতেন, বিনয়ের তো বড় খোজ খবর! কার দোষ দোষ বল, বাবা! ও আমার গর্ভের দোষ,—আমার ভাগ্যেরই দোষ! পোড়া পেটে একটাও কি আর মানুষ জন্মতে নেই? দু-দুটো ছেলে হলো, দুটোই কি বাদর হাতে হয়? এই তো তুমিও তো বিলেত গেছলে বাবা, অতবড় একটা চাকরীও তো কর্চো, তা মন তো আর তার মতন বিলিতী হয়ে যায় নি।”

তরুণ কহিলেন, “তা এখন শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নিজেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেই তো আর হবে না যা! যাতে ছেলেটি আপনার ঘরে ফেরে, জেল কেল-একটা না হয়,—তাঁ ছাড়া আরও যে একটা মস্ত রকম কলেক্টারীরও জোগাড় সে করে তুলে, সে সবগুলো থেকে যাতে রক্ষা

পায়, তার জন্ত তো আপনাকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।”

• মনে মনে অত্যন্তই শঙ্কামুভব করিতে থাকিয়া জগদ্ধাত্রী কাতর-কণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিলেন,— “বাবা! তা হলে কি হবে বাবা? ও মা, হতভাগাও কি আবার ঐ বড়র পথেই গেল না কি গো? আ! তের বছর বয়সে যে ওর ঐ ভয়ে বিয়ে দিলুম, বলি তা হলে আর কোন দিকে বুঝি চেরে দেখবে না। তা’ এ আবার আমার দেখছি উল্টে দুঃখ জালা হলো!”

উন্মিলা বাতাসে রুদ্ধ স্বর বনাৎ করিয়া খুলিয়া গালভরা পানের সঙ্গে চোঁটভরা হাসি লইয়া কাঁচের গ্রাসের জল ভগ্নিপতির হাতে তুলিয়া দিল। “দেখুন তো, আমাদের নীচের কুঁজোর ঠিক বরফ-জলের মতন ঠাণ্ডা নয়?”

“তাই তো রে!” বলিয়া তরুণ হাসিয়া জল পান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী-অতিকষ্টে নিজের আহত হৃদয়ের জালা চাপিয়া ক্রীণকণ্ঠে কহিলেন, “বোমা! যাও তো বাবা! বায়ুন-মেয়েকে দিয়ে বড় ছেলের খানকতক গরম লুচি, একটু আলুর দম, আর দু’খানা আলু-পটলের ভাজা চট করে করিয়ে নিয়ে তো। আর কাপড় ছেড়ে তাঁড়ার-ঘরের শিকে থেকে পেড়ে কালকের বানানো নাড়ু আছে, তাই দিয়ে দিও গোটাকতক। যাও, শীগ্গির করে যাও।”

সন্তুষ্ট-মনে কন্দিষ্ঠা উন্মিলা লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া গেল। তাহার বন্ধনহীন-প্রায় অবসর-কালকে কোন এক আপনার লোকের জন্ত একটুখানি উৎসর্গ করিতে পাইয়া সে যেন আজ বর্তাইয়াছিল।

জগদ্ধাত্রী ছই চোখে কঠোর কাতরতার সঙ্গে মিনতি করিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, “হতভাগা ছেলে কি যে করেছে, জানিনে। তবে ওর রকম সন্ধ্যা দেখে দেখে অনেক দিন থেকেই আমারও কেমন যেন মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কলেজে পড়লে, সব করলে, শেষ পরীক্ষার সময় কোথাও কিছু নেই, হট করে কয়েক ছেড়ে দিলে। তাই না হয় না পড়িস্ ধরেই চলে আস। নিজের জাত-ব্যবসা যা সব আছে, তাঁনার—অতবড় কার-কারবার, সেই সবই দেখ শোন্ না, পড়বার তাঁদের দরকারই যে ছিল না; সে-ও তো তাঁদের নিজের নিজেরই সখ। তা’ নয়—আবার পাঁচ জনেরই মুখে মুখে



উন্টে পাই, পথে পথে না কি টোটে ক'রে বেড়িয়ে—কোথায় কোন্ ভিখিরী মরছে, কে কোথায় কার হাওয়াগাড়ী কি ট্রায়ে কাটা পড়েছে, তাদের নিয়ে সেবা হচ্ছে! খাওয়া নেই, ঘুম নেই, পায়ে একটা জুতো,—মাথায় একটা ছাতা পর্যন্ত নেই—পথে পথে কাপড় বেচা হচ্ছে, দেশ না কি এই ক'রে উদ্ধার করা হচ্ছে! ভয়ে আরি আশ্রয় হারিয়েছেন বাবা! রাতে আমার ঘুম হয় না, কোথাও একটু শব্দ হলে যেন বুক আমার ধসে পড়ে। কেবল মনে হয়, কোথা থেকে বুঝি কি কু-খবরই বা এলো! তা এই তুমিই তো বলচো যে, তার বিপদ না কি এসেই পৌঁছে গেছে? মন যে অন্তর্যামী!—আর নেহাৎ বেশী কিছু না ঘটলেই কি আর এত কষ্ট ক'রে তুমি নিজে এসেছ?—জগদ্ধাত্রী চোক দিয়া হুহু শব্দে জল পড়িতে লাগিল।

তরুণ তাঁহাকে অর্ধ-সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “দেখুন মা! বিপদ বিনয়কে সত্যি সত্যিই ঘিরেছে। আমি কোন রকমে জানতে পেরেছি, তারা তিতর তিতর একটা খুব বড় রকমই বড়বড় করছে। তার জন্ত অস্ত্রশস্ত্রও না কি নানাদেশ থেকে জোগাড় হচ্ছে। এই সময় খুব বেশী সাবধান না হলে আর তাকে রক্ষা করা যাবে না। তা ছাড়া কল-কাতার এক বিলাতফেরৎ ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেও তার নাম নিয়ে আজ কাল খুবই গোলমাল যাচ্ছে। তাঁকে না কি সে বিয়ে করতেও চায়। আচ্ছা, উন্মিলাকে কি তার মনে ধরে নি? কেন, ও তো খান্না মেয়ে!”

জগদ্ধাত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “সকলিই আমার বরাত রে বাবা! সকলিই আমার এই পোড়া বরাত!—উন্মিলাকে সেই একরকমি বেলা থেকে যে পিঠোপিঠির মতন ক'রে এসেছে কি না, এখনও ওদের ঠিক সেই রকমই চলে যাচ্ছে। এখনও বাড়ী আসে তো অস্ত্র ঘরে শোয়; কেবল দুটি রাতদিন ছেলেমানুষের মতন মারামারি আর হুড়োহুড়ি! হাজার বল্লোও শোনে না, বোঝে না, আর বাড়ীতেও তো কেউ ওদের সম্বয়নী নেই যে, তেমন ক'রে বুঝিয়ে বলে। কউটোও হয়েছে বোকার একশেষ। আমি বলি তো ওকে বিধিয়ে বিধিয়ে, তা গণ্ডারের চামড়া না কি যে ওর গায়ে আছে, সকলি যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন ভুগুন হত-ভাগা মেয়ে!”

তরুণ একটু চিন্তিতমুখে নীরব রহিল দেখিয়া জগদ্ধাত্রী উঠিয়া আসিয়া একবারে তাহার দুই হাত

হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “যদি পোড়াকপালীর মুখেরে কষ্ট ক'রে এতদূর এসেইছ বাবা! তা হলে যাতে আবাগীর বেটীতে জন্মের মতন ভেসে না যায়, তারই একটা উপায় কর। ওর এই সোমোত্ত বয়েস, দেহতরা রূপ, যা হোক ঘরে দুটো পরসাত আছে, ওকে দেখবেই বা কে? ওর দশা হবে কি?—আমি আর কদিন! দোহাই বাবা! তুমি একটা মেজ-টার, তুমি মনে করলে কি না পারো? ওকে কোন রকমে একবারটি ঘরে পুরে দিয়ে যাও।”

“আমিও তো তাই চাইছি। আচ্ছা দেখুন, আপনি যদি বিস্তর কাদাকাটা ক'রে ওকে বাড়াতে আনিরে নেন; আর এলেই ওকে ও উন্মিলাকে সঙ্গে ক'রে,—ধরুন—এই বদরীনারায়ণই চলে যান এবং সেখান থেকে ফিরে ছবিকেশে কিছুদিন ধরে ওদের নিয়ে বাস ক'রে থাকেন। অর্থাৎ বৎসর খানেক ঐ রকম অনেক দূরে দূরে জনসঙ্গ ছাড়া নিভৃত স্থানে ওকে যদি আটকে রেখে দিতে পারেন, তা হলে হয় তো হ'রকম বিপদ থেকেই বেঁচে যেতে পারে। বুঝলেন? তা ভিন্ন আর তো কোনই উপায় দেখি না।”

জগদ্ধাত্রী এ পরামর্শে কথঞ্চিৎ শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও অবস্থিতে অধীরা হইয়া পড়িলেন, “হ্যাঁ বাবা, এ যে তুমি বলচো, তো খুবই ভাল কথা বাবা! তোমার বুজির উপযুক্তই তো পরামর্শ দিয়েছ, তা, সে হতভাগা ছেলে কি আর আমার কথা কানেই তুলবে? না, আমার সে দিন আর আছে? যা বলতে বিনয় আমার এত দিন অজ্ঞান হতো, এখন ‘দেশ’ পেয়ে যে পোড়াকপালী নাকে সে ভুলে গেছে।—ও বাবা! আমার মুখ চাইবার আর কেউ নেই। ভগবান তোমার ভাল করবেন, আমার হুঃখ দেখে তুমিই দয়া ক'রে যদি কোন উপায় ক'রে দাও।”

তরুণ সবিনয়ে কহিলেন, “সে কি আর আপ-নাকে আমার কষ্ট ক'রে বলতে হবে মা! দেখুন, আমার নিজের বোন নেই, উন্মিলা আমার ছোট বোনটির মতন। তার যাতে ভাল হয়, সে কি আর আমি না করবো। তবে কথা কি জানেন, আজকালকার ছেলেরা একটু বেশী পরিমাণে স্বাধীন হয়ে উঠেছে। তারা আমাদের মতন লোককে কেয়ারই করে না, বরং গবর্ণমেন্টের চাকরী করি বলে ওদের চোখে আমরা লোভী, ভীক, এবং অপদার্থ। তারা সব এ বুগের অর্জুন, ভীক।—

কাজেই তাদের সামনে যেতে আমরাও ভরসা কম করি। না হলে আমি তাকেই তো নিজে ডেকে এ সব কথা বলতে পারতুম। অনর্থক এতদূর আসবার তো কোন দরকারই ছিল না। তা আপনারা যতদূর পারেন চেষ্টা করে তো দেখুন, নেহাৎ না হয়, তখন আমি তো আছিই।”

“বাবা! তোমার ভগবানই কৃপা করে দুঃখীদের কাছে এনে দিয়েছেন, যাতে সুবিধা হয় তাই করে। আমি মুখা মেয়ে-মানুষ;—শৌকে, রোগে জানোয়ার ব'নে রয়েছি; কি আর তোমার বেশী বলবো? তুমি একটা জেলার নেভেটর, দিনরাতই তো ওই সব করুচো, যাতে হতভাগাটা বেঁচে যায়—তুমি তাই করে।”

হাস্ত-কৌতুকের মধ্যে দিয়া জলযোগ সমাধা হইলে, তরুণ বলিলেন, “তোমার সেই সোনার না হীরের চাঁদটিকে একবারটি কোলে করে নিয়ে আর তো রে উমি! আহা, বেড়ে মোটা ল্যাঙ্কটি তার।”

উম্মিলা তাহার পোষ্যপুত্রের ‘ল্যাঙ্কের’ প্রশংসার আক্লাদে ডগ্‌মগ হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ও খানিক পরেই অনিচ্ছুক বিড়াল-ছানাটাকে ঝাড়ে চাপাইয়া সেটাকে নাচাইতে নাচাইতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

তরুণচন্দ্র পকেট হইতে একটি ভেলভেটের বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যে হইতে খুব সুন্দর গঠনের একটি সোনার চেন লইয়া সেই বিড়াল-ছানাটার মাথার উপর সেটি ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। চেনটার মাথখানে একটা বড় ধুকধুকি। তাহাতে বড় একখানা ওপালের চারিপাশে সোনার পাতার মুকুতা-খচিত। জিনিসটার দাম আছে।

“এ আবার কি? নাঃ!”—বলিয়া হারগাছা হাতে করিয়া উম্মিলা বিড়াল-বাচ্চাটাকে ছাড়িয়া দিল।

তরুণচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তোমার খোকার মুখ দেখবো ব'লে আসবার সময় কিমে এনেছিলুম রে! তা আমার উম্মিলায় যখন ঐ রকমেরই খোকা, তখন কাজে কাজে তাকেই দিতে হচ্ছিল! আচ্ছা আয় দেখি, তা হলে তাকেই না হয় পরিয়ে দিবে যাই। দেখলে মধ্যে মধ্যে শুবু এই অভাগা জামাইবাবুটার কথা পড়ে যাবে এক আধবার।”

উম্মিলার বিস্তর আপত্তি-সত্ত্বেও তাহাকে সেই বিড়াল-প্রসাদী হারগাছা পরিতে হইল, এবং শেষে শিটমাটো হইল এই রকমে—“আচ্ছা, ওটা তুই

অমনি না নিস, ওর বদলে আমার না হয় ওর চাইতেও বেশী দামের খুব ভাল জিনিস একটা দিবে দে। কেমন রে! প্রাণ ধ'রে কি পারবি দিতে?”

জিজ্ঞাসু-চোখে চাহিতেই তরুণচন্দ্র সম্মতমুখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, “তোমার হুঁজনকার ঐ কটোখানা।”

“ওঃ তারি তো!” বলিয়া উম্মিলা ঠোট উল্টাইয়া মুখ ফিরাইল এবং তৎক্ষণাৎ সেখানি ফ্রেম-ডক খুলিয়া আনিয়া অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া ভগ্নিপতির হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, “তারি তো, এর বুঝি আবার অত দাম! আহা হা, যা বুঝি গো!”

তরুণ সেখানি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া সহাস্ত-মুখে উত্তর দিলেন,—“যা হোক তোমার বুঝির দোড় যে কতদূর, তা বেশ জেনে রাখলুম।”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণা ইংরাজীতে লিখিত এই পত্রখানা পাইল।—  
আমার প্রিয় বেবি!

কাজের ভিড়ে ক'দিন তোমার খবরাখবর নিতে পারি নি, তার জন্য আমার মাপ করো। আশা করি, তুমি শারীরিক বেশ সুস্থই আছ? তোমার বাবা কিছু সুস্থ হইয়াছেন কি? তাঁর যে নূতন প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সেদিন পাঠাইয়াছি, তাঁর কাজ-কর্ম বেশ মন দিয়া করিতেছে তো?

একটা অপ্রিয় সংবাদ দিতেছি। সত্যটাকেও ‘প্রিয়’ ভাবে প্রকাশ করা শাস্ত্রকারদের অনুমোদিত হইলেও অবস্থা-বিশেষে শাস্ত্রশাসনলঙ্ঘনে আমাদের যে সমস্যা বাধ্য হইতে হয়, অবশ্য সেটা তুমি বোধ হয় এখনও অস্বীকার করিবে না?

দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার নবীন-বান্ধব ও উপদেষ্টা বিনয় শীল নামধারী লোকটির সকল রহস্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এই বিনয়কুমার শীল আমার মৃত্যুদ্বার-সমাসীনা চিরকথা স্ত্রী প্রমিলার ছোট বোন উম্মিলার স্বামী। সেই সম্বন্ধে সে আমার ‘ভায়রা-ভাই।’ তুমি জান, খণ্ডর-কুলের কাহারও সহিত আমার বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। বিনয়কুমারকে তাহার বিবাহ-রাত্রে একবার-মাত্র এগার বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম, তাই সে দিন রাত্তার দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারি নাই। গত কল্যা বিশেষ কার্যব্যাপদেশে কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম, সেখানে বহুদিন পরে আমার শালী উম্মিলাকে



দেখিলাম। উন্মিলকে দেখিতে এখন খুবই সুন্দর হইয়াছে! তাদের দু'জনকার একসঙ্গে তোলা ফটোগ্রাফ একখানা উনি আমার উপহার দিয়াছিল; তা—স্বী সুন্দর ছবি উঠিয়াছে! এই সঙ্গে সেখানি তোমার পাঠাইলাম, মিলাইয়া দেখিও, এই উন্মিলার স্বামী বিনয় শীলই তোমার সেই নব-পরিচিত ও বন্ধু বিনয়শীল কি না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন তোমার নূতন বন্ধুর আশা করা তোমার পক্ষে অধিকতর নিশ্চিন্ত হওয়ারই আশঙ্কাপূর্ণ, [যেহেতু, তার স্ত্রী তোমারই মত সুন্দরী ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, অধিকন্তু তোমার পেক্ষারও ছ'এক বৎসরের অন্নবয়স্কা] তখন অনর্থক তাদের সুখময় আনন্দময় আশা-সরস তরুণ দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নিরানন্দের বিচ্ছেদের বেদনার হাহাকার না টেনে এনে যে লোক আজ দীর্ঘতম আট বৎসর একাদিক্রমে তোমারই ধ্যানে তন্ময় হয়ে বেঁচে আছে, তারই কাছে ফিরে এসো না কেন? আমার স্ত্রীর অবস্থা প্রতিদিনের চেয়ে প্রত্যেক দিনেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তার শেষ হবার আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু বিনয়-কুমারের স্ত্রী উন্মিলার হয় তো তোমার পরেও কিছুদিন বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। বিবাহিতের সহিত নিজের নামকে জড়িত রাখা তোমার বিশেষ অনিচ্ছা জানিয়াই এই খবরগুলি তোমায় দিলাম। বিনয়ের সহিত তোমার নামোন্মেষ ইতোমধ্যেই কোথাও কোথাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, [ইহা ইচ্ছা করিলে বিশ্বস্তহস্তে জানিতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়]। চিরকথা ও উন্মাদ স্ত্রীর স্বামীর নামের সহিত উল্লেখ হওয়ার অপেক্ষা কোন সুন্দরী স্ত্রীলা পুণ্যচরিত্রা রমণীর পতির সহিত সংযুক্ত হওয়ারে কি তোমার নামের গৌরব বৃদ্ধি হইবে আশা করো? তন্নিম্ন কোন ভদ্রমহিলার নাম সাধারণে যদি পাঁচবার পাঁচ জনের সঙ্গে সংযোগ করে, তাহাতে সমুদয় ভদ্রসমাজেরই মানি। ভরসা করি, আমার কঠোর কর্তব্যপালনব্যপদেশে অপ্রিয়ভাবে প্রযুক্ত সত্যকথাগুলি তোমার পক্ষে অসহ্য হইবে না এবং এর জন্য আমার তুমি ক্ষমাও করিতে পারিবে? তোমাদের কুশল জানিতে ইচ্ছুক ও উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

তোমার চিরানুগত তরুণ।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কুমার মুখের উপর বিবিধ ভাবের তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ক্রীড়া করিয়া গেল। তাহার কবিত কাঞ্চনবর্ণ কখনও তীব্র বেদনার

কালো দেখাইল, কখনও অকথ্য অবমাননার অসহায় ক্রোধে হাপরে-ভরা স্রবণের মতই তাহা রাস্তা হইয়া উঠিল,—অবশেষে চিঠি পড়া সমাধা করিয়া সে সেই একই ভাবে কতক্ষণই যেন অবসন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। কখন একান্ত অপ্রত্যাশিত মর্ম্মস্তদ্বৎ হঃখে তাহার স্বভাব-রক্ত কপোল ললাটের রক্তরাগ অপমৃত হইয়া গিয়া তাহাকে বিবর্ণ পাণ্ডুরাভ করিয়া তুলিল। সম্পূর্ণরূপেই অচিন্তনীয় ব্যাপার কিছু না ঘটিলে যাহুকের সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার, সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি এমন করিয়া বৃদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায় না!

যখন বহুকণ পরে আপনাকে আপনিই আবার স্মরণ করিয়া লইবার সারথ্য ফিরিয়া আসিল, তখন নিজের কোলের উপর চোক পড়িতেই মত্তবড় একখানা খামে মোড়া 'পেটবোর্ডের' রক্ষণার মধ্যে সেই তথাকথিত ফটোগ্রাফখানার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তার পর আর একটুখানি সময় ধারিয়া থাকিয়া বন্ধের উদ্ধার নর্ত্তন-বেগকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া মোড়ক খুলিতেই হস্ত-সংস কোতু-কোজ্জল একখানা বড় পরিচিত—বড় পরিচিত মুখের পাশেই এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা কিশোরীর হস্ত-প্রফুল্ল পুরস্ক মুখের উপর তাহার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বাধিয়া রহিল। এই সেই নারী, যাহাকে তাহারই মত 'সুন্দরী ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্ন' বলিয়া মিঃ লাহা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন! ইনিই বিনয়-কুমারের স্ত্রী উন্মিলা শীল! ফটোগ্রাফ-খানা নামাঙ্কিত রাখিয়া দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে স্তব্ধ ও আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন রেখাচিত্রের জায় তাহার কাছে কতকগুলি কালির আঁচড় মাত্র বোধ হইতে লাগিল। জীবনের নব-জাগ্রত আশা-স্বপ্নের অর্ধেকখানাই তাহার বৃদ্ধি সেই সঙ্গে ভাঙিয়া গেল।

দু'দিন পরে মিঃ লাহা তাঁহার উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিত্য-প্রতীক্ষিত পত্রের এইরূপ উত্তর পাইলেন।—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার পত্রে আমার 'নবীন-পরিচিত' ও কর্ম্ম-সঙ্গী স্ত্রীবৃত্ত বিনয়-বাবুকে আপনার নিকটতম আত্মীয় জানিয়া বিশেষরূপ আনন্দিত হইলাম। বিনয়বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ-পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে, বড় সুন্দর মেয়েটি! যদি কখন আপনার বাড়ী তিনি আসেন, খবর দিলে গিয়া নিশ্চয়ই একবার দেখা করিয়া আসিব এবং সম্ভব হইলে তখন তিনিও আমাদের কর্ম্ম-সঙ্গিনী হইবেন।

আপনি অনেকখানি অনবিকার-চর্চার অনর্থকই নিজের মাথা বকাইয়াছেন; এবং আমাকেও সেই সঙ্গে অহেতুক অপমান করিয়া ফেলিয়াছেন! আমার আপনার নামের সহিত আমার নাম নিরুদ্ভূত-বশতঃ দীর্ঘ-কাল ধরিয়া জড়িত রাখার ফলেই আজ এই পর্য্যন্ত আমার মর্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আপনি এবং আপনার মত যে কেহই আমার সম্বন্ধে দুইটা কথা কহিতে পাইলে ছাড়িয়া দেননা। যাহা হউক, আমার সন্মান কুনামের চিন্তায় আপনি আর অনর্থক হুঃখভোগ করিবেন না। এখন হইতে আমাদের দুজনকারই ঐ সম্বন্ধে ছুটি হইয়া যাক। তবে নিতান্তই যদি দুর্ভাবনার ■■■ আপনার নিজস্বাধীনতা জন্মে; সেই জন্তই জানাইলাম যে, বিনয়বাবুর সম্বন্ধে আপনার ঐ অতি হেয় ঈর্ষ্যা একান্তই নিশ্চিন্ত। আপনি বা আর কেহ—কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন ব্যক্তির সহিতই আমি নিজের নামকে আর সম্বন্ধ গুণিতে ইচ্ছা করি না—এবং সত্যকথাই বলিব;—বিবাহে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। বিবাহেই আমার প্রবৃত্তি নাই। অতএব নিশ্চিত-চিত্তে নিজের পত্নব্যাপথে স্বচ্ছন্দে গমন করুন; আর দোহাই আপন-নার, আমার পথে আমার একটুখানি স্বত্তিতে চলিতে দিন। মিনতি করি, আমার পিছনে আর ধাক্কা করিবেন না।

আর এক কথা,—আপনার সহিত আমার বিবাহের বাগ্‌দান-ভঙ্গস্বরূপ আপনার দেওয়া মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি আপনাকে ফেরৎ দেওয়া আমি উচিত বলিয়া মনে করি। ‘ইন্সিওরড’ পার্শেলে আপনার টাকায় কেনা মুক্তার মালা,—আপনার দত্ত হীরার ও মুক্তার ব্রোচ দুট, হীরার আংটি, চুনীর ব্রেসলেট ও গবর্ণমেন্ট হাউসের নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে বেনারসীর স্ট্রুটেরি করাইতে আপনার কাছে ধার লওয়া টাকার সাতাশো পঁচিশ খরচ হইয়াছিল, সেই ‘অব্যবহৃত’ সাদী ও ব্লাউস দুইটিও ঐ সঙ্গেই পাঠাইতেছি। আমি গরীব, অতঃপর গবীবের মতই থাকিব। ও-সব আমার আর কোন্ কাজে লাগিতে পারে? ভবিষ্যতে যিনি ব্যাক্সিষ্ট্রেট-মহিষী হইবেন, তাঁহার কাজে লাগিবে।—আপনার কাছে আমার বাবা অনেক ধানে আবদ্ধ, অন্তরের ঋণও আপনার সঙ্গে আমাদের প্রচুরতর। অর্থ-ঋণ বাবার ঘর-বাড়ী বিক্রী করিয়া শোধ হইতে পারে; আপাততঃ আমার কয়েকখানা গহনা বেচিয়া যে দশ হাজার

টাকা পাইয়াছি, এই সঙ্গেই দিলাম। আর আপনার মেহের ঋণ এ জন্মে শোধ হইবার নয়, সেটা ধারেরই থাকিল। আশা করি, সকল অবস্থা এইবারে পরিকাররূপে বুঝিয়া লইয়া আমার ছাড়ান দিবেন।

আপনার বিনীতা কৃষ্ণা মল্লিক।

ইহার পর কৃষ্ণার এই সুদীর্ঘ পত্রের উত্তর সঙ্গেপেই আসিল।—

আমার প্রিয় বেবি! তোমার পত্র ও গহনা টাকা ইত্যাদি ফর্দমত সমস্তই মিলাইয়া পাইয়াছি, কেবল পাই নাই সেই আমার স্বপ্ন-আহরিত অতি সুন্দর কটোধানি! হীরা-মুক্তার চাইতেও অমূল্য বোধে বোধ করি, সেইখানিই শুধু নিজের রাখিয়াছ?

তুমি যে লিখিয়াছ—বিবাহিত এবং কোন অবিবাহিত পুরুষের সহিতই তুমি সম্বন্ধে আসিতে আর সম্মত নও। কিন্তু এই মতটা তোমার—বিনয়বাবুরের সঙ্গীক কটোধানা দেখার পূর্বে যে ছিল না, ইহা নিশ্চিত।

যাই হোক ‘বিবাহিত’ এবং ‘অবিবাহিতের’ প্রতি বিরাগ জানাইয়া যে বিপত্নীকের প্রতি অনুরূপা-টুকু বাকী রাখিয়াছ, ইহাতে আমি ভবিষ্যতের ■■■ আশ্বস্ত রহিলাম। আশা করি, সর্বদীন কুশলে আছ? তোমার বাবার সংবাদ দিতে তুলিয়া গিয়াছি, তিনি কেমন থাকেন খবর দিও।

তোমার চিরানুগত ভরুণ।

ক্রোধোত্তেজিত বিকৃত হৃদয়কে এই পত্রখানি কৃষ্ণা মল্লিকের নিকট হইতে ডাকে আসিল। “মহাশয়!

আপনার ব্যবহার ভদ্রতার সীমা বহুদিনই অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে একেবারেই অসহনীয় বোধ করিতেছি। আমার ইচ্ছা, বাড়ীখানা বেচিয়া আপনার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিই। আপনার মত হৃদয়হীনের সংস্রব রাখার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

আর এক কথা—বাহাকে আপনি অন্তানু-রাগিনী বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাহাকে নিজের স্ত্রী করিতে চাহিতেছেন কোন্ হিসাবে? আপনার আরোপিত অপরাধের আমি প্রত্যাহার করিলাম না জানিবেন।—এইবার আমার মুক্তি দিন!—মুক্তি দিন! মুক্তি দিন!—

কৃষ্ণা মল্লিক।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় সে দিন প্রথম হরতাল। বড়-বাজার ■ হারিসন রোডের কতকগুলি মাড়ওয়া-রীর দোকান ভিন্ন প্রায় সব দোকানই বন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও উপবাসী ছেলেরা দলে দলে অন-ভিজ ও অধিকাংশ অশিক্ষিত নাগরিকবর্গকে 'হরতালের' বা সজ্জ-বস্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার উপকা-কারিতা ও উদাহরণ সচেষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বনে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোথাও কোথাও হুই দলে বেশ একটুখানি তর্ক জমিয়াছিল। কিন্তু 'সেরা প্রমাণ যে লাঠীর গুঁতা' সেটা এ ক্ষেত্রে কোথাও উপস্থাপিত করা হয় নাই। কারণ, 'হর-তালী'রা একবারেই লাঠিশূন্য।

'তৃতীয় পক্ষ' নিজেদের রেগুলেঙ্গ লাঠি এবং বন্দুক, বেওনেট, কিরীচ প্রভৃতি সমস্ত উত্তম করিবা-মাত্র একটা ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় আছে। ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণের আকাশের মতই সমস্ত ধম্বধমে ও তরু! রাস্তার দু'ধারে একতল হইতে চারিতল পর্য্যন্ত ■ বাড়ীর ঘাট জানালা বারান্দা ও পঞ্চম তলার ছাদে পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক জমিয়া উঠিয়া আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষায় যেমন করিয়া উড়িৎ মেঘে ব্যাপ্ত আকাশের দিকে চাহে, তেমনই করিয়া হর-তালী ও সশস্ত্র পুলিশ-সার্জেন্ট ও গুর্খাসমার্সের রাজ-পথের দিকে উৎপ্রেক্ষিত-নেত্রে চাহিয়া আছে।

শেরালদহের কাছাকাছি, হারিসন রোডের উপরের একটা বিলাতী কাপড়ের দোকানে জন-কয়েক আফিসের কেবলী কতকগুলি সৌখীন বস্ত্র ক্রয় করিতেছিলেন। 'মুটরার' সাজ পরা গুটি-কয়েক তরুণ ছেলের মাথখানে একটা তরুণী হাতের উপর ঝুলাইয়া কতকগুলি চরকার সূতার মোটা কাপড় লইয়া সেইখানে দেখা দিলেন। ছেলে-দের মধ্য হইতে এক জন সেই পাতলা কাপড়ের খরিদার-বাবুদের ডাকিয়া বলিল, "মশাই! আজ-কার দিনটাতে আর কেনা-বেচা না করলেই ভাল হয় না? একটা দিন বই তো নয়।"

বাবুদের মধ্য হইতে এক জন রুষ্ট-বিদ্রূপে জবাব দিলেন—"বান্ মশাই! নিজের নিজের চরকার তেল দেন গিয়ে, পরের উপর জুলুম করতে আস-বেন না, বল্চি।"

ছেলেটি হাত দুটি জোড় করিয়া সবিনয়ে কহিল—"আমরা দেশের তরফ থেকে দেশবাসীর সেবা করবার ভার নিষ্পেচি, জুলুম করা আমাদের

মোর্টেই উদ্দেশ্য নয়। একটা দিন জাতীয় গৌরব-বর্ধনের সহায়তার জন্য সকলেই সামান্ত ত্যাগ স্বীকার করুন এই অনুরোধ।"

আর একটা বাবু জবাব দিলেন, "তাতে আমার লাভ?"

"জাতীয় উন্নতি অবনতির মধ্যে আপনারও লাভ-ক্ষতি আছে বৈ কি! আপনি তো আ-জাতির বাহির নহেন।"

বাবুটির মুখ তামার হাঁড়ির মত দেখাইল। রোখ দেখাইয়া বলিলেন, "এ সব তোমাদের গুণ্ডারী! এক দিন হরতাল করলে কি তুখানা খদ্দর পরলেই কি ভারত স্বাধীন হয়ে উঠবে?"

এদের দল হইতে উত্তর আসিল—"না হ'তেও পারে। কিন্তু আমরা যে একটা স্বতন্ত্র মহাজাতি, আমাদেরও যে একটা জাতীয় ঐক্য থাকে সম্ভব, আমরা যে সংবদ্ধ হয়ে কঠিন কার্য্য সাধন করলেও করতে পারি, এ বোধটা অন্তের কাছেও কিছু মান বাড়ায় এবং নিজেদেরও প্রাণশক্তিকে সঞ্চরন করে। আর খদ্দর পরলে? তা বোধ হয় আত্মগৌরব একটু বাড়ে বই কমে না এবং বিলাসি-তার হ্রাসে অর্থ-সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হয়।"

যে বাবুটি প্রথম কথিয়াছিলেন, তিনি একটু নীতল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তা কি করবে। বন্ধি-বাণ! দেশী কাপড়ে বিলাতীর চাইতে অন্ততঃ জোড়া পিছু এক টাকা, বার আনা বেশী পড়ে, অথচ মোটা ও শ্রীহীন হয়।"

ছেলেটি বলিল, "মানলুম! তেমন ঢের বেশী ট্যাকসইও হয় তো এবং অনেক বাজে স্কিনিস কিন্তে হয় না ব'লে বিদেশী বস্ত্রনে যেটা বেঁচে যায়, তাতে এই পরমাটা পুথিয়ে গিয়েও লাভ থাকে। তা ভিন্ন চরকা ও তাঁতের চলন বাড়লে তুলোর চাব বৃদ্ধি হ'লে কাপড়ও সম্ভা হবে। বিশেষ বিলিতি কাপড় এখন তো সম্ভাও নেই।"

বাবুটি কিছু নরম হইয়া গিয়া কহিলেন, "সে সব তো পরের কথা, এখন আজই যে আমার মেয়ের বাড়ী ফুলশয্যার তবে নমস্কারী কাপড় পাঠাতেই হবে, নতুন কুটুম তা আর তোমাদের সঙ্গে পরা-বর্শ ক'রে ব'সে নেই যে, পাওনা-গুণ্ডাটি ছাড়বে। মাঝে প'ড়ে কি আমার কুটুম চটবে, আর মেয়েটার খোয়ার করবে।"

কথা চট করিয়া সামনে আসিয়া একখানা মোটা শাড়ী তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে এই কাপড়

কিন্তু, শুভ-বিবাহে অশুভ বিদেশী জিনিস দিবেন কি জ্ঞাত? আমাদের দেশে বিবাহ প্রভৃতিতে চরকা-কাটার স্তার কাপড় ব্যবহারেরই নিয়ম রয়েছে, আজ পর্যন্ত তার নিদর্শন অনেকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। জানেন অবশ্যই?”

আবেদনকারিণীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বাঙ্গালী বাবুটির মেজাজ একেবারেই গলিয়া পড়িল, তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “মা! আপনার মতন যদি এ দেশের সকল মেয়েই শিক্ষিতা ও ত্যাগশীল হ’তে পারেন, তা হ’লে তো কোন দুঃখই ছিল না, কিন্তু একটুখানি সৌখীনত্বের লোভে মেয়েরা এখন এতই পাগল হয়ে পড়েছেন যে, এই গড়া পরবার কথা তো দূরে থাক, অল্পস্বল্প মোটা শাড়ীই তাঁরা পরতে রাজী হন না। কম দামের ফ্রেঞ্চ জরি ও জর্জানসূতার শাড়ী ছ’দিনে ছিঁড়ে যায়, তাই মোটা বেনারসী চেলি মেয়ের জন্তে কিনে এনেছিলুম বলে, যের পরে লাহিত হচ্ছি। ও কাপড় দিলে কুটুমবাড়ীতে কি আর আমার চৌদ্দপুরুষের শ্রদ্ধা হ’তে থাকি থাকবে? না হ’লে আমি কিনতুম।”

কৃষ্ণা কহিল “আপনার জামাইটি তো শিক্ষিত? তাঁর বাপ কি করেন?”

“জামাই শিক্ষিত হ’লেই বা সে কি করবে? মা-বাপের উপর সে কি কথা কইতে পারে? বাপও অশিক্ষিত নন; কিন্তু মা! আপনি কজন শিক্ষিত পরিবারকে আপনার মতন ত্যাগী ও উদ্বাসীল দেখেছেন? মনে হ’লেও কাজে কেঁকতটুকু করে উঠতে পারছেন? আপনার কথায় ছ’খানা শাড়ী আমি নিচ্ছি, কিন্তু বাকিগুলি আমার—”

কৃষ্ণা হাত দিয়া দূরের একটা বড় দোকান দেখাইয়া কহিল, “তা হ’লে এখান থেকে অন্ততঃ দেশী মিলের ও তাঁতের শাড়ী নিন। মঙ্গল-কার্যের তিতরে আর ম্যাকেটায়ের ছাপ মারবেন না।”

বাবুর দল চলিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীর সহিত ছেলেদের তর্ক কলহের কাছাকাছি গিয়া পৌছিল।

অল্প দূরেই এক জনের হাতে ঝুলান এনামেলের বালতি ও জাপানী সিল্ক হরতালীদের মধ্যে কেহ কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াতে প্রথমে ছ’জনে হাতাহাতি বাধিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোণ-বিহঙ্গবৎ পুলিশ আসিয়া তাহাদের বেঁটন করিল।

—দেখিয়া বিনয় উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া যাইতে উত্তত হইয়াই বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ফিরিয়া দেখিল,

তাহার জামার প্রান্তটা কৃষ্ণার মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরা।

সে মুহূর্ত্তে বলিল, “বিনয় বাবু! মনে রাখবেন, —‘নন-ভায়োলেন্স!’ ছেনেটি ওর জিনিস কেলে দিয়ে কাজ একটুও ভাল করে নি,—এইবার যান, তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন। আর—একটু মিনতির সঙ্গেই বলিল—“নিজেও স্মরণ রাখবেন।”—

একখানা ‘ক্যালকট’ বেগে আসিতেছিল; সেই মুহূর্ত্তে যেন একটা বিকট হিংস্র-গর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া পরস্পরে হুঁসিতে হুঁসিতে আসিয়া পড়িল। গাড়ীর মধ্য হইতে মিঃ লাহা নারিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, —“ঠিক এই কথাই আমিও ভেবেছিলাম, তবে এত শীঘ্র পাব আশা করি নি। ধ্যাক গড্!”

এমন করিয়া কথা কয়টা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা দম-ফেলা গোছ করিয়া দীর্ঘশ্বাস উখিত হইল যে, সব করজ্ঞান লোকই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণার বুকটা তিতরে একটু কাঁপিল, তার ভয় হইল, পাছে এই ভক্ত-সম্প্রদায়মধ্যে তাহার মর্যাদা-হানিকর কোন আচরণ ইনি করিয়া বসেন, পাছে ইহারা তাহাকে ইহার গুণচরই বা মনে করিয়া

লয়!

মিঃ লাহা ক্ষতপদে কাছে আসিয়া বলিলেন, “বাস্! অনেক তো হলো? এখন ফিরে চলো দেখি।”

“কোথায়?” বলিয়া কৃষ্ণা কিছু ভীত-দৃষ্টিতে তাঁহার সুগম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। প্রতি-ক্ষণেই এই রাজপথের মধ্যখানে নিজেকে সকলকার নিকট একটা দর্শনীয় পদার্থ করিয়া তুলিবার আশঙ্কা তাহার মনকে পীড়িত করিতে থাকিয়া এই অনধিকারী উৎপীড়কের প্রতি তাহার বিরাগকে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছিল।

“বাড়ী চলো।” বলিয়া মিঃ লাহা নিজের মোটরের অভিযুখে এক পদ অগ্রসর হইলেন, “এসো বেবি! আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি।”

একটুখানি নিকটস্থ হইয়া অশুচ অথচ দৃঢ় ভৎসনাপূর্ণ-কণ্ঠে কৃষ্ণা কহিল, “মিষ্টার লাহা! আমার পিছনে লেগে থেকে কেন আপনি আমার অনর্থক অপদস্থ করতে এলেন? আমি আপনার কি করেছি যে, কিছুতেই আপনি আমার ছাড়ান দিতে পারছেন না? যান, আমার মুক্তি দিন।”

মিঃ লাহা এই কথা শুনিয়া শুধু একটুখানি



মুচুকিয়া হাসিয়া তাহার কোপ-কুটিল চক্ষের উপর নিজের স্থির-দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া সম্মিত-মুখে উত্তর করিলেন, “তুমি! আমার! কি করেছ? কি করবে? কিছুই করতে পারো নি।”—তাহার কণ্ঠে মাত্র প্রবল পরিহাস ব্যক্ত হইল।

অদূরে জনতা বর্ধিত হইতে হইতে বিপুলারতন ধারণ করিয়াছিল। পুলিশের লাল-পাঙ্গড়ী ও গুর্থার থাকিতে জনতা জম্জমে হইয়া উঠিয়াছে। যে সব দোকান এতক্ষণ হরতালকারীদের অনুসরে বন্ধ হয় নাই, সেগুলো লুট-তরাজের ভয়ে চটপট বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ছান বারান্দাগুলো উৎকণ্ঠিত দর্শকের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে চাহিতেই মিঃ লাহার দৃষ্টিও সেই সঙ্গে তথাকার জনতা ভেদ করিয়া রহস্তোদ্ধারচেষ্টা করিল; এবং এক নিমেষেই সমস্ত বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ দৃঢ়-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আর তোমার এখানে থাকা চলবে না, বেবি। তুমি শীঘ্র উঠে পড়ো, যে রকম দেখছি, এইবার একটা খুনোখুনি কাণ্ডও হয়ে পড়তে পারে।”

কৃষ্ণা তাহার গভীর আবেগে উদ্বেলিত আতঙ্কিত অন্তরকে প্রাণপণে সংযত রাখিবার চেষ্টায় নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। সেই কোলাহল-ময় দাঙ্গাম্বলে তাহার অনুসন্ধিৎসু ব্যগ্র-দৃষ্টি বেন আলোকাক্রষ্ট পতঙ্গের মতই উগ্র আগ্রহে কাঁপাইয়া পড়িতেছিল, অন্তরের মধ্যে তাহার চিন্তা বেন রণবাস্তব্র অবগে উন্নত বুদ্ধাশ্রয়ের মতই উন্মূখ হইয়া সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে তাহাকে ছ’হাতে ঠেলিতেছিল। তাহার বকের মধ্যে এই সবল উত্তেজনার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উদ্ভাস হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রায় নিরুজ্জ্বলসে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “নিরস্ত্র নিরপরাধীদের উপর গুলী চালাবে! ওদের হাতে যে বন্দুক রয়েছে দেখ চি!”

মিঃ লাহা সেই দিকে বারেক চাহিয়া দেখিলেন, ■ তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, “শান্তিরক্ষার দরকার হ’লে চালাবে বই কি!”

“নিরস্ত্র জনতার শান্তি-রক্ষার দরকার এমন কি হ’তে পারে, যাঁতে গুলী চালাতে হয়! উঃ, কি অত্যাচার!”

জনতার মধ্য হইতে সত্য সত্যই একটা বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হইল, ও সঙ্গে-সঙ্গেই জনতা ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণা দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া মার্জিতভাবে চোক বুজিল।—তাহার

সমস্ত অন্তর কাঁপাইয়া সে ধ্বনি বেন বকের ভিতরে গিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল, চোক চাহিতে গেলে ■ তো বা কোন্ দৃশ্য তাহার চেখে পড়িবে! ওঃ, হয় তো কোন্ পরিচিত রক্তাপ্লুত প্রাণশূন্যদেহ,—হয় তো —হয় তো—

মিঃ লাহার নিরুজ্জ্বল কণ্ঠ তাহার অবসন্ন শরীরে বলাধান করিল।—“ফাকা আওয়ার! এঃ!—রাগাটিয়া সব পালাচ্ছে! মোটে তিনটে লোককে আরেষ্ট করেছে।”

কৃষ্ণা গভীর শ্বাস-গ্রহণপূর্বক দেখিল, ছেলে তিনটিই তাহার অপরিচিত এবং ইহার মধ্যের একটিও সেই যে জাপানি সিক ও বালুতি কেলিয়া দিয়াছিল, সে নয়। মোষীর চেয়ে নির্দোষী বড় সহজেই ধরা পড়িয়া থাকে।

রাগার লোকেদের আবার এই দিকে ফিরিতে দেখিয়া মিঃ লাহা নিজের কাজে মনোযোগী হইলেন। অদূরে বিনয়কে আসিতে দেখিয়া বিশেষ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “আর আমার অপেক্ষায় রেখ না, কিষণ! সকাল ৭টার খবর পাই; তখনই যজ্ঞধরবাবুকে চার্জ দিয়ে মোটর একদম ফুলস্পীডে ছুটিয়ে এসেছি। সকালে সেই বা একটু চা’ আর একটু ডিম্‌টিন্ খেয়েছিলুম। এগো, তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে একটুখানি ঠাণ্ডা হলেই আবার আমার ছুটতে হবে। কাল একটা ‘রায়েট বেস’ আমারও কাছে আছে।”

কৃষ্ণা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া পরপারে বিনয়ের নিকট যাইতে চেষ্টিত বুঝিয়া তিনি সহসা পক্ষযকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?”

কৃষ্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই স্বর প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, “না।”

“এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে আর কোন ভদ্র-মহিলা যোগ দিতে এসেছেন কি? তুমিই কি এক জন জেয়ান অফ্‌ আর্ক ফিরে জন্মেছ না কি!”—

নিরুত্তর দেখিয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন, “কেন অনর্থক গুলী খেয়ে ম’রে পড়বে, অথবা পু’সের হাতে গ্রেপ্তার হবে। পুলিশের হাতের নিগ্রহ কোন দ্বীলোকের পক্ষে গোরবের বস্তু নয়, এটাও ভেবে দেখ।”

কৃষ্ণা কোন জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া রাস্তা পার হইয়া ওপারের ফুটপাথে বিনয় প্রভৃতির পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ লাহার মুখ অপমানে কালো হইয়া গেল,

তাঁহার কপালের শিরা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল, হুঁচোখ জঁঝার জলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপেই সংযত রাখিয়া সোফারকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন, সে গাড়ী লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, নিজে তিনি শীকারীর থাকি পোষাকের পকেট হইতে সিগারকেস লইয়া একটা মোটা সিগার ধরাইলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য-তাপ মাথায় লইয়া মুখের সঙ্গে মনের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতে দিতে দৃষ্টি ঘারা কৃষ্ণাকেই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পকেটে-ভরা বামহস্ত বারবার চঞ্চল হইয়া সেখানে গোপনে রক্ষিত ছোট্ট দোনলা পিস্তলটাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে সম্পূর্ণ ঔদাস্ত-ভাবাপন্ন কৃষ্ণার পার্শ্ববর্তী বয়সে তরুণ এবং সুন্দর গঠন বিনয়কুমারের বক্ষ লক্ষ্য করিতে লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিতে থাকিলেও তিনি বাহিরে শাস্ত উদাসভাবেই চুরোট টানিয়া বাইতে থাকিলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার শ্রামলাল মল্লিকের নামে গাঙ্গুলী এবং দত্ত এটর্নির আফিস হইতে এক পত্রে জানা গেল, তাঁহার বসত-বাটা জঙ্গীলাল ও মোহনলালেরের খণের দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মকেল মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জী উহা ক্রয় করিয়াছেন, সপ্তাহমধ্যে উহাতে দখল লওয়া হইবে।

এবার আর ডাক্তার মল্লিকের কাছে ব্যাপারটা লুকান রহিল না, তিনি তাঁর অন্ধকারময় জগতে প্রবল ভূকম্প অনুভব করিয়া কৃষ্ণাকে ডাকাইয়া অতি তীব্র তাপযুক্ত ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, “তোমারই কল্যাণে আজ আমার পথের ভিখারী হ’তে হবে। তোমার শিক্ষার ফল হইবে বিপুল অর্থকর আমি বৃথা করেছিলুম, শুধু সেইটে জন্মিবে রাখলেই আমার জীবনটা সুখে কেটে যেতে পারতো। তোমার মত সম্ভ্রান্ত যদি আমার না জন্মাত!”

চির-আদরিণী কৃষ্ণা পিতার কঠিন বাক্য মনের মধ্যে বেদনা পাইলেও নিঃশব্দে সবই সে সহ করিল। পিতার বাক্য অংশতঃ সত্য হইলেও, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতার ■■■ তিনিই যে প্রধানতঃ দায়ী, সে সত্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার লোক ছিল না, এবং দিলেও কেহ দেখে না।

সৌধারণতঃ অধিকাংশ বিলাত-ফেরতের মতই তাঁহারও বরষা আর তরষা ব্যয় থাকায় আর কবিতো ব্যয় করে নাই। ‘শুণঃ কৃষ্ণা দ্বুতঃ পিবেৎ’—এই নীতির অনুসরণে তিনি ‘ঘরের পরিবর্তে’ তদপেক্ষা ব্যয়-সাধ্য ও তদানুযায়িক সকল প্রকার ব্যয়নেরই অভ্যাস, সামর্থ্যের একবিন্দু থাকিতেও ত্যাগ করেন নাই, আজও না। পোষাক তাঁহার প্যারিসের দোকানে তৈয়ারি হইত, কাচিতেও বাইত সেই দেশে। জ্বী-কস্তার পিছনে ফ্রেঞ্চ গবর্নেশ এবং তাহাদের মেলামেশা, চাল চলন সমস্তই বিলাতী লর্ডদের জ্বী-কস্তারই অনুরূপ। অক্ষর এবং অন্ধদের সীমার পৌঁছিতেই ডাক্তারীর সমস্ত আর একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়া অকুল-পাথারে ফেলিয়া দিল, কিন্তু স্বভাব বদলাইয়া দিতে পারিল না। কথিত আছে, মরিলেও না কি ওটা বদল হয় না।

যাই হোক, ডাঃ মল্লিক তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, তাঁহার নূতন আইভেট সেক্রেটারীকে দিয়া মিঃ লাহাকে ‘জরুরী’ তার করিলেন এবং পত্রও লেখান হইল। সে দিন কাটিয়া গেল, কোন উত্তরই আসিল না। মল্লিক-সাহেবের অসুস্থ-শরীর এবং উদ্বিগ্ন-চিত্ত বেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তরুণ ভবে সত্য সত্যই তাঁহার আত্মভরস্বর্গ ও অর্কাটীন মেয়ের হুঁস্বাবহারে রুগ্ন হইয়া তাঁহাকে ■■■ ত্যাগ করিল? মনের সহিত শরীরও তাঁহার অবসাদের চরমে গিয়া পৌঁছিল।

কৃষ্ণা সে দিনের সকল কাজের মধ্য দিয়াই নিজের ভবিষ্যৎটাকে সম্পষ্ট করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। এই বাড়ী—সার্কুলার রোডের এই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদ-ভবন, এ আর তাহার নই! সাত দিনের মধ্যে এ গৃহ জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।—শুধু তাই নয়; বৃদ্ধ অন্ধ অসুস্থ পিতার হাত ধরিয়া নিঃস্বলে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। কোথায়?—এ প্রশ্নের উত্তর সে চারিদিক হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। মিঃ লাহা যে এতবড় অত্যাচার করিতে পারিবেন, এ সন্দেহ ঘূণাকরও তাহার চিত্তে কোনও দিনই উদ্ভিত হয় নাই। তা হইলে সে এত দিন নিজেদের একটা বিলিবাৎসল্য করিয়া কেলিতেও সচেষ্ট হইত। এই বাড়ীখানার দাম—উচিত মূল্যে বেচিতে পারিলে তিন-চারি লাখ টাকাও হইতে পারিত। কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই জুয়াচুরীর আশ্রয় লইয়া তাহাদের অজ্ঞাতে এর অর্ধেক টাকার চেয়েও অল্প-বল্পে এই বাড়ী



উহার দখল করিয়া লইয়া তাহাদের একেবারেই আজ অকুল-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। ইহার বলেই সে যে এত দিন নিজের মনে বলসকর করিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ী বেচিয়া ঋণ শোধ দিলেও তাহার অবশিষ্ট অর্থে তাহারা অনায়াসেই ভ্রম গৃহস্থভাবে কালাতিপাত করিতে পারিবে। কিন্তু এখন? মহাজনের নিকট হইতে কোন তাগিদ তাহারা পার নাই, আদালতের পিয়াদা শমন ধরাইয়া যায় নাই, নীলাম ইত্যাহার জারী করা হয় নাই। একেবারেই এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

এর কি বিচার নাই? বিচার! বড় দুখে কৃষ্ণার অধরে তীব্র শ্বেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল। যদি এই অত্যাচারী বখাওঁই জঙ্গীলাল মোহনলালরা হইত, তাহা হইলে বিচার পাওয়া যাইত কি না, তবু সন্দেহহীনও ছিল। কিন্তু তা যখন নয়; জঙ্গীলালদের আড়ালে দাঁড়াইয়া যে ছদ্মবেশী মেঘনাদ তাহাদের উপর গুপ্ত শরসন্ধান করিতেছেন, তখন তাঁহার সে লক্ষ্য যে ব্যর্থ হইবে, এমন আশা বাতুলে ভিন্ন কে করিতে পারে?—বিশেষতঃ বিচারশালায় পণ্যক্রয়ের পক্ষে আজ কৃষ্ণা মল্লিকের অধিকার কেই বা সাব্যস্ত করিতে পারিবে? তত্ত্বিন্ন নে নিজেও সেখানের দ্বারে আশ্রয় লওয়ার অপেক্ষা নিরাশ্রয় হওয়ারকেও নিরাপদ মনে করিয়া থাকে যে। সে যে নন্থো অপারেটর,—কোন মুখে ■ অবিচারের বিচার সেখানে সে খুঁজিতে ছুটিবে?

মল্লিক-সাহেব সে দিন বিছানা হইতে উঠিলেন না, কোন মতেই তাঁহাকে সে এতটুকু কিছু আহ্বার করাইতে পারিল না, অসুখ বালকের মতম কাতর হইয়া তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন এবং মেঘের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “তোরা ভাগ্যে নির্ঘাত জেলখানার ভাত লেখা আছে, সে আমি আমার এই অন্ধ চোখেও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার মাথা হেঁট করবার আগে কেন তুই ম’রে গেলি না? আমার তুই পথে বার করলি!”

“বাবা!”—বলিয়া আর্তস্বরে ডাকিয়াই কৃষ্ণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এটলী আফিস, মেকিঞ্জিলালের আফিস এবং যে জহরীর দোকান হইতে তাহারা জহরত ক্রয় করিত, তাহাদের সহিত কথাঝিন্তা শেষ করিয়া সে যখন রাস্তার পা দিল, তখন তাঁহার মনে সর্ব-স্বান্তের একটা সর্বনাশা শান্তি তাহার গভীর

ভারাক্রান্ত হৃদয়কে অত্যন্তই লঘু ও লঘুতর করিয়া কেলিয়াছে। যে বৈরাগ্যে চৈতন্যদেব, বুদ্ধ প্রভৃতি সুখের আলয় জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের মতই পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বালিকা-চিত্ত যেন সেইরূপই একটা তীব্র রিক্ততা নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিল, যাহার সহিত আরও একটা তেমনি সুবিপুল অনুপম শান্তিও বিজড়িত।

এটলী জানাইলেন, জঙ্গীলালদের দেনাটা স্ত্রী-আসলে জড়াইয়া এক লক্ষ সাতাশ হাজার শত টাকা ক’আনা ক’পাই দাঁড়াইয়াছিল; ইহার ■ রীতিমত এটলী আফিস হইতে চিঠি দিয়া এবং আদালত হইতে সমন প্রভৃতি ধরাইয়া আইনমত কার্য করা হইয়াছে। প্রমাণ—তা যদি ‘ম্যাডাম’ অনুগ্রহ পূর্বক খবর লয়েন, অথবা তাঁহাকেই সে ভার দেন, বখাওঁ জানিতে পারিবেন। নীলাম-ইত্যাহার জারী করার পরেও তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট দেখিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিতই তাঁহাদিগকে বখাকর্ষ্য করিতে হইয়াছে। অল্প খরিদার না থাকায় তাঁহারই এক মকেল উহা ঐ এক লক্ষ সাতাশ হাজার ছয় শত কত আনা কত পাইয়েই কিনিয়া লন। একগুণে তাঁহাদের অত্যন্ত বিনীত অনুরোধ যে, পূর্ব-নির্দ্ধারিত তারিখমধ্যে বাটীর নূতন অধিকারীকে দখল লইতে দেওয়া হয়।

এক লাখ সাড়ে সাতাশ হাজার টাকা? যে বাড়ীর চার লক্ষ টাকা দর হওয়া অনভিজ্ঞেও স্বীকার করিবে, তাহা জলের দামেই চলিয়া গেল। এত বড় অস্ত্রায়ের প্রতিরোধ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে তাহার শরীর-মনের প্রতি অণুটি পর্য্যন্তই যেন তারস্বরে অস্বাকার করিয়া উঠিল। অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য লোকেরা যে ভাবে ইহাদের হাতে নিপীড়িত হয়, সেই অত্যাচারেই সহরের বৃক্ক বসিয়া তাহাদের মতন লোকেরাও যদি স্বীকার করিয়া লয়, তবে তো ইহাদের স্পর্ধার সীমাই থাকে না! কিন্তু কল কিছু হইবে কি? এ সংসারে আজ কাল ‘মতো ধন্বন্তরো জয়’ এ বাক্যের সার্থকতা ঘুচিয়া ‘মতো অর্থ মতো জয়’ই ঘটিতে দেখি। তাহার সে বস্তুটাতেই যে টান পড়িয়াছে। তত্ত্বিন্ন—মাথায় তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ো পড়ো হইল।—মিঃ লাহার পঁচিশ হাজার টাকা দেনার মোটে সেই দশটি হাজার শোধ হইয়াছে, এখনও পনের হাজার টাকা শোধ দিতে বাকি। সে টাকাও এই বাড়ীর ভিতরে শোধ হইল না!—উঃ! এত বড় ময়তানী—মানুষের সঙ্গে মানুষেও করে!

আদালতে—কার আদালতে সে যাইবে? যেখানে এক জন গণ্যমান্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে (কারণ, জঙ্গীলাল, মোহনলাল বলিয়া কেহ বাস্তবিকই আছে কি না—তাহাও সন্দেহ স্থল) একটা নগণ্য নিঃস্ব জীলোকের বিরোধ; সেখানে তার মীমাংসা হইবে সাধারণ বিচারশালায়? আর বহু উর্দ্ধে উঠিবার পক্ষে সে যে এখন একান্তই অশক্ত!

জহরতের দোকানের যিনি ম্যানেজার, তিনি কৃষ্ণার মায়ের আমলের পুরাতন লোক, কৃষ্ণাকে গহনা বেচিতে উদ্বৃত্ত দেখিয়া অবাধ্য চাহিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, “এ কি বেবি-দিদি! ও সব জিনিস তুমি বেচে ফেলতে চাও? এর এক একটা ডিজাইন, আমার কত মাথা খাটিয়ে বার করিতে হইয়াছে জানো? এমন সব ভাল জিনিস কি আর আজকের বাজারে তুমি পাবে?”

কৃষ্ণা স্থিরকণ্ঠে কহিল,—আমি তো আর এ সব পরি না,—তুমি কোন্টার কি দাম দেবে—তাই বলো।”

বিস্তর বাদানুবাদের পর গহনা বিক্রয় হইল। মুক্তা ব্যতীত জহরতের দাম পুরাতনে অত্যন্তই কমিয়া যায়। ভগবান্‌প্রসাদ যতটা সম্ভব উচিত মূল্যই দিল। একগাছি একনরী অম্লান সুগোল অথচ অনতিবৃহৎ মুক্তাহার কৃষ্ণার গলায় পরান ছিল, সেইটি খুলিয়া হাতে দিতেই সে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া উহা তাহার পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিল, —“বেবি-মল্লিক! তুমি কি তোমার ঠাকুরদাদার বইসি বুড়োর সঙ্গে আজ তামাসা করিতে এসেছ! যাও যাও—তোমার গলা থেকে খোলা ও মালা আমি হাতে করে ছুঁতে পারবো না। নাও, শিগ্গিরি কুড়িয়ে নাও বল্টি!”

কৃষ্ণার ডাগর চোকে দুইটি বড় বড় মুক্তার মতই অশ্রুবিন্দু তাহার প্রবাল-রক্ত অধরের একটি ফোটা হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের হৃকুম তামিল করিয়া পুনশ্চ মিনতির সুরে সে কহিল, “আচ্ছা, দাদা-ভাই! এর দামটা কত হ’তে পারে, সেটা তো বলো দাও। না নাও, না নেবে।”

বুড়া গুম্ হইয়া জবাব দিল, “ভারি চালাক মেয়ে! দাম কেনে তুমি অল্প জায়গায় বেচে এস আর কি! দেখ দিদি! ও দিলোনি মুক্তো। ওর দাম মোটে বেশী নয়, ওটা তুই ভাই কিছু-তেই বেচিস্ নি। ই্যা, জিনিস বটে, সেই সে দিন যেটা লাহা-সাহেব কিনে নিয়ে গেছেন।”

বৃদ্ধের মিথ্যা-বিজড়িত এই সম্বন্ধ শ্রোতাক্ষকে মনে মনে সক্রতজ হাসি হাসিয়া সে মুক্তামালাটি কুড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছিল, পিছন হইতে ম্যানেজার বড়ই কুণ্ঠিত-সুগ-কণ্ঠে ফিরিয়া ডাকিল।

“ডাক্তার-সাহেবকে মনে করে দিও তো—বেবি-দিদি! তাঁর সেই হীরের নেকলেশটার দরুন যে টাকাটা ক’বছর থেকে দোকানের পাওনা আছে, সেইটে যদি সুবিধা করে দিতে পারেন, তা হ’লে—”

সর্বাস্থে শিহরিয়া উঠিয়া কৃষ্ণা বলিয়া ফেলিল, “বাবা কিনেছিলেন! হীরের নেকলেশ! কই, না।”

বুড়া অত্যধিক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া তাহাদের হিসাব বই বাহির করিল, ও হিসাব এবং রসিদ বই হইতে মিঃ মল্লিকের হাতের সই দেখাইল। দুই বৎসরকার পূর্বের ঘটনা। তখন মিঃ মল্লিক চোখে অল্পস্বল্প দেখিতে পাইতেন। দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া সে সাড়ে তিন হাজার নেকলেশের ও পুরাতন হিসাবের কয়েক শত টাকা শোধ করিয়া চলিয়া আসিল।

একখানা থার্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে নিজের পরিশ্রান্ত দেহ-মনকে এলাইয়া দিতেই একটা অননুভূতপূর্ব শান্তিতে তাহার সেই শ্রান্ত শরীর-মন ঘেন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে নিঃস্ব! এই বিপুল বিশ্বের বিরাট কারবারে সে এই জীবন-প্রভাতেই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়া বিদায় লইল।—এইবার তার নব জীবন-প্রভাত! অমনই বিপরীত দিক হইতে তাহার এই আশা-সুখকে আড়াল করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাপের মুখ! কি অসহায়, কি দুর্বল, কি অসহিষ্ণুতার চঞ্চল সেই বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখ! কৃষ্ণার বৈরাগ্যের শান্তিতে ভরা চিত্ত মুহূর্তের মধ্যে একটা গভীর অশান্তির আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিল। কোথায় মুক্তি? কেমন করিয়া সে মুক্তি পাইবে? অন্ধ এবং আতুর পিতা যে তাহার এই অনাবিল, আত্ম-প্রতিষ্ঠ শাস্তিময় জীবনকে নিজের ক্ষোভ-জর্জরিত অন্তরের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আতপ্ত ক্রুদ্ধিতে ছাড়িবেন না, সে কথা দিনের আলোকে মতই যে সত্য—সত্য—সত্য।—পনের হাজার টাকা দেনা এখনও তাহার বুকের উপর পাথর হইয়া বুলিয়া আছে, বাজার-দেনা এখনও যে তাহাকে দিক্ দিয়াই বেড়িয়া ধরিয়া আছে—তাহার হিসাব করাই এক ভয়াবহ কাণ্ড! সে কেমন করিয়া



মনে করিতে যাইতেছে যে, সে মুক্ত? এই সুবি-  
পুল ঋণজাল হইতে ছাড়ান পাইয়া মুক্তি তাহার  
■ কে জানে যে কত-কত দূরেই বসিয়া আছে!  
সে কি তবে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়া আজই  
রাতারাতি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে পলাইয়া যাইবে?  
এই চিন্তাতেও তাহার সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।  
যাহারা বিশ্বস্ত-মনে এত দিন পর্যন্ত ভদ্রলোক-বোধেই  
তাহাদের কাছে পাওনা টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে,  
তাহাদের সেই সরল বিশ্বস্ততার কঠিন আঘাত দিয়া  
চোরের মত লুকাইয়া ফিরিবে?—এ কাজ করিলে  
যে শাস্তির এক কণামাত্র এত অশাস্তির মধ্যেও  
সে উপভোগ করিতে পাইয়াছিল, এ জীবনে আর  
কি কখন ইহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ  
ঘটিতে পারাও সম্ভব?

তুফানে পড়া টলমলে মনের মধ্যে একটা মূতন  
কথা একবার মাত্র উকি দিল। বিনয়বাবু তো শুনেছি  
বড়লোকের ছেলে, তাঁর কাছে কিছু ধার নিলে  
হয় না? কিন্তু সেট একটি কণের আশার প্রদীপ  
পরক্ষণেই আত্ম-তিরস্কারের দম্কা হাওয়ার অন্ধ-  
কারে ডুবাইয়া দিয়া কঠিন হইয়া গিয়া সে মনে  
মনে বলিল, “না, আমার এ জাগতিক সুখ-দুঃখের  
মধ্যে তাঁকে আমি কোন কিছুই জন্তে টানবো  
না, তাঁতে আমার ভাগ্যে যত কিছুই ঘটতে পারে  
যটুকু। তিনি শুধু আমার পথপ্রদর্শক, আমার  
গুরু, আমার কর্ম-জগতের বন্ধু,—কিন্তু ব্যবহারিক-  
জগতে তিনি আমার এতটুকুও কেউ নন।”

‘রোখো’ ‘রোখো’ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত  
গাড়ীখানা হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং লাফাইয়া পাদানে  
উঠিয়া পড়িয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “কোথায়  
চলেছেন?”

কৃষ্ণা চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাসি-মুখের  
দিকে চকিত কটাক্ষ করিয়া নতমুখে কহিল,  
“বাড়ী।”

“চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিবে আসি।”  
—বলিয়াই সম্মতির অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া সে  
গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল এবং কোচম্যানের  
উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া বলিল, “চলো।”

এই যে অতর্কিত কাণ্ডটা ঘটয়া গেল, বিনয়  
তো দিব্য নিশ্চিন্ত হাসিমুখে সামনের আসনে ধুপসু  
করিয়া বসিয়া পড়িয়া, কোথায়-কিছুপা কাজ-কর্ম  
হইতেছে, পুলিশ সার্জেন্ট কোন্ নিরুপদ্রব খন্দর-  
ধারীকে মাত্র তাহার পোষাকের দৌলতে কিরূপ  
অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহারই গল্প জুড়িয়া দিল,

কিন্তু কৃষ্ণা নির্জেকে যেন কোন মতেই আর সহ্য  
করিয়া লইতে পারিতেছিল না। বুকের মধ্যে  
হৃৎপিণ্ডটা তাহার বিপুল বেগে নড়িত হইতেছিল,  
■ সমস্ত মন ভরিয়া সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জা ও বুঝি  
তাহাদেরই অন্তরালে এক ফোঁটা অতি তীব্র সুখও  
উকি মারিতেছিল।

আপনার মনে অনর্গল বকিয়া যাওয়ার শেষে  
যখনই হাঁস হইল, বিনয় বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণার নিরু-  
ত্তর ও নিরুদ্দম মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, “আপ-  
নার কি হয়েছে বলুন তো? মুখ অত শুকনো  
কেন? খান্না বুঝি কিছু? না অসুখ করেছে?”

কৃষ্ণা বিপুলবলে উথলিত অশ্রু দমন করিয়া  
রাখিয়া জীবৎ হাসিতে গেল, “কিছুই তো হয় নি!”

বিনয় অবিশ্বাসের সহিত প্রবলবেগে মাথা  
নাড়িল, “হয় নি বই কি! আপনার ■ সুন্দর  
মুখ, আজ কি রকম বিকী দেখাচ্ছে! হাসলে যে  
আপনাকে কত মানায়, আজ যেন সে-ও অত রকম  
দেখাল। সত্যি, বলুনই না? আমি যদি কিছু  
করতে পারি।”

প্রচণ্ড প্রলোভনকে প্রাণপণে দূরে ঠেলিয়া দিয়া  
কৃষ্ণা শুধু মাথা নাড়িল,—“কিছু না।”

বিনয়কে কিছু হুঃখিত দেখাইল, সে ঋণকাল  
গভীর-মুখে থাকিয়া তার পর হঠাৎ চট করিয়া বলিয়া  
উঠিল,—“ও, বুঝেছি! মিঃ লাহার সঙ্গে বুঝি  
স্বগড়া করেছেন, না? তা অমন হয়ে থাকে, ■  
জন্তু হনিয়ার উপর চটলে চলবে কেন? দেখুন,  
একটা কথা আমি যখন তখন ভাবি।”

কৃষ্ণা সে ‘কথা’ শুনিবার ■ কোনই আগ্রহ-  
প্রকাশ না করিয়া যেমন তেমনই স্থির হইয়া রহিল।

“আচ্ছা, মিঃ লাহার সঙ্গে আপনাকে বন্বে কি  
ক’রে; আমি তো সেই কথাই ভেবে হিসেব  
পাই নি। উনি তো স্বদেশীর স’টি পর্যন্ত সহ্য করতে  
পারেন না, ওর কোন পুরণ আমলা না কি থকর প’রে  
আসার জন্তে সে দিন বরখাস্ত হয়েছে, আর আপনি  
তো এই—”

আচম্বিতে মুখ তুলিয়া স্থির-কণ্ঠে কৃষ্ণা বাধা দিল,  
“তাই জন্তই তো আমাকেও ‘বরখাস্ত’ না করবার  
সুযোগ দিয়ে তাঁহাকে মুক্তি দিয়েছি।”

“তা হ’লে তাঁকে আপনি বিয়ে করছেন না?”  
বিনয়ের কণ্ঠে বিস্ময় যেন ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

“না।”

কচি-ছেলের মতন করতালি দিয়া আনন্দ-ধ্বনি  
করিয়া উঠিয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “আঃ, বেশ হবে,

—বেশ হবে! এটা আমার এত বিলম্ব লাগছিল যে, সে কি বলবো আপনাকে। আপনার মত ভাগী, মহাচরিত্রা মহিলার—যাই বলুন তিনি উপযুক্ত নন। তা হ'লে এইবারে আপনাকে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনার ক'রে পাব, কেমন না?”

কৃষ্ণার হৃৎতন্ত্রী সব করটা তার সজোরে বাঁধা এস্রাজের সব করটা তারের মতই একসঙ্গে ঝমঝম করিয়া বাজিয়া উঠিল এবং তার পরই বেন তাহা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে গেল।

ততক্ষণে বাড়ী পৌছিয়া পাড়ী খামিয়াছে।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়াই পিতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে সর্বপ্রথম চাক্ষুষ হইল। জানিতে পারা গেল, মল্লিক-সাহেব এ পর্যন্ত জলম্পর্শও করেন নাই এবং ভরানক অস্থির হইয়া পড়িয়া কেবলই তাহাকে খুঁজিয়াছেন।

অপরাধ-সজ্জিত পায়ের মুঠ শব্দও অন্ধের কাছে অজ্ঞাত রহিল না। অধীর আবেগে উঠিয়া বসিয়া প্রত্যাশাপূর্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হলো, বেবি! তরুণের কাছ থেকে কোন তার-টার এলো? তুমি চিঠি লিখলে? আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রেই লিখলে না কেন?”

কৃষ্ণা যত্নবরে কহিল, “আমি এটর্নীর ওখানে গিয়েছিলুম।”

ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের আবার হতশতাবে শব্দা লইয়া তিনি ক্লককণ্ঠে কহিলেন, “তাতে কি লাভ হবে? তারা কি তোমার বাড়ী ফিরিয়ে দেবার এ সব জোচ্চুরির খেলা খেলেছে! এক যে পারে—তারই চেষ্টা করো বেবি! তাকেই ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণে চেষ্টা করো, সে ভিন্ন তোমার আর দ্বিতীয় গতি নেই।”

কৃষ্ণা আজ মিঃ লাহার উপর যথার্থই রাগিয়াছিল। যে মানুষ নিজের স্বার্থের দিক-টাকে—সুখের দিকটাকে অতবড় প্রচণ্ড প্রশ্রয় দিয়াও সেটাকে লাভ করিতে চাহে, তার সেই হীন স্বার্থপরতার লভ্য হওয়ার চাইতে গলায় দড়ি দেওয়াও তার কাছে বেন গৌরবের বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছিল। পিতার অজ্ঞার আদেশ ও উপদেশকে আজ সে তাই সম্মাত্র করিতে না পারিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, “বাবা! আপনি কি বুঝতে

পারছেন না, কে আজ জলীলানদের ছদ্ম নামে আপনাকে সর্বস্বান্ত হওয়ালে? যে লোক এত বড় অজ্ঞার করতে পারলে, এখনও তারই হাতে আপনি আমার দিতে চাইছেন?”

ডাক্তার মল্লিক অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিলেন, —“সে এসব জানে না,—সে এ সব করে নি, সে আমার তেমন ছেলেই নয়।—কিন্তু যদি ক'রেই থাকে, তা হ'লে তুমিই তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেচ। তোমার ভালবেসে—তোমার পেতে চেয়েই সে আজ অপরাধী—”

“বাবা! আপনাকে আমি কেমন ক'রে—বোঝাব? একে আপনি ভালবাসা বলেন? এত জুলুম কি কেউ তা হ'লে করতে পারে?”

ডাক্তার অধীর হইয়া কহিলেন, “পারে বেবি! পারে। সবাইকার স্বভাব একরকম হয় না। আমি কি তোমার ম'কে ভালবাসি নি? আজও যে তাঁকে আমি প্রায় প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। কিন্তু সঙ্গে স্বভাবে প'ড়ে কত বড় বড় দুঃখ তাঁর মনেও কি দিয়ে কোল নি? তাঁর প্রতি বিবর্ততাও কই ঠিক রাখতে পেরেচি? তা ব'লে কি বলছি! তাঁকে ভালবাসা আমার কারুর চাইতে কম ছিল? —না বেবি! তরুণ তোকে ভালই বাসে।—ভাল-বাসে ব'লেই পাগল হয়ে গিয়ে যদি ক'রে থাকে তো কি করচে না জেনেই করেচে। তাকে ডাক, তাকে ফিরিয়ে আন, তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নে। আমার শেষ দিন ক'টা আর লজ্জার মধ্যে অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যাস্বে! আমি সে সহিতে পারবো না,—আমি সে সহিতে পারবো না, —উঃ আমি! কি থেকে কি হলুম!—কি থেকে কি হলুম!”

মিঃ মল্লিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ পুনঃ চমকিয়া চমকিয়া উঠিলেন।—ধবরের কাগজে হয় তো আমার সম্বন্ধে একটি প্যারা এডিটোরিয়াল বেরবে। ওরা তার হেড্ লাইনে লিখবে—“এ রিচম্যান কুইন্ড্” তার পর মায় গবর্ণমেন্ট হাউস থেকে, ক্যালকাটা ক্লাব থেকে যাই না যাই, যেখানের যত বড় বড় নেমতর আসতো সব বন্ধ,—বাগ্‌চী, নিয়োগী, হালদায়, এয়ারসন্, রিচমন্ড, কালাইল কেউ-ই আর আমার বাড়ী ভুলেও মাড়াবে না। মিসেস্ হালদায় এক দিন আসেন তো শুধু তোমার আহাশুকীর জন্তে ছ'কথা শুনাতে,—আর কেউ না, বেবি! আমাদের কাছে আর কেউ আসবে না! উঃ! আমি সে সব সহিবো কেমন ক'রে?



একে এই চোক গিয়েই তো সব গেছে, তার উপর  
বেবি! বেবি! তুই আমার কি করলি বেবি?  
কি করলি, কি করলি!”

“ভিতরে যেতে পারি?”—জিজ্ঞাসা করিয়া  
প্রাইভেট সেক্রেটারী গৃহে প্রবেশ করিল, হাতে  
খোলা টেলিগ্রাফ।

“এই তারটা যশোর থেকে এসুনি এসেছে।”—

“পড়ো,—পাড়া,—পড়ো।”—

“তেরি বিজি, কান্ট গো নাই” (বড় ব্যস্ত  
আছি, এক্ষণে যাইতে অক্ষম)।—

“অ্যা! এই কথা সে লিখলে! আমি তাকে  
কাতর হয়ে মিনতি ক’রে ক’রে তিনখানা তার  
করলুম, তার এই জবাব এলো! তবে আর সে  
আসবে না, তবে আর সে আমার দিকে চাইবে  
না, তবে আর সে,—তবে আর সে,—তবে আর  
সে—ডাক্তার মল্লিক হাঁপাইতে লাগিলেন।”

“বাবা! বাবা! হির হবার চেষ্টা করুন,—  
এইটুকু খেয়ে ফেলুন।”

হাত দিয়া মেয়ের হাত শুষ্ক স্নান-গ্লাসটা  
সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অস্বাভাবিক উচ্চ-কণ্ঠে  
ডাক্তার পাগলের মতই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,  
“বেবি! বেবি! যদি তুই আমার বেঁচে থাকা  
চাস,—যদি আমার প’রে তোর কোন কৃতজ্ঞতা থাকে,  
—এই মুহূর্তে যশোর চলে গিয়ে তা’কে সঙ্গে ক’রে  
আমার কাছে নিয়ে আর। না হ’লে এ জনে তোর  
সঙ্গে আমার এই পর্যন্ত হয়ে গেল। তুই আমার মেয়ে  
নোন্, তুই আমার শত্রু—মহাশত্রু! আমি তোকে  
অভিসম্পাত করবো। তুই কখন সুখী হবিনে।”

স্নান-গ্লাসটা কুমার হাত হইতে মাটিতে  
পড়িয়া চূর্ণিত হইয়া গেল। পায়ের তলার টল্টলে  
মাটি তাহার ভারও যেন আর বেশীকণ বহন করিয়া  
রাখিতে পারিতেছিল না।

■ \* \* \*

বিনয় সে দিন যখন নিজের বাসায় ফিরিল,  
পাখীর মত লঘু আনন্দে মনের মধ্যে নাচিতে  
নাচিতেই সে যেন পথটা অতিক্রম করিয়া গেল।  
সিঁড়ি দিয়া উঠার কালেই শুন্‌গুনিয়া সে একটা  
পুরাতন গান মনের স্মৃতিতেই গাহিতে গাহিতে উঠিল।

“ওহে সুন্দর! মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।  
আমি রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।”—

তার পর সঙ্গীর্ণ খোলা বারান্দার রজনীগন্ধার  
টবের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া

পড়িয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়া  
দিল—

“তুমি এসো, তুমি এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ!—

মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণহাস্ত-ভাতি।”

তার পর গাহিতে গাহিতে তাহার সমুদয় প্রাণ  
মন যেন নিজের গীত-সুধারসে মাতিয়া মাতাল  
হইয়া উঠিল। সেই পরমোৎসব রাজির সমুদায়  
উৎসব এবং সকলটুকু আমোদই যেন তাহার অন্তর-  
গহনের কন্দরে কন্দরে অটুট ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের  
রাগিনীতে মূর্ত হইয়া দেখা দিল! যেন এই ধূম-ধূলি  
এবং কোলাহল-সুখর কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত  
দৈত্য এবং কদর্যতা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া এই তরুণ  
চিত্তের আনন্দ মাত্র তাহার সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া  
পড়িল! যেন ইহার রাজপথে ট্রাম-মোটরে, ঘোড়ার  
পায়ে, কারখানার হাতুড়ি পেটার, মাছবের কল কল  
শব্দে শুধু আনন্দেরই অনাহত ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে,  
এমনি সে উপলক্ষি করিতে লাগিল এবং তাহার  
সেই আনন্দ-রসে পরিতৃপ্ত কর্তৃ স্বপ্নের পর স্বপ্ন চড়া-  
ইয়া গাহিয়া চলিল—

“তব কণ্ঠে দিব মালা—

দিব চরণে ফুল-ডালা;—

আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি

এনেছি বৃত্তি, জঁতি।”

তার পর হঠাৎ একটা সময় তাহার মনে পড়িয়া  
গেল যে, এত আনন্দের আজ তাহার মনের মধ্যে  
আমদানী হইয়া গেল কোথা হইতে? সেই হুল  
ওড়াহুলসন্ধানে নিরন্তর হইতেই সহসা নিরন্তর বিস্ময়ে  
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সেই আনন্দোৎসবের গোপন  
রহস্ত ফাঁক হইয়া গেল এবং যা দেখিল, তাহাতে  
সে একেবারেই স্তম্ভিত হইল। যাহাকে উপলক্ষ  
করিয়া তাহার জীবন-গৃহে পরমোৎসবের রাজি  
আজ আনন্দমূর্তিতে দেখা দিয়াছে, সে এক জন  
সুন্দরী তরুণী। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তাহার  
পুলকাকিত দেহে-মনে ব্যথার বজ্র সবলে হানিয়া  
সত্যের বিজুলী অসহনীয় আলোক-ধাঁধায় তাহার  
চোখের পর্দা টানিয়া তুলিয়া ধরিল,—কিন্তু,  
তাহাকে—যার আগমনের আনন্দে বিশ্ব আজ অধা-  
চিত আনন্দের অগ্নসত্ত্ব খুলিয়া দিয়াছেন, সেই  
তাহাকে কণ্ঠে মালা পরাইয়া তাহার জীবন-সাবী  
করিয়া লইবার কোনই উপায় নাই!

দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দের জ্যোৎস্না  
যেন নিরানন্দের অন্ধকারে ঢলিয়া পড়িল। তার

উপরে যখন প্রথম অভিব্যক্তির প্রবল ঝাকটা কাটরা আসিল, তখন জানা গেল যে, বস্তার জল আসিয়া তাহার ঘরের সঞ্চয়টুকুকেও টানিয়া লইয়াছে, সুখ-সাগরের জোয়ারের টানে গা ভাসাইয়া সহসা যেন তাহাকে অশ্রু-সাগরের কূলে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। যে জিনিসটার অস্তিত্ব আজ এই চক্ৰবর্তী বৎসর বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কাছে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল, আজ সেইটেই সে নিজের অন্তরেরই অভ্যন্তরে বড় বেশী প্রবলভাবে অনুভব করিয়া ফেলিয়া অত্যন্তই ভয় পাইয়া গেল। সত্যই কি অষ্টার স্বজন-গৌরব-স্বরূপা স্বরূপা কৃষ্ণাকে সে ভালবাসে! শুধু ভালবাসিলেই কিছু দোষ ছিল না, তা নয়, তার সম্বন্ধে তাহার মনে যেন একটা প্রবল স্পৃহা, একটা তীব্র কামনা তলায় তলায় যেন লুকান ছিল, সহসাই আজ সেটা এতটুকু সুযোগকে হাতে পাইতেই দেখা দিল কি? তা কৃষ্ণা এখন তো আর মিঃ লাহার বাগদত্তা নয়, তাহার কথা একটুখানি ভাবিলেই বা আজ দোষ কি? কিন্তু দোষ নাট, এই ভাবনাটাই কি সত্য? দোষ কি স্বার্থভী নাহি? জীবনে সর্বপ্রথম দিন আজ যুবক বিনয়ের স্তম্ভ যৌবন আগিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরকে যখন বিপুল ঝঙ্কারে সাড়া দিল, তখনই তাহার মধ্যে আরও একখানা যুমস্ত মুখকেও সে তার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিল না।—সে উন্মীলা। বিনয়ের আজ প্রথম মনে পড়িল, সেই উন্মীলা তাহার স্ত্রী। এ কথা আবিষ্কার করিতে গিয়া বুক আজ ভাঙিতে চাহিল, তথাপি আজকের দিনে এই সত্যকে ছেঁল-মানুষী করিয়া উড়াইয়া দেওয়া আর কোন মতেই চলিতে পারে না। অস্তিত্ব: নিজের মনকেও আজ তাহার এ খবর পাইতে দিতে হইবে। উন্মীলা তাহার স্ত্রী, তাহার যৌবন সহচরী তাহার বালাসখীর অনধিকৃত সিংহাসনে কোন মতেই নিজের গৌরবাসন বিস্তৃত করিতে সমর্থী নহেন। যেহেতু, কেহ দিক্, না দিক্, সে আসন উন্মীলারই। কারণ, সে-ই তাহার স্ত্রী।

কিশোর—তাহার বন্ধু আসিয়া জ্ঞা কুণ্ডিত করিয়া বলিল, “অর্থ এবং পরমার্থ একসঙ্গে ছইয়ের সাধনায় কোমর বেঁধে লেগে গেছ যে দেখছি! রাজিটা কিন্তু বেশ ‘উৎসব-নিশার’ পরিণত হ’তে দেওয়া কর্তাদের ইচ্ছা নয়। আজকের বোধে মেলেই বেরিয়ে পড়ে ‘পরেণনাথ’ যাবার হুকুম হয়েছে। সেখানে না কি জৈন-সমাগম হবে বিস্তর। ছ একটা মোটা মহাজনকেও যদি টলাতে পারা যায়, মন্দ হয় না।”

চট করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিনয় সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, “আমি প্রস্তুতই রয়েছি।”

এমনি করিয়া কোনওখানে নিজেকে জোড়া করিয়া দিতে, দূরে ঠেলিয়া দিতে তাহারও নবজাগ্রত অন্তর ব্যাকুল উদ্বেগে ঠিক এই একই সময় পথ খুঁজিতেছিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাকতুরাটা মোটা গলায় ‘কাঁক কাঁক’ করিয়া কেবলই ডাকাডাকি করিতেছিল; ‘ব-উ-মা!—অ-ব-উ-মা! উন্মীলা খন্ খন্ করিয়া আসিয়া তাহার শিকলীটা খন্ খন্ করিয়া নাড়া দিয়া ডেংচাইয়া উঠিল—“ব-উ-মা! অ-ব-উ-মা! আহা! আমার কতকালের গিন্নী রে!”

ময়নাটা শিষ্ট ছেলের মত আপনা হইতেই “কালী কলতক, শিবো জগৎ গুরু,”—বলিতে আরম্ভ করিয়া পালিকা-মাতার আদরটুকু বেশ করিয়া আদার করিয়া লইল।

পক্ষিসমাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিলেও উন্মীলার মনের মধ্যে সে দিন কিছুমাত্রই যেন সুখ ছিল না। শুধু আজই কেন, যত দিন বাইতেছে, মনের ভিতর তার একটা দারুণ অশান্তি যেন বাসা বাধিয়া বেশ জমিয়া বসিতেছিল। বিনয়ের কলিকাতা-গমনাবধিই তাহার মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, এখন অশান্তিটা যোল আনা মনের উপরই পাকা বনিয়াদ তুলিয়া বসিল। যে বয়সে বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরেরা ছেলের মা ও ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত হইয়া বসেন, ততখানি বয়স পর্য্যন্ত অনবরত পুতুল খেলিয়া খেলিয়া পুতুলখেলার উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উন্মীলা সেগুলোকে পাড়ার বিলাইয়া দিয়াছে। সখ করিয়া একটা বিড়ালছানা এবং কয়েকটা লাল মাছ পুষিল। বিড়াল মাছ কয়টাকে খাইয়া ফেলিল। তখন বিড়ালকে সে মাঝিরা তাড়াইয়া দিল। এক গাদা পাখী মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া সে ঘোগড় করিয়াছে বটে, তবে সেগুলোকে লইয়া তার এক মহা জালা ষটিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মনে করে—অল্পমনস্ক এক দিন এদের খাঁচার দোর খোলা থাকে, আর এরা উড়িয়া যায় তো বেশ হয়! শাওড়ী, বউএর হানিখুসী দেখিতে পান না, মুখখানা ভারি করিয়া সে এখানে ওখানে বসিয়া তইয়া বেড়ায়, অল্পখের ডরে তিনি মধ্যে মধ্যে গিন্নী



তাহার কপালের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখেন  
ও বধুর কাছে ভৎসিতা হন।

বিনয় এবার ফিরিয়া গিয়া অবশি সবগুহ  
ছ'খানা পত্র বাড়ীতে লিখিয়াছে। একখানা  
গোমস্তাকে বিষয়-সংক্রান্ত; আর একখানা  
উর্শ্বীলাকে যেমন সাধারণতঃ সে লিখিয়া থাকে,  
কোন কাজের কথাই নয়।

আজ এতদিন পরে আর একখানা চিঠি সে  
পাইল। সেখানার পূর্বের মত—“ও রে বাদরি!”  
এই সভ্য সম্বোধনটি নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাব  
ভাষা সকলই বেশ অল্প রকম এবং তাই অল্পে  
উর্শ্বীলার কাছে উহা কিছু রহস্যময়। তাহা  
এই;—

উর্শ্বীলা।

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, অবসর ছিল  
না এবং ইচ্ছা ছিল শীঘ্র একবার তোমাদের কাছে  
যাইব, কিন্তু ফলে তাহা ঘটিল না। বিশেষ জটিল  
কার্যোপলক্ষে ‘পরেশনাথ’ পাহাড়ে যাইতেছি এবং  
ইচ্ছা আছে, তার পর কিছুদিন পর্যন্ত পশ্চিম  
প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, এখন শীঘ্র যে কলিকাতার  
ফিরিব, তাহার সঙ্কল্প মনের মধ্যে ভোঁ নাই, পরে  
কি দাঁড়ায়।

উর্শ্বীলা! আজ একটা কথা তোমার বলি  
বলি মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই ভরসা করিতে  
পারিতেছি না। মন বলিতেছে, আমার সব কথাই  
অকপটে তোমার কাছে জানান উচিত। আমার  
জীবনের কোন রহস্য, কোন সঙ্কট, কোন কিছুই  
তোমার অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে; এবং তাহাতে  
মনও আমার নিরতিশয় পীড়িত হইতেছে। কিন্তু  
উর্শ্বীলা! তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমার আশি  
বেটুকু জানি, তাহাতে আমার আভিকার এই  
সংশয়হীন অন্ধকার চিত্তের হৃদয়নার অংশ তুমি  
বহন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমার ভরসা  
না। তাই এখন আমার এই গোপন কথা  
আমার মনের নিভৃত গহনেই লুকানো থাক।  
যদি কখনও জীবনের এই জটিলতার হাত হইতে  
নিজেকে মুক্ত করিতে পারি; যদি কখনও গুরু  
অপরাধের বোঝা নামাইয়া হৃদয় লঘু হয়, তবেই  
তোমার কাছে গিয়া সেই দিন সকল কথাই তোমার  
জানাইব। আর যদি তা নাই হয়, যদি না পারি,  
যদি পিচ্ছিল পথে পদস্থলিত হইতে থাকে, তবে  
যে শ্রোতে ভাসিয়াছি, শুধু তাইতেই ভাসিয়া যাইব,  
আর পিছনে ফিরিয়া চাহিব না। এ সব কি

লিখিতেছি? জানি না, তোমার মত বালিকাকে  
এ সব জানানর সার্থকতা কি? জানি না।  
শুধু যা মনে আসিল লিখিলাম।—একটা কঠিন  
কার্যের মহাতার মাথায় লইয়া বাহির হইলাম,  
দেখি, কতদূর কি হয়। হয় মারিব, নয় মারিব। এর  
আর তৃতীয় পন্থা নাই।

বিনয়কুমার।—

উর্শ্বীলার মনে এ পত্র ক্রমাগতই হেঁয়ালির  
জাল বুনিয়া দিয়াছে। এ রকম সমস্তার সে তার  
সারা জীবনেও কখন পড়ে নাই। পাখীর খেলা  
ভাল লাগিল না, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে একটা  
কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল ও আর একবার ইহার  
মধ্যগত গভীর রহস্যোদ্ভারে মনোনিবেশ করিয়া  
দিল।

দালানে জুতো-পায়ের শব্দ হইতেই উর্শ্বীলার  
বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই কিন্তু জুতার  
ও চলনের পার্বক্যে তাহার অধিকারীকে চিনিতে  
পারিয়া একদিকে তাহার আশার জোয়ারে তাঁটা  
পড়িয়া আসিলেও অপর পক্ষে আনন্দোত্তেজনার  
সে লাকাইয়া উঠিয়া পড়িল। ততক্ষণে মিঃ লাহা  
ঘরের সম্মুখে আসিয়া হাসি-মুখে কহিয়া উঠিলেন—  
“কি রে উমি! আজ বুঝি তোর ছেলেপিলেরা সব  
ঘুমিয়ে পড়েছে?”

তাঁহার গলার সাড়া পাইয়া সেই রূপসী-পাখীটা  
কলরব করিয়া উঠিল, “রূপু, রূপু, রূপু!”

ময়না ডাকিল, “কি রে উমি!”

কাকাতুয়া তাহার হেঁড়ে-গলা বাহির করিল।

মিঃ লাহা হাসিয়া উঠিলেন।

উর্শ্বীলা ইতোমধ্যে নিজের সমস্তা-পূরণের ‘সমস্তা’  
ভুলিয়া মহা-দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, সে মিঃ লাহার  
একটা হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরের মধ্যে  
টানিয়া আনিতে আনিতে অমুযোগের সহিত  
কহিয়া উঠিল, “খুব তো শীগ্গির শীগ্গির এসেছেন,  
জামাইবাবু! ব’লে গেলেন, ‘এবার থেকে তোর  
কাছে সর্বদাই আসবো!’ কি আসা গো!”

মিঃ লাহা শালিকার নথের নোলকে একটুখানি  
দোলা দিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, “উর্শ্বীলা!  
তুমি যে আমার পনকে প্রলয়-জ্ঞান করবে,  
আমার এমন সৌভাগ্যের আমার তো করনাও  
ছিল না! কোন্ একটা পত্র-দূতকেই আলমী  
গ্রেণ্ডার ক’রে আনতে পাঠিয়েছিলে?”

উর্শ্বীলা তাঁহার কথা বলার ধরণে লজ্জা বোধ  
করিতেছিল, শেষ উপমাটার সে একেবারে খিল

খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—“মা গো মা! বড় জামাইবাবু ‘আসামী’ আর ‘গ্রেপ্তারের’ মধ্যে এমন জড়িয়ে গেছেন যে, ভাল কথা বলতে গেলেও তার মধ্যেও ‘আসামী-গ্রেপ্তারের’ চেষ্টা বেরিয়ে পড়ে!”

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই মিঃ লাহা তাহার প্রদর্শিত আসন গ্রহণপূর্বক জবাব দিলেন, “কি করি বল, ‘যাদুশী ভাবনা যন্ত্র’ ঐ বৈ আর তো কিছুই ছুটলো না রে!”

উন্মিল্লা বলিল, “জামাইবাবু! আপনি বুঝি কবি? গান গাইতেও পারেন, বোধ হয়? একটা গান না—তা হ’লে।”

অল্প একটু নিখাসের সহিত হাসিয়া তরুণ কহিলেন, “পারতুম রে সবই; শৌনবার লোকের অভাবেই সব ছেড়ে দিয়েছি।”

উন্মিল্লা তাহার উন্মাদিনী ও চিরকথা দিদির কথাই মনে করিয়া মনের মধ্যে লজ্জা ও ব্যথা বোধ করিল। ঈষৎ অপরাধী ভাবে কুণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি আজকাল কেমন আছে—জামাই-বাবু?”

“আর কেমন আছে!”—বলিয়া এবার একটা নিখাসকে তিনি বড় করিয়াই মোচন করিলেন।

উত্তপ্ত সহানুভূতিতে উন্মিল্লার সরল বালিকা-চিত্ত ইহার প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে সেই জন্ম-পাগল জীবন্ততা দিদির ‘পরে তাহার যেন একটা ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার অনাদৃত অবহেলিত নারীত্ব ভিতর হইতে পীড়িত হইয়া যেন এই কথাই বলিল, আমার সেই অর্জস্বত বোন যা পেল, জ্যান্ত-মানুষ আমি তাও পেলুম না। তাহার বন্ধ মথিত করিয়া একটা উত্তাপে-ভরা দীর্ঘ-তর শ্বাস সহসাই উঠিয়া আসিল।—সে যেন কেমন গস্তীর ও অন্তমনা হইয়া গেল।

মিঃ লাহা তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর লক্ষ্য করিলেন অদূরে পতিত একখানা খোলা চিঠির খামের উপর। তার পর চোক ফিরাইয়া আনিয়া উৎকল্লভাবেই উন্মিল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই গাইতে পারিস্ উন্মিল্লা?”

উন্মিল্লা কুণ্ঠিতভাবে ষাড় নাড়িল।—“উহুঃ।”

“লিখিস্নে কেন? খুকী হয়ে নেচে বেড়ালে বেরাল বশ করা যায়, বর বশ হবে কি ক’রে?”

সকলকার এবং এমন কি নিজেরও মনের প্রতিধ্বনি ইহারও মুখে ধ্বনিত হইতে শুনিয়া অক্ষমতার লজ্জার ক্ষোভে উন্মিল্লার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে গুম হইয়া গেল।

“উমি! রাগ করলি ভাই? আর, বোস, একটা কথা বলি শোন দেখি, আচ্ছা বিনয় কবে এসেছিল রে? আমার কাছে লজ্জা কি ভাই? আমি তোমার ভালর জন্তেই এসেছি। তুই তো আর সেই ছোটটি নেই! নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার, ভাববার ব্যয়স তো তোমার হয়েছে। এখন যদি এমন ক’রে অবহেলায় সব নষ্ট হ’তে দিস্, চিরকাল ধ’রে যে কাঁদতে হবে, উমা!”

উন্মিল্লা একটা অজানিত আতঙ্কে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। সে পাণ্ডুসুখে ভগ্নীপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিবার অনেক ছিল, কিন্তু লজ্জা ভয় ও সঙ্কোচে কোন প্রশ্নই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।

মিঃ লাহা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করিয়া ফেলিয়া সেই ভূপতিত পত্রখানার উপর লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“কার চিঠি রে? বিনয়ের বুঝি? ওঃ, তা হ’লে সে এখনও তোকে চিঠিপত্রও লেখে!”—বলিয়াই তিনি একটুখানি ষাধ্বস্চক বাঁকা হাসি হাসিলেন। উন্মিল্লার মন ক্রমেই আশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

“দেখি না ভাই, তোমার বর তোকে কি চিঠি লিখেছে। একসঙ্গে ছুঁখানা নৌকা তা হ’লে সে তো চালাচ্ছে ভাল। আমাদের ■■■ আনাড়ী নয়। হ্যাঁ রে উমি! বরের লেখা প্রেমপত্র হত-ভাগা ভগ্নীপতিটাকে দেখাতে বুঝি মন সরে না? কেন রে, আমি তাতে তাকে কি হিংসা করবো? না রে, তা নয়, তুই আমার ছোট বোন্টির মত; তোমার সুখের খবর জানতে পেলুম মন আমার সুখই পাবে। তবে যদি তোমার লজ্জা করবার মতন কোন কথা এতে থাকে, তা হ’লে অবশ্য আমি তোকে বিপন্ন করতে চাইনে।—”

এত বড় অপবাদটাকে সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মিল্লা তড়িদ-বেগে উঠিয়া চিঠিখানা মিঃ লাহার গানের উপরে ছুঁড়িয়া দিল। তিনি মনে ও মুখে হাসিয়া সেখানা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মুখে চোকে একটা অভূতপূর্ব নূতন ভাবোত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল। পত্রপাঠ-শেষে সেখানা নিজের কোর্টের পকেটেই ফেলিয়া দিয়া মিঃ লাহা ডাকিলেন “উন্মিল্লা!”

খামীর পত্র পরের হাতে তুলিয়া দিয়া উন্মিল্লা আজ একটু একটু লজ্জাহীন করিতেছিল, এবং সেই ■■■ মিঃ লাহার দৃষ্টি-পরিহার-মানসে অন্ধ দিকে



মুখ ফিরাইয়াছিল, মিঃ লাহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়া-  
হতভাবে মুখ ফিরাইল। সে প্রতিক্ষণেই ইহার  
বিজ্ঞপে-ভরা উচ্চ হাস্য ও ব্যঙ্গের ভাষা প্রতীক্ষা  
করিয়া লজ্জা-বিপন্ন হইতেছিল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বরে  
এ সকলের স্থানই ছিল না।

“উন্মিলা! এ চিঠির অর্থ তুমি কিছু বুঝতে  
পেরেছিলে?—পারো নি বোধ হয়? কেমন ক’রে  
পারবে! তুমি যদি অমন বোকাই না হবে, তা  
হ’লে আর আজ তোমার এ রকম সর্বনাশ  
হতেই বা বসেছে কেন? শোন তা হ’লে, তোমার  
স্বামী তোমায় ভালবাসে না, তোমায় সে কোন  
দিনই জ্বী ব’লে স্বীকার করে নি কেন জান? সে  
আর এক জন জ্বীলোককে সর্বাস্বত্বকরণ দিবে  
ভালবাসে,—তাকে সে বিয়ে ক’রতে চায়। এ কথা  
তোমার শাণ্ডীও জানেন, ইচ্ছা হয়, তাঁকেও তুমি  
জিজ্ঞেস ক’রতে পার।”

একটা অশ্রুত আঁধার উন্মিলার কণ্ঠ ভেদ  
করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই বাহির হইয়া  
গেল।

“বুঝতে পারলে এখন ওই হৈয়ালীর মানে?  
কোন্ পিছল পথে তাঁর পা পড়েছে; কোন্  
স্রোতে তিনি ভেসে যাচ্ছেন—কোন্ সঙ্কটের  
মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেছেন—এখন বুঝলে কিছু?  
—তিনি যাকে ভালবাসছেন, সে তোমার চেয়ে  
শতগুণে সুন্দরী এবং সহস্র গুণেই শিক্ষিতা, তুমি  
তার পায়ের কাছে দাঁড়াবারও যোগ্য নও; এখন  
তোমার নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলে? উন্মিলা!  
ও কি! ও কি ক’রচো!”

উন্মিলা তিনি উন্মিলার এলাইয়া-পড়া দেহ  
ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলেন।  
এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া জলের কুঁজা হইতে এক  
অঞ্জলি জল আনিয়া মুখের উপর জোরে ঝাপটা  
দিতেই সে চোক চাহিল।

“কি বিপদ! আঃ, মেয়েগুলো কি সব সমান  
সেন্টিমেন্টাল! উন্মিলা! উন্মিলা! রকম  
ক’রচো কেন? এখন কি অত অধৈর্য্য হ’লে চলে?  
মনে বল করো, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করো,  
তবে তো তাকে রক্ষা ক’রতে পারবে।”

উন্মিলার হৃচোক দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিতে  
লাগিল।

“ছিঃ, কেন না! স্বামী তোমার ত্যাগ করেছে,  
এ তুমি নেহাৎ ছেলে-মানুষ ব’লেই আজ এত ক’রে  
তোমায় বোকাতে হলো, নইলে এ তো আর নূতন

কিছু নয়। যাই হোক, আমি যখন সব জানলুম,  
তখন তোমার যতদূর সুবিধা করা যায়, তা  
আমি করবোই। কিন্তু শুধু তো আর এই নয়, সে  
আরও একটা মস্ত বড় বিপদের মধ্যে যে মাথা  
দিবে রেখেছে।—সে বিপ্লবপন্থী।”

এই ‘বিপ্লবপন্থী’ সম্বন্ধে উন্মিলার জ্ঞানও খুব  
বেশী নয় এবং এ কথাটা তাহার অসহ যন্ত্রণানলে  
বিদগ্ধ প্রায়-চিন্তে ভাল করিয়া স্থানও লাভ করিল  
না। সে যেন তখন কি এক রকম হইয়া গিয়া শুধু  
এই কথাটাকেই এক এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গারের মত  
নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছিল যে, ‘বিনয় তাহাকে  
ভালবাসে না তাহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং  
বাহাকে ভালবাসে, বাহাকে সে পাইতে চায়, সে  
তাহাপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী!’ মিঃ লাহার কথায়  
কান্না তাহার খামিল ন, বরং এবার সে মুখের উপর  
কাপড় টানিয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

“ছিঃ, উন্মিলা! ছিঃ, চুপ করো। বিনয় বরা-  
বরই তোমার সঙ্গে নিত্য অন্তায় ও অসঙ্গত  
আচরণ ক’রে আস্চে, আর তুমিও এতদূর  
ক’রে থেকেই তো তাকে এতবড় প্রশ্রয় দিবে  
কেলেছ! তা সে বা হবার হয়েছে, আমার  
উন্মিলার চোখের জল ফেলান তার বার্থ হবে না।  
এর [ ] তাকে কঠিন শাস্তি পেতেই হবে। আচ্ছা,  
এখন তুমি তোমার শাণ্ডীকে একটবার ডেকে  
আন তো, তাঁকে প্রণাম ক’রে এখানি আমি বেরিয়ে  
পড়ি। ইঁা, ভাল কথা, তাঁকে ডেকে দিবে আমি  
যা লিখে দিই, এই কথাগুলি তুমি একখানি চিঠিতে  
লিখে বিনয়কে পাঠাও দেখি! দেখ, এ সব সময়  
লজ্জা সঙ্কোচ সমস্তই বিসর্জন দিতে হবে, মনকে  
জোর ক’রে বাঁধতে হবে, না হ’লে তোমার হারানিধি  
তুমি ফিরিয়ে পাবে কেমন ক’রে? আচ্ছা, তুই  
ওপোরে পাঠ কি লিখিস্? কিছু না! হা রে  
বোকা-রাম! এমনি ক’রেই স্বামীটিকে একেবারে  
হারিয়ে ব’সেচ?”

যে চিঠিখানার মিঃ লাহার উপদেশ আদেশ-  
মত উন্মিলা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিল, সেখানি  
এই রকম।

তোমার চিঠি পেয়ে আমারও বড়ই ভয় ও  
ভাবনা হচ্ছে! আমি কত কাঁদলুম।—কি করেছ  
তুমি? কি সঙ্কটের মধ্যে তুমি ঢুকতে গেছ?  
তোমার জীবনের কোন্ রহস্যের কথা লিখেছ?  
যে কাজ আজ ক’বছর ধ’রে তোমায় ক’রতে চেষ্টা  
করছিলে, সেই গুপ্ত কথা কি কেউ জানতে পেরে

গেছে? অথবা আর কিছু? তুমি জানো, তোমাদের মতন অত ধারালো বুড়ি আমার নয়। আমি কি অত সব ছেঁদো কথা ধরতে পারি? আমার মন ছটফট করছে, কেবলই কান্না পাচ্ছে, (এখানে চোখের জলে কাগজ ভিজিয়া কালি-মাখা হইয়া গিয়াছে) কেন তুমি সঙ্কটের মধ্যে পড়তে গেলে? কেন তুমি আমার কাছে ফিরে এলে না? তাই এসো, ও-সবে আমাদের কাজ কি? 'মারিতে গেলে যখন মরিবারও' সম্ভাবনা নিজেই লিখেছ, তখন কাজ কি তেমন দুঃসাহসিক কাজে যাওয়ার? না, আমাদের স্বরাজ চাই না, স্বাধীনতা চাই না,—সাহেবরা সব যেমন আছেন, থাকুন, তুমি শুধু চ'লে এসো! ওগো, তুমি শীঘ্র না এলে আমি ম'রে যাব।—সত্য বল্চি, ভয়েই ম'রে যাব! তুমি শীঘ্র এসো।—

উন্নিলা।

মিঃ লাহা লিখিয়া দিয়াছেন, 'তোমার উন্নিলা।' সেখানটা লিখিতে গিয়া খুব এক চোট গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উন্নিলা 'তোমার'টা বাদ দিয়া লিখিল শুধু উন্নিলা। তাহার—বিনয়ের। কই তা তো সে নয়!—উন্নিলাকে তো সে এক দিনের জন্তও সে পদ, সে অধিকার দেয় নাই! তবু শুধু শুধু গারে পড়িয়া আর এ আদর কাড়াইতে যাওয়া কেন? তাহার মনের প্রাণের সবখানি যে জুড়িয়া আছে, সেই হয় তো কত আদরে গলাইয়া আজ তাহাকে কত বখাই লিখিতেছে! উন্নিলা কিসের জোরে ও-সব কথা লিখিতে যাইবে? সে তো আর তার মত স্কন্দরী বা শিকিতা নয়! রাগে দুঃখে কোতো অভিমানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উন্নিলার নাক-চোক সব ফুলিয়া উঠিল। মুছিয়া মুছিয়া কিছুতেই আর আহুত অশ্রুপ্রবাহকে সে রোধই করিতে পারে না। একবার চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়াই সঙ্কল্প হ্রি করিল। ঠিক এমনি সময়েই মিঃ লাহা জগদ্ধাত্রী-প্রদত্ত আহার্য্য এক আধটুকু নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিবার দরায় অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া ডাকিলেন,—“উন্নিলা!”

উন্নিলা যেন চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, এমনি করিয়া চম্কাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা মুড়িয়া লাহার অনুরোধে বাজলায় ঠিকানা লেখা থামের মধ্যে ভরিয়া ফেলিল, এবং সেখানা হাতে করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়া আরক্ত ও ক্ষীত মুখখানা অস্বাভাবিক দীপ্ত দেখাইতেছে।

“আমার গাড়ী অবধি পৌছে দিবি আর। ওঃ, বড্ড ভুলে গেছলুম রে। তোর জন্তে এই একটা রুবির ইয়ারিং এনেছিলুম যে!”—

“নাঃ, রোজ রোজ এ সব কেন?”

“দিলুমই বা? দেবারও তো আমার নেই কেউ, মনুষ্য-জন্মে সাথ তো সবই যায়। তোর দিদি যদি মানুষের মতন হতো, তো সে কি দিত না?”

উন্নিলা এই মেহের দান আজ আর কোন কিছুই জন্ত নয়—শুধু একমাত্র হিতকামীর দেওয়া বলিয়াই অত্যন্ত অনাগ্রহ ও অনিচ্ছার মধ্যেও গ্রহণ করিল। নহিলে বিনয়ের প্রতি তীব্র অভিমানে সমস্ত পৃথিবীটাই তাহার কাছে তখন তুচ্ছ—তুচ্ছতম হইয়া গিয়াছে এবং সেই মর্মভেদী অভিমান ক্রমশই তাহার বক্ষের মধ্যে উত্তাল ক্রোধের আকার ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নীচে নামিয়া আসিয়া মিঃ লাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিঠি লেখা হয়েছে রে?”

উন্নিলা মাথা হেলাইয়া জানাইল, ‘হ্যাঁ’।—

“তা হ'লে সেটা আমার হাতেই দাও না কেন? ট্রেনেই পোষ্ট ক'রে দিবে বাই।”

নিরন্তরে উন্নিলা চিঠিখানা মিঃ লাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চক্ষে প্রশ্ন বুঝিয়া এবং তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ লাহার মনেও একটু যেন দুঃখ বোধ হইল। তার পিঠে হাত দিয়া স্নেহে কহিলেন, “কি রে উমি?”

চোক নত করিয়া উন্নিলা মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি চিঠিতে ও-সব কথা লিখেছেন কেন?”

মিঃ লাহা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিলেন, জোর করিয়া মনের দ্বিধাটুকুকে সরাইয়া দিয়া পরে উত্তর দিলেন—

“তা হ'লে সে ভয় পেয়ে তোমার ভুল ভেঙ্গে দিতে ছুটে আসবে, আর এলে পর, মা'তে ও তোমাতে বিস্তর কাঁদাকাটা ক'রে তা'কে ফিরতে দেবে না। কেনন! কিন্তু দেখ, আমার কথা যেন কিছু বলো না তাকে।”

উন্নিলা মুখে আর কোন কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল, “আসতে হয় আসবে, কিন্তু আমার যে ভালবাসে না, অত্নকে ভালবাসে, আমি আর এ জন্মে কখনই তার মুখের দিকে চাইতে পারুবো না। আমার সব কিছুই এ জন্মের মতন হয়ে গেল।”



## সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিবসের অবশিষ্টাংশ ও সমস্ত রাত্রিই অভুক্ত, বিনিদ্র এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহপরায়ণ বুদ্ধ অন্ধ পিতাকে লইয়া তেমনি অনাহারী এবং বীতনিদ্রা কৃষ্ণার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, অথচ যারও না তো! দু'দিন আগে যে সংসারাতীত সুখসৌভাগ্যের কোলের মধ্যে বসিয়াছিল, ঐখন্ডের চরম ভোগস্থখে যে দেহ আজন্ম লাগিত, সেই শরীর-মনে একসঙ্গে সকল দিক দিয়া এই যে প্রচণ্ড দুঃখের আবণ-ধাণা বর্ষিত হইতেছে, সে যে কেমন করিয়া সহিয়া আছে, এইটুকুই বেন তাহার নিজের কাছেই পরম বিস্ময়ের মত ঠেকিতেছিল। কৃষ্ণ যেমন হস্তপদ সমস্তই ভিতরে টানিয়া লয় ও পিঠের কঠিন সর্বসহ আবরণটাতে, এমন কি, এই বিপুল ধরিত্রী-ধারণের ভারও গ্রহণ করিতে পরাশ্রুত হয় নাই, সে-ও তেমনি করিয়াই তাহার উপর উত্তম সকল দুঃখকেই সহ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মন কঠোর ত্যাগ-ব্রতের মহা সন্ধিস্থলে পড়িয়া যেমন দৃঢ়—তেমনই প্রশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরেরও অন্তঃস্থলে সে বেন এই মহা পরীক্ষার ভগবৎ-প্রেরণা ও তাঁহার মঙ্গল-আশীর্বাদের ধারা অনুভব করিয়া ইহারই মধ্যে একটা নিগূঢ় আনন্দ জন্মের তলে তলে অনুভব করিতেছিল। মন যেন তাহার এই দুঃখ-দৈত্য-লাঞ্ছনা-অবমাননাকে মাথার মুকুটের মতই পরম পরিতোষে তুলিয়া লইয়া এই কথাই তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল,—

“আরও দুঃখ সহবে আমার সহবে আমারো,  
আরও কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।”

কিন্তু আর দুঃখ সহল না। “জীবন-তার” এর চেয়ে কঠিন সুরের ঝঙ্কারে ছিঁড়িয়া পড়ে পড়ে হইল। সারা দিন-রাত্রের মধ্যে যখন মল্লিক সাহেব জলম্পর্শ না করিয়া ‘প্যাসিভ্ রিজিস্ট্যান্স’ (নির্কিরোধ অবাধ্যতা) অবলম্বন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। এই দুর্বল বুদ্ধ-শরীরে তাহাতে তাঁহার প্রাণহানিরও আশঙ্কার অস্তিত্ব হইয়া পড়িয়া তখন কৃষ্ণার দৃঢ়সঙ্কল্প ও শিথিলীকৃত হইয়া আসিল।

নিজেদের ভবিষ্যৎটাকে ইতোমধ্যেই সে খানিকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল, গহনা-বেচা টাকার মধ্যে এক হাজার মাত্র হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট এগার হাজার সে মিঃ লাহার জন্ত ইন্সিওরড পত্রে শীল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই হাজার টাকা এবং

তাহাদের বিখ্যাত ফার্মিচারগুলার, রূপার বাসন-পত্রের যে দাম উঠিবে, উহাতেই খুঁরা বাজার-দেনা কয়েক হাজার শোধ দিয়া একখানি ছোট-খাট বাড়ী বালী-বেলুড় এমনি কোন জায়গায় ভাড়া লইয়া তাহারা দু-এক দিনের মধ্যেই সেখানে উঠিয়া যাইবে। সঙ্গে পিতার ভৃত্য দুইটি থাকিলেই যথেষ্ট। অবৈতনিক (মিঃ লাহার দত্ত বেতন-ভোগী) প্রাইভেট সেক্রেটারীকে শুদ্ধ সঙ্গে লওয়া হইবে না। সেখানে তার প্রয়োজনই বা কি? আর কি ধনিসমাজের কেহ তাহাদের সহিত সম্বন্ধই রাখিবেন? সেই ভোগবিলাসের জগৎ হইতে তাহাদের নাম দু-দিনেই তো মুছিয়া যাইবে; এটা বিশেষ জানা কথা।—তার পর তাহাদের চলিবে কিসে? সেই কথাটাই কৃষ্ণা অনেককণ ভাবিল। কোন মেয়েস্কুলে সে শিক্ষার্ময়ী হইতে অক্লেশেই পারে, কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষ ক্রটি এই যে, তাহার অন্ধ পিতার দেখা-শুনা প্রভৃতির অনুবিধা ঘটবে। তার চেয়ে কোন ভদ্রপরিবারের মেয়ে-দের গান-বাজনা শিখাইতে এক এক ঘণ্টা সময় দিলে, দু'জায়গার অন্ততঃ সত্তর আশী টাকাও তো পাওয়া যাইবে। একবার তাহার ঠোঁটের গোড়ায় একটুখানি ফুল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তার পথই সে গম্ভীর হইয়া মনে মনে বলিল, আমার নিজের এখন পঁচিশ টাকা হইলেই চলিয়া যার। মিতব্যয়িতার পরম শাস্তি অনুভব করিয়া সে তৃপ্ত হইল।—কিন্তু কল্পনা-রচিত, আশ্বাসপ্রসাদ ও আশ্রয়গোরবে ভরা ভবিষ্যৎ তাহার বর্তমানের মহা সমস্যার ভারে তখন টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশ সে দিন ঘন-মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষার বাতাস থাকিয়া থাকিয়া আর্দ্র-ক্রন্দনের রোল তুলিতেছিল। মেঘ-ব্যাপ্ত অন্ধকার রাত্রির বন্ধে ভীতশিহরণ জাগাইয়া কাহার মমতা-হীন রোষ-দৃষ্টির জ্বালা তীক্ষ্ণ বিদ্রোহ চকিত হইয়া উঠিতেছে। যেন কোন মর্মান্বিত অন্তরের অভিশপ্ত পরিতাপের বজ্র হাঁকিয়া উঠিতেছিল, কড় কড় কড়।—আর এই সকল কঠিন ও অসহ্য শাসনে লাজিতা প্রকৃতি হু হু শব্দে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছিলেন, আর তাঁহার বিদীর্ণ বন্ধের শোণিত-নিঃস্রাবের মতই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল—বর্ বর্ বর্।

সারা রাত্রি চোরের মত নিঃশব্দে বাপের ঘরেরই এক পাশে তাঁহার অকথ্য মনোবেদনার সাক্ষ্য স্বরূপে বসিয়া থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণার কাটিয়া-পড়া শরীর-মন লইয়া শেষ-রাত্রে সে নিজের ঘরে

ফিরিয়া লুটাইয়া পড়িল। আর সহিবার বহিবার শক্তি তাহাতে নাই। আর আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রসাদকে সে উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—আর এ জীবনের সুখশান্তি আশা-তৃষ্ণাকে ত্যাগ-সংযম দৃঢ়তা-নিষ্ঠাকে সে আশ্রয় করিয়া থাকিতে ভরসা করিল না। এমন কি, তাহার অন্তরের নবজাত শ্রুতমার—ভীকু অথচ প্রগাঢ় ■ পবিত্র, প্রেমকেও সে জলাঞ্জলি দেওয়াই হিরীকৃত করিল। নতুবা যথার্থই যে তাহাকে পিতৃ-যাতিনী হইতে হয়!—কিন্তু ■ কি পরাভব? ভগবান্! হা ভগবান্! বাস্তবিক কি তুমি প্রবলের ঈশ্বর? দুর্বলের কি তুমি কেহ নও? বলীর বাহু তোমার আশ্রয়-স্থল বটে, কিন্তু তাহার অত্যাচারের খড়্গকেও কি তুমি প্রশ্রয় দিবে? কিন্তু কাহাকে এ বৃথা অনুযোগ? অত্যাচারের উদ্ভূত দণ্ড কবে না ভাগ্যহীনের মাথা ফাটিয়া থাকে! আজ কি তাহারই ■ এ নূতন সৃষ্টি হইল? মনে পড়িয়া গেল, সেই অত্যাচারিতা 'নবার মা' বুড়ীটার কথা। —সে বলিয়াছিল, 'যারা মানুষের বুকের উপর দিবে চাকা চালিয়ে হাওয়া গাড়ী করে হাওয়া ধরে বেড়ায়—তাদের বুক এমনি করে মড়মড়িয়ে ভাঙে ■ না আমার যন্ত্রণা যায়!—'

আজ তার সে মর্যাদাতিক অভিলাষই বুঝি ফলিতোছে! এর চেয়ে তার বুক যদি সত্যসত্যই সেই রকম করিয়া গুঁড়াইয়া পড়িত! না, তিনি যে জ্ঞানের দণ্ড বহনকারী—জ্ঞানের মর্যাদা এমনি করিয়াই বেরক্ষা করেন। তোরের বেলা প্রাইভেট সেক্রেটারী খবর পাঠাইয়া দিয়াছে মিঃ মল্লিকের অবস্থা বিশেষ মন্দ। তিনি ডাক্তার আনিয়াছিলেন, ডাক্তার বলিয়া গেলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ; হার্ট যতদূর দুর্বল হইতে হয়, হইয়াছে। বলকারক ঔষধ-পথ্য খুব শীঘ্র পড়া বিশেষ আবশ্যক।—

কৃষ্ণা কম্পিত-হস্তে কোন মতে কাপড়টা বদলাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

“বাবা! বাবা! বাবা!”

“অ্যা!”—বলিয়া মিঃ মল্লিক অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন।

“সে কি, এসেছে? তরুণ তরুণ! এলে কি তুমি?”

“বাবা! শীঘ্রই তিনি আসবেন। তুমি যদি একটু কিছু খাও, তা হ'লে আমি এক্ষণ তাঁকে আনতে যাব। না খাও তো কিন্তু কিছুতেই যাব না।”

“সত্যিই যাবি? তাকে বিয়ে করতে আর অমত করবি নে? বেবি! ঐ কি সত্যি বলছিস?”

“তোমার কাছে কি মিথ্যে বলবো? তোমার জন্ত আমার করতেই হবে। কিন্তু তা হ'লে এখন তুমি কিছু খাও, না হ'লে আমি যাব কি করে?”

“ভবে দে, খাচ্ছি। আঃ! বেবি! বেবি! মা আমার! কই, কোথায় তুই! আর যাহু আমার! আমার অন্ধকারের আলো! বুকের মধ্যে তোর মুখটা রাখ। কত মন কধাই বলেছি, কিছু মনে করো না বাবা আমার! বুড়ো হয়েছি, কাণা হয়ে গেছি। ভেবে দেখ দেখি, কত যন্ত্রণা আমার! কি ছিলুম কি হ'লুম, আরও কি হ'তে যাচ্ছি! তবু এ বিয়েটা হ'লে এখনও মানটা কতক বজায় রেখে যেতে পারি। যাও কিছু! মনে কোন ক্ষোভ না রেখে তাঁকে হাতে ধ'রে নিয়ে এসো। —কিছু করতে হবে না, সে তোমার দেখলেই সব ভুলে যাবে। সে আমার তেমন ছেলেই নয়। তার তোমা-অন্তঃ প্রাণ বে!”

বাহিরে আসিতেই প্রাইভেট-সেক্রেটারী পর্দার আড়াল হইতে সরিয়া গেল।

নিজের কাজকর্মটুকু সারিয়া বাপের যেটুকু কাজ তার নিজস্ব, সেইটুকু সম্পন্ন করিয়া দিয়া বাহির হইতেই কয়েকখানা পত্র পাইল। তার মধ্যে দুই খানার উপর নজর পড়িতে হাত বেন তার আড়ষ্ট হইয়া আসিল। দু'খানা ঠিক দুজন প্রতিযোগীর নিকট হইতে আসিয়াছে।

প্রথম সে বিনয়ের খানা খুলিল, খুলিতে সমর কুলাইল না, দ্রুতকম্পিতহস্তে খাবটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে পত্র পাঠ করিল। পাঠকালে হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক চঞ্চলতার মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষের দৃষ্টিও বেন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

“কৃষ্ণা!

কি লিখিব, ভাবিয়া না পাইয়া তোমায় তোমার নিজ নামেই সম্বোধন করিবার স্পর্ধা গ্রহণ করিলাম। তোমাদের নব্য এটিকেটে এটা নিতান্ত অসভ্যতা তা জানি; কিন্তু তুমি তো জানই; কোন রকম সত্যতার ইতিহাস যদি আমার পড়াই থাকবে, তবে আমার এ রকম দশাই বা কেন?—

আমাদের পক্ষে একান্ত লাভজনক একটা শত্রু কাজ হাতে লইয়া দূরে চলিলাম। যাত্রাকালে একটি বার তোমায় দেখিয়া যাইবার জন্ত লোভের সীমা নাই, কিন্তু এত বেশী আগ্রহ বলিয়াই তাহা দমন করিলাম। কিছু দিন ফিরিতে বিলম্ব হইবে। মধ্যে



মধ্যে পত্র দিবার লোভটাকেও কি ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে? দূরে থেকে একখানা একখানা চিঠি লিখলে আর দোষ কি?—তুমি উত্তর দিবে তো?—দিও, সত্যি দিও। তুমি তো আর এখন কার কাছে বাধা পড়ে নেই? তা হ'লে আমাদের এই নিশ্চল বন্ধুত্বের বন্ধনটুকুকে ছিঁড়ে কেলবার কি এমন আবশ্যক আছে?

ঐ বাঃ! আগাগোড়াই 'আপনি' লিখতে 'তুমি' লিখে এসেছি! তারি হাসি পাচ্ছে! কিন্তু তাই বা কি বলবো? 'কৃষ্ণা' লিখে আর 'আপনি' লিখতুম কেমন ক'রে, আঃ?—ও ঠিকই হয়েছে। রাগ করো নি তো? না, তুমি তো রাগ করো না। আজ আর মোটে সময় নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যে কাজটা হাতে নিয়েছি, তাতে যেন সফলকাম হই।

তোমার বন্ধু—বিনয় শীল।

সেই চিঠিখানা কোলে করিয়া মুক্ত-প্রিয়তম-কোড়ে সর্বস্বাস্থ্য অভাগী নারীর মতই কৃষ্ণা বহু-কণ অভিজ্ঞতাৎ বসিয়া রহিল। চিঠিখানার এক একটা শব্দ শোকাচ্ছন্নচিত্তে—সন্তোষিত প্রিয়জনের শেষ মেহান্তি ব্যক্তির তায় তাহার অন্তরের ছিন্ন-ভিন্ন এলোমেলো তন্ত্রীতে যা দিয়া দিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনটা যেন দেখিতে দেখিতে একখানা নূতন সাজান চিতার মতই কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আগুনের ■■■ লিখা যেন তাহাকে আর একবার নূতন করিয়া সর্বস্বাস্থ্য করিয়া দিল।—তার পর শশান-বৈরাগ্যের মতই বিরাগভরা শূন্য চিত্তে সে মিং লাহার পত্র গ্রহণ করিল। সে ইংরাজী পত্রের মর্ম এই—  
আমার প্রিয় বেবি!

কাজ-কর্ম্মে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ক'দিন তোমার কোন খোঁজ খবরই রাখতে পারি নি, তার ■■■ কমা চাইছি। বাইরে খবর রাখতে পারি নি বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তোমার মুখ সর্বদাই যে পদ্মের মতন ফুটে রয়েছে!

তোমার বাবা আমার বাবার ■■■ টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন,—লিখছেন,—তিনি না কি বড়ই বিপন্ন! শীঘ্র যেতে বলেছেন।—কিন্তু বেবি! জান তো আমি পরের চাকর। ইচ্ছা করলেই তো আর আমার বাবার শক্তি নেই। কি তাঁর বিপদ—কি হয়েছে তাঁর? তুমি কিছু জানো কি? জানলেও হয় তো আমার জানাবার মতন দরকার আছে ব'লে মনে কর নি? না হ'লে ■■■ তো তাঁর বদলে

আমায় বাবার কথা লিখতে পারতে? বাই হোক, যদি প্রয়োজন বোধ করো, সেই মুহূর্ত্তেই আবেদন করো; তোমার কাছ থেকে এতটুকু ইঙ্গিত পেলেই যেমন ক'রেই হোক, আমি ছুটে যাব। তুমি জান, তোমার ■■■ এ পৃথিবীতে এমন কোন ভবিষ্যৎ-কাজই নেই—যা আমি করতে পারি নে।

আশা করি, তোমার বাবা তেমন কোন বিপদে পড়েন নি? আশা করি, তুমি শারীরিক ■■■ লেই আছ?

তোমারই চিরায়ুগত—তরুণ।

সর্প-বিষে জর্জরিত হইয়া মৃত্যুর কবলে অর্দ্ধ-পতিত মাহুষের মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখে কৃষ্ণা তাহার অবশ অঙ্গুলি-মধ্যে কোনমতে কলম তুলিয়া লইয়া লিখিল।—এগ্রি টু ইওর টার্মস্—কম্ (তোমারই প্রস্তাবে সম্মত, আইস)।

নিজের হাতে এই টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিয়া সে যেমন বাহিরে পা দিয়াছে, দেখা হইয়া গেল—তার পিতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। লোকটি দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই জানাইল, মল্লিক-সাহেব তাহাকে খুঁজিতেছেন।

কৃষ্ণা দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল, এবং কি মনে বলা যায় না—কৃষ্ণার প্রেরিত টেলিগ্রামের মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ জানিয়া লইয়া নিজে এই মর্ম্মে মিং লাহাকে আর একটা তার করিয়া দিল, “বেষ্ট টাইম্ কর্ ইওর কমিং (আপনার আগমনের সমুচিতকাল উপস্থিত)।

নিজের বহনক্ষম শরীরকে বহিয়া লইয়া সে দিনের বাড়ী ফেরাটাই যেন কৃষ্ণার কাছে এক মহাবিস্ময়! তার পর এই যে কাজটা করিয়া আসিল, ইহার পর আর শরীরের ক্লান্তিবোধ বা স্নানাহারের প্রয়োজনীয়তা তাহার কিছুই বাকি রহিল না। মন যেন তার এই কথাটাই শুধু নালিস করিয়া বলিতে লাগিল,—

“ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা,

চুকিয়ে লও গো ভয়।

বিরোধ আমার যত আছে

সব ক'রে লও জয়।”

প্রথমেই পিতার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

মেয়ের সাড়া পাইতেই তিনিও ব্যগ্র হইয়া মাথা তুলিলেন, “কি রে বেবি?”

“তুমি আমার ডেকে পাঠিয়েছিলে?”

“কই না, কে বললে? তুমি কোথায় ছিলে?”

“টেলিগ্রাফ-অফিসে। মিঃ ভদ্র গিয়ে বললেন, তুমি আমায় ডাকচো।”—

মিঃ মল্লিক ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিলেন, “বলতে পারিনে তো, আমি তো কই ডাকি নি। তরুণকে তার দিলে?”

মিঃ ভদ্র সম্বন্ধে মনে মনে কিছু সন্দেহান হইয়া কৃষ্ণা পরে পিতার প্রশ্নের উত্তর দিল, “হঁ।”

“বাবার খবরটা দিলে বুঝি?”

“না, আস্তে বললুম।”

“যদি না আসে?”

“না আসার কারণ তো কিছু নেই, তাঁর মতে সম্মত হয়েছি, এই কথাই তো জানালুম।”

“কি লিখলে?”

কৃষ্ণা টেলিগ্রামে যাহা লিখিয়াছিল, বলিল। শুধু ‘টারমস্’ না বলিয়া ওইখানে “প্রোপোজান” শব্দটা ব্যবহার করিল। শুনিয়া ডাঃ মল্লিক কিছু সন্দেহ কিছু অসন্তোষভাবে মন্তব্য করিলেন, “হয়েছে মন্দ না, তবে কি না, তোমার ওই পরমা বাঁচাবার ■■■ যেমন একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে, সে কোথায় যাবে! বাই হোক, ভালই করেছে। শীঘ্র শীঘ্র তরুণ এসে পড়লে বাঁচা যায় এখন। এতে সে নিশ্চয়ই আসবে। কীল তাতে রবিবার আছে।”

শনি এবং রবিবারটা ডাক্তার মল্লিকের একান্ত অশান্ত উত্তেজনের মধ্য দিয়াই তাহার আশাচ্যুত বেলা লইয়া দিব্য মনঃসংযোগে বিদায় লইল। এই আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ছিয়ানব্বইবারও তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপে, এমন কি, বাতাসের শব্দেও চমকিত হইয়া ডাকিয়া উঠিতেছিলেন—“তরুণ!”

রবিবারে এই অধীর ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। প্রাতে উঠিয়াই কক্ষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “বেবি! আজ নিশ্চয়ই তরুণ আসবে। নিজেকে আসবে বলেই সে কীল তোমার টেলিগ্রামের জবাব দেয় নি। তুমি হয় তো সেই বিল্ডী মোটা শাড়ীই পরে আছ? চেহারা হয় তো তোমার অথবা ত্রিহীন হয়ে গেছে? কিছুই তো আর আমার দেখবার উপায় নেই! যাও, একটু যত্ন করে গা-হাত সাফ করে নাও গে। ভাল দেখে কাপড়-চোপড় পরে, চুনির ব্রেসলেট, মুক্তার মালা আর যা কিছু তার দেওয়া আছে, সেইগুলি সব পরবে। সে এসে দেখে যেন ছঃখিত না হয়, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ না করে।”

এক সময় বহুদিন অপরিচিত অন্ন একটুখানি

পুষ্পসারের মুছ সৌরভে ■ একখানা নূতন শাড়ীর খসখসানীতে কক্ষার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রীত-ভাবে বিজ্ঞাসা করিলেন, “কত বেলা রে?”

“সাড়ে আটটা, বাবা! এইবার তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে—”

“বলো কি বেবি! রাত্তির সাড়ে আটটা?—তা হ’লে তো তরুণ আজও এলো না! সত্যিই তা হ’লে সে আমাদের ভাগ করলে।—”

“ও বাবা! বাবা! বাবা গো! অমন কর্তো কেন, বাবা? এখনও হয় তো আসবার সময় আছে। হয় তো সরকারী কাজের জন্য আসতে পারছেন না। না হয়—আমিই কালকে যাব। তুমি স্থির হও।”—

“বেবি!—বে-বি! সে একটা চিঠিও তো আমাদের লিখতে পারতো। তবে কি, তবে কি, তোমারই সন্দেহ সত্য? সেই কি আমাদের এই দশা ঘটালে? তার পর এখন নিঃস্ব পথের ভিখারী ডাক্তার মল্লিকের মেয়েকে ম্যাডিক্সট্রেট তরুণ লাহার অযোগ্য বোধে ঘৃণা করে আমাদের দিকে ফিরে চাইলে না? তবে আমি যথ দেখাব কি করে? হালদার, নিরোগী, বাঁড়ুঘো ওরা যখন জানতে পারবে, আমি আমার সে গজা লুকবো কোথা দিয়ে? ও রে বেবি! তোকে যে এক সময় সঝাই হিংসা করতে রে! আজ তোর এত বড় অপমানও আমার বেঁচে থেকে দেখতে হলো?”

“বাবা! অত অস্থির হ’লে কি হবে! আমি তো বলেছি, আপনাকে খুসী করবার ■ আমি তাঁকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি, কাল সকালেই আমি নিজে যশোর যাব।”

ডাক্তার মল্লিক একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার দুর্বল বক্ষের প্রায় আধখানা খালি করিয়া ফেলিয়া সকাতির এই কথা বলিলেন;—“আর তুমি যাবে! সে হয় তো এতক্ষণ ■ কোন মেয়ের সঙ্গে এন্গেজড হয়েছে। আর কি সে তোমায় বিয়ে করতে রাজীই হবে?—আর কি সে তোমার চেয়ে দেখবে! আর কি সে আমার মান-ইজ্জত বাঁচাতে চাইবে! কোন আশা নেই, কোন আশা নেই, ■ রে আর যে আমার কোনই আশা নেই রে—!”

সে রাতে আরও একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া তাহার উত্তরের প্রত্যাশা করা হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মল্লিকের খানসামাটা ■ হইয়া কৃষ্ণার গৃহদ্বারে দ্রুত করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল।—



“কি রে আব্দুল?” বলিয়া কৃষ্ণা নৈশবাসের উপরেই একটা শাড়ী ও জ্যাকেট টানিয়া জড়াইয়া বাহিরে আসিতেই সে খবর দিল, “ডাক্তার-সাহেব কি রকম শব্দ করছেন, কথা কইছেন না; নড়ছেন না; আপনি একবার আসুন।”

উহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া ভীতা কৃষ্ণা উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিতেই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—  
“আফটার অল্ ইট আর রাইট মাই চাইল্ড! আই অ্যাম ডিসিভ্—মোট কুয়েল্লী ডিসিভ্। ওঃ তরুণ!—তরুণ! তুমি এই করলে?”—

আর কোন সাড়াই সে পাইল না।

ডাক্তার আসিয়া মত্তব্য করিলেন, “হাট কেলি-ওর।”—

সন্ধ্যা-তারকারা যথারীতিতে তাহাদের নিত্যব্রত পালন করিতে নীল-সাগরের উপকূলে আসিয়া জমা হইয়াছে। মেঘপুঞ্জের অন্তরালে ক্ষণ অন্ত ক্ষণ সমুদিত চন্দ্র তাহার রূপালী আলো দিয়া সুখচুঃখের ক্রীড়ার মতই ক্ষণে ক্ষণে ধরণী-বন্ধকে আলো ছায়ায় বিচিত্রতর করিতেছিল। ডাক্তার মল্লিকের প্রকাণ্ড প্রাসাদ-ভবন এই ছায়া-কালের মধ্যে কি নিবিড় শোকাচ্ছন্ন ও অসহনীয় নিস্তব্ধ মনে হইতেছিল! সাহায্যের মরুপ্রান্তরের সেই সজ্জাহীন, শ্রীহীন জন-বিয়ল বাড়ীখানি যেন উর্দ্ধ্বাসে হা হা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

মল্লিক-সাহেবের বিখ্যাত গৃহ-সজ্জার শেষ অংশে গোন্ধর গাড়ী বোঝাই হইয়া ম্যাকেলিলায়েলের নীলাম-ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রারস্ত করিতেছে, তেমন সময় একখানা টুনীটার কার আসিয়া এই বাড়ীর আইভি-জড়িত চারনা টবে বিলাতী ভালে এবং বিচিত্র ক্রোটনে-সজ্জিত গাড়ী-বারান্দায় প্রবেশ করিল। মিঃ লাহা তাহা হইতে ছুরিতে নাশিয়া পড়িয়াই চারিদিকে নিজের বিস্মিত দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সামনের হল অন্ধকার, সিঁড়ির প্রথমে যে ধাতুময় কাফ্রিমূর্তির হাতে ইলেকট্রিক আলোর একটা ঝাড় ছিল, সেটা নাই। ছবি, আরসি, কার্পেট, চারনা পোরসিলেনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টব, সবই গিয়াছে। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি অতি ক্রম করিয়া স্পন্দিত-বন্ধে প্রত্যেক জনহীন নিরা-লোক ও স্তম্ভস্বয় ঘরগুলোকে অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে ডাক্তারের শয়নকক্ষে আলো জলিতে দেখিয়া অর্ধ আশঙ্ক্যভাবে মিঃ লাহা সেই

ঘরেই প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রবেশমাত্র তাহার সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইয়া আসিল। ডাক্তারের শূন্য-গৃহেও তাহার পরিচিত সাজসজ্জা কিছুই বর্তমান নাই, শুধু শয্যাহীন খাটের উপর কে একজন আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে।

তাহাকে কৃষ্ণা বলিয়া চিনিতে তরুণচন্দ্রের বিলম্ব হইল না।

“বেবি! বেবি! আমি এসেছি। আজ আমি আমার অসহ্য বন্ধন হ’তে মুক্ত হয়ে তোমায় পাবার যোগ্যতা এবং দাবী নিয়েই এসেছি।”

তরুণচন্দ্র কৃষ্ণার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের উপর নিজের মমতাপূর্ণ হাত দুখানি রাখিলেন। “বড় দুঃখ যে আর একটি দিন আগে আসতে কিছুতেই পারলুম না! গত-রাত্রে আমার জীবন মৃত্যু হয়েছে এবং—”

ধীরে—অতি ধীরে মিঃ লাহার স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া কৃষ্ণা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর নিজের স্থির কটাক্ষ তরুণ-চন্দ্রের বিজয়-গৌরবানন্দে-পরিপূর্ণ অখণ্ড সমরোচিত ভাবে জীবৎ গাভীর্যময় দৃষ্টির উপর নিবদ্ধ করিয়া শান্ত অখণ্ড সুদৃঢ়ত্বেরে কহিল;—

“কিন্তু আপনাকে দরকার আমার যে এখন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।”

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনয়ের পরেশনাথ পাহাড়ের কাজে আশানুরূপ ফল মিলিল না। অন্তর-বাহিরে বণিকবৃত্ত মাড়োয়ারীরা বিলাতী পণ্য-বর্জনে সহজে কেহ সম্মতই হইতে চাহে না। ছ’ এক জন ছাড়া সবাই বলে, “বাবুসাহেব! ‘যাতে ছ’ পয়সা লাভ, তাই কর’বো কি ব্যবসা ফেল করতে ব’সে বাব?” কেহ বলিল, “আরে যান্ যান্, বাবুসাহেব!—আপনাদের তো হুজুকে মাতা! আজ এই কথা বলছেন, আবার কালই চাই কি, একটা চাকরী পেয়ে গেলে কলারের নীচে টাই বেঁধে দিব্যি সাহেব ব’নে যাবেন। তখন ঐ খন্দরের বোকা আমি বেচ’বো কাকে? আপনাদের কি বেশী দিন সহ্য করবার শক্তি আছে?”

বিনয়ের দল এই স্তায়সমস্ত নির্কিবাদ প্রচেষ্টার হাবি-সম্বন্ধে অশেষ-বিশেষে আশা দিয়া

## অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী

বুঝাইতে লাগিল। তাহার। বলিল, ইতঃপূর্বে হ' একটা চেষ্টা যে বার্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ সে সব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জত ভাবে করা হয় নাই। কোথায়ও বা ঐ চেষ্টার পথ সর্বাঙ্গ ও জটিলতাপূর্ণ অধর্মমূলক হইয়া পড়িয়াছিল। এবার তাহা নহে। ভবিষ্যৎ এবার নেতৃত্বশক্তিসম্পন্ন নেতার অভাব ঘটিবে না বলিয়া দেশ আশা করিতেছে। এই মহৎ কার্যে মহাপ্রাণ নেতা ব্যতীত কখনই কার্য-সাফল্যের ভরসা থাকে না।

উহাদের সঙ্গে দুইটি শিক্ষিত বাঙালী ছিলেন। তাঁরা বলিলেন;—মানুষ-নেতার দ্বারা হইবে না, তবে যদি ভগবান্ নিজে আবার অবতরণ করেন, তা হ'লে কি হয় বলা যায় না।—

ছেলেরা বলিল, তিনি মানুষের মধ্য দিয়েই তো এসে থাকেন। গীতায় বলেছেন;—

“পরিভ্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদ্যতাম্ ।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবায়ি যুগে যুগে ॥”

উহারা বলিলেন, “তিনি সাধুদেরই পরিভ্রাণের জন্য আগমন করতে প্রস্তুত আছেন, তোমরা এবং আমরা কি সাধু?”

ছেলেরা বলিল, “না, কিন্তু হ'তে হবে। জন্মগত সাধু বা সাধক যিনি, তিনিই তো ভগবানের অবতার। সবাই সে কপিল বশিষ্ঠ শুকদেব বা সনক-সনন্দন সনৎকুমার হবে না। কিন্তু বিশ্বামিত্র হ'তে পারে। মহা মহা পাপী ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরও আদর্শ জননারকে পরিণত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যদি সে পাপ তার কেবলমাত্র শিক্ষা, সৎতা ও সৎ প্রভৃতি দ্বারা অল্পাধিক শারীরিক পাপ হয়। কুটিল স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারটাই মনের কলুষ। সেটা নষ্ট হওয়া দীর্ঘকালসাধ্য, হয় তো অমর লতার মত তার জড় কখনই মরে না।”

“কিন্তু ধরুন, আপনারা এই কম-বয়সী ছেলে, আপনাদের কি নেতা হবার শক্তি আছে মনে করেন? আপনাদের মান্বে কে? আর যারা মান্বে, তাদের যে আপনারা ঠিক পথেই নিয়ে যেতে পারবেন, তার প্রমাণ কি?”

ছেলেরা বলিল—“এ সন্দেহ অমূলক নয়। এই ‘অক্টোবের নায়মানাঙ্কা বধা’ গোছ ভাস্কি একটা তো ব'টে যাবার ভয় আমাদেরও সর্বদাই করতে হয়। এ সব বড় বড় কাজের ‘অর্গানাইজ’ করাই তো সব চাইতে ভাবনার জিনিস। তবে প্রকৃত নেতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন এক জন মহাত্মার যদি অভ্যুদয় ঘটে, তা

হ'লে তাঁরই দৃষ্টান্তে ও প্রভাবে শত শত মধ্যশ্রেণীর দেশ-সেবক তৈরি হ'তে বাকী থাকে না। প্রধান পরিচালনভার সেই একমাত্র নেতৃপুরুষের হাতেই থাকবে, আর তাঁর অধীনে কেহ কেহ এক-জন ক'রে প্রধান ও অপ্রধান যত হয়, কার্য-নির্বাহক থাকা চাই। এককে পেলে বহুকে পাওয়া কঠিন হবে না। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই এই নীতির অনুসরণে কাজ হয়ে থাকে। স্বদেশের সাধনার, স্বদেশের পুনরুত্থানে, নূতন ভাব-প্রচারে এবং অন্য নিয়ে বুদ্ধ-বোধপাতেও সর্বত্রই এই একই পন্থা। ‘কমান্ডার-ইন্-চিফ্’ একই জন, এবং তাঁরই যথার্থ উপযুক্ততার প্রয়োজন। বাকি হু-দশ ছাড়া সবই তো অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ।”

“কিন্তু ‘নেতা’ হবার যোগ্যতা তাঁর আছে কি না বুঝতে পারবো কি দেখে?”

একটি ছেলে কহিয়া উঠিল, “কেন, ৬তম শ্রেণী সুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ-পুরাণ-স্বরূপ অমর-গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের ‘নেতৃ-প্রতীক্ষা’ প্রবন্ধটি প'ড়ে ফেলুন না; এবং সেই ভবিষ্যৎ-বেস্তার নেতৃ-পরিচয়ের সঙ্গে ‘নেতার’ লক্ষণ মিলিয়ে দেখে নিন। যদি সাড়ে তিনভাগও মেলে, সাড়ে তিনভাগও তো বিশ্বাস করতে পারবেন?”

বিনয় তাহাদের এই তর্কাতর্কির সব খবরটুকু সেই দিনেই বাসায় কিরিয়া কৃষ্ণার পক্ষে উপহার পাঠাইল। তার পর লিখিল,—যদি তোমার সামাজিক প্রবন্ধ পড়া না থাকে, সেইজন্য ঐ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রেই দিতেছি। আমি নিজে পূর্বে পড়ি নি, এখন প'ড়ে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হচ্ছি। কি অসাধারণ হৃদয় ও দুর্দৃষ্টির সহিত অনন্তসাধারণ ও অকৃত্রিম দেশপ্রেম! আজিকার এই ‘নন্-ভারো-লেস’ সম্বন্ধে বহু বহুকাল পূর্বেই তো তিনি পথ প্রদর্শন ক'রে গেছেন এবং নিজের জীবনের আদর্শে স্বদেশের সর্বপ্রকার উপকারে ও দেশীয় শিল্পের সাধনার বেশকিছু আমন্ত্রণ করেছেন। বই-খানাই তোমার পাঠাতে সাধ হ'চ্ছে! কারণ, এর কোনখানটাই তো বাদ দেবার দেখা দিচ্ছে। তবে আজ শুধু ঐটুকুই পাঠাই। যদি ইচ্ছা —বইখানাও আনিবে পড়ো, বা আমার লিখো, আমি পাঠিয়ে দেবো।—

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহায়ভূতি-প্রয়াসী হইবেন।

(২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন-সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন।



হুতরাং অধিকারি-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপস্থব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন।

(৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাস্বত্বের সন্নিবেশ করিবেন।

(৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সার সন্মিলিত হইয়া থাকিবে।

(৫) তিনি স্বধ্যমেবের জ্ঞান ভারতাকাশের পূর্কোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মি-জালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্দোষিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-মত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোশুণের সন্মিলন থাকিবে। একরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্বাক্য স্বরণ করিবে।

“বদ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভব ॥”

যাহাতে প্রভা, শ্রী ও তেজঃ দেখিবে, তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্কোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাহাতে পাইবে, তাঁহারই গৌরব-বুদ্ধির চেষ্টা করিবে।—

তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

বিনয়শীল।

সেই দিনের ডাকেই আর একখানা পত্রও কৃষ্ণার হস্তগত হইল।—

আমার প্রিয়তমা কিষণ।

সে দিন তোমার অদ্ভুত আচরণের জন্ত আমি কিছুমাত্রও বিস্মিত হই নাই। একসঙ্গে এত বড় বড় বিপৎপাতে আমাদের মত সবলচিত্ত পুরুষেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। তুমি তো কোমলমতি বালিকা মাত্র।

বেবি! এত বড় কাণ্ডটি যে ঘটয়া গিয়াছে, সে কথা আমার তোমরা কেহই তো স্পষ্ট করিয়া লেখ নাই? আমি মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আমাকে কাছে পাইবার ব্যস্ত হইয়া তার দিতেছেন, সুযোগ পাইলেই যাইব। তোমার পাঠান টেলিগ্রামখানি, সেই আমার চির জঁপিত, ইহ-পরকালের সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ আমারই নিতান্ত মনভাগ্যবশে যখন আসিয়া

পৌছিল, তখন আমি যশোরে উপস্থিত ছিলাম না। সরকারী কাজে বনগাঁ গিয়াছিলাম। কাজেই উহা পাইতে এক দিন বিলম্ব ঘটিল। তখন কাজ ফেলিয়া আসিবার উপায়মাত্র ছিল না, সেখানে তখন দাক্তার সম্ভাবনা চলিতেছে, আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যাই হোক, আমার অধবা বিলম্বে তোমার বাবা হয়তো আমার উপর বিশ্বাসহারা হইয়াই চলিয়া গেলেন, ■ পরিতাপ আমার যে মরিলেও যাইবে না। তবে তুমি।—চির-আদরের বেবি আমার! আমার মন প্রাণ যে চির-তোমাময়, তা কি তুমি কোন কিছুতেই ভুলতে পেরেচ? তা ■ পারো নি—সে তো তোমার এই ছুদিন বিচ্ছেদের পরেই চির-মিলনের আগ্রহ প্রকাশেই প্রমাণ দিচ্ছে।

তোমার বাড়ী আমি জলীলালদের কাছে থেকে তোমারই নামে কিনে নিয়েছি। (তাদের দুর্ভাগ্য-বহারে আমি নিজের অন্তই নিরতিশয় লজ্জিত ■ সন্তপ্ত!) তোমার ফার্নিচার সমস্তই ‘সেল’ থেকে কিনে ফেলেছি, ভগবানপ্রসাদের কাছে তোমার গহনা সমস্তই জমা দেওয়া আছে। এ ভিন্ন তোমার আরও দুইটা সুসংবাদ দিই। এই মাস থেকে আমি কনকার্ড হলেম। আর আমার এক অপূত্রক জ্যেষ্ঠামশাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির (প্রায় আট দশ লক্ষ টাকার কম নয়) অধিকার আমিই পেয়েছি। আর একটা কথা;—আমার ৬ভূতপূর্বা পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার, (তার মধ্যে শ্রীপুরের মল্লিক-বংশের পারিবারিক বিখ্যাত মুক্তামালাটাও আছে—সেটার দাম জহুরীদের মতে লাখ টাকার কম হবে না। আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ এটা পাঠান-রাজাদের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলেন ওনোই।) সে সকলই আজ তোমার। আর তার সঙ্গে আমার মন-প্রাণ সে তো তোমারই ছিল, এখন আমাকেও তুমি নিজের করে নাও, আর কি প্রতীক্ষা করা যার বোধ? না, আর না, অনেক দেয়ী হয়ে গেছে, ইতোমধ্যেই।—

এখন একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসং লোক তোমার ■ আমার নামে অধবা ও অকথ্য গ্লানি সহস্র লোকের মাঝখানে প্রচার করিয়া তোমার ও আমার অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার ■ আমার পবিত্র-স্বভাবা চিরস্বথ-লালিতা, আনন্দময়ী কিষণ আজ জনসাধারণের হান্ত-কৌতুকের পাডী—সেই অহেতুক বৈরসাধনকারীর সমুচিত শাস্তি-বিধান-টুকুই বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি! তুমি

সে দিনে নিতান্তই মর্মান্তিক-চিত্তে ঐ পাখণ্ডকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। তার পর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে, তার কার্য-কলাপ পর্যবেক্ষণ জন্য তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব আমার এখনও ভাল করিয়া শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে, একটি দিন তোমার কাছে কাটাইয়া আসি।—তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিনয় শীলের সঙ্কট-কাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে।—এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে—যদি কেহ তাহাকে ইহার জন্য প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাকে চির-নির্কাসন-দণ্ড হ'তে কেহই রক্ষা করিতে পারবে না—তার পর বিনয় শীলের নির্কাসনের দিনেই যদি আমাদের গুপ্ত-বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যায়, তা হ'লে কেমন হয়? তোমার প্রতিশোধ-স্পৃহাটা সম্পূর্ণরূপেই মেটে না কি? কি বল? আমার প্রচুরতর ভালবাসা ও আদর আমার চির-আদরিণী বেবিকে দিলাম!—

তোমার চিরানুগত—তরুণ।

### নবম পরিচ্ছেদ

বিনয় এত দিন বালকের মত সদানন্দচিত্ত ও আপনা-ভোলাভাবে কাটাইয়া হঠাৎ এই কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণযৌবনের প্রথম আলাদীপ্তি নিজের অন্তরের মধ্যে বেশ স্পষ্ট করিয়াই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্যসখী উর্মিলার উপর তাহার যে ভাব, তাহাকে স্নেহ সৌহার্দ্য সব কিছুই বলা চলে, শুধু তাহা প্রেম নয়। কারণ, সে জিনিসটা স্থির বিন্দু এবং ব্যাপকভাবেই তাহার সর্বদেহের শোণিত-স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার সমুদয় মনকে অলক্ষ্য হইতে ছাইয়াছিল। পরীরমধ্যগত একান্ত প্রয়োজনীয় শ্বাস-বায়ুর মতই তাহা যেন স্বতই বর্তমান। যে বস্তুটাকে চিরদিন ধরিয়াই পাইয়া আসিতেছি, সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তাহার অভাবটাকে কোনমতেই অনুভব করিতে পারা যায় না, এতই তাহা অভ্যস্ত হইয়া উঠে। উর্মিলাকেও তাহার বাল্য-কৈশোর্যাবধি

এতই সহিয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে বেঁচন করিয়া ধরিয়া তাহার যৌবন জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। উর্মিলার চিরপরিচিত হাসি-কান্না, তাহার যৌবনোত্তরে চপল-চিত্তকে সুখে-দুখে আশার পুঙ্কে নিরাশার অন্ধকারে ডোবা-ওঠা করায় না, তাহার চঞ্চল পদক্ষেপধ্বনি তাহার সর্বশরীরের উন্নত বেগে প্রবাহিত রক্তের তালে তাল দেয় না, তাহার হাসির ■ গলার সুর তাহার সর্বদেহে পুলক-ভাড়িতের কণ্ঠনা বাজায় না। তাহার অধীর অভিমান-স্মুরিত ক্ষুদ্র ও রক্তিম অধর তাহার অধীর ও উদ্বেল হৃদয়কে ভূষিত করিয়া তুলে না। কারণ, সে উর্মিলা,—তাহার সব দিনের পাওয়া, নিজের অঙ্গশোণিতেরই একটি বিন্দুর মতই নিজস্ব উর্মিলা। ইহাকে নূতন করিয়া যে আবার নিজের অন্তরের কোনও খানে, কোন অপ্রাপ্ত-প্রদেশে এখনও পাইতে বাকী থাকিও সম্ভব, সে কথাটা বড় সহজ বলিয়াই সহজে মনে পড়ে নাই।

এক দিন নব-বসন্ত-সমাগমে চিরদিনের অনাদৃত উপবনের মতই তরুণী কৃষ্ণা এই বিস্মৃত-যৌবন চঞ্চল-মতি তরুণ-চিত্তকে আকস্মিক প্রাপ্ত যৌবনোচ্ছ্বাসে ভরাইয়া তুলিল। তাহার পদস্পর্শে অশোক মুঞ্জরিত হইল, তাহার হাসি-গানে এত দিনের যুকীভূত কোকিল-পাখিয়া পঞ্চমে সপ্তমে গাহিয়া উঠিল। কৃষ্ণার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রীতি যে ক্রমশঃই প্রবল আবেগ ও তীব্র আকর্ষণজনক প্রেমে পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথাটা তাহার নিজের কাছে সেই দিনই একান্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে অবসরপ্রাপ্ত হইল, যে দিন মিঃ লাহাকে কৃষ্ণার প্রত্যাখ্যান করার সংবাদটা সে তাহারই মুখ হইতে জানিতে পারিল।—প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝখানেই তাহার আনন্দোৎসবের মুক্তধারা সহসাই ঘোর নিরানন্দে পরিবর্তিত হইয়া ধামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা তরুণ লাহার হইল না, এ অতি সুসংবাদ বটে; কিন্তু বিনয়েরও তো তাহাকে নিজের মনে করিতে পারিবার কোন-রূপ সাধ্য নাই! বিনয়ের মন ক্ষণিক আনন্দান্বিত ক্ষণপ্রভাবৎ চঞ্চল ও তেমনি তীব্র গভীর সুখের অনুভূতিটুকু প্রাপণ-বলে বৃকের মধ্যে কান্না-লের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে ছাড়া একান্ত দুঃসাধ্য—এবং হয় তো বা অসাধ্য বলিয়াই তাহার বোধ হইতেছে, তাহাকে, এমন কি, তাহার স্মৃতিটুকুকে পর্যন্ত নিঃশেষ করিয়াই তাহার মন হইতে মুছিতে হইবে। এর চেয়ে যদি সে লাহার ■ হইতে স্বীকৃত



ধাকিত, তবে হয় তো পরনারী-হিসাবে তাহার প্রতি নিজের মনোভাবকে সে কোন মতেই এতটুকু প্রশ্রয় দিতে সাহসী হইত না, এবং তাহার নিজের মনের কাছেও এই তাঁর অনুভূতিটা অস্পষ্টই থাকিয়া যাইত।—কৃষ্ণাকে ভুলিবার সঙ্কল্প লইয়াই সে কলিকাতার বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নিজের ভ্রান্তি তাহার নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার স্মৃতি আজ শত শত কোণ দূরেও যে তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবিয়া দেখিল, তাহার ধ্যানে সে দিবারাত্রের মধ্যে অল্প সময়ই শুধু ডুবিয়া থাকে না। দেশ-সেবার মধ্যেও সেই তারই প্রতি কার্য্য, প্রতি উদ্ভম, নির্ভীক ও শান্ত ধৈর্য্যপূর্ণ ও উৎসাহিত আচরণ তাহাকে যেন সমধিক উজ্জল ভাস্কর-মূর্তিতে তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বিনয়ের মনে হইল, তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারিলে তাহার কর্ম্মোদ্ভম শতগুণেই যেন বর্দ্ধিত হইতে পারে। তাহাকে ছাড়িলে আজ এ পথেও সে নিঃশব্দ ককৌর।

সঙ্কল্প পরিবর্তিত করিল।—সে ভাবিল, মনে মনে আমি যদি তাহাকেই চিরদিন ভালবাসি, গোপনে—পূজা করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কথা সে না জানিলেই হইল। সে তো আমি জানিতে দিব না। অথবা যদি কোন মতে জানিতেও পারে, পারিলই। আমি কায়মনোবাক্যে কখনই আমার এই অন্তরের গোপন সাধনাকে, পূজার উপচারকে, বাহিরের ভোগের উপাদান করিয়া ফেলিব না, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কাছে দাঁড়াইয়া নিজের এই দুর্বল অন্তরকে যদি এতটুকু একটুখানি উৎসাহের স্পর্শ বুলাইয়া সামর্থ্যশীল করিয়া লইতে পারি, ছাড়িব কেন? আমার পক্ষ হইতে তাহার কোনরূপ শাস্তির স্মৃতির ব্যাঘাত আমি মরিলেও ঘটতে দিব না, ইহা স্থির।

বিনয় কলিকাতা বাজা করিল। বাকিপুর, আরা, বজার ও বেনারসে পাঁচ সাত দিন মাত্র তাহার থাকা ঘটিয়াছিল; বেশী দিন তাহার আবেগ-চঞ্চল চিত্ত সহিতে পারিতেছিল না।—হু-এক রকম চরকার নমুনা সে সঙ্গে করিয়া লইল।

ট্রেনে সে খার্ডকানের টিকিট লইয়াছিল। গাড়ীতে বেজায় ভিড়। তিল-ধারণের স্থান আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পার হইলে দেখা গেল, সেই জনারুণা—রাত্রে বাহাদের লইয়া অন্ধকূপ-হত্যার উপক্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে, তাহাদের মধ্যে

বিনয় এবং কেবল আর একটুমাত্র বাঙ্গালী ঐ কাষরাটিতে বাকী পড়িয়া গিয়াছে। বেহারীর ভিড় বেহারের সীমানাতেই নিঃশেষ হইয়াছিল।

এই লোকটির সঙ্গে বিনয়ের একটুখানি আলাপ জমিয়াছিল। বিনয়ের চেয়ে বয়সে বৎসর দশেকের বড়, বড় বড় করিয়া রক্ষিত মাথার চুল, ছাঁটা দাড়ি, একটি ছোট টিনের পেটরা, একটা ক্যান্সিসের আধ-ময়লা ব্যাগ ও ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলীর সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধা একখানা পুরাতন তালি-সেলাই ও তৎসঙ্গেও স্থানে স্থানে ছিদ্রওয়ালা ছাতা। থেলো হাঁকারে মধ্যে মধ্যে টিনের কোঁটা হইতে বাহির বরিয়া তামাক সাজিয়া খাইতেছিল। বিনয়কে তামাক খাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া সে তাহার পকেট হইতে কলাপাতা-জড়ান সাজা পান বাহির করিয়া দিতে গেল। পুনশ্চ হাসিয়া ও বিনীতভাবে বিনয় তাহার সাগ্রহ উপহারকে প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু একটি জিনিসকে শুধু পারিল না। ঐ দরিদ্র ব্যক্তির পরণে হাতে-কাটা মোটা সূতার খাটো ধুতি। বিনয় তাহার কিম্বৃত আকার ও আচার সবেও মনে মনে সম্ভ্রান্তভাবে প্রণাম করিল, বাহিরে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মেমারি-নিবাসী অশিক্ষিত দরিদ্র হরিপদ বাগ শিক্ষিত সুসভ্য ও ধনি-সন্তান বিনয়কুমারের অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিল।

কথার কথার হরিপদ দুঃখ করিয়া বলিল, “দেখুন না মশাই, মেয়েটা খুত্তর-বাড়ী চ’লে গেল, এমনি ভুলো মন সব, পেটরাটি তার ফেলে গ্যাছে, কেমন ক’রেই বা পৌছে দিই। আবার কতকগুলো টাকা খরচ হবে, গরীর ছাঁপোবা মালুম মশাই, কোথা থেকে কি পাই বলুন না? কাচ্চা-বাচ্চা নিরে ছুঁবেলার ছটো মুটো খেতেই আটে না। গরীব তারাও মশাই! আমারই মতন গরীব তারা, আবার যে ছুঁখানা হঠাৎ কিনে দেবে, তারও তো বুগ্যতা নেই। চাবিটি নে’ গেল, বাজটা কি না রইলো প’ড়ে!” একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

দীর্ঘ হইয়া বিনয় সমুদ্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার মেয়ের খুত্তর-বাড়ী কোথায়? আমি না হয় পৌছে দোব। আমি তো ক’ল-কাতাতেই যাচ্ছি।”

“বলেন কি বাবু! আপনি পৌছে দেবেন! আমাদের জন্তে এত কষ্ট আপনি কেন স্বীকার করতে যাবেন!”

বিনয় কহিল,—“আমার কোন কাজ মেমারীতে পড়লে আমি যদি তোমার লিখে পাঠাই, তুমি বি

ক'রে দেবে না ? পরস্পরের সাহায্য পরস্পরকে তো করতেই হয়। তাদের ঠিকানাট বলা তো, আমি লিখে নিই।”

“সাত নম্বর.....লেন। খবরের নাম রত্নেশ্বর হাতি, আমার মেয়ের নাম কুমুম। জামাই সর্বেশ্বর হাতি।”

বিনয় কাগজ-পেন্সিল বাহিঃ করিয়া উক্ত নাম-ধাম সমূহ লিখিয়া লইল, উপরন্তু হরিপদর ঠিকানাটা টুকিয়া লইতে ভুলিল না।—

টিনের সেই ছোট পেটারাটা রাখিয়া মেমারী ট্রেনে হরিপদ বাগ ট্রেন হইতে নামিয়া গেল। আর এক জন ভদ্রলোক আসিয়া সেই কামরার উঠিয়া বসিলেন। ইহারও গম্যস্থল কলিকাতা।

ট্রেনখানা কলিকাতার যতই নিকটবর্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই কি একটা গোপন স্থানে বিনয়কুমারের মনের মধ্যটা যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালার সুজলা সুফলা গ্রামলা ছবি কয় দিনের অদর্শনেই তাহার বিরহ-বিধুর চিত্তে যেন নব-সন্মিলিতা প্রিয়ার মুখপদ্মের মতই অপক্লপ ও নবীন সৌন্দর্যালোকের সমাবেশ করিয়া তুলিল। চারি পাশে নবকিশলয়বিধগীত হরিৎ ক্ষেত্রসমূহ, তাহার কিনারায় কিনারায় সুপ্রচুর বর্ষা-বাণী-সঞ্চিত জলাশয়, কুমুদ-কল্লার ও খেত ও রক্ত পদ্মখচিত শোভায় সেই পবন-চঞ্চল নির্মল সলিলাসন-গুলি বঙ্গ-লক্ষীর নিজস্ব কমলাসনবৎ পরমরমণীয় শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া থাকিলে চোখ যেন কিরিতে চাহে না। স্থানে স্থানে মজিয়া আসা নদীর উপর সেতু দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। অপ্রশস্ত জলের ধারা বর্ষায় কিছু কিছু প্রশস্ততা লাভ করিতে পারিয়াছে মাত্র। হৃৎধারে পরিত্যক্ত গ্রামের উপর অদৃশ্যসমূহ নিবিড় অরণ্যানী বাঙ্গালীর অক্ষমতার জলন্ত সাক্ষ্যরূপে ম্যালেরিয়া-ধ্বংসকারী বীজ সঞ্জন করিতেছে। বিনয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসিল। এই সুবর্ণ-প্রস্থ বাঙ্গালার মাটি অনর্থক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে; আর বাঙ্গালীর দরিদ্র ■ মধ্যবিত্ত লোকেরা যুগ্মাচ্ছাদিত জন-অধুষিত সহরের বুকের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিতে করিতে শ্বাসকষ্ট্র তায় প্রাণ হারাইতেছে। এই সব নদীতীর, ক্ষেত্র-খামার, বাগান-বাগিচা অনাবাদী কেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালীর ছেলে সাহেবের জুতা ও গালি খাইয়া অর্দ্ধাশনে কলম পিষিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে।—কিন্তু করিতে পারিতেছে কি?—

ছোট বড় সহর ও পল্লী আসিয়া আসিয়া চলিয়া বাইতে লাগিল। এক একটার জনমানবের সাড়া প্রচুরভাবেই পাওয়া যায়, এক একটা বেন রাক্ষসের কবলে পতিত জনহীনা পুরীর ভ্রায় নিশ্চক। বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা রুদ্ধদ্বার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল, পুষ্করিণী কলসী-দামে হরিষর্প, কুটীরনিবাসী দরিদ্র ভাগ্যবানের ভাগ্যছায়া-বাঞ্ছিত ছর্ভাগ্য-সঞ্চিতস্থলে কার্যক্রেমে দিনাতিপাত করিতেছে। বিনয়ের চিত্তে তাহার নিজের পরিত্যক্ত স্বগ্রামের ছবিখানি জাগিয়া উঠিয়া তাহার ■ প্রভূত পরিমাণে মমতা ও সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিম্নি উর্দ্ধাকাশকেও যতখানি সম্ভব বর্তমান সম্মততার তপ্তাশ্বাসে করিয়া তুলিয়া নিজেদের গৌরবগাথা ধ্বজ-রেখায় তাহারই গায়ে অঙ্কিত করিতেছিল। এখানে এঞ্জিনের বিকট গর্জন, ওখানে অসংখ্য মোটর-কারের উদ্ভট তর্জান, নানা দিগ্দেশস্থ যান্ত্রিদলের কলকল কলকল শব্দে শব্দ-মুখরিত কলিকাতার মুখপাত্র হাওড়া-ট্রেন দেখা দিল। বিনয়ের মনে হইল, গাড়ীতে উঠিয়া একখানা তার করিয়া দিলে ■ তো এখনই তাহার বুদ্ধিক্রিত দৃষ্টির সমুদয় ক্ষুধা মিটাইয়া দিয়া কৃষ্ণার মুখ-পদ্ম ফুটিয়া থাকিতে পারিত।

প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দল পুলিশ কনষ্টেবল সঙ্গে বে ইউনিফর্ম পরা সাহেবটি দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিনয়ের সঙ্গী অপর ভদ্রলোকটি একটুখানি ইঙ্গিত করিতেই তাহার বিনয়ের পথ-রোধ করিয়া তাহাকে বেরিয়া ফেলিল।—বিস্তীর্ণ হইয়া বিনয় কহিয়া উঠিল, “এ কি!”

পুলিশ-সার্জেন্ট কহিলেন, “আপনাকে আমরা আরেটে করলুম। এই দেখুন বিনয়কুমার শীলের নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে।”

গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা পাঠ করিয়া বিনয় দেখিল, তাহাকে বড়বস্ত্রের চার্জে ধরা হইয়াছে।

গাড়ীতে উঠিয়া সে কহিল, “এই টিনের বাগটা সাত নম্বর.....লেনে রত্নেশ্বর হাতির বাড়ী পৌছে দেবার তার—আমি অপরের কাছ থেকে নিয়েছি, এইটুকু শেষ করতে দিলেই আর আমার কোথাও যেতে আপত্তি নেই। আপনারা সঙ্গে থেকে এই দায়টা চুকিয়ে নিতে দিন।”

ছদ্মবেশী ডিটেক্টিভ, মুচকি হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, “বেশ; কিন্তু তার আগে ওটা আমাদের খুলে দেখতে হবে।”

বিনয় কহিল, “ওর চাবি আমি পাই নি, ওখু



বাক্সটা পৌছে দেবার ভার পেয়েছি, ইচ্ছা হয় তাদের বাড়ী গিয়েই খুলিয়ে দেখতে পারেন।”

পুলিস-ইন্সপেক্টর আবার সেই রকম একটুখানি মুখ টিঁপিয়া হাসিল। বলিল, “তা’ আমাদের নিয়ম নয়। লালবাক্সারে গিয়ে ‘সার্চ’ করবার পর এটা আমরাই বখাস্থানে পৌছে দেবার বন্দোবস্ত করবো।”

বিনয় আর কিছুই বলিল না।

বাক্সটা খোলা হইবামাত্র একটা বিষয় স্পর্শক ফণা তুলিয়া দংশনোদ্ভূত দেখিলে মাহুষ যেমন করিয়া আংকাইয়া আশ্চর্য্য করিয়া উঠে, বিনয়ের মুখ দিয়া আচম্ভক্য তেমনতর ভয় ও বিস্ময়ের যুগপৎ মিশ্রণে সজ্জিত একটা আশ্চর্য্য নির্গত হইয়া গেল।

সে বাক্সটার ছিল, একজোড়া রিভলবার এবং কয়েকটা কাটিক।

### দশম পরিচ্ছেদ

বিনয়ের ধরাপড়া ব্যাপারটা লইয়া সমস্ত দেশের খুব বড় রকমই একটা হৈ চৈ লাগিয়া গেল। এই উপলক্ষে ইংরাজ-সম্পাদিত খবরের কাগজগুলিরা খুব কথিয়া একবার দেশ-সেবকদিগকে আক্রমণ করিয়া লইল। তাঁহাদের বর্তমানে অসুষ্ঠিত ও প্রচারিত ‘নন্-কো-অপারেসন’ যে ‘নন্-ভয়োলেন্স’ নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার এই একমাত্র উদাহরণকে তাঁহারা একসহস্রবারও অস্ততঃ উল্লিখিত উদাহৃত করিয়া তুলিয়া ‘কলমে’র পর ‘কলম’ ঐ একই কথা পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলসম্বৃত করিতে ছাড়িলেন না। দেশীয় খবরের কাগজগুলি এই আকস্মিক পুলিস-আবিষ্কারে লজ্জার প্রায় অধোবদন হইয়া রহিল। এই ঘটনার কেহ কেহ স্পষ্টই রাগতঃ হইয়া যে চপলমতি অদূরদর্শী বালক নিজের অনাবশ্যক খেলায় পড়িয়া দেশের এই নূতন প্রচেষ্টাকে সন্ধিগ্ন ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতে গিয়াছে, তাহারই উপর বৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার কষাঘাত করিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ পূর্বক পুলিসের কার্য্যভাব ও তাহাদের মস্তিষ্কের উর্বরতাকেও লক্ষ্য করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিল, যদি বখাথই কোন এক বা এক দল লোক এই পবিত্র ব্রত ধারণের ছয়বেশের অন্তরালে এই প্রকার গুপ্ত চেষ্টার

ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তবে সে বা তাহারা নিশ্চিতই দণ্ডনীয়। আবার কেহ ইহার ঈষৎ মাত্রার সংশোধন করিয়া দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, হাঁ—সে কথা সত্য বটে, তবে কি না বড়বল্লভ বাস্তবিকই নন্-কো-অপারেটরের, অথবা পুলিসের কৃত, সেটি বিশেষভাবে অনুসন্ধান পূর্বক, নিরপেক্ষ ভাববিচার অনুমোদিতভাবে দোষীর দণ্ডবিধান করা হউক। তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সহানুভূতি থাকা সম্ভব বটে। অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের নবরোপিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করা, নরমপন্থী—কি চরমপন্থী অথবা নিরপেক্ষ পন্থার লোক কাহারই অভিপ্রেত নহে।

খবরের কাগজের কল্যাণে এ সংবাদ বিনয়ের বাড়ীতেও রাষ্ট্র হইতে বাকী ছিল না। তিনিই জগদ্ধাত্রী কণে কণে মুচ্ছা বাইতে লাগিলেন এবং উন্মিলা যে বিছানা হইয়া শুইল, সেখান হইতে তাহাকে নড়াইতে কাহারও সাধ্য হইল না। তার পর প্রথম থাকটা কাটাইয়া সে জগদ্ধাত্রীর জবানীতে তাঁহারই শিক্ষা-মত একখানা পত্র নিজের ভগ্নীপতি তরুণচন্দ্রকে লিখিল। বড় বিপদে তাঁহার কথাই হু’জনকার একসঙ্গে মনে জাগিয়াছিল। এ জগতে তিনিই যে এখন উই-দের একমাত্র ভরসাস্থল। এখন, হু’জনকারই মনে হইতেছিল, তিনি তো পূর্বেই এ বিপদের আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। তখন বিশ্বাস করিয়াও যেন বিশ্বাস হয় নাই। সেই তো এখন ফলিল।

কি লাহা পত্রের উত্তর দিলেন; “আমিও সংবাদ পাইয়াছি, মোকদ্দমা ভালরূপ তবির বাহাতে হয়, বখাসাধ্য চেষ্টা করিব। তবু কি?”

এক জন ম্যাগিস্ট্রেট বলিতেছে তবু নাই—এ অবস্থায় বতটুকু সাহসমালাভ সম্ভব, ছ’টি জীলো-কেই তাহা করিলেন। কৃষ্ণা অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর হরিণবাড়ীর জেলে বিনয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিল, সে দিব্য প্রশান্ত-মুখে তখন নিজের কুঠরীটিতে বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। সে তাহাকে নমস্কার করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইতেই বিনয় প্রতি-নমস্কার পূর্বক উঠিয়া সানন্দ অভ্যর্থনার সহিত তাহাকে স্বাগত জানাইল। তাহার বিমর্ষ ও ছল্ছলে মুখের ভাব দেখিয়া প্রকল্প হাস্তের সহিত তাহাকে উৎফুল্ল করিতে চাহিয়া সাগ্রহে কহিল; “আহা, এখানে বসে বেশ স্বর-সাধনার সুবিধে। যদি একটা এসাজ বা সেতার দিত, দিব্য আরাধ্যে থাকা যেত।”

কৃষ্ণা একটা নিশ্বাস ফেলিল, এ কথায় হাসিতে পারিল না।

“আচ্ছা, আমি এই গানটা গাই, তুমি তো এ বিয়ের এক জন ওস্তাদ, শোন দেখি, সুখটা ঠিক হয় কি না?”—এই বলিয়াই নিজের সহস্র উজ্জল দৃষ্টি কৃষ্ণার যথাপূর্ব রাহগ্রস্ত মুখে তুলিয়া ধরিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, এবং তার পর গান ধরিল;—

“নিষ্ঠুর হে! এই করেছ ভাল।

এমনি ক’রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন আল।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ সে তো নাহি ঢালে;  
আমার এ দীপ না জলিলে দেয় না সে তো আলো;—  
এই ক’রেছ ভাল!”—

শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণার চোক দিয়া হুঁট বড় বড় জলের ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল এবং সে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া নিজের সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই হাসি-মুখের কায়ান্তরা কঠিন অনুযোগ নিম্পন্দ হইয়াই শুনিতে লাগিল। গানের ভাষার হৃৎজনকারই প্রাণের ভাষা একত্রিত হইয়া গিয়া তাহাদের উভয়েরই অন্তরে অন্তরে কাতর মূর্ছনার তাহা কাঁদিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। লুকান আবেগ বিপুল ও অসীম হইয়া উঠিয়া অশ্রু-নদীর কূল ছাপাইয়া পড়ে পড়ে হইল।

হঠাৎ গান থামাইয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর হাসি থামিলে সে বলিল, “হাসলুম কেন জানো?”

কৃষ্ণা চোক মুছিয়া ঘাড় নাড়িল।

“মনে হলো, তোমাকে আমার গান শোনা-  
লুম, এবার তোমার একটা শুনিয়ে দিতে অনুরোধ  
করবো। তোমার গানের অতটাই খ্যাতি শুনেছি  
বটে, তবে কখনই কানে শুনি নি। তার পরই  
মনে হলো, এ জায়গাটা ঠিক সঙ্গীত-সমাজ বসাবার  
উপযোগী নাও হ’তে পারে। তুমি গাইবে একটা?  
না, থাক কাজ নেই।”

কৃষ্ণার পা কাঁপিতেছিল, সে সেই অপরিষ্কৃত  
মাটির উপর অপরিসর গৃহে বিনয়ের পায়ের কাছে  
বসিয়া পড়িল। বিনয় তাহাকে বিশেষ কাতর  
বুঝিয়া এবার আর হাসিল না। তাহার মুখের  
দিকে চাহিয়া আর একটা নূতন সন্দেহ অতি  
সহসাই তাহার মনের মধ্যে আসিয়া উদ্ভিত হইল।  
কালের ভিতর বিনয়ের মনের মধ্যে অনেক-  
খানিই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার স্বাভাবিক

তীক্ষ্ণ দী-সম্পন্ন উচ্চ-শিক্ষিত অন্তর, বয়সের অভি-  
জ্ঞতা অল্প দিনেই লাভ করিয়া ফেলিয়াছিল। কণকাল  
কৃষ্ণার জলভারাতুর মেঘের মতই অশ্রু-সঞ্জন রক্তিম  
মুখচ্ছবি সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিয়াই সে হরিতে  
তাহার একথানা হাত টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে  
তুলিয়া লইল।

“আমার জন্ত হুঃখিত হয়েছ?—কেন? জানতে  
না কি যে আমাদের সকল প্রকার বিপদই অনি-  
বার্য? তোমার নিজের অবস্থাটাও যে আমার  
চাইতে বেশী নিরাপদ নয়, সে-ও কি তুমি জান না?”

কৃষ্ণা নিজের হাত সেই ভাবেই থাকিতে দিয়া  
বৃষ্টি-শেষের রামধনুর মত একটুখানি রঙ্গীন হাসি  
হাসিল,—“সে তো আমি জানিই। এ কিন্তু তুমি  
শুধু শুধু মিথ্যা অভিযোগে হুঃখ পাচ্ছো যে। আমি  
তো তা পাবো না। তা হ’লে আমার কোন  
হুঃখ যে হতো না। তুমি কি তোমার প্রতি হঠাৎ  
এই ব্যবহারের জন্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ  
করো না?”

বিনয় পরম পরিতোষের সহিত কৃষ্ণার সেই হাত-  
খানি আন্তে আন্তে তুলিয়া ধরিয়া তাহার উপর  
নিজের মস্তক বারেকমাত্র সশ্রদ্ধভাবে স্পর্শ করিল।  
তার পর সেখানি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ পূর্বক সানন্দ-  
চিত্ত শিশুর মতই হাসিমুখে কহিল, “তাতেও আমার  
অ’র কোন হুঃখ নেই। শুধু—যদি ফাঁসী বাঁই  
বা আন্দামান যেতে হয়, তখন তোমার আমার মা’র  
আর উন্মিলার ভার দিয়ে যাব। উন্মিলা আমার  
স্ত্রী। বড় ছোটবেলার আমাদের বিয়ে হয়েছিল,  
কখন স্ত্রী ব’লে মনে ক’রতে পারি নি, বন্ধুর মত,  
ছারার মতই সে আমার বাল্য-জীবনের সঙ্গিনী ছিল,  
আজও আছে।”

প্রহরী ডাকিয়া বলিল—“আর দেবী ক’রা যেতে  
পারে না।”

কৃষ্ণা উঠিয়া ত্রিংশ-পদে বাহির হইয়া আসিল।

কৃষ্ণা চলিয়া গেলেও বিনয় সে দিন নিজের মনের  
মধ্যে একটা নিগূঢ় ও অনাবিল আনন্দের তীব্র মধুর  
স্বাদ যেন অসীম-ভাবেই অনুভব করিতে  
লাগিল। অস্তুর যেন তাহার সুবিমল ও  
অপরিসীম আনন্দের প্রাণে প্রাণিত হইয়া  
গিয়াছে—এমনি অনুভূতির মধ্যে সে আপন-  
হারা হইয়া নিজের অন্তরে ভরা সুখের  
জ্যোৎস্নার একটুখানি ধারা সেই নির্জন ক্ষুদ্র  
গহবরের অন্ধকার বকে ঢালিয়া দিয়া গাহিতে  
লাগিল।—



“এই লভিষ্ঠ সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।

পূণ্য হ'লো অঙ্গ মম, ধন্য হ'লো অঙ্গর।

সুন্দর, হে সুন্দর!”

### একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার এক জন বড় ব্যারিষ্টার এক দিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। বলিলেন, ‘আপনি নন কো-অপারেটার’ হিসাবে ‘অ্যারেষ্ট’ হন নাই, অল্প অপরাধে আপনাকে ধরা হইয়াছে। এই ‘কন্সপিরেসির’ চার্জের বিরুদ্ধে নিজেকে ‘ডিফেন্স’ করতে না দিয়ে আপনি যদি দণ্ড নেন, না হয় নিলেন;—কিন্তু বরাবরের জল্প নন কো-অপারেটারদের’ সম্বন্ধে গাল দেবার একটা মন্ত বড় সুযোগ দেওয়া হবে, সেইটের আমরা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনে। অতএব আপনার ইচ্ছা থাকুক না থাকুক, আমরা আপনাকে ডিফেন্স করতে ‘পাব্লিকের’ পক্ষ থেকে কতকটা বাধ্যই, এবং তা করবো।”

বিনয় হাসিয়া বলিল, “এ এক রকম সুন্দর জুলুম নয়। উভয়পক্ষই আমার উপর অত্যাচার চালালে, এই হরিণবাড়ীর জেলেও দেখছি আমার টেকা দায় হবে।”

ব্যারিষ্টার তাহার হাসি দেখিয়া একটুখানি হাসিলেন। তার পর বলিলেন, “আচ্ছা, ঐ টিনের পেটরাটার খবর বলুন দেখি?”—তার পর আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—“আপনার কি রাজনৈতিক ব্যাপার ভিন্নও অল্প সম্বন্ধেও কোন শত্রু থাকে আপনি সন্দেহ করেন?”

বিনয়ের তখন চট করিয়া কৃষ্ণার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। ‘তুমি কি তোমার হঠাৎ এ অবস্থার কোন ব্যক্তি-বিশেষকে সন্দেহ করেন না?’ সে একটুখানি ভাবিয়া দেখিল। তার পর অসংশয়ে চোক তুলিয়া জবাব দিল, “না।”

“ক্ষমা করবেন, কোন রকম ক’রে আমি জানতে পেরেচি; আপনার জী-ই না কি আপনাকে ধরিয়ে দেবার প্রধান উদ্যোগী। তাঁর কাছ থেকে আপনার কি চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, তাতেই নাকি এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানা যায়।”

বিনয় দণ্ডাহতের ভাষা লাকাইয়া উঠিল—

“আমার জী! উন্মিল্লা?—উন্মিল্লা আমার ধরিয়ে দিয়েছে। উন্মিল্লা?”

ব্যারিষ্টার মাথা নত করিলেন, “ঐ রকমই একটা খবর পেয়েছি, তবে ঠিক না হ’তেও পারে। তাঁর কোন এক জন আত্মীয় সিবিল-সার্কিসে আছেন, তাঁকেই না কি তিনি ডেকে পাঠিয়ে আপনার চিঠি নেন। তার পর আপনার ট্রাঙ্ক থেকেও এই চিঠির উত্তর তাঁর লেখা ঐ সম্বন্ধীয় একটা চিঠিও পাওয়া গেছে, আজ খবরের কাগজেও শুধু ব’লে এ সংবাদটা গেরিয়েছে দেখলুম। এটা কি রকম কিছু বুঝতে পারলেন? সত্যি কি ঐ রকম কথা আপনি তাঁর কোন চিঠিপত্রের কোথাও উল্লেখ ক’রে—”

বিনয় শুধু মাথা নাড়িল, “না।”

“আমারও এ ব্যাপারটা কিছু সন্দেহ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, সেই আত্মীয়টি কে বলতে পারেন? তাঁর নাম-টাম কিছু প্রকাশ পায় নি।”

বিনয়ের চিন্তা মেঘ-সমাজের-চিন্তে সহসা ঈষৎ চপলা-চমকের মতই একটা পুরাণো কথার স্মরণ হইল। উন্মিল্লার সবার চাইতে বড় বোন প্রমীলার স্বামী তাহার বিবাহের পরই বিলাত যায়। তার পর আর কখন তাহার খবর সে পায় নাই। মধ্যে একবার খেন শুনিয়াছিল, তিনি বিলাতেই কি বড় চাকরী পাইয়াছেন। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, অত খবরও রাখিত না। হইতে পারে, এই ব্যক্তিই সেই সিবিল-সার্কিসের আত্মীয়!—কিন্তু কে সে? ওঃ, আচ্ছা মিষ্টার লাহা!—মিষ্টার লাহাই কি সেই আত্মীয় হওয়া সম্ভব? ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা মিষ্টার লাহা যশো-হরের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পুরা নামটা আপনি কি জানেন?”

“জানি বৈ কি! টি, সি, লাহা—তরুণচন্দ্র লাহা।”

“তাঁর কি পূর্বে একবার বিয়ে হয়েছিল?”

“হ’য়েছিল কেন, তাঁর জী তো এখনও জীবিতা রয়েছেন। তিনি পাগল ও যক্ষ্মারোগী। সে বেঁচে না থাকলে তো এত দিন কোন্‌কালে কলকাতায় বিখ্যাতা সুন্দরী মিস্ মল্লিক তাঁর জী হতেন।”

“এক জী বর্তমানেই তা হ’লে ঐ সঙ্গে এনুগেজ-মেন্ট হ’য়েছিল?”

ব্যারিষ্টার সাহেব হাসিয়া কহিলেন, “তাতে কি! বিয়ে তো আর হয় নি। সে জীটা তো জীবন্ত। যাই হোক, বুঝতে পারলেন কিছু?”

বিনয়ের হুই চোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শুধু সংক্ষেপে উত্তর করিল, “বোধ হয়।”

বিনয়ের মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল। এক তো তাহার এই সম্পূর্ণরূপে অন্তর্য বন্দিরূপে জনসাধারণে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে জানিয়াই তাহার মনটা বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল, তার উপর উন্মিলার কাণ্ডে তাহার মাথার ভিতরে আগুন ধরিয়া উঠিল। ভ্যাগ তখনি সফল হয়, যখন তাহার সেই ভ্যাগের মূল্য পাঁচ জনের প্রকা দিয়া শোধ করিয়া দিতে পারে। এ তো আর তাহার নিকাম ভ্যাগ নয়; এ যে প্রচণ্ড কামনাতেই তরা আত্মোৎসর্গ। একে নীরবে সঁপিয়া দিতে প্রাণও চায় না, আর এর প্রয়োজনীয়তাও তা নয়। বুঝবার এবং বুঝাইবার সহস্র প্রয়োজন যে ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছে।—তার পর উন্মিলা! বিনয়ের অমূলক ঈর্ষ্যা-কলুষিত মানি শুনিয়া হিতাহিত জানশুভ হইয়া নিশ্চয়ই সে বিনয়ের বিরুদ্ধে এই ঘোরতর যড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। মিঃ তরুণচন্দ্র লাংহার যে বিনয়ের প্রতি মর্শাত্তিক আক্রোশের কারণ থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, সেটা হুঁদিন আগে হইলে বিনয় হয় তো বিশ্বাস করিতেই পারিত না; এখন সহজেই পারে।

কিন্তু কি ভয়ানক নীচ এবং ঈর্ষ্যা-প্রবণ চিত্ত ঐ উন্মিলার? আশৈশবের সহচরী সকল সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গিনী চির-অপরিচিত পরের মুখের হুইটা কথায় সে তাহাকে এত বড় অবিশ্বাস করিয়া বসিল, এবং এমন হিংস্র জন্তুর মত প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। উন্মিলার প্রতি কবে কি অন্তর্য সে করিয়াছে? সে যখন বাহা আব্দার করিয়াছে, তখনই যত টাকাই খরচ হোক, তাহাকে যোগাইয়া দিতে ছাড়ে নাই। ছোট-বেলার কথা ছাড়িয়া দাও, বড় হইয়া অবধি কোন রুঢ় কথা কোন দিনই বলে নাই। আর কি করিবে? তবে কৃষ্ণা-সম্বন্ধে তার রাগ করিবার কি ঘটিতে পারে? কৃষ্ণাকে সে ভালবাসিয়াছে, তা সে অস্বীকার করে না। করিবার কোনই কারণও নাই। কৃষ্ণার সংস্রবে আসিতে পাইলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? কিন্তু শুধু পরের মুখের একটা উড়ো খবরে নিজের চিরপরিচিত স্বামী—না হোক স্বামিরূপেই পরিচিত—তবু বন্ধুকেও এমন ঈর্ষ্যা-কলুষিত বজ্রবাণ হানিতে যাওয়া উন্মিলার কি উচিত হইয়াছে? তাহার মনের চোখে সেই বহু বৎসরের অস্পষ্টপ্রায় ঘটনাটা আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠিল।—সে যে দিন

তাহাকে ‘স্পাই’ বলিয়া নিজের ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সে দিনের কথা! আজ ভাগ্যচক্র সত্যই কি তাহাকে তাহাই তৈরি করিয়া তুলিল? সত্যই আজ উন্মিলা পুলিশের গুপ্তচরের কাজ করিল!

সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জনের কমবীয় মুখ তাহার মনোদর্পণে এই কালিমালিপ্ত কলঙ্কিত মূর্তির পাশেই ফুটিয়া উঠিল।—সে ভ্যাগে সমুজ্জল, অবিচলিত নারীমহিমার দৃপ্ত ও মহিমাম্বিত, অথচ স্নেহময়;—সে কৃষ্ণা।

ইহার পর হইতে যতবারই উন্মিলার হৃৎসহ স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার চিত্তে একটা অসহনীয় দুঃস্বপ্নের মতই উদিত হইতে লাগিল, ততই সে গভীর ঘুণার সহিত ইহাকে সমস্ত পরিহার করিয়া লইয়া কৃষ্ণার কথাই ভাবিবার চেষ্টা করিল। যে উন্মিলার সহিত তাহার পরিচয় ছিল, সে যাহাকে ভালবাসিত, সে তো নাই! তবে আর তাহার কথা ভাবিয়া কি হইবে? যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে গুরুতর রাজদ্রোহের অভিযোগে ফেলিবার সাহায্য করিতে পারে, সে তার স্বামীর চোখে মৃত। উন্মিলা—সেই ক্ষুদ্র চঞ্চল মানন্দ চিরদগ্ধিনী উন্মিলার শব্দেই কোথাও পড়িয়া থাকিতে পারে, সে নিজে নাই, ইহা স্থনিশ্চিত।—আর সে বিনয়ও নাই।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শরতের পূর্ণিমার চাঁদ প্রথম সন্ধ্যাতেই প্রচুরতর রূপালি আলো ধরলীবক্ষে ঢালিয়া দিয়াছেন। বিনয়দের বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানের সেই প্রকাণ্ড দীঘি! চারিদিকে তার ফুল-কলের চিত্রকরা ক্রেমের মতই সবুজ ঘাসের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য রকম বৃক্ষ-লতা। আর বাগখানে যেন গগনানন্দনের কুলবধু তারকাদের মুখ দেখিবার দর্পণের মত সেই দীর্ঘিকা জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করিতেছে। ষোলকলায় পরিণত পূর্ণচন্দ্র তার বুকের উপর মুহু হিলোলে দোল খাইয়া খেলা করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের দোলন-মঞ্চের চারিধারের ষোলশত গোপিনীর মতই নক্ষত্র-মেয়েরা সে খেলায় যোগ দিয়া কৌতুকভরে নৃত্য করিতেছিল, আর সমস্ত আকাশ পৃথিবী জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া গিয়া যেন একখানা প্রকাণ্ড সোনার পাতের মতই ঝিলিক হানিতেছিল।

উন্মিলা উদাস উদাস হইয়া এই দীঘির পাড়ে বসিয়া আছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যে সময়ে



আলোকের পুলক স্পর্শ অঙ্গে লইয়া স্থখের হাসি হাসিয়া উঠিয়াছে, একান্ত অসহায় ও অন্ধকার হৃদয়-মন লইয়া সে তখন একাকিনী এই নির্জন জলের ধারে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া ছিল। কি উদ্দেশ্য মনে লইয়া যে সে এই ভরা সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহিরে জনশূন্য বাগানের মধ্যে অনন্তসহায় হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তার মনের সেই গোপন চিন্তা আমরা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক নহি। তবে আসিবার কালীন একখানা গামছা কাপড় সে হাতে করিয়াই আসিয়াছিল, অর্থাৎ যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, মনে করিবে কাপড় কাটিতে চলিয়াছে।

ঘাটের উপর প্রশস্ত চাতাল, তার দুই ধারে বাবুদের বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্য মার্কেল-পাথরে বঁধান আসন। দু পাশে আলোকধার লণ্ঠন মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বিপিন শীলের মৃত্যুর পর আর তাহাতে কেহ আলো জ্বালে নাই। সেইখানে কাপড় রাখিয়া উন্মীলা এক পা এক পা করিয়া নামিয়া জলের একেবারে কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের আলোর সোনালী জল তাহার পায়ের পাতা ধোয়াইয়া তাহার কালাপানি রংএর শাড়ীর চওড়া লাল পাড়টি স্পর্শ করিল। তখন উন্মীলা একবার উর্কে সেই অসংখ্য জ্যোতির্ময় তারকামণ্ডিত আকাশে দৃষ্টি তুলিয়া কাহার উদ্দেশ্যে তাহার যুক্তকর ললাটে ঠেকাইল। একবার অ-দূরে নিজেদের বাড়ীর মুক্ত বাতায়ন-পথে যে সত্ত প্রজ্জ্বলিত সন্ধ্যা-দীপটি নবোদিত একটি তারকার মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই দেখিল। তার পর দীর্ঘিকার পরপারে যেখানে গন্ধরাজ গাছের ঝোঁপে ঝোঁপে হাজার ফুলের নক্ষত্র খচিত হইয়া আছে, সেইদিকে চাহিতেই তাহার গভীর ভারাক্রান্ত চিত্ত মথিত করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়া আসিল। জলে স্থলে গৃহে কাননে সর্বত্রই যে তাহার সেই একমাত্র প্রিয়তম—চন্দ্রসুখার অবিস্মৃত জলন্ত স্মৃতি এই ভুবনভরা জ্যোৎস্নাজালের মতই ব্যাপ্ত হইয়া আছে! শুধু—নাই বুঝি চাঁদের আলো—যেখানে ছায়া হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর কান্না হাসি যেখানে পুরানো কথার দহন দিয়া অহো-রাত্রকে অগ্নিময় করিয়া রাখে না, সেই নির্জন নিরালোক নিঃসঙ্গ জলতলে?

উন্মীলার সহিবার শক্তি সীমাতীত করিতেই সে এই উপায়টাকেই সব চেয়ে সহজ বলিয়া অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু যখন সময় আসিল, তখন দেখা গেল, তাহার হৃদয়ল বালিকা-চিত্ত এত বড়

বিপাকে পড়িয়াও আজন্মের সংস্কারকে কোন মতেই ঠেকাইতে পারে নাই। এক দিকে মানুষের স্বভাব-জাত প্রাণের মায়া, অপর পক্ষে আত্মঘাতীর বিপন্নি-পামাশঙ্কা তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আকর্ষণলিলমধ্য হইতে কূলে উঠাইয়া দিল। তখন ঘাটের সিঁড়ির উপর লুটাইয়া লুটাইয়া যে কান্না সে পরিজনবর্গের মধ্যে বাস করিয়া ইচ্ছাসম্বন্ধেও কাঁদিতে পারে নাই, সেই বুক-ফাটান পাথর-গলান মর্ম্মভেদী প্রাণের কান্না কাঁদিতে লাগিল। এই যে মরণের সহিত মুখামুখি দাঁড়াইতে আসিয়া সেই অচিন্ত দেশের অনিশ্চয়তাকে ভয় করিয়া তাহার শব্দিত ভীকৃতি যুদ্ধে বিমুখ বোদ্ধার মতই পলাইয়া আসিল; এর পর এই বিড়ম্বনাময় জীবন লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিলা কি করিবে? মরিবার আশায় যে এতক্ষণ সে অনেক অসহনও সহিয়াছে। সে আশা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এই বিড়ম্বনার বিষে জর্জরিত হৃদয়-মনকে সে কি দিয়া আজ ঠেকাইয়া রাখে।

বাড়ীর বিষয়কার্য্য নির্বাহক হরিচরণ বিশ্বাস বহু পুরাতন কর্মচারী, কিছু ফল মিষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেলখানার সে বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সেই কিরিয়া আসিয়া জগ-ন্নাথীর পারে বিনয়ের শতকোটি প্রণাম নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার একটুখানি আড়ালে বধু উন্মীলাকে নিতান্ত হুঃখ এবং কুণ্ঠার সহিত বিনয়ের প্রেরিত বাক্তী জ্ঞাপন করিল। অনেকবার কাসিয়া সাহারা মরুর মতই কেশ-বিহীন মস্তক ঘন ঘন কণ্ঠরন করিতে করিতে কোনমতে কুসংবাদটাকে সে অনিচ্ছা-শিথিল ব্যথিত-কণ্ঠে জানাইল।—

বলিল,—“বউ-মা! কি জানি মা! এ সব কথার মানে তো জানি নে, ছোট দাদাবাবু বলতে বলে, তাই মুখ দিয়ে বার করতে হচ্ছে মা! নইলে এই বড়-ছেলের সাধ্য কি ছিল যে, মার সাক্ষাতে এত বড় কথা মুখ থেকে বার করতে পারে? দাদা-বাবু তোমার বলতে বলে দিলেন যে, ছয় বৎসর আগেই তিনি না কি তোমার প্রকৃত পরিচয় জেনে-ছিলেন; আজকের এই গোয়েন্দাগিরিতে তিনি তাই কিছুমাত্রই বিস্মিত হন নি।—তিনি বলেন, ‘উন্মীলাকে বলো, তার সন্দেহটা নিঃশেষেই ভঞ্জন হয়ে যেতে পারবে; কারণ, তারই অনুগ্রহের দান মাথায় তুলে নিয়ে এ জন্মের মত পৃথিবী থেকে আমার সরে যেতেই তো হবে। আর সেইটুকুই শুধু আমারও মনে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ আমার আর কখন দেখতে হবে না।’”

উন্মিলার হুই কান জালা করিয়া বধির হইয়া গেল। তার পর আর কোন কথা যদি তাহাদের বিশ্বাস-দার মুখ হইতে বাহির হইয়াও থাকে তো উন্মিলার অবগেলিয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে পারে নাই। অলক্ষ্য হইতে যে বিষাক্ত শব্দ তাহার নিরন্তর পিষ্ট ক্রিষ্ট অহোরহ অনুতাপানলে বিদগ্ধপ্রায় অন্তঃকরণকে উদ্দেশ্য করিয়া সন্ধান করা হইয়াছিল, তাহার নির্ধাত আঘাতে রক্তরঞ্জিত বিদীর্ণ বক্ষে সে সবলে হুই হাত চাপিয়া ধরিয়া রূপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং তার পরই অকস্মাৎ মূর্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল।

সেবারের মূর্ছা-ভঙ্গে উন্মিলা মনের মধ্যে কি একটা বল-ভরসা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়া শীঘ্রই অনেকখানি সংযত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন? এইবারই তাহার নিপীড়িত বুকের মধ্যে মুক্ত হাহা-কারে ডাকিয়া-পড়া প্রাণ যেন আতঙ্কে মুহুমুহঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তবে এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত জীবন,—পতিঘাতিনীর জীবন, এই দুর্ভিক্ষহ জীবনও তাহাকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে? ঘণার ও ভয়ের তাড়নায় উন্মিলার গুরুভারাতুর বক্ষে আর যেন খাস লইবারও শক্তি রহিল না। মনে মনে সে ক্ষণিকের জন্য আশা করিল, যদি দমটা বন্ধ হয়ে যায়!—তার পর যেমনি এই বাগানেরই ভিতর—অদূরে কোলা-হল লক্ষে এক দল শৃগাল ডাকিয়া উঠিয়াছে; অন্ত্যাসৎসতঃ চম্কাইয়া উঠিতে পড়িতে গিয়া উন্মিলার ঠোঁটে বিছাতের মত এক লহমার একটুখানি তীব্র হাসি খেলিয়া গেল। এই না সে মরণ খুঁজিতে আসিয়াছিল!—বিস্মিত হইল। মুখে যতই বলা যাক, মানুষের প্রাণের মায়াটাই বুঝি তার সকল মায়ার চাইতেই প্রকাণ্ড বড়? নহিলে শৃগালে-কুকুরে ছিড়িয়া ছিড়িয়া থাইলেও যার পাপের এতটুকু প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় না, সেই মানুষ শৃগালের ডাক শুনিয়াই প্রাণটা লইয়া পলাইতে চাহে? হাস রে, বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি! ধন্য তুই! নিজের পরে তাহার অশ্রদ্ধার আর অন্ত রহিল না।

বাগানের মধ্যে আলো জলিয়া উঠিল। মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজও যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। গভীর অন্তমনস্ক উন্মিলার কর্ণে সে সমস্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। সহসা সে সর্বশরীরে চমক খাইয়া শুনিতে পাইল, “বোঠান! বলি হ্যাঁ গা বোঠান! তুমি কি এখানে আছ?”

কাদি-বি হাতে একটা হারিকেন লঠন বুলাইয়া হাঁক দিতে দিতে আগে আগে আসিতেছিল, আর তার পিছনে পিছনে আরও দু'জন মানুষের অন্তত বুঝা গেল। হু'জনের মধ্যে একজন দরওয়ান্ বজীর সিং, কাদির পিছনে লাঠী ঠুকিয়া নাগরা জুতা বাজাইয়া চলিয়াছে।

স্বপ্নময় জগৎ হইতে জাগ্রতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উন্মিলা উত্তর দিল, “হঁ।”

“যা হোক, যা হোক মেয়ে তুমি বাছা! বলিহারি যাই তোমার আকৈলকে!—হাজারটা গড় করি তোমার বুকের পাটাকে! এই সাঁজ-সজ্জাবেলা, পাখ-পাখালি—হাওয়া-বাতাস আছে, অন্ধকারের আনাচে কানাচে, আদেখা মাটিতে বুক দিয়ে কত কি কোথায় লুকিয়ে আছে, আর এই রাত পহর হ'তে যার, কেউ কোথায় নেই, এখানে এসে চুপটি-মেরে কি না ব'সে থাকা হয়েছে!”

কাদির বক্তৃতায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া কিন্তু উন্মিলা মুখ ফিরাইয়া—“যা, যা, তোকে কেউ লেকচার খাড়তে ডেকে পাঠায় নি—” বলিয়াই থমকিয়া থামিয়া গেল। শুধু কাদি নয়; কাদির সঙ্গে আরও কেহ—অপরিচিত কেহ আছে।

সে তাহার এই মানসিক বিপ্লবের মাঝখানে এমন করিয়া অজানা কাহারও উপস্থিতি একটুও পছন্দ করিল না; অথচ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায়ও কিছু চারিদিক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া না পাওয়ার মৌন হইয়া তেমনি বসিয়া রহিল। তা দেখিয়া—যে আসিয়াছিল, সে সিঁড়ির আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া পড়িল ও কহিল, “আপনার নাম তো উন্মিলা শীল?—বিনয়বাবু আপনিই—আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে। বি, তুমি ওপোরে গিয়ে বসো গে।”

বিনয়ের নামটা ইহার গলাতেই কাঁপিল, কি সে কম্পনটা উন্মিলারই বুকের, তাহা ধরিবার তেমন উপায় ছিল না। উন্মিলা সেইরূপ কম্পমান বক্ষে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, “আমি উন্মিলা।—”

কি কথা, সে প্রশ্নই সে তুলিল না। কারণ, তাহা জানার কোনই কৌতূহল তাহার এই শোকা-হতাশাদিকার ও যন্ত্রণাবিক্ষত চিত্তের কোণেও উদ্ভিত হয় নাই। কোন কিছুর রস নিংড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া দিলে সেটা যেমন নিঃসঙ্গ হইয়া যায়, ইহার মনটারও আজ সেই দশা।



অপরিচিতা নিজ হইতে বলিল,—“বিনয়বাবুর যে চিঠিখানা আপনি আপনার ভগ্নীপতি তরুণজি লাহাকে দিয়েছিলেন, সেখানায় যা লেখা ছিল, আপনার কিছু মনে পড়ে কি?”

উর্শ্বিলা এবার একটু বিস্মিত হইল, তার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, “না,—কিন্তু আপনি সে চিঠির কথা জানলেন কেমন করে?”

“জানা আর আশ্চর্য্য কি! আপনাকে লেখা পত্রই বিনয়বাবুর বিপদের সব চাইতে বড় প্রমাণ, এ তো দেশজ লোকেই জানে। তবে সেটা যে আপনি মিঃ লাহাকে দিয়েছেন, সেটা অবশ্য আন্দাজ করে নেওয়া গেল। যেহেতু, তিনি যে আপনার ভগ্নীপতি, সে কথা আমি জানতুম। মনে করবার চেষ্টা করুন দেখি,—কি কি কথা ছিল তাতে?”

উর্শ্বিলা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। চেষ্টা সে সাধ্যমত করিয়া দেখিল, তার পর হতাশভাবে কহিল, “মনে পড়লো না, কিন্তু—কেন?”

“বড় দরকার ছিল।—তাতে আপনার স্বামীরই ভাল হতো, দেখুন, যদি মনে করতে পারেন! সবটা না হোক, তবু—”

এবার উর্শ্বিলা চমক ভাঙ্গা হইয়া হঠাৎ সেই প্রফুট চন্দ্রালোকের মধ্যে উন্মিতাননে আগন্তকার মুখের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। চাহিয়াই কিন্তু যে কথা বলিতে উদ্ভত হইয়াছিল, তাহা তাহার অন্তরের আকস্মিকোদিত ঘোরতর বিশ্বাসভিত্ত হইয়া গিয়া অকস্মাৎ জিহ্বামূলেই সংহত হইয়া রহিল। যা দেখিল, সেটা সত্যিক না! সেইটেই তাহার সংশয় বোধ হইল। এত কাছে এমন জিনিষ সে যেন এর আগে আর কখন দেখে নাই।

আকাশে চাঁদ তখন ক্রমশই উর্দ্ধগামী হইতে-ছেন। জ্যোৎস্নাধারা ক্ষটিক-স্বচ্ছ ঝরণা-ধারার মতই ধরণী-অঙ্ক লীতল সুমিষ্ট রক্ততালোকে গুল্লতর করিয়া তুলিয়াছিল। জলের মধ্যেও শশাঙ্কের সেই সুবর্ণমুষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘতর ছায়া ফোলায়া নিজের রূপের গৌরবে বিভোর হইয়া রাহিয়াছে। উর্শ্বি-লার মনে হইল, এ মুখ দেখিয়া উহারও একটু লজ্জা বোধ করলে ভাল দেখাইত! সে বিমুগ্ধ এবং সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিশ্বাস-বিমূঢ়ভাবে কহিয়া উঠিল—“তুমি—আপনি কে?”

তাহার কণ্ঠের বিশ্বধ্বনি ও মোহের ভাব লক্ষ্য করিয়া অপরিচিতা মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। প্রকাশে সে যেমন তেমনি শাস্ত-স্বরেই উত্তর দিল,—“আমার নাম যে আপনি

জেনেছেন, তাতে আমার সংশয় নেই; কারণ, তা না হ'লে আপনার সে চিঠি আজ মিঃ লাহার কাছে পৌঁছত না।—আমার নাম কৃষ্ণা মল্লিক।”

এই নামই যে উর্শ্বিলা আর কখন জেনিয়াছিল, তা নয়; তবে ইহার রূপের খ্যাতিটা যে রকম তাহার বুকের বেদনায় মোচড় দিয়া গিয়াছে, তাহাতে এই রূপসীকে তাহার মন চিনি চিনি করিয়াই উঠিয়াছিল। এখন যেন সম্পূর্ণরূপে ইহাকে চিনিয়া লইয়াই তাহার জালা-ভরা চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে একেবারেই ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল।

এ কথা মনে পড়িতেই তাহার সকল অবসরতা এক মুহূর্তে কোথায় যেন চলিয়া গেল; শরীর-মন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া কিসের যেন একটা প্রবল অস্থিরতা আগিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন টান মারিয়া সেখান হইতে উপড়াইয়া তুলিয়া লইল। উত্তেজিত আরক্তমুখে সে বেগের সহিত বলিয়া উঠিল,—“ওঃ! আজকে তাই বুঝি তুমি আমার হৃদয় দেখে আনন্দ করতে এসেছ? তোমার পথ সাক্ষ হচ্চে কি না জানতে এসেছ?” তাহার সমস্ত দেহ জলস্রোতোহত শৈবালদামের মতই ভিতরে বাহিরে কাঁপিতে লাগিল।

কৃষ্ণা ইহার অবস্থা দেখিয়া হুঃখিত হইল, কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, “রাগ অভিমানের দিন এখন আপনারও নেই, আমারও নেই। শান্ত হয়ে এখন আমার কথা ক'টা ওনে নিন্, আমার আশার এখনি কিরে যেতে হবে। বিনয়বাবুর ও আমার সম্বন্ধে কত দূর কি আপনি ওনে থাকতে পারেন, সে আমার জানা নাই থাক্, আন্দাজ একটা আছে। ধরেই নিন্, আপনার স্বামী অস্ত্রাসক্ত। কিন্তু তাই ব'লে আপনি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী, স্বামীকে ফাঁসী-কাঠে ঠেলে দেবার মত অতিহিংসা-প্রবৃত্তি কিছু আর আপনার মধ্যে নেই? যা হয়ে গেছে—তার জন্ত বৃথা পরিতাপ অথবা মনের প্রাণিতে নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু একটা বিপাক ঘটিয়ে তুলেও কিছু আর তার প্রতিবিধান হবে না। তার চাইতে ঠাণ্ডা-মাথায় ভেবে দেখুন, যদি কোন মতে অস্ত্রতঃ তাঁর দণ্ডটাও কিছু লাঘব করতে পারা যায়। কি বলেন?”

উর্শ্বিলায় কথা কহিতে বিলম্ব ঘটিল, পরে বলিল,—“তা হ'লে তুমি তো ওকে ভালবাস?”

কৃষ্ণার অপূর্ব সুন্দর মুখ এক রকম হাসির

আভার চক্চকে হইয়া উঠিল,—“ধরুন, যদিই বাসি ! তা সে বিচারটা তিনি যত্নসূত্রে থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এলে করলেই ভাল হয় না ? কেউ কারকে ভালবাসলেই কি তাকেও কুইন এলিজাবেথের মতন চরম দণ্ড দিয়ে দেবেন ?—” আবার একটু হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে আমাকেও এই দীঘির জলে কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরতে হুকুম দেবেন না কি ?”

ইহার এই মর্মঘাতী নিষ্ঠুর পরিহাস যতকের ফাঁসের দড়ির টানের মতই উন্মিলার শ্বাস রোধ করিয়া আনিল। অণকাল সে সেইভাবে নীরব থাকিয়া তার পর উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, “আমাকে কি করতে হবে ?”

“সেই চিঠিখানায় কি লেখা ছিল,—যতটা পারেন মনে ক’রে বলুন।—”

“তাতে লাভ ?”

কৃষ্ণা কহিল, “আছে ব’লেই বলছি।—কি আছে তা আপনি এখন বুঝতে পারবেন না, কিন্তু ফল পেলেই জানতে পারবেন।”

উন্মিলা কি ভাবিল, পরে চিন্তিতভাবে কহিল, “কিন্তু কেমন ক’রে জানবো যে আমার তুমি ঠকাচ্চো না ? জামাইবাবুকেও তো আমি খুবই বিশ্বাস করেছিলুম। বিশেষ তিনি আপনার লোক।”

কৃষ্ণা কহিল, “আপনার আত্মীয় হ’লেও তাঁর স্বার্থ আপনার সঙ্গে এক নয়, তাই তাঁর হাতে আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ছেলেমানুষ, সংসারানভিজ,—কাজেই তাঁর ছরভিসন্ধির মধ্যে ঢুকতে পারেন নি, আমার কেন সংশয় করছেন ?”

উন্মিলা একবার ভাল করিয়া সকল কথা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিল। মিঃ লাহার সমবেদনা, মহামুভূতি, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ, বিনয়ের সেই হেঁয়ালীর জাল-বোনা চিঠি, এবং তাঁর সঙ্গীন প্রত্যুত্তর ! তার পরের সকল কথা—বিনয়কুমারের গ্রেপ্তারের খবর এবং হরিচরণ বিশ্বাসের দোষ !—উন্মিলার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, সচক্ৰ-তারকা সমস্ত আকাশ, পৃথিবী, ছালোক এবং ভুলোক সমস্তই আপসা টলটলে ও এলোমেলো হইয়া তাহার চারি পাশে যেন হাজারটা প্রেতযোনির মত বিকটচ্ছন্দে ও বীভৎস তালে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের বিকৃত ভঙ্গী ■ বিকট স্বর তাহার ভয়ানক হৃদয়ে প্রবল কম্পন-বেগে জাগিয়া

যেন সন্দেহের তাড়নাকেই শিরোধার্য করিয়া লইয়া নিরাশ্বাসের মর্মচ্ছেদী বিলাপ-ধ্বনির মত উচ্চারণ করিয়া গেল,—“আমি বলবো না,—আর আমার কেটে ফেলেও আমি তার সম্বন্ধে একটি কথাও কাক কাছে বলবো না। আমার যা করতে হয়, তোমরা কর।”

কৃষ্ণার মুখে ঘোর হতাশার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। স্বল্পকণ কর্তব্যবিমূঢ়াবৎ থাকিয়া পারশেষে শেষ-চেষ্টার মতই সে নিজেকে সবল করিয়া লইয়া উন্মিলার কাছে আরও সরিয়া আসিল,—তার পর তাহার হাত আদর করিয়া ধরিয়া স্নেহ-কোমল-সিক্ত-কণ্ঠে কহিল,—“ভেবে দেখ বোন ! আচ্ছা, তোমারই বিশ্বাসমতেই না হয় একবার মনে ক’রে দেখ, তাঁকে যদি আমি ভালই বেসে থাকি, তা হ’লে যাতে তাঁর ভাল হয়, তাই তো একান্তভাবে আমার চেষ্টা হবে ? আমি কিছু তাঁর অনিষ্টে যোগ দিতে পারবো না ? তবে কেন আমার তুমি অবিশ্বাস করছো ?”

উন্মিলা কোনই বিধা করিল না,—নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—“তাঁর ভাল করা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যেমন ক’রে হয় করবেই। কিন্তু আমার যে তুমি মন্দ করবে না, তার আমি কি জানি ? একেই তিনি আমার উপর রাগ করছেন, এই অবসরে আমার জন্মের মত তাঁর বিষ ক’রে দিয়ে নিজের পথ খালি ক’রে নেবে না যে, তার ঠিক কি ?—আমি কিছুই বলবো না, তাতে আমার ভাগ্যে যা হয় হোক।”

এই বলিয়া আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গমনোন্মত্তা হইল।

তখন একটা ক্ষুদ্র অথচ ক্ষুদ্র খাস ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কৃষ্ণাও উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উন্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বাই হোক, আর যে আপনি আপনার স্বামি-সম্বন্ধীর কোন কথা কাকর কাছে বলবেন না ব’লে স্থির করেছেন, তাতেও আমি অনেকটা ভরসা পেয়ে গেলুম। আমার এখন অল্প দিক থেকে চেষ্টা করতে হবে।—তা হ’লে আসি !”

এই বলিয়া সে গরিতপদে সোপান অতিক্রমপূর্বক পাথর-বাঁধান চাতালের উপর যেমন পা দিয়াছে, পিছন হইতে শুনিла,—“দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—” এবং উন্মিলা কৃষ্ণাসে ছুটিয়া আসিয়াই তাহার হাত ‘জোর’ করিয়া চাপিয়া ধরিল।—“তুমি সাহসী



চেষ্টা করবে বলা? আমি বোকা মুখ্য কি বলতে  
কি বলেছি—তা বলে আমার উপর রাগ করে  
তুমি তার ক্ষতি হ'তে দেবে না। আমার বলে  
যাও?”

কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া উর্মিলার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া  
বলিল, “পাগল!”

“বলো, তার ফাঁসী—উঃ বাবা রে!—দীপান্তর  
—জেল কিছু হবে না? বল, তুমি বাঁচাবে?  
কি করে সে আমি জানি নে, শুধু বলো পারবেই,—”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া শুধু জবাব দিল, “হঁ।”

“চিঠির কথা সত্যি আমার মনে নাই—থাকলে  
তোমার বলতুম,—এই বলিয়া উর্মিলা নত হইয়া  
কৃষ্ণার কাছে বসিয়া পড়িয়া ছুই হাতে তাহার দুই  
পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।—“দিদি! দিদি!”

“বোন!”

“যদি বাঁচাতে পারো, আমার স্বামীকে তুমি  
আর ভালবাসবে না আমার বলে যাও?”

কৃষ্ণা কণকাল নীরব থাকিয়া তার পর তাহার  
কমকাজলিবে হুঁখানি স্তম্ভিত সুন্দর করতল উর্মিলার  
নত মস্তকের উপর স্নেহপূর্ণ আদরে স্থাপনপূর্বক  
সেইরূপই গাভীর্ঘ্যময় অথচ দীর্ঘ কীর্ণ হাস্য-মণ্ডিত-  
মুখে কহিয়া উঠিল, “পাগলি কোথাকার! আর  
উঠে আর।”—

উর্মিলা কৃষ্ণার দুই পা দু' হাতে জোর করিয়া  
আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ  
তাহারই মধ্যে গুঁজিল।—“বলো, আমার স্বামীকে  
তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে না—বলো?  
আমি যে সে সহিতে পারবো না।—কিছুতেই  
যে সে আমার বুকে সহিবে না ম'রে যে  
নিশ্চিত হবো, তারও যে আমার উপায় নেই। মর-  
তেই তো আজ এসেছিলুম—পারলুম কৈ? সাহস  
হলো না যে! তা হ'লে আমার কি গতি হবে?”  
উর্মিলার চোখের জলে তাহার প্রতিপক্ষের পা  
জিজিয়া গেল।

“উর্মিলা!”—কৃষ্ণা জোর করিয়া উহাকে টানিয়া  
তুলিয়া কিছুকণ কথা খুঁজিয়া পাইল না। পরে  
নিজেকেও সামলাইয়া লইয়া এবং রোদনকম্পিতা  
বিবশা বিহবলা উর্মিলাকেও কিঞ্চিৎ শান্ত হইবার  
অবসর দিয়া নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া  
বলিল, “উর্মিলা! মানুষকে অত ছোট করে  
দেখো না—তোমার স্বামী তোমারই আছেন, এক  
দিনের [ ] তিনি আর কার হনও নি, আর  
হবেনও না। মন্দ লোকে তোমার কাছে মিথ্যা রটনা

ক'রে গেছে মাত্র। এসব ভুলে যেও। এ নিয়ে  
ভবিষ্যতে দুজনে আর নতুন দুঃখের সৃষ্টি করো না।”

“তিনি কি আর কখন আমার ক্ষমা করবেন?  
না না, কিছুতেই তা বোধ হয় পারবেন না।”—  
বলিয়া উর্মিলা আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে  
লাগিল। “আমি যে কত বড় অপরাধ করেছি,  
সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছে, এর পর কি কেউ  
ক্ষমা পেতে আশা করে?—করে কি?”

“আমার বিশ্বাস করো, তোমার ক্ষমা তিনি  
করবেন।”

উর্মিলার বুকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের তড়িৎ  
মুহূর্হ চকিত হইয়া গেল,—“কি ক'রে তুমি জানলে?  
সত্যি তিনি খালাস পেয়ে ফিরে আসবেন? আমার  
ক্ষমা করবেন? আমার ফিরে চাইবেন? সত্যি,  
এ কি সত্যি? তুমি—তুমি—তাকে আমারই  
থাকতে—”

সকোচে বাধা-পড়া কথাটাকে শেষ হইবার  
অবকাশ না দিয়াই কৃষ্ণা তাহার সকল প্রশ্নকেই  
সমষ্টিগত করিয়া লইয়া উত্তর দিল—“নিশ্চয়।”—  
তার পর উর্মিলা আবার মাটিতে পড়িয়া তাহার  
পায়ের ধূলা লইবামাত্র তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ  
ছুই হাতে ধরিয়া তাহার ললাটে নিবিড় স্নেহে চুষন  
করিয়া গাঢ় অথচ শাস্ত্রমূলে সে তাহাকে আশীর্বাদ  
করিল, “সাবিজী-সমানা হও।”—তার পর আর  
কণবিলম্ব না করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যশোরের সেই গোলাপ-বাগানে যেমন বসন্তে  
তেমনি শরৎকালেও আজ ফুলের খেলায় কিছু কম  
পড়ে নাই। প্রাচীরের ধার ঘেসিয়া যে সকল দেশী  
ফুলের গাছ বসন্তের উত্তল হাওয়াতেও জর করিয়া  
উর্ধ্বমুখী শূক সমাহিত চিত্র সাধুর মতই অটল  
ছিল; আজ শরৎ-লক্ষ্যের পূজা উৎসবে সানন্দ-  
উল্লাসে যোগদান করিতে তারাও নিজ নিজ ঘোঁগে-  
মর্থ্যের সমাবেশ করিয়া দিয়াছে। লাল, সাদা  
ও পদ্ম-করবী, গন্ধে-ভরা গন্ধরাজ, রূপরানী স্থলপদ্ম,  
অপরাজেয়া অপরাজিতা ও অতসী, অশ্রু-সজলা,  
সু-ফলা সেফালিকা এবং তত্ত্বিত্ত কারিনীফুলে হাজার  
বাতি নিশীথ রাজির আঁধার বুকেও আলো করিয়া  
থাকে। ফটকের মাথায় যে বিঘোনিয়া লতাটি  
ছিল, তার বড় বড় উজ্জল কমলা-বর্ণের কুঁড়িগুল

ও সবুজ জমীর ধারে ধারে বর্ণ-বৈচিত্র্যশালী গন্ধ-বিহীন জিনিষগুলোর বাহার, পাশ্চাত্য সভ্যতার মতই অনেক দূরের লোককেও আকৃষ্ট করিয়া কাছে আনে। কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিতেই আরদালীটা ছুটিয়া আসিয়া আভূষিত সেলাম দিয়া আন্তরিক আনন্দ ও বিশ্বয় প্রকাশ করিল। খবর পাইলে ট্রেনে গাড়ী যাইত, অনর্থক এত কষ্ট করিয়া—ইত্যাদি নানা আপ্যায়ন আরম্ভ করিতেই সে দুইটা মিষ্টবাক্যে সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“সাহেব বাবু আসছেন কি না?” আরদালী জানাইল, “তিনি খাস-কামরাতেই আছেন। তবে এখন বাহির হইবার কথা। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে মোটর-বাইকটাও নামান রহিয়াছে দেখা গেল। কৃষ্ণা উঠিয়া আসিয়া হলের সামনের বারান্দায় সাধারণ আগন্তুকদের বসিবার স্থানে একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া খবর দিতে বলিল। ‘কার্ড’ পর্যন্ত দিল না। আরদালীটি বিস্তর আপত্তি অনুযোগ করিয়া তাহাকে ভিতরে বসাইতে না পারিয়া, হার মানিয়া শেষে ভয়ে ভয়েই সংবাদ দিতে গেল। ইহাকে বাহিরে এমন ছরবছর রাখিয়া গেলে, সাহেবের কাছে অন্ততঃ দুইটা গালিও যে খাওয়া নিশ্চিত, তাহাতে তার সংশয় ছিল না।

কিন্তু পূর্ব-কর্মের কিছু স্মৃতি থাকাই সম্ভব। সাহেবের মেজাজ আশ্চর্য্য বদল হইয়া গেল। যেমন সে গিয়া বলিয়াছে, “খোদাবন্দ! মিস্ সাব আয়া। লেকেন বাহারমে বৈঠা হায়, ভিতর নেহি লে আনেসাকা গরীব পরবর।—গুলাম বহোত—”

সাহেব একটা কাগজ পড়িতেছিলেন ■ মধ্যে মধ্যে পাইপের টানে অঙ্গরের উত্তাপ মতই বাহিরেও রাশি রাশি ধূমধারা নির্গত হইয়া পড়িতেছিল। অনাগ্রহভাবে যথাকার্য্যে রত রহিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কোন্ মিস্ সাব?”

বেহারী বলিল, “হুজুর আপনা মিস্ সাব—মিস্ মল্লিক সাহাব কল্‌কাত্তা-সে আয়া—”

“হোয়াট! মাই গড্! ইজ ইট পসিবল?” মিঃ লাহা লক্ষ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।—তাঁহার হাত হইতে অগ্নিগর্ভ পাইপটা কার্পেটের উপর পড়িয়া ধরময় আগুনের ছড়াছড়ি হইয়া গেল, খবরের কাগজখানা পায়ের তলায় পড়িল। বেহারী ছুটিয়া আসিয়া অগ্নি নিবাইতে লাগিল। তিনি তার মধ্যে বর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণা একাকিনী বসিয়া সেই ‘চায়নারোজ’ ও

মার্শেলনীল জাতীয় গোলাপ-কুঞ্জের পানে চাহিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতেছিল। বারেক তাহার মুখ অদূরস্থ হরিদ্রা গোলাপের মতই বেদনা-পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, আবার তাহা উহানের মতই গুল হইয়া পরিশেষে নিজের স্বাভাবিক বর্ণ বসোরা-গোলাপের উজ্জলরূপ ফিরিয়া পাইল। মনে মনে নিজেকে সে এই আসন্ন-সাক্ষাতের জন্যই তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিল।—অতীত বা ভবিষ্যৎকে ইহার মধ্যে এতটুকু প্রশ্ন দেওয়া চলবে না।

“ভাল আছ তো বেবি?” বলিয়া মিষ্টার লাহা যখন বাহির হইয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বাহু-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া কোনরূপ অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যাই-তেছিল না।—“পথে কোন কষ্ট হয় নি? ট্রেনে নেমেই গাড়ী পেয়েছিলে তো? সব সময় আবার গাড়ী থাকেও না।”

“হ্যাঁ, পেয়েছিলুম।—আপনি কি এখন বেরবেন?”

“বেরতে একবার হবে। তবে এখন না হ’লেও চলে। এসো, ভিতরে গিয়ে বসি গে।—

কৃষ্ণা কহিল, “আমার ■ আপনার কাজের কতি করবেন না; আমার শুধু গোটাকত কথাযাত্র বলবার আছে। সেটা এখানে ব’সেই শেষ ক’রে নিয়ে আমি এখন আবার ফিরে যাব।”

“এখানে অন্য লোকও হঠাৎ এসে পড়তে পারে, ঘরের মধ্যে গিয়ে ব’ললেও আমাদের সময়ের বেশী লোকসান হবে না।”

ঝড়ের আকাশকে বাহিরে যেমন প্রশান্ত দেখায়, মিষ্টার লাহার ধরণ-ধারণে সেই ভাবটাই সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

কৃষ্ণার ইহার আজ্ঞা-পালনের রুচি বড় ছিল না, কিন্তু তা লইয়া তর্ক করিতে প্রবৃত্তি আরও কম ছিল বলিয়া অগত্যা ইহার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতে হইল। হলের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মিষ্টার লাহা বেহারাকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের আরও কি, কির ■ অনুচ্চস্বরে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমার সেই ঘরটির সব ঠিকই আছে। সমস্ত তৈরী পাবে। যাও ঠাণ্ডা হ’য়ে এসো, তার পর তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া যাবে। কেমন?”

কৃষ্ণা খুঁটির মত ■ হইয়া থাকিয়া বাড়



নাড়িল। “চা আমার খাবার দরকার নেই, আমি আমার কাজটা, এখনই শেষ করে নিতে চাই।”—

মিষ্টার লাহা একখানা চৌকি তাহার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, “তা হ’লে বসো”—নিজে আর একখানা লইয়া তাহার অদূরে বসিয়া পড়িলেন। তাহার মুখ যথেষ্ট শান্ত ও গাভীয়াপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও চোখের কোণ দুইটা চক্চকে হইয়া উঠিল।

“আপনি বিনয়বাবু জীর কাছ থেকে তাঁর স্বামীর লেখা যে চিঠিখানা ভুলিয়ে এনেছেন, সেখানা একবার আমার দেখাবেন?”

মিষ্টার লাহা বলিলেন, “বেখানার বিনয় তোমাকে ভোলবার প্রতিজ্ঞা ক’রে তার জীকে আশ্বস্ত করতে চেয়েচে, সেইখানা? সে তো এখন আর আমার হাতে নেই।”

এ আঘাত-চেষ্টাটা ব্যর্থ হইল কি কোথাও গিয়া নির্ধাত বাজিল, তাহা জানিতে না দিয়াই কৃষ্ণা শান্ত ঔদাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি সেটা এখন আর কোনমতেই কি প্রত্যাহার করাতে পারেন না?”

এ প্রশ্নও যে সম্ভব ছিল, এ সন্দেহ বোধ করি মিষ্টার লাহার মনে ক্ষণিকের জন্তও উদ্ভিত হয় নাই। তাই বিস্মিত এবং কিছু তত্ত্বিত হইয়া পড়িয়া কহিলেন, “সেটা প্রত্যাহার করাতে পারি কি না, জিজ্ঞেস কর্চো। আমাকে?”

কৃষ্ণা কহিল, “হ্যাঁ।”

মিষ্টার লাহা দাঁত দিয়া ঠোট কামড়াইয়া ভিতরের প্রবল ক্রোধোন্মত্তজন্য সবলে দমন করিয়া লইয়া উত্তর দিলেন, “না।”

“কিছুতেই না?”

“কিছুতেই না। আর কেনই বা তা করাতে যাব? বিনয় যদিও আমার নিকটতম আত্মীয়; এবং তার স্ত্রী আমার বিশেষ স্নেহপাত্রী, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে আমাদের ভাই, ছেলেকেও মাপ করে চলা চলে না, সে তো তুমি জানই। আমি গবর্ণ-মেন্টের তরফ থেকে বারমাস মোটা মাইনে খাচ্ছি, তার নেমকহারামী কর্চো কেমন করে?”

কৃষ্ণার ললাট হইতে কর্ণদেশ পর্যন্ত ব্যাণ্ড করিয়া ভিতরে একটা রক্ত-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কষ্টে সেটাকে বধাসাধ্য দমনে রাখিয়া সে কহিল, “ইংলণ্ডের ক্রুটীরই ঋণশোধ করুন; দেশের অন্ন-জলের ধার শোধ না ক’রে গেলেও সে

আপনাকে ধ’রে রাখতে পারবে না।—কিন্তু সে যা হোক; যেটাকে এখন কর্ণবা-পালন বলে উল্লেখ করলেন, সে কাজটা তো চিরদিনই ও-পর্যায়-ভুক্ত ছিল না। এক সময় ওটা প্রতিশোধ নেওয়ার হিসাবেই তো আরম্ভ হয়েছিল, তখন নেমকহারামীর ভয়টা এ ক্ষেত্রে ছেড়ে দিলেও দেওয়া যায় না তা নয়। আর আমি বলি কি, তাই না হয় দিয়ে ফেলুন।”

মিষ্টার লাহা একবার স্থির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি উহার মুখে প্রখরভাবে স্থাপন করিয়া পরে অস্ত্রদিকে চাহিয়া জবাব দিলেন, “তোমার আমার সম্বন্ধে বিনয় যে অপমানসূচক কথা লো প্রচার করেছিল, তারই জন্ত রাগ ক’রে তুমি তার উপর শোধ নিতে চেয়েছিলে। সে তো তুমি পারো নি। তা’ হ’লে আর প্রতিশোধের কথা তুল্চো কেন? প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা তোমারই তো তখন বেশী ছিল, না?”

কৃষ্ণা কহিল, “না, পারি নি। তাই আমার অক্ষর দেখে আপনার সক্ষম হস্তে আপনিই সে ভারটা গ্রহণ করেছেন। তাই বলছি, এখনও ওটা ফিরিয়ে নিন।”

“বেবি।”

“রাগ করলেও এ কি মিথ্যা কথা মিষ্টার লাহা? বিনয় শীলকে আপনি আপনার সর্বস্বত্ব-করণ দিয়েই কি ঈর্ষ্যা করেন না? এবং সেই আশুনেই কি সে আত্মদগ্ধ হ’তে বসে নি?”

মিঃ লাহা ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া চূপ করিয়া থাকিলেন, পরে বিচলিত-স্বরে কহিলেন, “মনের খবরের উপর কার কোন দাবী দাওয়া রাখা চলে না বেবি! তা হ’লে আমিও হয় তো আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে এই প্রশ্ন ক’রে বসতুম যে, লোকের মধ্যে আমার শ্রাণীপতি বিনয় শীলের জন্তই বা আমার বেবির এতটা মাথা-ব্যথা কিসের?”

অবিচলিত ও সুস্পষ্ট-স্বরেই কৃষ্ণা কহিল, “সে তো আপনি জানেনই?”—এই বলিয়া সে অস্বাভাবিক স্থির-দৃষ্টিতে মিষ্টার লাহার যজ্ঞগাহত অস্ত্রের অকস্মাৎ উৎখলিত ক্রোধ-পাংগুল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। বেশ বুঝতে পারা গেল, যেন ইচ্ছা করিয়াই সে এই শূলের ফলাটা তাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন কর্ণধরের সামান্য কাঁপন ছাড়া মানসিক বিপ্লবের অপর কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। বলিলেন, “বিনয়ের স্ত্রী যখন

আমার আপনার লোক, তখন তার ভাল মন্দও তো আমার দেখা উচিত। তার এই বড়বড়-মামলায় যাতে কাঁসীটা অন্ততঃ না হয়, তার জন্য আমাকেও বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে। আরও ক'জন ছেলেকেও আরা, বাঁকিপুর থেকে ধরে আনা হয়েছে, তাদের নাম বোধ করি তুমি জানোও না—তারা আবার কেসটাকে জটিল না করে ফেলে! যে রকম সব এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ট্রানস্পোরটেশন্ ফর লাইফ না হ'লেই বাঁচি।”

কৃষ্ণা ভিতরে ভিতরে আপাদমস্তক, শিহরিয়া উঠিল, “তা হ'লে এ মোকদ্দমা এখন চালাতেই হ'বে? কোনমতেই আর তুলে নিতে পারেন না? চিঠিখানার ঠিক কি ছিল জানতে পারলেম না; তবে বোমার কথা বা লাট-বে-লাটকে খুন করবার মন্তব্য যে ছিল না, তা আপনিও বেশ জানেন। বিনয়বাবুর মত সামান্য লোকে এমন একটা অসামান্য ব্যাপার ঘটলে তুলতে যে পারে না, সেটুকু মোটা-বুদ্ধি তাঁর ঘটে আছে। সে বাক, এখন একটা শেষ-মীমাংসা। কোন মূল্যেই বিনয়বাবুর ও তার খাতিরে আর যে ক'জন নির্দ্বিবেচী ভদ্র-সন্তানকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের মুক্তি ঘটা সম্ভব কি না?”

মিষ্টার লাহা সক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্র-কণ্ঠে কহিলেন, “বেবি! তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করচো, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গেই তা' করা চলে না। শুধু তুমি ব'লেই আমি সমস্ত স'রে যাচ্ছি!—বিনয়কে পুলিশ কি প্রমাণে ধরেছে, তার জিনিষপত্র সার্চ করতে গিয়ে রিতলবার, কাটিজ বার হয়েছে, তার কাছ থেকে তার জীর লেখা পত্রে তাদের গুপ্ত-সমিতির কথা জানা গেছে, এ সব কি খবরের কাগজে পড়ো নি? আমি তার কি করতে পারি? বিনয়ের লেখা সেই চিঠিখানা উন্মিল্য আমার অর্থবোধ করতে না পেরে পড়তে দেয়, অন্তমনস্কে পকেটে ফেলে রেখেছিলুম। সে দিন হঠাৎ দেখতে পেয়ে তখন তার অর্থ আমিও কতকটা বোধ করতে পারার, এখানে সেই সময়ে উপস্থিত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে দিই।—অবশ্য না দিলেও চন্টো। তবে ওটা আমার কর্তব্য ব'লেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু আমি সামান্য এক জন ম্যাজিস্ট্রেট, আমার সাধ্য কতটুকু সে কি তুমি জানো না যে, পুনঃ পুনঃ আমার এই প্রশ্নই করচো? গবর্ণর বা তাইসরর

ব্যতীত ও-সব মামলা কি যার তার হকুমে রদ হয়?”

কৃষ্ণা নতমুখে বসিয়া থাকিল, তার পর হৃদয়ো-খিত দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে গোপনে বুকের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—

“আচ্ছা, আমি এখন চলুম; একটা পনেরোর ট্রেনটা আবার ধরতে হবে।”

মিষ্টার লাহা প্রথমতঃ নিজের শগরু সন্নত ভক্তি বজায় রাখিয়া গভীর ■ উদাস্তপূর্ণ ভাবে নিজের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তার পর সে হাত স্পর্শমাত্র না করিয়া ঈষৎ মলিন হাস্তের সহিত কৃষ্ণা শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া সংক্ষিপ্ত নমস্কার-ক্রিয়া সমাধা করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার সেই সমস্ত-বদ্ধ মেহের বাঁধ একবারেই ধ্বসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সামনে আসিয়া দুই হাতে দ্বার রোধ করিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “বেবি! বেবি! পরও তো পরের বাড়ী থেকে এমন করে অভুক্ত চ'লে যাব না। এই দীর্ঘ পথ এসে, একটা বেলারও বিশ্রাম না নিয়ে, মুখে একটু জল পর্যন্ত না দিয়ে তুমি চ'লে যেতে চাইচো! তুমি কি আমার সেই বেবি? এত নির্ভর তুমি কি করে হ'লে? উঃ! কে তোমার এমন করে বদলে দিলে?”

কৃষ্ণার শুষ্ক আলাপূর্ণ নেত্র ভেদ করিয়া সহসা যেন একটা প্রবল অশ্রু-উৎস সবেগে উথলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। এই লোক—এই স্বার্থ-সর্বস্ব দারুণ আত্মাভিমानी আত্মোন্নতির খাতিরে পরের সর্ব-প্রকার ক্ষতি করিতেও যাহার মনে কিছুমাত্রও অনুতাপ জাগে না, সেই স্বার্থপর লোকই যে তাহাকে কত দূর নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছে, সে কথা যে তাহারও অজ্ঞাত নয়—তাহা নিঃস্বার্থ প্রেম নাই হোক, কিন্তু অতি প্রবল ও প্রগাঢ় ■ সে প্রেম, তাহাতে আজ যদি সে সন্দেহ দেখায় তো তাহা তাহার কৃতঘ্নতা! যে বেগবান্ ও তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রেমের বস্ত্র-ধারায় হয় তো জগতে শত অমঙ্গলের উদ্ভব করিতে পারে; কৃষ্ণা তাহার বেগ সহ না করিতে পারিয়া ইহার সান্নিধ্য হইতে আত্ম-রক্ষার্থ পলাইয়া বাইতেও হয় তো সমর্থ, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে অস্বীকার করিবে সে কোন্ মুখে?—তাহার স্মৃতির মন্দির উল্টিয়া কত কালের কত সঞ্চয়ই যে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া সে দিক-টায় একটা কটাক্ষেপ করিতেই একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল! কৃষ্ণা যখন সুবেশে বালিকাবস্থা



হইতে বিমুক্ত হইয়া কৈশোর-জীবনে সজ্জ পদার্পণ করিতেছে। ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষার আবর্তে এবং ট্যারো, অ্যাক্টিং—মিউজিক প্রভৃতি নইয়া বিস্তৃত ছাত্রীদলই যখন তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজ, সেই সময় তাহাদের বাড়ী এই তরুণ পুরুষ তরুণের প্রথম অভ্যাসের ঘাটে।—সে যুগে জন্মদিনের উপহারে ছুটির আমোদ-প্রমোদেও তাহাকে হাত খুলিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যময় নব নব উপহার-বস্তু যোগাইয়াছে, সকল কাজের সাহায্য করিয়াছে সেই। তার পর তাহার নবোদ্ভিন্ন যৌবনের প্রথম স্বপ্নে সে উহাকেই তাহার সর্বোত্তম ও নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়বোধে জীবনখাতায় লেনা-দেনা ইহার সহিতই তো আরম্ভ করিয়াছিল। আজ তাহার কাছে সংসারের মূর্তি বদল হইয়া গিয়াছে, উপরের সোনার পাত কম হইয়া ভিতরকার যুগধরা কাঠের চেহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তা এখন হয় নাই। তখনকার—সেই সোনালি আলোর রঙ্গীন নেশায় এই বদান্ত বন্ধুটিকে সে-ও কি বড় কম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে ছাড়িয়াছিল?—আর আজ ইহার এই বিদ্ধ বেদনার করুণ মিনতি এমনি কারয়া পারে ঠেলিয়া চলিয়া বাইতেও সে কি এক বিন্দু বিধা করিবে না?—মানুষের মন বলিয়া তবে জগতে কি কোন কিছুই অস্তিত্বই নাই?—আছে শুধু মত, বিশ্বাস ও তাই লইয়া স্বার্থ-সংঘর্ষ! কৃষ্ণার সমস্ত অন্তর যেন তাহারই বিবেকের বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হইয়া উঠিয়া তাহাকে ফিরাইতে গেল,—পা চাপিয়া ধরিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কানের কাছে বলিয়া উঠিল—  
 অন্ততঃ ওইটুকু।—এতটুকু যদি তৃপ্ত একবারের জন্তও দিতে পার। এর কাছে তুমিও তো কম ধার নি।—কিন্তু সেইটুকু ঋণ শোধের বাগনাকেও তাহার জোর করিয়া আজ জয় করিতে হইল।—না, সে পারে না।—কোন মতেই পারে না। মনের মধ্যে তাহার যে উদ্দেশ্য আজ ক্রমেই দৃঢ় সঙ্কল্পের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাকে চিন্তে রাখিয়া এখানে সম্মেহ অতিথেরতাকে সে কোন মতেই কলঙ্কিত করিতে পারে না। নিকপায় ভাবে মুখ তুলিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল—“আমার আপনি মাপ করবেন।—পারবো না।”

মিষ্টার লাহা দণ্ডাহতবৎ রোষে ক্ষোভে ব্যথায় চ-চিন্তে নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নত করিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, “এমনি ক’রেই কি হুঁজনে দূরে চ’লে গেলুম? আর কি আমাদের হি হবার কোন উপায়ই নেই? তুমি

তখন আমার জিজ্ঞেস করেছিলে, বিনয়ের মূল্য পাবার কোন মূল্য আছে কি না?—আমিও তোমার মিনতি ক’রে জিজ্ঞেস করছি বেবি, তোমাকে আমার পাশে ফিরিয়ে পাবার কোন দাম—কোন বিনিময় হ’তে পারে কি না?”

কৃষ্ণার মন দারুণ লোভে চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার অদম্য উত্তেজনার মধ্যে মনে হইয়া গেল যে, ইহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া সে তাহারই জন্ত বিপন্ন নিরপরাধীকে রক্ষা করে। আত্মত্যাগ এর চেয়ে আজ আর কোন কিছুতেই তাহার পক্ষে বেশী করা হইবে না। কিন্তু মানুষ যতই কেন যা বলুক না, নিজেকে সে কাহারও চেয়ে কম ভালবাসে না। অন্তের প্রাণ দেওয়াটা বরং অনেকটা সোজা, কিন্তু নিজের মনের সমস্ত বিধাবন্দকে প্রশ-মিত করিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করা সহজ নয়। তার পর অদূর-ভবিষ্যতে তাহাদের দাম্পত্য যে কত বড় অভিশাপের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারই একটা করুণা ছায়া, সেই মুহূর্তই তাহার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার মনটাকে শিহরিত করিল। সে কহিল, “তা’ হয় না।”

মিষ্টার লাহার মুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি কম্পিতস্বরে কহিলেন—“বেবি! এ পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র সুখশান্তি! আমার তুমি প্রাণাধিক প্রিয়তমা।—আমার চেয়ে অন্নবরদী ও দেখতে একটু ভাল ব’লে আমার প্রাণটাকা ভালবাসা প্রত্যাখ্যান ক’রে বিনয় শীলকে তুমি আজ আমার—একমাত্র আমারই অধিকৃত আগনে এনে বসালে! কিন্তু সেখানে তাকে রাখতে তুমি পারবে না। তাকে পাবে না। কখনই পাবে না। বাইরে তাকে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিলই, এখন তো অসম্ভবই হবে। তবে অনর্থক নিকরাসিতের জ্বাখের স্বতির পিছনে প্রাণোৎসর্গ না ক’রে, যেখানে আমাদের হুঁজনকারই জীবন ফল সার্থক হয়ে উঠতে সমর্থ, সেইখানেই তুমি ফিরে এসো না?—দেখ, মানুষের জন্মটা এতটা দীর্ঘ নয় যে, একটা স্থায়ীত্বের ভরসাপূত্র খেলারই পিছনে তার খানিকটা অপব্যয় ক’রে ফেলা চলে। জগতে কাজ করতে চাও, দেশের উপকার করতে চাও, আছে—করতে যারণ ক’র? মেয়েদের জন্ত স্কুল করো, ক্লাব করো, শিল্প-বিজ্ঞান করো, সকলকেই যে ঐ একটা হজুকেই মাততে হবে, তারও তো বিধান দেশভক্তির শাস্ত্রে নেই! এসো বেবি! আমার কাছে ফিরে এসো তুমি, আর আমি পার্চি নে।

আর হুঃখ আমার দিও না, কিয়। আমারও জীবন যেন তার সঙ্গে আসে। তোমার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে অনেক চেষ্টাই তো করলুম, কিন্তু কি ভয়ানক নিষ্ঠুর যে তুমি—‘কিছুতেই তোমার আসন টলাতে পারলুম না।’

কৃষ্ণা সমস্তকণ চূপ করিয়া সব কথাই শুনি, তার পর তিনি খাম্বামাত্র আর একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। খানিক পরেই একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীর চাকার শব্দে তরুণচন্দ্র বৃত্তিতে পারিলেন, সে চলিয়া গেল।

—মিঃ লাহা যখন সরকারী কাজে বাহির হইয়া গেলেন, মনে মনে এই কথা দৃঢ় করিয়াই ভাবিয়া গেলেন—বিনয় চিরদিনের জন্ত নির্দ্বাসিত হইলেই কৃষ্ণার মোহ-বিকার কাটিয়া যাইবে। এক দিন সে তাহার হইবেই!

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শিখালদা ষ্টেশনে মিষ্টার এবং মি.সন্স করের সহিত কৃষ্ণার অতর্কিতে সাক্ষাৎ ঘটয়া গেল। পর্য্যটনের উপযুক্ত বেপাৰ্জীর উপর গলার বুক পাখীর পালকের মালা ঝুলাইয়া উঠু গোড়ালীর সোখীন জুতার খুটখুট শব্দ তুলিয়া এলা তখন একখানা রিজার্ভকরা ফার্ট্রান্স কম্পার্টমেন্টে উঠিতে বাইতে-ছিল; পিছনে পিছনে স্থলকার প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিষ্টার কর, জ্বর সহিত চলনের পালা দিতে গিয়া রীতিমত হাঁফ ধরাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহার রংটি বাদ আর সবটুকুই সাহেবী, কিন্তু মনটার ভিতর কোন্ খানটার একটুখানি যেন দেশের মাটি লাগিয়া রহিয়াছিল। তবে তরুণী জ্বর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সোখীনদের এতটুকু জটী সোখীন জটীর মাথা ধরাইয়া ফেলে। নিম্নশ্রেণীর মাদ্রাজী খুঁদান আঙ্গাগুলি—চেহারা প্রায়শই তাহাদের তাড়কা রাক্ষসীর মত, এতোকো নিজ নিজ সম্পত্তি এক একটি ছোট ছেলে বা মেয়েকে কোলে বা হাতে ধরিয়া জতপদে চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সেই সমস্ত দলটির সহিত মিস্ মল্লিকের সামনা-সামনি দেখা হইয়া গেল।

“বেবি যে! কোথা থেকে? কি বিক্রী হয়ে গেছে! কিছু যেন চেনবারই উপায় নেই! মা গো মা! আর তেমনি কি পোষাকের শ্রী!”

কৃষ্ণার এই আকস্মিক মিত্রাভাষে মন বড়

একটা আপ্যায়িত হইয়া উঠিল না, বরং নানা রকম অশ্লেষণ-বিশ্লেষণের জালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে মনে করিয়াই মনটা তাহার তেতো হইয়া গেল। মনে হইল, এর চেয়ে বরং মিষ্টার লাহার অনুরোধ রাখিয়া সেখানে স্নানাহার সারিতে এই ট্রেনখানাকে ফেল করিলেই ভাল ছিল। ভয়তর খাতিরে অগত্যা দ্বিভ্রাসা করিতে হইল, “দার্জিলিং যাচ্চো বৃদ্ধি?”

“হ্যাঁ ভাই! ওনার ইচ্ছে ছিল না যে যান। তা দেখ না আমার শরীরের অবস্থাটা! এবার এই ছোট বেবি হয়ে অবধি আর তো সারতে পারি নে; গ্রীষ্মকালে গিয়ে মোটে ছ’টি মাস থেকে ডালির অল্পখের খবরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো না? সারতে আর তেমন পারলুম কই? এবার তো ইচ্ছা আছে, শীতের প্রথমটা অবধি থেকে আসবো, দেখি কি হয়! তুমি এখন আহ কোথায়? ঠিকানা জানি নে যে, এক দিন যাব কিম্বা একটা লোক পাঠাব। সে দিন ‘শীলা’র জন্মদিন গেল, বলতে পারলুম না।”

কৃষ্ণা কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। ঠিকানা আমার ১৪/১.....লেন।”

“ডিম্বার মি! এ সব কি তোমার পাগলামো নয় বেবি? ওই সব জায়গায় তুমি কোন্ ভরনায় রয়েছ শুনি? নোংরা গলি, পচা ড্রেন, হাওয়া চলে না মোটে, গারে গারে বাড়ী, একেবারে এপিডেমিকে ভরা! কেন, তোমার বাবার বাড়ী তো শুনলুম মিঃ লাহা তোমারই নামে কিনে আবার যেমন ছিল, তেমনি ক’রেই সাজিয়ে দিয়েছেন! সেখানে থাকলেই তো হয়? তোমার যেমন বেগাড়া খেয়াল।”

কৃষ্ণা দেখিল, তাহাদের সকল সংবাদই তাহার পুরাতন সমাজ রাখিয়া থাকে, শুধু রাখে না পরের অনুগ্রহজীবী না হইলেও তাহার কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা চলে সেইটুকুই। সে জন্ত সে কাহারও নিন্দা করিল না। সমাজ তাহাদের পুরা মাত্রায় অস্তিত্ব: নব্য-শিক্ষারও শিক্ষিতা হইবার অবকাশ ও অধিকার দিয়াছে, তার পর সে যদি তাগকে পোষণ করিবার ভার না লয়, তাহাতে দোষ দেওয়া চলে না।

এবার কথার জবাবে তাই শুধুই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, “সারা দেশই যখন ঐ নোংরা গলি, পচা ড্রেন ও এপিডেমিকের মধ্যে পড়ে শো হয়ে যাচ্ছে, এর কোন প্রতিবিধান-চেষ্টা



রাজা-প্রজার সমান তাজীলো প'ড়ে যখন অসম্ভব হয়েই রৈলো, তখন একা একা আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য উঠি-পড়ি লেগে থেকে হবে কি? ও হাল ছেড়ে দেওয়াই ভাল।”

এলা মুখ ভার করিয়া বলিল—“তুমি আবার অতিমাত্রায় সোসিয়ালিষ্ট হয়ে পড়েছ! বলসেভিক গবর্নমেন্ট না হ'লে আর অত কেউ করে না তা ব'লে।—যা হোক তোমাদের বিয়েটা হচ্ছে কবে? হ্যাঁ, ভাল কথা, সে দিন আর এক অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হলো।—নাম অজয় শীল, অনেক বছর বিলাতে ছিল। সেখানেই এক মেম বিয়ে করে। ছেলেপিলেও কি ছ'চারটে হয়। তার পর ও-ক্ষেত্রে অনেক সময় যা ঘটে থাকে; অর্থাৎ ‘জুডিসিয়াল সেপারেশন!’ তবে এঁর কিছু গ্রহের জোর আছে বোধ করি; মেমঠাকরুণ মারা গেছেন। ছেলে-মেয়েদের কোথায় বোর্ডিং না কন্ভেন্টে রেখে দিয়ে অজয় বহুকাল পরে এই ক'দিন হলো দেশে ফিরে এসেছে। এঁদের সঙ্গে না কি এক সঙ্গে বিলাত যায়, এক সঙ্গেই পড়তো। সে দিন পথে দেখে ইনি চিন্তে পারেন নি, সে কিন্তু পেরেছিল। ইনি কেমন ক'রে পারবেন? এখানে এসে না কি মাথায় বড় বড় চুল রেখে গেরুয়া প'রে রামকৃষ্ণমিশনে না কোথায় সাধু হয়ে বেড়াচ্ছে। ইনি বলছিলেন, বিলাতে না কি বেশ ভাল প্র্যাক্টিস ছিল, বড্ড মাতাল ছিল ব'লে যদিও তেমন সুবিধা করতে পারে নি, তবু এখানে এক জন বড় ব্যারিষ্টারের চাইতেও কম পেতো না! সে সব ছেড়ে এখন এই টো টো কোম্পানীতে নাম লেখালেন। এখন ঐ ক্যাপান্ উঠেছে যে—”

অজয় শীল! অজয় শীল!—কে সে? নামটা কক্ষার কানে পরিচিত ঠেকিল।

তার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল, এর পূর্বাব্দী কাহিনী তাহার অশ্রুত নয়!—এই অজয় শীল, বিনয়কুমার শীলের বড় ভাই। ব্যগ্র হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—“তিনি কোথায় থাকেন?”

হাস্ত করিয়া মিসেস্ কর কহিয়া উঠিল, “তবেই হয়েছে! পাগ্লার সাঁকো নেড়ে দিলাম না কি? —কি জানি ভাই! তখন তো বেলেড়-মঠে যাচ্ছিল বলে। নির্দিষ্ট স্থান বোধ করি কিছুই নেই। আমার এসেছেই তো মোটে এই ক'দিন। বটুক কেয়ার মাই ফ্রেণ্ড! মিষ্টার লাহাকে বঞ্চিত করে শেষে যেন তোমার এই খদ্দরকে গেরুয়ার পরে বসো না, দেখ!”

দার্জিলিং মেল ছাড়িবার বাঁশী তারস্বরে বাজাইয়া দিল। বাড়িদল সচকিতে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইল। কক্ষা বাড়ির দিকে চলিল।

\* \* \* \*

হরিণবাড়ীর জেলখানার যে গর্তে বিনয় বাস করিতেছিল, বেলা এক প্রহর থাকিতেই তাহার মধ্যে অন্ধকারের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও আঁধারের প্রজা মশককুল তাহাদের বিজয়োৎসবের বাজ বাজাইতেছে। বিনয় নিজের একমাত্র কলখানি মাটিতে বিছাইয়া চিংপাত হইয়া গুইয়া গুইয়া এক পারের হাঁটুর উপর আর একটা পা লম্বা করিয়া তুলিয়া দিয়া নিম্নীলত-নেত্রে গান গাহিতেছিল। হাত দুখানা পরস্পরে বন্ধ এবং তাহা কপালের উপর রক্ষিত। গান সে গাহিতেছিল, কিন্তু সে দিনের মতন আজিকার গানে তাহার প্রাণের রসধারা সঞ্চিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল না। গান, সে আজ যেন শুধু কথার সমষ্টি, যেন সুরের ইজ্জতাল, বুকের সে অমৃত-উৎস নয়। এটা ওটা সেটা লইয়া টানাটানি করিয়া শেষে তিক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়া সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, “না বাপু! গানকে আজ আর বাগাতেই পারা গেল না। থাক্ গে থাক্—” বলিয়া আবার চোক বুজিয়া পড়িয়াই রহিল। কিন্তু সেই অতি চপল, স্বজন-তৎপর তরুণ বকের অন্তর্গত চাকল্যে-ভরা মনের মধ্যটা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সাধকের মত, অথবা বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধ-ভিক্ষুর জ্ঞান আনন্দধনের অথবা সর্বশূন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে তখন নিজের মধ্যেই আপোষে একটা আলাপ তর্ক সুরু করিয়া দিল। তবে কথা কহিতে গেলেই এখন আর কিসের কথা সে কহিবে? মনের ভিতর যে উত্তাপটা জমিয়া রহিয়াছে, বাতাস বহিলে তাহারই তাপটাকে সে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে ছাড়ে না। বিনয়ের মনও কথা কহিতে গিয়া উর্মিলার কথাই কহিতে বসিল; এত দিন বরং নানা ঘটনার সম্মুখে উর্মিলাকে সে অনেকখানি দূরে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার তাহাকে তাহার বড় কাছাকাছি, বুকের মাঝখান চিরিয়া যেন তাহারই অন্তর্ভাগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আর এখন সে উর্মিলা নয়, এ সেই উর্মিলারই শবদেহের অগ্নিময়ী স্মৃতি! তার সে আনন্দ-প্রতিমা, শৈশব-সঙ্গিনী উর্মিলা আজ কোথায়? বিনয়ের বুক আজ এ কথা ভাবিতে ব্যথায় টনটম্

করিয়া উঠিল। উন্মিলা নাই!—উন্মিলা মরিয়াছে!—  
বিনয়ের স্মৃতির কাছে চিরদিনের জন্তই যে তাহার  
মৃত্যু ঘটিয়াছে, এ কথা মধ্য বিনয়ের সমস্তই যেন মস্ত-  
বড় একটা শ্মশানে পরিণত হইয়া দেখা দিল। উন্মিলা  
যে তাহার এতখানিই ছিল, তাহাকে এমন করিয়া  
হারাইয়া না ফেলিলে বুঝি এ খবরটা সে কোন দিনই  
জানিতে পারিত না! বুঝি এই জন্তই ভগবানের  
হওয়ার চাইতে তাঁর শক্তির মূল্য বেশী?  
সত্যই আজ বিনয় দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে,  
উন্মিলার প্রতি তাহার অন্তরে সঞ্চিত ভালবাসার  
অস্ত ছিল না। সে তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিল;  
তবে যে ইদানীং আর একরকম সন্দেহ হইতেছিল,  
সেটা কি শুধুই মনের কল্পনা? কণকাল আকাশ-  
পাতাল ছাইপাশ ভাবিয়া আবার নিজেরই সিদ্ধান্ত  
করিয়া লইল, না তা নয়, কৃষ্ণাকেও আমি  
ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা তার রূপ গুণ বিভা-  
বুদ্ধি ত্যাগ ও চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের প্রতি প্রহ্লাপূর্ণ  
ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা। কিন্তু এ যে আমার চির-  
দিনের গ্লান হার, আমার ভালয় মন্দ মেশান,  
আমার বুকের শোণিত-বিন্দুর সঙ্গে মিশ্রিত আমার  
উন্মিলা! তাকে হারিয়ে যদি আমার চির-জীবন  
আন্দামানেই বাস করে বেঁচে থাকতে হয়, তা হ'লে  
কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো? তার চেয়ে ফাঁসী  
যদি হয়, তো সেই ভাল!

প্রথম-প্রেমের মত বেগবান ও বিগত যে আর  
কিছুই নয়, তাহা সে মর্মে মর্মেই অনুভব করিল।

ঝনঝন করিয়া শিকল খুলিয়া রক্ষীর পিছনে কৃষ্ণা  
আসিয়া প্রবেশ করিল।

“এসো, এসো, বসো।—অত শুধু নো দেখাচ্ছে  
কেন? ভাল আছ?”

“হ্যাঁ,” বলিয়া কৃষ্ণা বিনয়ের আমন্ত্রণানুসারে  
তাহার কক্ষলখানার এক প্রান্তে উপবেশন করিল।—

“আপনিও একটু শুখিয়েছেন! তা অপরাধই  
বা কি?”

বিনয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, “কৃষ্ণা।”

“বলুন?”

“আমার জী না কি আমার ধরিয়ে দিয়েছে?  
এ কি সত্য?”

বিশুদ্ধ নীলকান্ত মণির স্তায় স্বয়ংপ্রভ দুইটি নেত্র  
সুধীরে বিনয়ের মুখে স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণা কহিল,  
“বিশ্বাস হয়?”

বিনয় যত্নমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল,—“কি,  
কৃষ্ণা?”

“আমার কথা?”

“হয় বৈ কি।”

“আপনার জী নির্দোষী! মন্দ লোকে যোর  
চক্রান্ত করে তাকে ভুল বুঝিয়ে তার কাছ থেকে-  
আপনার চিঠি চুরী করে এনে আপনাকে বিপদ  
করেছে। সে এর কিছুই জানে না।”

বিনয়ের বুক যেন সুগভীর আনন্দের আখ্যাসে  
ভরিয়া উঠিল। সে গভীর একটা নিশ্বাস লইয়া  
বলিল, “তৈ তোমার হাত?”

নিজের সবল হস্তের মধ্যে কৃষ্ণার ছোট্ট হাত-  
খানি লইয়া সে তখন ভিজাসা করিল, “আমার  
মিথো সাক্ষ্যনা করুচো না?”

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—“না।”

“তবে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করলুম। কিন্তু কেমন  
করে তুমি জানলে?”

কৃষ্ণা কহিল, “আমি জানি।”

আবার একবার উল্লাসের একটা চলন্ত শ্রোত  
বিনয়ের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া বহিয়া গেল।  
সে পরমমুখে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া কৃষ্ণার হাত ছাড়িয়া  
দিল। তার পর হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা,  
তুমি কি ওদের কাছে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“গিয়েছিলে? মা'র সঙ্গে দেখা হলো?”

“তিনি তখন পূজার ঘরে ছিলেন। দেখা হয় নি।”

“আর উন্মিলা?”

“তাঁকে দেখেছি। তিনি আপনাদের দীঘির  
ধারে একা বসেছিলেন, রাত তখন সাড়ে আটটা।”

“অত রাত্রে একলা সেখানে? তার যে নানা  
রকমের ভয় ছিল, সে কোথা গেল?”

কৃষ্ণার অধরপ্রান্তে ক্ষীণ একটি হাসির রেখা দেখা  
দিল, “মরণকে যার ভেঙ্গে গেছে, তার কি আর  
কোন কিছুতেই ভয় কববার বাকী আছে,  
বিনয়বাবু?”

বিনয় এ কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া  
চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণা বলিল, “আপনার জী সে দিন ডুবে মরবার  
সকল নিয়েই তেমন সময় সেখানে পৌঁছে ছিলেন।”

বিনয় শিহরিয়া চোক বুজিল। “কৃষ্ণা। কৃষ্ণা।  
তুমিই ওকে—আমার উমিকে বাঁচিয়ে এলে।”

প্রহরী তাগিদ জানাইল। কৃষ্ণা-দত্ত দশটা  
টাকায় সে মিনিট কয়েক সময় বেশীও খরচ করে  
এবং দরজার একটু পাশ করিয়া বসিয়াও থাকে,  
আর কি করবে? কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।



“বিনয়বাবু!”

“কি?”

“আপনার স্ত্রী তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে যে অখ্যাতির মধ্যে এসে পড়েছেন, যখন আরও স্পষ্ট করে জানতে পারবেন যে, কতবড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েই তাঁকে এই কলঙ্ক ও ক্ষতি সহ করতে হয়েছে, তখন আশ্চর্যিকভাবেই তাঁকে ক্ষমা করে শুধু স্ত্রী বলে নয়; সহধর্মিণী বলেও এবার নতুন করে গ্রহণ করবেন? বলুন? আপনার কাছে এই আমার প্রথম আর শেষ ভিক্ষা!”

“ও-কথা কেন কৃষ্ণা? তুমি যা বললে, তা আমি স্বীকার করে নিলাম। যদি মরি, তাকে ক্ষমা করেই মরবো, আর যে তাবেই বাঁচি, এখন ক্ষমা তাঁকে মন থেকেই করতে পারবো। তুমি ■■■ তাঁকে নির্দোষী বলেছ কৃষ্ণা! তোমার কোন কথাই তো আমি অবহেলা বা অবিশ্বাস করতে পারবো না! সে আমার স্ত্রী, কিন্তু তুমি আমার কি জানো?” মুহূর্তে হাসিমুখে বলিল,—“ঐবতারা।”

কৃষ্ণা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় গান গাহিতে লাগিল,—

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঐবতারা,  
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাক পথহারা।”

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের মাঝলা আরম্ভ হইয়াছিল। পেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সাক্ষীদের এজাহার হইতে-ছিল। উভয়-পক্ষীয় উকীলে জেরায় জেরায় অনেক পাকা মাথা, কাঁচাইয়া দিতেছিলেন।

আজ প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহেরও তৃতীয় দিন আসিয়া পৌঁছিল। দলে দলে সরকার-পক্ষীয় সাক্ষীগণ নানা দিগ্দেশ হইতে লালবাজার পুলিশ-কোর্টে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। নব নব অধ্যায় রচনা করিয়া দিয়া চব্য-চোষ্য আহ্বারান্তে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর জায় কোতুলোদীপক এক-খানা স্মরহ উপন্যাস রচিত হইতে থাকিয়া ‘নথির’ আকার পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

“পারেশনাথ পাহাড়ের মাড়োয়ারীদের মধ্যে দু’জন বিনয়কে ‘রাজজোহ’ প্রচার করিতে শুনিয়া-ছিল, তা লইয়া তর্ক করিয়াছিল। বিনয় না কি তাদের বলে, বিলাতী বস্ত্র আমদানী না করিয়া

জাপান ও জার্মানী হইতে বন্দুক, পিস্তল আনাহঁতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করা হয়। নিকপত্রব অসহযোগিতায় কিছু হইবে না; অস্ত্র চাই।”

ইহারা না কি বলে, “হুঁচারটে বন্দুকে কি সাম্রাজ্য লাভ হইবে?” তাহাতে বিনয় তাহাদের কটুবাক্য প্রয়োগ করে এবং বলে, “সকলেই যদি হুঁচারিটার জোগাড় করে, তবে তো আর হুঁচারিটা থাকে না, তা ভিন্ন বিনয়ের দল ইতোমধ্যেই কয়েক শত সংগ্রহ করিয়াছে। ইত্যাদি।”

বাঁকিপুরে, আগার, বজ্রারে, বেনারসে অমন একশত লোকের কাছেই বিনয় শীলের রাজজোহ প্রচার, পিস্তল পকেটে লইয়া সন্ধ্যার, রাত্রে নির্জন রাজপথে অপর কয়েক জন সন্দেহে-ধৃত যুবকের গৃহে গমন, তাহাদের পরস্পরের সহিত কোন পড়ো-বাড়ীর চৌকাঠে বসিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য লুটিয়া লওয়ার গুট পরামর্শ আটা এ সবেই বুড়ি বুড়ি সাক্ষী হাজির হইয়া পাতার পর পাতা ভর্তি করিয়া সাক্ষ্য দিয়া গেল। দারোগার দপ্তর আর একবার নতুন সংস্করণে বাহির হইল। বিনয়ের পক্ষের দু’জন ব্যারিষ্টার, তার মধ্যে এক জন বিনয়ের সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত; তাঁর জেরায় কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষীই কাঁচিয়া বাইতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া সাক্ষীর বহর কিছু কমিয়া আসিল। অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার এ দিকে ধমকের পর ধমক দিয়াও এই তীক্ষ্ণ-ধী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যারিষ্টারটিকে দমাইয়া দিতে সমর্থ না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার যোগাড় করিলেন।

তথাপি বিনয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য বৃত্তি ও প্রমাণ রহিয়াছিল, তাহাতে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বৃত্তিতে পারা গেল। অপর কয়টি ছেলের মধ্যে বাঁকিপুরের নীললোহিত সেন, আগার স্বর্ণকান্তি মহলানবীসকে কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। তবে একা একা না কি ষড়যন্ত্র করা যায় না, কাজেই শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ চন্দ, কল্পপ্রসাদ ধর প্রভৃতি কয়েক জনকে কোনমতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইল। মোকদ্দমা দিনে দিনে মন্দর দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবশেষে শেষ শুনানির দিনে উম্মিলাকে লিখিত ■■■ উম্মিলার লেখা পত্রদ্বয় লইয়া সরকার-পক্ষের ব্যারিষ্টার ইহাতে নানারূপ টীকাটিপ্সনী প্রভৃতি লাগাইয়া ইহার অশ্লষণ-বিশ্লেষণ পূর্বক দীর্ঘতর ছন্দে প্রকাণ্ড এক বক্তৃতা করিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, যে বিনয়কুমার শীল, চিরকালের হৃদান্ত ও দোদাঁড়

প্রতাপশালী লোক, তাহার এনার্কীজম্ সর্বজন-বিদিত।—এমন কি, উহার নিজের জীই,—আবার সে জী সেই সুদূর অতীতকালে বিবাহিতা দীর্ঘ দিনের সহচরী—সেই জী নিজেই তাহাকে ‘এনার্কীজম্’ হইতে বিরত হইবার ■■■ অনুনয় বিনয়পূর্বক পত্র দিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনয়কুমার যে বাজালা, বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বড়বক্ত-চেষ্ঠা সম্পূর্ণরূপেই করিতেছিল এবং উহার দ্বারা সম্ভবই একটা ভয়াবহ কোন কিছু—যাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তিপৰ্য্যন্ত টলমল করিয়া উঠে, এমন কিছু ঘটনা উঠিতে পারিত, এই কথাটা বিচক্ষণ সূচত্বর এবং বাগ্মী ব্যারিষ্টার মহাশয় প্রায় পুরাপুরি প্রমাণ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষ হইতে এক জন নূতন সাক্ষীর জবানবন্দী জ্ঞাত কোর্টে প্রার্থনা করিলেন।

সরকার-পক্ষের কৌশলী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া জানাইলেন যে, তাহা আর সম্ভব নহে। এই মোকদ্দমায় ইতোমধ্যেই সরকার-পক্ষের ■■■ তাঁহার অমূল্য সময় যথেষ্টই অপব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর অনর্থক নষ্ট করা যায় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াই গিয়াছে।

বিপক্ষ-ব্যারিষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোর্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হজুর! আমার সাক্ষী পুলিশ-প্রেরিত, বাজে সাক্ষী নয় যে, তাঁহার সাক্ষ্য আমার-বাক্যবহুল ও ক্লাস্তিকর এবং অপর পক্ষের জেরার ভরা হইয়া যাইবে। তিনি এক জন উচ্চশিক্ষিত, মহৎশোভাব ও বঙ্গসমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোক। আমার এই সাক্ষীর জবানবন্দীর জ্ঞাত কোর্টকে মাত্র একটি ঘণ্টার অধিক সময় খরচ করিতে হইবে না। অথচ তাঁহার একাহারে এই কেসের অবস্থা একেবারেই উল্টাইয়া যাইবে। ধর্ম্মাবতার! আমি অনেক বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আমার চিত্ত আজও “ব্রিটিশ জায়-নিষ্ঠার প্রতি সন্ধিগ্ন হইতে পারে নাই। আমি কয়েক বর্ষ সেখানে ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে অনেকানেক উচ্চমনা উদার-চরিত্র ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের সম্মুখীন হইয়াছি। আমার ধারণা তাই আজও অকলুষিত রহিয়াছে এবং আশা আছে যে, দেশভেদেও আমার এই উচ্চ ধারণার কোন দিনই ব্যতিক্রম ঘটতে পারিবে না। আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের নির-পেক্ষ জ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক।”

বিচারক নূতন সাক্ষী আনিতে অনুমতি দান করিলেন।

বিনয় একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম এই ক্লাস্তিকর দীর্ঘ মিথ্যাসাক্ষ্য শুনিতে শুনিতে পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের জায় সে বেন ফুলিতে থাকিত। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকগুলা দিবা নিম্নজ্জভাবে আসিতেছে, যা’ খুসী তাই বলিতেছে, তাহার অচেনা মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে, কটাক্ষপাত না করিয়াও চিনিয়া ফেলিতেছে, কত কিই অভিনবত্ব ঘটতেছে, দেখিয়া শুনিয়া তাহার হাড় অবধি জ্বালা করিতে থাকে। মনে মনে আশ্চর্য হইয়া যে রিভালবারগুলা নষ্ট রাখি-বাও তার আজ এই ছরবছা, তাহারই একটা যদি সত্যই এখন তার হাতে আসিয়া পড়া সম্ভব হইত! তার পর যখন বেশ স্পষ্ট করিয়াই দেখা গেল যে, তাহাকে বড়বক্তকারী, নরহত্যার চেষ্ঠা-কর্তা, প্রভৃতি খুব বড় বড় অপরাধে মণ্ডিত করিয়া একটা জাঁকালো রকম শাস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় পার্শ্ব হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ সম্বন্ধে তাহারও মনের চাঞ্চল্য রোধ হইয়া মনটা বেশ প্রশান্ত হইয়া গেল। মনে মনে সে তখন নিজেই নিজের বিচার ঐ বিচারকের ম্যাজিস্ট্রেটের চোকে দিয়া করিয়া লইয়া একটা স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বাঁচিল। সে মনকে বলিল, ফাঁসী আমার হইবে না, হ’লেই চুকিয়া যাইত, তা আর অদৃষ্ট নাই। যাবজ্জীবনেরই চেষ্ঠা চলিতেছে। তাতেই বা এত ক্ষতি কি? জীবন যে আমার আরও সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে, তাই বা কে আমার বলিল? হয় তো পাঁচ সাত বৎসরে শেষ হইয়াও যাইতে পারে! আর যদি বিশ বৎসরের পরেও উহাদের হাতে টেকিয়া থাকি, না জানি তখন দেশে ফিরিয়া কতই সুখলাভ হইবে! আবার নূতন করিয়া জননী-ধরিজীর অঙ্কে তখন বেন আর একটা জন্মলাভই করিব! যখন তার প্রাণটাকে লইয়া পাশার দান চালাচালি চলিতেছে, তেমন সময় হয় তো সে তাহার ভবিষ্যৎ আন্দামানী-জীবনের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ফেলিল!—সেখানে তাহাকে কি কি খাটুনিতে জুড়িয়া দিবে?—নারি-বেল ছোবড়া ছাড়ান, ঘানি টানা, পাথর ভাঙ্গা... সবই বোধ করি পালাক্রমে করিতে হইবে? ‘প্যাসিভ্ রিজিস্ট্যান্সটা’ সেখানে থাকিতে বোধ করি অভ্যাস হয় ভাল করিয়া, না? চাবুক খাইলে ফিরিয়া মারার পথ তো নাই! কোন ■■■



জেলখানার সেন্টেমেতে মেজের শীত ও মশকের দোয়াওয়া যে নিজা উপভোগ করিবার উপায় কম; এখানের কাঠগড়ার ভিতর হাঁটুতে মাথা গুঁজিয়া তাহারই বরং কতকটা শোধ মিটাইয়া লয়। মধ্যে মধ্যে ঘুমন্ত তাহার নাক ডাকিয়া উঠে। কেহ বিস্মিত, কেহ বিরক্ত হয়। এইরূপেই বন্দিদশার দীর্ঘ ও ক্লান্তি-দিনগুলো সেই চঞ্চল ও উত্তম পূর্ণ তরুণ-বয়সী ছেলেটি কোন মতে বাপন করিতেছিল। এক এক দিন তাহার সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত, কদাচিৎ অর্ধ-পরিচিত, অপর তিনটি ছেলের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে বসে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাড়ার চোটে সেটা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পায় না। নিজের সম্বন্ধে তাহার আর কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না, বরং একটু একটু কৌতুক বোধ হইতেছিল। এই যে বিনয়-কুমার শীল, ডাক্তারীর এম্ বি পরীক্ষাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলিকাতার অলি-গলিতে বিনা ভিজিটে ডাক্তারী করিয়া থক্কর বেচিয়া বড় জোর এই সম্বন্ধেই এক আখটা উপদেশ দিয়া বেড়ায়, এই পর্য্যন্তই তো তাহার দৌড়। এক দিন যদি এ দেশ স্বরাজ লাভ করে, যদি স্বরাজ-লাভের ইতিহাস লিখিত হয়, তার মধ্যে এই অসীম সাহসী, অকুতোভয়, অনন্ত-সাধারণ অধ্যবসায়-শীল, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-উচ্ছেদ-চেষ্টাকারী বিনয় শীলের অমর নাম কি অক্ষর অগ্নির অক্ষরে লিখিত হইবে না? তাহার তারি হাসি পাইল। কিন্তু কাঠগড়ার বসিয়া তত হাসি হাসিতে গেলে না কি এখনই কারার ব্যবস্থা ঘটয়া যাইবে, তাই সেটাকে হজম করিয়া লইয়া মুহু মুহু হাসিতে হাসিতে সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ধ্যান-ভাঙ্গা হইয়া বুঝিল, আদালত-গৃহে কিসের একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

বিনয়ের পক্ষের এই নূতন সাক্ষী প্রবেশ করিতেই শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষেরই উপর দিয়া বাস্তবিক একটা যেন ঘোরতর পরিবর্তনের হাওয়া বহিয়া গেল। এমন কি, উভয় পক্ষীয়ের বহির্গত বিচারক শুধু যেন মনঃসম্মোহিতের ভ্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে সম্মান জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আসামীর ব্যারিষ্টার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। সাক্ষীকে চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ না করিয়াই সরাসর সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বিনয়ের বিস্মিত, সন্দেহ কল্পিত দৃষ্টি সাম্নাসাম্নি তাহার মুখের উপর ব্যগ্র-ক্ষুধার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই স্তম্ভিত ভর্তুকি হইয়া উঠিল। তাহার

প্রথম হৃৎকম্পের মধ্য দিয়া ক্রুদ্ধপ্রায় অর্ধফুট কণ্ঠ প্রায় অশ্রাব্য আর্ন্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, “কৃষ্ণা!”

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল; তাহার সমস্ত স্নায়ুশুল তাহারই তড়িৎ-স্পর্শে যেন আচ্ছন্নবৎ হইয়া গেল। এই অসমরোপযোগী ভাবে অকস্মাৎ ও একান্তই অপ্রত্যাশিতরূপে উহার দেখা পাইয়া, বিশেষতঃ ঐ স্থানে উহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই তাহার স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি যেন একটা অঘটন, কি যেন একটা অমঙ্গল যেন কোন্ মুহূর্ত্তেই ঘটয়া যাইবে, যেন ইতোমধ্যে ঘটিতেই আরম্ভ করিয়াছে, এমনি হৃৎসহ-ভরে সে কৃষ্ণাকে সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিবার অমুরোধ করিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে নিজের ব্যাকুল অজ্ঞান-ভরা ছুটি চোখের তারা তুলিয়া ধরিতেই সে চেষ্টা অসাধ্য বুঝিয়াই আপনা হইতে তাহার উন্নত দৃষ্টি নমিত হইয়া আসিল। কৃষ্ণাই সে বটে, তবু সে যেন সেই তাহার পরিচিতা কৃষ্ণা মল্লিক নয়। তাহার মুখে এমন অনৈসর্গিক কিছু আছে, যার কাছে এ পৃথিবীর ভাব বা ভাব লইয়া কোনমতেই পৌছাইতে ভরসা করা যায় না। সে যেন একটা ছায়ামূর্ত্তি, যেন কোন্ স্বপ্নলোকের বাহু; তাহারই সবাই দেখিতেছে, সে কিন্তু যেন কোন কিছুকেই দেখিতেছে না।

যথারীতি শপথ লইয়া এই নূতন সাক্ষীর জবাব বন্দী আরম্ভ হইল। কৃষ্ণা বলিল, “বিগত ডিসেম্বর মাসে কোন রাজপরিজনের অভিযুক্ত উপলক্ষে কলিকাতায় যে উৎসব হয়, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে? সে দিন... রোডের একটা বড় বাড়ীতে আমরা তাঁর শোভা-যাত্রা দেখবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়াছিলাম।—” এই বলিয়া সে বিনয়কুমারের সে দিনকার বক্তৃতা মুখে মুখেই সবটা বলিয়া গেল, এবং ইহা পরদিনের যে যে সংবাদ-বাহির হইয়াছিল, তাহা তাহাদের ব্যারিষ্টার দাখিল করিয়া দিলেন।—সে বলিতে লাগিল, “আমার সঙ্গে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার তরুণচন্দ্র

লাহার বিবাহের সম্ভাবনা সকলেই জানিতেন; কিন্তু মিঃ লাহার এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহে বিলম্বে ঘটতে থাকায় ইহা কিছু বিজ্ঞপাত্মক হইয়া উঠে। বিনয়বাবু কারু কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন এবং সস্ত্র সস্ত্র মোটর চাপা দিয়ে পালিয়ে আমার ব্যাপারটায় চটে উঠে আমার ও মিঃ লাহার নাম একত্র মিলিত ক'রে ঐ প্রকার প্রেষোক্তি করেছিলেন। আর বাস্তবিকই সে সময় মিঃ লাহা আমায় একগাছা বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন এবং দরবারে যাবার ■■■ তাঁর কাছে আমার বাবা কয়েক হাজার টাকা ধারও নেন। আমাদের দুজনকার মনেই সেই মুহূর্তে এই কুৎসাকারী নিম্নকের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলো।”

এই বলিয়া কৃষ্ণা ইহার পরের ঘটনা যথাযথই বিবৃত করিতে লাগিল। তার পর বলিল, “ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে গুঁকে ‘কুকুর’ দিয়ে খাওয়াতেও চেষ্টা করেছিলেন। পরিশেষে আমাদের দু'জনের মধ্যে স্থির হয় যে, এখন উঁহাকে গ্রেপ্তার করাইলে সংবাদপত্রে আমার নামে অধিকতর কুৎসা রটিবে, দণ্ডও উঁহার বেশী হইবে না,—তার চেয়ে সময়ের প্রতীক্ষা করাই ভাল। মিঃ লাহা আমায় বলেন, “জাল পাতা থাকিলে এক দিন না এক দিন তা'তে এসে পড়তেই হবে।”

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করিলেন, “এই বিনয়কুমারের সঙ্গে আপনার কি বিশেষরূপ সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই? ইহারই প্ররোচনায় আপনি খদ্দর ব্যবহার ও আপনার পূর্ব-সমাজের সমস্ত পরিচিত বন্ধুদের কি পরিত্যাগ করেন নাই?”

উত্তর হইল, “করিয়াছি, এবং ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দও জন্মিয়াছিল। এই পত্রখানি পড়িলেই আপনারা এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার রূপে সকল কথাই বুঝিতে পরিবেন যে, কি জন্ত এই আসামীর স্ত্রীর মনে তাহার স্বামী সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার স্বামীর লিখিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থযুক্ত পত্রের পূরা রাজনৈতিক অপরাধযুক্ত অর্থ প্রয়োগ করিয়া উত্তর তাহার ভগ্নিপতি তরুণচন্দ্র লাহা দ্বারা উপস্থিত হইয়া লিখিত হইয়াছিল। আসামীর স্ত্রীর ও মাতার সাক্ষ্য লওয়া হইলে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণিত হইতে পারিবে। আপাততঃ আমার প্রদত্ত মিষ্টার তরুণচন্দ্র লাহার এই বহুস্তলিখিত পত্র পাঠ করিয়াই এই ব্যক্তির নির্দোষিতা

সম্বন্ধে যে আপনারা নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই।”

আদালত-গৃহের বিপুল জনতা একেবারে খাম কক করিয়া এই রূপসী তরুণীর অদ্ভুত জ্বানবন্দী শুনিতেছিল। ঘর এমনি নিস্তর যে, একটি সূচিকাপাত হইলেও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই মুখে ব্যগ্রকৌতুহল, এবং অধিকাংশের মনেই মিথ্যা অভিযোগে প্রাণ-সঙ্কট বিপন্ন বিনয়কুমারের প্রতি গভীর সহানুভূতি। কিন্তু যে ঐ অবিচলিত সাহসে, অকুতোভয়ে নিজের গুচ রহস্তের গুপ্তধার উদ্ঘাটিত করিয়া সহস্র নেত্রের মাঝখানে অকম্পিত জিহ্বায় প্রচার করিতে দৃঢ়পদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এত লোকের মধ্যে একজনমাত্র কেহই তাহার সেই উচ্ছ্বল অপরাধের অভিযোগে তাহাকে দিকার পর্য্যন্ত দিতে পারিল না, বরং অনেকের মনেই বেদনা পুঞ্জীভূত হইল।

আসামী-পক্ষীয় ব্যারিষ্টার কৃষ্ণার প্রদত্ত মিঃ লাহার লিখিত পত্র পাঠ করিলেন। সমস্ত পত্রখানাই আত্মোপাস্ত পঠিত হইয়া অবশেষে ইহার শেষাংশে বর্তমান মোকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসিলেন।

“—এখন একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন হইতে বাকী আছে। যে অসংলোক তোমার ও আমার নামে অযথা ও অকথ্য গ্লানি সহস্র লোকের মধ্যে প্রচার করিয়া তোমার ■ আমার অবমানিত অপদস্থ করিয়াছিল, যার ■ আমার পবিত্র-স্বভাবা, চির-সুখ-লালিতা আনন্দময়ী কিষেণ আত্র জনসাধারণের হস্ত-কৌতুকের পাত্রী, সেই অহেতুক-বৈর-সাধনকারীর সমুচিত শাস্তিবিধান বাকী আছে। মনে পড়ে বেবি! তুমি সে দিন নিতান্ত মর্ম্মাহতচিত্তে ঐ পাষণ্ডকে ‘কুকুর’ দিয়া খাওয়াইবার’ ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই। তার পর দেশ-সেবার ছদ্মবেশে তার কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাদের গুপ্ত-চক্রের কতদূর সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, সে সব এখনও যে আমার শোনা হয় নাই। এমন অবসর পাই না যে, একটি দিন তোমার কাছে কাটাওয়া আসি। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিনয় শীলের সঙ্কটকাল আর খুব বেশী দূরে নাই। শীঘ্রই সে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবে, এই সময় যদি দেশ ছাড়িয়া সে নিকরদেশ হইয়া যাইতে পারে, যদি কেহ তাহাকে



ইহার জন্তই প্রস্তুত করে, তবেই তাহার রক্ষা! নতুবা স্থির জেনো বেবি! তাহাকে চির-নির্কাসন দণ্ড হইতে বেহই রক্ষা করিতে পারিবে না! তার পর—বিনয় শীলের নির্কাসনের দিনই আমাদের বিবাহোৎসবটা সম্পন্ন করা যাইবে। কেমন, তাহা হইলে তোমার প্রতিশোধ-স্বহাটা সম্পূর্ণরূপেই মিটে না কি?”

শ্রোতার দল নীরব নিম্পন্দ। সকলেই যেন রম্যগন্ধে কোন ভীষণ বিষোগাত্ত অভিনয় দর্শন করিতেছে, এমনি তন্ময়! আর আসামী? সে তখন একেবারেই বজ্র-স্তম্ভিত। শরীরে তাহার সংজ্ঞা ছিল কি না সন্দেহ। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত শরীরের স্নায়ুপেশী-গুলি শিথিল হইয়া পড়িয়া এ পৃথিবীর আলো, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অন্তর্বাহ যত কিছুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপারকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিয়া দিয়াছিল। সে যে কি শুনিল, কি বুঝিল, কিছু বুঝিল কি না, ঠিকমত অনুভব করিতেও পারিল না। শুধু একটিমাত্র বজ্রধ্বনি কর্ণের একদ্বী-অস্ত্রের মতই তাহার বিখণ্ড সরল চিত্তে জ্বলেই বিদ্যুৎ হইয়াছিল যে, উন্মিলি নয়—এই কক্ষাই তাহার ধ্বংসের জন্ত হীন চক্রান্তের স্বজনকারিণী! তাহার প্রেমাস্পদ ও বন্ধু মিঃ লাহার সে সহকারিণীমাত্র! তবে এত দিনকার সে সমস্ত ত্যাগের খেলা, মহত্বের মহিমাষিত অভিনয়, মহোচ্চ আদর্শের সুগভীর অনুরাগ সে সকলই তাহার এই গূঢ় ও হেয় কার্যসাধনেরই ভাগ মাত্র? তবে এই বিনয়ের প্রতিও সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সহকারিত্ব এবং সেই একটা আরও কিছু,—যাহাকে এ জগতের অনেক উর্দ্ধে দিব্য-লোকেই সে আসন পাতিয়া বসাইয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অতিশয় গুচী-গুচ্ছ চিত্তেই সন্তুর্পণে প্রদান করিয়া থাকে, সেও একটা মিথ্যা অভিনয়?

বিনয়ের মাথার মধ্যে দারুণ অবসন্নতা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। এই মানুষ? এত হীনতা এবং এত দীনতা এই মানুষেরই মধ্যে ছদ্মবেশ ধরিয়া লুকানো থাকিতে পারে? এত বিশ্বাসের এই পরিণাম! সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই যেন তাহার চোখে একটা স্বপ্নে বদলাইয়া গেল। রাজা এবং রাজ-পুরুষেরা তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য-প্রীতির মোহে কূট-নীতির আশ্রয়ে অনেক কিছুই করিয়া থাকেন; প্রজাও তার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে এই রাজনীতিবেই অনুসরণ করিতে শিখিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট বন্ধ করিতে হুকুম দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণা যখন সাক্ষ্য-মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল;—বিশৃঙ্খল জনতা নিজেদের মধ্যে সরিয়া সরিয়া তাহাকে পথ করিয়া দিল। উপহাস, ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ অথবা শ্রদ্ধা যনের মধ্যে যার যাহাই থাক, প্রকাশ্যভাবে কোন এক জনও তাহা প্রচার করিতে সমর্থ হইল না। আর সব কিছুকেই আড়াল করিয়া তাহার সাহসে মণ্ডিত ত্যাগ—সে যে কত বড় ত্যাগ—সেইটাই সেই সমবেত ইতর ভদ্র শিক্ষিত নিরক্ষর সবারাই মুগ্ধ মনে জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া উঠিল। এই যে নারী কোথা হইতে অকস্মাৎ ধসিয়া পড়া উদ্ধার মত আসন্ন বিপৎপাতের মধ্যে অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া দিয়া, আবার ঠিক তেমনি নির্ভীক ও নির্করভাবে কোন দিকে দৃকপাত পর্য্যন্ত না করিয়াই সোজা চলিয়া গেল, অগ্নি-গুচ্ছ নিখাদ স্বর্ণের মত। তাহার গৌরব-দৃশ্য মূর্তি স্বতঃই জনতার মস্তক নত করিয়া রাখিল, শ্রদ্ধা ও করুণায় নেত্র সজল করিয়া তুলিল।

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সরকার বিনয়ের উপর হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া লইলেন। বিনয়ের ব্যারিষ্টার প্রথমতঃ ইহাতে একটুখানি আপত্তি করিলেও ‘কুমীরের সঙ্গে বাদ সাধিয়া জলে বাস করা নিরাপদ নহে’ এই চলিত বাক্যের হিসাবে জগতাই চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধিগ্ধাবস্থার মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ড বহন করাও ভাল, মর্যাদারও ইহাতে লাঘব ঘটিতেছে বলিয়া বিনয়েরও একপ মুক্তি বিশেষ কচিকর হইল না।

সে যখন আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, বাহিরের জগৎ ঠিক সেই একই রকম চিরপরিচিত মূর্তিতেই তাহাকে স্বাগত জানাইতেছে! কিন্তু এই স্বর করটি মাসের মধ্যেই ভিতরটা তাহার কি ভীষণভাবেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল! যে বিনয় হরিণ-বাড়ীর জেলের মধ্যে তিন মাস পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বিনয়—সেই জীবনী-শ্রোতে পরিপূর্ণ চঞ্চল আনন্দময় কিশোর বিনয় আজ আর সেখান হইতে বাহির

হইয়া আসিতে পারিল না—আজ যে আসিল, সে চিন্তাশীল, সংসারভিজ্ঞ, জীবন-স্রোতোহত গভীরপ্রকৃতির পরিণতবুদ্ধি যুবক বিনয়কুমার।

বাহিরে সামনেই সেই অপরিচিত ‘সিনিয়র’ ব্যারিষ্টারটি কতকটা উৎসুক হইয়াই কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিনয় সম্মুখীন হইয়া দুই হাত লগাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে উত্তত হইতেই তিনি তাহার সেই দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্ত-মুখে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সম্মুখে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—“বল তো বিহু! আমি কে?”

বিনয় নির্ঝক্ বিন্মরে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিয়া তাহার কপালে-পড়া কৃষ্ণ ■ দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ সম্মুখে সরাইয়া দিয়া ‘স্নেহ-গভীর-কণ্ঠে’ তাহার বিন্মর-নির্ঝক্ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, “আমার নাম অজয়-কুমার শীল, আমি—”

“দাদা এসেছেন! তাই আপনার জন্তেই আমি মুক্তি পেলুম!”—বলিয়া বিনয় অকৃত্রিম ও অপরিণীম আনন্দে মগ্ন হইয়া তাহার সাহেব-দাদাকে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিল।—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে কৃষ্ণ শেখ গৌরবটুকুও তাহার সমস্ত পূর্বস্মৃতির চিত্তাভ্রমের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার দাদাই তাহা হইলে এই রহস্যের উদ্ঘাটনকর্তা; এবং খুব সম্ভব যে তিনিই উহাকে কোনরূপে বাধ্য করিয়া ঐ স্বীকারোক্তিটা বরাইয়া লইয়াছেন।

মনকে অস্ত্র দিকে ফিরাইয়া লইয়া সে তাড়া-তাড়ি প্রশ্ন করিল—“মা’র কাছে গিয়েছিলেন?”

অজয় কহিলেন, “এত দিন পরে এসে মা’র কারা মইতে পার্বে না ব’লে ভয়সা ক’রে যেতে পারি নি; আজ তোকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে যাব।”

“তবে চেনুন।”—বলিয়া বিনয় অনেকখানি ক্ষুতিবুদ্ধি হইয়াই দাদার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

রাস্তার পূর্বের মতই জনারণা; কৰ্ম-কোলা-হল,—সহস্র লোকের সহস্র প্রকারের উদ্দীপনা, ঐশ্বর্য্য-মদগর্ভের পদতলে দারিদ্র্যের মাৎসর্য্য ভাব যথাযথ একইরূপে প্রবাহিত।

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী, তার সমস্ত জানালা-জুলা বদ্ধ করা, কেবল একখানা খিলখিলি মাত্র একটুখানি ফাঁক, গেটের বাহিরে ফুটপাথের ধারে

দাঁড়াইয়া ছিল। তার কোচবাক্সে বিশ্রামশীল কোচ-ম্যানের পার্শ্বে যে দরওয়ানজাতীয় লোকটি বসিয়া ছিল, তাহার প্রতি নজর পড়িতেই অজয় বিনয়ের কালের কাছে ঈষৎ কুণ্ঠিত ও মৃদুস্বরে কহিল, “এই গাড়ীতে মিস্ মল্লিক রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক’রে যাবে না, বিনয়? তাঁর জন্তই তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে।”

যে দিকে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া ছিল, তার উল্টা দিকের ফুটপাথে বাহির হইয়া পড়িয়া বিনয় শুধু জবাব দিল, “দরকার নেই।”

\* \* ■ বাড়ীতে বোড়া সত্যনারায়ণের পূজা খুব ঘটী করিয়া হইতেছিল। ধামা ধামা ফেনি-বাতাসা ও সন্দেশ, চাকারি-ভক্তি পান-সুপারিও হলুদ। পূজার উপকরণ প্রকাণ্ড রূপার থালে ধরে ধরে সজ্জিত। ধূপ-ধূনা-গুগ্গুলের গন্ধে রাস্তা ও প্রতিবেশীদের গৃহ পর্য্যন্ত আঘোষিত হইয়া উঠিয়াছে। পাড়া ঝাঁটাইয়া সমস্ত হিন্দু-মুসলমান (এই ব্রতের নিয়মামুসারেই) আজিকার এই শুভদিনের মঙ্গলোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া শীলেদের বাড়ীর ■ বড় অঙ্গনে আসিয়া চান্দোরার নীচে বসিয়াছিল। সকলের জন্তই সন্দেশ বাতাসার হাঁড়ি ও বড় বড় গামলাভর্তি কাঁচা সিরি, নানাবিধ ফল-ফুলারির প্রসাদ বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়া আছে। ঠাকুর মহাশয় তখন পূজা সমাধা করিয়া পুঁথি হাতে ব্রত-কথা শুনাইতেছেন,—

“ফিরে এল পতিধন দুঃখ গেল দূর,  
অতুল আনন্দ হৈল বিস্তর প্রচুর।—”

বধু ও জননীৰ ভক্তি-মুদিত চারি চক্ষু হইতে সুগভীর ও অসহনীয় আনন্দের অশ্রুজল এই পরম-কারুণিক দেবতার পায়ের অর্ধরূপে বরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের ভাষাহীন কৃতজ্ঞতার অকুরন্ত মৌনবাণী তাহাদেরই আনন্দ-সিক্ত মন্বন করা বুকের মধ্য হইতে নীরবে উঠিয়া যেন তাহার সকল পূজার উপর দিয়া সুললিত ও সুরচিত স্তোত্র পাঠের জায় অজস্র স্ততির বাণীতে মুখর হইয়া উঠিল। ■ আশা হতাশার সীমানাতেই আটকাইয়া পড়িয়া-ছিল, আজ শুধু এই সর্ব্বক্ষম-শক্তির সহায়তাবলে তাহা বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে। ও গো দয়াময়! ও গো দয়াময়! এত দয়া তোমার?—তবু আমরা তোমার করুণায় সংশয় বোধ করিয়া ছঃখ পাই!



বাহিরের দিক হইতে একসঙ্গে যুগল শব্দধ্বনির মত, অনাবৃষ্টির আকাশে অপ্রত্যাশিত মেঘ-গর্জনের মত, প্রবাস-প্রবাসী এবং কারাগৃহ-বাসী যুগল সম্মানের চিবপরিচিত এবং বহুদিন অশ্রুত যুগল-কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল, “মা!”

সে রাত্রে বন্ধু, পরিচিত ও আত্মীয়গণের স্নেহ-সাদরসম্ভাষণাদি হইতে অগ্রসর পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে আসায় বিনয়ের অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। প্রায় মধ্যরাত্রে সে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘরের সমস্ত সাজসজ্জাই যথাপূর্ব সজ্জিত ও সযত্নসংরক্ষিত রহিয়াছে। টেবিলের উপর সেই তাহার ছেলেবেলার সাজান আগ্রায় সাদা পাথরের কাগজ-চাপা, মোরাদাবাদী দোয়াত-দান,—কাশীর পিতলের ফুলদানী সকলই সেই এক ভাবেই রহিয়াছে। অধিকন্তু সেগুলি সব ঝাড়ামোছা ও স্নানার্জিত এবং ফুলদানীতে একটি গুচ্ছ রজনীগন্ধা ঘরখানিতে অত্যন্ত সুস্থ একটি সুরভি দান করিতেছিল।

বিনয় আসিয়া সে দিনকার সেই চেয়ারখানাতেই বসিয়া পড়িল। টেবিলে তেলের সেজ জলিতেছে, দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া। তাহার আর এক রাত্রে কথ্য মনে পড়িল। সেই নিশীথ অভিমান—তাহার নিফল অভিমানে আজ যেন বিনয়ের চোখের সামনে চোখের জলে ভিজিয়া, নিবিড় লজ্জায়—রাগিয়া, নিজের সুপ্ত যৌবনের ব্যর্থ দিবসকে দিক্কার দিয়া উঠিল। উন্মিলাকে যদি সে সে দিন নিজের কাছে টানিয়া লইত, তবে হয় তো আর তার জীবনটা অত বড় বিড়ম্বনা-পাকে ওড়াইয়া পড়িত না, এবং সে জাল খুলিবার চেষ্টায়—যাক, গতানুশোচনা সম্পূর্ণই নিরর্থক।

প্রতীক্ষা যখন অসহিষ্ণুতার পরিণত হইয়া আসিল, তখন উঠিয়া আসিয়া বাহিরে পা দিতেই ঢাকা দালানের এক পাশ হইতে যেন একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাহত চাপা কান্নার গুমরাগি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিত ও বিস্মিত হইয়া শব্দানুসরণে অগ্রসর হইতেই অক্ষুট নক্ষত্রালোকে একটা অর্ধ-মলিন-বজ্রাবৃত মনুষ্যাকৃতি সে দেখিতে পাইল। মানুষটা তাহার সান্নিধ্য জানিতে পারিয়া কান্না চাপিতে চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য হইতে পারে নাই, তাহা তাহার ফুলিয়া ও কোঁপাইয়া ওঠা হইতেই সে স্পষ্ট টের পাইল। এই নির্জন নিশীথে একাকিনী বিবশা রোদনপরায়ণা ভুলুটিত নারীকে এক লহমার মধ্যে চিনিয়া লইয়াই তাহার

পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, “উন্মিলা!”—এবং জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল।

“উন্মিলা!—উন্মিলা!—আমি যে এতক্ষণ তোমাকেই খুঁজছিলুম। তুমি আমার কাছে গেলে না কেন?”

উন্মিলা আবার অব্যক্ত কণ্ঠে কাদিয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ছাড়াইয়া তাহার পায়ে উপর উপড় হইয়া পড়িল, কান্নাধরা ভগ্নকণ্ঠে কোনমতে কহিল, “তবে কি আমার তুমি এবারও ক্ষমা করবে? তবে কি আমার তুমি এখনও দূর করে তাড়িয়ে দেবে না?”

বিনয়ের চোক দিয়াও জল পড়িল, সে-ও প্রায় রুদ্ধস্বরে উত্তর করিল, “তুমি তো দোষী নও উন্মিলা।”

উন্মিলা আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত করিয়াই ষড়মুদ্রিয়া উঠিয়া বসিল, “তুমি তা হ’লে জানতে পেরেছ? আমি যে ইচ্ছা ক’রে কিছুই করি নি,—বড্ড বোকা, আর বড্ড মুখ্য ব’লে না বুঝে না জেনে নিজের সর্বনাশ নিজেই যে ক’রে ফেলেছিলুম, সেই দেবকন্ঠাটি কি সে কথা তোমার সব বুঝিয়ে দিয়েছেন? তা হ’লে আমার ঠেলে ফেলো না, আমার তোমার ইচ্ছামত ক’রে গড়ে নাও,—আমি এই দেখ, তোমার মতন মোটা কাপড় পরেছি, চরকা কিনেছি, পড়তে শিখছি। আমাকে কি তুমি তোমার মতন ক’রে নেবে? তুমি যা করতে বলবে, আমি সমস্ত শুনবো।”

“আমিও সেই আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বন্ধু, প্রেমসী, সজিনী ও সহধর্মিণী একাধারে সবটুকুই আমি যেন এবার হ’তে তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ক’রে নিতে পারি। নিজের জীকেই যদি না গ’ড়ে নিতে পারবো, তবে পরকে গঠিত করতে যাবো কোন্ মুখ নিয়ে?”

এই বলিয়া নূতন পাওয়া চির-পুরাতন জীবন-পথের সজিনীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বিনয় তাহার আনন্দাশ্রুসিক্ত গণ্ড ও গুণ্ড অঙ্গের আদরের চুম্বনে প্রাবিত করিয়া দিল।

■ \* ■

সকাল হবো হবো হইয়াছে, তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই—এমন সময় বিনয় আসিয়া একান্ত ধৈর্য্যহারা অসহিষ্ণুভাবে ঘুমন্ত অজয়ের পা ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ডাকিয়া উঠিল, “দাদা! ও দাদা!”

সত্ত নিদ্ৰাভঙ্গের স্বলিত-জড়িত-কণ্ঠে “উ?” কহিয়া উত্তর দিয়া অজয় পাশ ফিরিয়া আর একবার নিদ্ৰা দিবার উপক্রম করিলেন।

“দাদা! মিস্ মল্লিককে আপনি কেমন ক’রে খুঁজে পেলেন, আর ঐ চিঠির বিষয়ই বা জানলেন কেমন ক’রে বলুন তো?”

অজয় ততক্ষণে ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া আলস্ত ভাবিতেছিলেন; ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিলেন, “মিস্ মল্লিককে আমি খুঁজে পেলুম, না তিনিই আমার আবিষ্কার ক’রে খুঁজে বার করলেন? কেমন ক’রে তা তিনিই জানেন। আমি তো এসে সরাসরি রামকৃষ্ণ-মিশনে ঢুকে পড়বার মতলবে বেলুড় গিয়ে জুটেছিলুম, তোমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল বলে।”

“তিনি নিজ হ’তেই কি তা হ’লে ঐ চিঠির কথা আপনাকে বলেছিলেন?”

“না, চিঠির কথা আমার তিনি মোটেই বলেন নি, সবশুদ্ধ এই কথাই বলেন যে, বিনয়বাবুকে যেমন ক’রে হর বাঁচাতেই হবে, তার জন্ত আমার যা ক’রতে হবে, আমি সবস্তুই করতে প্রস্তুত আছি। আপনারা চেষ্টা করুন, নেহাৎ যদি না পারেন, আমার তখন সাক্ষী মানবেন, শেষ উপায় আমার উহাতে আছে। আমি সে উপায়টা কি, জানতে চাইলে বলেন যে, এখন সেটা বলবো না; কারণ, নিতান্ত নিকপায়ে এক জন নির্দোষীকে রক্ষা করার জন্ত যা ক’রতে প্রস্তুত হচ্ছি, অপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়, যেহেতু যতই অত্যাচারী হ’ন, এতে থাকে অপ্রদাহ ক’রতে হবে, এক সময় অনেক উপকারও তিনি আমাদের করেছেন। কিন্তু বিনয়—কাল তাঁর সম্বন্ধে তুমি একটু অবিচার ক’রে এল—ভাই! আমি শুনেছি, তোমার পক্ষাবলম্বন করার জন্ত মিঃ লাহার কোপে প’ড়ে তিনি হত-সর্বস্ব, পিতৃহীন এবং অশেষ রকমে সীড়িত হয়েছেন, তবু তাঁকে বিয়ে ক’রতে কিছুতেই সম্মত হন নি, এবং নিজেও তাঁর সম্মান পর্যাণ্ত বিসর্জন দিয়েও এইতো তোমার প্রাণরক্ষাও করলেন, দেখলে!”

বিনয়ের বক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল, সে বিষয় পাংশুমুখে স্নানভাবে বলিতে গেল, “কিন্তু সেই চিঠিখানায়—”

অজয় স্থির-দৃষ্টি ভাইএর মুখে মেলিয়া ধরিয়া মুহূ-হাস্তে বাধা দিলেন, চৌদ বৎসর ব্যারিষ্টারী করছি বিনয়! ও চিঠিখানা যে মিঃ লাহার ‘চাল’, সে তুমি

বাধে নি। কিন্তু ভাগ্যে ও-রকম ক’রে মিস্ মল্লিককে ভয় দেখাবার জন্তও সে ঐ চিঠি লিখেছিল; না হ’লে তোমায় আজ ফিরিয়ে আনে কার সাধ্য!”

\* \* \* \* \*

.....লেনের একখানি অপরিচরিত ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর সদর দরজার দিকে চাহিতেই বিনয়ের বুকেটা ধড়াস করিয়া উঠিল। দরজার তালাবন্ধ!

পাশের বাড়ীর দোকানে একটি-যুবা যুগ্ম যুগ্ম যন্ত্র-সাহায্যে পুরাতন ঘড়ী মেরামত করিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঐ বাড়ীতে কে থাকেন বলতে পারেন?”

ছেলেটি মুখ না তুলিয়াই ইহার উত্তরে বলিল, “থাকতেন বটে—আপাতত কেউ তো থাকেন না!”

একটা অজানা আশঙ্কার ঢেউ বিনয়ের অন্তঃস্থ-চিন্তে সহসা উদ্ভাস হইয়া দেখা দিল, তথাপি সে নিজের ভ্রম হওয়ার শেষ আশায় ঈষৎ আশ্বস্ত হইতে চাহিয়া পুনশ্চ এই প্রশ্ন করিল, “মিস্ মল্লিক কি ঐ বাড়ীতেই থাকতেন?”

ছেলেটি এবার নিজের কার্য-নিযুক্ত দৃষ্টি উঠাইয়া প্রশ্নকারীকে পর্যবেক্ষণ করিয়া লইল, এবং তার পর বিশদার্থপূর্ণ ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিল, “হ্যাঁ, মিস্ মল্লিক ঐ বাড়ীতেই থাকতেন বটে;—ও বাড়ী আমার কাকার, তবে আজ ভোরেই তিনি বাড়ী-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। হাওড়া ষ্টেশনের পথে যেতে দেখেছি, তবে কোথায় যে যাবেন, তা কারকেই তিনি বলে যান নি, তাই আমরা কেউই তা জানিনে।”

বিনয় হাতড়াইয়া একটা জানালার গরাদ চাপিয়া ধরিয়া চোক বুজিল। তার পর বহুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্ফুট স্বরে বেন আত্মগতই উচ্চারণ করিল, “চলে গেছেন! একাই গেছেন হয় তো!”

ছেলেটি তাহার এই মুহূমান ভাব দৃষ্টেও বিশেষ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, সে একটুখানি মুচ্কি হাসি হাসিয়া—অজিজ্ঞাসিত স্বগতোক্তির, গায়েপড়া হইয়াই এই উত্তর দিল, “একানয়, সঙ্গে গেছে তার সেই পুরণো দরোয়ানটা।—তা শুধু তিনি আপনাকেই ফাঁকি দেন নি। আপনার আগে আর এক জন বাঙ্গালী-সাহেব একখানা টু-সীটারে ক’রে এসে



এমনি ক'রেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তবে তিনি আপনার মতন হালছাড়া লোক নন,—তখনই হাবড়া ষ্টেশনের দিকে মটর ছুটিয়ে দিলেন।”

ওনিয়াই বিনয় ক্রতপদে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া একখানা চলন্ত ট্যাক্সির ড্রাইভারকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল।

রাস্তার ফেরিওয়ালারা ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র ফেরি করিতে করিতে হাঁকিতেছিল, “বিনয় শীলের রহস্যপূর্ণ মোকদ্দমার অদ্ভুত সমাধান! মিস্ মল্লিকের আশ্চর্য্য রহস্যভেদ!—যশোরের সেই স্বনামধন্য স্বদেশী-দলন মহামহিম মাজিষ্ট্রেট প্রবর মিঃ লাহার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ!”

---

সমাপ্ত





# গরীবের মেয়ে

( উপন্যাস )

শ্রীমতী অনুকম্পা দেবী

---

মাননীয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে—

আপনার উৎসাহেই আমার রচনা লোকচক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

“গরীবের মেয়ে”কে তাই আপনার হাতে দিলাম।

আপনার মেহের

অনুকম্পা

---

# গরীবের মেয়ে

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল, বেলা প্রায় নয়টা। শাক্সিরাছে। আফিসের কেরানী, দারবান, বাড়িদার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদল বথানিয়মিত সময়কে পাছে না ধরিতে পারে, তাহারই জন্ত পশ্চিমের এই চরম শীতকেও উপেক্ষা করিয়া খালি গায়ের উপর কেহ এক খাব্লা তেল চাব্ড়াইতেছে, আবার কেহ বা শীতাক্ততার গায়ের জামাজোড়া খুলিতে না পারিয়া সেই সব শুকনো মাথা বুলাইয়া, মাথার চুলগুলোকে একটুখানি ভিজাইয়া লইতেছিল। এইরূপ কাকমানের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য চুলগুলার মধ্যে স্তচরুভাবে টেরী কাটা। নতুনা শারীর-স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই, বরং কিছু বিকল্প সম্পর্কই দেখা যায়।

এ ছাড়া আজকাল আর এক জাতীয় জীবকেও এই আফিস, ইকুলের অধিবাসীদিগের মতই শীতবর্ষানির্বিশেষে সাত-সকালে নাকে-মুখে ছুটি জুজিয়া প্রায়ই অ-স্নাত—অ-ভুক্ত অবস্থায় সারাদিনের মত বাড়ীর বাহির হইতে হয়। তাহাদের ছরবস্থা আবার আরও এক কাঠি উপরে। সে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদল। স্কুলের গাড়ীর ভয়ে তাহাদের ঘুম ভাঙার পর হইতে এতই সঙ্গত থাকিতে হয় যে, পুরা হুঁটাটী মান ত তাদের হয়ই না, আহাটীও অর্ধেক দিন না হওয়ারই সাক্ষি। কারণ, বাসনমাজা-বিয়ের কামাই মাসের মধ্যে অমন পঁচিশ দিনই, খোকাখুকীদের না ধরিলে, বিছানাটা না তুলিলে, নেকড়াগুলো না কাচিলে, বাবা বা দাদার তেলটুকু, গামছাখানা, ধুতিখানি ঠিক করিয়া না রাখিলে বিভূজা মাতা চতুর্ভুজা হইয়া পড়ে আধসিদ্ধ ডাল-ভাতটা ভোগান দিতে পারিয়া উঠেন না। বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ছাই তুলিয়া, ছেলেকে ছুষ দিয়া, তাহার উপর মেয়ের কাছে কণামাত্রও সাহায্য না পাইলে, স্ততিকারোগ-

জীর্ণা মাতা বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সব করটিকে কেমন করিয়া সাড়ে নয়টার ভিতর সারাদিনের রসদ ভোগান দেন? বিশেষতঃ সারা সহর ঘুরিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মেয়ে-স্কুলের গাড়ী বেশীর ভাগই সাড়ে সাতটা হইতে আটটা নয়টার মধ্যেই সর্বত্র আসিয়া পৌঁছে।

পৌষমাস, যেমন প্রবল শীত পড়িয়াছে, তেমনই প্রচণ্ড বর্ষা দেখা দিয়াছে। এক দিকে মেঘ ও অপর দিকে কোরাশার স্কল অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া ধরনীকে দিনের আলোর অবতরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বেলা নয়টা বাজিলেও মনে হইতেছিল, সবেমাত্র বুরি এই ভোর হইয়াছে। একে ত শীতের ভোরে পাখীরা সহজে সাড়া দেয় না, তাহার উপর কুটির ঘোলেতে কাক, পক্ষীরা সকলেই যেন ছয়র বন্ধ করিয়া ঘুসাইয়া আছে, কাহারও আর সাড়াটুকু পর্যন্ত নাই। কিন্তু জীবজগতের সর্বত্র ত আর একই নিয়ম চলে না, মনুষ্যজীবের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের ত আর কাহারও ভরা কলসীতে ঠোঁট ডুবাইয়া, বাড়ীভাতে মুখ জুবড়াইয়া বেড়াইলে দিন চলিবে না, কাজেই বাত, বর্ষা, আতপ এবং হিমকে পরাস্ত করিয়াই তাহাদিগকে পেটের চেষ্ঠা দেখিতে হইতেছে। আরামের এবং বিরামের অদৃষ্ট লইয়া তাহাদের জন্ম হয় নাই, তবে ইহারই মধ্যে বাহারা স্ক্রুতিবলে অপরের বাড়ী ভাত খাইবার মত বুদ্ধি ও শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এলবার্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড অমুনিবস্থানা হুইটি বার্কক্য-শীর্ণ ও বৃহদায়তন “মেকেওহাও” কেনা কালো ঘোড়ার দ্বারা বাহিত হইয়া, সহরের প্রান্তভাগে অনেকগুলো পড়োবাড়ী, খোলার ঘর, কালকাসন্দা, ঘেঁটু ও বাশবাগানের পাশাপাশি একখানা অর্ধভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনের পাদানীতে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্টা ময়লা ‘চুহুদী’ শাড়ী



ও ছেঁড়া 'ঝুলা'-পরা বালিকা-বিছালয়ের 'দাইঠাকুরানী', চলন্ত গাড়ী হইতে ত্রস্তে নামিয়া পড়িয়া, সেই অসংস্কৃত, জীর্ণ, নাতিবৃহৎ অট্টালিকাটির প্রবেশদ্বারের মধ্যে দাঁড়াইয়া উন্মুখে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—  
“নীলীবউয়া! হো নীলীবউয়া! গাড়ী আসা।”

বাড়ীর ভিতরদিক হইতে একটি উবেগ-বিপর কণ্ঠস্বরে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, “ওই শোন মা! আমি ত বলছি তোমার যে, আজ কিছুতেই আর আমার খাওয়া হয়ে উঠবে না, তা তুমি কিছুতেই শুনলে না ত! এখন?”

“ও মা! মোটে যে গোণা দুটি গরাস তাত মুখে দিইছিলি রে! এখনি উঠছি কি বল? দুধওয়ালী মাগীও ত এখনও এলো না যে, দুধ একটু নিয়ে না হয় গরম ক’রে দোব। আজ না হয় না-ই গেলি, মা!” নেপথ্যস্থিতা খুব সম্ভব যে সেই সন্দোষিতা মায়েরই কণ্ঠ হইতে এই ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রতিবাদটুকু বাহির হইল।

মেয়ে কিন্তু এই স্মৃতির সমর্থন করিল না; সে অসহিষ্ণুভাবে দৈব তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তোমার ত অর্ধেক দিনই এই রকম; না গেলে কাইন দিতে হবে যে! আর সে পরসাত্ত আর তুমি আমার দেবে না। না, মা! রোজ রোজ সন্টার সামনে আমার দাঁড় করিয়ে দেবে, সে আমি পারবো না, বাপু! তার চেয়ে না খাই না-ই খেলুব, আমি—”

দাই হরমতিয়া অগ্রসর তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া, ডাকিয়া উঠিল, “নীলি বউয়া! জলদি আইয়ে বউয়া, মাইজি লোগ কেতা বোলতা হার, আপ ত আপনেসে হি কুহ্ কুহ্ শুনাখা? তব, কিন্ কাহে এতা দেবী করতেহে বউয়া?”

“ও মা! না না, তুমি আর কিছু বলো না, মা! এ দাই! তুরন্ত মায় আতেহে—”

দুই তিন মিনিট পরেই একটি বছর এগার বারো বৎসরের মেয়ে একখানা আধময়লা মিলের সাড়ী ও বাজে ছিটের আধছেঁড়া একটা জামা পরা, হাতে তার গাছকতক কাচের চুড়ি, মাথায় রুম্ব চুলের পিছনে একটা আধখোলা প্রকাণ্ড খোঁপা, একগাদা ময়লা ও মলাটখসা পুরাতন বই-খাতা বগলে চাপিয়া ধারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

“হা, নীলি বউয়া! আপ কেতা দেবী কিয়া!—”  
এই মন্তব্য করিয়া দাই মিলিটারী ধরনে পা ফেলিয়া

গাড়ীর দরজা খুলিতে অগ্রসর হইল। গেল এবং মেয়ে গাড়ীর পাদানীতে পা দিবার পূর্বেই তাহার সহাধা মিনীমণ্ডলী হইতে একটা কল্লোলিত কলরব উঠিল পড়িল—

“বাবা! নীলিমা! তোমার যে আজ সন্ধ্যা-গোজার শেষ হয় না, তাই! এতক্ষণ ধরে হচ্ছিল কি, শুনি?”

“রোজই ত তাই, তোমার দরজার আমাদের তিন বটা ক’রে সমর লাগবে, আমরা তবু তোমার কণ্ঠ আগে বেরিয়েছি, তোমারই বা রোজ রোজ এক দেবী কিসের জন্ত হয় তাই?”

আর এক জন বলিল, “ও মা! তবু চুলটা ত চারদিন থেকে ওই রকমই বাধা আছে দেখছি মা গো! তুই কি কুড়ে, তাই! আমি দেখে আজ চান করতে পারিনি, তবু চুলে ‘কেতা’ ক’রে ফিতে বেঁধে নিইচি তো। তুই তাই, কেন কি?”

নীলিমা ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের মধ্যে নিজের আসন গ্রহণ করিয়া অপরাধিতাবে সকলের সব প্রশ্নের একসঙ্গে এই জবাব দিল, আমাদের যে তাই বামা-পিসীর অমুখ করেছে, বা’রও শরীরটা মোটে ভাল নেই তাতে এই রুটি-বাদলা, রান্না হ’তে অনেক দেবী হলে গেল, তবু আমি ঠিক গোণা দুটি গরাস মাত্র তাত মুখে দিয়েই—যেমন দাইএর সাড়া পেয়েছি, অমনি উঠে পড়ে মা’র মানা না শুনেই পালিয়ে এলুম।”

এই বলিয়াই মায়ের পরিমান ছলছলে মুখ-চোখ বনে পড়ায় তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা মুহূর্তের উদ্ভিগ্না আসিল। কিন্তু তাহার বান্ধবীগণ সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সপ্তরথীর মতন একসঙ্গে বিজ্রপের তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে পুনরাক্রমণ করিয়া

অণুকা বলিল, “ও মা! বাদলা-রুটি কি শুধু দেবী বাড়ীতে হয়েছে না কি? সারা সের শুধু দেবী কি ক’রে রান্না-বারা হলো, শুনি?”

সুখমা চৌট টিপিয়া মন্তব্য করিল, “নীলির মা যদি কালিয়া-পোলাও চড়িয়ে খা কি ক’রে এর মধ্যে শেষ হবে বল? আমরা খিচুড়ী আর আলুবেগুন ভাজা খেয়ে এ নয়। এ তোমার অজ্ঞার কথা যে!”

মনোরমা একটা দুই কাঠির গলাধক, পশম দিয়া এই গাড়ীর প্রচণ্ড বাঁকানীতে করিয়া অভ্যস্ত মনোযোগের সহিত বুনি

এই সময়টুকুর জন্যও তাহার সেই লাল সবুজ পশমের  
সলাইটুকু বন্ধ থাকিলে, কি জানি, কি অনর্থই বা  
ঘটিয়া যাইবে, — তা সেও অকস্মাৎ নিজের সেই  
একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া মুখ তুলিয়া ও মাথা  
করাইয়া, সুবহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল,  
“বলি সুবি! তুই বুঝি আর এ সহর খুঁজে পোলাও  
মাধবার লোক দেখতে পেলিনি? তাই নীলির মায়ের  
পক্ষে ওর দার ফেলি? হ্যাঁ তাই নীলি! আজ  
তাদের কি রাসা হয়েছিল, বল তো তাই?”

এই প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ভিতরকার রহস্য এ সমাজে  
মতান্তরই অ-প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া এ কথায় সকল মেয়েরই  
ঠাটের আশে-পাশে তৎক্ষণাৎ কিছু কিছু হাসির  
আভাস বিজ্ঞাতের মতন খেলিয়া গেল। কোন মেয়ে  
বা সেটাকে সামলাইতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া  
হাসিয়াও ফেলিল। নীলিমার গণ্ড ও কর্ণমূল এই  
বিজ্ঞপ-প্রশ্নে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে  
নিজের লজ্জা-বিপন্নতা সম্বন্ধে রোধচেষ্টা করিতে করিতে  
প্রশ্ন ওদিকে সহজভাবেই উত্তর করিল, “আজকের দিনে  
আর অস্ত্র কি হবে? খিচুড়ীই চড়েছিল, বা তাই থেকে  
হাতায় কেটে আমার ফুটি তুলে দিয়েছিলেন, তাও  
আবার গাড়ী এসে পড়লো বলে—”

অণুকা প্রশ্ন করিল, “আজ তা হ’লে তোর বা নিশ্চয়  
মাকে জলখাবারের পয়সা দিয়েছেন? আনি,  
হাই, আজ চাউ চানাচুর, সাড়ে বজ্রিশতাক, কচুরি আর  
গোলা কিন্বে। মম্ব, তুই কি কি কিনবি? নীলি,  
হই?”

মনোরমা বোনা বন্ধ করিয়া তখনই জবাব দিল, “আমি  
কালবড়ু আর গোলাপী রেউড়ির কথা ভেবে  
তা ছাড়া বা হয় হবে। কিন্তু নীলি নিশ্চয়ই  
হাই ছাই খাবার কিন্বে না, সে আজকের দিনে  
নী, রাবড়ী আর মতিচূর কিনতে দেবে,—  
হই, নীলিমা? কেমন তোর ‘মেম্ব’ তৈরী ক’রে  
হই?”

নাম নীলিমা হইলেও সুধমা বা মনোরমার  
তাহার অনেকটাই সাক, তার সেই  
এই ব্যঙ্গোক্তিতে অনেকখানি লাল  
খুখে সে শুধু একটুখানি হাসিয়া  
তো খুব ভালই হয়েছে; কিন্তু খাবার  
কিন্বে না, বাজারের খাবার যে আমার  
আর না, সে তোমরা তাই, জানই ত?”

“হ্যাঁ—তা—বটে!” এমন সুর করিয়া মনোরমা এই  
কথাটা বলিল যে, বাকী মেয়েরা তাদের চাপিবার ইচ্ছা  
সম্বন্ধে কেহই আর হাসি চাপিতে পারিল না; কেবল  
নীলিমা তাহাদের সেই হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা  
করিয়াও হাসিতে ত পারিলই না, উপরন্তু তাহার সমস্ত  
মুখটা অপমানের লজ্জায় অধিকতর রক্ত হইয়া উঠিল।

ইহার ভিতর তাহাদের সুবহুৎ বান গবগব শব্দে  
সমস্ত মহরের রাস্তা কাঁপাইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে  
আসিয়া পৌছিয়াছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে  
ভিতরের মেয়েরা ছড়াছড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া  
দেখিল, আজও তাহারা ‘লেট’ আসিয়াছে। স্কুলের ঘণ্টা  
পড়িয়া গিয়াছে এবং দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল  
যে, সে দিনও স্কুলোচনাদির মুখের চেহারাখানা বেশ  
সুপ্রসন্ন নয়। ইহা দেখিয়া সকল মেয়েই একসঙ্গে ত্রুটি  
করিয়া ভয়বিপন্নমুখী নীলিমার আনত মুখের দিকে  
এমনই ভাবে চাহিল যে, তাহার এ অর্থ করাও অসম্ভব  
হয় না—যে, এই সব কোপকটাকে সে যদি ভয় হইয়া  
বার ত হয় ভাল।—তাহা হইলে ত আর যোজ ওরাজ  
তাদের ‘কি না থাকার’, মায়ের অসুস্থতার’, ‘বাপের  
কোন কিছুর’ দরুণ ভাত না হওয়ার দ্বারা সবাইকার  
এই অবস্থা বিলম্ব ঘটয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারে না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়ের গালভরা বাহারে নাম রাখিতে যদি  
কিছুমাত্র পয়সা খরচ হইত, তাহা হইলে নীলিমার  
পিতা অমুকুলচন্দ্র কখনই তাহার দ্বী স্বর্ণলতার  
উপর তাহার ছেলেমেয়েদের নামকরণের  
ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।  
সৌভাগ্যক্রমে আজও আবারের কর্তৃপক্ষীয়গণের  
অনবধানতা প্রযুক্ত এই একটা ব্যাপারের উপর  
কোনরূপ কর ধার্য করা এখনও পর্যন্ত ঘটয়া উঠে নাই  
বলিয়াই অমুকুলচন্দ্রের পত্নী তাহার দীর্ঘদিনের বিবাহিত  
জীবনের মধ্যে এই একটা বিষয়েই শুধু একটুখানি  
স্বাধীনতা লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। তা মনের কোত  
তিনি ঐ বিষয়ে কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু তুইলে কি  
হয়, মানুষে ছাড়িলে আবার যবে ছাড়ে না বে! যম-  
দূতেরই একটি ছোটখাট সংস্করণ স্বামিরদ্রুটি যদি বা  
একটুখানি উদারতা দেখাইলেন, ত ভাগ্যানিগ্রস্তা



বাম হইয়া সেট কোলাগাথা নামগুলি করেটিকে খসাইয়া লইয়া চিরমহিষ, বৈদ্যশীলা, শান্তপ্রকৃতি নামের বুকটাকে বড়মড়িয়া তালিয়া দিলেন। একটির পর একটি করিয়া স্বর্ণলতা তাঁহার পূর্ণিমা, সুরমা ও সুমাকে হারাইলেন। বাকী রহিল কেবল তাহার সহিত মিল রাখিয়া রাখা নাম সকলের ছোট মেয়েটি নীলিমা। আবার এ দিকে অরুণেন্দু, নিখিলেন্দু দুই জন চলিয়া গেল, শুভেন্দু এদের সবার ছোট, সেইটিই শুধু নামের কোল জুড়িয়া রহিল। এমনই করিয়াই কৃপণ স্বামীর দ্বী স্বর্ণলতা নিজের অশন-বসন-ভোগ-বিলাসের একান্ত অভাব সত্ত্বেও সকল হুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবকে তুচ্ছ করিয়া যে মহাধনে নিজেকে ইঞ্জানীসমা বোধ করিয়া গৌরবানন্দে পরিপূতা হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাহার প্রায় সবটুকুকেই বিসর্জন দিয়া জীবন্যতা হইয়া রহিলেন। সাতটি সন্তানের মধ্যে বাকি দুইটির উপরই বা কিসের আশা? সদা মনে হারাই, হারাই,—এই ভাবে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা, ইহার চেয়ে মানুষের পক্ষে আর অভিলাষ বৃদ্ধি কিছুতেই নাই। তা তেমন করিয়াও মানুষকে প্রায়ই ত বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং স্বর্ণলতাও রহিলেন।

শুভেন্দু ছেলেটি খুবই মেধাবী বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নয়। তাই বলিয়া ছোটবেলা হইতে বড়পুরুষ পড়া-শুনা করাইলে সেও যে 'মানুষ' হইতে পারিতই না, তেমন কোন মন লক্ষণও তাহার শৈশব-জীবনের ইতি-হাস বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে, এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু শুভেন্দুর পিতার নাকি ভবিষ্যদ্বাণীসম্মতটা অত্যন্তই প্রবল, তাই তিনি তাঁহার এই একমাত্র পুত্রকে বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্ত অসমর্থ জানিতে পারিয়া প্রথমাবধিই তাহার জন্য কোন প্রকার ব্যয় করেন নাই। বিশেষতঃ ছেলেরা আজকাল বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একান্ত ধৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পিতামাতা—বিশেষতঃ পিতার প্রতি আর বধোচিত বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে পারণ হইতেছে না, এই প্রকার হেতু-প্রযুক্ত ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রতি শুভেন্দুর পিতার বিশেষরূপেই একটা প্রচণ্ড বিরাগ ছিল। তবে ইংরাজী বিদ্যা বরকট করিয়া রাখিয়াও যে ছেলের পক্ষে অপর বিদ্যালয় করিতে পারা সম্ভব, এমন কুতর্ক তুলিবার কালোক সৌভাগ্যক্রমে এ পরিবারে বা ইহার বাহিরে তেমন কেহই ছিল না, যে এক জনমাত্র ছিলেন, তিনি অমুকুলচন্দ্রের এক জন বাল্যবন্ধু, নাম তাঁহার

ভুবনমোহন রায়, এক্ষণে বহুবর্ষ যাবৎ দুই জনে সাক্ষাৎ নাই। কাজেই নির্বিরোধে শুভেন্দুর বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ কোনরূপ শিক্ষা লাভেরই ব্যবস্থা হইল না। বিদ্যা তাহার পাঠশালা বাঁদালা স্থল প্রভৃতি হইতে আর উদ্ধনীয়ার উঠিতে পাইল না। এত দিনের পর হঠাৎ একদা একটা সুযোগ যদিও বা নিজে হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও তার ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হইয়া গেল।

অমুকুলের বাল্যবন্ধু ভুবনমোহন একটা মোকদ্দমার আসিয়া এক বেলায় অস্ত বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সেখানে ভাল-ভাত, সজিনাখাড়া চচ্চড়ি, মোরলা বাছের অমল ও ধরয়া বাছ তাহার পরিবর্তে তিনি বন্ধু-কস্তা নীলিমার হাতে এক জোড়া সোনার ইয়ারিং ও জিয়া দিলেন এবং বন্ধুর সঙ্গে বিস্তর তর্কাতর্কির পর বন্ধুপুত্র শুভেন্দুকে বিদ্যাশিক্ষার্থ নিজের সঙ্গে লইয়া বাইতে চাহিলেন। বন্ধুর হাতে ছেলে দিলে ধরচের ভাবনা নাই, সে কথা অমুকুলও জানিতেন এবং বন্ধুও প্রথমাবধি সে ভরসা দিয়াছিলেন। ইহাতে অসম্মতির কিছুই ছিল না, বরং শুভেন্দুর উপর যেটুকু ধরচ পড়ে, সেটুকু শুধু বাঁচাইতে পারা যাইবে। কিন্তু দুঃদৃষ্টিসম্মত বিচক্ষণ ব্যক্তি অমুকুল সুদূর-ভবিষ্যতে তাহার এই ইংরাজীশিক্ষিত উত্তরাধিকারীর কথা মনে করিতেই সর্বদা শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরাজী শিখিলে সে কি তখন আর এই ভালা বাড়ীতে বাস করিবে, বাপের মর্ত্য আটহাতি ধুতী বেনিয়ান পরিবে, নী-চানা-তিজা ও শুড় দিয়া জলখাবার খাইতে রাজী হইবে? উঃ, তখন হয় তা ডসনের জুতার, আঙ্গুর পাঞ্জাবীতে বাংসের কাটলেটে তাঁহার বুকের রক্তস্বরূপ টাকার দুইদিনের মধ্যেই উড়াইয়া দিয়া শুভেন্দু পথে পথে করিয়া বেড়াইবে। এই চিন্তা মনে উদ্ভিত হইয়া তিনি উঠিয়া তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ বলিলেন, "মরাহাজা একটামাত্র ছেলে; ছেড়ে থাকতে কিছুতে রাজী হবে না।"

ভুবনমোহন তৎক্ষণাৎ নীলিমার দিকে কহিলেন, "তোমার মা'কে এই দোরের দাঁড়াতে বল তো খুকি! আর তাঁকে শুভেন্দুকে আমার সঙ্গে লেখাপড়া শেখা দিতে তাঁর কোন অমত আছে কি না?"

অমুকুল নেপথ্যে অবস্থিত পক্ষ করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "কে"

দেখ, গিন্নি! হঠাৎ একটা খামখেয়ালী তারে  
যেন কিছু ক'রে বসে না। ছেলে ছেড়ে দিয়ে যে  
শেষকালে প্যান-প্যান ক'রে কাদতে বসবে, সেটি যেন  
হয় না দেখো। তাতে তোমার আবার বুকের ব্যানো  
আছে।

নালিমার মুখ দিয়া স্বর্ণলতা জানাইলেন, ছেলে  
ছাড়িয়া তিনি এক দিনও টিকিতে পারিবেন না।

হিতকারী সুহৃদ সুদীর্ঘ নিখাসসহকারে বিদায়  
লইলেন। বাইবার পূর্বে তিনি আর একবার গৃহ-  
স্বামীর অজ্ঞাতে তাঁহার বালিকা কন্যা দ্বারা পুত্রস্নেহে  
তাঁহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচারশক্তিহীনা  
জননী নিকট এ সম্বন্ধে বিস্তর পরামর্শ পাঠাইয়া  
এই একই উত্তর পাইয়াছিলেন।

স্বর্ণলতার যদিও নিজের সম্বন্ধে এতবড়  
অবিচার করিতে বুক ফাটিয়া গেল, কষ্ট চাপিয়া আসিল,  
শেষে চোখের জলে বুক ভাসিল, তথাপি স্বামীর  
আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও তাঁহার ঠোঁট দিয়া  
নিকলি হইয়া আসিল না। নতুবা ভ্রম-ধরের মেয়ে  
স্বর্ণলতা নিজ সম্বন্ধে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে জানগন্ডা-  
হারা হইয়া নিজের খেলালেই তাঁহাকে কাছে টানিয়া  
রাখিলেন, তা নয়। আসল কথা, অমূল্যচন্দ্রের জী  
স্বর্ণলতা যদিও বয়স ও পদব্যাধার গৃহিণী, জননী এবং  
এমন কি, তাঁহার প্রথম সম্বন্ধগুলি বাঁচিয়া থাকিলে  
এতদিনে স্বপ্নাতার পদবীতেও উন্নীত হইতে পারিতেন,  
তথাপি স্বভাবে আজও তিনি সেই নবোদা বালিকারই  
জায় তাঁহার স্বামীর কাছে ভয়সঙ্কুচিতা হইয়া আছেন।  
সংসারে এক এক জন মানুষ দেখা যায়, বাহাদের  
মুই বনে হয়, তাহারা যেন জগতে কেবলমাত্র  
জিত হইবার জন্যই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্বামী-  
বটেই, পাড়াপ্রতিবেশীরাও সুযোগ পাইলে  
সম্বন্ধে একটুখানি না একটুখানি অবিচার  
এবং তাহারাও নিরীকরোধে উল্লাস  
পর শুধুই যে সহ করে, তাও নয়; তাহাদের  
নি অজ্ঞান হইতেছে, এমন কথা মুখে শু  
তাহাদের মনেও হয় ত পড়ে না। চির-  
য় সহিয়া ঐ জিনিসটাই যেন জগতের  
একমাত্র পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে,  
তাঁরা বিশ্বাস নিজের মনেও কল্পিয়া যায়।  
টু ঠিক এই প্রকৃতিরী দশ বছরে বিবাহ  
ইকী" শান্তীর হাতে অশেষবিধ লাহনা

সহিয়াছেন, বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্বাবাসের ক্রটি  
ঘটিলে তাঁহার গালি খাওয়ার অন্ত থাকিত না। এক-  
বার কি একটু প্রতিবাদ করিতে যাওয়ার ইহার শাস্তী  
ঠাকুরালী বধুর মুখে জলন্ত দিয়াশালাইয়ের কাঠি চাপিয়া  
ধরিয়া "বউ মানুষের চোপা করার" এমন এক শাস্তির  
বিধান করিয়াছিলেন যে, বধুর মুখ সেই দিন হইতে ছুট-  
সুতা দিয়া সিলাই করিয়া দিলেও এর চেয়ে বেশী করিয়া  
আর বন্ধ করিতে পারা সম্ভব হইত না। সেই যে  
বালিকা স্বর্ণলতা তাঁহার প্রতি শাস্তীর সকল অত্যা-  
চারকে নীরবে সহিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, আজও  
প্রোচা গৃহিণী ঠিক ভেমন ভাবেই দেব-মানবের সকল  
অত্যাচারকেই "চিন্তারহিত" কি না বলা যায় না—তবে  
"বিলাপরহিত" ও অপ্রতীকারপূর্বক নীরবে সহ করিয়া  
চলিতেছেন। দৈববিপাকের বিরুদ্ধে দেবতাকেও তিনি  
কোন দিন দোষী করেন নাই এবং মানুষকেও না।  
এমন কি, নিজের ভাগ্যকে পর্যন্ত কোন দিন তাঁহাকে  
নিন্দা করিতেও কেহ শুনিতে পার নাই।

স্বর্ণলতার বিবাহ হয় বৈশাখমাসে। দারুণ জীর্ণ  
বিবাহের সময় বলিয়া শয্যাদানের সঙ্গে তাঁর বাপ তাঁকে  
গারে দিবার লেপ দেন নাই; আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঘর-  
বসতও হইল আধিনে। তখনও তাই লেপখানি দিতে  
বাদ পড়িল। পৌষমাসের কনুকে নীতে তাঁর শাস্তী  
তাঁহাকে গারে দিতে একখানি পুরাতন কাঁধা দিয়া  
বলিলেন, "বাপ মিন্বে লেপ দিলে না যে, আমি কোথা  
থেকে কি দেবো? তার বেয়ের জন্তে ঘরের পয়সা  
ভেঙ্গে লেপ কি আবার তৈরী করিতে যাব না কি? ঐ  
গারে দিক।" তা এখন আর সেই এক ব্যবস্থাই তাঁহার  
জন্ত চলিতেছে। শাস্তী বরণকালে নিজের প্রতি-  
নিধি যে যে ছেলে রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা বত্বরক্তের  
অবমাননা ঘটিতে পার নাই।

অমূল্য জীকে সংসার-ধরচ করিতে মাসে পাঁচশটি  
করিয়া টাকা দিতেন, ইহার তিতর অশন-বসন সমস্তই  
চালাইতে হইত। ইদানীং জী হাতে বাজে ধরচ  
হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নিজের হাতেই  
সমস্ত ধরচপত্র রাখিতে হইয়াছে। তবে জীর সম্বন্ধে  
তিনি নাকি নিতান্তই অবিচার করিতে পারেন না;  
তাই হয় মাস অন্তর যখন কোম্পানীর কাগজের সুদ  
বাহির করা হয়, তখন দুই তিন টাকা করিয়া তিনি  
জীর হাতে দিয়া থাকেন। কারণ, ঐ টাকার মধ্যে  
হাজার পাঁচেক টাকা স্বর্ণলতার বাপের বাড়ী হইতে



পাওয়া গিয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুতে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান স্বর্ণ, শুধু ঐ টাকা কেন, আরও অনেক কিছু লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়াও কোন সময় সে সকল সম্বন্ধে কোন কথাটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিতেন না। স্বামী হাতে ভুলিয়া হেলার শ্রদ্ধায় যেটুকু দিতেন, সেইটুকুই কি তিনি ভরসা করিয়া খরচ করিতে পারিতেন? যদি কোন দিন খরচের হিসাব চাহেন? অব্যবহারে সকল জিনিসেই যেমন মরিচা ধরে, এ মেয়েটির সমস্ত মনোবৃত্তিরই বোধ করি সেই রকম ভরবস্থা ঘটিয়া থাকিবে। তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তির একটা অংশ খুব সজাগ ছিল—সেটা ভয়।

বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও ইহারই ভিতরে স্বর্ণলতাকে অমূল্যচক্রের দিগির বয়সী মনে করিতে পারা যাইত। তাঁহার গায়ের রং এক সময় বেশ উজ্জল ছিল, আজও তাহার আভাস তাঁহার অত্যন্ত শীর্ণ ও অযথা লোল চর্ম্মের উপর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ দেহ ইহার মধ্যেই মধ্যভাগে যেন নত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছিল। ললাটের শুষ্ক চর্ম্ম রেখার রেখার ভরসা উঠিয়াছিল। মাথার চুলের অর্ধেকগুলি শুষ্কবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গালের মাংস লোল হইয়া, গায়ের মাংস শীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেন একটি রসহীন আতপশু ফলের মতই দেখাইত। কিন্তু তাঁহার সচকিত ভীত দৃষ্টির মধ্য দিয়া এবং শুষ্ক মৌন শাস্ত অধরের অভ্যন্তর হইতে এখনও যেন একটি অতৃপ্ত বালিকাজীবনের সাদা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ■■■ বালুরাশির তলদেশে এখনও যেন অনেকখানি স্বচ্ছ শীতল সলিল কোথায় লুকান আছে বলিয়াও একটা সন্দেহ আগে। কিন্তু দর্শকের সে সন্দেহভঞ্জন করিবার কোনই পথ ছিল না, দ্বারে তার কড়া পাহারা।

যাহা হউক, এইরূপে “মাতা শত্রু” এবং “পিতা বৈরী” হইয়া তাঁহাদের বালকটির পড়া-শুনার পথে যখন কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া বসিলেন, তখন কোথা হইতে আর এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া আর একটা অভাগা জীবের আশ্চর্যরূপ সহায়তা করিয়া বসিল। পাড়ার নরহরি ভট্টাচার্য্যের এক বয়স্থা অনুচর কস্তা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত বলিয়া অনেকেই—বিশেষ করিয়া আবার অমূল্যচক্রই সে বেচারাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিল। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, এক মোটা মাহিনার মধ্যবয়সী রাজকর্ম্মচারী তাঁহার

দ্বিতীয় পক্ষের জন্ত সেই বয়স্থা ■ লেখাপড়া-জান্না মেয়েকে, তাহার সৌন্দর্য্যহীনতাকে ভুচ্ছ করিয়াও বিনা পণে বা সামান্ত পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহসভায় বরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে বরটি গম্ভীরমুখে উত্তর দেন যে, “গায়ের চামড়া একটু কটা পাওয়া যাইতে পারে, পয়সাও অকিঞ্চিৎকর নয়; কিন্তু স্ত্রীকে ‘ক’ থ’ শেখাইতে বসার পরিশ্রম উহার দ্বারা পোষাইয়া উঠে না। এই মেয়েটি সেলাই জানে, হাতের লেখা ভাল; গান-বাজনাও জানা আছে, ছোট ছেলেমেয়েদের কতকটা শিখাও দিতে পারিয়া আমার তার লাভব করিবে।”

এই ঘটনার অমূল্যচক্রের চোখ ফুটিয়া গেল। তিনি বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “বলি গিন্নি! ওগো! বলি শুন্‌চো? কাল থেকে আমি নীলিকে মেয়ে-স্কুলে ভর্তি ক’রে দেবার সব ঠিকঠাক ক’রে এসেছি। এবার কিন্তু আর তোমার কাঁছনী শুন্‌ছিনে যে, মেয়ে ছেড়ে সারাদিন কেমন ক’রে থাকবো! সেটি আর তোমার হচ্ছে না, বাপু। আজকালের দিনে মেয়েছেলের একটু লেখাপড়ার দরকার হয়েছে।”

স্বর্ণলতা অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি যে কি শুনিতেন কি শুনিলেন, তাহাই যেন ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে বাড়ীতে ছেলের বিদ্যালয় নিষেধ, সেই বাড়ীর মেয়ে চলিল কি না স্কুলে ভর্তি হইতে?

কিন্তু বিশ্বাস তাঁহাকে করিতেই হইল। ইহার পরদিন সকালে যখন বড়-বড় হড়-হড় শব্দে ■■■ স্কুলের গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের দরজায় দাঁড়াইল, তখনই অমূল্যচক্র আস্তে-বাস্তে আসিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেই গাড়ীর সঙ্গে আগতা স্কুলের দাইয়ের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন।

শুভেন্দু আসিয়া অভিমানে জলভরা চোখে মা’র গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, ফুক-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, “নীলিকে যে স্কুলে পাঠান হলো বড়?”

স্বর্ণলতা এ-দিক ও-দিক চাহিয়া নিঃশব্দে কহিলেন, “ওর ইচ্ছা হলো, বাবা।”

শুভেন্দু বলিল, “তা’ হ’লে আমার বেলাই বা হলো না কেন ওর ইচ্ছাটা?”

স্বর্ণলতা চকিতে ছেলের দিকে চাহিয়া সত্য কহিয়া উঠিলেন, “চুপ কর, শুভেন্দু!”

ভুভেন্দু একবার নিজের পিছনটার চকল দৃষ্টিপাত করিয়া লইল, তাহার পর সে দিক্ দিয়া উপস্থিত আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া সে দৃঢ় এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে পুনশ্চ নিজের বিজ্রোহ ঘোষণা করিয়া কহিল—

“কেন, ইস্কুলে পড়লে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হ’লে নীলিই বা হবে না কেন? ■ কি চাকরী ক’রে পয়সা এনে তোমাদের খাওয়াবে না কি? ও যদি পড়তে যেতে পারে ত আমিই বা তা পাবো না কেন, শুনি? আমাকেও দিতে হবে ভর্তি ক’রে ইস্কুলে। নিশ্চয়ই দিতে হবে।”

স্বর্ণলতা তখন একখানা ছেঁড়া কাঁধার উপর আর এক খানা পুরাতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিতেছিলেন, সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং সম্মুখে ■ সম্মুখে ছেলের একটা হাত হাতে ধরিয়া তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মুহূ ও ভীতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “ইংরেজী পড়া উনি পছন্দ করেন না, তারই জন্যেই ত তোমায় ইস্কুলে দেন নি, নইলে আর দিতে কি? নীলি ত আর ইংরেজী পড়তে না ■ এখন দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় পড়তে বৈ ত না, তুমি ■ নিয়ে আর গোলমাল করো না, লক্ষ্মী-গোপাল আমার!”

ভুভেন্দু গা-ঝাড়া দিয়া মায়ের হাত গায়ের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। উদ্ধত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে ঝাঁজের সঙ্গে কহিল, “হঁ—গোল করবে না বৈ কি! ‘লক্ষ্মী-গোপাল’ বৈ কি! আমি কিসের লক্ষ্মী-গোপাল! সে ত তোমাদের ঐ ধীজি আচ্ছাদনী নীলি। বা রে মজা! মুখপুড়ী মেয়ে, সকালকেলা খেয়ে দেয়ে গাড়ী চ’ড়ে ইস্কুলে যাবেন, পড়তে শিখবেন, আর আমি বাড়ীতে সন্ধ্যার পাত কুড়িয়ে খাব, গরুর খড় কাটবো—নেদি কুড়বো—বা রে মজা!”

ক্ষীণ ■ শুষ্ককণ্ঠে বা বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ছেলেদের ইস্কুলে অনেক খারাপ ছেলে আছে কি না,—সেই জন্যেই ত দিতে পারেন না, না হ’লে তুমিও ■ পড়তে। সেবার বিপিনের সঙ্গে কি রকম মারামারি করেছিলে, মনে নেই?—তাইতেই ■ ছাড়িয়ে নিতে হ’লো—”

ভুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল—“মিথো কথা—মিথো কথা; তোমাদের ও-সব চালাকী আমি ■ বুঝি! দেশ ■ সব ছেলেই ইস্কুলে যাচ্ছে, আর

আমি গেলেই নাকি ■ যাব ■ আচ্ছা, দেখ তা হ’লে, আমি বাড়ীতে থেকে ■ যেতে পারি কি না! এবার থেকে যত সব মন্দ ছেলে বেছে বেছে তাদের সঙ্গেই বেড়াবো। দেখছো ত ইস্কুল ছেড়ে অবধি সারা দিনই ঘুড়ি ওড়াই আর লাটু খেলি? এখন থেকে কেবলই ঘুড়ি ওড়াবো, লাটু খেলাবো, কপাটী খেলাবো, সাঁতার দোব, এই সব দিনরাত করবো, তোমাদের গরুর খড় কুচুতে বলে গুনছি তাই কলা—”

ক্ষীণ বহির্ঘায়ে মনুষ্যপ্রবেশজনিত বেশকটা শব্দ গেল, তাহাতেই এই বালক-বীরের বীর্যসে কিছু বাধা পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই শুকনো ও ছেঁড়া চটির বে চিরশ্রুত অপূর্ণ বাদ্যধ্বনি উখিত হইল, তাহাতেই একেবারে সকল বীরত্ব জলাঞ্জলি দিয়া সে শুষ্ক ■ বিপন্নমুখে তাহার বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইল।

স্বর্ণলতার গভীর ভাবাক্রান্ত ■ ভেদ করিয়া একটা কষ্টবহুল সুদীর্ঘ নিশ্বাস এতক্ষণের পর উখিত হইয়া আসিল, কারণ, ছেলের সাক্ষাতে এতটুকু স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করিতে ভরসা করেন নাই।

বলা বাহুল্য, ঐ ছেঁড়া চটির অধিকারী ব্যক্তি তাহারই স্বামী।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটির পর সকল মেয়েই যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর চারিপাশে জড় হইয়াছে এবং একে একে বা একসঙ্গেই ছই ■ লাক-লাফি করিয়া আগে উঠিবার চেষ্টায় সোরগোল লাগাইয়া দিয়াছে, বারান্দার উপর হইতে বিজ্ঞানরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তখন ডাকিয়া বলিলেন, “নীলিমা! ■ যাও।”

এই আহ্বান পাইয়াই নীলিমার মুখ একটুখানি রান হইয়া আসিল। স্কলোচনাদি’ কি জন্য যে তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কথা তার ■ আর অজ্ঞাত নয়, এবং এরূপ ভাবে আহ্বান পাওয়াও ত আর তার পক্ষে এই প্রথমবার নহে। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিয়া সে নতমুখে তাঁর সামনে দাঁড়াইল।

স্কলোচনা বহু পূর্বে বালিকা-বিজ্ঞানরের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী থাকিলেও এক্ষণে প্রতিনিধিত্বে তিনিই প্রধানার পদ অধিকার করিয়া আছেন, নীলিমা কাছে



আসিতেই নিজের পদমর্যাদার উপযুক্ত গান্ধীর্থোর সহিত তাহাকে প্রণাম করিলেন, “তোমার বাবাকে সে চিঠি দিয়াছিলে?”

নীলিমা নতনেত্রে, ষাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে তাহা দিয়াছিল।

“কি বললেন তিনি?”

নীলিমার কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিল। তিনি বাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিবার শক্তি বা সাহস তাহার প্রাণে থাকিলে তবেই ত সে তাহা বলিবে। আবার মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিবার অভ্যাস—তাহাও সে কোন দিন করে নাই। কাজে কাজেই অত্যন্ত বিপন্ন ও অতিশয় বিমর্ষভাবে সে নিজের পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল, মুখ দিয়া তাহার একটি শব্দও বাহির হইল না।

তিনি যে ‘কি বলিলেন’—এ প্রশ্নের উত্তর এর চেয়ে আর বেশী সরল তাহার পাওয়া সম্ভব ছিল না, সুলোচনা বসুও তাহা বুঝিতেন। তাই মনে মনে এদের পরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও বাহিরে তিনি আর এই বিপন্ন জীবটিকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শুধু স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “প্রায় তিন বৎসর তুমি এখানে ভর্তি হয়েছ, কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা তোমার মাহিনার দাবী একটি পরস্যাও কখন পাই নি। বেশী পীড়াপীড়ি হ’লে পাছে তোমার ছাড়িয়ে নেন, সেই জন্য মায়া ক’রে আমরাও তাঁকে তার জন্য বড় একটি ব্যস্ত করিনি, সে ত তুমি সব জানোই? কিন্তু এখন আর কারকে ‘ত্রি’ রাখা সম্ভব হচ্ছে না, স্কুলের গবর্নমেন্ট-‘এড্’ প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। নানা রকমে খরচ বেড়েছে, সেই স্কুল ক্লাসের মেয়েদেরই কিছু কিছু মাইনে বাড়িতে হলো। যে সব টাকা অনাদায়ী হয়ে প’ড়ে আছে, সে সব আদায়ের জন্য উপর থেকে কড়া হুকুম এসেছে। সব না হ’লে আমাদের চাকরীতেও টান পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনারও আভাস এবার ইন্সপেকট্রিস মিস্ বিল দিয়ে গেছেন। তোমার বাবাকে সব কথাই বেশ ক’রে খুলে লেখা হয়েছিল, তাতেও তিনি দিব্যি নীরব হয়ে রইলেন। তা, তা হ’লে আর কি করা যাবে বলো? এই চিঠিটা আবার আজ দাও গে, পনের দিনের মধ্যে হয় ■■■ অর্ধেকটা পাওনা দিয়ে দিন, না হয় ত’ তোমাকে আর কেমন ক’রে চিরদিন ধ’রে এমনিতে পড়ান বার?

৫৫ (খ)—২

এটা অল্পের পক্ষে বড়ই ‘বাড-একজাম্পল’ হচ্ছে, অর্থাৎ কি না, দুটোকাটা তো ভাল হচ্ছে না। তোমার নজীর সবাই দিতে আরম্ভ করেছে, বড় অনুবিধায় পড়া গেছে। বুঝতে পারলে?”

নীলিমার দুইটি চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল, পাছে সে ■■■ প্রভাতকালের শিশিরের ■■■ মাটির বুকে ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজেকে সতর্ক করিতে করিতে কোনমতে একটুখানি ষাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে। তার পর অল্পদিকে মুখ করিয়া সে হাত-পাতিয়া সুলোচনা বসু প্রদত্ত খামে আঁটা চিঠিটা লইল।

নীলিমার সঙ্গিনীগণ তাহার হাতের খামখানায় কি লেখা আছে, দেখিবার ■■■ তাহাকে ঝাঁক বাধিয়া ধরিয়া ফেলিল—“দেখি, দেখি, আজ আবার কার নামের চিঠি এলো? ‘অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী কোয়ার’। অ-ভাই! রোজ রোজ সুলোচনাদি’ তোর বাবাকে কি সব ■■■ লেখেন তাই? কৈ আমাদের বাবাদের ত কৈ তিনি কিছুই লেখেন না!”

মনোরমার সেই দুই কাঠির বোনাটা এখন ■■■ খানি লম্বা হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য এখন সেটাতে ঝাকড়া জড়াইয়া পিন আঁটিয়া সেটাকে বলের মতন গোলাকারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। গাড়ী-চলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোনাটা হাতে লইয়া প্রথম প্রশ্ণকারিণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা বাণ ছুড়িল—“মালতি! তুই যেন কি! তোর বাবা গবর্নমেন্টের উকীল, মাসে হ’াজার টাকা রোজগার করেন, তোর স্কুলের মাইনে কি কখনও দিতে বাদ প’ড়ে থাকে যে, তোর বাবার কাছে সুলোচনাদি’র চিঠি যাবে?”

প্রতিমা অবনি টানা সুরে ষাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, “ও না, তাই! সেই জন্যই সুলোচনাদি’ বারান্দা থেকে যক্ষুনি নীলিমা ব’লে ডাকলেন, তক্ষুনিই নীলির মুখটি শুকিয়ে যেন এতটুকুখানি হয়ে গিছলো। তুমি নিশ্চয় তখনই বুঝতে পেরেছিলে, না নীলিমা?”

নীলিমা নীরবে একটা ঢোক গিলিল, কথা কহিল না।

মনোরমা তাহার ছোট বোন প্রতিমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া ক্ষুব্ধাশ্রয়ের মত তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “পিসী কি যে বলে! ও নাকি আর তাই বুঝতে পারেনি? এই ত আর প্রথমবার ওর হাত দিয়ে ওর বাবার

কাছে তাগিদে চিঠি পাঠান হয় নি যে, ওর বুকে বাধবে! 'ও' ত, 'ও, আমিও ত' যেই স্লোচনাদি' ওকে ডেকে বলেছেন, 'নীলিমা শুনে যাও'—তক্ষুনি বুকে পেরেচি যে, কি জন্তে তিনি ওকে ডাকছেন।"

অনুরূপা বলিল, "আমিও ভাই।"

সাবিত্রী মেয়েটি সকলের পিছনে বসিয়া ছিল, সে সেখান হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া করকাপাত তুল্য খনখনে কঠিন স্বরে নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "তা নীলিমা! তোমার বাবাকে তুমি স্কুলের মাইনেটা দিয়ে দিতে বলতে পার না? সত্যিই ত বার মাস ত্রিশ দিন শুঁরা কি তোমার 'ফ্রি'তেই পড়াবেন না কি? কি অজায় তোমাদের!"

শুনিয়া ছুই এক জন মেয়ে পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়া করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, কিন্তু মনোরমা মেয়েটি নাকি কাহারও কোন অসৈরণ সহিতে একেবারেই অভ্যস্তা নহে, কাজেই সে সোজা-সুজি খপ করিয়া অমনি বলিয়া বলিল—"সত্যি না কি, সাবি! অজায় না কি? তা হ'লে তোমার দাদামশাই সেই অজায়টা কি ক'রে ক'রে থাকেন ভাই? আমি এই সে দিন স্লোচনাদি'র সঙ্গে রামদীন চাপরাসীর কথা হচ্ছিল শুনেছি যে, তোমারও তো সাত আট মাসের মাইনে আদায় করতে বেচারী ঘোঁলখেয়ে যাচ্ছে। তা তুমিই বা এমন অজায় সহিচো কি ক'রে?"

তখন দলপতিকে (পত্নী?) কিরিতে দেখিয়া ছাত্রী-সমিতির মধ্যেরও হাওয়া বদলাইয়া গেল। সুধমা তখন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর ও বেচারী তার বাবাকে কেমন ক'রেই বা টাকার তাগিদ দেবে, ভাই? সে বরঞ্চ স্লোচনাদি'রই দিতে পারেন।"

সাবিত্রী মেয়েটি মেয়েদের স্কুলের মধ্যে না কি কলহ-বিজ্ঞার বিশেষ পারদর্শিনী!—তবে এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কারলাভ অবশ্য এ পর্য্যন্ত সে যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, ওই বিষয়ে স্কুলে কোন প্রাইজ এখন পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা ছিল না, থাকিলে মনোরমার পরিবর্তে বোধ করি সে-ই দেটা পাইত। তবে তাদের 'ব্র্যাকেটে' পাশ করাও নেহাৎ অসম্ভব ছিল না। কারণ, হাঁক-ডাক কম থাকিলেই যে নৈপুণ্যের অভাব বুঝায়, তাহা নহে। বরং টিপিয়া টিপিয়া চোখা চোখা শরৎকণ করিতে জানাতেই সমধিক সমরপটু বুঝায়। এখন মনোরমার মন্তব্য

শুনিয়া বড় বড় ডাব্‌ডেবে ছুই চোথকে গোল করিয়া পাকাইয়া সাবিত্রী যেন বাঘের মত গর্জিয়া তাহার শরৎকণের উপর হুমকি দিয়া উঠিল, "বলি মোনা! তোমার যে বড্ডই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে দেখতে পাই? আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মাইনের টাকা ইন্সুলকে দেয় বা না দেয়, তোমার ভাতে কি আসে যায় তুমি? তুই যা খুসী তাই ট্যাক্-ট্যাক্ ক'রে বলবি ক্যান্‌ লা? ফের যদি কখন আমার সঙ্গে লাগতে আসবি, তা হ'লে—"

"কি, মা'বি না কি? সুধমা, লীলা, অনুরূপা, সবাই সাক্ষী থাকুলি, এর যদি না আমি একটা প্রতীকার করি, তা হ'লে—"

"কি প্রতীকার করবি লো? জেলে দিবি না ফাঁসি-কাঠে খোলাবি?"

এইরূপ সলজ্জ আক্ষালনে পথের দুই সারি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে নেপথ্যাচারীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখিনী হইলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যদিও সে সময়টা অক্ষুণ্ণচক্রে বাড়ী থাকিবার সময় নয়, তথাপি কি ঘটতে কি ঘটে, দৈবের কথা বলাও ত যায় না, তাই বাড়ী ঢুকিয়া নীলিমা সতর্ক চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। তাহার পর কতকটা আশঙ্কিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অগ্রসর হইতে হইতে অনতি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

"এস, মা এস!"—বলিতে বলিতে কীর্ণাঙ্গী ক্রান্তমুর্তি জননী তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে বসান ধাতার চারিটি গম লইয়া স্বামীর রাত্রিতে কটা খাওয়ার আটা পিষিতেছিলেন।

"এস, মা, এস—আহা, মুখটি শুকিয়ে গেছে রে! সারাদিনটাই উপোসে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে রান্নাঘরে আয়, চারিটি ভাত শেষ ক'রে ফুটিয়ে রেখেছি, একটু ছুধচিনি দিয়ে খাবি, চল।"

নীলিমার পেটের মধ্যে যে রকমের উগ্র জ্বালা ছিল, তাহা হইতে তাহার অপমানাহত ক্রুদ্ধ মন ওই শুভ সংবাদেই জুড়াইয়া জল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু



উপর্যুপরি ক্রমাগত তিরস্কার ও বিক্রপ সহিয়া সহিয়া আজ তাহার পূর্ণ উপবাসী শরীর-মন বড় বেশী রকম ভাতিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে মায়ের দেওয়া ঐ সু-খবরকে আদৌ আমলে না আনিয়াই উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “দাও, আমি তোমার দুধ-ভাত খেতে চাইনে; আমার স্কুলের মাইনেটা তোমরা দিয়ে দিবে কি না, তাই এখন স্পষ্ট ক’রে বলো ত?”

স্বর্ণলতার ভরাচিত্ত শুটাইয়া যেন এতটুকু ছোট হইয়া আসিল। মেয়ের মনের মধ্যে কিসের যে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে, মুহূর্তের মধ্যে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া তিনি অপরাধিতাবে মাথা নত করিলেন। এই যে প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইল, তাহার স্পষ্ট ছাড়িয়া অস্পষ্ট একটা জবাবও যে তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না।

নীলিমা তাহার হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া আশ্বিন-বেদনা-ছলছল চোখে মা’র পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, “স্বলোচনাদি’ আমার রোজ রোজ বকছেন, রাগ করছেন; আজ বলেছেন, এবার যদি না মাইনে পান, তা হ’লে আমার ইস্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দিবেন। কেন তোমরা আমার মাইনেটা দিয়ে দিচ্ছে না বল তো? শুধু শুধু আমার সকাইকার কাছেই সব বিষয়ে খোঁটা খেতে হয়। তুমি বাবাকে কেন এ কথাটা ভাল ক’রে বুঝিয়ে বলো না?”

স্বর্ণলতা এইবার তাঁহার বিষম মুখ তুলিলেন—  
“বলেছিলুম রে! উনি বলেন, অনেক টাকা হয়ে গেছে—অত টাকা তাঁর নেই, কেনন ক’রে দেবেন? এত দিন যেমন গুঁরা দয়া ক’রে পড়িয়ে এসেছেন, এখনও যদি সেই রকমই তোমার মুখ চেয়ে আরও একটু—”

নীলিমা মায়ের এই মৃদু সঙ্কুচিত করুণ কথা করটিতে তীব্র-জ্বলনে জলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বাধা দিল—“চাইনে আমি অমন দয়া ভিক্ষা করতে। যদি স্কুলের মাইনেই দিতে পারবে না, তবে কেন তোমরা আমার সকাইকার কাছে ছোট করবার জন্যে স্কুলে দিয়েছিলে?”—বলিতে বলিতে অঝরঝরে কাঁদিয়া ফেলিয়া নীলিমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। মা অবাকমুখে চাহিয়া রহিলেন।

স্বর্ণলতা বিমর্ষমুখে রাসার পিড়িতে বসিয়া একখানি যেটে পাতরে করিয়া চারটি ময়লা রংয়ের মোটা ভাত

বাড়িতেছিলেন, শুভেন্দু ‘মা’ বলিয়া ডাক দিয়া ঘরে ঢুকিল।

“হঁ ; তাই তো বলি যে, মুখপুড়ী মেরেটা কি খেয়ে অত মোটা হইবে? আর আমিই বা তাই খেয়ে দিনকের দিন শুকুছিই বা কেন? এর ভেতরে মস্ত বড় একটা ঐতিহাসিক জটিল রহস্য আছে! তাই না? দাঁও দিকিন, ওই ভাতকটা দুধ দিয়ে আজ না হয় আমিই খেয়ে যাই! বাঃ বাঃ, আবার যে একটা কাঁচকলা পাকাও জমিয়ে রাখা হয়েছে, দেখচি! ওঃ, দিবি্য হবে এখন। দিয়ে ফেল আজকের মত এ সব এই অপাজটাকে, পেট আমার ক্ষিদেয় জ’লেপুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। আবার এখুনি বাব জগা-মতেদের সঙ্গে ফুটবলম্যাচ খেলতে।”

শুভেন্দু ধপ্ করিয়া নীলিমার পাতা কাঠের পিড়িখানায় বসিয়া পড়িয়া আগ্রহভরিতহস্তে ভাতগুচ্ছ পাতরটা নিজের কোলের কাছে চট করিয়া টানিয়া আনিল। এইরূপে উহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়া দুধ নামে আখ্যাত নীলবর্ণের জলবিশেষকে কোনমতে ভাতের উপর ঢালিয়া আঠাগন্ধ কদলীযোগে তাহা পরম পরিতোষে মাখিতে লাগিয়া গেল।

“কৈ, চিনি কোথায়? ওইটুকু দুগ্ধের মতন চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায়? নিজেদের আহরে মেয়ের অন্তে চুরি ক’রে রাখা হলো বুঝি? দাও দাও, বার ক’রে দাও। না দিলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি, হ্যাঁ!”

স্বর্ণলতা চিনির কোটাটা পাতের উপর উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া দিয়া দুঃখিত স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, “আর ত ঘরে নেই, বাবা, ওই দিয়েই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি।”

“ও সব খোসামোদের কথার ধার ধারিনে;— নেই কি! আলবৎ আছে। তোমার স্কুলে-পড়া গাড়ীচড়া মেয়ে কি না ওইটুকু চিনির টাকনা দিয়ে এই ভাতের কাঁড়িটি খেতে পারতো? দাও বলছি শীগ্গির, না হ’লে এই রইলো তোমার ছাইপিণ্ডি ভাত প’ড়ে! আহ্লাদী মেয়ে খেতে পেলেন না ব’লে রেগে গেছ ত? সেই সোজা কথাটা খুলে বল্লেই ত হতো; তা থাক, তোমার সেই বিহুসী মেয়েই থাক; পচা নর্দমায় ফেলে লোকসান্ করবার দরকারটাই বা কি!”

তড়বড় করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে

শুভেন্দু সত্য সত্যই মাথাভাত পাতর ■■■ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেল এবং মায়ের বুকফাটা কাতর করণ জাহ্নান কানে না তুলিয়াই সে গুম-গুম শব্দে পা ফেলিয়া দালান পার হইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

নীলিমা নিজের দুঃখ-অভিমানে অভিভূত হইয়া গিয়া মায়ের সঙ্গে যেটুকু কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, মার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াই সে তাহার অন্ত ভীষণভাবে অনুতপ্ত ও হইয়া পড়িয়াছে। মা যে তাহার কত বড় অসহায়, সে কথা বালিকা সম্পূর্ণভাবে না বুঝিলেও স্বামীকে তিনি যে কতদূর ভয় করিয়া চলেন, সে কথাটা যে তাহাদেরও অজ্ঞাত ছিল না। পিতা না দিলে মা আর কেমন করিয়া তাঁহাকে দিয়া দেওয়াইবেন? এই কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল, মার মনে সে আজ শুধু শুধু কষ্ট দিয়াছে। ■■■ তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে চাহিলেন, আর সে কি না 'খাইতে চাহে না' বলিয়া তাঁহার সে বস্ত্রের অবমাননা করিয়া চলিয়া আসিল! অপরাধীর মত সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া সে নিঃশব্দপদে নীচে নামিয়া আসিল। আবার লজ্জাও তার মনে বড়ই জালা দিতে লাগিল, সে 'খাইতে চাহে না' বলিয়া আবার তখনই কি না খাইতে চলিয়াছে! মনকে জোর করিল, বলিল, "হোক গে, মা তো খুসী হইবেন"—কিন্তু রান্নাঘরের কাছাকাছি যাইতেই তাহার সঙ্গর পরিবর্তিত হইয়া গেল। শুভেন্দু সোৎসাহে ভাত মাখিতে মাখিতে উৎফুল্লকণ্ঠে বলিতেছে—"কৈ, চিনি কোথায়? অতটুকু মুণের মত চিনি দিলে কখন অত-গুলো ভাত খাওয়া যায়?"

আবার তেমনই করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসিল; মনে মনে ভাবিল, "যদি আমি এখন খেতে গেলে দাদার ■■■ পড়ে যায়! থাক, আগে ■■■ খাওয়া হরে যাক, তখন ওর পাতেই না হয় খাবো।"

সে জানিত, তাহার মা নিজের ভাগের চাল দু'টি দু'টি করিয়া প্রতিদিন একটা ভাঁড়ের মধ্যে জমা করেন এবং মুটাখানেক জমিলেই এক দিন তাহাদিগকে বিকালের পাপর-পোড়া বা ভুট্টাভাজার বদলে ভাত রাখিয়া দেন। সে ক'টি ভাত ছই জনে খাইতে গেলে কাহারও আধপেটাও হয় না।

উপরে আসিয়া এবার সে তাহার নিত্যকার্যগুলি

সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিল; কিন্তু মার তখনকার সেই বিষয় নিরুপায় মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার মনটা বেশ সহজ হইতে পারিল না। তাহার উপর সারাদিনের উপবাসে শরীরেও যথেষ্ট মৌরল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টির ■■■ কাপড়-চোপড় ■■■ বারান্দায় টাঙ্গান ছিল, সে সব খুলিয়া, যেগুলি শুক, সেগুলি আলমারি রাখিয়া ভিজা সেন্টসে কয়েকখানা লইয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু সেই সাবিত্রী পাহাড়ের সিঁড়ির মত উঁচু উঁচু সিঁড়ি উঠিতে সে দিন তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কয়েক দিনের পরে আজ মধ্যাহ্ন হইতেই বৃষ্টি ধামিয়াছে; মেঘলাও অনেকখানি কাটিয়া আসিয়াছিল। বিশাল আকাশের সর্বত্রই যদিও নির্মেষ হইতে পারে নাই, তথাপি আশে পাশে যে সকল খণ্ড-মেঘ লঘু তন্তুগতি লইয়া ইচ্ছানুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা যে কোন জাগতিক জীবের ভয়প্রদ নহে, তাহা উহাদের শাস্ত্রমূর্ত্তিই সপ্রমাণ করিতেছে। মেঘের বিরাট প্রাচীর টুটিয়া যাওয়াতে বারিমোত প্রসন্ন জগতের বন্ধে নামিয়া আসিয়া অগ্নান রক্ত-কৌমুদীরই সমতুল্য শীতের প্রফুল্ল সূর্য্যকর যেন স্মিতহাস্যে সকলকেই অভিনন্দন জানাইতেছিল। ইহার প্রতিদানে আবার দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায় সর্বত্রই এই চির-অতিথির আগমনী-উৎসব সমারোহের সহিতই চলিতেছিল।

নীলিমা কাপড় কয়খানা ছাদের প্রাচীরের উপর বেলিয়া দিয়া ধানিকটা দূরের একটা বাড়ীর ছাতের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বাড়ীটা অহুকাদের। সে দেখিতে পাইল, ছাদের উপর অহুকারা তিন ভাই-বোনে কমলালেবু খাইতে খাইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; আর তাহার মা একটা ছোট ডালার ভরিয়া আঙ্গুর, আপেল ও কমলালেবু তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। বুকের কাছে একটা নিখাস আচম্কা জমিয়া উঠিতেই সে চমকিত হইয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল! তাহার ক্ষুণ্ণপিপাসাতুর বুভুক্ষু দেহ-মন কি ■■■ সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষ্যা করিতেও আরম্ভ করিল না কি? পরের সুখ দেখিয়া লোভ করিবে না, এ কথা প্রাণপণে মনে করিতে করিতেও কিন্তু তাহার বিবেকের সহস্র নিষেধ ■■■ মানিয়াই তাহার অন্তঃ নিরানন্দ মন অকস্মাৎ মনে



করিয়া বসিল,—সে-ও যদি অহুকারই আর একটি বোন হইয়া জন্মিত! তপস্যা করিলে যাহুবে গরীবের ঘরে জন্মায় না?

আবার তখনি সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখখানি মনচ্ছকুতে ভাসিয়া উঠিল। কি শাস্ত, কি কোমল, আর কি করুণ সে মুখ! উঃ, নীলিমা কি নিষ্ঠুর!—ও-ই নাকে কি না সে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়া মনে করিতেছে যে, সে যদি মায়ের হইত বৈশ হইত! কেমন করিয়া এমন কথা সে মনেও করিতে পারিল? সে যদি না তাহার মায়ের ঘরে হইয়া জন্মিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি হইত, কে বলিতে পারে? হয় ত মায়ের কাছে তাহার মুখ কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু তাহার মায়ের কি হইত? মা'র মুখ চাহিতে ত আর কেহই থাকিত না! এ কথা ভাবিতে গিয়া তখন আবার মনে পড়িয়া গেল যে, সেই বা তাহার মায়ের মুখ এমনই কি চাহে? এই ত সে মায়ের আদর করিয়া ভাত খাইতে ডাকার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে দশটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া অনায়াসে চলিয়া আসিয়াছে। মা'র প্রাণে তাহার এই ব্যবহারে কতখানি ব্যথা বাজিতে পারে, সে কি তাহা একবারও ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু যদি তাহার ওই মা-ই আবার ও-বাড়ীর ঐ অহুকার মায়ের মত তাহার মুখের সামনে আঙ্গুর-আপেলের ডালা ধরিতে পারিতেন? সে কি তখন সে সব প্রত্যাখ্যান করিয়া মা'র প্রাণে আঘাত দিতে পারিত? লোভ!—হায় রে লোভ! মায়ের স্নেহটা তাহা হইলে আসল জিনিস নয়? সম্ভান তাঁহার নিকট হইতে প্রগাঢ় ভালবাসার অপেক্ষা উত্তম অশন-বসনেরই আকাঙ্ক্ষা অধিকতর করে? নিজের প্রতি তার যেন যুগা বোধ হইল। এমনই সে মা'র কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

“কি গো বিবি সাহেব! হাওয়া খাওয়া বে আর শেষ হলো না?”

দাদার এই স্নেহসম্ভাষণে একান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া নীলিমা মুখ কিরাইল—“তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দাদা?”

ভবেন্দু পূর্ববৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, “ওগো, না গো না, ভয় নেই, তোমার আমি হস্তারক হইনি। যাও, সব ঠিক করাই আছে, কৃপা করে শুধু একটু মুখে তুলে দিয়ে গে যাও।”

নীলিমা কথার ভাবে দাদার মনের খবর জানিতে পারিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি খেলে না কেন, দাদা? যাও, তুমি খেয়ে এস, আমার একটুও আজ ক্ষিদে নেই, বড্ড মাথা ধরেছে। আমি খাবো না।”

ভবেন্দু বলিল, “আহা, মাথা ধরেছে। ম'রে যাই রে? প'ড়ে প'ড়ে বোধ হয়? এসো, বিছানা পেতে দিই গে, গা বেলে শোবে এসো। মাথার গোলাপ-জলের পটা বেঁধে দেবো? হাওয়া করবো নাকি?”

এই বিজ্ঞপের খোঁচা খাইয়া অভিমানে চোখের কোল ভুঁই হইয়া উঠিলেও নতমুখে তাহা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া নীলিমা মিনতি করুণস্বরে কহিল, “কিছু করতে হবে না। লক্ষীটি! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি খেয়ে এস।”

“হঁ! আমি খেলে কি হবে? বরং তুমি খাও গে যে, মাথার মগজে একটু ঘি হবে। আ মল্লো! মুখপুড়ী মেয়ে আবার ভাঁ ক'রে কেঁদে ফেললেন! কাঁদলি তো বড় আমার বয়েই গেল! তোমার মা ধরেছে, তুই কেঁদে মর গে যা। তাতে আমার কি? হঁ, বুঝছি! ও কি আমার খাওয়ারা জন্তে কাঁদছিল? মনে করেছিল, ওই রকম প্যান-প্যান করলে আমি রেগে মেগে চ'লে যাব, আর তখন মজাসে খুব খানিক গুড়-চিনি মেখে নিয়ে গবগবিরে ভাতগুলো সব গিল'বি।—ঐ রে! কিপুটে বুড়োটা ঐ গলির বোড় ফিরলো রে! বাড়ীর দিকেই ত আসুচে না? তুই ত—পালাই।”

ভবেন্দু তিন লাফে সিঁড়ি নামিয়া খিড়কীর দ্বারের দিকে ছুট দিল। আর পথের উপর-বাপকে দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে ছুটিয়া বিপদের সম্ভাবনা একত্র মনে উদ্ভিত হইয়া নীলিমাকেও ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমতঃ বাড়ী ঢুকিয়াই তাহার পিতা একবার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সারাদিনের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ রাসাঘরে না গেলে তাঁহার মন তো স্থিরই হয় না। যদি ইহারা মাঝে-মেয়ে ও ছেলের মিলিয়া সেখানে তাঁহার সকল সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বিশেষ তোজের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া থাকে, তাহারই ‘ডিটেকটিভ’ তাঁহাকে প্রতিদিনই হুই একবার করিয়া করিতে হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই এক এক দিন অকস্মাৎ অসময়ে কর্মস্থান হইতে চলিয়া

আসিতেও হইয়া থাকে। আজ যখন তিনি ঐ কুম্ভাখা ভাত ও রন্ধনকারিণীকে একত্র ঐ স্থানে দেখিতে পাইবেন, তখনকার সেই দৃশ্য মনে করিতেও তাঁহার সর্কাসে কাঁটা দিয়া উঠিল। ছুটির দিনে বাড়ী থাকিলে সে দেখিয়াছে যে, তাহার মায়ের ভাত আজকাল খুবই কম থাকে। যদিও সে অল্পবয়সেই তিনি অ-সুখার দোহাই পাড়িয়া থাকেন, তবুও নীলিমার মনে সন্দেহ হয় যে, ওই যে মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুই ভাই-বোনকে তিনি ভাত রাঁধিয়া খাওয়ান, তাহারই জন্য তাঁহার ঐ অ-সুখাটুকু দেখা দিয়াছে এবং ফলে জীর্ণদেহ অধিকতরই শুষ্ক হইতেছে। এবার হয় ত অপব্যয়ের চাউল বাঁচাইতে গিয়া পিতা তাঁহার জন্য অর্দ্ধাশনেরই ব্যবস্থা করিয়া বুসিবে। তখন তাহার এই প্রথম চিন্তাটাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়া স্কুলের মাহিনার বিষয়-চিন্তাটাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং আত্মগোষ্ঠিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সে নিজের মনকে যেন প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়া ভাবিল—এই আমি! মা'র মনে কষ্ট দিলেম, মা'কে আবার বকুনি খাওয়াব, তাহার উপর আমার জন্য মা'র ভাতেও টান পড়বে! না না, আমি আর কান্নকে চাইনে, আমার মায়ের মেয়েই বেন আমি থাকতে পাই!

উষেগে শঙ্কায় অধীর হইয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

“মা, মা, বাবা আসছেন। কি হবে, মা?”

স্বর্ণলতার নিজের মুখ এ সংগদে শুকাইয়া গেলেও তাঁহার এতকণকার মনঃকষ্টের কাছে তাহাও যেন তাঁহার কাছে ছোট হইয়া গেল। তাঁহার চিরাত্যস্ত অটুট ধৈর্যের সহিত তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্নেহ মুহূর্তে মেয়েকে কহিলেন, “তুমি খেয়ে নাও, নীলা! আমি ওদিকে যাচ্ছি। কি আর হবে, তোমায় কিছু বলবেন না।” এই বলিয়া পতি-সন্তাষণার্থ তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেলেন। কিন্তু স্বর্ণলতার আজ কাহার মুখ দেখিয়া যে রাত্রি পোহাইয়াছিল, বলা যায় না। মহিলে এমন অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় কাণ্ড কখন ঘটে!

“গিন্নি! ওগো ও, বলি কোথায় গো!” এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্রান্ত শীর্ণ চরণকে যতখানি সম্ভব দ্রুত করিতে চাহিয়া গৃহিণী স্বর্ণলতা বলিদানোদ্দেশ্যে আনীত জীববিশেষের মত কম্পিত-কলেবরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নিজের তখন

যত না হইতেছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা হইতেছিল—নীলিমা হয় ■ এই সব গোলমালে মাখা ভাত কয়টা খাইয়া উঠিতেই পারিবে না। শুভেন্দুর কথা মনে হইয়াও তাঁর বক্ষ চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল ও পড়িল। না খাইয়া কোলের ভাত ফেলিয়া ছেলেটা কোথায় যে চলিয়া গেল, আহা, এমন অবুর সে কেন হইল! সহসা অতিমাত্রায় বিস্মিত ও চকিত হইয়া তিনি গুনিতে পাইলেন, তাঁহার কক্ষমহাজ্ঞী কঠিন স্বামী তাঁহার সহিত এ কি আবার রসিকতাও করিতেছেন নাকি?

“ও গিন্নি! নেমস্তন্ন খেতে যাবার জন্যে যে বড় জোর তাগিদ এসেছে, বলি, খেতে যাবে নাকি? তা হ'লে চটপট তন্নিতন্ন সব বেঁধে ছেঁদে নাও গে যাও।”

নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ অবাচ্ হইয়া স্বামীর দৃষ্ট-বিকসিত আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ রকম কথা তো আর তাঁর জীবনে তিনি শুনে নাই যে, এর উত্তর দিবেন!

অনুকূলচন্দ্র হাতের নোটের তাড়াটা দেখাইয়া তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, “বিশ্বাস হচ্ছে না! একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি আর কি! সত্যি গো, মাইরি বসুঁছি, তোমার সঙ্গে রঙ্গ করছি। তোমার সেই ভুগ্ন রান্নাকে মনে আছে, সেই যে একবার ক'বছর আগে এসে গোঁড়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল না? সে-ই তোমাদের বাবার জন্যে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছে, আর এই টাকা-গুলো পাঠিয়েছে গাড়ী-ভাড়া ব'লে। সবাইকার সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া! উঃ, কত টাকাই না জানি ওরা বাজে খরচ করে যে! আহা, মনে একটু দরদও কি করে না গো?”

‘উড়নচড়ে’ লোকগুলার আশ্চর্য্য অপব্যয়শক্তির কথা শ্রবণে আসিতেই ‘মিতব্যয়ী’ অনুকূলের ললাট অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেইক্ষণেই আবার যেমনই মনে পড়িয়া গেল যে, সেই অপব্যয়িত টাকা-গুলো উড়িয়া তাঁহারই লোহার সিন্দূকের ‘দোরগোড়ায়’ আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব এ ক্ষেত্রে সেই মিতব্যয়ী লোকেই তাঁহার আশীর্বাদ-ভাজনই হইতে পারে, অমনি তাঁহার গলার সুরটাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল :—

“তা ভালই করেছে; অনেক হয়েছে, একটু আধটু আর খরচপত্র করবে না! আমাদের মতন



ত আর পাতরচাপা কপাল ক'রে আসে নি, ভাগ্য দিচ্ছে অচেন, ছড়িয়েও ফেলেছে তেরনি দুহাতে। তা দেখ, গিন্নি! তোমরা আর এই দুঃস্থ নীতে কোথায়ই বা যাবে? আমিও ত আর কাজ-কর্ম ছড়িয়ে ফেলে কোথাও যেতে পারবো না। ক্ষেত-খামারটুকু করেছি, রবিগুলো নষ্ট হবে। পাঁজার ইটে আগুন দেওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে চলবেই না। তার পরে মধু মিস্ত্রীর স্ত্রীদটা উত্তল করা নেহাৎ দরকার হয়ে পড়েছে। নৈলে তারাদি হ'তে পারে। আর নেই যেন একটি পরসী, কিন্তু 'স্ত্রী'টুকু ত তার ঘোল আনার উপর আঠারো আনাই আমার পোহাতে হচ্ছে। তা দেখ, আমি বলি কি, ওর জন্তেই পাগল ত; ঐ গোড়া ছোড়া-টাকেই না হয় ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমরা সব থেকেই যাও। গাড়ী-ভাড়ার টাকারটাও তা হ'লে কিছু বেঁচে যাবে। আর গোড়ার এই বয়সে অত নবাবী ত আর ভাল নয়, তাকে একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়া দিলেই চ'লে যাবে।—কি বল?

স্বর্ণলতা ঈষৎ ব্যগ্র হাসিয়া খাড়া নাড়িলেন, “হু”—পরক্ষণেই কি ভাবিয়া লইয়া এই অবসরে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াই কোনমতে বলিয়া ফেলিলেন—“ওই টাকা থেকে তা হ'লে নীলার ইস্কুলের মাইনেটা চুকিয়ে দিলে হয় না? ওরা রোজ রোজ বড়ই তাগিদ দিচ্ছে, বলছে—”

অনুকূলের ‘দস্তকুচি’ আবার ‘কৌমুদী’ ছড়াইয়া বিকসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এবার আর তাহা আনন্দে নহে। ইম্পাত শাণে ঘষিলে বে রকম শব্দটা জন্মায়, ঠিক সেই ধ্বনির সুস্পষ্ট অনুকরণে তিনি কহিয়া উঠিলেন, “কি বলছে, শুনি?”

স্বর্ণলতার দুর্বল স্বপ্নিও ‘ধব্ ধব্’ করিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল, তথাপি তিনি কোনমতে ধরা গলাটাকে সাফ করিয়া লইয়া মুহূর্তে উত্তর দিলেন, “কালকের মধ্যে মাইনে না পেলে ওকে নাকি স্কুল থেকে ওরা ছাড়িয়ে দেবে।”

অনুকূল এবার দাঁতে দাঁতে আবারও একটা বিকট স্বর্ণশব্দ করিয়া বলিলেন, “ছাড়িয়ে দেবে? বটে! হুঁ! আচ্ছা। দেবে কেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে ওদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবো। আর শুধু তাই নয়, সকল মেয়েই যাতে ওদের ঐ

হতভাগা স্কুলটাকে ছেড়ে ছুঁচো-বেটীদের দেশ-ছাড়া ক'রে দেয়, তারই জন্তেই আজ থেকে বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করবো। ইস্কুলে মেয়ে দিইছি, তাই কত না, এতেই তোদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি ব'লে মেনে নে; না হয় আবার তার ছ'টাকা ক'রে মাইনে দেবে না, কচু করবে! আহ্লাদ দেখে আর নি যে!”

পাছে তাহাদের লাগে—এই টাকাগুলিকে সম্বর্ণপনে কোঁচার কাপড়ে ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। সেগুলিকে লইয়া চলিয়া যাইবার অভি-লাষে ফিরিতে গিয়া কি মনে হইল, ফিরিয়া মুখ খিঁচাইয়া জীকে বলিলেন, “আর তুমি মগীও ত কম সমতানী নও! বেই এই ক'টা টাকা চোখে-উপর দেখতে পেরেছ, অমনি ওর বিবি-মাইনে-মেয়ের ওর উপর চোখ প'ড়ে গ্যাছে! আরে বাপু! এই টাকাগুলি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে যদি রাখতে পারি, মধু মিস্ত্রীকে যদি সাড়ে তের টাকা স্ত্রীও কর্ত্ত দিয়ে রাখতে পারি, তবেই না তোমাদের বারো মাসের কুঁড়ো পাথরটি যোগান দেবো। বলে কি না, ‘মেয়ের ইস্কুলের মাইনে দাও!’ মেয়ের উপর যদি টাকা খরচই করবো, তা হ'লে মেয়েকে ইস্কুলে দিলুম কি কর্ত্তে শুনি? একটি পাই-পরসী ওর ওপোর আমি বার করবনি, এটি বেশ ক'রে মেনে রেখে দাও। ওকে নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে হবে।”

টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়া কর্ত্তা তখনও স্বর্ণ-লতাকে সেই স্থানে ও সেই ভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু প্রসন্নতরে (বোধ করি টাকা গোণার শব্দটা কানে ও প্রাণে বাজিয়া রহিয়া-ছিল বলিয়াই) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওর জন্তে তুমি কিছু ভেবো না গো গিন্নি! ও আমি সব ঠিক ক'রে নেবো। নীলার পড়া আমি ছাড়াবো না, পড়াতে ওকে হবে। তবে ও ছায়ের ইস্কুলে কিছু ভাল জিনিস শেখায় না। প্রাইজ ত ওতে নেই বল্লই হয়;—আমি ওকে মিস্ স্কুলের মিসন্ ইস্কুলে কাল থেকেই ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবো। তারা মাইনে ত নেয়ই না, উন্টে শাড়ী, জামা, বই, প্লেট, সমস্তই প্রাইজ দেয়। আবার কেমন সুন্দর বড় বড় ‘ডল’ দেয়, সেগুলো আমাদের দোকানে আধা কড়িতে বেচে এলেও তার একটা দাম

আছে। আচ্ছা, কালই আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভক্তি করিয়ে দিয়ে আসছি।—হ্যাঁ, আর গৌড়াটাও তা হ'লে কালই ওখানের জন্তে রওনা হয়ে যাক। আঃ, এই ছেলেপিলেগুলোই হয়েছে মানুষের বিষম জালা।”

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা গ্রামবাজারে ভুবনমোহন রায়ের প্রাসাদ-তুলা অট্টালিকা। তাঁহার সুদৃশ্য উদ্যানে বহু বদেশীর ততই বিদেশী পত্রপুপের বৃক্ষলতা উজ্জল শোভায় পথিকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। তাঁহার আন্তাবলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, বহুকে ক্রহাম, ল্যাণ্ডো ও মোটর;—তাঁহার অতি মূল্যবান বদেশী বিদেশী গৃহ-লজ্জী প্রভৃতিতে সুরুচি, ধনবস্ত্র ও বিদেশের প্রতি অভক্তি না থাকিলেও বদেশের প্রতি যে যথেষ্ট পক্ষি-মাণে ভক্তি আছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিত। বিশেষ যত্নপূর্বক কাশ্মীর, লাহোর, মুজাপুর, নোরাদাবাদ, কাশী ও মাদ্রাজ প্রদেশীয় অপূর্ব শিল্পসম্ভার যতদূর এ দেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশের আপাত-মনোরম নিকৃষ্ট ও সহজলভ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ পরি-পূর্ণ না করিয়া সযত্নে আহরণ করা হইয়াছে।

ভুবনবাবুর পৈতৃক বাটীতে যদিও এতটা ঐশ্বর্যের সমাবেশ ছিল না, তথাপি সেই পুরাতন ‘এজমালি’র সম্পত্তিকে তিনি কালের হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে সাহায্য করেন নাই। এ বিষয়ে অনেক বড় বড় নামজাদা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদের পৈতৃক-গৃহ হইতে তাঁহার পৈতৃক-গৃহকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে।

সে বাটীও সুবৃহৎ। যদিও তাহা উদ্ভানবেষ্টিত নহে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে বহুদূর-বিস্তৃত প্রকাণ্ড কলের বাগান অমূল্য ও কলের ভাণ্ডাররূপে বারো মাসই গৃহস্থ পোষণ করিয়া আসিতেছে। উদ্ভানে স্বান-পানের একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে; তাহা সযত্ন-রক্ষিত সুসংস্কৃত। বাসন মাজিবার অপূর্ণ ক্ষুদ্র পুকুরি বা ডোবা এই উদ্ভানের এক পার্শ্বে অবস্থিত। তাহা হিঙ্গা, কমলী, পানা, পানিকল এবং শরৎপ্রারম্ভে কুমুদকল্লার ও সুনীল বর্ণের পানা-ফুলে ঋচিত হইয়া থাকিত।

বাটীর সদরদরজা পার হইয়া সুপ্রশস্ত অঙ্গন,

ইহার পার্শ্বে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সাত আটটা সিঁড়ি দিয়া মণ্ডপে উঠিতে হয়। পুরাতন হর্য্যা-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-রূপ আট-পলে জোড়া খাম, খামের মাথায় বিচিত্র পশুপক্ষী, খিলানসমূহে নানাবিধ লতাপাতা ও জালির কাষ। এই অঙ্গনের দক্ষিণধারে সারি সারি বৈঠকখানা-ঘর, তাহার সম্মুখে দৌড়বার টানা দালান। ঘরগুলি সেকালের প্রথা-মত নীচু-চৌকির উপর ঢালা বিছানায় সজ্জিত। ছিটের জালির উপরে দুই একটা করিয়া তাকিয়া-বালিস রাখা। তাকিয়াগুলি অবশ্য সেকালের চেয়ে একালে হুসাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তা মানুষগুলিই কি হয় নাই?

এই বাড়ী এখন বিয়ে-বাড়ী। গৃহস্থানী ভুবন-বাবুর জোষ্ঠা কস্তা তরুলতার বিবাহ এই কাস্তন মাসেই স্থির হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভুবন-বাবুরা সপরিবারে তাঁহাদের পল্লীগৃহে আগমন করিয়া-ছেন। যদিও এখনকার প্রথা-মত এই গ্রামের বাটীতে না আসিয়া তাঁহার সুধৈর্য্যমণ্ডিত কলিকাতার বাটীতে বিবাহ দেওয়াই সম্ভব ছিল, তথাপি বিষয়ে আধুনিক হইলেও ভুবনবাবুর কতকগুলি সেকালে যতামত ছিল; তাহার মধ্যে একটি এই পল্লীপ্রীতি। সর্বদা কলিকাতার থাকিলেও প্রতি বৎসর পূজাবকাশে তিনি তাঁহার অজ্ঞাত সমগদহ ব্যক্তিগণের জ্ঞান সিমলা, দার্জিলিং বা মধুপুর বাজা না করিয়া পৈতৃক আবাসে আগমন করেন। বাটীতে তাঁহার যথেষ্ট সমারোহের সহিত জুর্গোৎসব হয়। কলিকাতার থাকিয়া অর্ধোপার্জন করিতে শিখিয়াও ভুবনবাবু সেই পৈতৃক পূজা উঠাইয়া দেন নাই, বরং মহার্ঘ্যতা বৃদ্ধি পাইলেও সযত্নে সেই পুরাতন রীতি যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ভুবন-বাবুর পিতা অন্নবাবুর আমলে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ইত্যরত এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত। এ দিনে গ্রামবাসী তত্ত্বগণ অধিকাংশই দেশত্যাগী; তবে পল্লীবাসী অপর সকল ব্যক্তিরই এই তিন দিন বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বারণ আছে। এই দেশভক্তি পল্লীপ্রীতিই কলিকাতানিবাসী ধনী ভুবনবাবুর কস্তার বিবাহ পল্লীগ্রামে ঘটাইয়া তাঁহার অনেক ধনী ও শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের মনোহর করিয়াছে। কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁহারা ত এখানে আসিতে পারেন না।



## গরীবের মেয়ে

ভুবনবাবুর এতদূর সুখের কথা শুনেও তাঁহার সংসার শ্মশান। গৃহলক্ষ্মীশূন্য নিরানন্দ গৃহস্থালী মরুভূমির মতই সুখশূন্য। প্রথম উত্তরের মুখে এত বড় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনস্রোত আহত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যগুণে তিনি নিজেকে ছন্নছাড়া ও নিকর হইতে অবসর দেন নাই। বাহিরের প্রেমসীকে অন্তরের মানসী প্রতিমা-রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কট-সঙ্কুল যৌবনকাল তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণ আজ তো না হয় অবসানের পথেই নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণে এই ধনী ব্যক্তিটির এই ইচ্ছাকৃত ত্যাগের মূল কোথায় খুঁজিয়া পাইত না। বিশেষতঃ তাঁহার অকালকালকবলিতা পত্নী চাক্ষুশীকে দেখিতে একে-বারেই সাদাসিধা ও অতি সাধারণ ছিল। কলিকাতার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অভিতাবিকারূপে ■■■ বালবিধবা ভগিনীটি বাস করিত, এখন তাহারও বয়স চল্লিশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নাম তাঁহার সরোজিনী। সরোজ পাঁচ জনের অমুরোধে তাইকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারে গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার কথা একবারমাত্র বলিতে গিয়া যে উত্তর দাদার নিকট হইতে পাইয়াছিল, তাহার পর আর কেহ দাদাকে বিবাহের কথা বলিতে অমুরোধ করিলে জিত্-কাটিয়া সে সময়ে উত্তর দিত, “বাপু রে! আবার আমি বলবো? বলতে হয় ত তোমরা বল গে—আমি আর এ জন্যে কখন বলতে যাচ্ছিনে।”

সরোজিনীর দাদা তাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—“আমার কেন বিয়ে করতে বল্ছি? আমিও তা হ’লে তোকে বিয়ে করতে বলবো, মনে মনে তোমার এই ইচ্ছা আছে, না?”

সরোজ রাগ করিয়া বলে, “তুমি কি যে যা তা কথা বল। ও কথা কি কখন মুখে আনতে আছে?”

দাদা বলেন, “মুখে নেই থাক, মনে তো আনতে আছে? না হ’লে আমাকেই বা তুই কোন্ হিসাবে এমন কথা বলতে পারুলি?”

সরোজ বলিল, “আমাকে আর তোমাকে?”

ভুবন বলিলেন, কেন, “তুই আমার চাইতে বয়সে ও বিজ্ঞাবুদ্ধিতে এতই শ্রেষ্ঠ যে, তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না?”

সরোজ মুখ লাল করিয়া জবাব দিল, “নাও। তাই

কি আমি বলেছি? তুমি যে বেটা ছেলে।—বেটা ছেলে তো হ’বার ছেড়ে চারবার বিয়েও করে, তুমিই বা আর একবার না করবে কেন?”

তত্বত্বের ভুবনবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, “কোন কোন বিধবা শুনি লুকিয়ে লুকিয়ে মাহ খায়, তুইও কি তাই খাবি? ওই ও বাড়ীর গেড়ী ডাক্তার যখন তিনবার বিয়ে করেছে, তখন তুইও কেন আর একটবার কর না?”

সরোজিনী বিপর্য্যভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ধাম তুমি! আর আমি কখন যদি তোমার বিয়ে করতে বলি তো”—কিন্তু তার দাদা তখনই থামিলেন না, তিনি তেমনই সহাস্ত-মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “আমি তিন ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে যদি বিয়ে করতে পারি, তা হ’লে তোর তো একটাও ছেলে-মেয়ে হয়নি, তোর বেলা তো মোটেই দোষ হ’তে পারে না। আজকালকার মেয়ে-পুরুষে যে ভেম্বুকিটা উঠে যাচ্ছে; তুই-ই বা কেন চিরকাল ধ’রে একাদশী ক’রে মরবি বল তো, তার চেয়ে—”

সরোজিনী উঠিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে—“বাট মানলুম, তবু হলো না?—বল্ছি তো আমি আর কখন তোমার এ কথা বলবো না”—বলিতে বলিতে ক্রতপদে পলাইয়া গেল।

সেই অবধি ‘বাহির হইতে যত বড়ই উপজীব আহুক না কেন, ঘরের মধ্যে আর তাঁহাকে উপজীব হইতে হয় নাই। নির্বিবাদে নিজের কনট্রাক্টরীর কাজকর্ম দেখিয়া শুনিয়া স্বদেশী বিদেশী দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চায় ভুবিয়া থাকিয়া ভুবনবাবুর দিন সুখে না হউক, খুব দুখেও কাটে নাই। ছেলে-মেয়েদের তিনি ■■■ রের সহিতই ভালবাসিতেন। ছেলেটি যাহাতে তাঁহার উচ্চাদর্শ লইতে পারে, মাহুষের মত হইয়া মাহুষ হয়, এইটি বলিতে গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহারই ■■■ সর্বপ্রযত্নে তিনি নিজের বিশ্বাস ও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিয়া আসিতে-ছিলেন। মেয়ে দুইটির নাম তরুণতা ও বিনতা—একমাত্র ছেলের নাম সুনীলকুমার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার সংসারে সরোজিনী গৃহ-কর্ত্তী হইলেও দেশের সংসারের কর্ত্তব্য বাহার উপর স্তম্ভ, তিনি ভূবন-বাবুর জ্যেষ্ঠাইমা। বয়স তাঁহার সত্তরের উপর। মাথার চুলগুলির মধ্যে কালের আঁক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখনও আঁখের টিকলী চিবাইয়া খাইতে পারেন। প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গামান করিয়া আসিতে এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ-বোধ হয় না এবং নিজের সংসারের দেবতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ-পালিত পশু হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী, প্রতিপাল্য আত্মীয়-স্বজন ও আতুর শিশু পর্য্যন্ত সকলেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আবার শুধুই ঘরের কর্ত্তব্য করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি নাই, পড়শী-বাড়ীর কোন্ শিশুটির পেটে প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বুকে পিঠে ‘কড়া’র জন্ত মাংসজার আঠা দিয়া দাগ দিতে হইবে, কাহার ঘুড়ি টোটকা চাই-কোন্ অল্পবয়সী দরিদ্র বিধবার জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, তাহার জন্ত তাহাকে দিয়া পৈতা তুলাইয়া কিনিয়া লওয়া, চরকা কাটাইয়া সেই সূতা চাকরের হাতে জোলায় বাড়ী বেচিয়া দেওয়া এই সমস্ত বেগার খাটিয়া বেড়াইতেও তাঁহার কখন আলস্য ছিল না। খাইয়া দাইয়া নভেল লইয়া পড়িতে বসি, ভাস-পাশা বা দিবা নিদ্রায় গা ঢালিয়া দিয়া সকল কার্য্যই সময়ের অভাব বোধ করা তাঁহার সেকালে হাড়ে সহিত না। শান্তদী-বধুর মনের অমিল চলিতেছে, রায়-গৃহিণীর কাণে উঠিলে অমনই তিনি সেই বাড়ী যান; উভয় পক্ষকে মিষ্টবাক্যে, কখনও সম্মেলন তিরস্কারে, নানারূপ উদাহরণ প্রদর্শনে ঠাণ্ডা করিয়া আইসেন। শান্তদীকে বলেন, “সে কি বউমা! তোমার গোপালের বউ, তোমার কত আদরের ধন, তাকে নিয়ে যদি সুখী হ’তে না পেলো, তা হ’লে তোমার সংসারই বা কি, অরণ্যই বা কি? না না বউ, এও কি একটা কথা হলো? এই বেলা সামলে নাও, দেশে না শোনে। লোকে তো ওই সব গৃহ-ছিদ্রই [ ]। সামনে এসে ‘আহা’ব’লে আত্মীয় জানাবে, আড়ালে গিয়ে হাসবে। তুমি মা, একটু সয়ে যাও. আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।” তাহার পর বধুর কাছে বাইয়া তাহাকে বলেন, “ওলো নাতবৌ! মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া কেন লো? বলি, ‘একটি পান কি ফোঁফুঁড়া’ পেয়েছিলি নাকি? নে তাই, শান্তদীকে গড় ক’রে পারের ধুলো তুলে মাথায় দে’। সর্ব্বরক্ষে! শান্তদীর মুখের উপর

চোপা কি করতে আছে? নিজের গর্ভধারিণী আর সোয়ামীর গর্ভধারিণীতে কি ‘করক’ আছে লো নেকি! দশ দিন ঘর কর না; তখন দেখবি, আবার সে-মাকে ছেড়ে আসতে যেমন প্রাণ কাঁদে, একে ছেড়ে যেতেও তেমনি হবে।”

গ্রামসুদ্ধ ছোট এবং বড়, ঈতর এবং তত্র সকলেই তাই এই প্রশস্তদ্বারা উদার-চরিত্র। গৃহিণীর একান্ত বশীভূত।

ভূবনবাবু এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বাড়ীতে একটা সন্মারোহ বিবাহ উপস্থিত। বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, আর ভূবনবাবুর জ্যেষ্ঠাইমার তো বিন্দু-মাত্রও অবকাশ নাই। ও দিকে রায়বাড়ীর উঠানে বড় আটচালা বাঁধান, রায়ার জন্ত জোয়াল কাটান, জিয়ান-ঘর সাফ করান, নিত্য-যজ্ঞের [ ] ধামা ধামা ডালের বড়ী তৈয়ারী করা ইত্যাদি শতবিধ কার্য্যে তিনি এই বৃদ্ধবয়সেও চরকির মত পাক খাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে আঁচলে চোখের জল মুছিয়া যাহাকে তাহাকে বলিতেছিলেন, “আজ যদি আমার বড় বৌমা বেঁচে থাকত!”

যথাকালে কলিকাতা হইতে সকলে আসিয়া পৌছিলে রায়-গৃহিণী তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—“এস বাবা এস,—আমি মা, সরোজ! আর, অমন রোগাটি হয়ে গেছিস কেন গো মা? সুশীল! ভাল আছ ত তাই? কি গো আমার তরু-রাণি!—তরুণি! বলি এত দিনে তোমার ‘তরুণে’র সন্ধান মিলে তো হ’লে? মনে মনে খুব আহলাদ হচ্ছে, না?”

তরুণতা ঠাকুরমার এই স্বাগতসম্ভাষে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে পারের উপর একটা মুছ রকমের চিম্টি কাটিয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিল, “বাও—তোমার আহলাদ হচ্ছে কি না?”

ঠাকুরমা তাহার দাড়ি ধরিয়া চুমা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার আহলাদ তো একশোবারই হচ্ছে লো! তা ব’লে তুই কি আর তা’ থেকে বাদ পড়ছিস, বোন? তা’ তরুর আমার তরুণটি কেমন হচ্ছে না বিনুতা?”

বিনতা নিজেকে গহনার বাসন্তী তখন তাহার সেজ কাকীমার জিন্সার সঁপিয়া দিতে ছিল। সে এই সময় কাছে আসিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতে করিতে



বলিল, “এতক্ষণ পরে বিনতার কথা হ’ল হলো মেয়ের! বলবো না তো অনেক ক’রে এখন আমার খোসামোদ না করলে।”

ঠাকুরমা চকলা ছোট নাতনীকে নিজের গায়ের উপর টানিয়া লইয়া তার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, “ওলো ছুটু! তোর তো আদরের দিনই নিকট হয়ে এলো লো! দিদি পথ ছেড়ে দিচ্ছে তো এইবার, আবার ছ’মাসের মধ্যেই তোর আদর বেশী ক’রে ক’রেই করা যাবে তখন। এখন বল তো, বোন, আমার তরুর বরটি কেমন হচ্ছে?”

বিনতা হাসিমুখে হাত পাতিয়া বলিল, “কি দেবে আগে দাও, তবে তো বলবো? নইলে শুধু শুধু তোমার বলতে বাব কেন?”

ঠাকুরমা তার ভরাগালে আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া বলিলেন, “ও মা! ছুটু মেয়ের রকম দেখ! ওলো! দোব, দোব, লীগ গির একটি রাজা বর এনে দোব, ছটো দিন একটু সবুর কর।”

বিনতা এদিক্ ওদিক্ মাথা ফিরাইয়া দেখিল, কাছাকাছি কোন ঝুঞ্জান নাই, সে তখন ফটু করিয়া বলিয়া বসিল, “কিন্তু ঠিক রাজাবরটিই আমার চাই, দিদির মতন যেন একটি কালো বর এনে জুটিও না, তা এখন থেকেই বলছি—থবরদার! দেখো!”

ঠাকুরমা ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “কেন, দিদির বর কি কালো হলো? তোরা না তাকে দেখেছিস?”

বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, “দেখেছিই তো, তিনি নিজে কনে দেখে পছন্দ ক’রে বিয়ে করবেন পণ করেছিলেন, কালো বউ করবেন না, প্রতিজ্ঞা।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “তা কি বড্ড কালো? তরুর অপছন্দ হয়নি তো? ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলি? হ্যাঁ তরুদিদি! বরকে মনে ধরেছে তো?”

“যাও, আমি দেখিনি।” বলিয়া লজ্জার বাড় ঝাঁকাইয়া তরু মুখ ফিরাইয়া রহিল। বিনতা তাহার হইয়া জবাব দিল, “আহা, তোমার তরুদিদির যা পছন্দর ছিরি গো, ওটা তো একটা জড় পদার্থ! ও পিসীমাকে বরো কি জানো? বরো, বাবার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন নিশ্চয় ও-ই ভালো। বাইরের রূপ থাকলে আমার হয় তো চোখে বেশী ভালো লাগত, কিন্তু ভিতরের গুণ কি আর আমি বেশী তুলিয়ে বুঝতে পারতুম? ওঁরা আমাদের চাইতে শত

গুণেই তো বেশী বুঝেন, ওদের কাছে এক দিনে যেটা ধরা পড়ে, আমাদের তাতে অন্ততঃ আট বৎসর লাগবে। কি মজার কথা রে! আমি তা ব’লে সব শুনিছিনে, বাপু, আমি এই স্পষ্ট ব’লে রেখে দিছি, আমার কিন্তু ওরকম গয়লার গাইটি নিয়ে কিছুতেই চলবে না। তা হ’লে আমি বিয়েই করবো না?”

ঠাকুরমা তরুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ‘সাবিত্রী-সমানা হও’ বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “ও আমার ছোটকাল হ’তেই বড় ধীর, বড় বুদ্ধিমতী, তা দিদির যদি কালো বর মনে ধরে তো তোরই বা মরবে না কেন, তুনি? তুই কি দিদির চাইতে বেশী সুন্দরী?”

কিন্তু সুখ্যা বিনতাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। সে-ও তৎক্ষণাৎ এ যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিল, “সুন্দরী নই বলেই আমার সুন্দর চাই গো। কেন, দিদির বর নিজে দেখতে ভালো নয় ব’লে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সুন্দর মেয়ে না হ’লে সে বিয়ে করবে না। তা ওঁরা যখন নিজেরা দেখতে খারাপ সুন্দর বউ চান, তখন আমাদেরই কি আর কালো হ’লে সুন্দর বরের সাধ যায় না?”

বিনতাদেরই সমবয়সী তাহার কাকার একটি মেয়েও কালো বরে পড়িয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ বিনতার কথার সাথ দিয়া বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছিস, বিনা! আমরাই বা ছাড়বো কেন? কেন, আমরা কি আর মানুষ নই? ওঁরা সগাই চান রূপসী কনে, তার আমাদের দেখে মুখ সিঁটকে ফিরে যান, আমরাও যদি সেই পণ ধরি, তখন কেমন মজাটি হয়? কালো বর-গুলি তখন কোথা থেকে রূপসী বিয়ে ক’রে ক’রে বরে আনেন দেখি।”

ঠাকুরমা হাসিয়া কেলিয়া বলিলেন, “এই সব মেয়েদের বড় ক’রে রাখার কল হচ্ছে, আর কি! তা এদের ত বেশী বেশী স্বাধীন হ’তে দিলে ওই রকমই তো হবে। এর পরে দেখছি, পছন্দ করতে করতে মেয়ে-পুরুষে আর মোটের উপর কাককে কাক বিয়ে করা হয়েছে উঠবে না। আমাদের দেশের তিনভাগ লোকই ত কালো। আবার তার ওপর জাত, জন্ম, কুলশীল বাছতেও তো হবে; তবে আমাদের মতন এক-কার ক’রে ফেললে অবশ্য ছ’পাঁচটা মিললেও হয় তো মিলতে পারে। কিন্তু একাকার ক’রেও তো বাপু ব্রাহ্মণ-মেয়েদের বিয়ের অভাব বেড়েছে ভিন্ন কমেনি

দেখতে পাচ্ছি। অথচ হিন্দু-সমাজে কালো, কুৎসিত কেউ কখন পড়েও নেই এবং রূপের ক্ষতও কই কেউ ■■■ বা কনেকে ত্যাগ করেছে, তাও তো বড় একটা শুনিনি বা দেখিনি। বরং মহা মহা রূপসীকেও গুণের অভাবে স্বামিত্যক্ত হয়ে থাকতে চোখে দেখেছি। কালে কালে কতই হ'ল!”

বিনতা তখন ঠাকু'মাকে সান্তনা দিয়া এই কথা বলিল, “ওগো, অত বড় ক'রে দীর্ঘখাস ফেলতে হবে না গো! সকল কালেই তোমার ‘তরুদিদির’ মতন মেয়ে জন্মে এক রকম সামঞ্জস্য ক'রে চালিয়ে নেবে। শুধু আমার মতন পাষাণবাই তো আর এ কালে একলা জন্মাবে না।”

এমন সময় ভুবনবাবু আসিয়া বলিলেন, “তরু মা! আমার হাত-বাগের চাবিটা দেবে এস ত।”

অগত্যা এই তরুহ বিষয়টাকে অসীমাসিত রাখিয়া তখনকার মত সভাভঙ্গ করিতে হইল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে শুভ বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছিল। এখন শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়, গলিতপত্র শীতশীর্ণ বৃক্ষলতা নবকিসলয়ে আপ্রাণত ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। উহার কোথাও কোথাও নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছও অতি উজ্জল ও বিচিত্র শোভায় দিক্ আলো করিয়া আছে। বিরলমলিলা দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলিতে জলজ পুষ্প আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু জলের মূর্তি সহজেই চোখে পড়ে, গ্রামের মধ্যে মধ্যে অদূরবিস্তৃত শস্তক্ষেত্র শুভ্র মূলকফুলে, হরিদ্র সরিষা-কুম্ভমে এবং উজ্জল বেগুনী বর্ণের কড়াইগুটির পুষ্পগুচ্ছের প্রাচুর্য্যে অপূর্ব সুন্দর মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তন্নিম্ন আলুক্ষেত্রের আশে-পাশে রক্ত ও পীত বর্ণযুক্ত কুম্ভকুলের ক্ষেত্রগুলি সকল শোভায় যেন আধার হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তভাগে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর— গোচারণের মাঠ। মাঠের ইতস্ততঃ কতকগুলি বিশালকায় অশ্বখ, বট, তিস্তিড়ী ও পাকুড় বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে এক আষটী শিরীষ, সেগুন, ছাতিম এবং আম-কাঁঠালের গাছও ইহাতে আছে। ইহার পশ্চিমদেবের বিশ্রামস্থল হয় ■ রৌদ্রকান্ত চরণশীল

গাভীদিগকে আশ্রয় প্রদান করে; ইহাদের তলার বসিয়া রাখালবালকেরা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া পুরাকালের গোষ্ঠলীলা স্রবণ করাইয়া দেয়; ইহাদের অনতি-উচ্চ শাখায় দড়ি দিয়া দোলনা প্রস্তুত করিয়া গ্রাম্য বালকবৃন্দ সানন্দচিত্তে দোল খায়। এই গ্রামের অনতিদূরে একটি নদী। নদীর অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, ইহার স্থানে স্থানে চর দেখা দিয়াছে, নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসিতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের রেলপথবিস্তৃতি ও খালকর্তনের গুণে এমন অবস্থা প্রাপ্তি অনেক নদীরই ভাগ্যে ঘটিতেছে, তথাপি নদীতীরবর্তী সুসমৃদ্ধ গ্রামের শোভা যে কোন সৌধ-অট্টালিকাবিবৃতি নগরীর তুলনায় শতগুণেই শ্রেষ্ঠ। শুভ্র জলধারার পরপারে শান্ত নিখুঁত ভ্রামল তরুরাজি, পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যেন চিত্রাঙ্কিতবৎ শোভা পাইতেছে। কচিং তাহাদের বুক চিরিয়া একটি বহু প্রাচীন প্রশস্ত চাতাল ও শিবমন্দিরসম্বিত বাঁধাঘাট নানিয়া আসিয়াছে। এ পারের মেটেঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ডাকার বটবৃক্ষের তলদেশ সানবাধান। গ্রামের সেটি বটীতলা। অদূরে জমিদার-বাবুদের দ্বারা সন্তুঃসংস্কৃত বহুপুরাতন শ্রাশানেশ্বর শিবের অতি বৃহৎ মন্দির ও ভোগঘর, ইহারই এক পাশে পূজারীর থাকিবার দুইখানি খড়োচালা। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসেই এখানে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া নদীতীরে মেলা বইসে, শিবের মাধার ■ চালিতে চারিদিকের গ্রাম ও পল্লী সকল হইতে দলে দলে লোক আইসে। চম্পক-চামেলীর ও কচি বিষপত্রের ভারে শ্রাশানেশ্বরের বিশাল মূর্তিটিও তখন চাপা পড়িয়া যায়। এক্ষণে কেবলমাত্র দুই চারিটি শুষ্ক বিষপত্র ও কয়েকটি কুম্ভ ■ ক্ষুদ্রজাতীয় গান্ধী লিঙ্গমূর্তির পিনাটের উপর পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্রাশানযাত্রীরাই শুধু এক একটা প্রণাম করিয়া যায়।

শুভেন্দু বিবাহবাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। নিজের সমবয়সী অথবা অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, এমন কি, দুই চারিটি বালিকাকে পর্য্যন্ত নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া সে সারাগ্রাম ও গ্রামান্তর পর্য্যন্ত ভোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার সুন্দর চেহারায় এবং নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে বোধ করি কোনরূপ সন্দোহনের সম্ভাবনাও



নিহিত ছিল; দুই দণ্ডের পরিচিত সকলেই একবাক্যে যেন কতকালের দলপতির মত তাহার বশতা স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া সেই আকর্ষণী শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া বোধ করিতে পারে নাই। ইহাদের দ্বারা নির্বিরোধে শুভেন্দু অনেক প্রকার অকর্ম-চক্ষুর সাহায্য পাইতেছিল, সাজা পান ও আচার চুরিতে ইহারাই সকলের অগ্রাভিনী। এই দলের মধ্যে ভুবনবাবুর ছেলে সুশীলকেই শুভেন্দু বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। সুশীল শুভেন্দুর ঠিক সমবয়সী হইলেও এবং স্কুলের পড়ায় এ পর্য্যন্ত ভাল ছেলে বলিয়া গণ্য হইতে থাকিলেও এবার এই শুভেন্দুর শুভাগমনে তাহার নিজেকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ও নিতান্তই নিকোষ বলিয়া মনে হইল। কলিকাতায় সে এক প্রকার বন্দিশায় কাল কাটায়। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা হইতে রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটিই তাহার একই নিয়মমুত্রে গ্রথিত হইয়া একখানা কটিনের লেখার মত হইয়া আছে, ইহার একটি দিনের নিয়মও কখন উলোটপালট হইতে পায় না। আজও সকালে সেই মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসা, পাঠশেবে চাকরের হাতে তেল মাখিয়া সাবান ঘষিয়া পরিপাটি স্নান ও অত্যন্ত সাবধানতাপূর্ণ ভাবে অর্থাৎ তেল, ঝাল, টক ও সস্তা দামের তরিতরকারি, মৎস্ত, ফল সমস্তই বর্জন করিয়া রোগীর পথ্যামুদিতভাবে গুরুজনের শাসন-দৃষ্টির তলে তলে আহার-কার্য্য সমাধা এবং গাড়ী চাপিয়া মাষ্টারের সঙ্গে স্কুলে গমন। বাকী দিনটার ইতিহাসও এই পূর্বাঙ্কের সহিত নেহাৎ বেখাপ্পা নয়। খেলার যেটুকু অবসর সে পায়, সেও এক আনন্দ-উৎসাহবিহীন প্রাণহীন খেলা। বাড়ীর ক্ষুদ্র 'লেনে' মাষ্টারশাই, বাবা এবং বাবার বন্ধু এক আধজনের সঙ্গেই আর সব বিষয়ের মতই সে খেলা সীমাবদ্ধ,—পিংপং, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, কখন বা ঘরের মধ্যে বিলিয়ার্ড টেবলে এমনই নিকরুসাহে বিলিয়ার্ড বল লইয়া ছোড়াছুড়ি। ভুবনবাবুর একটি ভাই যুবাবয়সে ফুটবল খেলিতে গিয়া গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইল ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই পর্য্যন্ত এ পরিবারে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর হাড়ডুডু, গুলিডাঙা এ সব এখনও ছোটলোকের ছেলেরা কদাচিৎ খেলিতেছে বটে, তবে আশা আছে যে, দুই দিন পরে তাহারাও আর খেলিবে

না, টেনিস খেলাই বোধ করি আরম্ভ করিবে। কাজেই সুশীলের নিগড়বদ্ধ জীবন পল্লী-স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার শুভেন্দুর মত এক জন সর্বিবিদ্যায় বিশারদ সঙ্গী লাভ করায় তাহার মন পরম সুখে নৃত্য করিয়া উঠিল। যদি বা এ কদিন পিসীমা, দিদি, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি অশেষবিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহার স্নানাহারটাকে কতকটা নিয়মিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শুভেন্দুর শুভাগমনাবধি আর কালারও সাধ্যো তাহাকে আঁটিয়া উঠা সম্ভব হইল না।

বাড়ীর বড় পুকুরিণীতে সচরাচর বাহিরের লোক স্নান করিতে পায় না। বাড়ীর বাবুরা বা বধু ও কন্যাগণ স্নান করিয়া থাকেন। আজকাল বিবাহবাড়ীতে এ নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, এখন দিবাগাত্রিই নিমজ্জিত-নিমজ্জিতাগণের দ্বারা পুকুরিণীর জল আলোড়িত হইতেছিল। কলিকাতাবাসী সুশীল ইতঃপূর্বে বাটা আসিলে নদীর তোলা জলেই স্নান করিত। পুকুরে নাষিয়া স্নান করায় তাহার মনেও বিলক্ষণ আছে এবং বাড়ীর লোকেরও নিষেধ ছিল। শুভেন্দু আসায় সে ভয় ও নিষেধ কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার আর কিছুই ঠিকানা পর্য্যন্ত রহিল না। প্রথম দিন সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া ঘটি করিয়া মাথার জল পড়িল, দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দুর বিশেষ সাহায্যে ডুব দিয়া স্নান হইল, তৃতীয় দিবসে পল্লীর অন্তান্ত বালকদিগের সহিত সমান পান্না দিয়া সুশীল পুকুরিণীবাসী মৎস্ত, শয্যু ও কর্কটকার দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বাড়ীর লোকের তাড়নার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার চেষ্টায় পরামর্শ করিয়া এক দিন তাহারা নদীস্নান করিতে গেল। সে দিন তরুর 'গায়ে হলুদ'। বাড়ীর লোক সেই সব ব্যাপারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। ইহারই ফাঁকতালে সুশীল এই নদীযাত্রীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে বিশেষভাবেই সুবিধা পাইয়াছিল। নতুবা হয় তো তাহার গমনে বাধা পড়িত।

সাঁতার দিতে শুভেন্দুর যুড়ি প্রায় খুঁজিয়া মিলে না। কোন্ বিছাটারই বা তাহার অভাব আছে! সুশীলের খুড়তুতো ভাই মলিকুমারের সহিত "বাচ" লাগাইয়া সে মাকনদী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিল, সুশীল তখনও ভরসা করিয়া জলে নামে নাই। শুভেন্দুর মতলব ফাঁসিয়া গেল। মিছামিছি নিজের হার

স্বীকার করিয়া লইয়া সে সলিলের পাশ কাটাইয়া ফিরিল। চারিদিকে ছবুরে ধ্বনির মধ্য দিয়া দৃকপাত-শূন্যভাবে তীরে উঠিয়া সে স্রুশীলের নিকট আসিলে নিতান্ত ভ্রমমাণভাবে স্রুশীল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “সলিলদার কাছে তুমি হেরে গেলে? কিন্তু তুমিই তো তখনও অনেকখানি এগিয়েছিলে, হার স্বীকার ক’রে নিলে কেন? ও কক্ষনো অতদূর যেতে পারতো না।”

শুভেন্দু জ্ব কুণ্ঠিত করিয়া জবাব দিল, “তুমি জলে না নেমে সংএর মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাইতেই তো আমার শুধু শুধু হার মেনে নিয়ে ফিরে আসতে হলো। তুমি একেবারেই ‘গুড-কন্-নথিং বয়’!”—

এই ইংরাজী গালিটুকু সে তাহার সম্বন্ধে অনেকের মুখেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন সেটা নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, আজ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া এক হাত লইল।

স্রুশীলের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, বাড়ীতে তো কথাই নাই। এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে সে শুনিতে পার নাই। কাজেই মনে মনে রাগিয়া সে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া জলে নামিল এবং প্রায় আবক্ষ জলে পৌছিয়াই গভীর জলের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গেই ডুবিয়া গেল।—সেখানটায় একটা গভীর খাদের মত গর্ত ছিল।

এই অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় - ঘাটভরু ছেলের দল অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেকেই আবার, স্রুশীল এটা ডুব দিল কি ডুবিল, তাহারও কোন স্থিরতা করিয়া উঠিতে পারে নাই, এমন কি, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাহবা, স্রুশীল!”

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শুভেন্দুর একটুও বিলম্ব ঘটে নাই, সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল এবং খানিকটা পরে অনেকখানি জল খাইয়া প্রায় অবসর স্রুশীলের শিথিল দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া কোনমতে তাহাকে উদ্ধার করিল। শুভেন্দু ও সলিলে মিলিয়া যখন স্রুশীলকে তীরে উঠাইল, তখন স্রুশীলের সমস্ত দেহ পাক্কাশবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার হাত-পাগুলো শীতে নীল মাড়িয়াছে, দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বাইতেছে, পেটের

মধ্যেও কিছু জল গিয়াছে; তবে সেটা খুব বেশী নয়। শুক্র, ভয়াকুল সঙ্গীর দল এতক্ষণে কিছু ভরসা পাইয়া একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল, “বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার।” কেহ বা প্রস্তাব করিল, “একখানা ডুলি আনাতে হবে।” সলিল গুরুমুখে কহিল, “কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র কি ভয়ানক যে চ’টে যাবেন, সে বলবারই নয়।” এই সম্ভাবনাটার আসন্ন ভয়ে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দুই এক জন বালক বার্তাবহের কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া বাড়ীর পথে পা বাড়াইতে বাইতেই স্রুশীলকে লইয়া অভ্যস্ত ব্যতিব্যস্ত শুভেন্দু তাহাদের হুকুম দিয়া বলিল, “খবরদার! এ সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কারুর মুখ থেকে বার হ’তে পর্য্যন্ত না পায়! স্রুশীল! এই স্রুশীল! তোর কি ডুলি চ’ড়ে বাড়ী যাবার সাধ হচ্ছে না কি রে?—দ্বিদির বয়ের মতন?”

ইতিমধ্যেই স্রুশীল অনেকখানি সামলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক পেট জল খাইয়া তাহার শরীরের মধ্যে তখন এক রকম হাঁসকাঁস করিতেছে, বমনেচ্ছা হইতেছে, ডুলি চড়িয়া বাড়ী বাইতে তার আপত্তি যে বিশেষ ছিল, তা নয়; কিন্তু এই অবমাননাজনক পরিহাসে ইহারই মধ্যে সে কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সবেগে মাথা নাড়া দিল, “হ্যাং! ডুলি কি হবে?”

শুভেন্দু বলিল, “তা হ’লে সবাই মিলে কথাটা একেবারেই চেপে যাও। তোমরা সব বাড়ী ফিরে যাও, স্রুশীলের খোঁজ হ’লে বলবে যে, সেও বাড়ী এসেছে। ওই ওদিকে আছে, ডেকে আনছি, এই না বললে সটান স’রে পড়বে। আমি একটু পরেই একে নিয়ে যাবছি। এই নিত্য! একটা কাজ কর দেখি, ওই মন্দিরবাড়ীর পুকুরের কাছ থেকে এতটা মূণ নিয়ে আগ, সেইটে জলে গুলে খাইয়ে দিলে বমি হয়ে যাবে। তা হ’লেই সব সেরে ঠিক হয়ে যাবেখন।”

নিত্য আদেশপালনে ছুটিল। সলিলের মেজ ভাই অনিল বলিয়া উঠিল, “শুভেন্দুর যে ডাক্তারীও পড়া আছে দেখছি!”

গর্বে বুক ফুলাইয়া শুভেন্দু সেই ফুলান বুক তাল ঠুকিয়া কহিল, “থাকবে না! আমি যে ‘লাঠো কেলাশের আউট’ হওয়া ছেলে, তার খবর রাখো কিছু? আমার কোন বিজ্ঞেটাই থাকে?”



এই গর্কোক্তির মধ্যে অর্থ কিছু থাকুক বা না-ই থাকুক, উহার বলিবার ধরণে কথাটা শুনিয়া সকলেই খুব একচোট হাসিল এবং হুণ খাইয়া সুশীলের পেটের জল অনেকখানি বাহির হইয়া গেল, সুশীলকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া শুভেন্দুর পরামর্শমত তাহাদের দুই জনকে শুধু সেখানে রাখিয়া অপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। ইহার মধ্যে সুশীলের জন্মগত হওয়ার খবরটা বেমানমভাবে চাপিয়া বাওয়া হইবে বলিয়াই সেই পক্ষায়েত সভায় একবাক্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সুশীলের জন্মে ডোবার সংবাদটা বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখা হইল বটে, এবং সে দিন তরুর ভাবী খণ্ডরবাড়ী হইতে তব আসার গোলমালে সুশীলের গৃহে অনুপস্থিতিও কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না বটে; তথাপি সুশীলের নিজের মনের মধ্যে এ দিনের এই ঘটনাটা কেমন যেন একটা অপরাধের গুরু ভারের মতই ভারী হইয়া রহিল। বিবাহবাড়ীর আশোনে সকলেই সুখোন্মত্ত। তরুর শাশুড়ীর সুবিবেচনার ও খণ্ডরের মুক্তহস্ততার খ্যাতিতে সে দিন বাড়ী ছাপাইয়া দেশ ভরিয়া গেল। বাড়ীতরু, পাড়াতরু ছেলেমেয়েরা তরুর সন্তঃপ্রাপ্ত খেলানার রাশির চারিদিকে, বসন্তপুষ্পসভারের চারি পার্শ্বে আকর্ষিত মধুপকূলের স্থায়, গুঞ্জরিয়া ফিরিতে লাগিল; কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পর ম্লানমুখে আসিয়া সেই যে সুশীল একটিবারমাত্র দিদির বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের পানে অমাগ্রহভাবে তাকাইয়াই আন্তে আন্তে চলিয়া গেল, সেটা আর কেহ লক্ষ্য না করুক, তরুলতা করিয়াছিল এবং পরম মেহের ছোট ভাইটির এই প্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ অবহেলার ভাব তাহাকে একটুখানি ব্যথিত করিতেও ছাড়ে নাই। তরু ভাবিল, “এ সব জিনিস, বোধ হয়, সুশীলের তেমন পছন্দ হয় নি। আমি কোথায় ভাবছিলাম, এগুলি সব হাতে পেলে এর থেকে ভালগুলি বেছে বেছে সুশু আর বিনাকে এর অনেকগুলিই দিয়ে দেবো। কিন্তু কেন ওর কিছু ভাল লাগলো না? আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে চলে যাব, তাই মনে করে কি ওর মুখটি অত শুকনো দেখাচ্ছে!” সুখসরোবর পরিপূর্ণ হইয়াও তাই ছাপাইতে পারিল না।

সুশীলের অঞ্চ এ সব বিষয়ে কোনমতেই আজ মন লাগিতেছিল না। মাতৃহীন সুশীল পিতার বড় আদরের ধন। ভুদনবাকুর নিজের একটা আদর্শ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, হলেরা শাসনে একেবারেই বিগড়াইয়া

যায়, অতএব তাহাদের সতত আদর করিবে; কিন্তু একমাত্র রাধিবে—তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। মিথ্যাবাক্যকথন এবং মিথ্যাচরণ না ঘটতে পারিলেই শিশুজীবন চিরনিরাপদ হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা এবং আজীবন এই শিক্ষাতেই তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে “মামুষ” করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুশীলও এই অনুসারে পিতার সহিত কোন বিষয়ে লুকাচুরি করিতে কখন শিক্ষা করেন নাই এবং এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজনও তাহার কখন ঘটে নাই। কলিকাতাবাসী বালকের ছাত্রজীবন এমনই বড়ীর কাঁটার মত নিয়মতন্ত্রতার গঠিত যে, তাহা হইতে এতটুকুও এদিক্ ওদিক্ সরিবার তাহার কখনই দরকার হয় না। আজ জীবনে এই প্রথমবার শুভেন্দুর পরামর্শের কুহকে পড়িয়া সুশীল পিতার নিকট কথা গোপন করিল এবং তাহাই তাহার বিবেককে ভীমরূলের হলের মত কাঁটা বিধাইতেছিল।

অবশ্য সুশীলের স্বপক্ষ যুক্তিরও কিছু অভাব ছিল না। শুভেন্দু তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ইহাকে মিথ্যাচরণ মনে করা সুশীলের নিছক কল্পনামাত্র। অপর কোন বখাৰ্ণ কারণ ইহার সঙ্গে নিহিত নাই। যেহেতু, সুশীলের পিতা ■ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এ বিষয়ে তিনি তাহাকে কোন প্রশ্নও করিতেছেন না এবং সে-ও সে প্রশ্নের ভুল উত্তরও দিতেছে না। তবে তাহার ইহা মিথ্যাচরণ কিসে হইতে গেল?—কিসে যে হইতে গেল, শুভেন্দুর সে কথা বুঝিতে পারা সম্ভব তো ছিলই না। সুশীলেরও সমস্ত সত্য এই গোপনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকিলেও সেটাকে ভাবা দিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে কতকটা তাহার অনভিজ্ঞতা ও কতকটা মানসিক দৌর্যল্য তাহাকে বাধা দিতেছিল। সে-ও, মনে না হউক, অন্ততঃ মুখেও মৌন রহিয়া এ মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া আত্মপ্রত্যারণার সূত্রপাত করিল। কিন্তু চিরদিনের শিক্ষাকে তো বড় ■ কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে মনটা তাহার এমন সুখের দিনেও একান্ত নীরস, তিক্ত ■ সুখলেশহীন হইয়া রহিল, আর পাছে কোনরূপ কুট-প্রশ্নে পড়িতে হয়, এই ভয়ে পিতার চির-ঈর্ষ্যিত সঙ্গের আসক্তি পরিহারপূর্বক পিতার সান্নিধ্যকে সে বখা-সাধ্যই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—এ ঘটনাও সুশীলের জীবনে এই প্রথম।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাকালে তরুর বিবাহ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়া গেল। কিন্তু রোমনাইয়ের আলো দিয়াও বরের কালো রঙ্গ ঢাকা পড়ে নাই, এটাও ঠিক। বর দেখিয়া ঘরে পরে অনেকেই মুখ বাঁকাইলেন। কেহ কেহ আবার সেই বাঁকামুখে মন্তব্য করিলেন—“মেয়ে সেয়ানা আছে লো! জানে মনে, বড়লোক বিয়ে করলে হীরের পাশ-বালিসও পারে দিয়ে শুতে পারে। নাই বা রইলো বরের অঙ্গে রূপ, রূপোর তো আর তা’ ব’লে তার ঘরে অভাব নাই। তাই হলেই হলো। হীরের আলোয় গায়ের রং চেপে যাবে।”

ইহা শুনিয়া এক জন স্বামিসোহাগিনী রূপসী ঠোঁট উন্টাইয়া জবাব করিলেন, “তা’ যা’ বলিস্ আর যাই কোন্স বোন! আমি বাবু হক্ কথা বল্‌বো। রূপো যতই কেন সিন্দুকে সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি একটু রূপই না রইল তো সকলি বাবু ‘বেৰ্থা’ হলো। ওই যে কুল-আটির মতন মুকুর মালা গলায় ঢুলছে, ও যদি বট্টাকুরের ছেলে—কি ওই ওঁর বন্ধুর ছেলে শুভেন্দুর গলায় ওঠে তো দেখবে, ওর না জেরা খুলে যাবে। আর এঁর গলায় মনে হচ্ছে যেন সেই ‘কার’ গলায় মতির মালা।”—

মহিলাকুল অনেকেই এই অর্ধ-প্রচ্ছন্ন উপমাটিকে শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উপহাসের অজস্র হাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং সে হাসি থামিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এমন সময় কর্মব্যস্ত বৃদ্ধা জ্যোতাইমা সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আনন্দ-স্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, “ওলো, তোরা আমার ভুবনের জামাই দেখলি? তা বেটা ছেলে, শ্রামবর্ণ রং একটু বটে, তাতে আর হয়েছে কি? মুখছিরিটুকু, বাপু, দিব্যি আছে!”

জ্যোতাইমা’র মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উন্টাইলেন। তাহার পিছন ফিরিতে যেটুকু দেরী, তাহার পরেই তাঁহাদের তীব্র-ভাষার ঝাঁজে ভুবনবাবুর নব জামাতার “মুখছিরি-টুকু”র সমস্ত ত্রীই প্রায় ঝুলিয়া গেল। ভুবনবাবুর ভ্রাতৃবন্ধু বলিলেন, “ও বলতে হয় তাই বলা। যখন ঘরের জামাই হচ্ছেন, তখন ও কথা না ব’লে আর কি বলা যাবে? তবে সত্যি কথা বলতে হ’লে বাবু বলতে হয় যে, মুখে ‘ছিরি’টির ব’লে কোন পদার্থই দেখতে পেলেন না।”

ইহার আর এক জন জা বলিলেন, “সে কি লো, সেজদি! দেখতে পেলিনি কি বল? কেন, দিদি! অমন খাঁদা নাক, অমন ছুটি কোঁটেরে ঢাকা চক্ষু আর অমন ‘ট্যাকতোলা’ চোড়া ‘চৌরস গড়ের ঝাঠের মতন’ প্রকাণ্ড কপাল রয়েছে, মুখে আর নেই কি?”

আর এক জন বলিলেন, “ওলো, ব্যাখানা কর্‌ছিস্ কি? বড় কপাল যে ভাগ্যবন্ত পুরুষের লক্ষণ। দেখছিস্ না, তাই অমন কপালে-পুরুষ। পাঁচটা না ছ’টা পাশ দিয়েছে, আবার শুন্তে পাই নাকি খুব ভাল চাকরীও পেয়ে গেছে এই বয়সে।”

“তার উপর অমন রূপেওণে বোঁ পেলো।”

মেয়ের খুড়ী একটুখানি টোপা হাসি হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, “তা হোক, তাই, সে তো অনেকেরই হয়, তা ব’লে মুখের অর্ধেকখানি কপাল কিন্তু ভগবান্ সবার জন্তেই তৈরি করেন না।”

বাসরঘরে সুরসিকা ঠান্দি বরের পাশে বসিয়া সুর করিয়া গানের ছন্দে সখেদে গাহিলেন—“হার বিধি পাকা আর দাঁড়কাকে খায়।”

বর যতীন্দ্র দেখিতে সত্যসত্যই ভাল নহে। সংসারশুদ্ধ সকলকেই যে সুরূপ হইতে হইবে, এমনও তো কোন কথাবার্তা বাধা নাই। কেহ বা রূপে মন্দ, কেহ বা গুণে মন্দ, আবার কেহ কেহ রূপেগুণে সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কোথাও ঠিক উন্টাও ঘটে। যতীন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে বসিলে আরম্ভেই তাহাকে ফেল করিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাস্তবের বুদ্ধি, বিজ্ঞা এবং বিনয়বাধ্যতা এ সকল না কি কখন চামড়ার রক্তের উপর নির্ভর করে না, সেই হেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছোট বড় ডিগ্রিধারী পরমপণ্ডিত সুরচিত্র ছেলেটি এক দিকে কঠোর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বড় রকম মাহিয়ানার একটা উচ্চপদ এবং অপর পক্ষে সুবিজ্ঞ ভুবন-মোহনের নিকট হইতে সাধারণ-দুর্ভাব কস্তারত্ব এত-দুভয়ই লাভ করিয়া বসিল। ভাগ্যবিধাতা তাহার অন্তর ও বাহির ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিতে কোথাও কোন কার্পণ্য দেখাইলেন না। আবার কনে দেখা এবং বিশেষতঃ শুভদৃষ্টির সময় তরুণী তরুর সঙ্গজ স্মিত-মুখখানি পলকের মধ্যে দেখিয়া ফেলিয়া যতীন্দ্রের তরুণ চিত্ত আশার পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তরুর মুখে তো কোথাও অসন্তোষের



তাহা হইলে কুরুপ যতীন্দ্রের প্রতি তাহার মনে কোন বিরুদ্ধভাবের উদয় হয় নাই! নতুবা এমন মন্দমধুর হাসির ছটায় কখন ঐ দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাল-রক্ত ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত? গুরুজনের আদেশে যখন সে তাহার ভূমিলয় অবনত নেত্র দুইটি উঠাইয়া সুধীরে যতীন্দ্রের মুখে বারেকের জন্ত স্থাপন করিল, সেই পলকের মধ্যের চকিত দৃষ্টিটুকুর তলে কি অপূর্ব বরাত্তর সে যে দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সুখজড়িত বিপুল বিষয়ে তাহার যৌবনোন্মেষিত আশাতরা চিত্ত যেন মুহূর্মুহ সুখভরে নর্ত্তিত ও কাম্পিত হইতেছিল। অন্তরে নিহিত সেই গভীর পুলকের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া তাই সে ঠান্দির অনুযোগের উত্তরে সহাস্ত-মুখে জবাব দিতে পারিল—

“যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর আহার,  
কমলে কটক হার বিধান তাহার।”

ঠান্দিও তেমনই! তিনিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিমুখে কহিয়া উঠিলেন, “ঠিক বলেছ, ভাই! ‘কমলে কটক হার বিধান তাহার!’ ওলো ও সাবিত্তিরি! চঞ্চলা! বেলা! তোরা হুটো গানটান গা’ না’ লা। বালি সেই ‘রাধাশ্রামের’ গানটি গা’ দেখি,—বেশ অকরে অকরে হবহ মিলে যাবে এখন। ও মা, জানিস্নে কি লো? অবাক কথা মা! আজকালকের ছুঁড়ীগুলো সব কিই গো! রজনী সেন আর রবি ঠাকুরকে নিয়েই ওরা উন্নত, আমাদের সেকলে সব কত সুন্দর সুন্দর বাসর-জাগার গান ছিল, সে সব দেখাছ তোদের হাতে প’ড়ে লোপ পেয়েই যাবে। নে, তা হ’লে আমিই না হয় তোদের বদলে গেয়ে দিচ্ছি! আমার এমন স্নেহের দিনে একটু গানও গাইব না! তা দেখিস্, ভাই, শেষে যেন গলা শুনে হেসে বিষম খেয়ে মরিস্নে সব। আমাদের সেকালে অত গলা-ফলার ভাবনা ছিল না, বাড়ীতেই হোক, পাড়াতেই হোক, বর দেখলেই আমাদের গানে পেত, তা গলা থাক বা নাই থাক।”

“কই ঠান্দি, গান গাও, বড়ুতাই ■ দিতে লাগলে।”

“এই যে গাচ্ছি লো, এই যে কলি, এসেছিস্, তুই ত ঐ-গানটা জানিস, আয় আমার সাথে গা’—দেখি—

৬২ (খ)—৪

‘রাধাশ্রাম একাসনে মিলেছে ভাল।

মিলেছে ভাল—রাধাশ্রাম সেজেছে ভাল—

ওগো, রাই আমাদের সো-নার ব-রণ,

শ্রাম চিকণ কালো’।”

গান শেষ হইলে সভামধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে পরিফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রোতৃ-বৃন্দের মধ্য হইতে দুই একজন চাপা গলায় বলাবলি করিলেন, “তা ঠিকই হয়েছে বটে। রাই, আমাদের সোনার বরণ, শ্রাম চিকণ কাল।’ তা এটা ভাই ঠিক!”

গান শেষ হইলে যতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, “গান এমন প্রত্যক্ষভাবে কার জীবনে দেখা দেবার সুযোগ কিন্তু সর্বদা পায় না—না, ঠান্দি?”

ঠান্দি অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক, সপ্রতিভ ভাবে গালভরা হাসিয়াই উত্তর দিলেন,—“তা হ’লে গানটা তোমার ভাল লেগেছে? দেখ ভাই, রাগ-টাগ কর নি ত?”

সাম্মতমুখে যতীন্দ্র কহিল, “স্নাতকে যখন দিন কব্বার উপায় জানা নেই, তখন রাগ ক’রে আর উপায় কি বলুন? ওই শ্রেনীর গান আপনাদের আর কতগুলি পুঁজি আছে?”

এবার ঠান্দির পূর্বেই তাহার পিছন হইতে এক জন আত্মপরিচয়গোপনকারিণী—শাওড়ী-সম্পকোয়া স্কোড়কে বালিয়া উঠিলেন—“কেন, দু-একটা শিখবে না কি?”

যতীন্দ্র পূর্ববৎ হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চাহিয়া জবাব দিল, “শিখতে চাইনে, তবে যাকে লক্ষ্য ক’রে আপনারা এই সমস্ত আখের বাণগুলি ঝাড়লেন, আজকের এত বড় পরীক্ষার দিনটায় প্রাণপণে সবাই মিলে একসঙ্গে আপনাদের সমস্ত চোখা চোখা শরসন্ধান ক’রে তাকে একেবারেই বিঁধে ফেলুন না? তার পর দেখা যাক, এরপরে তিনি নিজেকে ঝাড়া রাখতে পারেন কি না! তবেই বুঝবো, আমার কতখানি জোরকপাল, তবেই জানবো, উনি কত বড় বীর!”

এই হাসির সঙ্গে একত্র মিশ্রিত তীব্র ব্যঙ্গভরা কঠিন অনুযোগের কথা সেই বাসরঘরের অল্পবুদ্ধি মহিলামণ্ডলীর বুকে পাড়িয়া তাহাদের চিত্তকেও যেন একসঙ্গে লজ্জায় শিহরিয়া তুলিল। সত্যি তো তরুর সাক্ষাতে এ আলোচনাটাকে এতদূর অব্যর্থ গড়াইতে দেখাটা তো সত্যি ভাল হয় নাই!

তথাপি মুখে কি কেহ কখন নূতন বিবাহের বরের কাছে নিজেকে হার মানাইতে চায়? শ্রীলীসম্বন্ধীরা কলিকা রোধ করিয়া বলিল, “তা যতীনবাবু! আমরা না হয় রাতকে দিন ক’রে ফেলেই—‘ওহে সুন্দর’ ব’লে তানই ধরুলেম, কিন্তু ওই যে তরুর হাতের পাশে তোমার ঐ হাতখানা রয়েছে, তা—  
■ দুখানার তফাৎ কি আর তরুণী নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে না? পরের মুখে ঝালই খাওয়া যায়, তা ব’লে পরের কথায় কি কালোকে সাদাও দেখা চলে? তা হ’লে না হয় বলুন, আপনাকে যতীন বাবু না ব’লে এখন থেকে গোরাজ বাবু ব’লেই ডাকতে থাকি!”

কলির কথায় সকলের চক্ষু বর-কনের যুগল হস্তের উপর আসিয়া পড়িল এবং তরুলতা তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণুতাবে নড়িয়া চড়িয়া নিজের সুগঠিত ও সুগৌর হাতখানাকে কাপড়ের তলায় ঢাকা দিয়া ফেলিল।

তখন যতীন্দ্র সর্কোতুক হাসিমুখে মুখ তুলিয়া তাহার আক্রমণকারিণীকে শ্রিতহাস্তে কহিল, “এই আমার উত্তর শুনুন।”

কলিকাও তখন হাসিয়া ফেলিল, সহাস্যে বলিল, “তা হ’লে দ্বিতীয়বার গাঙ্গারীর অভিনয় করবে বোধ করি, তরু।”

এই সময় বিনতা নিজের দলবল লইয়া এই ঘরের ধারে উকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতোছিল, কথা-শুনা তাহার কানে ঢুকিতেই সে সেইখান হইতেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “তা বুঝি তুমি জান না, কলিদি! দিদি বলেছিল যে, ‘রূপ না কি একটা কিছু জিনিস! মামুষের গুণ থাকলেই হলো’।”

কলি উচ্চহাস্তের সহিত কহিয়া উঠিল, “ওই শোন, তাই গুণি! তোমার গুণগ্রাহিনীর গুণের কথা শুনে তো! আমরা তোমায় গোরই বলি আর কালাচাঁদই বলি, রাই কিন্তু নিজের মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে যে, সে কালমাণিককে মাথার মণি ক’রে নেবেই নেবে।”

যতীন্দ্র হাসিমুখে কহিল, “নিজেরাই শুনুন আর শিখুন। যেহেতু, এ বাড়ীর জামাইদের মধ্যে দেখ্‌লুম, আমার মতন আফ্রিকাবাসী নাই হোক, তবু আরও হুঁচার জন অরসন্ন কালোও আছেন। তাঁদের পক্ষে কিছু সুবিধা হ’তে পারবে।”

তখন এই বয়সে অত বিবেচনা ও গুণগ্রাহিতার

■ তরুর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া পড়িয়া বার্ষিক-বাসিনীগণ পূর্ব আলোচনাতে ইতি করিলেন এবং অবশেষে সকলেই যে তরুর সহিতই একমত, তাহাও  
■ ক্রমে প্রমাণ হইয়া গেল। তাহার পর আপোষে কতকটা মিটমাট হইয়া গিয়া যখন আসন্ন কিছু নরম পড়িয়াছে, তখন ঠান্ডির দল নিবৃত্ত হইয়া শ্রীলিকার দলকে গান শুনাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। তখন অরগ্যানের ঢাকা খোলা—এসরাজ বেহালা সেতারের সুর বাঁধার ধুম পড়িয়া গেল। যতীন্দ্রও তখন ভরাবুকে পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি একটি বিন্দু দৃষ্টিপাত-পূর্বক প্রসন্নচিত্তে সঙ্গীতসুধা পান করিতে মনোযোগী হইল। জীবনের প্রথম পরীক্ষা-সাগর সে সাঁতার দিয়া আসিয়াছে, কখন ফেল হয় নাই। জীবনের মধ্য-পরীক্ষাতেও তাহা হইলে হয় ■ সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

### নবম পরিচ্ছেদ

নদীর ধারে ধারে আমগাছের সারি, কাঁঠাল নারিকেল কলা ও সুপারির স্তম্ভবিড় বন। ইহারই ইতস্ততঃ কয়েকটা উচুদরের জাম, জামরুল, গোলাপ-জাম, আতা, পেয়ারা, লিচু, বেল ও কপিথ বৃক্ষ। আবার বাদাম, ভুঁত, নানাজাতীয় লেবু, পিচ ও ফলসা গাছও ছই একটা করিয়া আছে। বাগানখানা ভুবনবাবুদের পার্শ্ববর্তী জমীদার অথবা চৌধুরীর পুত্র বিপ্রদাস চৌধুরীর। এক্ষণে উত্তর পরিবারে অসৌজন্য না থাকিলেও পূর্বে পূর্বে কাহারও সহিত কাহারও বেশ মনের মিল ছিল না। জমাজমি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক আধবার ফৌজদারীও হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন হইতে আর কোন গোলমাল হয় নাই; এবার তরুর বিবাহে বিপ্রদাস বাবুর স্ত্রী কস্তা নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বিপ্রদাস বাবু নিজে আসিতে না পারিলেও আইবুড়তাত ভালই পাঠাইয়াছিলেন।

ছেলের দল ঐ বাগানখানার উপর চিরদিনই লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল; কিন্তু ভয়ে কেহ কখনও সেই জমিতে পা দিতে পারে নাই। শুভেন্দুর কাছে সেই কথাটা ফাঁস হইতেই সে সকলকেই টিটকারী দিয়া উঠিল, “আরে ছাঃ! আমি হ’লে এদিনে  
■ তিন ভাগ ফল পেটে পুরতাম।”



সলিল মাথা হুলাইয়া বলিল, “তাই ত গো! মুখে শু সব বলা ভারি সহজ, এ বড় বিষয় ঠাই, একটা আনারস উপড়ে যেদো ভাঁতি জেল খেটে মরেছিল। চারটে আয় পেড়ে হরে খাড়ার ছোট ছেলে নেপা যেপে সাত হাত নাকে খত দিয়ে তবে কোনরকমে ছাড়ান পায়। যাও না একবার পেয়ারা পাড়তে, টেরটি পেয়ে এস না দেখি।”

এই তাকিলা বাক্যে শুভেন্দুর মনের মধ্যে যে মতলবটা খেলিয়া গেল, সে তখন আর সেটাকে কাস করিল না, চাপিয়া গিয়া অবাস্তব কথা পাড়িয়া বসিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুশীলকে একপাশে টানিয়া আনিয়া শুভেন্দু তাহার কানে কানে বলিল, “জানলি, সুশীল! আজ একটা খুব সাহসের কাজ করতে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়া কিন্তু তোর কর্ম নয়, তুই বরং তার চাইতে বাড়ী যা।”

শুভেন্দু জানিত, সুশীলের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই। হইলও তাহাই। ইহা শুনিয়া সাগ্রহে সুশীল প্রশ্ন করিল, “কি কাজ কর্তে যাচ্ছ তুনি?”

শুভেন্দু যেন কতই অনিচ্ছুকভাবে খামিয়া খামিয়া জবাব দিল, “সে তোমার শুনে কোনই লাভ নাই। তোমাদের মধ্যে কেউ সে কাজে হাত দিতে কখনই ভরসা করবে না। সলিলদের বিশ্বাস, তা কাজ অসম্ভব, তাই আমি তাদের দেখাতে চাই যে, যা তোমাদের সবার পক্ষে অসম্ভব, তা একা আমার পক্ষে অতি সহজ এবং—” সুশীল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে একটা ঠেলা দিল ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়া উঠিল, “চল এফুণ,—আমিও যাব।”

শুভেন্দু যেন কতই বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, “তুনি!” সুশীল গম্ভীর ও দৃঢ়বরে উত্তর করিল, “হঁ”—এবং এই বলিয়া লম্বা পা ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। তখন শুভেন্দু মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, “আরে সোজাই চলে যে, আমাদের পথটা যে এর থেকে একেবারেই বাকা।”

ফলের বাগান এখন ফলশূন্য-প্রায়, তাই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য পূর্বের অপেক্ষা কিছু শিথিল, কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে ঘাট-বাধান পুঙ্খবিলী আছে—তাহাতে অনেক মাছ ফেলা

হইয়াছিল। বাবুর মাছ ধরিবার মত বড়ই প্রবল; পাছে সেই মাছ কেহ ধরিয়া লয়, সেই ভয়ে বিশেষভাবেই যে পাহারার বন্দোবস্ত আছে, আশপাশ দেখিয়া শুভেন্দু সে খবরটা জানিতে পারে নাই এবং সম্পূর্ণরূপেই জনশূন্যবোধে তাহার দুইজনে কুল ও পেয়ারা যত পারা যায়, নিজেরা খাইয়া সঙ্গীদের দেখাইবার জন্যও অপরিপাক সংগ্রহ পূর্বক যেমন ঝপাৎ করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই প্রারম্ভিকারে কাহার বজ্রমুষ্টি তাহার পিঠের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দড়ি দিয়া তাহার দুখানা হাতকেই চাপিয়া বাধিয়া ফেলিল। সুশীলের অবস্থাও ততক্ষণের মধ্যে তাহার অপেক্ষা যে বেশী ভাল ছিল না, সেটুকু দেখিতে পাওয়ার মত আলো সেখানে ছিল।

ঘাটের রাসায় মাচা বাধিয়া বসিয়া বিপ্রদাসবাবু একান্তমনে হইলের ছিপে একটা বড় কালবোস মাছকে গাঁথিয়া কেলিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, পারিয়া উঠেন নাই, তাই মনটা বেজার হইয়া গিয়াছে। একবার ফাৎনার টান পড়িল, ভারি ঠেকিল, তুলিয়া দেখেন, একটা মস্ত কোলা ব্যাং—আবার একটা কঁকড়া আসিয়া চার খাইয়া গেল—কি মুন্সিল!—

এমন সময় বাগানের দুইজন মালী তাহার সন্দের দরওয়ানটার সাহায্যে দুই কিশোর চোরকে হাত বাধিয়া লইয়া আসিয়াষ্টপস্থিত হইল ও সুদীর্ঘ সেলাম বাজাইয়া বলিল, “ধর্মাবতার! এই দোনো চোট্টা মিল কর, কলমবালা আমরুত সবই তোড়তাড় লিয়া, অউর পাটনাবালা বইরতি বহুত চোরাককে লে বাতে রহা। মালীলোককে সাথ মিলকর ডুবুনকো পাকড়া গায়া।”

জলের মধ্যে একটা বড় মাছের পাখনা-নাড়ার মূহু কম্পন অনুভব করিয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই ধর্মাবতার বিচার শেষ করিলেন, “খানা মে লে যাও।”

বিচারের রায় শুনিয়া শুভেন্দু সেকোপে দাঁত দিয়া নিজের ঠোট কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সুশীল কোন-মতেই আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল, সমস্ত শরীর ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সতর্কণ আর্জনের বাহির হইয়া পড়িল। শব্দটা বিপ্রদাসের কানে গেলেও তাহার প্রাণে উহা স্পর্শবাহ

করিল না, তিনি যথা-পূর্ব হুইলের চাকার দিকেই চাতিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কর্কশ-কণ্ঠে দরওয়ানজী বাজপেরী হাঁকার দিয়া উঠিল “আরে চলবে চল”— বলার সঙ্গে ছেলে দুইটির হাতে বাধা দড়ীতে একটা হেঁচকাটানও সে দিল, ভদ্রলোকের ছেলে বুঝিয়াও ছাড়ান দিল না। কিন্তু সুশীল তাহাতেও নড়িল না। যতদূর সাধা, শরীর মনে তাহার যতখানি বল যেখানে আছে, সে সমস্তই একত্র সংগ্রহ করিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল, মুখেও হয় ত কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুজলের কম্পনে কথা তাহার কণ্ঠের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল এবং কি কথাই বা তাহার বলিবার আছে, তাহাও সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ না কহিলেও যে এখনই কি সর্বনাশ তাহার ঘটিয়া যাইবে, তাহা মনে করিয়া তাহার ভীষণ আত্মনাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শুভেন্দুর অবস্থা দেখিবার অবসর তাহার মোটেই ছিল না, নিজের কথাই এখন তাহার কাছে সমস্ত পৃথিবীর আকারের অপেক্ষাও অনেক বেশী বড়। সর্বশরীরের চলন্ত রক্ত উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া যেন তখন শুধু রক্ত-কলোলে এই কথাই তাহাকে বলিতেছিল—“বাবা জান্লে কি করবেন! বাবা জান্লে কি বলবেন!” এর চেয়ে বেশী আর বড় কোন ভাবিবার বিষয় তাহার কাছে ছিল না।

শুভেন্দু মৃহ্মরে দরওয়ানজীর অনেক ক্রবস্ত্ত ভই করিতেছিল, কিন্তু সে সমস্ত ভয়ে যুগার্পণের জ্বালা একান্ত বার্থ করিয়া চোরোদ্ধরণিকের দল যখন পরমোৎসাহে লক্ষ শীকার লইয়া ‘কুইক মার্চ’ করিয়া চলিয়াছে, এমন সময় সেই অন্ধ অন্ধকারছায়াচ্ছন্ন বন-বীথির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র দীপশিখার জ্বালা ক্ষুদ্রাঘর বাণিকা ত্রস্তপদে বাতির হইয়া আসিয়া উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, “বাজপেরীজি! হামকো একটো পাখী ধরুতো দিজিয়ে! এ কাঁহা চলতা হাম, সেরা শুনিয়ে তো খোড়া খাড়া হোকে।”

বাজপেরী ঈষৎ বিপর্যয়ে খাড়া হইয়া বলিল, “দেখিয়েনা খোঁকিজী! দোঠো চোড়া আপনা কলমকা পেঁড়মে বহের চোরাতে রহা, ময় আভি মহারাজকা হুকুম তামিল করনেকে ওয়াস্তে থানে পর হুমন্ লোগকো লে চলত থেঁ, আভি মায় কেইসে পাখী ধরুতা?”

‘খোঁকী’ ত্রস্তপদে উহাদের সম্মুখে আসিয়াই যেন বিষয়ে একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল। পরে সন্ধিগ্ন-মৃহ্মরে সে বাজপেরীকে বলিল, “ঝুটা বাত নেহি কহনা! ই তো বাবু লোক হাম, চোড়া কাহে কহা?”

বাজপেরী হস্তবদ্ধ আনতবদন ছেলে দুইটির প্রতি টিটকারী দিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিল, “আরে খোঁকিজি! আপতো গেড়কাআদরি, আপকা মালুম নেহি হাম, আজকাল বাবু লোক সব চোড়া ওর ডাকু বড়ে হোতা হাম! চল বাবু! থানেপর চল! এইসা বহোত বাবুলোক আজকাল থানেপর যাতে উতে হেঁ।”

যেহেটি সহসা বিজ্ঞাচ্ছটার জ্বালা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া ভীষ গভীর আদেশের স্বরে উচ্চারণ করিল, “খবরদার! হিঁয়াই খাড়া রহনা, মায় পিতাজীকো পাশ চলতেহেঁ।”

এই বলিয়াই যেমনই অকস্মাৎ সে কানন ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনই করিয়াই আবার নিমেষ-মধ্যে অদৃশ হইয়া গেল। অপরাধীঘর যদি নিজ নিজ দুঃখতারে অত বেশী অবসর না হইয়া পড়িত, অথবা বয়স আর একটু অধিক হইত, তাহাদের হয় ত বা কাননবিহারিণী কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ হওয়া বিচিত্র ছিল না।

\* \* \* \*

“বাজপেরি!”

“খোদাবন্দ।”

“চোর লোগকো দো দো বেত লাগাকর ছোড় দেনা।”

“যো হুকুম মহারাজ!”

হুকুম শুনিয়া শুভেন্দুর চোখ জলিয়া উঠিলেও সুশীলের অবসরতায় প্রায়-বিচেনদেহে যেন তৎক্ষণাৎ জীবনীশক্তি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। দুই বেত! দুই বেত কেন, থানায় যাওয়ার পরিবর্তে সে যে সহস্রগারও বেত্রাহত হইতে প্রস্তুত আছে।

থানায় গেলে তাহার পিতা যে সকল কথা জানিতে পারিবেন! আর জানিলে পর? সুশীল ভাবিতেও পারেনি যে, তার পর কি হইবে বা কি হইবে না! সুশীলকে তিনি যে কিছুই বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত।—কিন্তু তাহার বুক যে কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে, সে কথা সুশীল ছেলেমানুষ হইলেও তাহার অজ্ঞাত



নয়। সে যথাসম্ভব দৃঢ় ও স্থিরচিত্তে দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইল।

“বাজপেয়াজি! বহোতি আস্তেসে বেত লাগানা, ভাইয়া! মায় আপকো একঠো কপৈয়া দেজে।”—

অত্যন্ত মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ এই করুণাপ্লাবিত শব্দকয়টি অপরাধীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীল ইহাতে বারেক সক্রতজনেজে সেই ক্ষুদ্র করুণাময়ীর করুণা-কাতর স্নিগ্ধমুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল।

“বাপ্ রে বাপ্!” বেজাহত সুশীল লাকাইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বেত উঠাইতেই কাতরস্বরে আর্তধ্বনি করিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল, তাহার সম্মুখ-বর্তিনী মেয়েটি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া আঙুলিয়া ধরিল। জলভরাচোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “খবরদার!”

বাজপেয়ীর হাতের বেত যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

শুভেন্দুকে অটল দাঁড়াইয়া বেত খাইতে দেখিয়া, বিশেষ এই অশ্রিচিত্তার পূর্বপ্রলোভনবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীল মনে করিয়াছিল, বেত খাওয়া জিনিষটা সন্দেহ খাওয়ার চেয়ে বেশী তফাৎ নয়; কিন্তু নিজের পিঠে উহারই একটি ঘা পড়িতেই তাহার সমস্ত ধারণাটাই উল্টাইয়া গেল। উঃ, বাজপেয়ীর হাতে আস্তে মারা বেতেরই এই জালা,—না জানি, তাহার পূরাদমে কতখানি বেদন হইতে হইত!—যে সুশীল কখনও কাহারও নিকট একটা চড়চাপড়ও খায় নাই, তাহার পক্ষে এ যে একেবারেই অসম্ভব! ইহার দ্বিতীয় আক্রমণের ভয়েই তাহার মূর্ছা যাইবারও উপক্রম হইল।

“বাজপেয়ি! জলদি পানি লাও, দোঠো বয়েরকে ওয়াস্তে তোম ভালো আদমীকো জান্ লে’ লেওগে?”

বাজপেয়ীর এই ক্ষুদ্র মনিব-কত্যাটির এ প্রকার প্রভুত্ব দেখা অভ্যাস আছে, ইহাকে সে নানা কারণে অসম্ভব ও করিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং সেইজন্য শুভেন্দু ও সুশীলকে সে একটু হাতে রাখিয়াই বেত লাগাইয়া-ছিল, ইহাতেও যদি নবীর পুতুল চোরকে মূর্ছা বাইতে হয়, তাহা হইলে সে আর করিবে কি? সুষর টাকার্টা তাহার নষ্ট হইল দেখিয়া উহাদের উপর তাহার

ক্রোধের সীমা রহিল না, মনে মনে আপশোষ হইতে লাগিল যে, এর চেয়ে বেত দিয়া উহাদের পিঠের চামড়া খানিকটা উঠাইয়া আনিতে পারিলে তবু হাতের কিছু সুখও হইত; আর বাবু-চোরদেরও তাহার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিতে পারিত। ঈষৎ বিরক্তস্বরে সে তাই প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “ভালা-আদমী কভি দোসরাকো বাগিচায়ে চোরী কর্ণে নেহি আতেহেঁ দিদি সাহাব!—এ দেখিয়ে! ডাকুলোগ মর্ নেহি গঁয়া! দেখিয়ে উঠকে খাড়া হো গিয়া। বাস্! আতি হায় দোনোকো বাহার নিকালকর দোসরা কাম-পর চলন্তে হেঁ।”

মেয়েটি কিছু না বলিয়া তাহার অভ্যন্ত চঞ্চল ক্রান্তপদে আর একদিকে চলিয়া গেল, এবং ফটকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া শুভেন্দু ও সুশীল দেখিল, সে এক ঘটা জল লইয়া ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছে।

“বাবার জিনিষ কিছু নেই,—শুধু খাবার জল এনেছি, নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে! একটু জল খান।”

শুভেন্দু বাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু সুশীল বারেক নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতার আবার তাহার সেই করুণাবিশ্রলিত মুখের পানে চাহিয়া প্রায় পুরা একসেরী ঘটীর এক ঘটা জল পান করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণ তখন তাহার গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

অনুকূলচন্দ্রের যে কথা, কাজও সেই। বাস্তবিকই ইহার ঠিক পরের দিন এলবার্ট বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী আসিবার পূর্বেই সেন্ট-পিটার্স মিসন স্কুলের একটি বলদযোজিত সাম্পান আসিয়া নীলিমাকে তাহাদের স্কুলবাড়ীতে লইয়া চলিয়া গেল। এ দিকে এলবার্ট স্কুলের গাড়ী আনিয়া স্কুলের দাই যখন তাহার অভ্যাসমত ডাকাডাকি করিতেছিল, “নীলি-বউয়া! হো—নীলি-বউয়া! আপ কেত্তা দেব্ করবে বউয়া! আইয়েজি! জল্নী আইয়ে!”

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া নীলিমার পিতা তাহার হরিদ্র-প্রসন্ন দম্পত্যজি প্রদর্শন পূর্বক কোন অশিষ্ট জীব-বিশেষের দ্বারা যেন ইহাকে

দংশনোত্তর ভাবেই চৈতন্য বসিলেন :—“এই তোম কুস্তাকো মাফিক এইসা কাহে চিলাচিল করকে আদমীকো কান খাতা ছায়! নিকালো নিকালো ; —ইয়াসে নিকাল যাও।”

প্রত্যক্ষ ক্রমশঃ দেখিয়া দাউ-বেচারী তটস্থ হইয়া পড়িল, মাথার কাপড়টা একটু সংযত করিয়া লইয়া ■■■ নামাইয়া বলিল, “বউয়াকো বোলাতে হেঁ, বাবুজি! জেরা মেহেরবাণী করকর বোলা দিজিয়ে বাবু!—দেব হোগিয়া।”

অনুরূপা তাঁহার খিঁচান মুখে অধিকতর খিঁচাইয়া পঞ্চমের স্বরকে সপ্তমে চড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, “বউয়াকো বোলা দিজিয়ে!” নেই নেই, বউয়া ওর কব্‌হি হুঁয়া পড়তে নেহি য়ায়েগি। তোমহরা বিবিসাহেব লোগকো বোল দেনা কি ঐসা খারাব ইস্কুলমে খারাপ জানানা লোগকা পাশ হামারা লেড়কীকো হাম ওর কতি নেহি ভেজেদে। হুঁয়া পড়ানা ঠিক নেহি হোতা ছায়, ওরুমা লোগকো দেখকর বহোত বেচাল শিখ যাত্তা ছায়। হন লোগকো নকরী ছোড়ানেকে ওরাস্তে হাম গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতে হেঁ। যব দোসরা মাইজী লোক আবেদে, তব কিন হামারা লেড়কী হুঁয়া পর পড়নে য়ায়েগা—”

শকটারোহিণী বালিকাবৃন্দ উৎসুক-আগ্রহে বুঁকিয়া পড়িয়া উৎকর্ষা হইয়া এই বাক্য-সুখা পান করিতে করিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া মুহু মুহু হাসিতেছিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে অকস্মাৎ চলার ঝাঁকানী বাঁচাইয়া লইয়া যে যাহার নিজস্থানে আসন লইয়া বসিল। সর্বপ্রথম মনোরমা তাহার ছুইকাঠির বোনা হাতে লইয়া স্বঘমার দিকে চাহিয়া হাসিল, “বুঝলি সুবি! নীলির বাবার নামে সেই যে চিঠি-খানা সুলোচনাদি’ পাঠিয়েছিলেন না? তার জন্তই নীলিবেচারীর আপার আইয়ারীটা দেওয়া ঘটলো না। সে হয় ত এবার পাশ ক’রে স্কলারশিপটাও পেতে পারতো।”

স্বঘমার পূর্বেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “আর সুলোচনাদি’ মনোরমাদি’দের চাকরী শুধু না খায়। বলেন যে, ‘গবর্ণমিণ্টমে দরখাস দেতে হেঁ’—দেখ বেচারারা বুঝি বিপদে পড়লেন বা!”

মনোরমা ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাসূচকস্বরে উত্তর করিল,—“ইং, নীলির বাবা তো ভা—রী একজন ব্যতকর। লোক কি না! তাই উনি ‘দরখাস’ দিয়ে

সুলোচনাদি’দের চাকরী ছাড়াবেন। আহ্লাদ প’ড়ে গেছে আর কি! বড়জোর একদিন ইন্স্পেকট্রিস এসে ওঁদের একটা কৈফিয়ৎ না হয় তলব করবেন।”

প্রতিমা মস্তব্য করিল, “তবু ত সে একটা অপমান। আর সুলোচনাদি’ ভাই যে রকম তেজালো মানুষ—”

মনো ক্রভঙ্গী করিয়া বলিল,—“কিসের অপমান। তা হ’লেই ত আসল কথাটাও ধরা প’ড়ে যাবে। যিনি ‘দরখাস’ দিচ্ছেন, তাঁর কাছে যে স্কুলের একটি গাদা টাকা পাওনা,—সেটিও যে ওঁরা জেনে যাবেন। তাতে অপমানটা হবে কার। সুলোচনাদি’ কাঁচা মেয়ে নন, সব চিঠিরই তিনি নকল রাখেন। ‘রাজার রাজার বুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ ব্যর’ তাঁর তো নয়; লোকমান হলো নীলি-বেচারীরই!—আর একটা আসও ছিল না—মোটো এই চাকরটা না পচিশটা দিন বাদ—পরীক্ষাটা দিলে ও নিশ্চয়ই স্কলারশিপটা পেয়ে যেত।”

অনুরূপা কহিল, “তখন ত ও’ নিজেই ভাই, ওর মাইনের টাকা দিয়ে দিতে পারতো। আহা! সুলোচনাদি’ এত তাড়াতাড়ি না ক’রে যদি একটু দেরী করতেন, তা হ’লে হয় ত ■■■ পরীক্ষাটা দেওয়া হ’ত।”

সাবিত্রী এতক্ষণের পর ‘ট্যাঙ্ক’ করিয়া উঠিল—“সুলোচনাদি’ ত আর ‘জান’ নন, কেমন ক’রে জানবেন বল যে, পাওনা টাকা দিতে বল্লই নীলির বাবা মেয়ে আটকাবে।—এমন ছোটলোক তো এর আগে আর কখন দেখেন নি তিনি।”

সাবিত্রীর মুখের ভরে সব মেয়েই মনে মনে উহাকে সমীহ করিত, শুধু করিত না মনোরমা। সে এখনও উহার মস্তব্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে টিপনী কাটিল,—“এমন ছোটলোক যে আর কক্ষণোই দেখেন নি, তাও অবশ্য হলফ ক’রে বলতে পারিনে। তবে নীলির বাবার তবু একটা আকলও আছে যে, মাইনে যখন দেবেই না, তখন মেয়েও না হয় আর পড়বে না; কিন্তু কারু কারু আবার দেখি সেটুকুনও নেই।”

স্বঘমা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “কিন্তু ভাই, নীলির বাবা সুলোচনাদি’দের সম্বন্ধে কি রকম অপমানের কথাগুলো সব বলেছেন বল তো!—আমার তখন কিন্তু এমন ভয়ানক রাগ ধরছিল। আমি ওঁদের কিন্তু সব বলে দেব।”

প্রতিমা বলিল, “আমিও।”



সাবিত্রী কিন্তু সে দিকে কর্ণপাত না করিয়াই মনোরমার দিকে ত্রুটি-কুটিল মুখ তুলিয়া সরোবে কহিল, “খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না! কেন, আমি কি তোর খাই না পরিবে, যখন-তখন তুই আমাকেই চিপটেন কাটতে আসিস?”—

গাড়ী আসিয়া বিজ্ঞানালের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আজিকার এই সকল অভিনব কাহিনী সর্বপ্রথম সুলোচনাদি’র কর্ণগোচরকরণার্থ আগে নামিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহারই ঠেলাঠেলিতে একটি সিন্ধু ক্রাসের ছোট্ট মেয়ে গাড়ীর পা-দান হইতে কঁকর বিছান পথের উপর সজোরে পড়িয়া নাকমুখ হেঁচিয়া কান্না জুড়িয়া দেওয়াতে সুসমাচার-প্রচারিকাদের প্রথম উৎসাহের মুখে তখনকার মতন পাথর চাপা পড়িয়া গেল।

স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল; সকল মেয়েই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছে। কেবল দুঃসাহসিকা মনোরমা সুলোচনাদি’র সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলের দাই এংবারিয়ার সাক্ষ্যের মধ্যে কোথায় কি ক্রটি থাকিয়া যাইতেছে, তাহারই হিসাব রাখিয়া যাইতেছিল। এংবারিয়ার খানিকটা বলা হইয়া গেলে সে হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিল,—“হ্যাঁ দাই, ‘গবর্ণমেন্টমে দরখাস দেতোহেঁ,’—ওই কথাটা বড় যে বাদ দিলে যাচ্চিস?—আচ্ছা মজার লোক তো তুই দেখি! ওছন, সুলোচনাদি’! নীলির বাবা আরও যে কত কথাই বলেন, তা আর আপনাকে কি বলবো! আপনাকে দেখে নাকি মেয়েরা সব বেচাল শিখছে, আপনাদের বদলে টিচার এলে তখন ওঁর মেয়ে নাকি পড়তে আসবে—আর সে ঢের ঢের কথা—”

ইনফ্যান্ট ক্রাসের মেয়েদের শ্রেণীর উপর পেনশিল দিয়া যুক্তাকর লিখিতে বসাইয়া কোণ টিচার ব্রাহ্ম-বালা দে কোতুহলাক্রান্ত হইয়া পারে পারে আসিয়া মনোরমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; মনোরমাকে এবার ‘কমা’ দিতে দেখিয়াই অসহিষ্ণুভাবে সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—“আরও কি কথা বলে রে মনোরমা?”

মনোরমা সমুৎসাহিত হইয়া—‘ঢের কথা’ বলিবার জন্ত উহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সুলোচনা গম্ভীরমুখে মিস দে’র দিকে চাহিয়া বলিলেন, “That

is impertinence” বালু!—মনে! যাও তোমার নিজের যায়গায় গিয়ে বস গে।”

খট্ খট্ করিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া রেজিষ্টার বাহির করিয়া তার পাতা উন্টাইয়া খস-খস করিয়া নীলিমার নামটা তাহা হইতে কাটিয়া দিলেন। পাশের ঘরের মেয়েরা খোলা বইএর পাতার পাশ দিয়া আড়চোখে তাঁর উক্ত কার্য্য দর্শনান্তে ফিস ফিস করিয়া বলাবলি করিল, “ওরে, নীলি আজ থেকে নামকাটা সেপাই হয়ে গেল রে!”

ইতোমধ্যে মনোরমা আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। খার্ড টিচার প্রেমকুসুম দাস কয়েকটি মেয়েকে একটা নূতন আঁক দেখাইয়া দিতেছিলেন, ইঙ্গিতে মনোরমাকে কাছে ডাকিলেন। মনো আসিলে একটু নামাইয়া বলিলেন, “কই, সে চিকনটা কেনা হয়ে এসেছে?”

মনো ঘাড় দুলাইয়া জবাব করিল, “উঁহু, সে আজকে মোটে কেনা হবে, কাল আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।”

“ইউ আর এ নটী গাল! রোজই তো কাল, কাল বলো, কবে তোমার কাল হবে শুনি?”

মিস দাসের এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—“ওর ‘কাল’ হ’তে এখনও অনেককাল লাগবে, প্রেমকুসুমদি’! দেখছেন না কি মোটা।”

মনোরমা ক্রান্তকী করিয়া কখিয়া উঠিল, “তোমার মতন ত আর সবাই পাকুতাড়ানী—কাক-তাড়ানী তা ব’লে হ’তে পারে না! না সত্যি প্রেম-কুসুমদি’! কাল ঠিক এসে যাবে দেখবেন। নাকে আরিও ক’দিন ধ’রেই কেবলই তাড়া দিচ্ছি, তা না কি বলেন জানেন?”

“কি?”—বলিয়া প্রেমকুসুম একটা মেয়ের আনা কথা দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

“না এমন ছষ্টু!—না, আমি সে কথা বলবো না!—সে আপনি শুন্লে রাগ করবেন!—না,—না বলে, ‘তোমার প্রেমকুসুমদি’র তো আর বিয়ে বন্ধ যাচ্ছে না—এত তাড়াতাড়ি কিসের? দোবই এখন আনিয়ে’!”—এই কথাটি বলিয়া মনোরমা মুখ নামাইয়া একটুখানি ঠোঁট টিপিয়া হাসিল সস্র সস্র সব মেয়ের ঠোঁটেই একটু একটু হাসি দেখা দিল।

প্রেমকুসুম হাতের পেন্সিলটা দিয়া মনোরমাকে ছুড়িয়া মারিলেন,—তাহার পর ভাঙ্গা পেন্সিলটা কুড়াইয়া দিতে হুকুম দিয়া উহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, “কি—সব ডেঁপো হয়ে যে উঠছেন! দাঁড়াও না, মিস্ বোসকে তোমাদের সব বিত্বের কথা শুনিয়ে দিচ্ছি!—এই অলকা! তোর কানে ও কিসের ছল রে? সিরোপাল? সুন্দর ত! কতর কেনা হয়েছে? কোথা থেকে আনানো হ’লো? দাম জানিস?—ওঃ! মোটে কুড় টাকা! এক্সসেলেন্ট! এই মেয়ে! মাকে ব’লে আমার একঘোড়া আনিয়ে দে’ না?”

অলকারা দুই বোন—অলকা ও অনুকা দুজনেই একসঙ্গেই সমুৎসুককণ্ঠে কহিয়া উঠিল—“আজই বাড়ী গিয়ে মাকে বলবো’খন আমি, মা কালই নিশ্চয় কল্কাতার দাদাকে লিখে দেবে পাঠাতে।”

তখন অপর ক্লাস হইতেও একটি দুইটি বড়-মেয়ে উৎসাহচঞ্চলগোভাকুলকণ্ঠে ইহার প্রতিধ্বনি তুলিল—“ও তাই অলি! আমিও মাকে ব’লে টাকা দেবো তাই! আমাকেও একঘোড়া ছল আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু!”

যে মেয়ের অঙ্কের তিন ভাগ ভুল হইয়াছিল, তাহাকে তিরস্কারপূর্বক প্লেটখানা ফিরাইয়া দিয়া প্রেমকুসুম ঐ মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিলেন, “তোকে আবার এখনি কানের ছল কিনে দিয়ে কি হবে রে মেয়ে? আবার তো ছাদিন পরেই বিয়ের সময় দিতে হবে।”

মেয়ে জবাব দিল, “হ্যাঁ, তা’ বই কি! আর আপনার, আপনার বুঝি পরতে দোষ হয় না? আপনারও তো—”

“কি? বিয়ের সময় হবে? কে দেবে? দেবার যদি কেউ থাকতো তো কি এইখানে এই সব গোক চরাতে আসি রে? এই সুখা! কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ রাখতে? তারি চালাকি হচ্ছে!”

“এই যে হয়ে গেছে—প্রেমকুসুমদি!”

“আচ্ছা প্রেমকুসুমদি!—না বাগু, বলবো না—আপনি হয় ত রাগ করবেন!”

“হা, হা, বলিস্নি, ডেঁপোর শেষ হয়েছে এই মেয়েগুলো। একদিন মিস্ বোসের কাছে না—এই সব শীগগির ভাল করে বোস, মিস্ বোস

আসছেন যে! সুপ্রভা! চার সতেরং কত হয়? তবে যে এখানে চৌবট্টী লিখেছ বড়?”

\* \* \* \* \*

নীলিমা বতকণ সেই ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে আনোদিত বন্ধ গাড়ীর ভিতরে বসিয়া ছিল, সমানেই সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া মুহূর্হু চোখ মুছিয়াছে। তাহার নিত্যন্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গোলকটের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর ঘেঁষে উপস্থিত ছিল না, তাই তাহার এই অনাহুত অশ্রুজলের বেগ সামলাইয়া রাখার অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও যে ছিটাকোটাটা জোর করিয়া বাহিস্থ খাঁ হইতেছিল, সেটার আর কৈফিয়তের দ্বারে পড়িতে নাই। সারা পথই তার এমন করিয়া কাটিয়াছে, বিশেষতঃ যখন এলবার্ট স্কুলের গাড়ীখানা তাহার নুতন গাড়ীর পাশ দিয়া ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া গম্গম শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, গাড়ীর মধ্য হইতে প্রতিদিনকার মতই মেয়েদের কল্কল করিয়া কথার শব্দ, হাসির স্রোত বায়ুতরঙ্গে মিশিয়া নীলিমার কানের কাছে ভাসিয়া আসিল, মনোরমার তীক্ষ্ণ হাতের সহিত অনুকার বন্ধারীকলহাস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া নীলিমার বুকের বাধাপর্দায় বেন একটা ঘা দিয়াই কতকগুলো পুরাতন স্মর বাজাইয়া তুলিল। কত সুদূর দিনের স্মৃতির ভাণ্ডার একসঙ্গে উলটিয়া পড়িল; আর যেন নিজেকে সামলান গেল না।—পাছে উহারা তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে গাড়ীখানাকে দেখিয়াই সে তাহার সমুখের টানা ঝিলঝিলি করটা নামাইয়া দিয়াছিল, আবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেও তাহার এই অশ্রুপ্রাণিত মুখখানাকে আজকের সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই সকল সঙ্গিনীদের দেখাইতে হয়। নীলিমা বিপর ভাবে অবশেষে নিজের দুই জামর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ ওই অত বড় গাড়ীখানার—অতগুলি মেয়ের মধ্যে শুধু তাহারই অতটুকু যায়গা খালি হইয়াছে! না জানি তাহার কথা উহারা কত কি-ই বলাবলি করিতেছে? হয় তো তাহাকে আনিতে আজও গাড়ীখানা তাহাদের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়াছিল! কে না জানি কি বলিয়া ফেরৎ দিল? ভাগ্যে সমস্ত তাহার বাবা বাড়ী থাকেন না! কিন্তু আজ তো নীলিমা তাহাকে আসার সময় বাড়ীতেই দেখিয়া



আসিয়াছিল। তবেই হইয়াছে! গাড়ী তো ঐ দিক্ দিয়াই আসিল? বাবা না জানি দাইকে কি কথাই বলিলেন? ঐ যে মেয়েরা অত কল্কল করিয়া কত কথাই বলাবলি করিতেছিল, অত হাসি-হাসি করিতেছিল, সে তাহার, আর তাহার বাবার কথাই নহে তো?

লজ্জায় নীলিমার চোখের জল শুক হইয়া গেল, এতক্ষণ স্কুলে পৌঁছিয়া দাই—তাহার সঙ্গে মেয়েরা যোগ দিয়া তাহাদের কথা কি ভাবেই বলাবলি হই-তেছে? বাকি টাকা ফাঁকি দিয়া নীলিমা স্কুল ছাড়িয়া দিল শুনিয়া স্কুলোচনাদি' কত বড় ঘৃণার সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ বিচার করিবেন। আর তো দেখাও হইবে না যে, সে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, এ কার্য্য সে একেবারেই নিজে ইচ্ছা করিয়া করে নাই! কিন্তু তাহাই বা কেনন করিয়া সম্ভব? স্কুলোচনাদি'র গভীর মুখ দেখিলেই যে বড় ভয় করে, তাঁহার সঙ্গে কি সহজভাবে কথা কহা যায় যে সে তাঁহাকে সুবিধা পাইলেও বুঝাইয়া দিবে যে সে দোষী নয়? না না, সে কখনই হইবে না,—দোষী হইয়াই উহাদের নিকট হইতে তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইল।—আবার চোখের জলে তাহার বুক ভাসিতে লাগিল এবং তাহার পারিপার্শ্বিকগণ তাহার এই মেঘ বৃষ্টির ক্ষণিক খেলা অবাস্থ্যে নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া বিশেষ কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না। হুই এক জন পরস্পরকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, “ই-বাকালীন্ কাইসে-আরী?—ই-রোতী কাহে হায়?” কিন্তু উত্তর প্রশ্নেরই “কা’ জানে।” এই উত্তর মাত্র পাওয়া গেল। অগত্যা তাহারা তাহাদের মধ্যে আকস্মিক সমাগতা এই নূতন অদ্ভুত জীবটি সম্বন্ধে অথবা কোতূহলকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া সম উরুস্বরে এক বীণা ভঞ্জন আরম্ভ করিয়া ক্ষুণ্ণিযুক্ত হইয়া চলিল :—

‘—হে মেয়া যেত্ত! হে মেয়া প্রভু?

আইসিও মেয়া লগ্গে,—ছোড়িও না কভু।”

স্কুলের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন মন ঈষৎ একটুখানি সুস্থ হইলেও দেশী ও বিলাতী মেম এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক চুনরী শ্রাকড়াপরা বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীলিমার সমস্ত শরীর-মন আবার যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু

৫ম (খ)—৫

হইয়া আসিল। ইহাদের মধ্যেই তাহাকে সারাদিন যাপন করিতে হইবে?—ইহাদের কাছেই পড়া লইতে দিতে হইবে? ওঃ, কোথায় মিস্ দে’, প্রেন-কুসুমদি, এমন কি, স্কুলোচনাদি'র সেই গভীর কঠিন মুখখানাও আজ তাহার মনের মধ্যে যেন মধুকরণ করিতে লাগিল। অপ্রিয়ভাবিণী সাবিত্রী মনোরমাকে তাহার যেন আজ স্বর্গাসিনী দেবকন্ডার দল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। কি করিলে, ওগো, কি পুণ্য করিলে ইহারা তাহারা কইরা যাইতে পারিত!

সন্দের দাই কি বলিয়া দিল, চিঠি দিল; শুনিয়া ও পাঠ করিয়া এক জন মেম আসিয়া হতবুদ্ধি নীলিমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। একটি অপূর্বদর্শন সুসজ্জিত আর একজন সুগাঙ্গী রক্তবদনা মেম প্রকাণ্ড একটা চৌকীতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন; নীলিমার সমভিব্যাহারিণী মেমটি তাঁহাকে ইংরাজীতে কি সব বলিতে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া নীলিমার দিকে ক্ষুদ্র ও কপিলবর্ণের চক্ষু'র ফিরাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন, “হে আমার প্রিয় বালিকা! তোমারই নাম কি নীলিমা চাকরভারতী?”

নীলিমা ঘাড় বাঁকাইয়া ইহার জবাব দিলে পুনঃ প্রশ্ন হইল—“তুমি এক্ষণে কত দিনের বৃদ্ধ হইয়াছ?”

নীলিমা এ প্রশ্নের অর্থ ঠিক জ্ঞানকর করিতে না পারিয়া নীরব থাকিলে মেম ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও হায় হায়, বেচারী বালিকা! তুমি যদি তোমার নিজের মাতৃ-জিহ্বাকে (ইওর মাদার টং) ভুগ কর, তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।”

এইরূপে নীলিমাকে মিসন স্কুলে ভর্তি করিয়া লইয়া তাহাকে ‘বেঙ্গলী ক্লাশে’ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই মিসনের সঙ্গে যে অনাধাপ্রম (অরফ্যানেজ) ছিল, তাহাতেই দুইটি বাঙ্গালীর মেয়ে এবং স্থানীয় দুই এক জন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থ বাঙ্গালীর মেয়েকে ইহারা ‘ভজন-সজন’ দিয়া আনিয়াছে, ইহাদের লইয়া মিসেস্ গুই টিচারের অধীনে এক ‘বেঙ্গলী ক্লাশ’ খোলা হইয়াছিল। নীলিমা তাহারই অন্ততম ছাত্রী হইয়া একটুখানি দলপুষ্ঠ করিল।

সে যখন ক্লাশে ঢুকিল, তখন সেই ক্লাশের পড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা ভূমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া প্রার্থনা করিতেছিল; কেবল মিসেস্ গুইই মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন যে, মেয়েরা কেহ চোখ চাহিতেছে

কি না। নীলিমাও উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সকলের মুখে গুনিয়া গুনিয়া যতটা পারিল, আবৃত্তি করিল :—

“হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মাত্র হউক,—তোমার ইচ্ছা আইসুক। আমাদের দিবসের আহাৰ এই দিবসে আমাদেরিগকে দাও এবং আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরা নিজ অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া থাকি। আমেন।”

প্রার্থনা শেষ হইতেই মেয়েরা সম্মুখে হুহু করিয়া গান ধরিয়া বসিল। নীলিমা অজ্ঞতাবশতঃ হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মিসেস গুই তাহার দিকে চাহিয়া গাহিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—

“চেষ্টা করতে পারতে।”

নীলিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।—

“বল না ভারত যুগাবে কত, পড়িয়া পাপের ঘোরে।  
দেখ না চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে, ত্রাণ-ভানু ওই অ-দূবে,  
হরি রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যাও ভুলে,  
নোড়া-মুড়ি ফেল সাগরের জলে,  
যদি পার চাহ ভবান্বিতকুলে, সার কর তবে যীশুরে।”

এই গানটি শেষ করিয়া পড়ার পালা। মিসেস গুই নিজের বাঙ্গালা বাইবেলখানি খুলিয়া আরম্ভ করিলেন—“ঈশ্বর বলেন। শেষ যুগ এইরূপ হইবে।—আমি সমস্ত সংসারের উপর আমার জ্ঞান আর বর্ষণ করিব।”

সঙ্গে সঙ্গে সকল মেয়েই নিজ নিজ বাইবেলের পাতা আঙ্গুলে খুঁ খুঁ মাখিতে মাখিতে খুলিয়া ফেলিল ও সেইরূপ সম্মুখে আরম্ভ করিল :—

“আর তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ প্রবচন বলিবে।

“আর তোমাদের যুবকরা দর্শন দেখিবে।

“আর তোমাদের প্রাজ্ঞানরা স্বপ্ন দেখিবে।

“হাঁ, আর সেই যুগে আমার দাসদের উপরে আর আমার দাসীদের উপরে আমার জ্ঞান আর বর্ষণ করিব ও তাহারা প্রবচন বলিবে।”

ছুটির পূর্বে পুনশ্চ প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া ছুটি হইল। এবারকার গানটি না গাহিয়া পাছে নীলিমার আত্মার অনন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই ভয়ে উহা নীলিমাকে একখানি কাগজে লিখিয়া দেওয়া

হইয়াছিল; তাহার আর ভুল করিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। সেই গানটি এইরূপ :—

“ওরে পাতকি!

ভবপারে যাবার উপায় করলি কি?

ও তোর ব্রহ্মা সুরেন্দ্র, আর কৃষ্ণ মহেন্দ্র—

তারা আপন পাপেই হাবুড়বু

তোমার উপায় করবে কি!”

ছুটি হইয়া গেলে মেয়েরা কপালে হাত ঠেকাইয়া “গুরুমা! নমস্কার!” বলিয়া বিদায় লইতেছিল, মিসেস গুই তাহাদের ফিরিয়া ডাকিলেন।

নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এই মেয়েটা আজ কোথা থেকে এলো? এই! তোর নাম কি?”

নীলিমা বিব্রাঙ্কিত স্বরে উত্তর করিল—“শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী।”

“হাঁ হাঁ, হিঁহুয়া অর্থ না বুঝেই নাম রেখে বসে তা জানা আছে। তোর এমন ফরসা রং অথচ নাম রাখলো নীলিমা!—আমি হিঁহুবাড়ীতে এক জন ঘোর কালো রংয়ের মেয়ের বিদ্যাবলতা নাম রাখতে শুনেছি। নীলিমা! আচ্ছা, আমি তোকে নেলী ব’লে ডাকবো—এই নেলি! তোরা পুতুল-পূজা করিস্ ত?”

নীলিমাকে নতমুখ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন—“ধবরদার! আর কখনও ও কাজ করিস্ নে। নরকের কথা শুনেছিস? সেখানে দিনরাত আগুনে পোড়ায়।—পুতুলপূজা করলে তার নরক হয়, আর—নরকের যে কি যন্ত্রণা, সে সব আমি কাল তোকে ভাল ক’রে বুঝিয়ে দেব এখন; আজ আর আমার সময় নাই। মনে কর, মৃত্যুর পর আর অনন্তকাল ধ’রে সেই রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অথচ যীশুকে যদি ভজনা করিস্, শেষ বিচারের সময় যীশু তোকে কোলে ক’রে নেবেন। স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হ’তে পারবি,—কেমন, পুতুলপূজা ত্যাগ ক’রে এখন থেকে যীশুকে মান্‌বি ত?”

অনন্ত নরকের ভয়েই হউক, আর মিসেস গুইয়ের বিরাট বপু ও তীক্ষ্ণ বসনার ভয়েই হউক, নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, সে যীশুকেই মানিবে এবং এই কথাটা স্বীকার করিবার সময় তাহার মাথার চুলের গোড়া হইতে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত



বারবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, যেন কিসের একটা তাড়নায় সে এবার আর মিসেস গুইকে “নমস্কার” না বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অনন্ত সুখের প্রলোভনদাত্রী মিসেস গুইয়ের কদাকার ও প্রকাণ্ড মুখখানাকে হঠাৎ তাহার সেই নরকের দ্বারপালেরই বিকট মুখের মত ভীষণ বোধ হইল, সেই নরকেরই একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা কুমীরের মতই ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সেই মুখটা যেন তাহাকে গ্রাস করিতে তাহার দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।—সে যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, মহরগতি গো-বান যখন চলিয়া চলিয়া মিসনবাড়ীর প্রশস্ত নয়দান ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, তখন সে একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে জোর করিয়া যেন ঠেলিয়া ফেলিল; ভরসা করিয়া যেন সেই অত্যাচ্ছ প্রাচীর-বেষ্টিত বিলুপ্ত-চিহ্ন বাড়ীটার পানে চাহিতে সাহসী হইল; কিন্তু তখনও তাহার শরীরের ভিতরে ভিতরে কম্পনের বেগটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই; তখনও তাহার কপাল দিয়া শীতের দিনে টস্টস্ করিয়া ধাম ধরিয়া পড়িতেছে। কেন, বা কি জন্ত কিরূপ একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়না সে খাইল, তাহা তাহার নিকট বেশ সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু তাহার জীবনে কিছু যেন একটা অভাবনীয়—একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের সূচনা আজ এইখানে দেখা দিয়াছে, বালিকা হইলেও ইহা তাহার সমস্ত অন্তরাগ্না যেন বুঝিতে পারিয়াই অমন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা খুশুবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের কাছে আদরে আপ্যায়িত হইল। কিন্তু যে ভাইটিকে সে বোধ করি এ পর্যন্ত সকলের অপেক্ষাই অধিকতর ভালবাসিয়াছিল, আজ শুধু তাহার নিকট হইতেই তাহার কোন স্বাগতসম্ভাষণ আসিল না। বিস্মিত হইয়া সুশীলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বিনতা চৌট ফুলাইয়া জবাব দিল, “তুমি চ’লে গিয়ে পর্যন্ত দাদা না কি কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে আসে! কার সঙ্গে

না কি কথাই কর! ছেলে ত দিন-রাত্তির অন্ধকার মুখ ক’রে বাইরের একটা ঘরে শুয়েই আছে। কেউ ডাকতে গেলে ভাল ক’রে জবাবও দেয় না।”

তরুল এই সংবাদে শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, “তার অস্থখ করে নি ত? বাবা কি বলেন?”

বিনতা কিতাবীধা বেশী ফুলাইয়া জবাব দিল,— “বাবা কি বলবেন,—বাবা কি কাউকে কোন দিন কিছু বলেন? ঠাকুমা বাস্তব হচ্ছিলেন, তাই বলেন, ‘ওর শরীরটা হয় কিছু অস্থখ আছে, আর তার চেয়েও তরুল জন্ত মনটাই বোধ করি, বেশী খারাপ, থাক, একটু রেস্তা নিক।’—তাই এখন ছেলে শুয়ে শুয়ে ‘রেস্তা’ নিচ্ছেন; একেবারে নট নড়ন চড়ন, নট কিছু!”

সে দিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটয়া গেল, সুশীলের এত দিনকার সংযত ও সুভদ্র জীবনযাত্রাপ্রণালীর সহিত সেটার এতই অনৈক্য যে, সেই কাণ্ডটাতেই বোধ করি, তাহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিত, যদি শুভেন্দু তাহার স্বন্ধে ভর করিয়া তখনও তাহাকে পরিচালিত না করিত। বিপ্রদাস বাবুর বাগানের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বুঝিতে পারিল, সুশীল নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ খুব কাছে আসিয়া সুশীলের যে হাতটা কাছে পাইল, জোর করিয়া সেইটাকেই চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল, “সুশীল!”

সুশীল কথায় ইহার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের অপর হাত দিয়া কোঁটার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। শুভেন্দু কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ভরিয়া তাহা সুশীলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ পূর্বক কহিয়া উঠিল, “তুমি ক’টা ছেলের মতন কাঁদছ সুশীল? তোমার বয়স বার বছর না চৌদ্দ বছর?”

এ প্রশ্নেরও সুশীল কোন উত্তর করিল না বটে, কিন্তু এই অবমাননাজনক প্রশ্নে তাহার অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে যে একটা উত্তেজনার মাদকতা তাহার শরীরের রক্তকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার ধৃত হস্তের অকস্মাৎ কঠিন হইয়া যাওয়াতেই শুভেন্দু বুঝিতে পারিয়াছিল। তড়িত এই ছেলেটির চরিত্র-লিখা তাহার নিকট একান্তই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিছুদূর হই জনৈক নীরবে পাশাপাশি চলিয়া

আসিবার পর শুভেন্দু পুনরপি একটা আকস্মিক প্রশ্ন করিয়া বসিল, “এখন কি বাড়ী যাচ্ছে?”

সুশীল এই প্রশ্নে যেন একটুখানি হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এই ভরা সন্ধ্যায় এবং এইমাত্র তাহাকে লইয়া যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহারও পরে তাহার মত চৌক বহুরের ছেলেতে বাড়ী না গিয়া যে আর কোথায় যাইতে পারে, তেমন কথা তাহার মনের কোণেও কখন উকি দিয়া যায় নাই, তাই সে বিস্মিত ও বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “না হ’লে আর কোথায় যাব?”

শুভেন্দু এই প্রতিপ্রশ্ন শুনিয়া বাবের মতন গর্জিয়া উঠিল, “কোথায় যাবে? কুকুরের মতন চাবুক খেয়ে এসে কৈদে ভাসিয়ে দিয়ে এখন চলো, ‘না হ’লে আর কোথায় যাব!’ পিঠে ওই চাবুকের জালা নিয়ে ভাত খেতে—ঘুমতে পারবে? গলায় সে ভাত বাধবে না? চোখে ঘুম আসবে?”

সুশীল আবার নীরব রহিল, কিন্তু অক্ষমতার অসহায় কোণে তাহার সর্বশরীরে যে টান ধরিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। শুভেন্দু উহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “আমি তোমাদের মতন ভাল ছেলে নই, সুশীল। আমার ঐ অবিচারের চাবুকের জালা বড়লোকের বাড়ীর পিঠে-পায়সে জুড়িয়ে যাবে না—আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।”

শুভেন্দু চলিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিল, সুশীলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরাইয়া কোমল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, “তুমিও এলে?”

“হাঁ” বলিয়া সুশীল হন হন করিয়া আগবাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হাসিয়া শুভেন্দু ডাকিল, “ওহে, শোন।”

“কি?” বলিয়া এবার সুশীলই ঘাড় ফিরাইল।

“রায়দীঘির পশ্চিম পাড়ে সেই নাদা বাড়ীখানা।”

“হু—”

“বাড়ীর উত্তরদ্বারের প্রকাণ্ড গোয়ালবাড়ীটা কখন লক্ষ্য করে দেখেছ?”

“দেখেছি।”

“দিব্যি হবে!”

“কি?”

“ভেয় বহুরে এমনটুকু পাশ করলেই যে মানুষ

বিদ্বান ■ না, তুমি তার একটি একের নম্বরের উদাহরণ! চাবুকের জালায় শোধ সেই প্রকাণ্ড চালাখানার জালায় ভোলবার বেশ সুবিধা হবে, তাই বলছিলেন, তোমার কি এতটুকুও বোঝবার শক্তি নেই?”

সুশীলের মাথা হইতে পা অবধি সম্বনে কাঁপিয়া উঠিল, “আগুন দেবে? সে যে মৃত্ত একটা অপরাধ!”

“আর দুটো পেয়ারা পাড়ার ■ ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকর দিয়ে চাবুক খাওয়ানটা বুঝি বিশেষরূপ গুণ্যাকার্য?”

“কিন্তু আগুন দিলে—”

শুভেন্দু হাত দিয়া পিছনে দেখাইয়া অমূল্যস্বরে কহিল, “তুমি বাড়ী যাও”—বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। লোহা যেমন করিয়া চুসকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তেমন করিয়াই সুশীলও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।

গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া ভুবনবাবু তাঁহার শয়নগৃহের মুক্ত বাতায়ন দিয়া, গ্রামের দক্ষিণভাগে একটা অগ্নি-পর্বত দেখিতে পাইলেন। মনটা তাঁহার বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল, না জানি কে বা কাহারো বিপন্ন হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দ্বার খুলিয়া বারান্দায় পা দিবারাত্র তাঁহার মনে হইল, কে যেন এক জন তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। সে ঘরটা সুশীলের এবং উহার দ্বার যে ভিতর হইতে বন্ধ ও তাঁহার ঘরের দিকে মাত্র খোলা থাকে, সে কথা যত্নবশতঃ স্মরণ হইল না। মনে করিলেন, কোন পুরুষহিলা আগুন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গিয়াছেন। নীচে নামিয়া আর দুই তিন ■ চাকর ও দ্বারবানকে যদি সন্ধ্যায় ■ বিজ্ঞান-দের কথকিত সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া অনেককণ এ দিক্ সে দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানে পা দিতেই আবার তেমনই করিয়া একটা ছানামূর্তি সরিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মর্মান্তিক বেঙ্কনার চিহ্ন—অক্ষুট কান্নার শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। প্রথমে ইহাকেও লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কান্নার শব্দও যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও স্পষ্ট হইয়া কানের কাছে আসিল, তখন বিস্মিত ■ সন্দেহ হইয়া ভুবনবাবু তাঁহার ও সুশীলের ঘরের মধ্যবর্তী দ্বারের



নিকট আসিলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু এবার বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কান্নার শব্দ এই ঘরের মধ্যে হই-  
তেই সৃষ্ট হইতেছে বটে।

ভুবনবাবু ডাকিলেন, “সুশীল!”

উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু কান্নার শব্দ বন্ধিত হইল।

“সুশীল, আমার কাছে এস।”

ভুবনবাবু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ দেখা দিল না। এরূপ প্রায় হয় না। অতিমাত্র বিষয়ের মধ্যেই তাঁহার সহসা মনে হইল, হয় ত যে ছায়ামূর্তিকে দুইবার অপসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুশীলরই। ঐ অসহনীয় আগুন জ্বালায় ভীষণ দৃশ্য চোখে দেখিয়া বালক ভয় পাইয়াছে, ব্যথিত হইয়াছে; আন্দাজে আন্দাজে কাছে আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াই। “সুশীল!” বলিয়া ডাকিতেই ভয় পাওয়া শিশুর মত সুশীল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর্তনাদের মত করিয়া উচ্চারণ করিল, “বাবা!”

“বাবা! ভয় কি? এস; আমার ঘরে এস;—আমি চাকরদের সব দেখতে পাঠিয়েছি—যদি কিছু করতে পারে, তার জন্তও তারা চেষ্টা করবে—”

“বাবুজি!”

“কে রে, রামপ্রসাদ? কি খবর?”

“আর খবর কবুতাবাবু? রায় বাবুদের গোশালা একদম রাখসে রাখ হোয়ে গেছে। সে জন্তে এতটুকু দুঃখ নেই—চৌধুরী সাহেব বড় ছদ্মন আদমী আছে, লেकिन একঠো বাচ্চী ইস্কে সাধ মরু গিয়েছে, সেহি একঠো বড়ি আপশোষকা বাত ছায়।”

একটা সঙ্কল্প আর্তধ্বনির সহিত সুশীল সংজ্ঞাহারা হইয়া তাহার পিতার বুকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সেই হইতে সুশীলের এই রোগের উৎপত্তি, বাড়ীর লোক বলিতে লাগিল, একে ত তরুর জন্তে ওর মনে মোটেই সুখ ছিল না, তাহার উপর আবার এই যে আগুন লাগা ও গোরু পুড়ে মরবার খবরটা আঁচমকা ঘুম ভেঙেই দেখে শুনে তাহার দয়ার শরীর একেবারে গলে পড়েছে রে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ গড়াইল না। সে দিনের সেই নিশীথ অগ্নিকাণ্ডের গুপ্ত নামকরূপে যাহাকে অভিযুক্ত ও পুলিশ সোপর্দ করা হইল, সে বিপ্রদাস চৌধুরীরই এক জন পূর্বতন ভৃত্য। দিনচারেক পূর্বে বাবুর একটা রূপারখান ছড়ি চুরি যাওয়ার ইহার প্রতি সন্দেহে ইহাকে থামে বাঁধিয়া প্রহার করা হয় এবং ইহার পর সেই অপহৃত ছড়িটি আর এক ভৃত্যের নিকট হইতে পাওয়া যাওয়ার তাহাকে পুলিশে চালান দেওয়া হয়। নিরপরাধে প্রহৃত অবমানিত গোপাল ছাড়া পাইবামাত্র তীরবেগে বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল ও চীৎকার শব্দে দশেধর্ম্মে দোহাই পাড়িয়া দেবতা মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া শীঘ্রই এই নৃশংস অবিচারের শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে ধারণানরা তাহাকে আর একবার অর্দ্ধচন্দ্র দিতে অনিচ্ছুক ছিল না, কিন্তু ততক্ষণে সে পথে পড়িয়া দৌড় দিয়াছে। সাক্ষ্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে, কয়দিন ধরিয়াই তাহাকে চৌধুরীবাড়ীর আশেপাশে সন্ধ্যার পর চুপি চুপি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। আগুন লাগাইবার সময়টার সে অবশ্য সাক্ষী রাখিয়া লাগায় নাই, তবে সব চেয়ে নিকটবর্তী দোকানদার সাক্ষী দিল যে, এক ডিবা কেরোসিন তৈল ও একটা দিম্বাশলাই এই উদ্দেশ্যেই সে তাহার দোকান হইতে রাতি নগটার সময় কিনিয়া ওই দিকেই গিয়াছিল।

গোপাল এ সব কথা কিছুই অস্বীকার করিল না, শুধু তাহার উপর প্রযুক্ত এই ভীষণ অপরাধটাকেই সে অস্বীকার করিল। অনেক পীড়া-পীড়িতে সে আদালতে বলিল, “রাগের মাথায় শোধ লইবার কথা বলিয়া আসিলেও বাবুর উপর যে তার শোধ লইবার উপায় নাই, তাহা সে এক দিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিল। আর শুধু সেই জন্তই দেশে না গিয়া বাবুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছিল।” কারণ জিজ্ঞাসায় অবনতমুখে উত্তর দিল, “বাবুর শরীরে দয়া-ধর্ম্ম কখনই নেই; চাকরদের তিনি কখনও মানুষ মনে করেন না। ‘শালা’ ‘ব্যাটা’ ভিন্ন কোন দিন নাম ধরেও কাককে তিনি ডাকতে পারলেন না,—অথচ তাঁর পোষা কুকুরদের আদরের নাম ‘টেবি’ ‘লুলু’। কান্দুরী বেরালটাকে

আদর ক'রে 'গারল্যাণ্ড' ব'লে ডাকা হয়। লাল-মাছ, নীলমাছ, পাখী, পাখরা, হরিণ, খরগোসের পিছনেই তিন তিনটে চাকর। তাঁর বিলিভী কুকুরে রোজ তিন সের ক'রে মাংস খায়, কিন্তু চাকরদের বেলায় মোটা চালের ভাতের উপর সব দিন একটু শাকচচ্চড়িরও অভাব ঘটিয়া যায়—অথচ সেই ভাতের গরাস কমটা তুলিবার মধ্যেও ফাই-কংমাসের জন্ত ডাক পড়াপড়ি বন্ধ হয় না। যাক, তার জন্ত আমি কিছু বলি না, সে আমাদের বরাতের দোষ। আর জন্মে বাবুর কাছে ধার নিয়ে শোধ দিই নি, তারই জন্ত এবারে তার শোধ মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর আর জন্মে কি পুণ্যকাজ ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এ জন্মে উনি দশ জনের ওপোর এই হুকুমজারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। এর জন্তে কঁাদাকাটি ক'রে আর হবে কি? আমি শুধু একটবার দিদিমণির মুখটি দেখে যাবার জন্তে ক'দিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। অমন দানব বাপের বে তেমন দেবতার মতন মেয়ে কোথা হ'তে এলো, সে আমরা তো সবাই ভেবে কুল পাই নে।”

গোপালের এ সব ছেঁদো কথা আদালতের স্তম্ভ বিচারে টিকিল না, যেহেতু গরীবের মত ছোটলোক ত আর সংসারে দ্বিতীয় নাই—উহারা যখন বড়মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নিশ্চিত জানা কথাই যে, তাহার ভিতর পনের আনা সাড়ে তিন পাই জৈব্যা ও বিদ্রোহ মিশ্রিত আছে। উহারা যদি মনিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধোষণা করিয়া কখন জয়লাভ করে, তবে সে দৃষ্টান্ত বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সংক্রামক ব্যাধির জ্বর উহা ভৃত্য-জাতীরের শীতল শোণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলে। উহাদের স্পর্শা বাড়ায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সবারই ঘর সামলান দরকার বলিয়া অন্তান্ত নিরপেক্ষ জ্ঞানবান বিচারক ব্যতীত প্রায়ই জ্বরের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। তবে এমনটাও ঘটিয়া থাকে যে, যদি কালেক্টর সাহেব আবার কোন কারণে সেই মনিবটির উপর বিরূপ থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যটি দোষী হইলেও জয়লাভ করে। এখানে তেমন ধারাটি না কি ঘটে নাই এবং শিক্ষিত উকীলের বক্তৃতায় বেশ বাঁধুনীও ছিল, সাক্ষীরাও খুব পাকা এবং হয় বা হাকিমটিও একটু কাঁচা। গ্রন্থদাহকারী গোপালের বিরুদ্ধে রায় বাহির হইল।

দণ্ডদেশ শুনিয়া গোপাল সাক্ষীরা বারেক উর্কে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—“হা ভগবান!” তাহার পর নিজের উদগত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে সজলগাঢ়স্বরে আত্মগতই কহিল, “দিদিমণি রে! আমার এই সাজার কথা শুনে তুই কত যে কঁাদবি, ভাই! তুই ছুটে এসে আমার উপর চেপে না পড়লে, সে দিন বাবুর হুকুমে আমার তো মাধো সিং ব্যাটা মেরেই ফেলেছিল। আহা, তোর কচি মুখটি আর একটবার দেখা হলো না রে!” বলিতে বলিতে প্রৌঢ় হু হু করিয়া কঁাদিয়া উঠিল। কঁাদিতে কঁাদিতে হাকিমের দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বলিল—“ধর্মাবতার! আমার বাবুর মস্ত লোকসান হয়েছে, শুনেছি, মা-ভগবতীর হত্যাকাণ্ডও না কি হয়ে গেছে। তা'র জন্তে আমি না হয় শাস্তিই পাচ্ছি, তা মনি অপরাধে হ'লেও আমার তেমন দুঃস্ব ছিল না, কিন্তু ছজুর! আমার দিদিমণি যদি সত্যি ক'রে মনে করে যে, তাঁর বাবার উপর শোধ তোলবার জন্তে—আমি তাঁদের ভাত খেয়ে মানুষ,—আমি এত বড় লোকসান ঘটলাম, একটা অবোলা জীবের হত্যে করলাম; এই দুঃস্বই যে আমার জেলখানায় মরণ ঘটলেও ঘুচবে না! এদাগা আমার বুকে শেষ পর্যন্ত থেকে গেল।”

উকীলের দিকে চাহিয়া বলিল, “বাবু! এখন ত আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন একবার রূপা ক'রে আমার বাবুর বাড়ী যেয়ে আমার দিদিমণিকে ডেকে ব'লে যাবেন যে, তার গোপালদাদা, সত্যি তাঁর গোয়ালঘর পোড়ায় নি; তাঁর ললাটের লেখনই এই কাজ করেছে, সে নয়। বাবু! আমার বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেউ নেই—আমার লেগে চোখের জল ফেলতে শুধু ঐ একটি জনই আছে।—আহা রে! ‘গোপালদাদা’ বলতে বাছা যে আমার অজ্ঞান হয়ে যায়। রাগের মাথায় তিড়িতিড়িয়ে বেরিয়ে এমু—বাছা আমার অকর করে কেঁদে কি ভাসিয়ে দিলে! যেমন দেবতার চোখের জল ফেলান—তাঁর ফল ফলবে না?—” বলিতে বলিতে এবার সে নিজেই কাঠগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কঁাদিয়া ফেলিল।

আদালতের লোকদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত চোখ মুছিলেন, কেহ বা মুছ হাসিয়া অপরকে বলিলেন, “একটা জানে মন্দ না!”—কেহ বলিলেন, “বেটা দাগী।”



ভুবনবাবুর বাড়ীতেও খবরটা প্রচার হইল। এখনকার ছবিবিনীত ভৃত্যজাতীয় লোকেদের উপর প্রায় কেহই সম্বন্ধ নহে। তাহারা এখন কথায় কথায় মনিবের উপর চোখ রাখায়, মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে চাকরী ছাড়িয়া দেয়, ভাল খাওয়া-পরাই দাবী তুলে, আবার অনেকেই গাঁজা, গুলি, সিগারেট, বিড়ি,—পশ্চিমারা ইহার উপর তাড়ি ও সিঁকিতে চুর হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসে। মেজাজেরও ঠিক থাকে না। মনিব চাহেন, সম্ভার সুরঞ্জিত বিনীত ভৃত্য। ভৃত্য—কালধর্ম্মে বিনীত তো নহেই—সম্ভারও নহে; অধিকন্তু মনিব-পুত্রের অহুকরণে নব্যমানায় চুলছাঁটা, সিগারেট টানা, পাতলা বিলাতি ফিতাপেড়ে সাজীটি পরা, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী গায় দিবার মথটুকু পুরা-দস্তরই তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। তা হইবেই বা না কেন? যখনকার বাবুরা খাটো ধুতী, হাতকাটা বেনিয়ান ও ঠনঠনের চটি পরিত, তখনকার ভৃত্যদেরও সেই খাটো ধুতী ও বাহিরের জন্ত একটা মেরজাই-ই যথেষ্ট ছিল। তোমরা যদি ‘ঘোড়ারোগে’ শিক্ষিত হইয়াও মরিতে পার, উহারাই বা বাঁচিয়া থাকে কিসের জোরে? তোমাদের স্কুলের ছেলে “হাওয়া-গাড়ী” মার্কি সিগারেট পকেটে লইয়া বেড়ায়, ওদেরও সেই বয়সের ছেলেরা তোমাদের ঘরে চাকরী করিতে আসিয়া অমন সূদৃষ্টাঙ্গটা গ্রহণ করিবে না?

কিন্তু মানুষ নিজেদের দোষ দেখে না। তাই মনিব যখন কোপ্তা কোন্সী দিয়া লুচি খাইয়া যাওয়ার পর বামুনঠাকুরের রূপায় মোটাচালের ধরাগন্ধ ভাতের সঙ্গে শাকচচ্চড়ি ও ডালের ঝোলের অভাবে তোমার চাকর তোমার উপর চোখ রাখা করিয়া আসিল, তুমি অমনিই তাহার সেই রান্না চোখের ছবিখানি দেখিয়াই তাহার স্পর্কার পরিমাপ করিতে বসিলে। নিজের পূর্ণ উদরের চাপে শরীর হাঁসফাঁস করিতেছে, কাজেই চোখ যে তাহার কেনই রান্না হইল, সে কথাটি তো ভাবিলে না। ধমক দিয়া বলিলে, “এমন এক আশ দিন হয়।” সে ইহার জবাব দিল, “এমন বাড়ী কাজ করিতে পারিব না, যেখানে খাওয়ার এমন দুর্দশা।” সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল। কাজেই কথা রটিল যে, ছোটলোকগুলার এখন বড়ই স্পর্ক হইয়াছে। কিন্তু কেন যে হইল, কাহাদের সহানুভূতিহীনতায়, হীনতার দৃষ্টান্তে হইল—সেইটুকু শুধু কেহ খুঁজিয়া দেখে না, ভ্রমী সেইখানেই।

গোপালের মত ভয়ঙ্কর গৌরার-গোবিন্দ ছোট-লোকটার এমন কঠিন দণ্ডদেশে—তাই বাহাদের সর্বদা চাকর রাখিয়া ঘর করিতে হয়, তাহারা অত্যন্তই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বড় বড় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, “এ না হইলে সংসারে টিকিয়া থাকাই ত মহা দায় হইয়াছিল। মনিবের জিনিষ খোয়া গেলে একটু কি করিয়াছে, না করিয়াছে—অমনি জালাও তার ঘর, পোড়াও তার গোক!—কি ভাগা যে তারই মুখে আগুন ধরাইয়া দেয় নাই।”

ইতঃপূর্বে এই সকল লোকই অতঃপর আর চাকর রাখিয়া ঘর করা দায় হইবে বলিয়া নিতান্ত হতাশার সহিত আক্ষেপ করিতেছিলেন।

শুভেন্দু খবরটা লইয়া নিতান্ত নিরপেক্ষভাবেই সুনীলের ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেখানে তরু ও বীণাকে উপস্থিত দেখিয়া সে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া বীণাই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “আমুন না শুভু’দা, চ’লে যাচ্ছেন কেন?”

শুভেন্দুর স্ত্রী চেহারা ও নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহস তাহাকে বাড়িগুদ্ধ সমুদয় ছেলেমেয়ের কাছেই নিতান্ত ঘরের লোক করিয়া তুলিয়াছিল, বীণার আহ্বানে শুভেন্দু আসিয়া তাহাদের একপাশে বিছানা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সুনীল বলিল, “দিদি আমার একটা গোলোকধাম খেলার ছক তৈরী করে দিয়েছে, খেলবে শুভেন্দু?”

শুভেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দ্বিধা একটু হাসিয়া কহিল, “এখনও তুমি গোলোকধাম খেল না কি?”

শুভেন্দুর সেই হাসি ও কথার সুরে সুনীলের কানের গোড়া অবধি লাগ হইয়া উঠিল। বিনতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছেন, শুভু’দা! দাদা এখনও এমনি সব ছেলেমানুষী জিনিষ ভালবাসে যে, সে দেখলে আমার ভারী হাসি পায়। আমিও ওকে বলি যে, খেলতে হয় ত তাস দিয়ে গ্রাবু খেল, না হয়, রিভার্সী খেল, না হয় ড্রাক্ট খেল। তা নয়, ছেলে খেলবেন ত গোলামচোর, নৈলে গোলোকধাম। আর দিদিরও ঠিক কি ওর মতন পছন্দ।”

সুনীল, তরু নিজেদের বিকৃত ক্রটির লজ্জায় বিব্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদের সহিত সায় দিয়া গিয়া বলিল, “আচ্ছা খেল, তোমাদের যে রকম ভাল লাগে, তাই খেল।”

খেলা আরম্ভ হইল। শুভেন্দুর কাছে এক পড়া-  
শুনা ছাড়া কোন কার্যেই কাহারও জয়ের আশা নাই;  
একবার, দুইবার, তিনবার—বারবারই তাহার স্থান  
সর্বপ্রথমে। কিন্তু এতবার জয়ী হইয়াও তাহার মন  
সেই জয়ের আনন্দের প্রতি নাই, সে বসিয়া পর্যন্তই  
সুশীলের নিরুত্তর, রক্তহীন ও স্নান মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ-  
চক্ষুঃ চাহিতেছিল। তাস লইতে গিয়া কত সময়  
তাহার হাত কাঁপিয়া যাইতেছে, উহাও তাহার অজ্ঞাত  
ছিল না। মনে মনে বিরক্ত হইয়া চোক তাকাইয়া  
উহার উদ্দেশ্যে পাঁচশোবার “ভীক” “অকর্মণ্য” বলিয়া  
গালি পাড়িলেও কয় দিনের ভিতরে উহার শরীর-মনের  
অবস্থা দেখিয়া বোধ করি, তাহার মনে একটু অনু-  
কম্পাও বোধ হইতেছিল। তাই তাহাকে মঙ্গলসংবাদে  
সুস্থ করিতে—নিশ্চিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কথায়  
কথায় বলিয়া ফেলিল, “গোপালের যে বিচার শেষ  
হয়ে গেল।—”

সে-বার বিস্তার খেলা চলিতেছিল; কিন্তু আগ্রহাতি-  
শয্যে তাহার সকল সাবধানতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিনতা  
টপ করিয়া ইকাবনের টেকাখানাকে ‘পাশ’ গুঁজিয়া  
দিয়া উগ্র কৌতুহলে উচ্চ করিয়া প্রশ্ন করিল, “কি  
হোলো, শুভু’না। কি দণ্ড তার হ’লো?—উঃ, লোকটা  
কি ভয়ানক! তার ফাঁসী হ’লেও দোষ হয় না।”

সুশীলের হাতখানা কাঁপিয়া হাতের তাস ক’খানা  
ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তার মুখখানা  
একবার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল ঠিক যেন  
মনে হইল, তার সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে  
যতটা রক্ত জমা করা ছিল, সে সবই যেন এক-  
টানে বোঁ করিয়া মুখে মাথায় উঠিয়া আসিয়াছে।  
শুভেন্দুর মুখের দিকে সে যখন উদাস-ব্যাকুলতায়  
অধীর দৃষ্টিপাত করিল, সেই অস্বাভাবিক রাজামুখে,  
আশ্চর্য উজ্জল চোখ দুইটা যেন দুইটা ইলেক্ট্রিক  
ল্যাম্পের মত ভয়ানক রকম জ্বলিতেছিল। ঠোঁট  
তাহার নড়িতেছিল, কিন্তু তাহা শুধু উত্তেজনার জন্ত,  
কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্তই কিছু বুঝা গেল না।  
শুভেন্দু বারেকমাত্র তাহার মুখে তীব্রকটাক্ষ করিয়াই  
বিনতার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত উদাস কণ্ঠে জবাব দিল—  
“বেশী কিছু হয় নি……চার বৎসর সপরিশ্রম জেল  
খাটতে হবে মাত্র।”

আবার সেই রাত্রির মতই আর একটা অব্যক্ত  
যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া সুশীল অচেতন হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি। পল্লীগাঁয়ের সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রি।  
শুধু মানবই নহে, যেন তাহাদের সহিত সমস্ত বিশ্ব-  
চর, দেব, দানব, বক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ  
সকলেই শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুশীতল অঙ্কা-  
শ্রমে বিভ্রাম করিতেছে। একমাত্র বিল্লীরব ভিন্ন  
কোথাও কোন শব্দই নাই। যেন মহাসাধনাক্ষেত্রে  
কোন যোগমগ্ন মহাযোগী সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন;  
আর তাঁহার সর্বসমাহিতচিত্তে কেবলমাত্র অনাদি  
প্রণবের একক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং  
সেই ধ্বনি শুধু জানাইতে চাহিতেছে, সোহং—  
সোহং—সোহং! মানবের ত্রিশজ্ঞ অহংকে সোহংএ  
মিলাইয়া দিবার সংযোজক কাল এমন আর দ্বিতীয়  
নাই। কিন্তু হায়, এ মহান সুযোগ যে মানুষের সারা-  
জীবন ব্যাপিয়া কত সহস্র সহস্রবারই ব্যর্থ হইয়া  
ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার যে কোন লেখাঘোখাই করা  
যায় না! কি যে নিরেট পাষণ দিয়াই বিধাতা  
মানুষকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন; এর কাছে যে  
সমস্ত মহা মহাযোগই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার যে  
সমুদয়ই দুর্যোগ, সুযোগ সে লইবে কোথা হইতে?  
ভুবনবাবুর পত্নীবিয়োগের পর হইতেই রাত্রির  
নিদ্রাটা তেমন গাঢ় হইত না; ভোরের দিকে তিনি  
বরাবরই একটু পড়াশুনা করিতেন। চণ্ডী ■ গীতা-  
পাঠও হয় ত হইত। এ সময়ে কেহ তাঁহার কাছে  
থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না বলিয়া ছেলেরা তাঁহার  
কাছে শয়ন করিত না। আজ হঠাৎ এই মধ্যরাত্রিতে  
ঘুম ভাঙিয়া তিনি আবার সে দিনের মত সেই চাপা-  
কাপা শুনিতে পাইলেন। কায়ার শব্দ সুশীলের  
শয়নকক্ষ হইতেই আসিতেছে। উঠিয়া নিঃশব্দে  
সুশীলের বিছানার কাছে আসিলেন। শুনিতে পাই-  
লেন, সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, “কি হবে!  
আমি কি করবো? গোপালকে যে জেলে ঘেতে  
হচ্ছে—এখন আমি কি করি! বাবাকে কি করে  
সব বলি?”

ভুবনবাবুর মনে হইল, কে যেন একগাছা চাবুকের  
বাড়ি তাঁহার মুখের উপর সজোরে আঘাত করিয়াছে।  
তিনি যেন সহসা চলিয়া পড়িতে গেলেন। তাহার  
পরক্ষণেই আপনার এই অতর্কিত ও অভাবনীয় গুরু  
আঘাতের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইয়া সুগভীর  
দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথা কহিলেন—“সুশীল! গোপাল  
কি তোমাদের সঙ্গেও ছিল না কি?”



সুশীল অকস্মাৎ এমনভাবে সম্বোধিত হওয়ার ত্যানক রকম চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর তাহার মনে সেই পরিমাণে বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়া গেল, বাবা কি তবে সবই জানেন? সে উঠিয়া বসিয়া অশ্রুভারাতুর ব্যাকুল উদ্ভাসের বলিল “না, কিছুই জানেন না সে, তাকে বাগান—” বলিয়াই আবার কাঁদিয়া অধীর হইয়া বিছানার মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। এই ভয়ানক ব্যাপারটার জানাজানি ব্যাপারে তাহার মত বড় প্রচণ্ড লজ্জাই জন্ম করা থাক না কেন, তবু সে যে লুকোচুরির হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার বকের মধ্যে অবরুদ্ধ তাপের প্রভাবে ফাটিয়া পড়া হইতে মুক্তিলাভ করিল, আপাততঃ সেই-ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী-পুকুরের তক্তকে নীলজল তখনও সূর্য্যকরের সোনার গুঁড়া ঝিলিক মারে নাই; তাহার অগ্নিকাণ্ডে কল্লারবনে ঘোর রক্তবর্ণের কল্লার-ফুলগুলা সবেমাত্র পাপড়ী খোলা স্নক করিয়াছে; তাহার নিশীথ-বিশ্রামের গায়ের চার কয়লপত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব-হস্তস্পর্শ তাহা এখনও তীরদেশ হইতে অপসৃত হইয়া যায় নাই। তাহার মৎস্যকুল এখনও বকের দোয়াত্বো তীরসংলগ্ন খাত্তানেষণ ভ্যাগ করিয়া গভীর জলে আত্মরক্ষার জন্ত পলায়নপর নহে,—দীর্ঘকূলে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, উপরে প্রকাণ্ড চত্বর, পশ্চাতে পুরাতন ছাদের স্তূপহং অট্টালিকা—ইহাই উদ্যাপতি চৌধুরীর নির্মিত—এক্ষণে বিপ্রদাস চৌধুরীর আবাস-বাটি। বাটির প্রবেশদ্বার এখনও খোলা হয় নাই, তবে ভিতরে দ্বারবান্জীর নাগরাজুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—খুব সম্ভব এইবার ফটক খোলা হইবে। বাড়ীর উত্তরে বিশাল একটা ভয়স্পূর্ণ গভীর টনার সাক্ষ্যরূপে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ভুবন রায়ের বকের মধ্যে লজ্জার আঘাত অসহনীয় বেগে পতিত হইল।

ভুবনবাবু কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন; মন অস্থির, সমসংক্ষেপ সহ করা কঠিন বোধ হইল। কিছু পরে ফটক খোলার শব্দে সম্মুখে আসিয়া দ্বারবান্ মাধো সিংএর হাতে একটা চিঠি দিয়া বাবুব

ঘুম ভাঙ্গিবারাত্র তাঁহাকে খবর দিতে বলিয়া আবার সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহাকে দেখিয়া নিরপরাধ গোপালের কথা আবার বেশী হইয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

বিপ্রদাসবাবু সচরাচর অধিকাংশ বাবুজাতীয় জীবেরই স্তায় বেলায় শয্যাভ্যাগ করেন এবং তাহার পর হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া কেশ-বেশ সারিয়া বৈঠকখানায় আসিতে তাঁহার ঐ শ্রেণীর লোকদেরই মত প্রায় সমান সময় লাগে। সেটা অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক বা তদুর্দ্ধ। আজ এমন নিতান্ত অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সামান্যতম পূর্ব-পরিচিত ভুবন রায়ের আগমন-সংবাদে ও পত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্যের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে সকল কার্য সমাধা করিয়া লইতে হইল। বিপ্রদাস বাবু জানিতেন, এই লোকটি বিলক্ষণ ধনী এবং সর্বদা দেশে না থাকা প্রযুক্ত ইহার সহিত তাঁহার বৈষয়িক বিবাদেও যে কোন যোগাযোগ নাই, তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আর তার উপর নিজে পয়সার লোক হইলে লোক একটু পয়সাওয়াল লোকদেরই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে; বিপ্রদাসবাবুই বা তা না করিবেন কেন?

সাক্ষাৎ যে এমনভাবে হইবে, তাঁহার তাহার বিদ্যুৎ-মাত্রও ধারণা ছিল না। ভুবনবাবু দুই হাজার টাকার দুই কেতা নোট আগে-ভাগে খেসারত ধরিয়া দিয়া তাহার পর সমুদয় ইতিহাসটাই জানাইয়াছিলেন কি না, তাই তাঁহার মূর্তি অনেকখানিই বদল করিয়া শ্রোতার কানের তিতর দিয়া মরমে পৌছিতে লাগিল এবং পাঁচশো টাকার বদলে দেড় হাজার টাকা উপরি লাভ হওয়ার, কতিটাকে তাঁহার এক্ষণে আর তেমন লোকসান বলিয়া মনে হইল না। বরং দুই পার্শ্বের বিরটি গুচ্ছক ঠেলিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধাবৃত স্নক ঠোটের আগায় একটুখানি হাসি পর্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি নোট দুইখানি পাঞ্জাবী জামার পকেটে ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে কহিয়া উঠিলেন, “কি ছেলেমানুষী!”

ভুবনবাবুর উচ্চ মস্তক আজ লুপ্তিত, তাঁহার বড় উন্নত আদর্শই চূর্ণ হইতে বসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের আত্মপরাধ স্বীকারোক্তিতেই তাঁহার সে পিতৃ-হৃদয়ে হৃৎথের মধ্যে ও স্তম্ভচূর স্তম্ভের অভাব ছিল না। শীঘ্রই তিনি বিদায় লইয়া উঠিলেন, এখনই তাঁহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জিলায় যাইতে হইবে। বিদায়কালে

পুনশ্চ বিনীত মিষ্টবাক্যে কহিলেন, “বড় অজ্ঞায় হয়ে গেছে, বেশী আর কি আপনাকে বলবো। মন থেকেই অপরাধীদের মতটুকু পারবেন ক্ষমা করবেন।”

বিপ্রদাসবাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, “কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী, তারা তো কৈ আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল না!”

ভুবনবাবু নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া মুহু মুহু কহিলেন, “হ্যাঁ, তারা ত আসবেই, নিশ্চয়ই আসবে। আসবে বৈ কি!”—কিন্তু মনে মনে তিনি এই দুর্ভাগ্যী ও অহঙ্কৃত পুরুষের নিকট শুভকস্তুকে পাঠাইতে একটু সংশয়ই বোধ করিতেছিলেন।

বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া বিপ্রদাস তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, এর চেয়ে বেশী সৌজন্যের অপব্যয় তিনি দেশী লোকের জন্ত কখন করিতে পারিতেন না। ভুবনবাবু বৈঠকখানার দালান পার হইয়া কয়েকটা পৈঠা নাষিয়া উঠান দিয়া চলিত চলিতে পিছন দিক হইতে একটা সমকোচ আত্মান গুনিতে পাইলেন,— “গুনুন!”

মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ণ দৃষ্ট চোখে পড়িল! একটি দশ বৎসরের বালিকা, কিন্তু সেই মেয়েটির গায়ের রংয়ের চম্পক-গোরাভা, উজ্জল ও বিশাল দুইটি চোখের স্বচ্ছ সরল ও সক্রিয় কটাক, তাহার জীবৎ সুরিত আরক্ত করপুটের যুগ্মকম্পন, সর্বাপেক্ষা তাহার গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডের উপরকার গ্রন্থিহীন মুক্তাহারের মতই নবীন রৌদ্রকরোজ্জল অশ্রুমালা সমাবেশ তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ভুবনবাবু একান্ত বিস্ময়ের সহিত এই সহসা-উদ্ভূত করুণামূর্তিটি নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, এমন সময় সেই অপরিচিতা বালিকা তাঁহার অধিকতর নিকটবর্তিনী হইয়া নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে বায়হস্তখানি বাহির করিল, তাহার হাতে একটি রেশমের বোনা মণিবাগ। ভুবনবাবুর দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিয়া সে রক্তপ্রায় গদগদস্বরে কহিয়া উঠিল, “এই নিম্ন, এই টাকা খরচ ক’রে আমার গোপালদাকে ফিরিয়ে আনুন। আমি তিন সত্যি ক’রে বলছি, সে কখন আগুন দেয়নি, কখন আগুন দেয়নি, কখন আগুন দেয়নি।” বলিতে বলিতে সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

ভুবনবাবু টাকার থলিটি হাতে না লইয়াই মেয়েটির সেই অশ্রুপ্রাণিত চাঁদপানা মুখের নিকে চাহিয়া সম্মুখে কহিলেন, “শা, তুমি, ঠিকই বুঝতে পেরেছ,

তোমার গোপালদা আগুন দেয়নি। দোষী দোষ স্বীকার করেছে, নির্দোষ গোপাল মুক্তি পাবে। তোমার টাকা রেখে দাও।”

মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বর্ষা-আকাশের চাঁদের মতই বারেক উজ্জল হইয়া উঠিল। আবার তখনই কিছু স্নান হইয়া গিয়া সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে যে সবাই বলছে, তার চার বৎসরের জেল হয়েছে! জেলখানা আরি মাঝাবাড়ী থেকে দেখেছি, সেখানে পাতর ভাঙতে দেয়, ঘানি ঘোরাতে দেয়, এমনি বিল্লী খাবার তাদের—গোপালদা তা হ’লে মরেই যাবে।”—এই বলিয়া মেয়েটি আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া পুনশ্চ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবুর ইচ্ছা হইল, এই করুণাময়ী মেয়েটিকে বুকের কাছে টানিয়া লয়েন, মাথায় গায়ে হাত দিয়া একটু আদরের সহিত তাহাকে সাধনা করেন, কিন্তু সে যে কে, তাহাই তো জানা নাই? তাই সে ইচ্ছা দমন পূর্বক গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, “হ্যাঁ, দণ্ড তা’র হয়েছিল বটে, কিন্তু তার দণ্ডের সংবাদ পেয়ে প্রকৃত দোষীর মনে অনুতাপের উদয় হয় এবং সে দোষ স্বীকার করে। গোপাল হ’লে এক দিনের মধ্যেই ছাড়ান পাবে, এ তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করো।”

“তা হ’লে তো যে প্রকৃত দোষী, সে-ও এই রকম সাজা পাবে? উঃ, চার চার বৎসর জেল খাটা কি সোজা কষ্ট! তার কি হবে?”

ভুবনবাবুর অন্তরের মধ্যে ব্যথাভরা আহত পিতৃহৃদে এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণাধারার টলটল করিয়া উঠিল। তাঁহার পুরুষের চক্ষুতেও এই ক্ষুদ্র বালিকার ওই সত্তর ইঙ্গিতটুকুতে অশ্রুর আভাস দেখা দেয়, এমন অবস্থা হইল। তিনি ইহা দমন-চেষ্টা পরিত্যাগ না করিয়াই সবাঙ্গুসরে উত্তর করিলেন, “শা! জীবন তোমায় চিরস্থায়ী করুন। কত বড় মহৎপ্রাণ নিয়ে তুমি এই স্বার্থ-মলিন সংসারে নমে এসেছ! আশীর্বাদ করি, যেন এমনি অস্নান থেকেই তাঁর পায়ে আবার ফিরে যেতে পার।”

দুই দিনের কুসঙ্গে পড়িয়া তাঁহার নিজ হাতে গড়িয়া তোলা স্ত্রীল যে এত বড় একটা অজ্ঞানের সহায়তা করিল, এ আঘাত তাঁহার বুকে যে বজ্রাঘাত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

মেয়েটি জীবৎ লজ্জিতা ও নতমুখী হইয়াই পুনরপি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া বলিল, “তাকে আবার তা হ’লে



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কি করে বাঁচাবেন। এই টাকা নিয়ে তা'র কিছু করুন না! শুনেছি, মোকদ্দমার অনেক টাকা লাগে। তা' আমি অনেক টাকা কোথা থেকে পাব? বাবা আমার খরচ করিতে পাঁচ টাকা করে দেন, তারই কিছু কিছু রেখে এই তেরটা টাকা আমি জমিয়ে-ছিলুম। এটা নিয়ে যান।”—খলিটি সে ভুবনবাবুর হাতে দিতে গেল।

“না! আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই যাচ্ছি, টাকা আমার সঙ্গে আছে, ও টাকা তুমি রেখে দাও, আমার কাজে লাগবে।”

বালিকা আস্তে আস্তে খলিটি আঁচলে বাঁধিল, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন বোধ হইল না; বোধ করি, ইহার কথা তাহার যেন নিশ্চয় বিশ্বাস হয় নাই। ঈশৎ সন্দেহভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ত উকীল? তা হ'লে টাকা না পেলে তা'র জন্য আপনি কেমন করে চেষ্টা করবেন?”

অত্যন্ত বিষাদের একটুখানি স্নানহাসি বর্ষাকাশের ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জের মধ্যস্থ এক ঝলক সূর্যালোকের মতই ভুবনবাবুর বিষম মুখকে মুহূর্তের প্রাণিত করিল, তিনি গভীরতর একটা নিশ্বাস মোচনপূর্বক সখেদে উত্তর করিলেন, “না না! আমি সেই অপরাধীরই বাবা।”—

“স্বলেখা।”—উপরের দালানের একটা ঝিলঝিলি সরাইয়া নারীকণ্ঠে কেহ ঐ নামে আহ্বান করিল।

“যাচ্ছি না!” বলিয়া উত্তর দিয়াই সেই বিজ্ঞানবরগী মেয়েটি বিছাতের মতই মিলাইয়া গেল।

ভুবনবাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে সেই লুকাইয়াপড়া উজ্জল মূর্তিটির প্রতি বহুদৃষ্টি হইয়া থাকিবার পর সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইলেন। গভীর ব্যথাবিজড়িত মানির মধ্য হইতে মনে মনে কহিলেন, “এক দিন আগে হ'লে আমি মনে করতাম,—আজ আমি আমার মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমার স্ত্রীলের জোড়া মিলেছে—কিন্তু আজ আর সে কথা মনে করবার কোনই অধিকার বা স্পর্ধা আমার মনে নাই।—কিন্তু তবু সাধ হচ্ছে—”

অতি কষ্টে গোপালের মুক্তিলভ ঘটিল। প্রথমে এ সংবাদ সে ত বিশ্বাসই করিতে পারে নাই, পরে আনন্দে প্রায় মূর্ছা যাইবার মত তাহার উপবাসক্লিষ্ট শরীর টলিয়া পড়িতেছিল। বাধনখোলা হাত দুইটা উর্দ্ধে তুলিয়া দরবিগলিত অশ্রুজলের মধ্য হইতে সে অশ্রুট ধ্বনিতে উচ্চারণ করিল—“তুমিই সত্যোর।”

বাহিরে আসিয়া সে একটা জনরব শুনিতে পাইল যে, রায়বাড়ীর ভুবন রায় না কি তাহার দিদিমণির কারায় গিয়া বিস্তর পরস্রা খরচ করিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। আরও শুনিল, সেই ভুবন রায়ের, এক জন রাজার যত আর, তেমনি ধারা টাকার আমদানী আসে এবং সেই ধনাত্মক ব্যক্তিটি না কি ভবিষ্যতে চৌধুরী-কন্ডার স্বত্তর হইবেন। কথাটা গোপালের বিশ্বাসও হইল এবং ভালও লাগিল। সম্প্রতি রায়বাড়ীর বিবাহে আইবুড়তাত লইয়া গিয়া সে রায়বাবুর ঐশ্বর্য্য, বদান্ততা প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া-ছিল, আহাৰ্য্য এবং বিদায় ভাল রকমই পাইয়াছিল। ও-বাড়ীর বড়বাবুর মেজাজও যে অসাধারণ ভাল, তাহাও লোকমুখে তাহার জানা আছে। তাহার দিদিমণি যদি সে বাড়ীর বউ হয় তো অত্যাশ হইবে না। কিন্তু এখন দিদিমণিকে একবার দেখা যায় কেমন করিয়া? আর কি বাবু তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিতে অনুমতি দান করিবেন?

বাড়ীখানার আশেপাশে চোরের মত লুকাইয়া ফেরাই যে তাহার পক্ষে প্রধানতম বিরুদ্ধ প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কথাটা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়া সে আবার সেই হুকাৰ্য্যই করিতে লাগিল, শেষে এক দিন পুরাতন মনিব-বাড়ী মোরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেও ছাড়িল না। ছায়বান মাধো সিং তখন ফটকের পাশের কুঠরীতে আটা মাখিয়া মোটা মোটা লেটী পাকাইতে অনতি-উচ্চস্বরে সুর করিয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল;—

“তুলসীদাস হরি-চন্দন রগড়ে,

পূজা করত রঘুবীর।”—

গোপাল এই চৌগোপা সরসু-পারীর কঠিন দৃষ্টি, হইতে নিজের শীর্ণ ও ধর্ম্ম আকৃতিটা গোপন করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই না দেখিয়া অবশেষে

কাঁচুমাচু মুখে দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে তাহারই শরণাপন্ন হইল।

“ভাল আছ ত বাবা, দরোয়ানজী! মেজাজ খুস্ হায়?”

“হাঁ আঁ, কাহে নেই?—কিসিকে নেহি চোরী কিয়া;—কিসিকে নেহি অপচর কিয়া; কোই হামারে তুলিব দে’ শক্তে হেঁ?”

গোপাল চোরের অধম হইয়া গেল। কি বলিবে, কি করিয়া নিজের বক্তব্যটাকে প্রকাশ করিবে, তাহার খেই হারাইয়া ফেলিয়া সে বিমুচ হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার ধসিয়া-পড়া শরীর-মনকে কোনমতে একটুখানি গুছাইয়া লইয়া সে আবার ক্রমশঃ স্তরে আরম্ভ করিল, “দরোয়ানজী বাবা! হামার খৌকি দিদিমণিকে একবারটি বুলিয়ে দেবে, বাবা! বাবা, তোমার কাছে হামি জন্মের মতন কেনা হয়ে থাকবো, বাবা! একবারটি তেনাকে বুলিয়ে দাও।—”

মাধো সিং তাহার গজিকা-প্রসাদাৎ রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু অগ্নিতপ্ত লোহার তাঁটার মত গোল করিয়া পাকাইয়া গোপালের দিকে তাহা যেন ছুঁড়িয়া মারিয়া তেমনি বজ্রনির্ঘোষে হুকুম করিয়া উঠিল, “কেঁও! ম্যর চোট্টাকো মাথ ম্যরকো খামিন্কা লেড়্ কীকো মিলনে দেঙ্গে?—”

আরও কোন কোন কথা সে বলিত, কিন্তু ক্রোধাতিশয়ো তাহার কথা বাহির না হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ স্ত্রিঃয়ের মতন ছিটকাইয়া তুলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া গোপালের পাঁকাটির মতন সরু গলাটা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া গর্জনস্বরে কহিল, “নিকালো শালে! হারামজাদ! ফিন্ ডেরামে আগ্ ফুঁকনে আয়া! বেহায়া, বদমাস! নিকালো।—”

“দিদিমণি রে! আর তোকে দেখতে পেলাম না—” বলিয়া আর্তনাদ করিয়া কারাবাসক্রেমে অর্দ্ধ-মৃত ও অনাহারী গোপাল সবেগে ফটকের বাহিরে পড়িতে পড়িতেও না পড়িয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যে আটকাইয়া গেল, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরক্ষণে দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটি সূরুপ কিশোরের সহিত এক জন মাধো সিংহেরই সমপদস্থ অপরিচিত ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল;

গোপাল তাহারই গায়ের উপর পড়িয়া যাওয়াতে মাটিতে পড়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইল, গোপাল তখন চিনিল, সে ভুবনবাবুর দ্বারবান গিরধারদাস চৌবে।

এ দিকে ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। গোপালের সেই উচ্চকণ্ঠের আর্তনাদ বাহিরের অঙ্গন পার হইয়া ভিতর-মহলের সম্মিহিত একতলার ঘরে পড়িত মহাশয়ের নিকট প্রবেশিকা-সোপান ও উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাঠে নিযুক্তা সুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ধাতু রূপ করা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সে কশাহত আনোয়ারের মত তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধীরস্বরে কহিয়া উঠিল, “এ নিশ্চয়ই আমার গোপালদা’ না হয়ে যায় না। কি হলো? গোপালদা’ অমন ক’রে চোঁচালো কেন? আবার কি মাধো সিং তাকে মারছে!”—

দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য বালিকা তীরবেগে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল,—“মাধো সিং! মাধো সিং! তোম্ উস্কে। একদম জান লেনে চাহ্ তা হায় কেনা! কাহে ফিন্ মারতা হায়?”

“ম্যরকো কুছ্ কশোর নেহি হায় দিদিমাহাব। ছজুরকা ছকুম হায় যে, ফিন্ কভি উ দাগাবাজ আদমীঠো হনকা কোঠীকো মাইল ভরমে আনে নেই শকে। ম্যর তো তাঁবেদার হায়।”

“কক্ষন না, বাবা সে কথা নিশ্চয়ই বলেন নি। গোপালদা’! গোপালদা’! তুমি আমার কাছে এস! আহা, তুমি কি হয়ে গেছ, ভাই!”

বিগলিত কক্ষণায় যেন শীতল জাহ্নবী-ধারা ঢালিয়া দিয়া সুলেখা এই কথা বলিয়া গোপালের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার সেই স্কন্ধ দৃষ্টিটি এক মুহূর্ত্তেই বিস্ময়-রেখায় ভরিয়া উঠিল। শুধু তাহা নয়, তাহার সঙ্গে আরও যে কে দুই জন দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই এক জনের দেহে তার রাখিয়া দাঁড়াইয়া গোপাল কেমন যেন অবসন্নবৎ নিবুস মারিয়া গিয়াছে। সুলেখা সহসা একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে অর্দ্ধমুর্চ্ছিত গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া মস্তা-স্তিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়া উঠিল—“গোপালদা! গোপালদা! আমি এসেছি যে।”

সেই স্বভাব-মধুর স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শ ও সন্তরঙ্গর যেন মাত্রাধ্বনির মতই মুচ্ছাতুর গোপালের ঘোর



ক্রান্তিতে হতচেতনবৎ দেহে শক্তি-সঞ্চার করিল। সে সবেগে দৃষ্টি মেলিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠের উচ্চারণ করিল, “দি—দিদি, দিদিমণি আমার!”—তাহার চোখ দিয়া অবিরল জলের ধারা বহিতে লাগিল।

সুলেখার চোখ দুইটিও শুষ্ক ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে আর অনেক বেশী কান্নাই বোধ করি কাদিত; কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার সম্মুখবর্তী কিশোরের দুইটি বিস্ফারিত ডাগর চোখের উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল, অমনই একটা গাঢ় লজ্জার লালিমায় তাহার সরস দাড়িমবীজতুল্য গণ্ড দুইটি আরক্ত করিয়া তাহার কান্নাকেও যেন বাধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সে চিনিল, এ সেই ছেলেদেরই এক জন—যাহারা সে দিন তাহার বাবার হুকুমে বাজপেয়ীর হাতের বেত খাইয়া গিয়াছে। মনে মনে বিস্মিত হইল, তাহার এখানে আবার কি জন্ত আসিল? গোপালদার সঙ্গে আসিয়াছে কি? কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার ইহাদের কাছে ভারী লজ্জা বোধ হইল। পাছে সে দিনের কোন কথা আবার উঠিয়া পড়ে, সে ভয়ও একটু হইল।

“গোপালদা, এস, কিছু খেতে দিই গে”—বলিয়া সে ততক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ গোপালের হাতে ধরিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

সুশীলের অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও সে তাহার সম্মানরক্ষাকর্ত্রীকে একটি রুতজতার কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সমর্থ হইল না। বলিলে তাহারও অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছিল।

বিপ্রদাসবাবু বৈপ্রহরিক বিশ্রামশয়্যার শয়ন করিয়া আলখোলায় নল টানিতেছিলেন, তাঁহার মাংসবহুল পদযুগল এক জন দাসীতে টিপিয়া দিতেছিল, তিনি তাহাকে তাঁহার জীকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সত্যবতীর বয়স বিপ্রদাসবাবুর অর্ধেকের অনধিক। আকৃতি অনেকটা সুলেখারই মত; প্রকৃতিতেও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে সে শিশু, ইনি পরিণত-বয়স্ক। জমীদারগৃহিণী এবং হৃদান্ত স্বামীর জী। দ্বিতীয়পক্ষীরা হইলেও চরিত্রের কোমলতা বশতঃ “প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী” হইতে পারেন নাই—বিশেষতঃ বিপ্রদাসও বৃদ্ধ নহেন; তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশোর্ধ্ব এবং পত্নী পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া।

প্রভুর ইজিতে দাসী বিদায় লইলে বিপ্রদাস বলিলেন—“তোমায় বাড়ী পোড়ানর ব্যাপারটা সে দিন সব বলেছিলাম না? আজ ভুবনবাবু যে তাঁ’র ছেলেকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।”

সত্যবতী একটুখানি চঞ্চলভাবে স্বামীর দিকে বারেক চাহিয়া লইয়া মুহূর্তে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “হঃ!”

বিপ্রদাস কহিলেন, “খাসা ছেলে।”

সত্যবতী মনে মনে ঈর্ষা বিস্মিতা হইলেও মুখে মৌন হইয়াই রহিলেন, ইতঃপূর্বে এ শব্দ তিনি স্বামীর মুখ হইতে আর কখন বাহির হইতে শুনিয়াছেন কি না, বোধ করি, সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিপ্রদাসের আজ বোধ করি মনোবীণা খুব উচ্চ সুর-গ্রামে বাঁধা ছিল, কোন দিকে লক্ষ্য পড়িল না। আপনার চিন্তাধারারই অঙ্গুষ্ঠ করিতে করিতে সত্যবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভুবনবাবুর এখন ঢের টাকা রোজগার হচ্ছে; শুনেছি, কলকাতায় না কি বড় বড় আট দশখান ভাড়াটে বাড়ী—একখানা তার বিলিতি হোটেল ভাড়া দিয়ে রেখেছে। কারবারও খুব ফালাও, আবার এ দিকের জমীদারীরও অংশ আছে। তাঁর ঐ ছেলে তো মোটে একটাই। ছেলেটি দেখতে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ করছে না, কেমন? কি বল? মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না কি?”

সত্যবতী চকিত হইয়া উঠিলেন, “এখনই?”

বিপ্রদাস কহিলেন, “আজই নয়, যখন হয় তখন, পছন্দ কি না?”

কিন্তু ওদের লেখাকে যদি পছন্দ হয়, তবে ত?”

বিপ্রদাস বিজয়গর্বে তাক্ষীলোর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “পছন্দ হয় কি? হয়েছে। ভুবনবাবু সে দিন সুলিকে দেখে খুব পছন্দ করে গেছেন। বিয়ের কথা স্পষ্ট না লিখলেও ওর রূপের কথা, গুণের কথা আজকের চিঠিতে না হোক, তবু পাঁচ জায়গায় লিখেছেন। শেষে লিখেছেন, ‘আমার ছেলে যদি আজ এত বড় অপরাধে অপরাধী না হতো, তা হ’লে—যাক, মনে কত সাধ যায়; সব সাধ কি আমরা মিটাইবার সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছি!’—আর কি স্পষ্ট বলবেন?”

সত্যবতীর সুন্দর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, তিনি ক্ষণকাল নতমুখে নীরব থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কিন্তু সে কথাও তো সত্যি, সুশীল যা অজ্ঞান কাজটা করেছিল, তাতে বড় হয়ে—”

“সে ডাকাতের সর্দার হবে? না, মোটেই তা নয়—”

বিপ্রদাস এবার হাহাশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—  
“ছেলেটির অতি নম্রকান্তি, মাধুর্য্যপূর্ণ নম্রমূর্তি; সে এ সব ক্ষাক্তের যোগ্যই নয়। আমি ত বোকা নই, ভুবনবাবু কোন ইঙ্গিত না দিলেও আমি বুঝেছি ■■■ জেরা ক’রে বার করেছি যে আগুন দেবার পরামর্শ এবং দেওয়া সুশীলের নয়, শুভেন্দুর—ওর এক বন্ধুর ছেলের। সুশীল শুধু তার সঙ্গে ছিল। আর দেখ, যদিই তা’ দিয়েই থাকে, ছোট বেলায় অমন কত ছেলের কত করে। সবাই তো আর তোমার এবং ভুবনবাবুর মতন ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজী নয়; ও সব কি আর ধর্ম্মব্য?”

একটু থামিয়া মুহূর্ত্তের সহিত পুনশ্চ কহিলেন,  
“ধর, এই আমিই ওর বরসে কার ঘরে আগুন না দিয়ে থাকি, একবার সংস্কৃত পণ্ডিতের টিকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একটু হ’লেই গো-হত্যা নয়, ব্রহ্ম-হত্যা হয়ে যেতে পারতো। একবার না, যাক্ গে, তা তোমার কি মত বলো? আমি তো মন ঠিক ক’রেই কৈলেছি। আমি যখন ডাকাত হইনি, ও-ও হবে না।”

সত্যবতী মনে মনে বলিলেন, “তুমি ডাকাতের চাইতে খুব বেশী তফাৎও নও!” প্রকাশে বলিলেন, “দেখ, যা ভাল হয়। তা ওরা এখন ত আর বিয়ে দিতে চাইবে না। সুলেখা এখন যে বড় ছোট আছে।”

“এখন দেবার কথা তো আর হচ্ছে না”—বসিয়া বিপ্রদাসবাবু গভীর মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন, জ্বর সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁহার পক্ষে এই যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে গেলে নিজেকে খেলো করিয়া ফেলা হয় বলিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল। তা’ ইতোমধ্যেই জ্বর সহিত মনের কথা কহিয়া ফেলিয়া নিজেকে তিনি হয় ত বা একটুখানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াই থাকিবেন—কারণ, তাঁহার এই সকল কথাবার্তার পরে তাঁহাকে একটুখানি প্রসন্ন করিয়া সত্যবতী ভয়ে ভয়ে এই সঙ্গে একটি আরজী পেশ করিয়া বসিলেন, হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মুখ নত করিয়া যত্নকণ্ঠে কহিলেন—“লেখা তো গোপালের জন্তে বড়ই কার্য্যকাটি করছে, সে যখন দোষী নয়, তখন তাকে বাড়ীতে রাখায় কি কোন দোষ আছে? যদি—”

বিপ্রদাসের মুখপ্রবিষ্ট আলমোয়ার নল বিবর্ত্ত-প্রবিষ্ট

সর্পমুখের তার সবগে বাহির হইয়া আসিল, ঘুমধারা বর্ষাজলপ্রাপ্ত নল-খাগড়ার বনের মত ঘন গুম্ফরাজীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন, গভীর বনে দাবানল জলিয়া উঠিয়াছে। গভীর ও অবিচলিত কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, “সে হারাম-জাদাটা কি আমার বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছে না কি? নাঃ, সুলুটা বড় জালালে দেখছি। এসেছে না কি?”

সত্যবতী ■■■ পাইয়া গিয়া নিজ নামের বার্থ মর্যাদারক্ষার সমর্থ হইলেন না। ‘ইতি গজ’ করিয়া বলিলেন, “আমার কথা নয়, যদি আসতে মত দাও, তাই বলছিলাম, সে তো আর দোষী নয়।”

“দোষী নয়? বল কি তুমি? সে আমার জন্ম করবে ব’লে মুখের উপর শাসিয়ে যায় নি? তার পর এই যে দণ্ড না পেয়ে ফিরে এলো, এতে কি ওর কম আত্মারা বাড়লো ব’লে মনে কর? ব্যাটার ধরাকে যে এখন সরা জান হবে, আর ওর দেখাদেখি সব লোকজন বিগড়ে যাবে না! ওকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যেন খবরদার আসতে দেওয়া না হয়, আমি যে মাথো সিংকে ব’লে দিয়েছিলাম,—এই কে আছিস?”

সত্যবতী তাড়াতাড়ি অন্তর্গত সন্নিহিত পড়িলেন ■■■ যেখানে সুলেখা আপনি বসিয়া বহুদিনের অভুক্ত গোপালকে যত্নপূর্ব্বক আহ্বার করাইতেছিল, সেইখানে গিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। সুলেখার চোখ দিয়া অমনই জলের ফোঁটা টপ টপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু গোপাল এ সংবাদ পাইয়া খুব বেশী বিচলিত হইল না; সে তৎক্ষণাৎ সুলেখাকে সাহসনা দিয়া কহিয়া উঠিল—  
“কাদিস্ নে দিদিমণি! আমার জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর শ্বশুর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে আমার তাঁর বাড়ীতে থাকবার কথা ব’লে পাঠিয়েছেন; বলেছেন, কল্কেতায় আমার নিয়ে যাবেন। হুদিন দেখা হবে না বটে, আবার তুই ভাই, সেই ঘরই তো চিরদিন ধ’রে করবি।”

মুখ তুলিয়া সত্যবতীর সহসা-কৌতুক-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, “খাসা মানুষ মা, আমার দিদিমণির শ্বশুর! দেবতুল্য লোক! জেলখানায় গিয়ে আমার মন ছোট লোকের গায়ে হাত দিয়ে কি আদরটাই না করা! যেমন আমার সীতাদেবী দিদি-মণি, তেমনি রাজা দশরথের মতন ■■■ হবে বাবু।”



সত্যবতী প্রীতি-আনন্দে সম্মত-নেত্রে কস্তার যুগের দিকে চাহিলেন; বন্দ নর! ইহারই মধ্যে সংবাদটা ছুটিয়াছে ত অনেক দূর! অথবা এটা উহাদের নিছক কল্পনা মাত্র! তা কথটা নেহাৎ বন্দ নর, সুলেখার পিতা যদি ভূমিবাবুকে বৈবাহিক করেন, তবে তাঁহার জীবনে অন্ততঃ একটাও ভাল কাজ করা হইবে।

সুলেখা অশ্রুস্রা হই চোখে রোষের বাষ্প তরিয়া গোপালের দিকে তাহার সম্মানপূর্বক উল্টান চোটে বলিয়া উঠিল, “যোৎ!”

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি এই মিশন স্কুলে আসিবার পর হইতে যত না হউক, বাইবেল পড়া ও বীণার গান তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণেই শিক্ষা করিতে হইতে লাগিল এবং যতই তাহা শিখিল, মিসেস্ গুই বা মিস্ হর্ণের কিছুতেই তাহার সে শিক্ষা আর বন্দ:—পুত্ৰই হইতেছিল না। মিসেস্ গুইএর ক্রাসে প্রথমেই প্রার্থনা-গান, তার পর প্রার্থনা, তার পর বাইবেলের “বুক অফ্ দানিয়েল”, “জেনিসিস্ সারুয়েল”—এরূপ কোন না কোন একটা জ্ঞানপা পাঠ্য। তার পর হাতের লেখারও সেই বাইবেল, কোন দিন ডিক্টিশন দিলে সেও সেই বাইবেল, ইংরাজী হস্তার দুই দিন মাত্র, তাহাও সেই ওল্ড টেষ্টামেন্ট হইতে ছত্র কতক করিয়া পড়ান হইত। বাকী রহিল অঙ্ক ও সেসাই, তা ও দুইটার মধ্যে না কি বাইবেল ও জিরা কেওরা কোনরূপে চলে না, কাজেই ও দুটাকে এই বাইবেলের সঙ্গে-নিঃ-সের মধ্যে একান্তভাবেই সম্বন্ধিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস রীড্ নীলিমার সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে একটুখানি কেমন স্নানজরে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তাই হস্তার এক দিন করিয়া তিনি তাহাকে একটু উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিতে চাহেন, যর হইতে ইহার জন্ত উপকরণ যখন সে আনিয়া উঠিতে পারিল না, তখন আর কি হইবে? অগত্যা ইহার বদলে অল্প-বন্দ ইংরাজী ও অঙ্ক সে তাঁহার নিকট হইতে শিখিতে পাইল। তবে সে ইংরাজীও বাইবেল-সম্বন্ধীয়, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের অগুণ্ডে পরমাগুণ্ডে এইরূপে বাইবেলের ‘শিক্ষা’ ও বাণপ্রের ইহার ইন্দ্ৰজ্ঞে করিয়া দিয়া নিজেদের

কর্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, এবং তপ্তলোহের তরলদারে পরিপূর্ণ বীভৎস কুস্তীরময় কুস্তীপাকের হস্ত হইতে অনন্তমুক্তি প্রদানে উহা-দিগকেও ধস্ত করিতেছিলেন।

নীলিমা ক্রাসের কাহারও চেয়ে এই আত্ম-রক্ষা-কার্যে অবনোযোগিনী না হইয়াও ইহার উঠিতে বসিতে কিছু শিকড়ীদের নিকট গুৎসনা লাভ করিতেছিল। মিস হর্ণ এক দিন প্রশ্ন করিলেন, “আই হোপ, ইউ লাইক দি সায়ন্স? (আমি আশা করি, Psalms তোমার ভাল লাগে)?

নীলিমা বিখ্যা বলিতে জানিত না, তবে ভয়ে ভয়ে জানাইল যে, না, তা’ লাগে না।

“নো?—ওহ হাউ শকিং!” (না? উঃ, কি ভয়ানক!) মিস হর্ণ চোখ কপালে তুলিয়া বকে ক্রম চিহ্ন ধরিয়া দেহশুদ্ধি করিয়া লইলেন।

মিসেস্ গুই এক দিন সব মেয়েদেরই জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওই! তোরা সব পুতুলদের ভক্তি করিস? ওদের বেবতা-বনে করিস?”

সব মেয়েই আর ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল। চুপ করা যখন অচল হইল, তখন বাহাদের বিখ্যা বলা অভ্যাগ আছে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বলিল, “নেহি, নেহি মানুতে হৈ; পহিলে মানুতে থি; লেকিন্ আব হি তো কেবল বেতুকো প্রেম করুতে হৈ।” মিসেস্ গুই উহাদের দিকে ঐতিকটাক করিয়া সঙ্কটভায়ে কহিলেন, “উয়ো ঠিক কাম করতে হৈ, তোম লোগকা অস্বীকার নরক সে বাচ গিয়া!”

শুনিয়া ঐ মেয়েরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন স্বয়ং বীণাখুই বা পুনর্জীবিত হইয়া আনিয়া তাহাদের অনন্ত পাপমুক্তির আদেশ প্রদান করিতেছেন, এমনই নিশ্চিন্ততা তাহারা বোধ করিল।

মিসেস্ গুই তখন তাঁহার কোটরনিবাসী চোখ দুইটাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া কটমট করিয়া নীলিমার দিকে চাহিলেন, “তোমার বুঝি ও কথা বলবার সাধা হলো না? তুমি বুঝি এখনও ফুল-বেলপাতা দিবে পুতুলের পূজা করছো?”

এতক্ষণ এই সময়েরই জন্ত নীলিমা খাননিরোধ-পূর্বক প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। সন্মোদিত হইয়া তাহার মুকুট চিপ্ চিপ্ করিতে লাগিল। তাহার রক্তাঙ্গ-তার পাণ্ডুর অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল। ইহা না কোন কথাই সে কহিতে পারিল না।

বিসেস শুইএর হয় ত বা বিখ্যাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁর অপর সকল হিন্দুস্থানী ও কয়েকটি নিতান্ত নিম্ন-শ্রেণীর বাঙ্গালী ছাত্রদের আত্মার অপেক্ষা একটু উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকর্তা নীলিমার আত্মার বাজার-দর কিছু অধিক হওয়াই সম্ভব এবং সেই জন্যই বোধ করি, উহাকেই সুরক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ-টাও কিছু অধিকতরই দেখা যাইত। নীলিমাকে যে উঠিতে বলিতে বীণ-শ্রোত শিক্কা দিয়াও তাহার কল এত বড় অফলা হইয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার মন খারাপ হইয়া মুষ্টি ও ভীষণতর হইয়া উঠিল।

“কর সেম! নেলি! কর সেম!—ঈশ্বর তোমার জামাদেবরই সঙ্গে এক রকমেরই মানুষের চেহারা দিয়াছেন, কেন নি? বরষও তোমার এখন এই নেহাৎ কাঁচা, ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি তাঁর নিজের ভেড়ার-ছেনা হ’তে পারতে। কিন্তু তা না ক’রে কি লজ্জার বিষয় যে, তুমি সরতানকে আত্মবিক্রম ক’রে রেখে দিলে! ঈশ্বরের পুত্রকে শরণ না নিয়ে পুতুলের কাছে নিলে? বাড়ী গিয়ে একবার বাঁ পায়ের লাধি দিয়ে দেখ দেখি, তোমার পূজা করা সেই পুতুলগুলো ক্যান্ড হয়ে উঠে তোমার উটে লাধি ঝরতে পারে কি না। \* তা যদি না পারে, তবে সে তোমার অনন্ত নরক থেকে মুক্তি দিতে পারবে?”

নীলিমার চোখে সহজে জল আসে না, আসিলেও তাহা সহসা ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু আজ আর তাহার চোখের জল চোখের মধ্যে ধরা রহিল না, গাছের পাতার শিশির-বিন্দুর মতই তাহা এক মুহূর্তে ঝরিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু ইহার ফল যে ভাল নয়, তাহা বুঝিয়াই সে পরক্ষণে অশ্রু সংবৃত্ত করিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু চোখের জল তাহার গোপন ছিল না এবং তাঁর মনের সঙ্গে তাহা বোধ করি বিচার মতনই হস্ত ফুটাইয়া দিয়াছিল। বিসেস শুই একবারে রক্তমুষ্টি ধারণপূর্বক দাঁতে দাঁতে ঝরিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন—“আ! নেলি! এত দিন এত শিক্কা পেয়ে তুমি পুতুলের শোকে কেঁদে কেরে! কি ভয়ানক! কি লজ্জা! কি ঘেরা! কোথায় আজ প্রভু বীণের প্রেমে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমের ধারা বইবে, তোমার স্বর্গের আলোক হাস্তে থাকবে, তোমার আত্মা অনন্ত

\* এই ঘটনাটি কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে, পরন্তু বাস্তব।

কালের সন্ত জ্ঞানকর্তা বীণের আশ্রয়ে পরিভ্রাণ লাভ করবে, তা না হয়ে হুলা জগরাধ, জিব বারকরা কালী-মুখী ন্যাংটা মুষ্টি কালী, হাতীমুখো গণেশ মনে করতেও গানের রোন খাড়া হয়ে ওঠে—সেইগুলোর শোকে তুমি চোখে সবধেফুল দেখছো! এই ঘেরা! তোমার আর এর সঙ্গে এক বেকিতে বসবিনে; ওর সঙ্গে কথা কবিনে; ওর দিকে কেউ চেয়ে পর্য্যন্ত দেখবিনে। ওর আত্মা একেবারে নরকের দোর-গোড়াতে গিয়ে পৌছে গেছে। সেখানে ওর আত্মা হাজার-কুমীরের আহার হয়েচে,—সেখানে ওর আত্মা কীট-পতঙ্গের আহার হয়েচে,—সেখানে ওর আত্মা সংসারের বাব-ভীষ পাপের ভারে ভারী হয়ে সংসারের মত কিছু ময়লা জিনিসের মধ্যে ডুব গেছে; সেখানে ওর আত্মা আগুনের হাপরে যেমন পলান লোহা চেউ খেলতে থাকে, তেমন ধারা পরম লোহার চৌবাচ্চার প’ড়ে জলে থাকে, জলে থাকে, জলে থাকে!”

নীলিমার ঠোঁট ফুলিতে লাগিল, বুক ঠেলিতে লাগিল, চোখ কাটিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হৃৎস্পন্দিকই যেন এই মুহূর্তে হইতেই তাহার উল্লসিত হৃৎস্পন্দ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মটিকে (সেটা যে কোথায় আছে, তাহা না জানিলেও) যেন হাজরে চিরাইয়া, কুমীরে গিলিয়া, জাঁকেয়া চুষিয়া, পতঙ্গে কুরিয়া খাইতেছে। গরম লোহা তরল অগ্নির মতই যেন তাহার সমস্ত শরীরকে পোড়াইয়া দিতেছে, অথচ তাহাকে ছাই করিতেও পারিতেছে না। নীলিমা হাঁপাইতে লাগিল, তাহার হাত ও পায়ের তলা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তাহার পর সর্কাজ ব্যাপিয়া একটা প্রবল কম্পন দেখা দিল, সে পতনোন্মুখ হইয়া দেওয়াল ধরিল।

বিসেস শুই একবারমাত্র তাঁর দৃষ্টিতে বোধ করি সেই তরল অগ্নিরই কতকটা কাপটা মারিতে চাহিয়া তেমনই সতেজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “সেই পলা আগুনে প’ড়ে প’ড়ে জুইয়া কণে কোনমতে বুঝবে না; চক্ষুতে দেখবে, মতেই প্রত্যক্ষ করবে না। চীৎকার ডাকিলেও কেহ আসিবে না। আবার ভীষণ দগু পাবে—যখন ঐ আগুনের কুণ্ড নিয়ে বরনার পচা গন্ধময় পুকুরে ঠেলে তখন চীৎকার ক’রে উঠলে সেই পচা



সহস্রটা ভীষণাকার ক্রমিকীট কিস্কিন্দ ক'রে মুখের মধ্যে—

নীলিমার কানে শুনিবার, চোখে দেখিবার শক্তি সভাই লোপ পাইয়া আসিল। অনেককণ পরে সে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মুখ তুলিয়া, চোখ বেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার ক্রাসের মেয়েরা তো বটেই, অন্যান্য ক্রাসের মেয়েরাও ক্রাস ছাড়িয়া তাহার বিচার দেখিতে আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিস্ হর্ণও আসিয়া নিতান্ত সক্রমভাবে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে 'হাউ সিকিং! হোয়াট এ পীটি!' ইত্যাদিরূপ আপশেষ জানাইতেছিলেন। নীলিমার চক্ষু-কর্ণের এ সকল দৃশ্য ও শব্দবোঝা বিশেষ অবসর ছিল না। মিসেস গুটর প্রকাণ্ড তামাটে মুখখানা কঠোর কাস্তুরবর্ন-প্রয়োগের অন্তর্গত তাহার অপমানাহত ভীত চিত্ত উগ্র আগ্রহে চকিত হইয়া উঠিল। মিসেস গুটর কিস্কিন্দ সমধিক শীতল হইয়াছিলেন।

তরল তপ্ত লৌহ বৃষি একটুখানি জুড়াইয়া আসিয়াছিল না কি, বলাও যায় না। কতকটা সংযতভাবে তিনি তখন পাঠ করিলেন—“এবং সেই পরাজিত সকলেও করে, যাহাদের উপরে আমার নাম ডাকা হইয়াছে। অতঃপর আমার বিচার এই, পরজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ক্রোধ, আমরা যেন তাহাদিগকে কষ্ট না দিই, কিন্তু তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমাখচিত্ত অন্তর্চিত্ত হইতে, ব্যভিচার হইতে গলা টিপিয়া মারা প্রাণী হইতে এবং রক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকে।”

“নেলি? এখন বেশ ভাল ক'রে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ ত? আচ্ছা, আজ রাত্রি ধ'রে অনুতাপ ক'রে নিজের পাপ-কালন কর গে যাও। পবিত্রাত্মার কাছে ঐ পুস্তক হৃদয়ের বদলে একটি মানুষের হৃদয় প্রার্থনা ক'রে খুব চোখের জল ফেল গে দেখি! কি বলবো, তুমি আমাদের বোর্ডিংএর মেয়ে নও, তা হ'লে এক দিনেই তোমার আমি ঠিক ক'রে নিভুন্ন। না যর হইতে ইংরেজ বন্ধ থাকলে আর শাস্তির কথা শুনলে উঠিতে পারিল। বের হয়ে যেত।”

ইহার বদলে আতীত ও অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-হইতে শিথিল হইয়া ভীত, কম্পিত, লজ্জাবিবর্ণ, সঙ্কোচে সম্বন্ধীয়, ইহা লিখা ক্রাসের বাহিরে আসিয়া একটা আর্ন্ত-অগুণ্ডে পরমাপেক্ষ করিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাহার বাস্তব ইহাভাব করিতেছিল, একটা প্রচণ্ড অনির্বৃত্ত

ভয়ে যেন তাহার সমস্ত মনটাকে আর্ন্ততার আশ্রয় করিয়া তুলিতেছিল। সে ভয়টা অবশ্য গুটর বা মিস্ হর্ণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাহাদের বর্ণিত সেই ভীষণ নরকযন্ত্রণার ভবিষ্য আভ্যন্তরিত, তাহা নিশ্চিত করিয়া না বুঝিলেও তাহার নিখাসে প্রাণসে কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সে গিয়াছে যেন অন্যের মত, ইহাপরকালের মত, অনন্তকালেরই মত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার ক্রাসের মেয়েরা তখন ছুটির পূর্বককার প্রার্থনা-গান গাহিতেছিল।

“ইশ মনি মেরা প্রাণ বাঁচাইও”—

তাহাদিগের সেই প্রার্থনার সঙ্গে প্রাণের তান মিশাইয়া তাহার ভয়ানক চিত্তও যেন অকস্মাৎ আত্মপ্রাণের প্রাণেরও মধ্য দিয়া ঐ গান মগ্নভাবে গাহিয়া উঠিল। মর্মেত্তিত হইতে ভীত অস্ত্র ব্যাকুলচিত্ত কাতর উদ্ভ্রান্ত হইয়া আর্ন্তত্বের বলিতে লাগিল,—

“ইশ মনি মেরা প্রাণ বাঁচাইও,—মেরা প্রাণ বাঁচাইও,—মেরা প্রাণ বাঁচাইও।”

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে দিন বাড়ী ফিরিবার মুখে সারা পথটাই নীলিমা গভীর উৎকর্ষার সহিত ভাবিতে ভাবিতে আসিল যে, বাড়ী ফিরিয়া সে মা'র কাছে প্রথমেই জানিয়া লইবে যে, খুঁটখুঁটের চেয়ে হিন্দুধর্ম বড় কি ছোট? খ্রীষ্টান না হইয়া হিন্দু থাকিলেই মানুষকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কি না, থাকিয়াও স্বর্গযাত্রা করা চলে কি না—যে সঙ্কল্পও সবিশেষ জানিয়া লইবার জন্য তাহার সারা চিত্ত উদ্বেগ ও আগ্রহের যেন আর অস্ত্র রহিল না। মিসেস গুটর আজ বিদায়কালে পুনশ্চ তাহাকে দৃঢ় আদেশের সহিত বলিয়া দিয়াছেন,—মিস্ হর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসে পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছেন,—কাল তাহারা তাহাকে ‘গুড বিলিভার’ দেখিতে উৎসুক রহিলেন। অসহ্য অশিক্ষিত বাঁড়ে চড়া মহাদেব, ঠুটো জগন্নাথ, কুচরিত্র কীকট, উলজিনী কালা (হোয়াট এ সেন!) এদের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া ‘সেভিয়াবু’ শরণাপন্ন হইলেই তাহা তাহার দীন-আত্মা অনন্ত অসীম মুখের অধিকারলাভে সমর্থ হয়, তখন অনর্থক নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অনায়াসসাধ্য সুখপাত্র কেনই বা সে পান করাইয়া

চির-অমরতা দান না করিয়া থাকে? ইহা না করিলে তাহার পাপ আবার অজ্ঞাত 'হীদেন'-দের চেয়ে কোটি-গুণ অধিকতরই হইবে। যেহেতু, যীশু যে 'খৃষ্ট' এবং তিনিই যে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলের জ্ঞান-কর্তা, তাহার সম্বন্ধে নীলিমাকে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ-ভাবে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। যেহেতু নীলিমা বিশেষভাবেই জানে যে পিতৃ-পুরুষ দায়ুদ প্রবাচক ছিলেন এবং ঈশ্বর দিব্যপূরক তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহার ওরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন, এই তিনি পূর্বে হইতে দেখিয়া খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাঁহাকে পাতালে ফেলিয়া রাখা হইল না। তাঁহার মাংসও ক্ষয় পাইল না। এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইলেন, আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণহস্ত দ্বারা উন্নীত হওয়াতে এবং পিতার কাছে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যীশু তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি বর্ণন করলেন। কারণ, দায়ুদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন,—‘প্রভু আমার, প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে উপবেশন কর, যে পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার চরণের পদাশ্রয় না করি, অতএব সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রভু খৃষ্ট উত্তরই করিয়াছেন।’

মিস্ হর্ন শাম্পানীর দ্বারের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “মন পরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপবিশোধনার্থ তোমরা প্রত্যেকে যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও; তাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মা দান প্রাপ্ত হইবে।”

নীলিমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এই শেষ কথাগুলারই প্রতিধ্বনি অনবরত তাহারই নিজের উত্তর কর্ণে ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল,—“তোমাদের পাপ-বিশোধনার্থ তোমরা যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও \* \* \* যদি বাস্তবিকই সেই যৌতবরূপ অতন্ত নরকজালা হইতে মুক্তলাভানন্তর ইহাতে অনন্তকালের সুখ-সেবা স্বর্গবাস ঘটে, তবে কেনই বা সে “যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ” না হইবে? মিসেস ওই বলিয়াছেন, “অবিশ্বাসীর আত্মাকে সহস্রকোটি বিবাক্ত কীট সহস্র সহস্র কোটিবর্ষ ধরিয়া প্রতিনিয়ত কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া কাটিয়া থাইতে থাকিবে; কাহারও সাধ্য নাই যে,

সে দুর্দশার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে! ইহার উপায় একমাত্র যীশু।”

নীলিমার মায়ের মুখ মনে পড়িয়া গেল। মায়ের কথা মনে হইল। মা, তার স্নেহময়ী মা, তিনি যে সামান্য একটু মাথা ধরিলে কতই না ব্যাকুল হইয়া, সেটুকু রূপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়েন, আর ঐ অতঃ বড় বিপাকের মধ্যে তাহাকে ডুবিতে দেখিয়া সেই মা কি কখন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন? কখনই না, কখনই না—মা তাহাকে নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই অমৃতমসাজের, সুগন্ধি বিবাক্ত-কুরিকীটে পরিপূর্ণ, গলিত মরলার শ্বাসরোধকারী দারুণ দুর্গন্ধে ভরা নরককুণ্ড হইতে, গলিত লোহের তরল অগ্নির ভীষণ আধার হইতে নিশ্চয়—নিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অসম্ভব, নীলিমার এ দুঃবস্থা তার মা থাকিতে ঘটা একান্তই অসম্ভব! মায়ের কাছে কোনরূপে এই মুহূর্তেই গিয়া পৌছিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ ও ইচ্ছাবৃত্তি সকল একান্ত উন্মূখ হইয়া উঠিল। অথচ কি—ধীরমুহুর গতি ওই বলদ দুইটার পায়ের, আর সেণ্টপিটার্শ মিশন স্কুল হইতে নীলিমাদের বাড়ীর রাস্তাটাও কি না ভেমনই বিষম দীর্ঘ।

বাড়ী ফিরিয়া এক রকম ছুটিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নীলিমা উচ্চ কর্তে ডাকিয়া উঠিল—“মা!”

অধীর ও উদ্ভীষিত আত্মা মায়ের দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এ কি! নীলিমার সকল ব্যগ্রতাই যে ঘোর নৈরাশ্রের ভীরে আছাড় খাইয়া পড়িল। এ অসময়ে তার মায়ের তাঁড়ার দ্বারের মধ্য হইতে তাহার পিতার কর্ণের সাদা আসিতেছে কেন? নীলিমা সহসা নিজের অনন্ত নরকযন্ত্রণার তন্মাবহতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার মায়ের আসন্ন কোন বিপৎপাতের সম্ভব করনার শঙ্ক হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন কিছু অঘটন না ঘটিলে এ সময় তাহার পিতাকে ইটখোলার তদারক ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনে নাই। তার উপর তাঁর ভাবগুরু-প্রবেশেই যে মস্ত বড় একটা বিপদের সূচনা করিতেছে। নীলিমা প্রোতোহত কুস্তম্বদ্বারের মতই সেইখানে নিশ্চল হইয়া রহিল এবং সেখান হইতেই যে এই কথাগুলি শুনিতে পাইল।

“বল কি তুমি গিন্নি। ছোড়াটাকে ত আজ বছর চারেক হ’তে চমো ভুখোন রায় পুবেছ, তোমার বাড়ীমুখো হ’তে দেয় নি,—বাড়ীতে থাকবার মধ্যে





এখন তাহা রাজ্যতিক্রমেরই উপক্রম করিল।  
মিসেস ওইএর মুখে কি সমাচার লাভ করিয়াই  
তিনি সে দিন প্রায় ষাটরকোষার রক্তবর্ণ মুখে  
ছুটিয়া আসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া  
উঠিলেন—

“নেল! ইহা কি সুসমাচার! তুমি বীশস্  
ক্রাইস্টের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ? ইহা কি সত্য?”

নীলিমা বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া  
তেমনই নতমুখে মাথা হেলাইয়া নিজের এ বিষয়ে  
সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

“ইজ নট ইট গ্লোরিয়াস!” (ইহা প্রশংসার্থ)

“তুমি এখন বীশস্ ক্রাইস্টের পবিত্র নামে  
বাধ্য হইতে সম্মত আছ, আশা করি।”

নীলিমার শরীরের প্রতি শিরা, প্রত্যেক লোকপ  
যেন এই প্রস্তাবমাত্রেরই একটা অনন্ততপূর্ণ আতঙ্কের  
শিহরণে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বন্ধ-  
শোণিতের সবল ধারা যেন অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত  
প্রোতোহত নদীবকের মতই শুক ও অচল হইয়া  
পড়িল। তাহার চক্ষুতে দৃষ্টি শূন্য রহিল, অথচ  
সে যেন তাহা দিয়া তাহার সমুদয়বর্তিনী বিদেশিনী  
প্রলোভকার গুল মুষ্টি সুস্পষ্টভাবে আর দেখিতে  
পাইল না। ঠোঁট খুলিয়া সে কি যেন একটা  
সম্মতিসূচক বাক্য বলিতে গেল, কিন্তু ভিতর হইতে  
তাহার সর্বদেহমনের নিদারুণ দৌর্যল্য তাহার  
জিহ্বা তালু ওষ্ঠাধর সকলকেই এমনই অবশ ও  
অবল করিয়া রাখিল, বাহাতে করিয়া এতটুকু শব্দও  
তাহারা বাহিরে আনিতে তাহাকে সহায়তা করিল  
না। রক্তচিহ্নহীন পাণ্ড ও ক্ষীণ ওষ্ঠ বারেক  
কম্পিত হইয়াই থাকিয়া গেল।

মিস হর্ন পুলকিতচিত্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শীকার-করা  
পাখীর মত তাহার বিবর্ণ শুক মুখের দিকে  
চাহিয়া ছিলেন, একটু বুঝি মায়া হইল। কাছে  
আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া, মাথার হাত দিয়া  
স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, “বাই গার্ল! নিজেকে অশান্ত  
করিও না, কিছু দিন সময় লও। বীশস্ ক্রাইস্টকে  
মনে মনে পূজা কর, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর,  
—যেন একটি ভেড়ার ছানা। আরি তোমার  
অন্তরের সঙ্গেই এ বিষয়ে সাহায্য করিব। কয়েক  
দিনের মধ্যেই তুমি নিজে বুঝিতে পারিবে যে,  
‘বিলিভার’ হইয়া তুমি এ সংসারেই কত উন্নতি

করিতে পারিবে। অন্য জগতের কথা ত দূরের, এ  
জগতেই বা, তুমি ‘আন্বিলিভার’ থাকিয়া কি  
পাইয়াছ?

নীলিমার রক্তহীন, বর্ণহীনশূন্য গুল মুখ ঘরিত  
শোণিতোচ্ছ্বাসে সিন্দুররাজা হইয়া উঠিল। তাহার  
অবসাদ-অবসন্ন সমুদয় মাথুপেশী যেন নবীন জীবনী-  
শক্তির পুনরুদ্ভাদয়ে জীৱন্ত ও সতেজ হইয়া উঠিল।  
তাহার সংসার সুখভোগে অপরিভূষিত, ভূষিত মনপ্রাণ  
যেন ওই তীব্র প্রলোভনবাক্যের বাহুগ্ৰস্টপার্শ্বে  
অপেক্ষের মধ্যেই নিজের সমুদয় অতীতটাকে সুখহীন,  
স্নেহহীন, আশাহীন ও নিরানন্দবোধে উহাকে  
পরিত্যক্ত পুরাতন সর্পনির্দোষের মতই বিদায়  
দিয়া নব নব আশাধারায় বিভ্রাঙ্কিত ও নবীন  
সুখোদ্ভীপনার পরিপূর্ণ নূতন জীবনকে, সমুদয়  
ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে আগত জানাইতে চাহিল। ঐ  
কয়টি বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহার উৎ-  
স্ফীড়িত আত্মানী চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া জবাব দিল  
—সত্যই ত, পরলোকের কথা ত অনেক দূরের—ইহ-  
লোকেই বা সে কি পাইয়াছে, কি পাইতেছে? কি  
পাইলে সে তাহার গৌরবে, তাহার বন্ধনে, তাহার  
আশাসে ইহাদের দান, তাহার চিরজীবনের সুখ-  
মোতাগ্য ঐশ্বর্য-গৌরব, পরজীবনের অটুট শান্তি সব  
ভাগ করিতে পারে? মায়ের বুকে তাহার জন্ম স্নেহের  
সকল নিশ্চর্যই আছে, কিন্তু সেই নিরুপায় ব্যর্থ স্নেহ,  
যাহা স্নেহপ্যাককে অকথ্য অপমান হইতেও এতটুকুও  
রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা থাকিলেই বা লাভ কি,  
আর না থাকিলেই বা ক্ষতি কতটুকু? তাহার পর-  
বাপ? তাহার কথা মনে পড়িতেই নীলিমার সর্ব-  
শরীরে যেন একটা টান ধরিল, বুকে একটা প্রবল  
চাপ বোধ হইল। ঐ পিতার কথা হইয়া থাকার চেয়ে  
তাহার আর সব কিছুই হওয়া ভাল। ঐ পিতার  
আশ্রয়ে অতীত ও বর্তমানে বাহাই হউক, ভবিষ্যতে  
তাহার ভাগ্যে আরও যে কিছু আছে, তাহার ঠিকানাই  
বা কি? তাহার মা যে জীবন চিরদিন ধরিয়া বহন  
করিতেছেন, সে জীবনের স্বতিতেই যে নীলিমার  
স্বৎকম্প উপস্থিত হয়। পিতার নিকটানে একান্ত  
শক্তার দরে, খুব সম্ভব ঐ দরেরই কেহ নীলিমাকে ভয়  
করিয়া লইবে; তাহাদের প্রোজীৱ শ্রেণীর চক্রবর্তী  
ঘরে পরসী লইয়া মেয়ে বেচারও ত প্রথা আছে।  
অতএব ভবিষ্যতের দড়ী-কলসীর চাইতে এদের আশ্রয়



কি শ্রেয়ঃ নয়? মরণের চাইতেও কি খুঁটান বেশী  
পর? তাহার বৃকের রক্ত—জমাট বাঁধিয়া ওঠা রক্ত—  
—ফেনাইয়া ফেনিল হইয়া উঠিল। সে অস্থির অথচ  
স্বদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, “বাগ্‌টাইজ আমি হ’বো;  
কিন্তু তার পূর্বে আমি ভাল ক’রে শিখতে চাই।  
আমায় ইংরেজী বাইবেল ভাল ক’রে পড়াতে হ’বে।  
আমার শিক্ষার যাতে উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা আপ-  
নাকৈই করতে হ’বে। তার পর আমি বাগ্‌টাইজ  
হ’বো।”

এত কথা ও এমন কথা সে যে কেমিন করিয়া এত  
সহজে বলিয়া গেল, সে যেন তাহার পক্ষে একটা  
ইচ্ছাকৃত বা স্বপ্ন। কিন্তু বলিতে পারিয়াই সে বিশ্বাসের  
সঙ্গে সঙ্গেই অপরিণীত তুষ্ট ও তৃপ্ত হইল। তাহার  
এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং বলিতে পারার  
শক্তিমন্দের জন্তই যে সে তাহার এই ভীষণ দুর্বল  
নিরুপায় জীবনের সমস্তটাকে বদল করিতে চায়।  
সে দিনের ইচ্ছামাত্রই যে এই আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য  
তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, ইহাতে সে ভবিষ্যৎকে  
খুবই উজ্জল ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিল।

মিস হর্ন যে তাহার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত  
হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য এবং এই শুভ-সন্দেশ  
সঙ্গিনীদের বাঁটিয়া দিবার জন্ত ক্ষিপ্ৰচরণে প্রায়  
ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারাও একে একে বা একে দুইয়ে  
আসিয়া কেহ নীলিমাকে এক গোছা ভায়োলেট ফুল,  
কেহ এক বাস্ক চকোলেট, কেহ বা একখানা লাইফ  
অফ আওয়ার লর্ড (Life of our Lord) এমনই  
কিছু না কিছু উপহারের সঙ্গে তাহাকে অল্প আদর-  
বর্ষণে মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। অতঃপর  
মিসেস গু’এর উপর কড়া হুকুম পড়িল, যেন নীলিমাকে  
তিনি খুব স্নেহে ব্যবহার করেন। তা মিসেস গু’ই  
নিজেও সে বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন। কেবল স্বভাব  
না কি মানুষ মরিলেও সংশোধিত হয় না!—তবে  
ইহার পর হইতে মিসেস গু’ইএর ক্রাশে নীলিমাকে বড়  
বেশীক্ষণ থাকিতে হইত না। মিস হর্ন তাহার  
ইংরাজী, মিস বীন্স তাহার ছবি আঁকার ও  
সেলাইয়ের শিক্ষাভার লইলেন। এমন কি, মাদাম  
পিরীও কখন কখন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ শিখাইয়া  
তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মায়ের  
সংযত উচ্ছাসহীন মাপাজোঁকা আদরের স্থানে  
সমুৎসাহিত সোচ্ছাস স্নেহের বজাপরিপ্লাবনে তাহাকে

ভাসাইয়া দিবার উপক্রম হইল। মিসেস গু’ই  
নিজ তাহাকে উঠিতে বসিতে বুকাইতে লাগিলেন  
যে, খুঁটান হইলে তাহার স্নেহের দীপা থাকিবে না।  
তিনি বলিলেন, “এই দেখ না, কম বয়সে বিধবা হয়ে  
ভাইয়ের সংসারে খেটে খেটে মরছিলুম, একাদশী ক’রে  
প্রাণটা বার হবারই যোগাড় হ’ত, লোভে জিহটা  
খসে গেলেও এক টুকরা মাছ নিজের পটিতে নেবার  
যোটা ছিল না; ভাগ্যে ভাগ্যে না এরা আমার ভজন-  
ভাজন দিয়ে বার ক’রে আনলে, তাই আজ আমার  
আবার একবার ছেড়ে ছ’বার বিয়ে হলো, মাছ  
ছেড়ে বেকন ফাউল পর্যন্ত অনায়াসেই চ’লে যাচ্ছে।  
হাত পুড়িয়ে রেঁধে মরবার বদলে খানসামার তোফা  
রেঁধে খাওয়াচ্ছে, নিজে যেখানে খুসী বাচ্চি আসছি,  
একটা কৈফিয়ৎ কাটবারও কেউ কোথাও নেই তো।  
তোমরও খুব সুখ হ’বে দেখবি কি না। তোমর তো  
এমন খাসা চেহারা রয়েছে, ভাল খেতে পরতে  
পেলেই তুই এক জন লেডী বনে যাবি, চাই কি কোন  
সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার ভিরিজী সাহেবের নজরেও  
লেগে যাবে। আমি দেখতে তেমন ভাল নই ব’লে  
আমার ও সাখটি আর পুরো হলো না। ছ’বারই  
আনকিন নেটিভ হজ্‌ব্যাণ্ড (নোংরা দেশী স্বামী)  
জুটলো।”

গভীর যুগ্মার আবার নীলিমার বুক ভরিয়া উঠিল,  
ফিরিজী সাহেবকে বিবাহ করিতে নাকি আবার  
বাকালীর মেয়ের কখন পারে? তা হউক সে  
সিভিলিয়ান, হউক সে ব্যারিষ্টার, হউক সে লার্ড  
সাহেব। তার চেয়ে গরীব হিন্দু—নীলিমার মনটা  
গুটাইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু? হিন্দুকে  
বিবাহ করিলে বা হয়, সে তো সে চিরজীবন ধরিয়াই  
দেখিতেছে! সে যদি খুঁটান হয়, বিবাহ সে তাহার  
মত দেশীর খুঁটানকেই করিবে, তাহাদের মধ্যে কি  
কোন উপযুক্ত রূপ-গুণবান্ পাত্র নাই? আর সে  
বিবাহ তো আর কাহারও স্বেচ্ছাচারের জবরদস্তিতে  
হইবে না, সে স্বয়ং নির্বাচন করিয়াই তো তখন পতি  
বাছিয়া লইতে পারিবে। তবে আর তাহার এত  
ভয়ভাবনা কিসের? নীলিমা হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

নীলিমার মা মেয়ের মনের এত বড় পরিবর্তনটা  
ধারণা করিতে না পারিলেও তাহার বাহ্যিক একটা  
বিশেষ হওয়া লক্ষ্য করিলেন। সে যেন পূর্বের  
মত তাঁহার কাছে মন খুলিয়া আর কথা কহে না,

## গরীবের মেয়ে

চুপচাপ গভীর হইয়া থাকে। পূর্বে তাঁহার গৃহকার্যের যেটুকু সাহায্য স্বৈচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই করিত, এমন কি, কত সময় তাঁহার নিষেধ পর্যন্ত মানিত না, এখন সে সবই পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি, কত সময় বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, এমনই গভীর অনমনস্কতার সে ডুবিয়া থাকে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে, বই লইয়াই—কোন একটা কোণের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া থাকে, স্থলের সময় আসিলে ছুটাছুটি আসিয়া নাকে মুখে দুটি জাত গুঁজিয়া ছুট দেয়। স্বর্ণলতা মেয়ের সামনে নিঃশব্দে থাকেন, আড়ালে তাঁহার বুক ঠেলিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসে। মেয়ের মনে যে একটা বিরটি চিন্তা ও বেদনা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা যে তাঁহাদের প্রতি অভিমান-প্রসূত, এটুকু তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিলেই বা তাঁহার উপায় কি? চিরদিনের অত্যাচারপীড়নে তাঁহার সকল মনোবৃত্তিই যে মূর্ছাবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পক্ষে তাই এটুকুও যে একান্ত অপ্রতিবিদ্যে। তাঁহার জীবনের শেষ শান্তি ঐ মেয়ের সহানুভূতিটুকু। তা' সেটুকুও যে তিনি এবার হারাইতে বসিয়াছেন। সে ক্ষতি তাঁহার মনে বিষম হইয়া বাজিলেও বাহিরে তাহা লইয়া তাঁহার কোনই অভিযোগ উপস্থিত করার আগ্রহ বা অস্থিরতা দেখা দিল না। দিন শুধু গতানুগত করিতে লাগিল।

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সেবারে গ্রামের বন্ধে বেলা ১১টার ডাউন পঞ্জাব রেলের নারিয়া দুইটি সুদর্শন তরুণ পুরুষ একটা ভাড়া গাড়ী করিয়া অমুকুলচক্রের জীর্ণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন দীর্ঘায়তশরীর, বলিষ্ঠ, উজ্জলতর গোরান্দ ও স্বভাবচঞ্চল। সে ছেলে গাড়ীখানা আসিবার পূর্বক্ষণেই লক্ষ্য দিয়া নারিয়া পড়িল ও তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ত অপেক্ষামাত্র না করিয়াই ছুটাছুটি গিয়া রুদ্ধ দ্বারের কড়া খরিয়া সজোরে নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সবল হস্তের আকর্ষণে খরিচাধরা পুরাতন কজা যখন খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তেমনই সময় ভিতর হইতে কে এক জন অতি সঙ্কুচিত ধীর হস্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে ভিতরের দিকেই সরিয়া দাঁড়াইল।

মে.(খ)—৮

ততক্ষণে দ্বিতীয় আরোহীও গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছে এবং জীবৎ সঙ্কোচের সহিত সহচরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া “এস হে সুশীল!”—বলিয়াই মুক্ত দ্বারের মধ্যে পা বাড়াইয়া দ্বারের পার্শ্বে সঙ্কুচিতা নীলিমাকে পলায়নোচ্ছল দেখিয়া সোৎসাহকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “হাঃ, নীলিমনি বে! খিন আ্যাক্ রাগেড্ আ্যাক্ এভার! (সেই রকমই শুটকি এবং ভাকড়াপয়া!)”

কথার নীলিমা তাহার দাদাকে চিনিয়া সকৌতুকে নকিরিয়া দাঁড়াইল এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিতমূর্তি জ্যোষ্ঠের প্রতি চাহিতেই বিষয়ের আতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া আর একটিও বাক্য ফুরণ হইল না। শুভেন্দুর হিম-গোর বর্ণ সহরের বন্ধ জল-বায়ুতে সুখস্বচ্ছন্দ্যের আতিশয্যে এবং সবত্বপরিমার্জনে শতশত ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ় বাহুসম্পন্ন দেহে কোমলতা দূর হইয়াছে। তাহার উপর অসাধারণ বিলাসিতাপূর্ণ সাজসজ্জায় তাহাকে পূর্বের সেই খাটো ও ময়লা ধুতী পরা গা-খোলা গরীবের ছেলে বলিয়া চিনে কাহার সাধ্য। ময়ুরছাড়া কার্তিকটির মতই তাহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল।

বিষয়ের প্রথম বেগ একটুখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে “কে? দাদা?” বলিয়া নীলিমা তাঁহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে উদ্বৃত্ত হইতেই দ্বারের বাহিরে আর একটা জুতাপরা প্রায়ের শব্দ হইল এবং আরও এক জন কেহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারা গেল। তাহার মুখটার সবখানি দেখিতে না পাওয়া গেলেও সেও যে তাহার দাদার মতই এক জন তরুণ পুরুষ এবং সাজপোষাকে ও রূপেও প্রায় তাহার সমকক্ষ, সেটুকু সেই চকিতের দৃষ্টিতেই নীলিমা দেখিয়া লইয়াছিল। তাহার উদ্বৃত্ত প্রণাম-নিবেদন মধ্যপথেই বাধিয়া গেল এবং সে এই অপরিচিত নবীনের আকস্মিক অভ্যুদয়ে থাকিবে কি পলাইয়া যাইবে, তাহা কোনমতেই স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে অশান্ত চঞ্চল হইয়াও স্রোতোজলবদ্ধ শৈবালখণ্ডের মতই আটকাইয়া রহিল।

ততক্ষণে শুভেন্দু বন্ধুর দিকে ফিরিয়া ডাকিয়া উঠিল, “এস না, সুশীল, নীলিকে আবার তোমার



সমীহ কর্তে হবে না কি ? উঃ রে!—ওঃ, লগেজ-গুলো ? তাই ত!—তাই ত হে! কে নিয়ে যাবে ? এই নীলি! তোদের চাকর-টাকর কেউ আছে, বলতে পারিস্ ? এই ট্রাকফ্রাকগুলো বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় কে, বল ত ?”

দাদার কথা শুনিয়া ও তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলিমার মনের মধ্যে সকৌতুক হাসির সঙ্গে একটু মায়াও হইল। শুধু দাদা থাকিলে সে হয়ত বলিয়া ফেলিত, “চাকর-বাকরের মধ্যে এক আমিই আছি, চল, আমিই না হয় নিয়ে যাই—” এবং সাধাচুয়াসী সেগুলো বহিবার স্হায়াও সে দাদাকে অবিলম্বে করিতে আসিত ; কিন্তু দাদার সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় লোকটিকে অগ্ন করিয়া সে তাহার কিছুই না করিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে চাকর-টাকর কেহ এ বাড়ীতে নাই। সঙ্গে সঙ্গেই বহু দিনের পরে সন্তঃসমাগত ভাইএর প্রতি তীব্র বিরক্তিতে তাহার মনটা পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিল—বাড়ীর সব হালচাল জানিয়া শুনিয়াও দাদা শুধু শুধু এ কি ছেলেমানুষী করিয়াছে!—এই বাড়ীতে আবার কোন ভদ্রলোককে কেহ সাধ করিয়াই ডাকিয়া আনে! এ দিকে শুভেন্দু আগাগোড়া যে ভয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক ছুটিটার সুশীলকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল, নিজ গৃহের যে দৈন্ত-দুর্দশা, কার্পণ্য সে প্রাণান্তেও তাহাকে দেখাইতে একবিন্দু ইচ্ছুক ছিল না, তাহার সে সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া এবার এই পথ দিয়া সপরিবার নাইনিভাল হইতে ফিরিবার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ভুবনবাবু যখন তাহাদের হৃজনকেই এখানে নামিতে আদেশ দিলেন, তখন ছ’একটা দুর্বল আপত্তি করিতে থাকিলেও জোর করিয়া ট্রেনে চাপিয়া থাকিয়া সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুভেন্দুর মত দুঃসাহসিকেরও সম্পূর্ণ সাহসে কুলায় নাই। ইহার উপর তাহার মনের মধ্যে আর একটা যে বিষর উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটার সিদ্ধিলাভার্থ তাহার এখন ঐ লোকটিকে যোল আনার উপর সম্ভট রাখাই প্রয়োজন। এই সকল স্বার্থচিন্তা স্বরণে আনিয়া মনের উন্মাদ মনেই মারিয়া আরক্ত-গভীর মুখে প্রতিপালকের আদেশে সে পিতৃমাতৃদর্শনে প্রস্তুত হইয়া নামিয়াই পড়িল। তাহার পর সুশীল-কেও যখন তাহার সঙ্গে নামার আদেশ হইল, তখন তাহার মাথায় যেন কে মূগুর মারিয়াছে, এমনই ভাবে

চমকাইয়া সে প্রবল প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। হুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া পঞ্জাব মেলের হুইশেল গর্জিয়া উঠিয়াই তাহাতে গতিবেগ প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্রুট কেস দুইটা দড়াম করিয়া প্লাটফর্মে ফেলিয়া দিয়া সুশীলও এক লম্ফ নামিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টিতেই চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া ভাইয়ের আঁটাচীকেন বাহির করিয়া দিবার সময় বিনতার অপ্রসন্ন দৃষ্টি শুভেন্দুর ক্রোধস্কন্ধ নেত্রের উপর অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আসিল। নিজের আঁচরের পিনে আঁটা হলদে গোলাপটাকে পিন খুলিয়া সে এমন ভাবে প্লাটফর্মে ফেলিয়া দিল, যেন সেটা নিজে নিজেই খসিয়া পড়িয়াছে। অনেকখানি ছুটিয়া আসিয়া সেটা সুশীল কুড়াইয়া লইতে উত্তত হইয়াছে, এমন সময় শুভেন্দুর কোন একটা কথা মাথায় ঢুকিয়া পড়াতে সে একলম্ফ আসিয়া সেটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াই চাহিয়া দেখিল যে, বিসর্পিতগতি চলন্ত ট্রেনের কোন একটি জানালার মধ্য হইতে একটি অস্পষ্টপ্রায় মুখচ্ছবি এখনও সেই দিকেই স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। শুভেন্দু মনে মনে বলিল, “ভারি বেঁচে গেছি রে!”

যাহাই হউক, লগেজগুলোকে নিজেরাই ধরাধরি করিয়া কোনমতে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্ণলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতেই শুভেন্দু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, “হাউ ডু ইউ ডু মাদার—ওঃ, আই মীন মা! ভাল আছ ত?”

স্বর্ণলতার অতি বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখে বহুকাল পরে একটা আনন্দের স্মিতরশ্মি জ্বীড়া করিতেছিল, পশ্চিমাকাশের শেষ রক্তিম সাক্ষাৎসরতা ভেদ করিয়াও যেমন আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার বহু দিন পরে পাওয়া এই সন্তান-বিলনের আনন্দ এতই প্রচুরভাবে তাঁহার চিরসংঘত চিরসমাহিতব্য চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা ভাটিপড়া মরা নদীর বুকে আকস্মিক বজ্রার প্রাবনের মতই যেন কুলুকুলু রবে ভরিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সানন্দচিত্তে তিনি তাঁহার প্রায়-অপরিচিত ছেলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কষ্টে মুখের অঙ্গ সংবরণ করিয়া লইলেন। পরক্ষণেই শুভেন্দুর পার্শ্ববর্তী তাঁহারই পদধূলি লইতে অবনতভ্রু আর একটি শোভনমূর্তি তরুণের প্রতি তাঁহার মন দিতে হইল। মাতার বিষয়ে সুস্থ দৃষ্টির নীরব প্রস্তোত্তরে

শুভেন্দু উত্তর দিল, “ও সুশীল, ভুবনবীপুর ছেলে; তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে।” তার পর এ দিক ও দিক চাহিয়া ঘোর বিরক্তির সহিত সহসা বলিয়া উঠিল, “এই পাঁচ বছরে তোমাদের বাড়ীর পুরনো ‘কল’ সমস্তই ত দেখছি ঠিক বজায় আছে! দেখ, সুশীলকে যদি এককাপ চা-টা করে দিতে পেরে ওঠে। আমাকেও দেবে অবশ্য সেই সঙ্গে দু'এক কাপ, সেটা বলাই বাহুল্য।”

স্বর্ণলতার শুক মুখ যে সজীবতাটুকু দেখা দিয়াছিল - সেটুকু মরুপলিলবৎ নিম্নে নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আন্তে আন্তে বলিলেন, “এখন তোমরা নাওনা-খাওনা করে নিলে হ'ত না? বিকেলে তখন চা পেরে—”

শুভেন্দু অসহিষ্ণুভাবে ঝাড় নাড়িয়া বলিল, “উহঁঃ, —সে হ'বে না। সে ভ-রী দেবী হবে। এক কাপ চা এখনই না খেলে শরীরের ‘মাজম্যাজানি’ কিছুতে ঘুচবে না। যাও দেখি, চট করে, নীলিকেও বরং ডেকে নিয়ে যাও, স্নীগ্নির বাতে হয়, তাই করো। ওঃ, মাদার! দি এ শুড্ গাল!”

স্বর্ণলতা বিপন্নভাবে থাকিয়া পরশেষে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, “চা ত বাড়ীতে নেই, শুভু! বাজার থেকে ও বেলা আনিয়া রাখব'খন; তাই বলছিলুম, ছপুরবেলা এখন নাই বা চা খেলি, চান করে নিয়ে—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িল, হাঁড়িতে তাঁহার নিজের ভাগের কয়টি মোটা চাউলের ভাত আছে, আধখানা আলুভাতে ও একটুখানি ভাজা-কলাইএর দালের সঙ্গে কয়ক খণ্ড পেঁপে সিদ্ধ মাত্র তরকারীর স্থানীয় হইয়া আছে। সেই জিনিস এই দুই বছরুলা দিকের পাঞ্জাবী ও চক্চকে পাম্পাস পরা সুন্দরকান্তি যুগাপুরুষের—তা' হউক সে নিজেরও ছেলে—কোলের সামনে ধরিয়া দিবার কথা মনে হইতেই স্বর্ণলতার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। জীবনে হয় ত এই প্রথম বারের জন্তই স্বর্ণলতার মন সম্পূর্ণভাবে নিজের কর্মকে তারস্বরে দিকার দিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, মেয়েমানুষ হইয়া যদি তাঁহার জন্ম না হইত, ছেলে যদি তাঁহার না জন্মিত, সে ছেলে যদি ধনী বন্ধুর সঙ্গে না আসিত! পরক্ষণেই আসন্ন বিপদের যথাসাধ্য প্রতিবিধানচেষ্টাও যে এই মুহূর্ত্তে করা অবশ্য প্রয়োজন, তাহা স্বর্ণল

আশায় ভ্রান্ত হইয়া “তোমরা ওই ঘরে কাপড়-চোপড় ছাড়, বাবা, আমি রান্না-চাপিয়ে দিই গে।”— বলিতে বলিতে যথাসাধ্য দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন।

শুভেন্দু পশ্চাৎ হইতে চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ড্যান্ ইওর রান্না! রাখবে যা ছাই তা আমার জানাই আছে! চা যে দিতে পারবে না, সে আমি আগাগোড়াই জানতুম, এমন জায়গায়ও মানুষ মরত আসে। কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড!—”

প্রায় হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত সুশীলের দিকে চাহিয়া সে বলিল, “তোমাকে শুকু আবার জোটালেন! আমার বলে ‘আপনি শুভে ঠাই পায় না শঙ্করাকে ডাকে,’ তাই হয়েছে! বাড়ীই যদি আমার বাড়ীর মত হ'বে, তবে আর এতকাল ধ'রে আমি পরের ছুরোরে ধরা দিয়ে প'ড়ে আছি কেন?”

সুশীল এতক্ষণ নির্বাক বিষয়ে ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ঘোর লজ্জাভিত্তভাবে মাতাপুত্রের মিলনকথা শুনিতেছিল এবং নিজেকেই ইহাদের এই বিশদবিড়ম্বনার হেতুভূত দেখিয়া অত্যন্তই লজ্জাক্ষুণ্ণ হইতেছিল। এখন স্বর্ণলতাকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটুখানি যেন শান্তিবোধ করিল এবং শুভেন্দুর একটুখানি কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া বিব্রত স্বরে চুপি চুপি কহিয়া উঠিল, “কি করছো, শুভুনা! কাকীমাকে কেন অত ব্যস্ত করচো? আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি, এমন সময় কোথায় কি ব্যবস্থা করে তুলবেন? একটা বেলা চা না হয়, না-ই বা খেলে! চুপ করে যাও। এস কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে একটু ঠাণ্ডা হওয়া থাক।”

বিরক্তি অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু সুশীলের এই কথার প্রত্যুত্তরে জবাব দিল, “যে বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ, ঠাণ্ডা এখানে হ'তেই হবে। গায়ের সবখানি রক্ত জমিয়ে বরফ করে দিয়ে না ফিরতে হয়, এখন!—”

উপেক্ষার চাপাসুরে অদম্যোত্তরের সহিত সুশীল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, “কি কর, শুভুনা! কাকীমার মনে কত কষ্ট হবে এ সব শুনে, তা কি তুমি একটুও ভেবে দেখচো না?”

শুভেন্দু তার অষ্ট্ৰেলিয়ান হাক্কা রেশমের টানা দেওয়া পাতলা পাঞ্জাবীতে লাগান চুপি বসান সোনার



বোতাম খুলিতে খুলিতে ক্র কুঁচকাইয়া তীব্র করিয়াই উত্তর দিল,—“দেখ, মোজা ■ সত্য কথাই বলবো, তা’তে কা’র মনের মধ্যে গিয়ে সে কি হল ফোটাবে না ফোটাবে, তা’র জন্তে পাঁচ লাগিয়ে কথা কওয়া আমার কোষ্ঠীতে লিখিত নয়; তার জন্তে তোমরা কবি মানুষরা আছ, কথার কাব্যি বানিয়ে হরকে নয়, রাতকে দিন তৈরী ক’রে তোল।—এই নীলি, একটু গরম জল এনে দে’ দেখি, দাড়ীটা কামিয়ে নিই।”

### বিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ছেলে যখন ঘরের বাহিরে গিয়া পরের মধ্যে পরিণত হয়, তখন সে যেমন অনায়াসে ও অতিমাত্রায় পর হইয়া যায়, সত্যকার পরও ঠিক ততখানি পর হইতে কুঠা বোধ করে, তাই এই দারিদ্র্যপূর্ণ এবং কার্পণ্য কঠোর গৃহস্থালীর সহস্র অভাবের অভিযোগে ঘরের ছেলে শুভেন্দুর সুগঠিত নাসা যতই অধিক উর্দ্ধ উঠিয়া থাকিল, পরের ছেলে সুলীলের লজ্জাবিপন্নতা ততই অধিক বর্দ্ধিত করিয়া তাহার মনকে একেবারে যেন এই নির্ঝাকব ও অসহায় সংসারের মধ্যবর্তী করিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। বন্ধুর ক্রটি সে যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া শোধরাইয়া লইবে, কি করিয়া কোন্ কথা বলিয়া এই দুটি নিকরপায়ী নারীর একান্ত অসহায় অবস্থার অপরিণীম লজ্জা-বেদনা প্রশমিত করিয়া দিবে, ইহা যেন সে দিশা-হারা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল এবং ইহার ■■■ তাহার স্বভাবতঃ স্বল্পভাবী সংযত স্বভাবেরও সময় সময় ব্যতিক্রম করিয়া নিজেকে সে নির্দগ্ধভাবেই মুখর ও চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুভেন্দু যখনই বিলাসবস্তুর অভাবে একান্ত উদ্বে-জিত হইয়া উঠিয়া মাতাকে অমুযোগ ■ পিতার উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে, সুলীলকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে এতদূতরকেই যথাসাধ্য সমর্থন করিয়া জানাইয়া দিতে হয় যে, শুভেন্দুর মাতার অল্পপায়তায় এবং পিতার অক্ষমতা বা কপণতায় তাহার পক্ষে কিছুমাত্রই অমুবিধা ঘটিতে পারেনাই।

শুভেন্দুর পিতা যথাকালে বাঁটা ফিরিয়া এই শুভদর্শন ওরূপ দুইটিকে দেখিয়াই অকস্মাৎ বাতাহত

কদলীকাণ্ডের মত প্রায় পতনোন্মুখ হইলেন। প্রায় সন্ধ্যার স্বমালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, “কে গা তোমরা? আমার বাড়ীতে কিসের মতলবে এসে ঢুকেছ? এটা যে অতিথিশালা নয়, তা বোধ করি তোমরা টের পাও নি? আচ্ছা, এখন কষ্ট ক’রে নিজের নিজের পথ দেখে নাও দেখি!”

নীলিমা সেইমাত্র মাতাপুত্রীর সমবেত চেষ্টা-বস্ত্রে সংগ্রহ করা দু’ বাটি গরম চায়ের সঙ্গে সামান্য একটু আটার মোহনভোগ দুখানি কাঁসার রেকাবে লইয়া অতিথিবরকে দিতে আসিতেছিল, বাপের গলার আওরাজে তাহার হাত কাঁপিয়া একটা বাটির গরম চা ঝড়নিকটা চলুকিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িয়া গেল। সে সেইখানে একটু আড়ষ্ট ও গতিহারা হইয়া থাকিয়া তাহার পর সাহসসংগ্রহ-পূর্বক একটু উত্তেজিত ক্রতপদে অগ্রসর হইতে গিয়াই শুনিতে পাইল, তাহার দাদা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছে, “আমি শুভেন্দু। কাকাবাবু আমার একবার এখানে দেখা ক’রে যেতে নাহিয়ে দিয়ে গেলেন, কালই খুবই সম্ভব আমরা ফিরে যাব। এটি কাকাবাবুর ছেলে।”

নীলিমা নিজের গতি স্থির করিয়া দেখিল, সুলীল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার বাপের সেই ছেঁড়া চটিপরা ধূল-ধূসরিত ফাটাপায়ের ধূলা সম্বন্ধে হাত দিয়া তুলিয়া লইল এবং সবিনয় মিষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, “জ্যোতামশাই! আমার নাম সুলীল। বাবা আমাদের আপনার কাছে ক’দিনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।”

“হাঁ, তাই বলো, তোমরা ভুবনের কাছ থেকে আসছো! বহোৎ আচ্ছা! ভুবন নিশ্চয় ভাল আছে? যার এত ধনদৌলৎ, সে ভাল না থেকে কবুবে কি! তাহার পর? তোমরা—বড়মামুষের ছেলেরা,—তোমরা এই গরীবের গরীবখানায় রাত কাটাতে কেমন ক’রে? পারবে ত? আর না পেরেই বা আজকের রাতে যাবে কোথায়? কোন গতিকে চোখুতান বুজ একটা রাত্তির বই তো নয়, চালিয়ে নিতেই হবে। কি বল হে—সুলীল না সুলীল বুঝি? কি নাম তোমার বসে?”

এই অপ্রচুর সত্য স্বীকারের পরিবর্তে সুলীল নিতান্ত লজ্জাবিজড়িত স্বিতমুখে উত্তর করিল, “আজ্ঞে, আমার নাম সুলীল।”

স্বভাবসিদ্ধ ঔষধব্যঞ্জক নীরসস্বর অমুকুলচন্দ্র কহিলেন, “তা সুনীলই হোক, আর সুশীলই হোক, ও একই কথা। আজকালকার দিনের ছেলে যত ‘সু’ হয়, সে আমার খুব জানাই আছে, তবে ‘নীল’ আর ‘শীল’ নিয়ে যতটুকু তফাৎ। তা হ্যাঁ, বলছিলুম কি, একটা রাত্রির তোমাদের এইখানেই তা হ’লে চোখ-কান বুজ কাটাতেই হচ্ছে, তা হোক! কালকের ভোরের প্যাসেঞ্জারটার তোমরা বেঞ্চলে পরণ্ড বেলা সাড়ে তিনটের তোমাদিগে হাবড়ার ইষ্টেসনে নামিয়ে দেবে। কোন অসুবিধাই হবে না। সেইটেতেই তোমরা যেও। আর যদি কখন বাড়ী যাই তো ওট্টেতেই যাই, ভাড়াও কতকটা সস্তা হয়।”

এই কথা বলিয়া যেন একটা খুব মস্ত বড় অর্থ-নৈতিক সমস্তার সহিত বিশেষ কোন জটিলতর সমস্তার সমাধান করিয়া দিগাছেন, এমনই প্রদম হইয়া উঠিয়া তিনি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ বলিলেন, “কিন্তু কল্কেতার ছেলেদের গুনেছি বেলা চটটার আগে ঘুম ভাঙে না, সেইটে হলেই তো সব মাটি করবে! তা আমি আর আমার গিন্নী আমরা খুব ভোরেই উঠি, আমরা তোমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবো’খন। অত সকালে তো আর মুখ কিছু দিতে মন সরবে না, চট্ ক’রে বেরিয়ে পড়লে, অ’না’সে সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা ধ’রে ফেলতে পারবে। হাঃ, তাহার পর সুশীল! তোমাদের বাবার ব্যবসা বোধ করি খুবই ভালই চলছে? কতটি টাকা ক’রে মাস মাস জমাতে পারছেন বল তো? কি গো, কুমারী নাইটিঙ্গেল কি নিয়ে এলেন? অ্যা! কি ও বাটিতে? ছুবাটি ও কি আনা হলো? আবার রেকার্ডে অতখানি ক’রে হালুগা এনেছিস কেন? হাঃ! তোর গুপ্তীর পিণ্ডি! কল্কেতার ছেলে ওরা, ওরা নাকি ওই হালুগার ভাল ছোটো গিলতে পারবে? তোর মতন কি ওদের রাকুসে কিধে! ওরা হাওয়া ঘেঁষে থাকে, ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়া খায়!”

ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়া খাইয়া সুধামান্দ্য করে কি না, বলা যায় না; তবে এ বাড়ীতে নাকি উহার কোন পাঠই ছিল না বলিয়াই না কি? সুধা এ দুই জন তরুণ পুরুষেরই অলম্বিতর পাইয়াছিল; কিন্তু গৃহস্থামীর মুখে নিজেদের ঐ প্রকার অনৈসর্গিক

আহার্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শুভেন্দু ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হইয়া নীলিমার দত্ত চায়ের বাটিটা মাত্র তুলিয়া লইয়া হাতের ধাক্কা দিয়া রেকাবখানা ঠেলিয়া গভীর চাপাসুরে বলিল, “নিয়ে যা—”

সুশীলও তখন হইতেই ঠিক উহার অমুকরণ করিতে মনে মনে ইচ্ছুক হইল ও উৎসুক হইয়া উঠিল; কিন্তু কার্যকালে ঠিক ওই রকমটাই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

নীলিমা অনেককণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, তাহার পিতৃকবল হইতে ইহাদের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই বহলায়াসে সংগৃহীত চায়ের হৃদ্যা ফেনের সহিত একীভূত হয় দেখিয়া অগত্যা ই সে তাহার পিতৃসান্নিধ্যকে আর সম্মান দিতে সাহস করিল না। কলে সে গৃহের কদম্বের দ্বারে প্রায় অর্দ্ধভুক্ত শুভেন্দুকে এবারও অভুক্ত থাকিতে হইল দেখিয়া তাহার সোদরা-মেহ আহত ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়াদান করিল এবং কেন অধিকতর চেষ্টা দ্বারা এই সামান্য সংগ্রহটুকু একটু পূর্বে করিয়া তুলিতে পারে নাই, ইহার সে নিজেকে মনে মনে বারংবার বিচার দিয়া অপর জনের দিকে সমধিক সঙ্কুচিতপদে ও উদ্বেলিতবক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দিবসান্তের সেই শেষ ধূসররশ্মিরেখায় সে মুখের পীড়িত, ভ্রুবিভ, বাখিত দৃষ্টি সুশীলের সুগ্রন্থের সহায়-ভূতিতে ভরা পরিপূর্ণ চিত্তকে অতি আগ্রহে আলোড়িত ও অভিভূত করিয়া তুলিল। সে কিছুকণ সহায়ভূতিপূর্ণ বিষয়নন্দে সেই বিব্রত বিপর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া রেকাবগুচ্ছ চায়ের আনন্দগ্রহণ করিল এবং অমুকুলচন্দ্রের বিরক্তি-অগ্রচ্ছন্ন হিংসাকূটিল মুখের দিকে উৎফুল্ল চোখ তুলিয়া স্নিগ্ধহাস্তে কহিয়া উঠিল, “আচ্ছা, আপনি ব’লে দেখুন জ্যোতামশাই, কল্কেতার ছেলেরা শুধু ইলেকট্রিক পাখার হাওয়াই খায় না, ভাল ভাল মোহনভোগও অনায়াসে ঋখে ফেলতে পারে। শুভদা, তুমি যদি আর না উণ্টে দাবী আনো, তা হ’লে ছকুম ক’রে দাও, তোমার ভাগটাও একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কল্কেতার ছেলেদের কলঙ্ক মোচন ক’রে জ্যোতামশাইএর কাছে প্রাইজ পেয়ে যাই।”—এই বলিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল এবং হাস্যোৎফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিতভাবে তুলিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল —“যদি আপত্তি না থাকে তো ও রেকাবখানাও



আমায় নামিয়ে দাও, জ্যোতামশাইএর এ রকম ভুল রেখে দিয়ে যাওয়া তো কোনমতেই চলবে না।”

নীলিমার সমস্ত মুখ রাজা হইয়া উঠিল, উহা আনন্দে কি সঙ্কোচে, তাহা সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল, এত দিন পরে যেন তাহার জীবন এতটুকু একটু সার্থক হইতে পারিল, এক দিনের মতনও একটুখানি যেন কাজে লাগিল। এমন সুরে, এমন শ্রদ্ধায়, এমনভাবে আর কেহ, আর কখন আর কোন কাজের জন্তই যেন তাহাকে আহ্বান করে নাই। সে লজ্জিত, জড়িত ও আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া তাড়াতাড়ি সবটুকু খাবার তাহার পাতের উপর ফেলিয়া দিল, ঠিক সামান্য-সামান্য পিতার জুটুকুটিল মুখের ছবি তীব্র ইচ্ছিতে কিছু বাঁচাইয়া দিবার কঠিন সঙ্কেত জানাইতেছিল, সে দিকে সে বারেকমাত্র চাহিয়াও দেখিল না।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

যন্ত্রের মধ্যে সুর ভরা থাকিলেও যন্ত্রীর হাতের স্পর্শ ব্যতীত সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, আবার উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের এতটুকু একটুখানি পরশ লাভে তার সেই নীরস কঠোর কঠোরতা এক নিমেষেই যেমন ঠেলিয়া দিয়া রসের স্রোতে সুরের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সে দিন সুনীলের সেই এতটুকু একটু মিষ্ট হাসি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও ওই কয়েকটি স্নিগ্ধ বাণীর অচিন্ স্পর্শেই নীলিমার বন্ধোবিলীন সুপ্ৰশান্ত সুরের ধারা উথলিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের তারে ওই স্পর্শটুকু যেন ঝকার দিয়া তারে তারে সুরবাহারের অসংখ্য সুর বাজাইয়া তুলিল। তাহার বুকের মরাগাঙ্গে জোয়ারের স্রোতে বজ্রার বেগ বহাইয়া তুলিল। তাহার চির-অনাদৃত ভিখারিণীর সঙ্কোচশঙ্কিত মুদিত অন্তরে রাজরাণীর ঐশ্বর্যভারের সমাবেশ করিয়া দিল। তাহার সহসা সে দিনেই প্রথম মনে পড়িল যে, তাহার বয়স এখন আর বালিকার বয়স নাই : তাহার অর্দ্ধপরিণত নবযৌবনোদ্ভাসিত তনু দেহ আজ এই অর্দ্ধাবরণের ফাঁকে ফাঁকে তাহার চিত্তকে নিরন্তর বজ্রবিপন্নতার বিব্রত করিয়া তুলিল, নিজের পরিধানের মলিন ও পুরাতন বস্ত্র আজ তাহাকে দ্বিধা-ধিকারে ভরাইয়া

তুলিল। নিজের চিরদিনের দৈন্তে, ততোদিক কার্পণ্যে বিরস নীরস গৃহস্থালী তাহাকে আজ একান্ত পরিতপ্ত, আহত ও অসহিষ্ণু করিয়া ফেলিল। এই অপূর্বদর্শন সুখসেবিত তরুণযুগলকে তাহার এই একান্ত কুশ্রীতায় ভরা, দুঃখদারিদ্র্য এবং হৃদয়হীন গৃহস্থালীর মধ্যে কোথায় রাখিয়া কেমন করিয়া যে, সেবাপূজা করিয়া উঠিবে, সে কথা মনে করিয়া এই অসহায় তরুণীটির বুকের মধ্যে যেন লজ্জামখিত রক্তের স্রোত কলকল্লালে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। উঃ, গরীবের মেয়ে হওয়ার এত বিড়ম্বনা! তাহার উপর সে গরীব যদি আবার রূপণ, হুমুখ এবং হৃদয়হারা হয়।

স্বর্ণলতার মনের বেলায় যে এ বিপ্লবাব্যাহতের ঢেউ আঘাত করিয়া যায় নাই, তা নয়। কিন্তু ওই চির-অসহায় নারীর পঞ্জর, জমাট বুকের মধ্যে সকল আশাই যেন চিরসমাহিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে যে আঘাত পড়ে, তাহাতে আহতকে তো প্রত্যাখ্যাত করার না, মাত্র অবরুদ্ধ বেদনার গুরুভারে অবসন্ন মনটাকে মুচ্ছাতুর করিয়া ফেলে। তাই মনের মধ্যে সকল বাসনা-কামনাকেই সমাহিত করিয়া ফেলিয়া তিনি তাঁহার চির-প্রথামতই সেই মোটা আটার কুটি, মসুরির দাল এবং বিলাতী কুমড়ার ছকা রাখিতে রাখিতে এই খাণ্ড পরিবেশন করিবার সমরকার নিজের ব্যথা ও ছেলের মুখের অগ্রসর মস্তব্য মনে করিয়া লজ্জাপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুর সুখসেবিত সুন্দর মুক্তি মনে পড়িয়া তাঁহার সকল দুঃখের উপর পরম সুখের শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছিল। চিরদুঃখের এত বড় সাহসনা—আজ যাহার দানে—তাঁহার পায়ের তলায় মাথা সহস্রবারই লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল নীলিমা। অমনই স্বর্ণলতার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা গভীর দার্দ্র্যনিশ্বাস উথিত হইল। আজ তাঁহার পুঞ্জৈশ্বর্যের পাশাপাশি এই মেয়ের দুর্দশাটা তাঁহার কাছেও যেন অত্যন্তই সুপরিচুট হইয়া উঠিয়াছে! তাহার উপর শুভেন্দুর সমভিব্যাহারী সুনীলের স্নিগ্ধ সৌম্য শ্রীটুকু তাঁহার মুক্ত মনের উপর কি মায়াজালই কে বিস্তৃত করিয়াছে, নে শুধু সেই জানে, যে অভাগা বাতুল গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর বর্ত্ত্য মানবের সহিত সংস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! স্বর্ণলতার বিমোহিত চিত্ত অন্তরের অত্যন্ত গোপন স্তরের সত্তর্পণে এমন একটা অসম্ভব অসম্ভব

বাসনাও উচ্ছ্বিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার একটু-খানি বহিঃপ্রকাশে সমস্ত মানবজগতে এমন একটা হাশ্বতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইবে, যাহার পর ওই চিরবিড়ম্বিত দুঃখসহিষ্ণু নারীর সকল সহ্য সীমা ছাড়াইয়া কোথায় যে ছুটিয়া যাইবে, তার কোন হিসাব থাকিবে না। এবারও নীলিমার গৃহপ্রবেশে সেই পূর্বতন দুরাকাঙ্ক্ষার চকিতোদয়ে তাই স্বর্ণলতার নিস্তেজ বক্ষ হইতে অত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। আহা, সূর্য্যলের হাতে যদি নীলি-মাকে দেওয়া চলিত।

নীলিমা আসিয়া কাঠের 'কেঠো'র কোটা কুটনা-গুলার উপর বারেক অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, উনানের উপর চাপানো ফুটন্ত দালের হাঁড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর মায়ের হাতে মাখামাখি জলঢালা আটাগুলার উপর চোখ পড়িতেই জলিয়া বিরক্তিকঠোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মা, আজও ঠিক তোমার সেই মাকাতাকালের বন্দোবস্ত! দাদাকে তা হ'লে তোমরা নিখাতই উপোস করিয়ে মারবে ঠিক দিয়ে রেখেছ! ও তো তোমার ওই পেটেন্টলেদারের তৈরী কুটি দাঁতে কাটতে পেরে উঠবে না!" বলিতে বলিতে এতক্ষণকার সকল অভিযোগের বেদনা এই উপায়হীনা জননীর উপরেই উত্তত হইয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে উত্তেজনার অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। বাপের কানে পৌছিতে পারার সকল সম্ভাবনার ভীতি তাহার মন হইতে মুছিয়া দিয়া তাহার কণ্ঠকে প্রায় সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল। সে বলিতে লাগিল।—

"অদ্ভুত মানুষ তোমরা! এত দিন পরে ছেলে ঘরে ফিরলো, কোথায় তাকে যত্নে আদরে ভরিয়ে দেবে, দুদিন ঘরে রাখবার জন্ত চেষ্টা করবে, তা না, না খেতে দিয়ে, দুঃখ দিয়ে দূর দূর ক'রে এক রকম তাড়িয়ে দিচ্ছে! খবর তোমরা! কিন্তু তা' না ক'রে ওকে যদি হাতে রাখতে, ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল হতো।—ও তো মানুষ হয়ে উঠেছে। দেখছো না কি, তোমাদের হতশ্রদ্ধা কুকুরের মতন দোরদোর ঘুরে বেড়ান সে দাদা আর নেই!"

অসহায় জননীর আর্তি করণ ছুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই অতি সহসা সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। আনায়বন্ধ নিকপায় জীব-জননীর ব্যথাকাতর মুক দৃষ্টির মতই তাহাতেও সেই একই

আশাহীনতা সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাকে সেই অভিযোগহীন বেদনা যেন কণা হইয়া বজ্রবলে আঘাত করিল। নিজের ধৈর্য্যচ্যুতির মূলে যত বড় অবिवেচনাই থাক, তাহার নিজের পক্ষ হইতেও মায়ের সম্বন্ধে যে তাহার চাইতে কম কিছু করা হয় নাই, তাহা মনে পড়িতে মন সমধিক আহত হইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। মাকে এ সব কথা বলা যে একেবারেই মিথ্যা এবং মা'র পক্ষ হইতে এ অবिवেচনার প্রতিকার হওয়া স্বর্গের সিঁড়ি হওয়ার মতই যে অসম্ভব, ইহা ত জলের মতই সহজসিদ্ধ জানা কথা। কণকাল অন্তর্গত অশক্ত কোম্প তরু হইয়া থাকিয়া নীলিমা সহসা কি ভাবিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

### দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্থায়ী রাত্রির খাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। অল্পকালজের শয়নকাল ঠিক সন্ধ্যা আটটা; ইহার ব্যতিক্রম কোন দিন হয় না, সৌভাগ্যক্রমে তাহা আজও হয় নাই। রাত্রির একবার চৌকিদারী করিয়া আসিয়া তিনি ছষ্টচিহ্নে আহার করিয়া লইয়া শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রাকালে জী ও কণাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "ওগো দেখ, তোমরাও আর অনর্থক রাত জেগে অস্থবিস্থ ক'রে প'ড়ো না, ওদের দু'খানা খাইয়ে দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে সময়মতন গুয়ে প'ড়ো। ভোর না হ'তে আবার ওদের ইষ্টিশানে পৌছে আসতে হবে। অত ভোরে ত কিছু মুখে দিতে পারবে না, তখন ট্রেনে ব'সেই কিনে নিয়ে খাবে।"

সন্ধ্যার অপরিষ্কৃত অন্ধকারের ছায়ায় দোতলার ছোট ছাতের আলিসার গারে হেলান দিয়া নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আকাশভরা নক্ষত্রগুলি প্রাণপণে জলিয়াও এই নিরালোক বাড়ীটাকে এতটুকু উজ্জল করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু ওই অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির মধ্যে একতমেরই মত অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রতম আলোকসম্পাতে আজ নীলিমার চিত্তটির অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া স্মিতশ্রুত রজতালোকের একটি স্নিগ্ধধারা তাহার এই নিরালোক বিজন মনের উপরে অতি ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে বাতাসে সন্মোহনশক্তির



## অমুরূপা দেবীর প্রহাবলী

উপাদানই কোথাও ছড়ান ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একান্তই প্রতিকূল। তথাপি এ কি গোলাপী নেশার রঙ্গীন আবেশে চোখের পাতা তাহার জুড়াইয়া আসিতেছে, মনের তারে কোন অজানা স্বরের একান্ত নবীন রাগিণী অনর্থক কেবলই এ কি রক্তত হইতে চায়? মায়ের উপর অভিমান ও পিতার উদ্দেশ্যে অপরিণীত ক্রোধ লইয়া সে এখানে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার,—অতিথিদের জোজনব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু একটুকণের মধ্যেই কোথা হইতে কোন অজাত চিত্তার অনাহুত আগমনে ঘোন্ সময়ে সে সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ পারিবারিক লজ্জার লজ্জাকর হের আন্বেষণ যে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জানাও ছিল না। সহসা অদূরবর্তী শুভেন্দুর চাপাকঠের আহ্বানে সমাজ হইয়া সে জানিতে পারিল, তাহার অন্তরের সকল বিদেববহি সহসাই নিবিয়া গিয়াছে এবং সেই নির্ঝাপিতশিখ অগ্নিজালার স্থানে সুশীতল অজস্র সুধাধারা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই স্পর্শস্থলে দাহ ত জুড়াইয়া গিয়াছেই, পরন্তু সেই অপরিমেয় অমৃতস্পর্শে সমস্ত মনপ্রাণই তাহার সুধাস্রোতে প্লাবিত হইতেছিল। পুলককম্পিত চরণে উঠিয়া আসিয়া শব্দাহুসরণে সে ডাকিল, “দাদা!”

শুভেন্দু কাছে আসিল। রাগে চুংখে সে গর্জিতেছিল। নীলিমাকে দেখিতে পাইয়াই প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে অক্ষুণ্ণ তর্জনে বলিয়া উঠিল, “কি রকমারীর কাজই আমি করেছি, এই তোমাদের বাড়ী এসে। তা’ আমার ■ মোটেই আপবার ইচ্ছা ছিল না, তা’তে আবার ওই ছোড়াটাকে ঘাড়ে ক’রে। কাকাবাবুর ঐ যে কেমন একটা ছোটলোকী গোঁয়ারতুমি, যা’ ধরবে তা’ না করিয়ে ছাড়বে না। বলো কি না, মা-বাপকে একবার দেখে আসা উচিত! আরে, বাপু, মা-বাপ কি আমার মা-বাপের মতন যে, তাদের দেখে আসবো? তা হ’লে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি কেন? এখন ওই সত্তা অপমানের হাত থেকে কেমন ক’রে বাঁচা যায়, তাই ভেবে আমার ■ মাথা ঘুরচে। কি করি বল দেখি?”

নীলিমার মুখ অন্তরের স্বপ্নবিত্তের সুখস্রোত বাস্তবের কঠিন ও তপ্ত স্পর্শে আহত ■ আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুখ তাহার একটুখানি হইয়া

জুকাইয়া গেল। কতকটা বুঝিয়া, কতকটা না বুঝিয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে?”

শুভেন্দু বিরক্তিতীক্ষকণ্ঠে কহিল, “কি হয়েছে, জানিস্ নে না কি? ত্রাকারী করিস কেন? আমি না হয় উচ্ছন্নই গেলুম, একটা রাতের মতন ■ থাকবার হুকুম হয়েছে, সেটা না হয় স্নেহ জল গিলেই কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওই যে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে রকমারী ক’রে এনেছি, ওর পাতে ওই চোকরের কুটি আর মুহুরীর দাল ঢালতে তোদের না হয় ‘হারা’ লজ্জা নেই, তোরা না হয় পারবি; আমি কেমন ক’রে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো বল দে দেখি? আরে ছ্যাং, এদের সান্নিধ্যে আবার বাবু.ব আসে? না কাউকে আনে? ওদের হিন্দুস্থানী ধরওয়ানগুলো কুটি ঐ রকমই পাকায় বটে, কিন্তু দালে তাদের খি পড়ে কত! আর সে পানপানে মুহুর দালও নয়।

কণকাল নীরব থাকিয়া নীলিমার দিক হইতে কোন প্রকার সাদৃশ্যকটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া জলন্ত হইয়া উঠিয়া শুভেন্দু গলা চড়াইয়া কৰ্কশ-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “গিন্নীঠাকুরুণকে আচ্ছা ক’রে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তুমি ঠাকুরুণও জেনে রাখ, তোমাদের বাড়ীর ও ছাই-পিণ্ডি সুশীলের পাতে আমি দিতে দেবো না, তার চাইতে তাকে নিয়ে আমি একুনি বিদায় হচ্ছি।”

এই বলিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে শুভেন্দু চলিয়া যায়; নীলিমা হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, “আচ্ছা, একটুখানি দেয়ী কর তুমি, একুনি আমি সব জোগাড় ক’রে এনে লুচি-টুচি ক’রে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে হু মটা অন্ততঃ দেয়ী হবে।”

শুভেন্দুও অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া নরমস্বরে কহিল, “আহা, তা’ যদি পারিস রে! কি বলবো তোকে? দেখ দেখি বাবার কি রকম অন্তায়, সাধ ক’রে কি আর ছ’টি চক্ষে প’ড়ে ওকে দেখতে পারিনে! বারমাস ওদের থাকি, আর সে কি রাজভোগে খাওয়া, তোদের চৌদ্ধ পুরুষও কখন অমন খাওয়া খায়নি! তা একটা দিনের ■ এসেছে, তা’কে এতটুকু একটু ■ ক’রে খেতে দিতে পারলে না! লজ্জায় ম’রে যেতে ইচ্ছে করে যে!”

শুভেন্দু আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। নীলিমা আর সে সব কথা কানে না তুলিয়া নিজের কার্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরে বাঁধা আহাৰ্য্য সামনে করিয়া স্বর্ণলতা হেঁটমুখে বসিয়া বোব করি বা নীরবে অশ্রুপাতই করিতেছিলেন। মেয়ের পায়ের শব্দে চকিত চক্ষুতে চাহিয়া দেখিয়া ঈশ্বর সঙ্কুচিত হইলেন। সেও যে তাঁহাকে ভৎসনা করিতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধাই ছিল না।

কিন্তু রূঢ় ও কঠিন সম্ভাষণের পরিবর্তে মেয়ে ডাকিল, “মা!”

তাহার গলার অতি নম্র ও অত্যন্ত বাধিত স্বরে জননী নিজের অন্তরের রাশি রাশি পুঞ্জীভূত অকথা বেদনাসিক্ত উথলিত হইয়া উঠিতে গেল। অতিশয় মর্ম্মভেদী বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, “মা?”

“তুমি উনোন নিবিও না, মা! আমি ভাল ময়দা, ঘি, হাঁসের ডিম, আলু সব বাসাকে দিয়ে আনিবে দিচ্ছি। সেই সব দিয়ে দাদাদের খাবার করে দিতেই হবে, তা হ'লে দাদা না খেয়ে একুনি চ'লে যাচ্ছে!”

স্বর্ণলতা তড়িৎপৃষ্ঠার মত চমকিয়া চাহিলেন, তাঁহার অবরুদ্ধ বক্ষ ঠেলিয়া ক্ষুধিত প্রাণের আর্ত স্বর ছুটিয়া বাহির হইল, “ও সব তুই কোথা পাবি মা? কোথা থেকে আনবি?”

নীলিমা সঙ্কল্পদৃঢ় স্বরস্বরে সংক্ষেপে শুধু উত্তর করিল, “সে আমি আনাছি কি না, দেখো না! আমি একুনি আসছি।”

ঘণ্টা দুয়ের ভিতরেই আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়া গেলে প্রকল্প-স্বত্মুখে নীলিমা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ইতোমধ্যে একটা চিরপরিত্যক্ত ঘরকে ঝাঁটপাট দিয়া একখানা তক্তপোষের উপর ময়লা তোষক ফর্সা চাদরে ঢাকা দিয়া সে শুভেন্দুদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছিল। একটি বহুদিনের পোর-সিলেনের বাতিদানীতে একটি বাতি কিনিয়া আনিয়া সে জালিয়া দিয়াছিল। শুভেন্দু সেইখানে শুইয়া ক্ষুধার জালায় জলিতে জলিতে মনে মনে নিজের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীলের পিতার পর্য্যন্ত যুগপাত করিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া নীলিমার কৃতকার্য্যতার উপরেও ভীষণ সন্দেহান হইয়া পড়িয়া উহাকে একান্ত-ভাবে গালি পাড়িতেছিল। অশ্রু ইহাও মনে মনে! সুনীল কয়েকবার কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া বন্ধুর নিকট

ধমক খাওয়ায় নিকৃপায়ে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রান্নাঘরে স্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার প্রবল লোভ হইতে থাকিলেও শুভেন্দুর মনের অত্যন্ত বিরক্ত অবস্থা দেখিয়া ভরসা করিয়া সে কথা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অথচ শুভেন্দুর এই আগ্রহহীন মাতৃমিলনের সকল ব্যর্থতাই তাহার মাতৃহীন চিত্তকে বিষয়ে ব্যথায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ দুঃখসহিষ্ণু দীনমূর্ত্তি অভাগী নারীর জটিল জীবনযাত্রার চিত্র তাহার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ চিত্তকে যেন নমতার মন্দাকিনীধারায় অতিবিক্ত করিতে লাগিল। সুনীলের অত্যন্ত আগ্রহ হইতে লাগিল, আহা, যদি সে ঐ বেদনাতারাতুর মেহবুভুকিত মাতৃহৃদয়কে নিজের ক্ষুধিত চিত্তের স্তম্ভিত-প্রেমে ভরাইয়া তুলিতে পারিত!

নীলিমার হাতে পূর্বে কতকগুলো কাচের চুড়ি থাকিত, এখন তাহাও ছিল না। মিশনের অনেক মেয়ে ও টীচারের অনুকরণে সে এখন শুধু হাতেই থাকে। বাজারের সব চেয়ে কম দামী বাজে চুড়ি ঘণা করিয়াই সে পরে না। নিজের আসার আগমনী জানাইবার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা সেইখানে থাকিয়া সে ডাকিল, “দাদা!”

শুভেন্দুর বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, তাহার সাড়া না পাইয়া অগত্যা সুনীলের দিকে ফিরিয়া যুগ্মস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খাবার এইখানে আনা হবে?”

সুনীল এই প্রশ্নে একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আগ্রহ উত্তেজিত কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “সে কি, না না এখানে কেন? এই আমরা তাঁ'র কাছেই বাচ্ছি—শুভুদা! ও শুভুদা! কি বিপদ! ঘুম দিচ্চো নাকি? চল চল, খেয়ে আসা যাক।”

শুভেন্দু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে যুগ্ম অন্ধকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সামনেই নীলিমা-কে দেখিতে পাইয়া বিরক্তি-নীরসকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “হ্যালো! কি ব্যাপার বল ত? ছাই-পিণ্ডি কি দেবে, দিয়েই ফেল না কষ্ট করে, আশায় আশায় আর কতক্ষণ রাখবে? রাত তো শেষ হয়ে এলো এ দিকে।”

শুভেন্দুর নিজের বোনের প্রতি এই শুষ্ক সম্ভাষণে সুনীল যেন চোর হইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে উঠিয়া তাড়িতাতি শুভেন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল,



“তিনি তো আমাদের কখন থেকেই ডাকাডাকি করছেন ; তোমারই যে ঘুম ভাঙে না।”

আহারে বসিয়া শুভেন্দু আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে নাই ত ? কলের ময়দার ধপধপে ফুলকো লুচি, পটল আলু ভাজা, হাঁসের ডিমের কালিয়া, কিস্মিসের চাটনি, সন্দেশ রসোগোলা, একখানা রেকাবে কয়েক টুকরা বোম্বাই আন্। শুভেন্দু বিস্মিত উল্লাসে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল, “হ্যালো! এ বাড়ীতে কি কর্তা বদলাইয়াছে আরিই বাড়ীর মাসিক হয়েছি নাকি ? এ সব কোথা থেকে এলো ? তোর জ্ঞান ফুলের চিচিরায় কি তোকে আলাদীনের প্রদীপ দিয়েছে নাকি রে ? বাঃ বাঃ, খাসা বেয়ে তুই।”

স্বর্ণলতার প্রীতিপ্রসন্ন সমস্ত চোখের নিক্ত দৃষ্টি গভীর মেহে নীলিমার আনত মুখের উপর নীরব আশীর্বাদের কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিল। সে যে আজ এই আনন্দমিলনের দিনকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া মায়ের প্রাণকে এই একটি দিনের জন্তও সার্থকতার মুখে ভরিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার মূল্য যে এই চিরজুহুধিনীর কাছে কত বড়, তা অন্তর্যামী ভিন্ন জানিবে কে ? সুশীল সকল কথা না বুঝিলেও স্বর্ণলতার আনন্দমিত্ত মূর্ত্তিখানি বিপুল আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর তাঁহারই দৃষ্টির অনুরাগে অদূরবর্ত্তিনী তরুণীর পাবনমূর্ত্তির নতই অচলা তরুণীর মুখের দিকে সম্মেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কেবল সেই আনন্দমিলনের সকলটুকু আনন্দের বাহিরে গভীর ভাবাক্রান্ত ও নিরানন্দ হইয়া রহিল নীলিমার অপরাধপীড়িত মন।

### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাসিন্দীর মধ্যে প্রেম সর্বত্রই থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অন্ততঃ তাহার একটা ভাগও থাকে। স্বর্ণলতার দাম্পত্য জীবনে আর বাই কিছু থাক না কেন, ইহার ভিতরে মিথ্যার কোন আবরণই ছিল না। বিগতপ্রায় যৌবনসীমার পৌছিয়া কোন অতীত স্মৃতি আকড়িয়া ধরিবার জন্ত এই প্রৌঢ় দাম্পত্য প্রাণের কোণেও বুঝি কখনও ব্যাকুলতাটুকু জাগে নাই। জী তথু বরকর্ণার বদ্বয়রূপই ব্যবহৃত হইয়া

অদ্বিত্যেছিল। সহসা আজ নিখুঁত স্তব্ধ রজনীর ঠিক মধ্যমায়ে নিদ্রান্তর হইয়া অনেককণ বিনিম্রাবহার চিন্তার পরে কি যেন একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া অমুকুলস্ত্র শয্যাভ্যাগ করিলেন। চিরদিনের পর অকস্মাৎ আজ গৃহিনীকে সচিবের পদ দিবার প্রয়োজন ঘটয়াছিল। পাশের ঘরে স্বর্ণলতা নীলিমার সহিত গভীর নিদ্রাভ্যাগ। অন্ধকারে আনন্দে আনন্দে ঘরের মধ্যে আসিয়া চাপাগলার অমুকুল ডাকিলেন, “গিরি! বলি ওগো! একবার উঠে এস ত ?”

ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়ে উঠিয়া বসিয়া অর্ধ সন্দেশে স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?”

“ওগো, আরি। বলি একবার এসেই না ; আমার এই বুকটার কেমন একটা ব্যথা ধরলো, একটু হাত বুলিয়ে দাওনে” দেখি।

স্বর্ণলতা মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন, ভাগো ঘটা হুই পূর্বে এই ব্যথাটা ধরে নাই !

নিজের বিছানায় ফিরিয়াই অমুকুলস্ত্রের ব্যথার সেবা করাইবার ইচ্ছাটা সহসা বদলাইয়া গেল। তিনি তখন অত্যন্ত চাপা গলার মুহুরে বলিয়া উঠিলেন, “দেখ, তোমার ওই আইবড় কার্টিক খেড়ে মেয়েটাকে পার কুরবার একবার এমন সুযোগ আর কখনও এ জন্মে পাবে না। ভুবন মায়ের ছেলোটাকে যদি হাত করে — গলার মেয়েটাকে গছাতে পার, তাঁরই অস্ত্রে কাল থেকে লেগে পড় দেখি। যেমন করে হোক, এ কাজ তোমায় করতে হবে।”

এই প্রস্তাব অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া স্বর্ণলতা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁহার মুখ দিয়া আচম্কা বাহির হইয়া গেল—“আমার কপালে এত সুখ কি হবার ? সুশীল আমার জামাই হবেন।”

অমুকুল স্থিরসঙ্কল্পের ঘরে অব্যব দিল, “কেন হবেন না ? অতবড় তৈরী মেয়ে রয়েছে, ছেলেও খোকাটি নয়। ছোটোকে খুব মেলা-বেশা করতে দাও, মেম সাহেবের নতুন, তাঁর পর নিজেই বিয়ে করতে চাইবে। সাহেবদের ওই রকমই হয়ে থাকে। ওতে দোষই বা কি ! রাজার দেখে না শিখে কার দেখে শিখে ?”

স্বামীর চিরজীবনের সকল বৃত্তি নির্বিচারে ও নির্বিবাদে পালন করাই স্বর্ণলতার অভ্যাস। তাহাতে

মন মার দিক, আর নাই দিক, প্রতিবাদ তিনি কখন কোন কার্যেরই করেন না। কিন্তু আজিকার এই পরামর্শটি তাঁহার বেশ মনঃপূত হইলেও তিনি ইহাকে নির্কিচায়ে ও নির্কিবাদে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আশাহতভাবে কীপ প্রতিবাদে উত্তর করিলেন, “স্বামীজী বাপ রয়েছে, সে কি নিজের ইচ্ছার বিয়ে করতে পারে? তার চেয়ে ভুবন বাবুকে বলে হয় না যে যদিই তিনি দয়া করে ওকে নেন, তাঁর দয়ার তো আর শেষ নেই যদিই—”

অনুকূল অসম্মতের চুক চুক শব্দ করিয়া উঠিলেন, “ওগো, তোমার দয়ার সাগরকে সে কথা আমি বলতে ভুলে যাইনি। তিনি তাহার কাটান জবাব বহুকাল পূর্বেই দিবে দিয়েছেন। কোন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নাকি ছেলের ছোটবেলা থেকে বিয়ের কথা দিয়ে গরীবের মেয়েদের পথ তিনি বন্ধ রেখেছেন। ছোঁড়া ঢালাক কি কম। দেখছো না, তোমার ছেলেটাকে কি রকম জেণ্টলম্যান বানিয়ে কেলছে! তুমি কি মনে কর, ওকে নিজের জানাই করবার মতলব ওর মনে নেই? তাই আমিও তার শোধ নেব ভেবেছি। ওর কাছে ছেলের বিয়ের টাকা তো আর চাইতে যেতে পারব না, আমার ছেলে তো ওরই হাতে। তাই যখন হাতে গেয়েছি, তখন ওর ছেলে-কেও আমি ছাড়ছি নে। ওর যাতে নীলিকে গছাবো, তবে আমার নাম অনুকূল চক্রবর্তী। ছেলে নিজে যেচে ওকে বিয়ে যদি নেহাৎ না-ই করে, তবে অবর-দণ্ডিতে করবে, করতে হবে আলবৎ।”

স্বর্ণলতার বুকের ভিতর আশার কীপ শিখা নির্দোষিত হইয়া গিয়া যেটুকু ভীষণ ব্যথা বোচড় দিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেও আড়াল করিয়া সহসা এই কথার জাগিয়া উঠিল—প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক। সর্ব-শরীর মনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আন্তরিক কহিয়া উঠিলেন, “অমন কথা বলো না। স্বামীজীর বাপের মতের বিকছে সে কেন তোমার মেয়ে বিয়ে করতে যাবে? তুমিই বা তাকে কোন হিসাবে সে কথা বলবে? সে কাজ নেই—সে কাজ নেই, আমাদের তেমন কপাল নয়।”

স্বর্ণলতার হতাশাস্কন্ধ ও তদার্ত কণ্ঠের চাপা দিয়া অনুকূলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে জানালার বাহিরে ফাটলে উপবিষ্ট একটা কালপেঁচা অকস্মাৎ ভর পাইয়া চ্যা চ্যা করিতে করিতে চোঁচাইয়া

উঠিয়া উড়িয়া গেল।—স্বর্ণলতার দুর্বল বুক তাহাতে হবু হবু করিয়া উঠিল।

“কপাল আমি তৈরী করব।—কপাল আবার কি? কপাল নিজের হাতে। এমন সুযোগ আমি নষ্ট হ’তে দেবো না। এ সুযোগ মাহুদ ছ’বার ক’রে পার না। তুমি আমার সাহায্য না কর—চুপটি ক’রে ব’সে থাক। কোন রকমে বাধা দিবেছ কি মরেছ! সেটি ঠিক জেনে রেখে দিও। এর বিকছে একটা কথা কইবে কি গলা কেটে ফেলবো!”

একটা ঘোর অবস্থার আশঙ্কার স্বর্ণলতার বাক অঙ্গ স্পন্দিত ও তাঁহার সর্বশরীর যেদম্নে অভিযুক্ত হইয়া গেল। খাস-প্রখাস তাঁহার জীর্ণ বকের মধ্যে যেন চাপিয়া থাকিয়া বহিরাগমনে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার পর কোন সময়ে বাধা ঘুরিয়া তিনি যে মশকে ঘরের মেজের উপর মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, অবসর মেহতার নিত্যসুই হালছাড়া অবস্থার পৌছিয়াছে। অন্তর্জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ অতি দীর্ঘে অত্যন্ত বিলম্বে একটু একটু করিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। মনে হইল, চিরসংঘের বাঁধভাঙ্গা এ অবসাদ আর কখনও সম্পূর্ণ ঘুরিয়া তাঁহার দেহ-মনকে পূর্বাভাস করাইতে পারিবে না। এই জীবনমৃত অবস্থাতেই তাঁহাকে হুত কা থাকিতে হইবে। রাজির শেষবারে অকস্মাৎ নিদ্রাতলে ভীত ত্রুণ গৃহবাসী, অনুকূলের উচ্চ চীৎকারে তাঁহার কক্ষ সমবেত হইয়া দেখিল, তিনি পাগলের মত বুক চাপড়াইতেছেন ও চোঁচাইতেছেন, “গিন্নি! ওগো গিন্নি! বলি গিন্নি! ওগো! সত্যি কি আমার কেলে তুমি চ’লে গেলে নাকি? ই্যা পা, কি রকম পাষণ তুমি! এমন করেই কি তাসিরে যেতে হয়?”

নীলিমা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই ত্তর ও গতিহীন হইয়া রহিল, এক পাও আর সে মড়িতে বা কাছে বাইতেও পারিল না। মাকে এমন অবস্থায় সে ত আর কখন দেখে নাই।

ওতেন্দু এবং স্বামীলও আসিয়াছিল। ওতেন্দু কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিত চোখে মায়ের শাকবর্ণ মুখের স্নানচ্ছবি দেখিতে লাগিল এবং বাপের কান্নাকে মনে মনে রুই বিজ্ঞপে তিরস্কার করিতে লাগিল। স্বামীল



শুধু এই সঙ্কল্প দৃষ্টে নিজের অর্দ্ধদৃষ্টি কোনমতে ফিরাইয়া এক ঘটি জল ও একখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুর্ছিতার শুশ্রূষায় মনোযোগী হইতে পারিল।

রোগিণীর চেতনা ফিরিয়া আনিতে অমুকুল হাউ হাউ করিয়া কাদিয়া সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন, “বাবা সুশীল! তোমার জন্মেই শুভেন্দুর গর্ভধারিণী এ যাত্রাটা রক্ষা পেয়ে গেলেন, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা! না হ’লে আমার কি হ’ত?”

গতকল্য হইতে ক্লান্তাবী, শুকচিহ্ন কপণের প্রতি যতটাই বিতৃষ্ণা সুশীলের মনে জাগিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা তাহার হৃদয়ধিকার করিল। বাহিরটা তাহার যতই কঠোর দেখাক, অন্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড প্রেমের নিকর লুকান আছে, ইহা স্থির করিতে তাহার বিলম্বমাত্রও হইল না এবং না জানিয়া অবিচার করার প্রাণিতে সে নিজের প্রতি বিশেষভাবেই বিরক্ত হইল।

মা’কে চোখ মেলিতে দেখিয়া নীলিমা কাছে গেল, স্বর্ণলতার বক্ষে গভীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তৃপ্তিত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে সামান্য একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। সুশীল ভাড়াভাড়ি মুখে এক চামচ জল দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, “চুপ করুন, মা! কথা এখন কইবেন না।”

ভাড়াভাড়িতে সে ‘জেরাইমা’র পরিবর্তে যে স্বর্ণলতাকে শুধু ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজের কানে ধরা না পড়িলেও অমুকুল ও নীলিমা দু’জনকারই কানেই উহা ঠেকিয়াছিল এবং ওই একটি শব্দই দু’জনের মনে দুই প্রকার অর্থ বোধ করাইল। নীলিমা এ ঘনিষ্ঠতায় এত বড় বিপদেও যেন একটা কুল দেখিতে পাইল এবং তাহার গুণমুগ্ধ মোহিত মনে তখনই এই কথাটা জাগিল যে, আজই এখনই সুশীল তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। অমুকুল মনে মনে বলিলেন, “নিজের মুখেই সম্বন্ধটা স্বীকার ক’রে নিলে বাছাধন, আর তুমি যাবে কোথায়? যা হোক, গিন্নী এ খেলাটা খেলে ভালই, এ বেশ ভালই হইল!”

সে দিন ঘরের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়েরই ~~আপস~~ বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কাহাকেও অবশ্য

খাফিতে আমন্ত্রণ করিল না, কিন্তু বাড়ীর এই আকস্মিক বিপদে যাইবার কথাই বা কহিবে কে? তবে খানিকটা বেলা বাড়িলে এবং স্বর্ণলতা অনেকখানি সুস্থ হইয়াছেন বিশ্বাসে নিজের চিন্তায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুভেন্দু সবিম্বয়ে ব্যাপারটা ধারণা করিতে গিয়া মনে মনে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। ট্রেনের সময় চলিয়া গিয়াছে মনে পড়িতেই ট্রেন ফেলের কারণটা মনে পড়িল, মায়ের প্রতি মনটা বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল। যা কি অজ্ঞান হইবার আর দিন বা সময় পান নাই? এই ত এই সময় তাহারা চলিয়া গেলে পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও চলিত! সুশীল তখনও স্বর্ণলতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, নীলিমা নিতান্ত হতভম্বভাবে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া আছে। মায়ের অর্দ্ধমুদিত চকুর, শিরাসঙ্কুল পাণ্ডু-মুখের ভাবহীনতা ও অতি মৃদু খাসমাঝে জীবিত-চিরুজ্ঞানীর্ণ দেহ তাহার ভয়ানক মনকে যেন নিরাশ্বাসের শেষ সীমার পৌছিয়া দিতেছিল। প্রাণপণে চোখের জলকে সে ঠেলিয়া রাখিলেও সমস্ত বুক জুড়িয়া তাহার একটা প্রবল ক্রন্দনের রোল উঠিয়া তাহার মনটাকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। তা’র অন্তরের সেই অব্যক্ত আর্তনাদ কেবলই বলিতেছিল, “মা আমার উঠিবেন না।” যে মানুষ জীবনে কখনও এক মুহূর্তও শোর নাই, তাহার এই যে নিশ্চিত শয়ন, এ যে তাহার শেষ শোওয়া,—সে খবর তাহার জানিবার বাকি ছিল না। তাই বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

শুভেন্দু আসিয়া বিরক্তিবিরস মুখে ডাকিল, “নীলি! শুনে যা।”

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমাকে উঠিতে হইল।

শুভেন্দু নীরসস্বরে কহিল, “আমাদের আজকে গতিটা কি রকম হবে? ট্রেন তো ওদিকে ফেল হয়ে গেল, আবার তো চব্বিশটি ঘণ্টা এই গারদঘরে বাস করতে হবে, একটু চা-টা কি দেবে, না আজও বুদ্ধাপুষ্ঠ প্রদর্শনেই সারবে?”

নীলিমা ভাইয়ের কথার ব্যথার উপর বেদনা বোধ করিলেও নীরবে সেটুকু সহিয়া লইয়া তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, “জোগাড় ক’রে দিচ্ছি, তুমি মা’র কাছে একটু বসবে?”

শুভেন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, “কি করবো ব’সে? আমাদের ডাক্তার সাহেব তো খুব লেগে পড়েছেন

দেখতে পাচ্ছি। আমি বাপু ও সন্ধ্যার মধ্যে নেই। জানিওনে কিছু, আর পারিওনে। আচ্ছা, এখন চল দেখি, চা আর কাল রাতের সেই ডিমের কালিয়ার ডিম যদি কিছু বাকি পড়ে থাকে ত তাই দুটো হাফবয়েল করে দে, দুজনে কোনগতিকে ব্রেকফাস্টটা সেয়ে নিই।”

নীলিমার বিষাদবিষয় মুখ ফণেকের ঘণার বিরোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, তার পর সে ভাব দমন করিয়া লইয়া সে সনিধাসে এই কথাই মনে মনে ভাবিল যে, মা-বাবার কাছে থেকে ওই বা কি মেহ-যত্ন কবে পেয়েছে, যাতে ক’রে ওদের ‘পরে ওর শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মায়? আমি ত বুঝি মা’র কি দুর্দশা, তবু সকল সময় আমারই মাথার ঠিক থাকে না। তা ত ও বেচারীও দুঃখী কম নয়। মেহ না জানতে পারলে কি আর শ্রদ্ধা আসে?

অনুকূলচন্দ্র তাড়াতাড়ি যেরে ঢুকিয়া জীবর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখে হাত চাপা দিলেন। কান্দো কান্দো গলায় কহিলেন, “গিন্নীর মনে কি শেষে এই ছিল! এমন ক’রে গুয়ে পড়লেন! আহা, সুনীলকে যে একটু যত্ন ‘আর্তি’ করবো, তারও আমার উপায়টি আর রইলো না। বাবা সুনীল! তুমি কিছু মনে করো না, বাবা! এ তো তোমারই নিজের দরদোর, তুমি নিজে দেখেওনে নিজে কষ্ট ক’রে দুটো দিন থেকে যাও, আমি অকূলে একটু কুল পাই। এ বিপদে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে!”

সুনীল প্রবল সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়া আগ্রহপ্রদীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, “কিছু ব্যস্ত হবেন না, জ্যোতামশাই! আমি জ্যোতাইমা না সারা অবধি যেতেই পারবো না, তা ছাড়া আমি বাবার কাছে হোমিওপ্যাথিক কিছু কিছু লিখেছি; আমার একটা কর্তব্যও তো আছে।”

“বটে, তুমি ডাক্তারী পড়েছো? তা হ’লে তো আর কথাই নেই। না হ’লে—এই একুনি মনে করছিলুম, যজ্ঞধর ডাক্তারকে একবারটি না হয় ডাকিয়েই আনাই। বলি, হঠাৎ এ রকমটাই বা হলো কেন? তা যখন তুমি ডাক্তার রয়েছ, তখন আর বাইরের পর ডাক্তার এসে বেশী কি করতে পারবে?”—

সুনীল উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ

কহিল, “আমিও আপনাকে বলাবল্য মনে করেছিলুম যে, একজন ডাক্তার দেখানই ভাল। আমি তো তেমন কিছুই জানিনে। বই দেখে পড়া বই তো নয়, চিকিৎসার আমি কি জানি, একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের দেখা খুবই দরকার। আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হ’তে পারব অবশ্য।”

অনুকূল বিষয়-প্রদীপ্ত মুখে দ্রুতস্বরে উত্তর করিলেন, “বিচক্ষণ ডাক্তার! তুমি কোন ডাক্তারকে কখন বিচক্ষণ হ’তে দেখেছ, সুনীল? ঐ যতক্ষণ শিক্ষানবীশ থাকে, ডাক্তার ততক্ষণই ভাল। পড়া ছেড়ে যেই প্র্যাক্টিসনার হলেন, ভিজিট করলেন, তাঁ’র মাথাটি খাওয়া হয়ে গেল! কিসে দুটোর যারগার চারটে ভিজিট করবেন, এই চিন্তাই তাঁ’র তখন একমাত্র জপমালা হয়ে বসল। রোগী মেয়ে কি পুরুষ, তাও তখন তাঁ’রা আর ভাল ক’রে দেখবার অবসর পান না। কতকগুলি জিনিষ কাঁচাতেই মিষ্টি থাকে, বাবা! ডাক্তার তাঁ’র মধ্যে একটি।”

সুনীল যদিও ডাক্তারজাতীয় জীবদিগের সকলকেই ঠিক এই প্রকার “ভামপায়ার” জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল না, তথাপি এক্ষেত্রে যে কারণেই হউক, তাহাকে শেষে ঐক্যমতাবলম্বন করিতে হইল। প্রতিবাদ বুঝা জানিয়া নীরব হইয়া রোগীর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, অসহায় ও আনারবদ্ধ জীববিশেষের মতই ভাবান্তরা মৌন চক্ষুতে স্বর্ণলতা তাহারই মুখের দিকে অনিমেবে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টির উদ্বেলিত মেহসিক্ত গুরুত্বই অমুভব করিয়া সুনীলের দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার প্রতিক্রিয়ার স্বর্ণলতার ছ’চোখের কোণ গড়াইয়া দুইটি অশ্রুর ধারা বহিয়া গেল। সুনীল এ আশা-নিরাশার মিশ্রণ অশ্রু-স্রাবের মূল্যসূচক না পাইলেও সে অশ্রু যে তাহারই এই সেবাটুকু হইতেই সজাত, এই বিশ্বাসে মনে মনে দৃঢ় হইয়া এই বিচার করিল, যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে সুস্থ না করিয়া সে এখান হইতে নড়িবে না। আহা, বেচারী বড় দুঃখী, আর তারও তো না নাই।



## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে অচলায় মতই দেখাইলেও যেমন ভূগোলশাস্ত্রে তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের জীবনশ্রোতকেও কখন কখনও রুদ্ধগতি বোধ হইলেও বাস্তবিকই কালচক্র কোন স্থানে এবং কোন দিনই যে গতিহারা হইয়া থাকে না, সহসা অতর্কিত সে তাহা একদা প্রমাণ করিয়া দেয়। স্বর্ণলতার দশমবর্ষীয় জীবন-নদী চল্লিশের পরেও ঠিক একই বিধিতে বহু হইয়া চলিয়া আসিলেও সে দিনের ভোরে সেই যে সহসা শ্রোতোহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে তাহার জীবন-নদীর মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরাতনে সে আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল না। সুশীল তাহার যথাসাধ্য, এমন কি, তাহারও চেয়ে অধিক করিয়াছিল। অর্থাৎ নিজে হালে পানি না পাইয়া গৃহস্থারীর অজ্ঞাতে যজ্ঞস্থল ডাক্তার, নন্দলাল কবিরাজ, এমন কি ঠিক দশমবর্ষী প্রতিবেশী সেই কেরামতুল্লার অনুরোধে হাকিম নসীরকেও ডাকিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়াছিল, কিন্তু সকল ফলই সমান হইল;—অর্থাৎ সবই অকলা হটয়া গেল। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন পথাবলম্বী তিন ব্যক্তির মধ্যে ঔষধ-নির্বাচনে যতই কেন না অনৈক্য ঘটুক, রোগনির্ণয়ে কিন্তু সকলেই একতাবল্বন করিয়াছিলেন। রোগ যে এপেন্ডোসিস, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর জীবনে আপততঃ ভয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ভরসাও কম। যে কোন উত্তেজনার প্রাপ্যবিয়োগ হইতে পারে। বাকশক্তি চিরদিনের মত একেবারে চলিয়া গিয়াছে, উহা আর ফিরিবে না।

যজ্ঞস্থর বাবু বলিলেন, “ইহার জীবনে যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিবে, তাহা যে কেহ অনুমান করিতে পারিত। তবে এ অবস্থার চেয়ে ইহার মৃত্যু ঘটিলেই হইত এবং শীঘ্রই তাহা ঘটাত কিছু অসম্ভব নহে।”

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সুশীল ভাবিল, বাস্তবিকই ডাক্তারীতে মানুষের মনকে কতকটা কঠোর করে! আহা বেচারী জ্যোঠাইমা! না, উহাকে ভাল করিতে হইবে। না হইলে নীলিমার কি হইবে?

সুশীল স্বর্ণলতার জীবন-যরণের মধ্যে যে নীলিমার

জন্মই বিশেষ করিয়া চিন্তিত হইল, তাহার কারণ এ কর দিনে সে কি দিনে কি রাত্রিতে সদাসর্বদাই নীলিমার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে। তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহাও সে এই সুযোগে অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে। এই মা ভিন্ন জগতে যে তাহার মুখ চাহিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহা বুঝিয়াই এক দুর্দশাপালিতা কিশোরীর প্রতি তাহার স্নেহ-সহানুভূতির অবধি ছিল না। তাহার স্বর্ণলতাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহার মুখ চাহিয়াই যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই যজ্ঞস্থর বাবুর মন্তব্যে তাহার মনটা বিশেষভাবেই বিমর্ষ হইয়া গেল। এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল, নীলিমা আড়ষ্ট কাঠের মতন দাঁড়াইয়া আছে। সে সবই ভুলিয়াছে বুঝিয়া সুশীলের মনে বড় হৃৎক হইল, কাছে আসিয়া স্নেহশীতল কর্ণে সে কহিল, “ও সব বাজে কথা মন ধারাপ করো না; আমি বলছি, জ্যোঠাইমা ভাল হবেন!”

দৈববাণীর মতই এই দৃঢ় উচ্চারিত আশ্বাসবাণী কমটি নীলিমার ভয়জন্য হৃৎখবিসারিত মনের উপর শীতল জলের ধারার মতই নিপতিত হইয়া তাহাকে যেন এক মুহূর্ত জুড়াইয়া দিল এবং পঙ্কীরতম কৃতজ্ঞতার ভরিয়া উঠিয়া সে আশ্বহারাৎ সেই একমাত্র আশ্বাসদাতার হৃদ পায়ের উপর অকস্মাৎ আর্দ্রভাবে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুশীল এই আকস্মিক বক্তাপ্রাবনের জন্ত আন্দৌ প্রস্তুত ছিল না। সে নীলিমার এই কার্য্যে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কি করিয়া উহাকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিপর্য্যভাবে থাকিয়া উহাকে কাঁদিতে দিল। তাহার পর অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়া নতদেহে বাহু ধরিয়া নিজের অশ্রু-ধোত পদতল হইতে উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “স্থির হও, নীলিমা! অত কাতর হ’লে ত চলবে না, আমাদের ধৈর্য্যের উপরই যে জ্যোঠাইমার জীবন নির্ভর করছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?”

নীলিমা সেই আকর্ষণে সর্বশরীরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসাধ্য ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে করিতে অশ্রু ও অস্থির কর্ণে কহিল “মা, গেলে আমি যে এখানে একটি দিনও আর থাকতে পারবো

না! মা গেলে এক মুহূর্তও আ-  
ধাকতে পারবো না। আমার তখন কি হবে?”

সুশীলের বৃকের মধ্যে এই হতাশাকাতুর কণ্ঠের কাতর প্রশ্ন গভীর বলে আহত হইল, “তখন আমার কি হবে?” বাস্তবিক এ সংসারের যে বিধিবাবস্থা সে এই কয় দিনেই জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মাতৃ-হীনা বালিকার পক্ষে এখানে পড়িয়া থাকা একান্তই আত্মাহুতি দেওয়া—ইহা সে ভালরূপেই বুঝে। এই ত্রিদিব অকাতরে রোগীর সেবার সহিত সমস্ত সংসারের সমুদয় কার্যসাধন করিয়াও তাহাকে পিতার মুখের কণ্ঠের কুৎসিত ভৎসনা ব্যতীত আর কিছু শুনিতে সুশীল ত এক দিনও শুনে নাই। মমতামণ্ডিত মেহভরে সে অকস্মাৎ নিজের কৌটার কাপড়ে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছাইয়া দিয়া উৎসাহদীপ্ত প্রফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, “ভয় কি নীল! আমরা ছুঁজনে মিলে জেঠাইনাকে বাঁচিয়ে তুলবো! না বাঁচার কথা মনে করবো কেন? চেষ্টা করিলে কি না হয়?”

নীলিমার মধ্যে ভয়ের তাড়না কোথায় সরিয়া গেল, আর তাহার স্থানে এ কি প্রবল হইয়া উঠিল—বুকভরা লজ্জা। এই স্পর্শ, এই কণ্ঠ, এই আদরের “নীল” ডাক—একি নীলিমা আজ সুশীলের কাছে লাভ করিয়া বসিল? এ যে তাহার গোপন বাসনারও অতীত! এ যে তাহার ঘুমন্ত স্বপ্নেরও অগোচর! এই তরুণ হাতের কোমল স্পর্শের অনুভূতি তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে আবির্ভূত হইয়া রিল; তাহার কান্না-ধোয়া চোখের পাতা ইহারই আবেশে বিহবল হইয়া সহসা নামিয়া পড়িল। তাহার সুখশিখিল ধরকম্পিত দেহলতা এই আত্যন্তরিক সুখোচ্ছ্বাসে যেন এলাইয়া শিথিল হইয়া আসিল। কণ্ঠে তাহার ভাষা হারাইয়া গেল, বৃকের মধ্যে প্রবল কুধিরোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া রহিল।

তাহাকে নিরন্তর দেখিয়া সুশীল আরও কিছু বলিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্থব্ব হইয়া গেল। সে মুখের উপর এমন একটি সুখের উচ্ছ্বাস ও আবেগের তরঙ্গ অন্তর্কিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞাতেই হিল্লোলিত হইতেছিল যে, যত বড় আনাড়ীই হোক, উহার অবির্তাব যে কাহারও চোখে না পড়িয়া যায় না। সুশীল সবিস্ময়ে নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, তাহার মনে এই মুহূর্তে মা হারাইবার ভয়ের ভাবনা একেবারেই জাগ্রত নাই। কিন্তু এমন অকস্মাৎ সেটা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেল,

সেইটুকুতেই তাহাকে যেন কাপরে কেলিল। সে আরও কতকগুলি ভাল ভাল স্মৃতির কথা শুনাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ঐ হর্ষমধুর স্মৃতিগুলির অধরোষ্ঠ, অর্ধমুগ্ধ স্মিত দৃষ্টি ও আরকোজ্জ্বল গণ্ড এই শোকসংবাদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কিন্তু না বুঝিলেও সুশীলেরও তরুণ কণ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ইহারই অনুকরণে লজ্জার রক্তিম ক্ষত ফুটিয়া উঠিল। নীলিমা তার কি ব্যবহারে লজ্জা পাইল? বিনতার ব্যবহার কি ইহার সহিত করা নহে? কেন নয়? না, হয় ত তাহার ভুল, নীলিমা ইহাতে নিশ্চয়ই কিছু মনে করে নাই।

সুশীল স্বর্ণলতাকে ঔষধ খাওয়াইবার মুখ কিরাইতেই তাহার ঠিক সাম্নাসাম্নি হইয়া গেল অমুকুলের সহিত। অমুকুলের কুঞ্চিত শীর্ণ মুখে একটা বিজয়দৃপ্ত হিংস্র হাসি।

শুভেন্দু দুই দিন মা’র রোগ আরোগ্যের অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, মা’র আর ভাল হইবার মত গতিক নহে এবং ডাক্তারের মুখে শুনিল, যে, এ রোগ আর আরোগ্য হইবে না, তখন সে ভোরের ট্রেন ধরির কলিকাতা যাত্রা করিল। পড়াশুনার এত বাধাব্যঞ্জমান তাহার সমস্ত বোধ হইল না। সুশীলও অবশ্য বাইবার অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সেই নিমজ্জন প্রত্যাখ্যান করিল এবং অমুকুলও সনির্বাক তাহাকে থাকিবার জন্তই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীলিমা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সুশীলের মুখে “না, আমি এখন বাব না” এই কথাটি শুনিতে পাইয়াই তাহার জুপিঙটা বৃকের মধ্যে উল্লাসে লাকাইয়া দোল খাইল।

সুশীল যাইবে না। ধনিসন্তান চিরসুখে পালিত সুশীল দরিদ্রের দৈন্তের অংশ গ্রহণপূর্বক শুধু তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়াই তাহাদের সাহায্যার্থ রহিল, আর শুভেন্দু তার মা’র শেষটুকুর জন্তও অপেক্ষা করিতে পারিল না। অস্তরের দুই তারে এই হর্ষ-বিষাদের দুই বিভিন্ন সুর ধনিয়া উঠিতে থাকিলেও নীলিমার বক্ষে যে আনন্দের স্রটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিল না। সে মনে মনে বলিল, “তোমার এত দয়া না হ’লে কি আমার মন এমন ক’রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো। উঃ! কি ভাল ভূমি! কত মহৎ!”

অপরূহ সুশীল ও নীলিমা রোগীর দুই পাশে দুই



জন বসিয়া ছিল। রোগী যুগ্মপূর্ব নিজামুদ্দীন  
পড়িয়া আছেন। অমূল্য যুগ্ম চুবিলেন। তাঁহার  
হাতে এক কোটা চা এবং একটা বড় মোড়কে বাঁধা  
কয়েকটা জিনিষ-পত্র। ছেঁড়া ছাতাটা এক স্থানে ঠেস  
দিয়া রাখিয়া তিনি নীলিমা ক বলিলেন, “এই চা  
নে; যা দেখি খুব ভাল করে এক কাপ চা তৈরী  
ক’রে সুশীলকে দে’, দেখি। আহা, দিনরাত খেটে  
বাছার মুখটি শুকিয়ে গেছে!”

নীলিমা কিছু বিস্মিত, কিছু গ্রীতভাবে বাপের  
হাত হইতে মোড়কগুলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে আজ্ঞা  
পালন করিতে গেল। তাহার মূল্যে সংগৃহীত চা  
চিনি সবই আজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই ভাবিয়া  
তাঁহার মনে সুশীল থাকার আনন্দটাও যেন অজস্র  
হইয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন কত দুঃখই যে সে  
এ দুই জনের চা, জলখাবার ও লুচির ময়দা খি  
যোগাইয়াছে, তাহা সেই জানে। তাহার আর তো  
কোনই সম্বল নাই।

কাঠ-কুটার উনান ধরাইয়া সেই আগুনে একটা  
ঘটিতে জল ঢেইয়া নীলিমা পাথরবাটিতে চা  
ভিজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, চটিজুতার শব্দে বৃকের  
সঙ্গে হাত কাঁপিয়া পাথরবাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া  
গেল। বরে ঢুকিয়া এই কাণ্ডটা চোখে পড়িতেই সুশীল  
হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—“বাঃ, বাঃ, বাঃ,—খুব  
কাজের লোক তো দেখছি। এ দিকে জ্যেষ্ঠামহাশয়ই  
আমায় তড়া দিয়ে দিয়ে তুলে দিলেন যে, চা নাকি  
প’রে প’ড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি, চা  
জুড়িয়ে পাথরবাটি হয়ে গেছে। উঃ, কি ভাশ্চর্য্য।  
তুমি ম্যাজিক করতে জান, নীল?”

নীলিমা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাটি লুকাইয়া ফেলিয়া  
পাছান্তরে চা ভিজাইতে দিল ও কোন মতে বৃকের  
দ্রুত তাল সংহত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “বন্ধন,  
এখনই আমি চা তৈরী ক’রে দিচ্ছি।”

সুশীল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “বাঃ, ‘বন্ধন’ বলে  
যে বড়? তা হ’লে তো বসাই হবে না, দেখছি।  
ভদ্রলোকরা কি আর রান্নাবরে বসতে পারে? আমি  
তো বাইরের লোক, বৈঠকখানায় বসি গে’ যাই।”

নীলিমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নত চোখে  
চা ঢালিতে ঢালিতে ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, “তা  
হ’লে কি বলবো?”

সুশীল পুনশ্চ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, “বাঃ,

যাই বলবার মত নেই? কেন,  
‘বন্ধন’ বলো, রো না কি? চিরদিনই আমি বৃষ্টি  
তোমার কাছে বাইরের লোক হয়েই থাকবো?  
আমায় অত পর পর মনে কর কেন বল তো? কৈ,  
আমি তো করি না? করি কি? হাঁ, নীল! সত্যি  
ক’রে বলো? আমি কি কিছুতেই তোমাদের পরের  
মতন করেছি? ও কি করছো? বাটিতে আর  
ধরছে না, তবু ঢালতে হবে? কেন, ওটা আর একটা  
বাটিতে ঢেলে নেওয়া কি যায় না?”

নীলিমা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া সরলভাবে  
কহিল, “আচ্ছা, তাই দিচ্ছি, না হয় আপনি ওটা  
আগে খান, তার পর ঐতেই বাকিটা আবার ঢেলে  
দেবো।”

সুশীল গরম চায়ে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করিয়া ত্বরিতস্বরে  
বলিয়া উঠিল, “বাঃ, আবার সেই ‘খান’ ‘খান’ বলে  
কিছু আর একটুও খাবো না, তা’ এই ব’লে দিচ্ছি  
দেখে নিও। বল ‘খাও’, না হ’লে এই রইলো  
তোমার চা, আমি জ্যেষ্ঠামহাশয়ের কাছে চল্লিশ ফিরে।”

নীলিমা লজ্জায় ও আনন্দে বিকশিত হইয়া  
উঠিয়া স্মিতমুখে মুহু মুহু কহিল, “আচ্ছা, আর বলবো  
না। খাও,—হয়েছে ত? খান, আপনি ভারী জুটুন।”

সুশীল কৌতুকে করতালি দিয়া উচ্চহাস্ত করিয়া  
উঠিল, “খান খান—আপনিও বড় কম জুটুন নন।  
এবার থেকে এই শান্তি। ও কি! আমায় আবার  
দিচ্ছেন যে, ওটা তো আমি চাই নি, ওটা তুমি খাবে,  
না আপনি খাবেন,—তোমার অভ্যাস নাই? না-ই  
থাকলো? রাত জাগা তো আর এর আগে কখন  
অভ্যাস ছিল না? লক্ষীটি! সত্যি তুমি খেয়ে  
ফেল। তোমার খাওয়া বড় কম হয়। আমি  
দেখেছি, কাল রাত্তিরে তুমি কিছু খাওনি, অথচ  
আজ সেই দুপুরবেলা একেবারে খেলে। রাত্তিরে  
আবার কি করবে, সে তুমিই জানো।”

নীলিমার চোখে জল আর চাপা থাকে না।  
এমনই হইয়া উঠিল। এত করিয়া তাহার মত তুচ্ছক  
যত্ন করা! তাহার কার্যকলাপ এমন করিয়া উল্টিয়া  
দেখা, এও কি কখন সম্ভব? এই স্মৃদর্শন, তরুণ,  
শিক্ষিত ধনি-সন্তানের পক্ষেও সম্ভব? সহসা  
নীলিমার মনে হইল, এও তো হিন্দুর ঘরেই জন্মি-  
য়াছে! মা-বাপ তো এরও হিন্দু! তবে এর মধ্যেই  
বা এমন উদারতা কোথা হইতে আসিল।

নীলিমাকে নিরুত্তর ■ চিন্তিত দেখিয়া সুশীল উড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চা-পাণের বাকি চা-টা একটা মার্জিত পাত্রে ঢালিয়া লইয়া মূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, “লক্ষ্মীটি! খেয়ে ফেল, না খেয়ে খেয়ে এত খাটলে তুমি মারা পড়বে যে! না, নীল! তা করলে হবে না, সে আমি শুনবো না। আমার কথা শোনো, খেয়ে ফেল।”

নীলিমার বক্ষ-শোণিত যেন কল-কল্লোলে সমুদ্রের তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সর্বশরীরে যেন সহস্র তড়িৎশিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। হাত বাড়াইয়া সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিতেই তাহার মনে হইল, ইন্দ্রদেবতার হস্ত-পরিবেশিত স্বর্গীয় সুধাপাত্র সে যেন নিঃশেষ করিল। তাহার দেহ প্রাণ মন আত্মা সকলই যেন সেই সুধামারে প্রাণিত হইয়া সুধাপ্রোতে তলাইয়া সুধামাখা হইয়া গেল। তাহা চিরদিনের দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচার-অবিচার সমুদয় যেন আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত পুলকের আলোকের মহা-সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যের আসনে অধিষ্ঠিতা করিয়া দিয়া গেল। তাহার পৃথিবী আর ধূলার ধরণী রহিল না, তাহার জীবনকে আর জীবন-সংগ্রাম মনে হইল না, তাহার অপরিতৃপ্ত বাসনারূপ কুমারী জীবনকে সুপরিতৃপ্ত কল্যাণপূর্ণ মহীয়সী মহিলার বরণ্য জীবন বলিয়া সে আনন্দাপ্লুত গর্ভাশ্রুত্ব করিল।

সুশীল কিন্তু অত কথার কোন ধারই ধারিল না। সে নিজের ভাবে ভোর রহিয়াই হাতদীপ্ত উৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিল, “দেখ দেখি কেমন হলো! যাই বল বাপু, চাটি শুধু নিজে খেয়ে কিন্তু সুখ হয় না, বেশ দুই তিন জনে ব’সে ব’সে গলে সলে ‘সিপ’ ক’রে ক’রে খাওয়া যাবে, তবে না। হ্যাঁ, একটা কথা, জ্যোঠাইমা আজ বেশ ভাল আছেন। কেমন ক’রে জানলুম? বাঃ, আমি ডাক্তারী পড়ছি না? তা ছাড়া আরও শোনো, তুমি চ’লে এলে একটু পরেই জ্যোঠাইমা যখন আমার চা খেতে আসতে বলেন, জ্যোঠাইমা তখন যে কি ভয়ানক চমকে উঠেছিলেন! একেবারে হুঁ চোখ ঠিকরে চেয়ে আমার যেন মিনতি ক’রে কি বলেন! অবশ্য কি বলতে চান, সেটা ঠিক বোঝা গেল না; আমার তো মনে হলো, যেন না যাই বলছেন,—কিন্তু

৫ম (খ)—১০

জ্যোঠাইমা ঠিক তেমনই বলছেন। বা হোক, এই বুঝতে পারাগুলোও তুমি পরই লক্ষণ বলতে হবে?”

নীলিমা এই বর্ণনা শুনিয়া কিন্তু মনে মনে বিশেষ-ভাবেই উৎকণ্ঠা-চকস হইয়া উঠিল। তাহার বাপের এই আকস্মিক সুকহস্ততা—সুশীলকে ঠেলিয়া চা পান করিতে পাঠান এবং সেই সঙ্গে সেই সংবাদে তাহার মায়ের অর্দ্ধমুর্চ্ছিত চিত্তে আকস্মিক উদ্বেগের সঞ্চার! এ সকলই কি কোন অর্থহীন প্রতিপূর্ণ বড়বড়? অথবা—আর কিছু না ভাবিয়াই সে ত্বরিতপদে উঠিয়া বলিল, “মার কাছে যাই। এতক্ষণ—”

বলিতে বলিতেই তাহার নজর পড়িয়া গেল নের প্রান্তে প্রস্থানোত্ত পিতৃমূর্ত্তির উপরে। ও অপমানে তাহার মুখ কালো হইয়া গেল। তাহা অন্ধরে তখনই একটা স্মরণ সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু বাপের উপর বিদ্রিষ্ট বিরাগে ইন্দ্র চড়াইতে গিয়া সে অকস্মাৎ সবিম্বরে দেখিল যে, কোথা দিয়া সেই পূর্বতপ্রমাণ বিরক্তি ও অভিমানের বোঝা গলিয়া পড়িয়া সেখানে একটা কৃতজ্ঞতার ক্ষটিকনিখর প্রবাহিত হইতেছে। সুখাপ্লুত ■ বেপথুনানা হইয়া সে মনে মনে পিতৃচরণোদ্দেশে সেই বোধ হয় সর্ব প্রথমই আন্তরিক প্রণিপাত জানাইয়া অন্তর্যামীর কাছে আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল, “আমার কি এত বড় কপাল-জোর আছে, ঠাকুর? যদি স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও কোন আগ্রত দেবতা থাক, তবে আমি যেন শুক পাই। আমার বাবার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, তিনি বা চাইছেন, তা আমি বুঝেছি! কিন্তু আমার কি সেই ভাগ্য!”

### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম সূর্য্যোদয়তপ্ত ধরণীবক্ষে সে দিন প্রথম বারিপাত হইয়াছিল। তাহাতে ধরণীর ধূলিধূসরিত মলিন ■ মার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধূলি-মলিন আকাশের স্নানিয়া অপসৃত হইয়া সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জল নীলিমায় দিগন্তের সমুদয়টুকুই নয়নরঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের স্তমিলতা এত দিন পরে স্থলতর ধূলিজাল ভেদ করিয়া আজই প্রথম লোকলোচনে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর পাইয়াছে।



পত্র পাঠান্তে এক দিকে বাড়ীর জন্ত, দ্বিতির জন্ত, পিতার জন্ত উদ্বেগ এবং অপর দিকে স্বর্ণলতার এবং

নীলিমার উৎকর্ষা, দুই দিক্ হইতে দুইটা তরঙ্গ আসিয়া যেন স্ত্রীলের মনকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর যেন একটা অশান্তির মেঘ আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অনুকূলের কাছে পত্রের উল্লেখ করিবামাত্র তিনি যেন একেবারেই আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, “সে কি কখন হয়? গিন্নীর এ রকম অবস্থা, মেয়েটা কোন্ দিকে কি করবে? আরও কিছুদিন থেকে যাও।”

থাকিবার উপায় নাই শুনিয়া তিনি তখন যেন একটু বিশেষ চিন্তিত ভাবেই কহিলেন, “তা হ’লে আগামী কালকেই একটু হলুদ দিয়ে আগামী পরশ দিনেই,—কি কালই না হয় শুভকার্যটা সম্পন্ন ক’রেই দিই?”

সুশীল বিষয়ে নির্বাক হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার বাক্যের অর্থ বোধ করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া অনুকূল পুনশ্চ সুস্পষ্ট স্বরেই কহিলেন, “নীলিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই আমরা তো তোমার বাপের কাছে পাঠাতে হ’বে! তার পর এই আশ্বিনা স্ত্রী নিয়ে আমার যা দশা হয়, তা না হয় হোক, সে আমি বুঝবো—কিন্তু বিয়ের দেয়ী তো তা ব’লে আর কোনমতেই করা চলে না।”

সুশীল তখন কোনমতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া সান্ত্বন্য কহিয়া উঠিল, “বিয়ের কথা আপনি কি বলছেন? কাল পরশু বিয়ে আপনি দেবেন বলছেন, এর মানে কি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে!”

অনুকূল শান্ত ও সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, “নীলিকে তুমি যে পছন্দ করেছ, তা আমি জানি; সেও তোমার জন্তে যে ছটফটিয়ে বরছে, তাও আমার সব জানা আছে। বিয়ে তোমাদের তো দিতেই হবে।—তা’ ছাড়া আর এর উপায় কি?”

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সুশীল যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। কণকাল সে নির্বাক বিষয়ে বাক্যহারা হইয়া থাকিবার পর, সেই অশেষ বিষয়ের তরঙ্গ তাহার বক্ষে ঈষৎ সংহত হইয়া আসিয়া কণ্ঠ-মধ্য হইতে একটা শিথিল শ্লিষ্ট ধ্বনি উথিত হইয়া আসিল—“তা হ’লে আমার বাবার মত আপনি জিজ্ঞাসা ক’রে তাঁরই সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কো’ন।”

অনুকূল একটি ডাবা হাঁকায় ভামাকু টানিতে-ছিলেন। একরাশি ধোঁয়া মুখে জন্মিয়াছিল, সেগুলোকে বাহির হইতে দিয়া তাহার পর কহিলেন, “ওহে! তা’ কি আর আরি না করেছি? তিনি কোন্ জমীদারের মেয়েকে নাকি কবে বাগ্দত্ত হয়েছেন, তাই আর গরীবের মেয়েকে বউ করতে রাজী ন’ন।”

সুশীলের সহসা যেন একটা ঘুসের ঘোরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। চটকাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সে এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন বর্তমানের বাহিরে দূর অতীত দিনের মধ্যে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে তাহার মনের সিংহাসনে অতি উজ্জল ভাস্বর মূর্তিতে আলোকময়ী বালিকা-প্রতিমার সমুজ্জল মূর্তিখানি তেমনই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—সে দেখিতে পাইল। সেই চাবুক খাওয়ার দিনের কথা মনে পড়িল,—তাহার পর আরও কত দিন দুই জনের চাক্ষুষ হইয়াছে। দেশের বাড়ীর নিমন্ত্রণে, কলিকাতার চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, একজিবিসনে, বায়স্কোপে, তাহাদের কলিকাতার বাসায় নিমন্ত্রিতা সুলেখা তাহার মা-বাপের সঙ্গে কতবারই যে আনাগোনা করিয়াছে। সে সব কি ভুলিবার? ভুবন বাবুর সেই প্রাণভরা ‘মা! মা!’ ডাক। সে যে তিনি কতই প্রাণের মধ্য দিয়া ডাকেন, সুশীল অপ্রবীণ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সুলেখার মুখের সেই স্নোহিত রক্তোচ্ছ্বাস, সেই সলজ্জ মন্দ হাস্য, সেও যে চির-অবিস্মৃত স্মৃতির মতই বুকের মধ্যে আলো হইয়া আছে। নীলিমার সঙ্গে থাকিয়া কয় দিন সে তাহার কথা ভাবিবার অবসর না পাইলেও তাহার সে ভাস্বর ছবি এতটুকুও তো য়ান হয় নাই! বিশেষ তাহার পিতার মনোনীতা বাগ্দত্তা সে। মনে মনে নীলিমার সুশীলের একটা বাধা বোধ হইল; —দিন এ ভাবে সে একটি মুহূর্তের জন্তও তাহার কথা ভাবিয়া দেখে নাই। কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িয়াছে, তখন তাহার বারেকের জন্ত মনে হইয়া গেল, তা হইলে কিন্তু মন্দ হইত না! চিরজুঃখিনী নীলিমা হয় তো ইহাতে সুখী হইত। প্রকাশ্তে কুণ্ঠিত মুহূর্তব্যক্যে সে কহিল, “বাবা যখন অমত করেছেন, তখন আর আমার তো কোনই হাত নেই কোঠা-মশাই।”



অমরুপীর তামাকুবর্ণে অমরুজিত ওষ্ঠাধরে একটা তীক্ষ্ণ হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্বের সেই শাস্ত্রসংঘত ভাব পরিত্যাগপূর্বক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, “তোমার বাবা না হয় অমৃত করতে পারেন, কিন্তু তুমি কেমন ক’রে পারবে? ভদ্রসন্তান হয়ে একটা ভাল লোকের মেয়ের মাথা খেয়ে তাঁকে পরিত্যাগ ক’রে যাবে, এ কি কখন ধর্ম্মে সহাবে? না এ জ্বালের রাজ্যে আমরাই তা সহ ক’রে নিতে পারবো?”

সুশীলের সর্কশরীরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন জলন্ত তরল ধাতুর প্রবাহ বহিয়া গেল, কর্ণে তাহার যেন কোথা হইতে কে একসঙ্গে সহস্র কামান দাগিয়া দিল। সে ভগবান্ ব্যাকুল কণ্ঠে আর্তনাদের মত অক্ষুট চীৎকার করিয়া উঠিল “এ কি বলছেন! আমার? আমি?—আমি—আমাকে, এ সব কথা আপনি কি আমার বলছেন?”

এই বারংবার “আমি” ও “আমার” শব্দ দিয়া কি ঘোর বিষয়, কি নিরুতিশয় অভিমান, কি তীব্র উগ্র ব্যক্তি ভৎসনা ও অকথ্য ভীতি সে প্রকাশ করিতে গেল, তাহা বুঝাইবার নহে। সমস্ত প্রকৃতি যেন সেই অকথ্য অভিযোগের অপরিণীত লজ্জার মুহূর্ত্তান ও বিষমাতঙ্কে সুশীলেরই সহিত সমানভাবে বজ্র-তন্ত্রিত হইয়া রহিল। সুশীলের বকের মধ্যে রুদ্ধ শ্বাস যেন জগতের সমুদয় বায়ুস্তরকেই সেই মুহূর্ত্তে চিরকদ্ধ অমৃতভব করিয়া মহাতারে তরু হইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের রাশি রাশি লজ্জায় তাহার সমুখের সমুজ্জল ও ধর সূর্য্যাকিরণ যেন একেবারে আচ্ছাদিত ও বসীবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন, মানুষ যে তাহা নিজের হাতেই দান করিয়াছে! তাহার পাষণ চিত্ত ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এবার উগ্র ও রুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্নেহের স্বরে অমরুপী উত্তর করিলেন—

হ্যাঁ তুমি! তুমি! তুমিই! তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়েকে কোলে জড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে তার গাল মুছাওনি? তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়ের সঙ্গে এক বাটির চায়ে দু’জনে মিলে একসঙ্গে ব’সে চুমুক দাও নি? তোমায় সে তার মা-বাপকে লুকিয়ে বাপের টাকা চুরি ক’রে মাঝরাতে গরম লুচি ভেজে চব্বাচোষা রোঁধে বেড়ে খাওয়ায় না? তোমার শোবার ঘরের খাট থেকে প’ড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙ্গে যায় কি? আমি সবের ‘আই

উইটনেস,’ আদালতে হলপ ক’রে সাক্ষী দেবো, আমার মেয়ে নিজের মুখে এ সব—আরও অনেক কথাই স্বীকার করবে। তখন তুমি করবে কি? আর তোমার বাপের মুখখানিই বা তখন কতটুকু হয়ে যাবে? সে কথাটা ভেবে দেখ, আমি অমনি ছাড়বো, তা মনেও ভেবো না।”

যদি সুশীলের ভাল করিয়া কিছু মনে করিবার অবস্থা থাকিত, তবে সে হয় ত ধরনীকেই শুধু বিধা হইবার সকাতে অমরুপী করিত। কিন্তু তাও তাহার নাকি ছিল না, তাই সে শুধু অতলজলে অর্দ্ধমগ্ন অভাগা ব্যক্তির মতই অর্দ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিল— “ভগবান্!”

অমরুপী প্লেবপূর্ণ কণ্ঠের কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে কহিয়া উঠিলেন, “কি করবে তোমার ভগবান্? তোমার হয়ে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে কি? কিন্তু আমি তা নিজে দেবো,—কেন না, এই চোখেই সব দেখেছি যে! আর আমার মেয়েও দেবে। মনে ক’রো না, সে তোমার দিক্ নেবে। সে তোমার পাবার জন্তে যে মরছে, সে কি আর আমি বুঝিনি মনে কর? তুমি চলে যেতে সে বুকে ব্যথা পায়, বুক পেতে দিতে চায় তাও বুঝি।—তার চেয়ে বিয়েটা ভালয় ভালয় ক’রে যাও। বাপ দু’দিন না হয় একটুখানি বিরক্তই হ’বে, তার পর একমাত্র ছেলে তুমি, বউও তার খুব কুৎসিত হবে না, সব ভুলে যাবে এখন।”

সুশীলের চক্ষুর অন্ধকার রাশি ও বকের অনিষসিত রুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ জমাট বাধিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে যেন একটা প্রলয়ঝড়িকার সৃষ্টি করিতেছিল। তাহার বকের শোণিততরঙ্গ তুফানের বেগে গভীর কলকল নাদ করিয়া উঠিতে লাগিল! অশ্রুর নিবীর ঠেলিয়া কোনমতে বাষ্পকদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল—“আমি নীলিমার সঙ্গে বিনতার চেয়ে ভিন্ন ভাবে কোন ব্যবহারই করি নি—” তাহার পর আর কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না। ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে তাহার আত্মমর্যাদা, অভিমান এবং মনের অবস্থা কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না। আর বলিবার মত তাহার ছিলই বা কি?

অমরুপীর চোখ দুইটা আভ্যন্তরিক উল্লাসে বাধের চোখের মতই উজ্জল দেখাইল। তিনি আবার বেশ সহজ হির কণ্ঠেই কথা কহিলেন, বলিলেন, “কোলে ক’রে চুমু খাওয়া অত বড় পরের মেয়েকে—তার পর

যে ডাক্তার নীলির হাতে 'বাড়' বেঁধেছিল, সে নীলিকে কোথায় দেখতে পেয়েছিল, সে কথাও তো বলতে বাধ্য? তা' এ সবগুলোকে আদালতে দাঁড়িয়ে কি বোনের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রমাণ করতে পারবে, সুশীল?"

সুশীল আতঙ্কে ভরা স্বর মুখে নিঃশব্দে বারেক তাহার আততায়ীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং দুই জামুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ সে লুকাইল। অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগকে সে আর কোনমতেই যেন ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এ কি অকথ্য কলঙ্কের ডালি নিরপরাধে তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল? ইহার বিপুল লজ্জা, নিদারুণ ভয় ও অপমান তাহার তরুণ কিশোর প্রাণে আর যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

সুশীলের কান্না আসিল। কিন্তু না, না, না। কীদিকে সে কাহার কাছে? পাষণ পাষণ পাষণ! একটা নির্মম রক্তলোলুপ রাক্ষসের মত, অথবা মনুষ্যচন্দ্রাবৃত প্রস্তরস্তূপের মত এই অমায়ুষের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সে ইহার পারে ধরিয়া কীদিকে? কখন না—কখন না, তাহার অপেক্ষা নীলিকে বিবাহ—সেও বরং সহস্রবার শ্রেয়।

ইহা ভাবিতে গিয়াও যুগ্ম সুশীলের সর্কশরীর মন যেন ওটাইয়া এতটুকু ছোটো হইয়া গেল। নীলিমার উপরও মনটা তাহার একেবারেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। এই পিশাচের মেয়ে, সেও কিছু কম পিশাচিনী নয়! তবে আগগোড়াই হয় তো তাহাকে লইয়া ইহার একটা মস্ত বড় যুগিত চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছে। নীলিমা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যবর্তিনী। সে নিশ্চয়ই সমস্ত জানে এবং স্বেচ্ছায় ইহার প্রধান ভূমিকা লইয়াছে। তাহার অহেতুক জড়িমা, অকস্মাৎ লালিমা, অনাবশ্যক লজ্জাভিনয় এ সকলেরই আজ এই মুহূর্ত্তে সুশীল যেন একটা মূল দেখিতে পাইল। এ সকলই অভিনয়োৎকর্ষ। তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার প্রচেষ্টা! সে যখন ভগিনীর মত ব্রহ্মভরে তাহার সহিত অসঙ্কোচে বেলামেশা করিয়াছে, এই পিশাচের দল তখন তাহার সেই সরল বিশ্বস্ততার এই এত বড় একটা নির্মম প্রতিদানকল্পনায় নিষ্ঠুর চক্র গঠন করিতেছিল। তবে কি স্বর্ণলতার রোগের মধ্যেও কোন হীন কৌশল, হের অভিনয়—

সুশীল নিজের চিন্তার আঘাতে নিজেরই আহত হইয়া মাথা তুলিল। সে নিজের মনকে পীড়ন করিয়া বলিল, 'না না, তুমি এত ছোট, এত নীচ হইয়া না! জ্যোঠাইমা বেচারী নিশ্চয়ই এর মধ্যে নাই'— তাহার সর্কশরীর শিহরিয়া তুলিয়া সহসা মনের মধ্যে সেই সে দিনের ব্যাকুল দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সেই যে দিন বড় আদরে গৃহস্থায়ী—এই জটিল বড়বয়ের সৃষ্টিকর্তা নিজে যাচিয়া ঠেলিয়া মেয়ের কাছে তাহাকে চা খাইতে পাঠাইতেছিলেন! সে দৃষ্টি যে একান্ত মিনতিভরা নিবেদনদৃষ্টি, সে দিনও এ সংশয় তাহার মনে জাগিয়াছিল। আজ তাহা নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। জ্যোঠাইমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা এ কোন আভাস তাঁহার অর্কচেতনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াই যেন তাহাকে সে দিন সাবধান করিয়া দিতে চাহিতেছিল। মূঢ় সে, মূঢ় সে; তখনও কেন সে কথা বুঝিতে পারিল না?

শিকারী যেমন মানন্দ আগ্রহে শিকারকরা পাখীর মৃত্যুযজ্ঞা নিরীক্ষণ করে, তেমনি করিয়াই প্রসন্ন মুখে অতুল আনন্দমুখ সুশীলের যজ্ঞার্থ যুক্তির প্রতি দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওষধ ঠিক ধরে গেছে!" প্রকান্তে মনের প্রকৃত-জাব দমনে রাখিয়া পরম গম্ভীর মুখে তিনি কহিয়া গেলেন,—"বেশ ক'রে ভেবে দেখ, সুশীল! কালই তোমার নীলিকে বিয়ে কর্তে হয়, না হয় কালই আমার ফৌজদারীতে তোমার নামে নালিশ দায়ের ক'রে দিতে হয়। এর আর তৃতীয় পছা নেই। ও মেয়ে আর কেউ গো বিয়ে করবে না! আর না কেনে করলেও তাতে পক্ষে অন্তর্পূর্ণা দোষ হ'বে। বিয়ে কর, সব ঢাকা পড়ে যাবে। বিয়ে না কর, খবরের কাগজে এই কেলেকারী ব্যাপারে নামটি উঠে যাবে। আমার তাতে কোনই লজ্জা নেই। আমরা গরীব মানুষ, বড়লোকের অত্যাচার আমাদের উপর কি রকম ভাবে পড়ে, সেটা দেশদর্শে দেখতে পেলে তা'তে আমাদেরই সমূহ লাভ। ধরো, তোমাদের চেষ্ঠায় আদালত জোর ক'রে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে যদি নাও দেয়, অন্ত কোন দেশতত্ত্ব ছেলে ওকে 'মর্যাদা কারেজ' দেখাবার জন্তে সেইখানে দাঁড়িয়েই হয় ত তখন বিয়ে ক'রে নেবে। কিন্তু তোমার তো অন্ততঃ পাঁচটি বছর যানি টানাটি বন্ধ করতে কার বাপেরও সাধ্য না। সেইটি তো



তোমার বাকী থাকবেই!—আচ্ছা, তুমি এখন বেশ ক'রে চিন্তা কর, আমিও ততক্ষণ সবাইকে খবরটা জানিয়ে আর পুরুতের, নাপিতের, চৌপার মালা আর আভ্যাদিক জিনিষের ব্যবস্থা পত্র ক'রে আসি। পরশু দিন তখন তোমাদের ট্রেনে চাপিয়ে তোমার বাপকে 'তার' ক'রে দিলেই হবে।—আর না হয় তো একেবারে গিয়ে দাঁড়ানই ভাল। ছেলে বউএর মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবেন এখন।”

এই বলিয়া বারেক সুশীলের যথাপূর্ণ করায়ত লুকাইত মুখের উদ্দেশে একটা তুরকটাক্ষ ফেপণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অমুকুল গ্রন্থান করিলেন। আর সুশীল তেমনই কর্তব্যবিমূঢ়, ব্যথাহত, আর্ত—সেই স্থানে ঠিক সেই একই অবস্থায় বসিয়া রহিল।

### ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ঐক, জরাগ্রস্ত, পুষ্পধরা, শীর্ণ শাখায় নব বসন্তের নবীনগমে নবপত্রমুকুলে যে নূতনতর শোভাসম্পদের সমাবেশ করে, কোকিলের কুহুতে, পাখিয়ার প্রিয়মু-সঙ্কানে, শ্রামাদোয়েল বুলবুলের আনন্দগীতির মধ্য দিয়া যে উৎসব-সমারোহ চলিতে থাকে, তরুণ জীবনে যখন নব বসন্তের সমাগম হয়, তখন সেখানেও ঠিক তাহারই অমুকরণ চলে। নীলিমার শীতশীর্ণ হৃদয়-কাননেও এই বসন্তাগম ঘটয়াছিল। তাহার অনাদৃত জীবন যৌবন এত দিন পরে সহসা আজ ফাঙ্কনসমাগম লাভ করিয়া সার্থক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরের সুপ্ত কামনারাশি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রেমের মুকুলকে মুগ্ধরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই বসন্তপুষ্পা-ভরণ জীবনোত্তান ভরিয়া আশারূপী কোকিলের পঞ্চম স্বর, কলনারূপিনী বাণীর বীণার স্বর, নব নব বাসনার পুলক-সঙ্গীতে পাখিয়ার দোয়েলের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছিল, আর শীতল-স্নিগ্ধ নির্ঝরধারার মত অপ্রতি-হতগতিলাভে ছুটিয়া চলিয়াছিল প্রেম! ইহার মধ্যে নীলিমা কতখানিই না তাহার মনের মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল! পিতার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া, সুশীলের নিকট অপৰ্যাপ্ত আদর-যত্ন লাভ করিয়া নিজেকে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরমে উন্নীত করিয়াছিল। তাই সকল কর্মের মধ্যে আজকাল তাহার আগ্রহ, আনন্দ ও উন্মাদ-নার অন্ত ছিল না। প্রভাতোদয় হইতে দিবসান্ত-কালাবধি তাহার যেমন হস্তপদের বিশ্রাম ছিল না,

মনের ভিতরেও তেমনই তরতর বেগে কল্পনা ও আন-ন্দের স্রোত সমান গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। এ বাড়ীর চিরনিয়মিত কদম্ব সে কোন দিনই সুশীলের পাতে পরিবেশন করিতে পারে নাই। অনেক রাত্রিতে ইচ্ছাবিলম্বে পিতার শয়নের পর গরম লুচি, বিবিধ ব্যঞ্জন সম্বন্ধে রন্ধন করিয়া সে কি পরিতৃপ্ত সুখেই যে তাহা সুশীলের সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিত, সে আনন্দ তাহার জানাইবার স্থান কোথায়? এই সকল সংগ্রহ কত দুঃখেই যে তাহাকে করিতে হয়, সুশীল যদি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত তো কখনই সে ইহার কণিকামাত্র গ্রহণ করিত না। কিন্তু সে যে তাহার এই গোপন দুঃখ জানে না, তাহার জন্যই সে শুধু নিজেকে যে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, এই-টুকুই যে তাহার সকল কষ্টের একমাত্র সাধনা, পরম পুরস্কার! সুশীল চিরসুখাত্মক, এ সংসারের সকল নিয়মের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই নাই; সে অগ্নেও জানে না, তাহাকে ঐটুকু আচ্ছন্দ্য দান করিতে নীলিমা কত বড় ত্যাগস্বীকার এই দিনের পর দিন ধরিয়া করিয়া চলিয়াছিল। তাই সে অবলীলাক্রমেই সেগুলি সহজভাবে গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু নীলিমার আত্মা পর্য্যন্ত যেন এই দানের মোহে ও ত্যাগের সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল।

কখন কখন বড় সঙ্কটে পড়িয়াই এক একবার সে এমনও ভাবিয়াছে যে, ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়াই উহাকে গিয়া বলি, আমার কিছু টাকা দাও তো, খরচের ■■■ কিছু হাতে নাই। আবার দারুণ লজ্জায় তাহার কোমরচিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মনে মনে নিখাস ফেলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে, সেদিন তাহার কত দিন পরে আসিবে, যে দিন ঐ কথাগুলি নিঃসঙ্কোচ অধি-কারে সে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? এমন কি, সুশীলের খোলা স্ট-কেশটা তাহার অসাক্ষাতে গুহাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার প্রত্যেক বস্তুটিকেই সে যেন নিতান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়া সম্বন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাহার জুতা দু'পাটি ধূলা ঝাড়িয়া কতদিন সেট ধূলা সে মাথায় মাখিয়া পুলককণ্টকিতশরীরে মানসনেত্রে ধ্যান করিয়াছে—সুশীলের সেই গৌর সুন্দর সুগঠিত সুকোমল পা দুখানি। সে দিন কবে আসিবে, যে দিন সেই দুইটি পা'কে সে সম্বন্ধে বুক তুলিয়া লইয়া সেবা করিতে পারিবে।

সে দিন অমুকুল বাড়ী ফিরিলে যে সকল ঘটনা

ঘটিয়াছিল, নীলিমা তাহার কোন সংবাদই জানিত না। সে রান্নাঘরে তখন বাটা ছানার সন্দেশ ও নিমকি প্রস্তুত করিতে একান্তমনে নিযুক্ত ছিল। কখনও এ সকল কার্য্যে সহযোগে না করিলেও প্রবল ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহায়তায় সে আজকাল অনেক বস্তুরই প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তৈয়ারি খাবার একখানি, পরিমার্জিত রেকাবে সাজাইয়া একবার তৃপ্তনেত্রে সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক একটা সুখের নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সে প্রফুল্ল মিত মুখে সুশীলের সন্ধানে চলিল।

বেলা তখন অবসানের পথে চলিয়া পড়িয়াছে। সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বস্ত্রাধারিত্রী স্নাত হইতেছিলেন, আকাশের অঙ্গেও সে আলোর লহরী ইন্দ্রভবন বা স্বপ্নলোক রচনা করিয়া দিতেছিল। দিকে দিকে কোকিলের আনন্দকুজন শ্রুত হইতেছে। জনবিরল বাড়ীটার কোথাও কোন সাড়া নাই। নীলিমা নিজ অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া মুহূর্ত্ত গাহিয়া উঠিল—

“অন্তর মম বিকসিত কর, অন্তরতর হে!”

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনের দালানের একটুখানি মাত্র দূরে দেওয়ালের গায়ে পিঠ রাখিয়া কে এক জন রহিয়াছে! কে এক জন? না, কে এক জন হইবে কেন—সুশীলই ত হই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িয়া আছে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার সমস্ত ছাত প্রাচীর একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে সে যত না স্তম্ভিত হইত, এই অভূতপূর্ব দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া নীলিমার পুলকচঞ্চল চিত্ত তদপেক্ষাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেল। তাহার হাতোস্তাসিত মুখ মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইয়া উঠিল। কণকাল অবাক বহুদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর সে সন্দেহ-শিথিল স্নান চরণে ধীরে ধীরে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গেই তাহার বিকসিত হৃৎপদ্ম মুদিত হইয়া আসিয়া তাহার বোধ হইল, অকস্মাৎ যেন একটা প্রলয়ের অন্ধকার মাথা তুলিয়াছে।

অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াও যখন সে সুশীলের দিক হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাইল না, তখন কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বিনা বিচারেই এবার তাহার মনের মধ্যে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গেল। কিন্তু সেটা যে কি, কোথা হইতে ঘটিল, এ বহুস্ত তাহার

কাছে একান্ত জটিল ও অভেদ্য বোধ হইলেও, সে বিস্ময় চিত্তে ও শঙ্কিত মুখে শুধু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। সহসা সুশীল মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বারেকের জন্ত কঠোর কক্ষনেত্রে নীলিমার পানে চাহিয়া দেখিল। এই ঘণাতরা ত্রুদ দৃষ্টি একটি ক্ষণের মধ্যেই যেন তাহাদের হৃৎকনকার এই বাসেক কালের সকল ঘনিষ্ঠতা, সকল পরিচয়কেই আড়াল করিয়া দিয়া পাবাণ-প্রাচীরের মত উত্তত হইয়া উঠিয়া তাহাদের মাথামনে অর্দ্ধহস্তপরিমিত জমীটুকুকে চাপিয়া রহিল। তাহার অদৃশ্য অটল অভেদ্য দেহ নীলিমার গতি ও বাক্য একসঙ্গেই রোধ করিয়া দিল।

তুই জনের কেহই কোন কথা কহিল না। বহুকণাবধি সুশীল তাহার আরক্ত ও কঠিন দৃষ্টি বাহিরের শূন্যপথে সংকুস্ত রাখিয়া অবশেষে আর একবার তাহা অকারণ শুধু অজানা ভয়ে আড়ষ্ট নীলিমার মৌন নত মুখে স্থির করিয়া ধরিল। সার্চলাইট যেমন করিয়া নদীর তলদেশাবধি ভেদ করিতে চায়, তেমনি করিয়া তীক্ষ্ণ কক্ষ দৃষ্টি যেন এই পাবাণে পরিবর্তিতা মূর্ত্তিরূপিনী নারীর অন্তরদেশ পর্য্যন্ত উলটিয়া দেখিতে চাহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়া সে মুখ কিরাইয়া লইল ও তাহার মোহ-ঘণাপূর্ণ চিত্ত যেন-নূতন করিয়া আর একবার ইহার উপর গভীরতর ঘণার তরঙ্গে প্রাবিত হইয়া গেল। তাহার বাপের উপরকার সকল বিদ্বেষ, সকল বিরক্তি, সমস্ত ক্রোধই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া ইহারই উপরে নিপতিত হইল। সুশীলের জ্বালাতরা নিরতিশয় অপমানপীড়িত চিত্ত নীরব কোপে জলিয়া জলিয়া নিজের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই ঘণিত বড়বন্ধে নীলিমা নিঃসংশয়ই জড়িত আছে। উহার মুখে যে অপরাধের কালি মাখান। আর উহার ব্যবহার কি লজ্জাহীন ও কাপট্যপূর্ণ! এই অপরাধিনী বিশ্বাসহীনের অগম্য বাতাস, তাহার নিশ্বাসের মুহূর্ত্ত, তাহার শুধু স্থির পাবাণমূর্ত্তি অসহনীয় বোধ করিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার চোখের সামনে সারা বিশ্বটা ভূমিকম্পে জুলিয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, তাহার পদতলের অবলম্বন কোথায় সরিয়া টলিয়া পড়িয়া বাইতেছে।



## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কি হইল? কেন হইল? কিসের হইল? ইহার কিছুই যদি খুঁজিয়া না পাইয়াও কাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে কার্যের চাইতেও কারণটার জন্তই সে যেন সমধিক ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে।—কি করিলাম যে, আমার তুমি অমন করিয়া গেলে? এই প্রশ্নটাই নীলিমার মনে সব চেয়ে প্রবল স্বরে বাজিয়া উঠিতেছিল বলিয়াই সেই প্রশ্নটাকে বাহিরে পাঠান আজ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কিছু যে একটা ঘটনা আছে, সেটা যে সামান্য কিছুও নয়—বড় অসামান্য, বড় অসাধারণ কোন কিছু এবং সেটা যে নীলিমারই সর্বনাশের আয়োজন, সেই কথাটাই শুধু এই আকস্মিক ব্যাপারের, এই অমূল্যমূল্য গভীর রহস্যের তলদেশে হইতে সহজেই ভাঙ্গিয়া উঠিতেছিল। আর সবই ইহার প্রচ্ছন্ন। সেই আসন্ন সন্ধ্যার আলোছায়াভরা সন্ধিকণে নীলিমার শত উদ্দীপনাতরা সহস্র কল্পনালোকে সমুজ্জ্বল পরিপূর্ণ চিত্ত একেবারে অতলের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আঁর্ত উর্দ্ধশ্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, “আমার সব গেল! ওরে আমার সব গেল রে!”

যাহার থাকে, তাহারই যার। যাহার কিছু ছিল না, তাহার কোথা হইতে কি যাইবে? এই যে সাধারণ একটা হিসাব পড়িয়া আছে, কি আশ্চর্য্য, নীলিমার মন একবারের জন্তও তো সে দিক ঘেঁষিয়া গেল না! তাহার ছিল কি, তাহার গেল কি? তাহার কোন হিসাবই সে করিল না। শুধু তাহার বেদনা-তীব্র শরে বিদ্ধ প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে দারুণ জ্বালা সহিত অমূল্য করিতে লাগিল যে, তাহার সব গেল! সব গেল! সব গেল! সে যে কতখানি পাইয়া বসিয়াছিল, এই হারানোর সেটুকুও সমস্তই যেন ভাল করিয়াই অনুভব করিতে পারিল।

অপরূহ সারাহে ও সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল। জনবিরল পল্লী প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে পাদচারী পথিকের গমনাগমন পথচারী কুকুরের সতর্ক চীৎকারে অমূল্যচিত্ত হইতেছিল মাত্র। অদূরে আশ্রকাননে শৃগালের দল কোলাহল করিয়া উঠিতেই কুকুরগুলি তারতর ডাকিয়া উঠিয়া উহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। বাড়ী নিস্তর—ঘোর

নিস্তর ইহার কোথাও সাড়াশব্দ নাই, আলো নাই। ইহার মধ্যে জীবিত জীবের নিবাস করনা করাই কঠিন। নিবিড় অন্ধকারে সাবধানভ্রম পদক্ষেপ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। আর একটু হলেই আগন্তুক সেই একই স্থানে একই ভাবে অবস্থিত অসাড় অস্পন্দ নীলিমার ঘাড়ের উপরেই পড়িয়া যাইত। কিন্তু ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সে গতি রুদ্ধ করিয়া দিল এবং একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, “জেগে নীলি? জেগে আছিস? আচ্ছা, একটা আলো জেলে আন দেখি, চট্ ক’রে।”

কোন অন্ধকার-গুহাগহ্বরপ্রাপ্ত পলাতক মনটাকে টানিয়া আনিয়া নীলিমা যখন পিত্রাদেশ পালনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিজের উপর দিয়া এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বড় একটা বিপ্লব ঘটয়া গিয়াছে, তাহা সে তখনই যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল। কি দুর্ভাগ্য, কি অবসন্ন, কি অপরিণীত অবসাদগ্রস্তই তাহার সমস্ত শরীর-মন ইতোমধ্যে হইয়া পড়িয়াছে!

প্রদীপ হাতে ফিরিয়া আসিয়া সে বাহা দেখিল, তাহাতে হাতের প্রদীপ তো তাহার পড়িয়া গেলই, নিজেও যেন সে সেই সঙ্গে সঙ্গে পতনোন্মুখী হইল। হয় তো মুছিতই সে হইত, যদি না সেই মুহূর্তে বাপের কঠোর তৎসনার আঘাত তাহার অবসাদে অবসন্ন চিত্তকে ব্রিষ্টারপ্রয়োগের মতই চেতাইয়া তুলিত। অমূল্য মেয়ের কাছে একান্ত বিরক্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া চাপা তর্জনে গালি দিয়া উঠিলেন—

“দিন দিন কচি খুকী হচ্ছিস নাকি? ভাঙলি পিটীঘটে? বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চি ব’লে সেই আহ্লাদে কি মাথারও ঠিক নেই না কি? শীগ্গির যা, একটা লঠন জেলে নিয়ে এসে এই টোপর, চেলি, কলা, পান, হলুদ, বাতাসা সব ভাল ক’রে তুলে পেড়ে রেখে দে। আর খাবার দাবার যদি কিছু তোমার গুজীর পিটী থাকে তাই নিয়ে এস। কাল আবার উপোস ক’রে মরতে হবে তো তোমার চৌদপুরুষের পিটী চট্কাতে। যাও না, উমাসিনী রাজকন্তার মতন অবাক হয়ে দেখছো কি আমার মুণ্ড? টোপর কখন চোখে দেখ নি, না আমাকেই কখন চেনো না?”

নীলিমা এ আদেশও পালন করিল। কেমন করিয়া যে করিল, সে কথা সে নিজের বুঝিল না। কাপ্তেনের হুকুমে অকূল সমুদ্রের ভীষণ ঝটিকার সময়েও যে অভ্যাসে ভীত নাবিকরা হাল ছাড়ে না, সেনাপতির আদেশে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াও সৈন্যদল যে অভ্যাসে অগ্রসর হয়, শুধু সেই চিরাত্যস্ত বাধ্যতার ফলেই নীলিমাও নিজের শরীর-মনের সেই প্রবলকম্পন ও অচলতার মধ্য দিয়া এই সকল কার্য সমাধা করিয়া রামাঘরে গেল। রামা আজ কিছুই হয় নাই। সেই সূর্য্যোদয়ের সময়ে প্রস্তুত রেকাবে ভরা খাবারগুলি মাত্র অবশ্যে পড়িয়া আছে। নির্দিষ্টকালে তাহাই আনিয়া সে বাপের সামনে ধরিয়া দিল। তাহার মায়ের ঘরে দাঁড়াইয়া তখন তাহার বাপ হাত-মুখ নাড়িয়া তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইতেছিলেন। লণ্ঠনের আলোতে নীলিমা দেখিল, স্বর্ণলতার মুখের চেহারায় অকথ্য ভয়ের ও অস্বাভাবিক লজ্জার ছায়া দেদীপ্যমান। তিনি প্রহারভীত বাগকের মতই ভয়ানক চক্ষুতে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তখন নীলিমার মনে পড়িল, আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে এই যে তাহার বাঁচিয়া আছেন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না।

অনুকূল মেয়ের দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া আপন মনের উৎসাহেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“ছোড়াটা কি কম বজ্জাত! কিছুতেই রাজী করতে পারিলে না। শেষকালে বাঁচিলে ভয় দেখিয়ে তবে না তার মুখ-খানা বন্ধ করি। বলেছি, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে, তা হ'লে আপনাকে মিলে তার নামে কোজ-দারী করবো। সমস্ত পৃথিবী জানবে, ভুবন রায়ের ছেলে সূর্য্যোদয় কি অশ্রু চরিত্রের মন লোক। তখন কোথায় থাকবে তোমার পিতৃভক্তি আর কোথায় থাকবে বড়লোকের মেয়ে সুলেখা।—এখন কোন গতিকে কালকের দিনটায় দু'হাত এক করে চারটে মন্তর পড়িয়ে দিতে পারলেই সকল পাপের শাস্তি হয়ে যায়। আজই দিওম—তা যদি বে-আইনী হয়েছে ব'লে বিয়েটা ‘ক্যানসেল’ করিয়ে নেয়, সেই ভয়েই শুধু আমার ভরসা হলো না।”

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্ত হিমশিলায় জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার চলন্ত হৃৎপিণ্ড দম-ফুরানো ঘাড়ের মত সহসা থমকিয়া ধামিয়া পড়িল। তার চারি দিকের বায়ুস্তর অকস্মাৎ কঠিন পদার্থেরই মত ভারী হইয়া উঠিল। অসাড় হাত হইতে খাড়াভরা

রেকাবখানা কোন্ যে বন্ বন্ করিয়া পড়িয়া খাবারগুলি কক্ষভূমির ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই; সে খবরটা জানিতে পারিল পিতৃমুখের কঠোর ভিন্নকারে—

“বলি আহ্লাদের চোটে কি আমার ঘরকন্নার কিছু আর রেখে যাবে না? বলি তুমিই না হয় বড়মানুষের বউ হচ্চো, আমার কি তা ব'লে রাজা ক'রে দেবে যে আমার সর্বস্ব ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকসান করে দিয়ে যাচ্ছে?—বলি ব্যাপারখানা কি বলতে পার?”

বাপের খাবারগুলি কুড়াইয়া দিয়া কোন নীলিমা সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরে থিল দিয়া অন্ধকারে শয্যাহীন তক্তাখানায় গিয়া বাসিতেই চারিদিক হইতে একসঙ্গে একত্র বাঁধতাজা জলরাশির মত বিবিধ বিস্তারিত চিন্তাশ্রোত তাহার বুকের মধ্যে বিচিত্র তালে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঘোর বিশ্বয়ের স্বলাধিকার করিল—অপরিমেয় আনন্দ। এই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে বধন মায়ের আর্ত চক্ষু ও বাপের চাতুরীভরা বাক্য দর্শন-শ্রবণের অতীত হইয়া গেল, তখন শুধু একান্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, এতদিনের সংশয়সর্কারী কীপ কন্ননার পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা ও সুখ। সর্বদেহে মনে আহ্লাদে কণ্টকিত হইয়া নীলিমা মনে মনে সূর্য্যোদয়ের তরঙ্গরূপ ধ্যান করিল। কি সুন্দর সূর্য্যোদয় দেহ! কি স্তম্ভাধাভাজক গভীর দৃষ্টি! আর কি সুমিষ্ট হস্তরঞ্জিত সেই গোলাপী অধর! সে হাসির সুখ যে নীলিমার চিত্তচকোর কি দ্রুত সূর্য্যোদয় মনে গ্রাস করিয়া লইয়াছে! তাহার সুদিত হৃদয়কোরক সেই হস্তরাশ্মিবিভাসিত হইয়াই আজ এই সহস্র দলে বিকসিত হইয়া তীব্র লোভাকুল দৃষ্টিতে সেই গগনব্যবধান দীপ্ত সূর্য্যোদয় পানে গোপন আকাঙ্ক্ষার শুধু চাহিয়া ছিল। উঃ, কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ রে!—আজ সেই তার বক্ররীচিকা সত্য হইতে, স্বপ্ন সফল হইতে চলিল। কি আনন্দ! নীলিমার জীবনে আজ অপ্রত্যাশিত কন্ননা-ভীত কি বিপুল আনন্দ রে! এ কি অসীম সুখ! স্বর্গরাজ্য বাস্তবিকই কি মর্ত্যমানবীর উপভোগে ধরণীর এক প্রান্তে নামিয়া আসিল না কি?

নীলিমা আনন্দোচ্ছলিত বক্ষে মনে মনে অশ্রুভব করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের সূর্য্যোদয় সূর্য্যোদয়, তাহার সেই প্রথমসূর্য্যোদয়; সেই মেঘ



সুশীল দৃষ্টি সে নিজের পিপাসিত দেহ-মনে মর্মে মর্মে উপভোগ করিয়া লইল। নিজেকে তাহার ঘরের নবোজা বধু, গৃহলক্ষ্মী, সম্ভ্রান্তজননী—সকল ভাবেই এক একবার ভাবিয়া লইল। জীবনে এ কি সার্থকতা! স্বপ্নে এ কি সুবিপুল সুখ! এ কি অবাচিত কল্পনা, হে দয়াময়!

ঈশ্বরের নাম লইতে গিয়া নীলিমার মনে পড়িয়া গেল, যীশুকে। এই মাসাবধি কাল স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং সেই ■■■ এ নামও সে লয় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সুশীলের ভিন্ন কোন দেব-মানবেরই স্মৃতি এই প্রায় একটি মাস ধরিয়াই তাহার মনের ভিতর প্রবেশাধিকার পায় নাই। তাই আজ এমন সময়ে আনন্দসাগর বধন কুলপ্লাবী হইয়াছে, সেই সময় এই স্মৃতি স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইয়া তাহার ভরাচিত্তে সারাস্ত্র একটা দোল খাওয়াইয়া দিল। যীশু?—না, না, আর ও নাম ■■■!—ও নাম, ও স্মৃতি, এ জীবনের অতীত হইয়া বাউক! ভ্রমেও আর কখন যেন উহা তাহার মুখে উচ্চারিত না হয়। সে চকিত হইয়া উঠিল—আঃ কি ভাগ্যেই সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে! ভাগ্যে মিস হর্ণের কথায় সে ব্যাপ্টাইজ হইয়া বসে নাই, হইলে কি আজ সে সুশীলকে পাইত? সুশীলের মুখে সে গল্প শুনিয়াছে, তাহার পিসীমা নিত্য শিবপূজা করেন, তাহার পিতা দুই বেলা সন্ধ্যার্চনা করিয়া থাকেন; সে দেখিয়াছে, সুশীলও প্রাতে গায়ত্রী জপ করে। সে মনে মনে স্থির করিল, সরোজিনী-পিসীমার নিকটে সেও শিবপূজাবিধি শিখিয়া লইবে, ভুবনবাবুর আফকের স্থান সে সময়ে সাজাইয়া দিবে। কোন দেবতার ইহারা উপাসক, তাহা জানিয়া লইয়া সেও অপরিণীত ভক্তিতে তাঁহাকেই উপাস্ত করবে। কে বলে, হিন্দুর ধর্মে মুক্ত নাই; তাহাদের জীবনে উদারতা নাই, ত্যাগ নাই—সংযম নাই? যে বলে সে দেখুক—সুশীলকে। তাহার ত্যাগ—তাহার—তাহার—

নীলিমার হর্বোদ্যোত আনন্দান্বিত মুখ সহসাই সেই ঋনাককারে তাহারই মত কালিমখা হইয়া গেল। তাহার মানসনেত্র তন্মুহূর্ত্তেই অপরাহ্নালোকে দৃষ্ট সুশীলের সেই ভৎসনাকঠোর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিল। সে দৃষ্টির অগ্নিকণা নীলিমার চিত্তে দগ্ধ ক্ষত সৃষ্টি করিয়া ■■■ ভিতরে ভিতরে আনর্কল হইয়াই বাহিয়াছিল, ■■■ সঙ্গে ইহাও তখনই প্রমাণ হইয়া গেল। কেন

যে সুশীল অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শের মতই তাহার হাঁতের ছোয়া হইতে নিজেকে বাচাইয়া লইয়া তীব্র বিরাগে তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, এইবার সেই জটিল রহস্যের জাল আপনা আপনাই মুক্ত হইয়া গেল। উঃ, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নন্দন? কোথায় আনন্দ-লোক? জালা—জালা! চারিদিক ব্যাপিয়া এ যে শুধু রাশি রাশি অগ্নিদাহ! অফুরন্ত আগুনের দাহ-করী জালা! সুশীল তো স্বেচ্ছায় তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না।

নীলিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া লুটাইতে লাগিল। সেই দৃষ্টি! সেই ঘৃণা! সেই অকথা ঘৃণা! তাহার বিনিময়ে এই সুখাকাজক্ষা? সুখ—কোথায় সুখ? পাগল—সে পাগল! যার চোখে ওই বিদ্রোহের লেখা—যার মনে ঐ ঘৃণার অবহেলা, তাহাকে চত্ৰান্তে জড়াইয়া আত্মসাৎ করিলেই সে কি তাহার আপন হইবে? অসম্ভব! নীলিমার আশা যে অসম্ভব আশা! নীলিমার পিতার ছরভিসন্ধি তদপেক্ষাও অসম্ভব অকার্য্য! জোর করিয়া তিনি তাহাকে উহার গলার বুলাইয়া দিখেন, কিন্তু সে তার তাহার সহিবে কি?

সারারাত্রি ধরিয়াই সেই শুক নিবুস নিরালস্য নিরালোকে একাকিনী বসিয়া সে ভাবিল। প্রথমে বিব্রীত ভিন্ন তাহার সেই অমীমাংসিত চিন্তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্য গ্রহিল না। তাহার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদনে কোথাও হইতে কোন সাড়া আসিল না। ■■■ সংশয়বৃন্দের কোনই সমাধান হইল না। একবার তাহার মন দারুণ বিদ্রোহভরে এই ছরস্ত্র লোভকে ধূরীভূত করিয়া দিয়া বলে, কি হইবে অমন হীন মূল্যে হয় হইয়া দস্যুর ■■■ লুটিয়া লইয়া? তেমন করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া কেহ কি চিরদিন কাহাকেও আপন করিয়া রাখিতে পারে? আবার মন বলে, ছ'দিন ছ'দিনই সহি! ছ'দিনের স্মৃতিকেও তো চিরদিনের সম্বল করিয়া রাখিতে পারিবে? স্বর্গ বধন মর্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়াছে, তখন কেনই বা তাহাতে না প্রবেশ করিবে?

সহসা পূর্বদিকের জানালা দিয়া পীতাত আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্রাস্তবৎ নীলিমা সবগে উঠিয়া পড়িয়া ঘন স্বাসে আত্মগত হই বসিয়া উঠিল, “না না, সে আমার কাজ নেই, সে সুখ আমি চাইনে, দুঃখই আমার থাক!”

হার খুলিয়া সুশীলের হারে আসিয়া সে বৃহ বৃহ করাঘাত করিল। তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাট, পূর্বাকাশের প্রান্তটি মাত্র গোলাপের অর্ধফুট মুকুলদলের মতই আখখোলা হইয়াছে। নিদ্রাঘতপ্ত নিশার তাপদাহ প্রশমিত করিয়া মিষ্ট শীতল বায়ু সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সশব্দনেত্র চারি দিকে চাহিয়া নীলিমা পুনশ্চ সেই রুদ্ধ হারে অধীর করাঘাত করিল। হারের ফুটায় মুখ রাখিয়া যতটুকু সম্ভব স্বর জমজট করিয়াই বলিল, “যদি চ’লে যেতে চাও, এখনই ট্রেন ছাড়বে। আর দেহী করো না।”

যর নিঃশব্দা, কোপাও কোন শব্দমাত্র নাট। তবে তো সুশীল নিদ্রা ঘাইতেছে। সে তো তবে মনের এই অবস্থাতও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে। তবে বুধা কেন নীলিমার এ সঙ্কোচ? না না, বুধাই ■ সন্দেহ! সুশীল তাহাকে ভালবাসে,—নিশ্চয়ই সে তাহাকে ভালবাসে এবং তাহার হঠাতে তাহার এমন কিছুই আপত্তি নাই। কিন্তু তাই কি? নাঃ, এত আর ভাবা যায় না, যদিই থাকে, তবে তা থাকুক, ■ লোভ নীলিমা কিছুতেই দমন করিতে পারিবে না। না না, নিজের এ সর্বনাশ কেনই বা সে করিতে বাইতেছিল? এত বড় নির্যোধ সে।

### অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা স্বামীর কর্মস্থান হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল চুইটি উদ্দেশ্য লইয়া। প্রথম, বাপ জাইয়ের সঙ্গে দেখাশুনা, দ্বিতীয়তঃ, তাহার ছোট দেবর শশিকান্তর সহিত বিনতার বিবাহসম্বন্ধ পাকা করা। এ বিবাহের কথা অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে, শুধু ছেলের ডাক্তারীর কাইনাল পরীক্ষার জন্তই এত দিন বিবাহ আটকাইয়া ছিল। এইবার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া শশিকান্ত মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে হাউস-সার্জনের পদ পাইয়াছে, বিলাতে গিয়া আরও কোন একটা বিষয় অধ্যয়ন করিবারও তার ইচ্ছা আছে। সেই জন্তই তাড়াতাড়ি বিবাহটা হইয়া যায়, পাত্রপক্ষের এষ্ট বকবট আগ্রহ। বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে।

ভুবনবাবু সব কথা শুনিয়া বলিলেন, “বেশ তো.

তাই হোক। বিপ্রদাসও স্থলখার বিয়ের জন্ত ■ হছেন, হ’জনকারই এক মাসে হয়ে যাক না!”

খবর শুনিয়া বাড়ীর ও পাড়ার লোক আনন্দ প্রকাশ করিল, কেবল করিল না বিনতা এবং শুভেন্দু।

বিনতা প্রথমে আকারে ইজিতে, পরিশেষে স্পষ্টাকরেই পিসীমা’কে গিয়া জানাইল যে, দিদির দেবরকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না, কোন মতেই না।

পিসীমা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চৌট উন্টাইয়া বিনতা জবাব দিল—“আহা, যে ভূতের মতন মূর্তি! অন্ধকার স্বাক্ষে দেখলে খোকসের বাচ্চা ব’লে ■ করবে না? বেহায়াই বল, আর যা-ই কর, আমি বাবু স্পষ্ট কথার মাহুষ; শুকে বিয়ে করা আমার কর্ম নয়।”

পিসীমা প্রথমতঃ মেয়েকে উপদেশ ও তৎসনার, অবশেষে তোবামোদে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং সে সকলে অকৃতকার্য হইয়া তরুলকে সব কথা জানাইলেন। তরু আসিয়া বোনকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিল। পরে বিরক্ত হইয়া বলিল—“কেন বাবু, ছোট ঠাকুপোর চেহারা এমনই কি বন্দ না কি? রংটাই তার ■ একটু শাফলা।”

বিনতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—“বা রে বা! ঐ তোমার ‘একটু শাফলা’!—তা তুমি আর তা ছাড়া কি-ই বা বলবে? তোমার বাড়ীতে যে বার মাস অমাবস্তা লেগেই আছে! বা হোক, তা ব’লে তোমার শান্তদীর কিন্তু বাবু ঐ ছেলের শশিকান্ত নাম না রেখে মসীকান্ত নাম রাখাই উচিত ছিল। থাকে বলে কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন, এ ঠিক তাই!”

তরু এ বিজ্রপে রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল,—“হ্যা রে হ্যা! আমার ঐ অমাবস্তাই ভাল। তোমার মনে না ধরে, কোথায় তোমার পূর্ণিমার টাঁদ আছে, তুই সন্ধান ক’রে নি’গে যা!”

বিনতা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না,—অসঙ্কোচেই সে হাসিয়া কহিল—“সন্ধান তো করাই রয়েছে! ধরেই তো আমাদের চির-পূর্ণিমা হয়ে রয়েছে, তাও কি তোমরা দেখতে পাও না?”

বিশ্রয়োভাজিত মুখে সংশয়ের সহিত তরু জিজ্ঞাসা করিল—“ঘরে আছে? কে? না না,—শুভেন্দু নয় তো?”



বিনতা দীপ্তমুখ মুখে উত্তর দিল—“হ’লেই বা, তাতে দোষ কি?”

বোনের মুখের এই সুস্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তরুণতার মুখ স্নান হইয়া গেল। তাহার এই স্বাধীন পতিনির্বাচনটাকে সে বেশ সুনির্বাচন বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিল না, এবং ইহার বিরুদ্ধে সে দুই দিন ধরিয়া তাহার সহিত সমানেই তর্ক চালাইয়া চলিল। তার পর যথাসাধ্য চেষ্টাতেও অবশেষে বিনতার পণ ভাঙ্গিবার যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অগত্যা খবরটা তাহার ভূবন-বাবুকে দিতে হইল। সংবাদ শুনিয়া ভূবন বাবুরও মাথার ঘেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনিও পুনঃ পুনঃ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। তাহার সে বিনতার ডায়েরীর পাতায় এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—“সরোজের মুখে, তাহার পর তরুণ মুখেও খবর পেলেম, বিনতা না-কি শশীকে বিয়ে না করে শুভেন্দুকে বিয়ে করতে চায়! ওরা না কি অনেক বুঝিয়েছিল, কিছুতেই তার মত বদলারনি। সকলই ভাগ্য! শশীর মত সুপাত্রকে তুচ্ছ করে যোঁকের মাথার শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে শুভেন্দুকে বিয়ে করা বিনতার নিতান্তই ছেলেমানুষী কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমিও তো আর তা ব’লে এ সম্বন্ধে তাকে বিশেষ জোর করতেও পারি নে। পারি কি? মেয়ে বড় হয়েছে, তার স্বাধীন মতামত জন্মেছে!—অন্ত দেশের শাস্ত্রে তো বটেই, হিন্দুশাস্ত্রমতেও এ বয়সে মেয়েকে অনুচা রাখলে সে মেয়ের স্বয়ং পতি-নির্বাচনের অধিকার জন্মে থাকে।—এ ক্ষেত্রে সে আমাদের পছন্দকে যদি ঠেলে ফেলে নিজের পছন্দ করে থাকে, সে ক্ষেত্রে আমার আপত্তি করা তো চলে না। হয় তো তাতে তার মানসিক শান্তি চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ মনে মনে এক জনকে সে যখন পতিত্ব বরণই করেছে, তখন কোন সুযোগের খাতিরেই আর অন্য জনের স্ত্রী হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও তো হবে না!—অথচ এ কি ভুল নির্বাচনই সে করলে! চাক, চাক! আজ যে তুমি নাই! তুমি থাকলে কি আমার এ সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারতে না? তবে কি এই জন্মই মেয়েদের বিবাহকে কৈশোরের সীমাবদ্ধ মাথার নিয়ন্ত্রণে আমাদের সমাজে হয়েছিল?

আমাদের এই জাতিভেদের, শ্রেণীভেদের সমাজে অপরাপর সমাজের স্বাধীন নির্বাচনের পথ তো মুক্ত নয়! তবু আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, নিতান্তই অ-কুলীন হ’লেও শুভেন্দু জাত্যাংশে হীন নয়।”

তরু আর একবার বোনকে ভয় বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনে বশীভূতা করিবার চেষ্টা করিল; বলিল—“রূপটাই কি সব? ছোট ঠাকুরপোর মত বিজ্ঞা, বুদ্ধি, মান-মর্যাদা, পরসী সে সব কি শুভুর কিছু আছে? ওর কি দেখে তুই ভুললি? শুধু আলতাগোলা রং, শুকপাখীর মতন নাক, চোখ দুটো পটল-চেরা আর পাতলা রান্না ঠোঁট? এ পৃথিবীতে এই কি সমস্ত?”

বিনতা জ্রুটী করিয়া মুখ কিরাইয়া লইল, তাহার পর উখলিত ক্রোধকে জঁবকমন করিয়া লইয়া সবিরক্ত হাতে উত্তর দিল—“বলেইছি তো রূপের তর্কে তোমার অধিকার আমি কোন দিনই স্বীকার করব না! তোমার পক্ষে কটার চাইতে কালো চামড়াই ভাল লাগা সম্ভব এবং হয় তো সম্ভবও হ’তে পারে, তাই ব’লে সবাইকেই বা তা মানতে হবে কেন? তার পর তোমার ছোট ঠাকুরপোর চাইতে উনি বিস্তর কম হ’তে পারেন। বুদ্ধিতে যে কম, তাও হয় তো আমি মনে করিনে। এত অল্প সময়ে এমন আত্মোন্নতিসাধন করতে ক’জন লোকে পেয়েছে? ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যদি যান, নিশ্চয়ই সেখান থেকে পাশ ক’রেই ফিরবেন এবং তখন হয় তো এমনও হ’তে পারে যে, তোমার ছোট ঠাকুরপো ও’র চেয়ে ডের নীচেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। লোকটা যে একটা ‘জিনিয়াস’, তাতে কোনই সংশয় নেই।”

তরু মনে মনে বলিল—“জিনিয়াস হ’তে পারেন;” প্রকাণ্ডে পুনশ্চ অস্ত পথ ধরিল, বলিল—“বেশ তো, ছোট ঠাকুরপো ছাড়া কি আর দ্বিতীয় পাত্র ভূ-ভারতে নেই? সুন্দর ছেলে শুভুর চাইতেও অনেক অনেক পাওয়া যায়,—বাদের চাল-চুলা আছে, নান-খ্যাতি আছে, বিজ্ঞাও আছে। বাবাকে বলি, তাই তিনি খুঁজে দেখুন না। বিশেষ শুভুদের ঘর যে বড় ছোট! শ্রোত্রিয়ের ঘর! ওদের মেয়ে আনা গেলেও, ওদের ঘরে আমাদের ঘরের মেয়ে তো একে-বারেই দেওয়া যায় না।”

বিনতা বিরক্তি-বিরস কঠিন স্বরে কহিয়া উঠিল

—“বর-দোরের অত খবর আমি জানি টানি নে।  
প্রাক্তনের জন্মেছে,—সেই চের। আর তা’ না  
হ’লেও আমি কিছু আর কারকে বিয়ে করতুম না,—  
আর এখনও তা কারকে কোন কথাতেই করবোও  
না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।”

ভুবনবাবুর সে দিনের ডায়েরীর পাতায় লিখিত  
হইল—“নাঃ, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিনতার  
পণ অটল। হয় তো এই ভাল।—একজনকে মনে স্থান  
দিয়া বাহিরে অন্তরে হওয়া কোন দিক দিয়া দেখিলেই  
আমারও সমস্ত বলিয়া মনে হয় না—উপায় নাই।  
বিবাহ আমার দিতেই হইবে। শুভ্রকে বলিলাম,  
—সে-ও সব কথাই জানে দেখিলাম। উহার দুই  
অনেক দিন হইতেই না কি বিবাহের  
বাগদস্ত আছে বলিল। আমিই অন্ধ ও অবিবেচক।  
মেয়ে বড় করিয়া রাখিয়া তাহাকে বাড়ীর ছেলের  
সঙ্গে অবাধে মিশিতে দিয়া অন্তায় করিয়াছি।—  
শুভেন্দুকে প্রথমাবধি হোট্টেলে রাখাই আমার সমস্ত  
ছিল। যাক, ‘নির্বাপনদীপে কিম্ব তৈলদানম্’—এখন  
আর ব্যথা অনুতাপে যাহা হাতের বাহির হইয়া  
গিয়াছে, তাহা কিরিয়ে না।—বিবাহের দিন স্থির  
করিতে তর্করত মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র  
দিলাম। সুশীলের বিবাহটাও এই সঙ্গেই হইয়া যাউক।  
বিনতার বিবাহে সম্ভবতঃ একটু গোলযোগ হইবে।  
জ্যেষ্ঠাঃমা আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার কোন্ডের  
সীমা থাকিত না।—বিবাহটা যত শীঘ্র সম্ভব দিতে  
হইবে এবং—এখানেই দিব। বিপ্রদাস আমার  
কোন গোল করিবেন না তো?—চাক!—তুমি  
থাকিলে হয় তো এসব হইত না। মা’ পারে,  
বাপ হয় তো মেয়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি পারে  
না। কিন্তু ছেলেকে মায়ের চেয়ে বাপেই হয় তো  
ভাল রকম শিক্ষা দিতে পারে। সুশীলের বিষয়ে  
আমার কোন ভ্রুটি হইয়াছে মনে হয় না। ভগবান  
এও আমার মনে কম সাহায্য দেন নাই।”

পরদিনের ডায়েরীতে লিখিত হইল—“অনুকূলকে  
খবর দেওয়া শুভেন্দুর আদৌ ইচ্ছা নহে। সে  
বলে, ‘বাপ আসিয়া হয় তো কোন বিলাট ঘটাইবেন।  
ভদ্রসমাজে হয় তো আপনাদেরও তাহাতে অপমান  
হইতে হইবে।’ সে বলে, ‘বাপের তো আমার  
উপর টান কতই। সুশীলকে ক্ষিদে করিয়া রাখিলেন,  
আমার প্রথম দিন হইতেই বিদায় দিতে ব্যস্ত।—

আমার হয়, বাপের চেয়ে ছেলেরই এ সম্বন্ধে  
দোষ বেশী। এই তো সুশীল সেখানে এক বাস হইতে  
যায় রহিয়াছে! মা যে মৃত্যুশয্যায়, তাহাতে দৃকপাতও  
নাই। চাকশি! এ কি হইল? মনের মধ্যে এত  
অশ্রু ও অবিবাস লইয়া তাহারই হাতে আমার কল্যা-  
দান করিতে হইবে? বীণাকে কি নিজেই আমার  
একবার ভাল করিয়া বুঝাইব? না, না, সেই বা  
করিয়া হয়? তা’কে কি বলিব? সে যে নিজে বলি-  
তেছে, সে শুভেন্দুকে বিবাহ করিবে বলিয়া তাহার কাছে  
পণে বন্ধ, তার কি আর বদল হয়?—হয় কি তা?

—সরোজ বলে, ‘কেন হইবে না? বর তো  
ছান্দাতলা হইতেও কিরিয়া যায়, আমার অন্ত বরে  
বাপ মেয়ে সম্প্রদান করিয়া থাকে।’ এটা তার  
বুঝিবার ভুল। সে কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! সে বিবাহের  
দাতা যে মেয়ের বাপ। মেয়ে নিজে তো নহে।  
মেয়ে যাহাকে আত্মসমর্পণে প্রতিক্ষিত, ভালমন্দ  
নির্কিচারে তাহাকেই তাহার নেওয়া সমস্ত।  
না হইলে যে সাবিজীর আদর্শ হিন্দুনারীর ভিতরে থর  
হইয়া যাইবে! মেয়ে বড় করলে নিজের মতকে  
ছোট করিতেই হইবে। নহিলে তাহা অত্যাচাররূপে  
গণ্য হইবে। নারীত্বের—সত্যত্বের অমর্যাদা  
ঘটিবে। হয় তো ইহার ফল ভালই। হয় তো  
সাবিজীর মতই আমার বীণা মা শুভেন্দু-চরিত্রের সকল  
অশুভকে জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। চাক!  
চাক! তুমি স্বর্গ হ’তে উহাদের আশীর্বাদ করিও।  
সত্যী তুমি, তোমার আশীর্বাদে তাদের ভাল হইবে।

“বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গেল! বিবাহের দিন এ  
মাসে ঐ একটি ভিন্ন আর একটিও নাই।—তা হোক,  
বা হইবার, তা হইয়া যাউক। সুশীলকে আজ একটা  
‘তার’ দিতে বলি।—এ’ কি, সুশীলের নাম ধরিয়া  
ডাকে কে? সরোজ না? হাঁ, তাই তো।—আমার  
সুশীল! আমার জীবনের আশাভ্রোতিঃ! আমার  
সকল দুঃখের শীতল সাহায্য! আমার বংশের প্রদীপ!  
আমার চাকশীর ধন! এসেছ তুমি? এই একটি  
বাস তোমার ছেড়ে দীর্ঘতম যুগান্তর ব’লে যেন মনে  
হচ্ছিল। কৈ, দেখি সে কেমন আছে? বুকে নিরে  
এই আর্ন্ত বুকটা একটুখানি জুড়িয়ে আসি। বীণা  
যে মনের মধ্যে আমার বড়ই আঘাত দিয়াছে। ওকে  
দেখে হয় তো একটু ভুলতেও পারবো। আঃ,  
সুশীল! এলি তুমি!”



## উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির অন্ধকারে বাহা অসম্ভব ও আশাহীন বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, দিবালোকের অভাবের সঙ্গে তাহার অখণ্ডনীয়ত্বের আস্থা খণ্ডিত হইয়া তাহাকে সম্ভাবনীয়রূপে প্রতীয়মান হয়। সুনীলের যে সাহস ও শক্তি গতকালকার অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অপবাদে আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ দিবসাম্বিশের অভ্যাদরসূচনার সহিত আবার তাহার কিছু অংশ যেন তার বিক্ষুব্ধ ও বিপর্যয় প্রাপ্ত জাগিয়া উঠিল। নিদারুণ শাস্তিশেষে বিদ্ধ তাহার আহত শোণিতাক্ত চিত্ত যেন সারা রাত্রির প্রলয়াকারের পর এতক্ষণে এই তরুণ উষার অভ্যাসে তাহার কনকনৌখিতে আশা-রূপ রাগে আবার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে দৃঢ় এবং স্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিল, এত বড় অজ্ঞানের মূল্যে সে কোনক্রমেই ইহাদের হস্তে আত্ম-বিক্রম করিবে না। ইহাতে ভবিষ্যতে বাহা ঘটবার, তাহাই ঘটুক। এই চিন্তার পর তাহার শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

যে ঘুমাইয়াছিল, তাহা মনে নাই, যখন সে ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। পিছন দিককার খোলা জানালা দিয়া তপ্ত হাওয়া এবং গ্রীষ্মের প্রথম রোদ উভয়ই অপরিাপ্ত পরিমাণে গৃহে প্রবেশলাভ করিতেছে। জানালার বাহিরে ভাঙ্গা কার্ণিসের উপরে কয়েকটি কাক বসিয়া সাবধানসূচক তীক্ষ্ণরে হয় তো বা তাহার এই অকাল-নিদ্রার তাহাকেই তিরস্কার করিতেছিল! ঘুম ভাঙিতেই আবার সকল কথাই তখন সুনীলের মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িতেই নিজের এই অবিম্যুকারিতার জন্য মনে মনে সে অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এমন বিপদ মাথায় লইয়াও মানুষের চক্ষুতে ঘুমও তো আইসে? সে তখন উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি একটা জামাটানিয়া গায়ে দিল ও স্ট্রটকেস খুলিয়া মনিব্যাগটা ও ঘড়িটা পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

“এস, এস, বর! এতক্ষণে তোমার ঘুম ভাঙলো? এ দিকে আত্মদিক করতে ব’সে পুরুত মশাই ছটফট করতে লেগেছেন যে।”—এই সুসংবাদ প্রদান পূর্বক পুরোহিত ঠাকুরের দ্বিদি ঠাকুরাণী চারটি

সম্বা বেয়ে সঙ্গে লইয়া সুনীলকে চারিদিক হইতে বেড়িয়া ধরিলেন। হাতে তাঁহাদের খানিকটা করিয়া বাটা হলুদ।

দ্বিদি কহিলেন, “ওলো বউ! মেয়েটার পাতাচাপা কপাল লো! কেমন মদনমোহন বরটি জুটেছে দেখ!”

পুরোহিতগৃহিণী অর্দ্ধাবগুষ্ঠন একটুখানি সরাইয়া অনিমেয়ে মুগ্ধ চোখে সুনীলের নিস্ত্রস্ত প্রভাতচক্রে মতই দীপ্তিশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলকিত স্বরে উত্তর করিলেন, “আহা, বেঁচে থেকে ভোগ করুক গো! স্বর্ণ ঠাকুরবি আমাদের বড় দুঃখী গো! আর নীলি মেয়েটারও কখন কোন সুখ হয় নি। মা মঙ্গলচণ্ডী যদি কৃপা করে দিয়েইছেন, তা’ পাকা মাখার সিঁদুর প’রে দুটিতে একটি হয়ে যেন সুখে থেকে ভোগ করে।”

পাড়ার চতুর্দশদীর এই আশীর্বাদের বটা শুনিয়া তা’ সহ হইল না। সে তাহার পার্শ্ববর্তিনীর কানের কাছে চুপি চুপি বলিয়া উঠিল, “জুটবে না কেন লো? ঘরে এনে পুবে রেখে—এখন দারে পড়েই না বিয়ে করছে! কোটানর প্রবৃত্তি থাকলে আমাদেরও চের জুটেতে পারতো। পোড়া কপাল!—পোড়া কপাল!”

কথাটা সুনীলের কানে গিয়া আবার তাহাকে কর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল এবং সেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে নারীর দল তাহার লগাটে হলুদ লেপিয়া দিয়া একসঙ্গে হলু ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রোষক্লান্ত সুনীল সন্মোহনে কহিয়া উঠিল, “এ কি করছেন আপনারা?”

মহিলাসংলগ্ন উচ্চ হাস্তে ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাহাকে বিব্রত করিয়া একটা স্মিট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সুনীল বিস্তর আপত্তি করিয়াও ভদ্রতার সীমায় পা রাখিয়া তাহাদের হস্তমুক্তির কোন উপায় মাত্র না দেখিয়া শেষে নিক্রপারে মস্তনিক্রবীর্ষা সর্প-শিশুর মতই কুলিতে লাগিল। নারীর নিকট পুরুষের পৌরুষকে যে পরিহার করা ভিন্ন উপায় নাই!—সে আর করিবে কি?

বরপক্ষের আত্মদিক করিতে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় আগাপোড়াই না হয় তাহাদের তিন কুলের জীবিত মৃত ব্যক্তিবর্গকে নির্বিচারে যথা-সমসত্ত্ব দিয়াই সারিয়া লইলেন; কিন্তু কোটানি বেখানে

অধিবাসী বরকে প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে কাপরে পড়িয়া ধাইতে হইল। বর সেই গাত্রহরিজা সমাধা হইবার পর কতাকর্তাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত কি কথাবার্তা কহিবার পর হইতেই স্বর্ণলতার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও সে সেখানে হইতে নড়েন নাই। প্রথমে ইহাকে উহাকে দিয়া, পরিশেষে অমুকুলচন্দ্র নিজের গিয়া তাহার হাত ধরিয়া পর্যন্ত টানাটানি করিয়াছেন, উঠাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ শুধু স্থলীলেরই উঠিতে আপত্তি মাত্র নহে, স্বর্ণলতা দুই দুর্বল বাহু দিয়া তাহাকে নিজের কাছে এমন করিয়া আগলাইয়া ধরিয়াছিলেন, ও যে কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল, এমন অলস আঙনে তরা তৎসমাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিতোছিলেন যে, এমন কি, ইচ্ছা থাকিলেও সে ইহার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না।

অমুকুল রাগে আঙন হইয়া সুস্বৰ্ণ স্ত্রীকে কুৎসিত ভাবায় গালি দিল, তাঁহার হাত জোর করিয়া ছাড়াইতে গেল,—কিন্তু শাবক-অপহরণকারীর প্রতি ব্যাঘ্রা বেনন করিয়া চাহিয়া শাবককে প্রাণপণ বলে বকে চাপিয়া ধরে, তেমনই করিয়া বেন তাঁহার মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত অসীম শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্থলীলকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া স্থলীল বলিল, “আপনার কি রক্তমাংসের দেহও নয়? বাহুবটাকে বেয়ে ফেলবেন না কি?”

অমুকুল অস্পষ্ট ভক্তিতে উত্তরের সম্বন্ধেই অনেক অকথা কুখ্যা কহিতে কহিতে কিরিয়া গিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, “রক্ত গে; নেও, তবে এমনই এমনই সেরে নেও। মাগীর আত্ম বরণযোগে ধরেচে, জোর করতে গেলে পাছে বঁরে গিরে সব পণ্ড করে বসে, তাই শুধু পাবলুম না—না হ’লে আজ একটা এম্পার ওম্পার হয়ে যেত। দাঁড়াও না, গোত্রটা একবার বদলে যাক। তখন এর শোধ তুলবো কি না, দুজনকাই ওপোরেই!”

পুরোহিত হতভববৎ হাঁ করিয়া থাকিয়া আপত্তির ঘরে বলিলেন, “তা কেমন করে হবে? বর না এলে কখন এ সকল কার্য হবে থাকে? তাঁকে একবার তো আসতেই হবে, যেমন করেই হোক—”

অমুকুল ভীষণভাবে চিঠিয়া উঠিয়া মুখ বিচাইয়া

বলিয়া উঠিলেন, “আরে নেও।—হর না তো কি হয়? কুলীনদের ঘরে যে ঘাটের বড়া ধ’রে নেয়েদের বিয়ে দিত। তারা কি উঠে বঁসে অধিবাসী কুলত আসতো না কি? এ’ও না হয় তেমনই করেই হয়ে থাকে না।—তারী তুমি পণ্ডিতী করতে এসেছ আমার কাছে আমার জানা আছে সব।”

অগত্যা সেই রকম করিয়াই সকল কর্ম সমাধা হইল। কেবল অধিবাসের ফোটা এবং মৃত্যুর বাধা দুর্ভাগ্য স্থলীলকে সেইখানে বসিয়াই অনিচ্ছাসহ পরিতে হইল। স্বর্ণলতা সেই চিহ্নগুলি অতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া কয়েক ফোটা জল পড়িল। কিন্তু সে অক্রমে বেন আনন্দাশ্রয়ও একটু মিশ্রণ আছে বলিয়া সন্দেহ নহে, অথচ ইহার সহিত বিরক্তিরও প্রাচুর্য ছিল না তা নয়।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাহিরে সবতরু জন পনের লোক মিলিয়া বিবাহ-বাড়ীটাকে একটু সরগরম করিয়াছে। আর বাড়ীর ভিতরে সেই পাঁচ জন এমো, আর বিনা নিমন্ত্রণে অনাহুতভাবেই আসিয়াছিল নীলিনার কুলের সঙ্গিনী সাবিজী। এই কয়টি মাত্র নর-নারীর সমাগম। বিবাহে “দীপ্ততা ভূজ্যতা” প্রভৃতির কোন জন্মলাই নাই। বাজারের কিছু মিষ্টায় ও চিড়ে-দইয়ের সামান্য রকম আয়োজন করা আছে। বাহাদের নিতান্তই পেটের আলু তাহারাই এ বাড়ীতে ঐ সকল খাইবে।

লাল কতাপেড়ে সাফী পরা, আললাট হরিজা-রঞ্জিত, বাব হস্তে হলুদরঙ্গা মৃত্যুর দুর্ভাগ্য রাশি বাধা আর দুই হাতে দুইগাছি রাগা শাখা এই মাত্র সাজে সাজিয়া বিয়ের কনে এতকণে রাজলিক কার্যাবসরে সকল লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক জোর করিয়া নিজের অশান্ত হৃদয়কে ও অবাধ্য চরণকে শাসনের পাশে বাধিয়া লইয়া মাঁকে খাওয়াইতে ঘরে ঢুকিল। গত রাত্রি হইতে মায়ের বে তার খাওয়া হয় নাই, সে কথা সে একেবারে না ভুলিয়া গেলেও নিজের চিন্তা, অবসরহীনতা এবং সকলের উপর স্থলীলের সেখানে উপস্থিতি এই সকলে মিলিয়া আর খাবার লইয়া আসা ঘটনা উঠে নাই। এখন নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া এক হস্তে দুধের বাটি, অপর হস্তে সামান্য কলমুল ও মিষ্টায় সংগ্রহ করিয়া কুণ্ঠিত ম্রগচরণে সে আসিয়া বাহুবন্ধিরে দেয়া দিল।



তাহার মা ছুটি শুক লতাবৎ শীর্ণ হাতে তখনও স্ত্রীলোকের হাত দুখানি ধরিয়া ব্যাকুল স্নানভেদী দৃষ্টিতে তাহার আতপতপ্ত কচি কিল্লনের মত নরম মুখখানির পানে পলকহীন চক্ষুতে চাহিয়া আছেন। নীলিমাও চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকের মুক্তি যেন এই একটি স্নানদিনের মধ্যেই আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের সেই শিশুসুলভ সরলতা কমনীয়তা সঙ্কল্প স্নেহে ভরা সেই উদার দৃষ্টি সে সব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া উহাকে যেন রক্ত শুক ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। সে স্ত্রীলোক যেন এ স্ত্রীলোকই নয়। সেই সদা সহাস্তমুখ আজ কি দীপ্তশূন্য! সেই আনন্দ-চপল স্ত্রীলোক আজ তাহার এই বিবাহদিবসে কি অসীম ব্যথাকাতর চিন্তে শুক মর্মর বিমর্ষ মুখে নীরবে রহিয়া আছে! নীলিমার বুকের মধ্যে অসংখ্য বেদনা টনটন করিয়া উঠিল।

আজ প্রথম প্রভাতের বার্ষ চেষ্টার পর এই অপ্রত্যাশিত বিবাহব্যাপারের সকল অন্তর্ধানপর্যন্ত বতাই অগ্রসর হইয়া সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, নীলিমার দ্বিধাগ্রস্ত মনের সশয়-বেশ ততই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার আশেপাশে আশা ও আনন্দের চক্ৰলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ প্রদীপ্ত করিয়া ছড়াইয়া পাড়তেছিল। গ্রীষ্মের শুভোট কাটিয়া বের নৈশ শীতল বায়ুগবাহ ধীরে ধীরে তাহার চিত্তাতপ্ত অন্তরকে শিথল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার কুণ্ঠিত চিত্ত এই বলিয়া আত্মসাম্বল্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, স্ত্রীলোকের যেন প্রকৃতি, তাহাতে সে কখনই নিরপরাধে তাহার প্রতি একান্ত অধিকার করিতে পারিবে না। এই দুই দিনের বিরাগ এক দিন অন্তর্হিত হইবেই। কিন্তু এখন দুই জনের চোখে চোখে বারেকের মিলন ফুটিতেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি হইতে এমনই গভীর যুগা ও বিবেকের কঠোর জ্বালা ঠিকরিয়া পড়িল যে, সেই দৃষ্টিবাণাহত হইয়া নীলিমার বুক যেন খান খান হইয়া তালিয়া গেল।

স্ত্রীলোক যখন স্বর্ণলতার হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল এবং নীলিমা মা'কে হৃদয়কু খাওয়াইতে বসিল, তখন সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকের মনে পড়িল, সন্ধ্যার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য সে তখন শরীরমণ্ডে একটুখানি বল সঞ্চার

করিয়া লইয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু অমূল্যের কাছাকাছি হইতেই তাহার বুকটা যেন বিশ মণ ভারে ভারী হইয়া আসিল, কঠোর কাছে-অশ্রুনির্ভর যেন তার গুল্মভূত হইয়া উঠিল, কোন কথা না বাগাই সে তাই তাড়াতাড়ি তার পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। সে তখন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল যে, এই লোকটার বাড়িতে কেমন করিয়াই সে এত দিন বাস করিতে পারিয়াছিল?

অমূল্য মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই বলিলেন, “বাবাজীবন এইবার একটু একটু করে বাগে আসে চেন! কেমন দাওয়াইটা খাইয়েছি,—হবে না?”

### ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারা দিনের শুভোটের পর অপরাহ্নে খুব বেশ উঠিল। ঘোলাটে আকাশে, শুক গাছপালার দেখিতে দেখিতে কালবৈশাখীর চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পরেই মেঘের সেই ধোয়ার বর্ণ নিকব কালো পাথরের পর্বতশ্রেণীর মতই চিকণ কালো রূপে রূপান্তরিত হইয়া পাড়াইল।—সন্ধ্যার পরেই শুকপক্ষের জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়া কেবল অন্ধকারের রাশি জাগিয়া উঠিল। বড় বড় গাছপালা সেই অন্ধকারে অসংখ্য প্রেতমূর্তির মতই শুক হইয়া রহিল। কোথাও বাজড়ের বটাপট, কোথাও আসন্ন বিপদভীত নীড়ান্নরী পাখীর ককণ কিচিমিচি ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দই রহিল না। সমস্ত পৃথিবী যেন কোন আসন্ন বিপদের ভয়ে সেই অসীম অন্ধকাররাশির মধ্যে আত্মসোপন করিল।

স্ত্রীলোক তাহার অন্ত নির্দিষ্ট সেই ঘরটার মধ্যে শ্রান্ত শরীরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার! দুই হাতে চোখ মুছিয়া সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বাহিরেও অন্ধকার প্রচিভেদ, কালো মেঘে আকাশের সহিত ধরতিও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। মেঘের বুক চিরিয়া বিজ্ঞানের সঙ্কল্প লোল শিখা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্নত ভঙ্গিতে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। মেঘের গর্জনে, বাজড়ের হুকারে নৈশপ্রকৃতির বক্ষে যেন একটা প্রলয়কাণ্ডের হুচনা চলিয়াছিল। স্ত্রীলোকের নিজের বক্ষেও বোধ করি এর চেয়ে কিছু কম বিপ্লবসংঘাত

বাধে নাই। বাতাস যেন কত তীব্র হইয়াছে।  
মুষ্টিতে মাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মনের মধ্যে  
তেমনই বড়ের হাওয়া তাহার আঁখি ও সংশয়কে  
লইয়া ঐ রকমই তীব্র ইচ্ছারূপে চারি পাশের অসহায়  
গাছপালাদের মতই আছড়াপাছড়ি করাইতেছিল।  
মন বলিতেছিল, এমন অসহায় শিশুর মত অত্যাচারীর  
অন্তায়ের পাশে নিজেকে বাধিতে দিতেছ ? আর তা,  
চিরদিনেরই মত ? শিক্ তোমার ভীকৃতায়। আবার  
অল্প দিক্ হইতে সংশয় বিপুল বলে সংগ্রাম  
করিতেছিল। তা'র মুক্তি—মুর্না ! কলঙ্ক ! সে  
কোন কিছু দিলেই ঢাকা পড়িবে না ! না ; উদ্ধার  
নাই—তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই !

গুরু গুরু গুরু গুরু রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল।  
সেই সঙ্গে বন বন বন বন শব্দে জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণতর  
দারজানালাগুলো কাঁপিয়া উঠিল। সুশীলের বক্ষও  
তাঁহাতে কম্পিত হইল। বাতাসে ঘরের পিছনে  
আবগাহের পাতা সরু সরু বহু বহু করিয়া শুধরিয়া  
শুধরিয়া উঠিতেছিল, বড় তাহার বিশাল দেহ ধরিয়া  
টানটানি করিতে করিতে অটুহাসি হাসিয়া বলিতেছিল,  
—সন্ সন্ শোন শোন শোন শোন !—তাহার পর  
আবার সুহৃৎ হৃৎ শ্রেণগর্জন শ্রুত হইয়া বৃষ্টির চড় চড়  
চড় চড় শব্দ আরম্ভ হইল। এই বিবিধ এবং বিচিত্র  
ঐক্যভাবনিক শব্দলহরী মিলিয়া সুশীলের পিঠ ও  
ক্রিষ্ট অন্তরটাকে যেন আর্ত করিয়া তুলিল।  
তাঁহার মনে পড়িল, আজ তাহার বিবাহ ! এ  
সবই তাহার বিবাহবাস ! ঐ আকাশের মেঘ  
তাঁহার বিবাহসভার চম্পা-পা, ঐ মেঘের গর্জন  
ব্যাধের বাজনা ! ঐ বড়ের হকার বরষাভীর  
কলরোল !—ঐ গাছপালায় সন্মুখানি তাহার বিবাহের  
বাগপাইপ !—আর ঐ জলের ধারা দিয়া বৃষ্টিতাহাকে  
বিছাতের রোসনীতে বরণ করিতে আরম্ভ করিল ?—এই  
সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, শত শত সুখ এবং ঐশ্বর্য্যে  
সমাকীর্ণ তাহার নিজ গৃহ ! সেই ইচ্ছাক্রমে অধিপতি  
সে, আজ তাহার এই বিবাহসজ্জা ? তাহার বিবাহের  
এই সমারোহ ? সুশীলের বুক চিরিয়া, চোখ ফাটিয়া  
অশ্রুপ্রবাহ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই  
আর্জ্জ অন্ধকারে নির্ঝল্লব সংসারের দ্বাতপ্রতিদ্বাতে  
একান্ত অনভ্যস্ত, সহায়হীন, কলঙ্কভীত, আর্ত বালক  
মর্ম্মবদ ব্যাকুলতার অধীর হইয়া উঠিল। তাহার  
চোখের জলের বাধ ডাকিয়া উৎস ছুটিতে লাগিল।

২ম (খ) — ১২

সেই অশ্রুপ্রবাহে হইখানি উদ্বেল মুখ নিমেষে  
নিমেষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং সে নিমেষে বন্ধ  
ব্যাকুল নেত্রে সেই মুখ হইখানার দিকে চাহিয়া তাঁহা-  
দের বহুবার বৃকের মধ্যে যেন সবলে চাপিয়া ধরিতে  
গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সংসারের  
আর বেখানে বাহা হোক, শুধু এই ছটি মুখ—এই  
একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম—প্রাণতম এই ছই জনই শুধু  
তাঁহার জীবন হইতে দূরে—বহু—বহুদূরে অপস্থত  
হইয়া বাইতেছে। সে যেন কোন প্রকারেই আর  
এই কালরাজির অবসানের পর ইহাদের ছই জনের  
কাছে তাঁহার এ জীবনের কষ্টে কোন দিনই পৌছিতে  
পারিবে না ! সে ছই জন তাহার পিতা এবং  
মুলেখা !—সুশীল সমলকাতর মুহুরে আশ্রয়তই  
উচ্চারণ করিল, “মুলেখা !—মুলেখা !”—

বড়ের প্রচণ্ড একটা দম্কা হাওয়া হালা শব্দে  
সারা বিশ্বে প্রলয়কাত বাধাইয়া এই অন্ধকার ঘরের  
মধ্যেও ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত কুলার  
রাশি মিশ্রিত ছিল। সুশীলের অশ্রুদ্রব চক্ষুকে  
সেই ধূলিবৃষ্টি করণকেই ভক্ত একটা বেদনার সৃষ্টি  
করাতে তাহার ব্যাবিবল চিত্ত মুহূর্ত্তকের ভক্ত  
বাহিরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রহস্য-  
বিহীন-দুরগ হইবারাজ তাহার চোখে পড়িল শুধু  
বড়ই নহে, তাহারই সহিত তেমনই চঞ্চল, তেমনই  
বিস্রস্ত কেশবাস, তেমনই উদ্বেগাকুল মুষ্টি লইয়া আরও  
কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।—বিছাতের সেই  
কণহারী কণিকালোকেই সুশীল চিনিল, সে নীলিনা।  
নীলিনা বসিত ক্রতপদে সুশীলের নিকটবর্ত্তী  
হইল, বায়ুর হকার তেদ করিয়াও তাহার ঘনবাস  
স্পর্শিত হইয়া শুনা বাইতেছিল। সে একটুও বিধা  
বা বিলম্বমাত্র না করিয়া এক নিখাসে বলিয়া উঠিল,  
“তুমি কি এখানে থেকে পালিয়ে যেতে চাও ?”

সুশীল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রাণে তাহার  
যেন নিবৃত্ত আশার আলো একটি ক্ষুদ্র দীপশলাকার  
সাজেই জলিয়া উঠিল। কে এ কথা বলিতেছে, তাহার  
কোন বিচারই সে না করিয়া, বন্ধীর কাছে কারাগৃহ-  
ত্যাগের প্রস্তাবের মতই তৎক্ষণাৎ উগ্র ব্যাকুলতার  
অধীর হইয়া উঠিয়া উত্তর করিল, “বাধার কি  
কোন উপায় আছে ?”

নীলিনার মনের মধ্যের শেষ কীর্ণ আশারশিটুকু  
এক ক্ষুণ্ণকারেই নিমেষে মধ্য নির্ঝাপিত ও অস্তর



তাহার বাহিরের মতই গাঢ় তমসাবৃত হইয়া গেল। কিন্তু তখনই সেই প্রচণ্ড বেদনার নিদাক্ষণ কষ্ট সংবরণ করিয়া লইয়া রুদ্ধপ্রায় স্বরে সে উত্তর করিল, —“আছে, খিড়কির দিকে এখন তো কেউ কোথাও নেই; লগ্নের এখনও তিন ঘণ্টা দেয়ীও আছে, সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে তোমার খোঁজ-খবর কেউ করবেও না। এই বেলা এই পথে চ’লে গিয়ে ২টার গাড়ীতে পশ্চিমের দিকের টিকিট নিয়ে,—তার পর কোথাও নেমে অনায়াসেই আবার বাড়ী কিরে যেতে পারবে।”

সুশীলের সমস্ত শরীর-মন যেন এই পরামর্শটুকু পাইবামাত্র আশ্বিনঠেকা তুবড়ীর মতন মুহূর্তে উৎসাহ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া আসিয়া নীলিমার কাছে দাঁড়াইল।

“তবে—তা হ’লে একগুই আমি চল্লম।”

বলিয়াই ঈষৎ তমোৎসাহে সন্ধিগ্ন স্বরে ধামিয়া ধামিয়া কহিল, “কিন্তু—”

নীলিমা ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল—“আর কিন্তু দেয়ী কমলে হবে না। কে কখন কোথা থেকে এস পড়তে পারে।”

সুশীল নিজের বিপর্যয়স্থা বুঝিয়া জোর করিয়া লজ্জা সংবরণ পূর্বক এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করিয়া গেল—“কিন্তু আমি চ’লে গেলে যদি তোমার বাবা আমার নামে নালিশ করেন?—যদি—যদি—”

নীলিমা কোনরূপ সংকোচমাত্র না করিয়াই সহজ স্বরে কহিল—“তুমি ত জানো,—তুমি নির্দোষ।”

সুশীল আন্তভাবে রুদ্ধ নিশ্বাস টানিয়া লইল—“সে তো আর আমি আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে পারবো না।—আর এ সকল কুৎসিত জিনিষ একবার বাইরে বেরিয়ে গেলে—উঃ! না, না, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! নাঃ,—আমার বাচবার উপায় নেই।”

এ পরিতাপে নীলিমার বুকে বজ্রহুচি বিদ্ধ হইল। সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে সেই কঠিন আঘাত-বাধা উপভোগ করিয়া তাহার পর আপনাকে দৃঢ় বলে দমন পূর্বক পূর্ববৎই স্থির স্বরে উত্তর করিল—“সে ভাবনার তোমার কোন মূল্যই নেই। আমি যদি অস্বীকার করি, আমার বাবা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারেন না। সব যখন আমার উপরই নির্ভর করছে, তখন অনর্থক এ বুধা চিন্তায় তুমি কেন সময় নষ্ট করতে লাগলে?”

ইহা শুনিয়া এইবার সুশীলের চলচ্চিত্তটা প্রশান্ত

হইয়া আসিল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস জোর করিয়া মোচনপূর্বক সে শান্তভাবে শুধু কহিল—“তবে চল”—বলিয়া সে সেই গাঢ় সূচিতে অন্ধকারে আগেই অগ্রসর হইল।

তখন নীলিমাও তাহার সঙ্গ লইল। কাছে আসিয়া যুদ্ধ স্বরে সে কহিল—“এসো, তোমার দোর খুলে দিয়ে আসি, অন্ধকারে হয় ত তুমি পথ ঠিক পাবে না।”

দুই জনে সেই অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া চলিল। দুই জনেই চিন্তাকুল—উভয়েই নীরব।

তড়িতের অচিরস্থায়ী শিখা মধ্যে মধ্যে তাহাদের পথ-চলার ষেটুকু সাহায্য করিতেছিল, নীচের তলার নানিতেই সেটুকু ফুরাইয়া আসিল। এই পরিতাপ্ত ভিতরমহলটা যখন অন্ধকার, তখনই ভাঙ্গাচোরা। একটা অন্ধভয় পৈঠায় পা বাধিয়া সুশীল পতনোন্মুখ হইয়াই অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। নীলিমা আপনার চিন্তাশ্রোতে ডুবিয়া এককণ নীরবেই ছিল; তাহার মনের মধ্যের তারে তখনও দুই বিভিন্ন সুরের রেখা বাকার দিয়া উঠিতেছিল। ব্যথার ও আনন্দের তাহার বন্ধে দুইটি তরঙ্গ সমতালে উঠা-নামা করিতেছিল। সুশীলের পদাঙ্গুলনশকে চকিত চঞ্চল হইয়া সে ত্বরিতে নিজের সেই অসীম ভাবনা-সমুদ্র হইতে হাবুডুবু খাওয়া চিত্তকে উদ্ধার করিয়া লইয়া ক্ষিপ্ৰচরণে তাহার নিকটবর্তী হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—“দেখবেন, প’ড়ে গিয়ে যেন সব মাটি করবেন না।—তার চেয়ে শূন্য আমার হাতটা ধরুন, আমার এখনকার সব জানা, ক’না,—আপনার এতে অনেকটা সুবিধা হবে।” সুশীলকে সে এবার “আপনি” বলিয়া কথা কহিল।

সুশীল নিরাপত্তিতে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তাহার মনেও ধরা পড়ার ভয় প্রচুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে নীলিমার হাতখানা বেশ দৃঢ় করিয়াই ধরিল। সুশীলের যদি নিজের বকের কম্পন তখন কম থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, নীলিমার সেই কন্দ-কঠিন হাতখানা কি শীতল, কি স্বর্ণাপ্লুত, কি কম্পিত।

অল্পদূর আসিয়াই নীলিমা আবার কথা কহিয়া বলিল—“জুতোর শব্দ হচ্ছে, দুটো খুলে আমার হাতে দিন।”

সুশীল তৎক্ষণাৎ জুতা খুলিয়া হাতে লইল, বলিল

—“তুমি জুতো বইবে! সে হয় না,—আমিই নিচ্ছি।”

নীলিমা আন্দাজে হাত বাড়াইয়া জুতা দুইটা ধরিল, মিনতি নহে, হুকুমের সুরেই বলিল,—“আমার দিন!”

সুশীলের মনে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি জাগিলেও সে আর তখন জুতা দিতে আপত্তিটুকুও করিতে পারিল না।

মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে আসিয়াই সুশীল সহসা বলিয়া উঠিল—“ঐ যাঃ! টাকা তো আনা হয় নি! কি হবে এখন?”

এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষটাকে এত বিলম্বে মনে হওয়ার নীলিমা মনে মনে দুই জনের উপরেই অত্যন্ত রাগ করিল! কণকাল চিন্তা করিয়া সে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল—“টাকা কি আপনার ব্যাগে আছে?”

সুশীল তখন নিজেকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেছিল। সে প্রায় হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—“সে আর আমি পেয়েছি! আমার কোটের পকেটে মনিব্যাগটা রেখেছিলুম; সকালবেলা সেই যে কারা—জানি না, আমার গা থেকে জোর করে সেটা খুলে নিলেন। কোথার আছে এখন বলবো কি করে? সব টাকা যে তাতেই ছিল।”

নীলিমার মনের তারে আশার রাগিণী বিপুল ঝঞ্ঝারে বাজিয়া উঠিল। মাথার উপর প্রবল ব্যুষ্টির ধারা ঝগ্ ঝগ্ নিনাদে যেন সেই সুরেরই তাল দিতে লাগিল। হরস্ত ঝড়ের হাওয়া ইহারই পোষকতা করিয়া তাহার কানের কাছে বলিতে লাগিল—“তবে আর উপায় কি? তোর কাজ তুই তো করিলি।”—আকাশের দীপ্ত বিছাতের শিখা নীলিমার চিত্তে আবার একটা লোভের আগুন ধরাইয়া দিল। সে নিশ্চল নীরব রহিল।

“নীলিমা!”

নীলিমা ভড়িতাহতের মতই দেহে-মনে চমকিয়া অস্থব করিল, সুশীলের হাত তাহার কাঁধের উপর। সে তাকে নাড়া দিয়া ঐ ব্যাকুল মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকিতেছে—“নীলিমা! নীলিমা! যাঁচো এসে আমার নৌকা ডুবে যাবে? আজকের মতন আমার অন্ততঃ দশটা টাকাও এনে দাও, গিয়েই আমি তোমার

ওটা পাঠিয়ে দেব। এত করলে যদি—সামান্য কাজটাও আমার জন্তে করো।”

নীলিমার গলা বুজিয়া শব্দ আর বাহির হইবার পথ পাইল না। সে কি একটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেটাকে আশারই বাণী বুঝিয়া সুশীল সেই ঝড়িকাতাড়িত ব্যুষ্টি-অধুষিত, ঘোরাঝুড়িকারমধ্যে অনাবৃত আকাশতলে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে উৎকণ্ঠা-উদ্বেল-বন্ধে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এ দিকে ব্যুষ্টির বেগ ক্রমশঃই যেন অসহনীর বোধ হইতেছিল। বারিপাত শব্দে ঝড়ের গর্জনে, কণে কণে বেগের কড় কড় নিনাদে, বজ্রাধির কণিকোড়বে নৈশ প্রকৃতি ভীষণতর ব্যুষ্টি ধারণ করিতেছিলেন। সুশীলের মনে হইল, দক্ষ-বজ্র বিনাশের স্বরং ক্রম আজ সংহারমুষ্টি ধারণ করিয়াছেন। অমনই চকিতে তাহার সতীর কথাও স্মরণ হইল। সেই পিতৃনির্ঘাতিতা সতীর মতনই যদি—

“এই নিন।”

“কৈ? কোথায়? পেয়েছ? আঃ! আমার কেবলই ভয় করছিল যে, হয় তো তুমি ধরা পড়ে যাবে। কত পেলো? দশই আছে! আচ্ছা এতেই চের হবে—ওঃ, তোমার কাছে আমি তিরদিনের মতই কেনা হয়ে রইলুম! এ উপকার আমি কখন ভুলতে পারবো না। তা হ’লে বাই? নীলিমা! জ্যোঠাই-মানে আমার সতীকি প্রণাম দিও—তিনি আমার বড্ড ভালবেসেছিলেন। আচ্ছা, বাই, তা হ’লে?”

জ্যোঠাইমাই শুধু ভালবাসিয়াছিলেন!—আর কি কেহই বাসে নাই?—হার নিষ্ঠুর!

সুশীল অগ্রসর হইল। সেই অবিরল জলধারা ঠেলিয়া, বাতাসের ঝাপটা ভেদ করিয়া, ঘনতমসাবৃত ধরণীর অদৃশ্য পথরেখায় দিশাহারা হইয়াও সে কোনমতে একটুখানি অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু আবার কি কথা তার মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাকে আর একবার ফিরিতে হইল।

“নীলিমা! আছ কি?—কই তুমি?”

বাতাসের হুকারে প্রথমতঃ সে ডাক নীলিমার কানে পৌঁছায় নাই। সে তখনও গতিহারা হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় আহ্বান কানে ঢুকিতেই বুক তাহার উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।



সুশীল তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

বিদ্যুতের আলোয় সুশীল দেখিল, নীলিমা ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া। সে তখন দ্রুতপদে তার কাছে আসিয়া অস্থির স্বরে কহিয়া উঠিল—“কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমায় পীড়ন ক’রে সাক্ষী দেওয়ান? তিনি জোর করলে তুমি কি তাঁকে বাধা দিতে পারবে?”

—হরি! হরি! এই তাহার এত বড় আত্মত্যাগের শেষ পুরস্কার! এই তাহার সর্বত্যাগের সমস্ত পরিণাম! এখনও সেই স্বার্থচিন্তা! সেই আত্মরক্ষার ক্ষুদ্রতম সতর্কতা! নীলিমার প্রাণের কোণেও এতটুকু একটু সহানুভূতি—করণা—কৃপা বিন্দুমাত্র—কণা-মাত্রও কি জাগে নাই!—নীলিমা এখনও তোমার কাছে—সেই তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম, হীনতম গরীবের মেরে? আর তাই-ই সে এতখানি দানের পরেও রহিয়া গেল? এই তাহার এ জন্মের চিরস্থায়ী পরিচয়? কোন মূল্যেই কি ইহার আর বিশ্বাস নাই? —পরিবর্তন নাই?

নীলিমাকে বাক্যহারী দেখিয়া সুশীল মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল।

“তা হ’লে কি হবে, নীল? তোমার উপরেই যে আমার সমস্ত নির্ভর করচে! তুমি নিজেকে তখন কঠিন রাখতে পারবে ত?”

নীলিমার একবার মনে হইল, উচ্চ চীৎকারে এই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টির উন্নত চীৎকার, অশ্রুনির কড় কড় নিনাদ এই সমস্তকেই ডুবাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির কর্ণপট্ট দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়া সে তাহার ফাটান বুকের রক্তঝরা আর্তনাদটাকে বাহির করিয়া দিয়া বলে—“ওগো নিষ্ঠুর! ওগো কঠিন! ওগো পাষণ! আর নয়,—আর নয়—সাজ কর,—সাজ কর, সাজ কর গো! তোমার এ ক্ষুদ্র স্বার্থের খেলা তুমি সাজ কর। তাহা না হ’লে হয় তো আমার মনের প্রাণপণে বাধা বীণার চড়ানো তার কাটিয়া খান খান হইয়া পড়িয়া যাইবে। হয় তো কোন সময় বলিয়া ফেলিব, ‘না, আমি পারিব না।’ আমিও মানুষ—রক্তমাংসে আমারও এই শরীর একদিন একই ঈশ্বরের হাতে গঠিত হইয়াছিল। বুক আমারও ঐ রকম অজস্র বাসনা-কামনার রাশি, বরং সকলই তাহার অতৃপ্ত ও অন্তর্ভুক্ত। লোভকে আমি জয় করিতেছি বলিয়াই

সে যে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে, সে ভরসাও আমার খুব বেশী নাই। হয় তো কোন সময় সে প্রবল প্রতাপে জাগিয়া উঠিয়া, আমার সকল ত্যাগের মূল কাটিয়া, চিন্তে আমার আসন পাতিয়া বসিবে। এই-বার তুমি যাও—আর কেন?—যাও, সুলেখার স্বর্ণমন্দিরের মরকত-আসনে তোমার বিরামশয়া তো দিস্ততই আছে। তবে আর কি? তবে আর বিলম্ব কি জন্য? কেন এ ফিরে আসা? হে পথিক! তোমার এই শ্রান্ত ক্লান্ত সংগ্রামপথের যাত্রা শেষ করিয়া ইহার লজ্জাক্ষিপ্ত হেয় স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া তুমি নিঃশেষেই ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে পারিবে।—তাই দিও!—হে অতিথি! অভাগার এই দৈন্তে পূর্ণ হৃদ্বিনের আতিথ্যকে হৃৎস্পন্দ বলিয়াই—যদি কখনও বা মনে পড়ে ত মন হইতে অদূরে ঠেলিয়া দিতে চিধা করিও না। তবে আর কেন? যাবেই যদি তো যাও!—এ সন্দেহ, ভয়, সংশয় কি তোমার শেষ হইবে না? না—এখনও লোভীকে—দ্রিষ্টকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? তা তোমার দোষ নাই! লোভ যে দারিদ্র্যের ধর্ম।

বৃষ্টির শিলাবতিন ধারা মাথার উপর মুহূর্ত্তঃ মুহূর্ত্তঃ কবিত্তেছিল, ভয়ানক শব্দে হুল, স্থল, আকাশ, পৃথিবী কাঁপাইয়া অদূরে বজ্রপাত হইল। কণকালের জন্ত তাহারই সহস্র বৈজাতিক আলোক-প্রবাহ সেই লণ্ডভণ্ড দীর্ণবিদীর্ণ বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর প্রকৃতির আর্তমূর্ত্তি সুপ্রকট করিয়া তুলিল। সুশীল সে আলোতে নীলিমাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহার মনটা যেন সহসা চমকাইয়া উঠিল। সে মুখ যেন মূঢ়াশ্রুতায় ভরা স্বর্ণলতারই মুখ।

“নীলিমা!”

“না না, ভয় নেই! আমি বলেছি! তবু কি বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না? যান যান, চ’লে যান। কেন বুঝা সময় নষ্ট করছেন? ট্রেন ফেল করলে হয়! আবার বিপদে পড়বেন। ওঃ না, না,—আর না,—এখনই যান,—এখনই যান।”—নীলিমা ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

এক মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই সুশীল আবার সেই দুর্যোগে ভরা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যাত্রাশ্রুত করিয়া মুক্তির নিখাস গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে বলিল—“বাক্, বাঁচা গেল।”

### একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয় হয়, আকাশ মেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, মেঘের গায়ে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল। সেই অন্ধকার আকাশে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অকুল সহকারে অকুল বলিলেন, “দিনটে আজ শুভদিনই বটে!—দিব্যা একটি পুরোমাত্রায় ঝড়-বৃষ্টি হ'বারই লক্ষণটা দেখছি।”

বিবাহে উপকরণ-সকলাদির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ, বিশেষতঃ বিবাহবিধির আগাগোড়াই অব্যবস্থার বিরক্তিতে পুরোহিতমহাশয় কতক-কর্তার এই অদ্ভুত মন্তব্যে শ্রম-গম্ভীর মুখে কহিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ, আপনার মেয়ের বিবাহে দেবতাহাই বর-যাত্রী হয়ে আসছেন দেখছি! মানুষকে ত আর নিমন্ত্রণ করা হ'ল না। অগত্যা!”

কথাটার মধ্যে বিজ্ঞাপন তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া অকুল ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। গম্ভীর মুখে ঝড় নাড়িয়া বলিলেন, “না হে, ঠাট্টা নয়! এই ঝড়-জল হওয়াটা বড়ই সুলক্ষণ! দেখ, আমি নেমন্তর করলেও এই কাল-বৈশাখী মাথায় নিয়ে কেউ কি আর আমার বাড়ী পেট টালতে আসত? ভাগ্যে ভাগ্যে আমি তেমন ধারা উষ্মাগটি করিনি, তাই, নইলে দেখতে দাঁড়িয়ে লোকসানটি হয়ে যেত।”

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্যন্ত আকাশে বাতাসে মিলিয়া যতই মাতামাতি করিল, অকুলের মনের ভিতর নিশ্চিততার শাস্তি ততই নিবিড়তর হইল। সারাদিনটা ধরিয়া তাঁহাকে যে স্ত্রীলের উপর নজরটি রাখিতে হইয়াছিল, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া শান্তচিত্তে কলিকাটা ঢালিয়া সাজিলেন এবং পরম আনন্দে উহা উপভোগ্যাক্তে সম্প্রদান-ঘরেরই এক পাশে একটা মাজুর বিছাইয়া একটুখানি আরাম করিতে শুইবামাত্র তাঁহার নাসিকা ঘোররবে গর্জনে কহিয়া উঠিল। অলক্ষণের মধ্যেই বিবাহবাড়ী বৃষ্টির সমতালের সহিত ঐক্যতানিক হইয়া উঠিল, দিকে দিকে নানা স্রবের নানাবিধ নাসিকা-ধ্বনি।

যখন বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত ও ঝড়ের দাপাদাপি ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন বিবাহলগ্নও উত্তীর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইল পুরোহিত বেনী ভট্টাচার্য্য। তিনি তখন চোখ

বগড়াইয়া, এক টিপ নশ্র লইয়া, প্রথমে শুধু গলার—তাহার পর গা ঠেলিয়া অকুলকে জাগাইলেন।

“কত! বলি কত! মেয়ের বিয়ে কি কাল সকালে দেবেন? রাত যে এ দিকে ভোর হয়ে গেল।”

চোখ মুছিতে মুছিতে অকুল তাড়াতাড়ি বর কনে আনিতে উপরতলায় ছুটিলেন।

কনে একখানি খাটো লাল ঢেলী পরিয়া, চতীর পুখি কোলে করিয়া সেইমাত্র পিড়ির উপর বসিয়াছে। স্বয়ম্বূজ পূর্বেই বেনী ভট্টাচার্য্যের বোন ও গৃহিনী তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি মেয়ে-সজ্জার মন দিয়াছেন। অকুলকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী মাথার কাপড় একটুখানি টানিয়া দিলেন, ভগিনী আধা-ঘোমটার মধ্য হইতে মুহূর্ত্তে কহিলেন, “বর তুমি নিয়ে যাও, কনেকে এই চন্দনটুকু পরিবে আর পায়ে একটু আলতা দিয়ে দিলেই সব হয়ে যায়।”

এই বলিয়া শ্যালানী স্বর্ণলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সোনা-রূপোর আঁচড় ত আর কোথাও পড়বে না?”

তাঁহার মৌন দৃষ্টিতে কোন ভাষা না পাইয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, “না হোক, ভাগ্যে থাকে ঢের পরবে—এই নে নীলি। এই ‘গো’টা (শুয়া) গালে দিয়ে রাখ। বামরঘরে বরকে কেটে খাওয়াতে হ'বে। বউ, দেখ তাই, চিতের কাঠি, ধুঁতরো, পীদিম, এ সব ঠিক আছে ত? তাল-চাবিটে দিস বাপু, ভুলিসনে যেন ওটা—মাঝের মতন বেরকে যেন চিরকালটা মুখ বন্ধ ক'রেই না বাটাতে হয়। এবার ওটা একটু বদল হোক।”

অকুল স্ত্রীলের অনুসন্ধান করিতে আর কোথায় বাকী রাখিলেন না। তাহার পরও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন তিনি অনেকক্ষণ যেন ইতি-কর্তব্যতা খুজিয়া পাইলেন না। এত বড় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে স্ত্রীলের মতন স্ত্রীল ছেলে এই মধ্যরাত্রে তাঁহার বাড়ী হইতে পলাইতে পারে, এ যেন সহজে বিশ্বাসই হয় না। আবার একবার এ ঘরটা সে ঘরটা খুঁজিয়া দেখিতে হইল। নাঃ, সে এ বাড়ীর কেনখানেই ত নাই! কখন গেল? তার চামড়ার ব্যাগ হুইটাই পড়িয়া আছে। তাহার বনিব্যাগ? নাঃ, সে-ও ত আজ সকালে শতাবধি মুদ্রা সমেত তাঁ'রই হস্তগত



হইয়াছিল, মেটা—হ্যাঁ, এই ত রহিয়াছে! তবে কি লইয়া গেল সে?

বিশ্বয়বিমুঢ়বৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকেই প্রশ্ন করিলেন, “সুশীল কোথা গেছে রে?”

নীলিমার ততক্ষণে আলতা-চন্দনের সাজ শেষ হইয়াছিল। তাহার সলিলার্জ কেশের রাশি হইতে তখনও জল ঝরিতেছে বলিয়া তাহা শুধু বাঁধা হয় নাই। আর সকলে কার্য্যান্তরে গিয়াছে, একা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পিছনে বসিয়া শুক বস্ত্রে সেই রাশিকরা ভিজা চুল ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া দিতেছিলেন। বাপের প্রাণে আসন্ন বিপদের ছায়ায় নীলিমার মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল, কিন্তু প্রথম বারের এই প্রশ্নটিকে এড়াইয়া গিয়া সে যথাপূর্ব্ব স্থিরভাবেই বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

তখন মুখ খিঁচাইয়া রোষতীব্র কণ্ঠে অমুকুল বলিয়া উঠিলেন, “আবার লজ্জা করা হচ্ছে! ঝাঁটা মার অমন লজ্জার মুখে! যা’ জিজ্ঞেস করচি, তা’র তো এখন সোজা জবাব দে, এর পর তখন স্বপ্ন-বাড়ী গিয়ে যত পারিস লজ্জা করিস!—বলি সেই নবাবপুত্রটি এমন সময় গেলেন কোথা? এ দিকে যে লম্ব-টম্ব সব ভস্ম হয়, তা’র খোঁজ আছে কিছু তোমাদের? আমিই না হয় একটু ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলুম। তোমরা তো আর মর নি, ডাকলেই তো হ’ত আমাকে। তা’ এখন তিনি গেলেন কোথা?”

নীলিমা মুখ তুলিয়া দ্রুতস্বরে বলিল, “চ’লে গেছেন।”—বলিয়াই এবার সে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল এবং তাহাতে দেখিল যে, স্বর্ণলতা এই সংবাদে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই কথাটি এমনই আকস্মিকভাবে শ্রুত হইল যে, অমুকুল প্রথমটা যেন তাহার মনঃপ্রাণে করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিশ্বয়বিহ্বলবৎ হাঁ করিয়া মেয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। নীলিমা সে দৃষ্টি অনুভব করিয়া মনের মধ্যে অস্বস্তি হইয়া উঠিল।

বিশ্বয়ের প্রথম বেগটা দমনে আসিলেও তাহার রেখ তখনও যেন ফুরায় নাই, তাই অমুকুলের বিশ্বয়ে শুরু কণ্ঠ হইতে যেন আপনা আপনিই স্ফুটিত হইয়া পড়িল, “চ’লে গেছেন! কোথায় গেলেন?”

নীলিমা আবার সুধীরে তার নত দৃষ্টি উত্তোলন

পূর্ব্বক মূহ অথচ পরিষ্কার স্বরেই প্রত্যুত্তর দিল,—  
“বাড়ী।”

এতক্ষণে অমুকুলের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। আহত শার্দূলের ত্রায় ক্রোধরক্ত নেত্রে তিনি নীলিমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হইল যেন, তাঁহার সেই আঙনের গোলায় মত চোখ দুইটা ঠিকুরাইয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া গিয়া এইবার নীলিমাকে বিদ্ধ করিবে। রোষগভীর তীব্র স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—  
“তার হাতে তো টাকা ছিল না, বাড়ী যাবার টাকা সে পেলে কোথায়? নিশ্চয় তা হ’লে তুই দিয়েছিস?”

তাঁহার সেই রোষকঠোর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়াই নীলিমা বলিল, “দিয়েছি।”

“আমার টাকা চুরি ক’রে তাকে দিয়েছিস?”

নীলিমা নীরবে চাহিয়া রহিল। অমুকুলের সিংহনাদ পদপ্রহারে সমস্ত ঘরখানা তখন অকস্মাৎ বন্ধ-বন্ধ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজে প্রচণ্ড ক্রোধে খর খর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“সয়তানি! বেইমানি! বা’র জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর! তোর ভাল করুতে গেলুম, আর তুই-ই কি না আমার এই করুলি? কি হ’ল তোর এ কাজ ক’রে? বল শীগগির, কিসের জন্তে তুই এত বড় আহাম্মুকি করুলি? বল শীগগির, বল!—না হ’লে আজ তোকে পাঁটা কাটা ক’রে আমি কেটেই ফেলবো। বল শীগগির বল—”

বাধের মত গর্জন করিতে করিতে মেয়ের ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাগি, চড়, কিল হুহাতে হুপায়ে অজস্র ধারে বর্ষণ করিতে করিতে অমুকুল এই কথা বলিতে লাগিলেন। নীলিমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও কহিল না। অথবা এ কার্য্যে তাহাকে বাধামাত্রও সে প্রদান করিল না। সম্পূর্ণই নিঃশব্দে রহিল। আর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও ঠিক সেই খানে ও সেই ভাবে গাষড়া হাতে কাঠের মতই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁরও এতটুকু প্রতিবাদের তরসা হইল না।

এ দিকে ক্রুদ্ধতর্জনে অমুকুল টোঁটাইতে লাগিলেন—  
“মুখে আজ তোর রক্ত তুলে তবে ছাড়বো!—এখনই তোর হয়েছে কি! মিশনরী ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে বিবি হয়েছেন! বরের সঙ্গে

লুকিয়ে লুকিয়ে কোটশিপ করছিলেন, জানতে পেরে আমি বিয়ে দিতে গেছি, এই আমার মস্ত অপরাধ হয়েছে, না? শেষে আমারই পয়সা ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে দিলি! অ্যা! কেন এ কাজ করলি? কেন করলি? এর মানে আমি যে এখনও বুঝতে পারচিনে! অ্যা!—বল রাফুসি! শীগগির ক'রে বল? কেন করলি?”

“ওগো! স্বর্ণদিদি যে মূর্খা গেছে, তোমরা ও করচো কি?” ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর সত্তর চীৎকারে অনুকূল তখন অর্দ্ধমৃত্যু নীলিমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

বেণী ভট্টাচার্য্য একটু কাসিয়া মাথাটাকে বারকতক কণ্ঠস্বর পূর্বক কহিলেন, “তা হ'লে চক্রবর্তী মশাই! এই রাত্রেই তো অল্প বয়স আমাদের খোঁজ করতে হবে। এ মেয়ের তো আর রাত পোয়ালে বিয়ে হ'বে না, আর আপনারও তা'তে জাত যাবে।”

মস্তব্য শুনিয়া অনুকূল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, “ও মেয়ের বিয়ে আবার দেবে কে, যে হবে? ও হারামজাদী মরুক গে, চুলোয় যাক্ গে, ওর কোন খবরে আর আমি নেই! এত বড় ছোটলোকের মেয়ে, আমার টাকা চুরি ক'রে ক'রে সেটাকে এত দিন ধ'রে খাইয়ে দাইয়ে আবার আমারই টাকা চুরি ক'রে কি না পালিয়ে যেতে দিলে! কলিকাল বটে!”

ভট্টাচার্য্য এক টিপ নস্ত লইয়া বিষমগতীরস্বরে কহিলেন, “সমাজ তো তা' শুনবে না, ভায়া! রাত পোহাবার পূর্বেই কতাসম্প্রদানটি কবুবার ব্যবস্থা হওয়া চাই-ই চাই। তা যদি আপনার সম্মতি থাকে, তা হ'লে বরং আমি বরের জোগাড়টা কোন রকমে ক'রে দিতেও পারি। আপনারই স্বঘর, আমার ভগ্নীর ভাসুর হন, সম্প্রতি জীবিরোগ হয়েছে।—এই আপনারই সমবয়সী হবেন আর কি। বিবাহে একান্তই ইচ্ছা আছে, কেবল পুত্র-কন্যা আর পুত্র-বধূদের ভয়েই পারেন নাই। তা' এ রকম অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি সানন্দে সম্মত হবেন এবং একটু কৌশল ক'রে আনিয়ে নিলেই ঘরের লোকেরাও কিছুই জানতে পারবে না। দেখুন, যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তা' হ'লে না হয় চেষ্টা করি, সময় সংক্ষেপ।”

অনুকূলের মনের মধ্যে ক্রোধের বহি তখনও উর্ধ্ব-নীর্ষে জ্বলিতেছিল এবং সে ক্রোধের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড

বিদ্বেষেরও তীব্র জ্বালা মিশ্রিত ছিল। তাই জাতি হারাইবার ভয়ে নয়, শুধু নীলিমাকে জব্দ করিবার লোভে তিনি এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎই সম্মত হইলেন। তাহার পর আর একটা কথা মনে পড়িতেই অননি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে ততক্ষণে স্বর্ণলতার দ্বতসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য-পরিবার তাঁহাকে বেড়িয়া বসিয়া, নানা আক্ষেপোক্তি শুনাইয়া, মড়ার উপর খাঁড়া চালাইতেছিলেন এবং নীলিমা নীরব নতমুখে মা'কে পাথর বাতাস করিতেছিল। তাহার মুখে মাথার-শূলা ও স্থানে স্থানে শোণিত-চক্ষু থাকিলেও তাহাকে ঝড়ের আকাশের মতই স্থির ও শুক দেখাই-তেছিল।

অনুকূল আসিয়াই এয়োদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা জ্বী-আচারের জোগাড়-যত্ন ক'রে রাখুন গিয়ে,—পুরুতদাদা বর নিয়ে এই এখনই এলেন ব'লে!”

মেয়েরা বিষমচমকিতভাবে ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন। বর কে? ইহা জানিবার আগ্রহ অবশ্য সকলেরই চিত্তে সমান থাকিলেও ভরসা করিয়া কেহ আর উ'ধাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে পারিলেন না।

সবাই উঠিয়া গেলে অনুকূল ডাকিলেন—নীলি।”

নীলিমা সুধীরে দৃষ্টি উঠাইয়া বাপের মুখে তাহা নিবন্ধ করিল। দৃষ্টিতে তাহার ভয় বা ভাবনা কিছুই ছিল না।

পিতা কহিলেন, “তোমার সামনে দু'টা রাস্তা প'ড়ে রয়েছে। এক, কাল সকালে সুশীলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করা—যে, সে তোমার সঙ্গে অবৈধ ব্যবহার ক'রে—তোমার বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে, অবশেষে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এ মোকদ্দমা হ'লে খুব সম্ভব ভূবনবাবু হয় তোমার বউ করবে, না হয় ঢের টাকা দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করবে।—বোধ করি শেষেরটারই বেশী সম্ভব। তার পর যদি সে বলে, তুমিই তা'কে যেতে দিয়েছ—তা' হ'লে তোমায় বলতে হবে যে, তোমায় মেয়ে ফেলবার ভয় দেখিয়ে তোমার হাত থেকে জোর ক'রে সে টাকাটা কেড়ে নিয়েছিল। কেনন, এতে রাজী আছ তো? এতে ঢের টাকা পাবে।



পাঁচ ছ' হাজারের কম তো নয়, 'চাই কি জোর করলে তখন হয় তো দশ হাজারও হ'তে পারে। —কেমন, রাজী আছ ?'

নীলিমা কণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল, —“না।”

অমরুপার মুখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, শ্বেতপত্রক কণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, “আর এক পথ,—এই যে, নিমাই ভট্টাচার্য—আমাদের ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতির বড় ভাই, তাঁকে বিয়ে করা। বর ওরা আনতে গেছে, —এখনই এলো ব'লে, কেমন ? তাতে, তুমি রাজী আছ ত ?—যেমন তোমার বরাত ! অমন সোনার চাঁদের মতন বর তোমার তো পছন্দ হলো না। বলছি, নালিশ ক'রে না হয় টাকাটাই নিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে চিরজন্মটা ব'সে কাটা, তা-ও তো গুণবিনে। তা' হ'লে আর আমি কি করবো বল ? মর এখন নিমাই ভট্টাচার্যকে বিয়ে ক'রে, তার শ্রাদ্ধ পিণ্ডি রেঁধে”—

নীলিমা অবিচলিত দৃষ্টিতে যথাপূর্বকই চাহিয়া রহিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্প হইল। সহসা রোগীর খাটখানা মচ, মচ, শব্দ করিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা উভয়েই একসঙ্গে সন্নিহনে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, তাঁর উপর সেই ভাসাধিক কালের অনড় রোগী তখন ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন।—ভাঁহার দুই বিস্ফারিত নেত্রে কেবল অকণা ভীতি।

অমরুপা সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই নিজ বক্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন—“কি বলিস ? নালিশ করবি ? আমি যা' যা' শিখিয়ে দেব, তুই শুধু সেই কথাগুলো ঠিক ক'রে ব'লে যাবি,—আর কিছুটাই তোকে করতে হবে না, —এইটুকু। দেখ,—এখনও বল, করবি ? নিমাই ভট্টাচার্যের বয়েস কত জানিস ?—ছাপ্পান বছর ! দেখ, আমার পরামর্শটা নে, তোরই তাতে ভাল হ'বে। দশ হাজার টাকা কি সোজা টাকা ! মনে ক'রে দেখ দেখি, তাতে তোর কতটা সুবিধা হবে ?’

নীলিমা নিঃশব্দে দৃঢ়পদে উঠিয়া মা'কে শয়ন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বাপের কথার জবাবও দিল না।

“কি বলিস, করবি ? কথা ক' !”

“না।”

এমন সময় ঘরের নিকট হইতে বেণী ভট্টাচার্য উৎসাহপ্রসূর মুখে ডাক দিয়া বলিলেন, “ওহে ভায়া ! বর এনেছি যে ! এখনই কনে নিয়ে চট ক'রে চ'লে এসে ছুটো মজ প'ড়ে খাও। জীআচার-টাচারের আর সময়ও নাই,—আর কি জানো, ওগুলো ঠিক শাস্ত্রীয়ও নয়,—না হ'লেও কিছু আসে যায় না। চট ক'রে চ'লে এস ভায়া, সকাল হ'তে আর বাকী নেই।”

এইবার সহসা বাকশক্তিহারা স্বর্ণলতা উর্ধ্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—“নীলা ! মা আমার ! বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যে পুণ্যটুকু তুমি সঞ্চয় করেছ, তা'র এই পুরস্কার—তোমার বাপ হয়ে উনি তোমার ভাল মতেই আজ দিচ্ছেন ! কিন্তু আমি বলছি,—তোমার মা হয়েও বলছি যে, তুই ব'রে যা—তুই ব'রে যা !—কোন দিনই বুক ভ'রে তোদের কোন কিছুই দিতে পারি নি, আজ এই অস্তিমকালের বুকভরা আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে গেলুম—কসাইয়ের হাতে বিক্রী হওয়ার চেয়ে মরণকে তুই বরণ কর। একজন উপরে নিশ্চয়ই আছেন—যিনি কার্যের ভিতর কারণ খুঁজে দেখেন। তিনি তোকে নিশ্চয়ই তার জন্তে কমা করবেন।—কিন্তু এ অত্যাচারের দণ্ড কিছুতেই মাথায় নিস নে, চিরকাল জলে মরবি।”

বাতাহত কদলীকাণ্ডের মত অকস্মাৎ ভাঁহার প্রাণহীন দেহ খাটের উপর হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

### ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পর্কতের কঠিন বক্ষ বিদারিত করিয়া স্রোতস্বিনীর ত্রিধারা যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন পর্কত যেমন কোনরূপ কঠোরতা দিয়াই তাহাকে রুদ্ধ রাখিতে পারে না, পরন্তু বাধা দিতে গেলেই সে ক্ষুদ্র ধারা শতগুণ ক্ষীতবক্ষে জলপ্রপাতের আকার ধারণ পূর্বক সেই প্রস্তরকারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীষণ গর্জনে ধরণীবক্ষে আছড়াইয়া পড়িয়া বিশালকায়্য নদীরূপ

ধারণ করে, সুশীলের অন্তরে নীলিমার স্মৃতি তেমনই যতই বাধা পাইতে লাগিল। ততই যেন তাহা বর্ষা-বারিপুষ্ট তটিনীর জায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তবে সে রাত্রে পশ্চিমের টিকিট কিনিয়া সে যখন একখানা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চাপিয়া বসিল, তখন তাহার শরীর-মনে কোন কিছুই চিন্তা করিবার মত সামর্থ্য ছিল না। তাই সে ভিজা সার্টটা খুলিয়া ফেলিয়া আর্দ্র-স্তন্য যথাসাধ্য নিংড়াইয়া পরিয়া একখানা গদিশূণ্য ধূলি-ধূসরিত বেঞ্চির উপর বাহুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং প্রায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা তেমনই নিদ্রাহীন, চিন্তাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিল। অপ্রত্যাশিত জটিল ও ভয়াবহ ঘটনাচক্রে আকস্মিক মৃত-প্রতিঘাত, তাহার উপর অমাহার, হুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও পরিশ্রম মিলিয়া তাহার সুখ-লালিত কোমল দেহ-মনকে যেন কেমন একটা সুগভীর ক্লান্তিতে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রবল উত্তেজনার পরেই বিষম অব-সাদের আক্রমণ অনিবার্য। সুশীলেরও সমুদয় অন্তরাঙ্গ তাহার দেহের সহিত সমভাবেই সেই একান্ত অব-সাদের মহাভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প-স্বল্প অশুভব করিতে পারিল সে \* \* \* ছাড়াইয়া। তখন ঝড়-বৃষ্টি ধারিয়া গিয়াছে—অথবা এত দূরপথে তাহার সে দিন দেখাও দেয় নাই। খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাইতেছিল; গভীর কালো আকাশের গায়ে উজ্জল তারকাগুলি শতনরী হীরকহারের মত ঝকঝক ঝলঝল করিতেছিল। মাঝে মাঝে কেন্দ্রব্রষ্ট এক একটা উজ্জ্বল অগ্নিগোলকের জ্বালা অন্ধকার ব্যোমপথ প্রদীপ্ত করিয়া দেবরোষাগ্নির রূপে ধরণীর পানে ছুটিয়া আসিতেছিল। মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্টি মেলিয়া সুশীল স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। নৈশ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধ স্পর্শে সুশীলের ক্লান্ত চক্ষু আবারও ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিল, নানিবার কথা তার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল না।

সকালবেলা সেই তন্দ্রাটুকু ভাঙিয়া গেলে সুশীল দেখিল, ট্রেনখানা \* \* \* পৌছিয়া থাকিয়াছে। রাত্রির নিবিড় অন্ধকার তখন দিবসের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। দুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া গত রজনীর সেই দুর্ঘোষময়ী প্রকৃতি এবং

দুর্ঘোষে পূর্ণ জীবনের স্মৃতি সহসা তাহার হৃৎস্পন্দ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তাহার পর একে ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহার বিশ্বয়বিকল চিত্তে উদ্ভিত হইতে লাগিল এবং ইহার বাঁধাধা নষ্টকর সাক্ষ্য প্রদান করিল—তাহার নিজের এই অনির্দিষ্ট পথের যাত্রা এবং কদমাক্ত মলিন জুতা-কাপড়! সজাগ হইয়া তাড়াহাড়ি সে ট্রেন ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। যে স্টেশনের টিকিট কেনা হইয়াছিল, সেখান হইতে সে আরও কয়েকটা স্টেশন বেশী আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার জন্ত দণ্ড দিতে হইবে। তাহার পর কলিকাতা ফিরিবার মত সম্বল তো তাহার হাতে থাকে না! সুশীলের মাথা টিপটিপ করিয়া উঠিল। কি বে-হিসাবী কাণ্ড করিয়া সে আবার একটা জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিল। একেই তো মাথার উপর সেই আসন্ন বিপদ তাহাকে অশনি প্রহারে উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহারই বীভৎস কুৎসিত মূর্তি স্মরণে আসিতেই সমুদয় হৃদয়-শোণিত তাহার শীতল হইয়া উঠিতেছিল, আবার এট একটা ছোট ব্যাপার লইয়া না জানি কত ভোগই বা তাহাকে ভুগিতে হয়! কোন্ডে ও লজ্জায় তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর তার উপায়ই বা কি? একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাকে অবলম্বন করিবার কথা মনে পড়িতেই সুশীলের সমুদয় মনুষ্যত্ব যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, তাহার এত বড় হীনতার কথাও ভাবিতে পারিল! এ কি তবে সেই হীন সংস্রবেরই ফল?

এই হীন সংস্রবের স্মরণে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া সুশীলের স্মৃতিপথে অজস্র বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। পিতার কথা, নিজের সুখময় স্মৃতিময় গৃহের কথা, বিপ্রদাস ও স্নেহার কথা। বিপ্রদাসের কথা মনে পড়িতেই তাহার আকপোল-কণ্ঠ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। স্বতঃই মনে মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা দেখা দিল অমুকুলের সঙ্গে। তখন তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে একটুখানি ঘৃণা ■ পরিতাপের মুহূর্ত্ত ফুটিয়া উঠিল। স্বপ্নভাগ্যটাই কি তাহার এই রকম! সেবারেও বেত্রাবাতে ইহার আরম্ভ। আর এবারে?—তাহার পর সে ভাবিল স্নেহথাকে। সেই নির্জন সাক্ষ্য অন্ধকারে নিতান্ত অবমানিত লাঞ্চিত বালকের লজ্জিত ভয়ার্ত্ত অন্তরে কোন ছদ্মবেশী দেববালার মতই তাহার আকস্মিক



আবির্ভাব! সে দিনের স্মৃতিকথা স্মৃশীলের হৃদয়ে উজ্জলতর সূবর্ণাকরে ক্ষোদিত হইয়া আছে, কালের ধূলিজাল তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সময়ের বিস্মৃতি-হস্ত তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিতে অপারগ। স্নেহে, শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে কণ্ঠকিত হইয়া সে নিজের সেই মানস-প্রতিমাকে মনের মধ্যে স্মরণ করিল। বিপ্রদাসের সকল কলঙ্ক ঐ অকলঙ্ক পূর্ণিমাচন্দ্রের অম্লান জ্যোতি-স্তরজে যে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। বিপ্রদাস নিষ্ঠুর, আর্থপর ও গর্ভাক্ষ হইলেও স্নেহে যে মূর্তিমতী দেবী!

স্মৃশীলের তরতরবেগে প্রবাহিত এই একটানা চিন্তাপ্রোতে সহসা একটা বিরুদ্ধ তরঙ্গ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া আঘাত করিল। সহসা স্নেহের সেই অনিন্দ্য জ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানাকে আড়াল করিয়া আর একটা পরিচিত—অতি পরিচিত মূর্তি অমনই স্পষ্টভাবেই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। স্মৃশীল সবিস্ময়ে দেখিল, সে মুখ সম্বন্ধকৃষ্ণিতা অপরাধিনী নীলিমার। কিন্তু কি আশ্চর্য! যেন আজ আর সেই পূর্বেকার ত্রুটি, ভীত, কুণ্ঠিত মূর্তি নহে, আজ ইহার কোথাও কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, এ যেন নিজের অধিকারবলে আজ দৃঢ়পদে স্থিত-মুখে আসিয়া তার মুখের সামনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। স্মৃশীল ইহার সমুজ্জল স্থিরদৃষ্টির আঘাতে যেন একটু অবস্থ হইয়া উঠিয়া দৃষ্টি নত করিয়া লইল। সহসা তার মনে হইল, যদি বিপ্রদাসের আচরণ স্নেহকে কলঙ্কিত না করে, তবে অমুকুলের পাপেই বা নীলিমা পাপী হইবে কেন? তখন স্মৃশীলের চিন্তে চিন্তাপ্রোত উন্টা হাওয়ার বিপরীত মুখেই বহিতে লাগিল। বিগত রাজির বিচিত্র ঘটনাটা এতক্ষণ তাহার আধ-জাগ্রত চিন্তে যেন বৈচিত্র্য-ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু এখন সেটা সকল স্মৃতিরোধকে স্পষ্ট করিয়া দিয়া ফুটতর হইয়া উঠিল এবং সেই অপূর্ণ ঘটনাজালের জটিল গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ঐ একটি মুখই তাহার মনের চোখে ভাস্বর হইয়া উঠিতে লাগিল। স্মৃশীলের এতক্ষণকার আত্মচিন্তার অতি সহসাই পরার্থপরতার অতি সমুজ্জল দৃষ্টান্তটা অধিকার করিয়া লইল। তখন বিস্ময়ে অভিভূত প্রায় হইয়া গিয়া তাহার মনে পড়িল যে, নীলিমা কাল নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করিয়াই তাহাকে এই মুক্তিদান করিয়াছে।

স্মৃশীল স্মৃশীল একটা নিশ্বাস সজোরে টানিয়া ফেলিল। যে কথাটা অতর্কিত বিপদের পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া তাহার একবারও মনে পড়িতে পার নাই, এখন এই নিরালস্য একা বসিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতে গিয়া তাহাই তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইল। তাহা নীলিমার বিপর্যাসের আশঙ্কা। স্মৃশীলের চিন্তে কেমন একটা প্রাণের মতই কি একটা জিনিস যেন তাহার মনটাকে এই বলিয়া পীড়িত করিতে লাগিল যে, তুমি তো বাঁচিলে, এখন সেই হতভাগীর কি দশা তাহার বাপে করিবে, তাহার কি কিছু ঠিকানা আছে? সেই যে স্মৃশীলের পলায়নের সহায় হইয়াছিল, এ কথা জানিতে পারিলে, চাই কি মেয়েকে সে রাক্ষসটা খুনও তো করিতে পারে!

এ চিন্তায় স্মৃশীলের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে সবই পারে—যদি তাই হয়, সত্যই যদি স্মৃশীলকে বাঁচাইতে গিয়া নীলিমাকে প্রাণ দিতে হয়? —ওঃ! কেন সে এই কথাটা কাল রাতে একবারটিও ভাবিয়া দেখিল না? কি নিশ্চিত মনেই চলিয়া আসিল। উঃ, বড় অজ্ঞান হইয়াছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ক্ষুদ্র ট্রেনের ক্ষুদ্র প্ল্যাটফর্মের একটা ধারে হইয়া বসিয়া বসিয়া স্মৃশীল এই রকম কত কি আকাশপাতাল ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সকল পরস্পরবিরোধী চিন্তায় সে কোথাও যেন কূল খুঁজিয়া পাইল না। নীলিমার অদৃষ্টে এতক্ষণ না জানি কি হইয়াছে! ভাবিয়া মন তাহার ব্যাকুলতার অধীর হইয়া উঠিতেছিল—এমন কি, নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া পুনশ্চ সেখানে ফিরিয়া গিয়া অমুকুল-প্রদত্ত অত্যাচারের অংশগ্রহণে এই কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের কথাও এক একবার তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ নিজের মারাত্মকে বড় সহজে তো কাটাতে পারে না। এই চিন্তায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত ভাবের তরঙ্গ চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া যুক্তি দেখাইল যে, নিশ্চয়ই নীলিমা তাহার সাহায্য করার কথা স্বীকার করে নাই এবং তাহাকে এ ক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার তো কথাও নহে। অতএব এই বৃথা আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই চিন্তায় গুরুভারাত্মক হৃদয় অনেকখানি যেন লবু হইলেও একটা ক্ষুদ্র অঞ্চ অতি তীব্র অমৃত্যুপের বেদনা স্মৃশীলকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়াই রাখিল এবং নীলিমার নিকট হইতে সে আগাগোড়াই

যে নির্বাক ও নিঃস্বার্থ সেবা-বস্তুলা পাইয়াছে, তাহার সেবাকুশলতার, স্বার্থশূন্যতার, কর্তৃশক্তির, ধৈর্যের যে সকল পরিচয় সে এ যাবৎ পাইয়া আসিয়াছে, আর তাহার উপর সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া নিজেকে কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরেই এই যে এত বড় বলিদানটা সে করিল, এই সকল একত্র মিলিত হইয়া তাহার কৃতজ্ঞ হৃদয়কে তাহার প্রতি মেহে, শ্রদ্ধায় এবং হয় তো তদপেক্ষাও সমধিক বেগবানু আরও কোন কিছুতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। স্নেহের উজ্জল মূর্তি ইহার পাশে আজ যেন একটুখানি নিম্নতর হইয়া উঠিয়াছিল। তার মনে হইল, যদি এই স্নেহকে তার বাপ বহু পূর্বাধিই ষাণ্ডস্তা বধূরূপে নির্বাচন করিয়া না রাখিতেন, তবে হয় তো তার পক্ষে ভালই হইত। নীলিমার প্রতি তাহাকে এরূপ অস্বাভাবিক নির্মমতা প্রদর্শন করিয়া আসিবার প্রয়োজন হইত না। মনটা তার নিতান্তই ব্যথিত হইয়া উঠিল।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিতে স্নানান্তের প্রায় সপ্তাহকাল বিলম্ব ঘটিল। এই দিন সাতকের ইতিহাসটা মোটামুটি এই রকম,—

সে দিন \* \* \* ষ্টেশনের পার্টফরমে খার্ড ক্লাস-যাত্রীরা সকলেই চলিয়া গেল। বহুবিলম্বিত ছ'তিনখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন গভীরতায় করিল, কিন্তু স্নানান্ত ঠিক সেই একরকমই গভীর চিন্তাতারাতুর আচ্ছন্ন অভিভূতবৎ বসিয়াই রহিল। উঠিল না, নড়িল না বা সে সম্বন্ধীয় কোন চিন্তাও হয় তো তখন তাহার মনের মধ্য হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর রক্ত বৈশাখের খরতপ্ত রোদ্ভ লইয়া ঘর্মাক্ত শরীরে শুষ্ক কণ্ঠে আর কর্তব্যবিমূঢ় চিন্তা লইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল।

ষ্টেশনমাষ্টার নিজের কর্তব্য সমাধা করিয়া নিকটবর্তী বাসাবাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের যাইতেছিলেন, দৃষ্টি স্নানান্তের প্রতি বদ্ধ হইল। তাহার কর্ণমাত্র চট্জুতা, তাহার কাদামাখা ধূতি-পিরী, গুরু ও বিপর্যস্ত বেশ, ■ সকলে দেখিবার

কিছুই ছিল না, ছিল শুধু তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে বাঁধা হৃদয়ে স্তায় শুষ্ক কয়েকটি দুর্কাদল। বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে হে তুমি? সেই ভোর থেকে ব'সে আছ? যাবে কোথায়?”

স্নানান্ত এই অতর্কিত সম্বোধনে চকিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া উত্তর করিল, “কলকাতা।”

“কলকাতা যাবে? তবে ঐ ২টার প্যাসেঞ্জারটার গেলে না কেন? ওটার চাইতে সুবিধার ট্রেন তো আর একটাও নেই।”

স্নানান্ত শুষ্কমুখে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কৌতূহল বাধা মানিল না। সহসা তিনি স্নানান্তের সেই স্তম্ভিত হাতটার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশপূর্বক সঙ্কোচকে প্রসন্ন করিয়া উঠিলেন, “তোমার হাতে বিয়ের স্তম্ভ বাঁধা দেখছি, কিন্তু”—বাক্যের পাদপূরণ করিলেন অদৃশ্য বধুর স্মৃতিস্মরণে চেষ্টায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্বক।—তাহার পর স্নানান্তের জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্গে বউ তো কে দেখাছিনে?”

স্নানান্তের শ্রান্তিমলিন মুখ এই কথার লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, সে নিরুত্তরে শুষ্ক হইয়া রহিল। তা' দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সহসা সন্দেহ হইল যে, হয় তো লোকটা পাগল, মা-বাপ ছেলের পাগলত্ব গোপন করিয়া কোন নিরীহ বালিকার স্বপ্নে ইহাকে চাপাইতে-ছিল, কিন্তু তাহার ভাবের জোর থাকার ভগবানু ইহার মাথার পলাইয়া আসার খেয়াল চাপাইয়া দিয়া থাকি-বেন।—এই কথাটা মনে হওয়ার তাহার মনটা একটুখানি প্রশস্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি কোমল স্বরে স্নানান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু খেয়েছ?”

আবার একটা দ্রবিত রক্তোচ্ছ্বাস তড়িৎবেগে স্নানান্তের কর্ণ, কপোল ও কর্ণমূল রক্তিম করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ কি ভাবিয়া সে-ও যেন আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল—“না।”

“খাবি কিছু?”

স্নানান্ত এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া মাথা হেলাইল।—খাইবে।

বাস্তবিকই তখন তাহার জঠরানল যেরূপ প্রচণ্ড-বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার অপেক্ষাও তুচ্ছভাবে



কেহ তাহাকে এ প্রস্তাব জানাইলে তাহাতেও হয় তো সে নিমন্ত্ৰণ গ্রহণে সে দ্বিধা করিত না।

“আর তবে আমার সঙ্গে আর”—বলিয়া ষ্টেশন-মাস্টার তাঁহার সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং সুশীলও অসঙ্কোচে তাঁহার সঙ্গে লইল। তিনি যে উহাকে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া সে অনেকখানি আশ্বস্ত এবং একটা বেশ কোতুক বোধও করিতেছিল। পথে সে হাতের দুটা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। খুলিবার ও ফেলিবার সময় আর একবার নীলিমার মুখখানা তাহার মনের আকাশে তড়িৎস্পর্শের মতই চকিতে উঠিয়া মিলাইয়া গেল। অন্তরের মধ্য হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠিত হইয়া আসিল।—আহা বেচারী!

ষ্টেশন-মাস্টারের গৃহে আসিয়া আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এত বেলায় এক পূর্ণবয়স্ক অতিথি সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ষ্টেশন-মাস্টারগৃহিণী স্বামীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাগের মাধ্যম যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া অবশেষে উঁচু গলায় শেব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “এনেছ সখ ক’রে, নিজের ভাত-গুলো ধ’রে দিয়ে এক খালা ছাই বেড়ে এনে দিচ্ছি, তাই খাওসে।”

স্বামীটি বিনতির সুরে অনেক মিনতি শুতি করিতে লাগিলেন, বাহিরে থাকিয়া সে-সকলের ভাবাগত অর্থবোধ না হইলেও তাহার ভাবার্থ বুঝিতে সুশীলের পক্ষে বাধা ঘটিল নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটা লক্ষ অকস্মাৎ তাহার কানে আসিয়া বাজিতে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও সেই সঙ্গেই মনে মনে ইহাতে অপরিমিত কোতুকও বোধ করিল। সে শুনিতে পাইল, ষ্টেশন-মাস্টারটি তাঁহার কুপিতা প্রিয়ার মনস্তত্ত্বের মীমাংসা কথার মাঝখানে বলিয়া বসিলেন, “ওকে কি আর শুধুই এনেছি? তুমি যে সে দিন এক জন রাধুনীর খোজ করতে বলেছিলে না, তারই জন্তেই না এনেছি।”

এ কথায় গৃহিণী সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া উঠিলেন, “আহা, তাই বল! তা এতক্ষণ বলনি কেন ছাই? আচ্ছা, নাও, এখন মুখহাত ধুয়ে খেতে বসো, ওলো বিমল! নে, চট্ ক’রে, তোর বাবাকে একটা ঠাই ক’রে,—বলি গেলে কোথা? আছ না?”

“যাই না,” বলিয়া একটি বছর তেরোর মেয়ে

আধখোলা রুম চুলের বেণী ছলাইয়া ছুটিয়া আসিল। সে তখন পাড়ার ছটি হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কড়ি খেলিতে ব্যস্ত ছিল। যা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “খেড়ে মেয়ের দিনরাত কেবল কড়ি-খেলা। যা, শীগগির ঠাই ক’রে দিয়ে, একখানা খাল ধুয়ে দে দেখি—ভাতটা বেড়ে ফেলি। হ্যাঁগা! তোমার ঐ রাধুনীটাকে ছটা ছাতুটাতু দিলে এ বেলাটা আর চলবে না? ভাত তো আর রাখা হয় নি ওর জন্তে।”

সুশীলের মনটা একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ছাতু! সে কেমন লাগিবে? তাহার পরই সে মনটাকে সহজ করিয়া লইল। তাই বা মন্দ কি? বরং সেটাই তাহার এই রাধুনী-জীবনের সহিত অধিকতরই খাপ খাইবে। ছাতু খাইবার জন্তই সে মনে মনে প্রস্তুত হইয়া উৎসুক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, ছাতু ছাড়িয়া আস্ত ঘোড়ার দানা পাইলেও সে এখন খাইতে পারে। ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণার কষ্ট ক্রমেই তাহার পক্ষে অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল।

যা হউক, অবশেষে একমুঠা হাঁড়িটাটা ভাতের সঙ্গে চারিটি ছাতু, একটু গুড় ও এক ঘটা ঠাণ্ডা জল সে খাইতে পাইল। সেই ‘বিমল’-নামধারিণী অনুচ্চ কন্ঠাট এই সকল ভোজ্য বস্তু তাহাকে আনিয়া দিয়া আদেশ করিয়া গেল, “খেয়ে উঠে বেশ ক’রে গোবর দিয়ে ‘খুটা’ মুক্ত করো, আর বাসন-মাজা মোংরা হয় না দেখ! তা হ’লে ‘দোহরায়কে’ মলতে হবে।”

গোবরে হাত দিতে অত্যন্ত ঘণা বোধ করিলেও আলগোছভাবে কোনমতে সুশীল সে আদেশও পালন করিল।

ষ্টেশন-মাস্টারের ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে মোটে দুখানি ঘর। একখানি কর্তার শয়নগৃহ, অপরখানি প্রয়োজন-মত বাহিরের ঘর হয়, আবার রাত্রে ছেলেমেয়েদেরও কেহ কেহ সে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে। ইহারই এক প্রান্তে খালি মেজের উপর হাতে মাথা দিয়া সুশীল শুইয়া পড়িল এবং তাহার এই সম্পূর্ণ নুতন কোতুকপ্রদ অবস্থার কথা সকোতুকে মনে করিতে করিতে অতি সত্বরই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বিছাইবার জন্ত একটা মাদুর চাহিয়া পাঠাইতে উত্তর পাইয়াছিল যে, রাধুনী মানুষের আবার বিছানার কি

দরকার? নবাবের বেটা তো আর এ বাড়ীতে রাঁধিতে আসে নাই!

সন্ধ্যার পরে যখন সুনীলের ঘুম ভাঙিল, সে তখনই অনুভব করিল, বাড়ীর মধ্যে খুব একটা সোরগোল চলিতেছিল। একটুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারা গেল যে, সেটা তাহারই উদ্দেশ্যে। গৃহিণী গৃহান্তর হইতে সপ্তমে গলা চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, “ও মা! এ কেমন রাঁধুনী নিয়ে এল গো! এ যে দেখি কুস্কর্ণের পিস্তুলতো তাই! এর কানের কাছে ঢাক পিটোলেও সাড়া দেয় না যে! মিন্বে ম’রে গেল না কি? ওলো ও বিমল! এক ঘটা জল এনে ছোঁড়াটার মাথায় ঢেলে দে তো দেখি, জাগে কি না জাগে! এ সব ভিটকিলিম্বী আমার ঢের ঢের দেখা আছে।”

এই মন্তব্য কানে ঢুকিতেই ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া সুনীল তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার চারি পাশে জমা হওয়া একপাল ছেলেমেয়ে হোঁ হোঁ শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং জলের ঘটা হাতে সন্ত-প্রবিন্টা বিমলা এই আকস্মিক রম্যভঙ্গ সন্ধান তীক্ষ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, “না যে অত চোঁচিয়ে মরছিল, নিশ্চয়ই তুমি তা হ’লে ‘বল্ল’ ক’রে প’ড়ে-ছিলে? ‘বুটো’কে আমার জল ভোলালে? ভারি বদ-মানুষ তো তুমি দেখতে পাই।”

সুনীল প্রথমে বিরক্তি-সূচক ক্রকুটি করিল, পরে স্মিতমুখে এই অপবাদকেও শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সে রাঁধিতে বসিয়া। প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, রান্না আর এমন শক্ত কাজ কি? যখন অবস্থা এই রকমই ঘটিল, তখন আর কি করা যাইবে? দু’দিন রাঁধিয়া দু’টাকা পাইলে তাহার বাড়ী ফিরিবার একটু সুবিধা হইবে তো। কিন্তু কাজটাকে বাহিরে থাকিয়া বতটা সহজ দেখায়, কাগ্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখা গেল সেটা আদৌ সে রকমই নহে। সর্ব্বের চাইতে অসুবিধা ঘটিল ভাত রাঁধা লইয়া। ভাত সিদ্ধ করিতে কি আন্দাজ জগ চলিতে হয়, সুনীলের সে বিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা নাই। সিদ্ধ হইল কি না, বুঝি-বারই বা উপায় কোথায়? তাহার পর কেন গড়ান? সে যে এক বিষম বিপদ! অশেষ চেষ্টার পর সে যখন পাকপিওবৎ-ভাতের হাঁড়িটা জলন্ত চুল্লী হইতে কোনমতে ভুনে নামাইল, তখন পোড়া

ভাতের গন্ধে পাড়া মাতিয়া উঠিয়াছে এবং হাঁড়ি উটাইবার ব্যথা শ্রম তাহার যে উপায়ে বাঁচিয়া গেল, তাহার ফলে তাহাকে চির-অনভ্যস্ত এতই কঠিন কথা শুনিতে হইল যে, ধৈর্য্য রাখা তাহার পক্ষেও দায় হইয়া উঠিল। সেই চোঁচির হওয়া ভাতের হাঁড়ি, গরম ফেনের স্রোত এবং পোড়াভাতের দুর্গন্ধের মধ্যে হেঁটমুখে লজ্জাক্ষুণ্ণ চিত্তে বসিয়া সুনীল তাহার নুতন অবস্থার সকল কৌতুক-প্রলোভন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া লইল! না, নিশ্চয়ই তাহাকে উপরাস্তর খুঁজিতে হইবে!

ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে নিজের নির্দিষ্ট কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন, সুনীল গিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইল।

“কি রে? রান্না শেষ হয়েছে? খেতে ডাক্তে এলি না কি?” বলিয়া কৌতুকস্মিতমুখ ভদ্রলোকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সুনীল বিষম হাসি হাসিল। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, “আজ্ঞে, যাপ করবেন, রান্না আমি করতে পারলেম না।”

“জ্যা। পারলি নে? কেন রে?—ওরা দেখিয়ে শুনিবে দেয়নি বুঝি? দুটো দিন দেখে নিলেই খাশা শিখে নিবি। বকুনি খেয়ে পালিয়ে এসেছিস্ বুঝি? তা দেখ্, আমার বাড়ীর ভিতরের ওরা একটু বকতে ভালবাসে, তা বকলেই বা? বকুনি খেলে তো আর কারু গায়ে কোথা পড়ে না—কি বলিস্? এই দেখ না কেন, আমাকেই তো সে কত বকে। আমি চুপটি ক’রে শুনে যাই, কথাটি কই নে’। কি আর করবে? বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে নিজেই তখন খামে। তুইও ঠিক তাই করবি। বুঝলি? আর, আমি দেখে আসছি, কি হয়েছে। আর, আমার সঙ্গে আর।”

সুনীলের আশ্রয়হীন চিত্ত এই সরল নিরীহ লোকটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করিল। সে তাহার পক্ষে সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বুঝিয়াও তাই আর ‘না’ বলিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মনিব-ভৃত্যের সংকারটা যে কিরূপ সাদরে ও সাড়সরে হইল, তাহা অমুমের মাত্র।

প্রভাতে নিদ্রোখিত হইয়া সুনীলের মনটা অস্বস্ত প্রথমেই নিরানন্দে ভরিয়া উঠিল। আবার সারাদিন সেই হীনতার ছায়াবেশে হীনাত্মন করিয়া তাহাকে



কাটাইতে হইবে! নিজের প্রতি ইহাতে একান্ত বিরক্তি ধরিল। একবার মনে হইল, দূর হউক, বাড়ীতে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাইবার আয়োজন তার দিই। আবার মনটা কেমন গুটাইয়া আসিল। বাড়ীতে এতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে যে কি কথাই না রটিয়াছে, কি সংবাদই না পৌঁছিয়াছে, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? সে সব খবর সঠিক না জানিয়াই সে তুচ্ছ করটা টাকার সহসা সেখানে হাত পাতিতে যাইবে না। যদি অনুরূপ তাহার বাপকে সেই তাহার হের চক্রান্তের হীনতম কথা সত্য সত্যই লিখিয়া থাকে? ওঃ ভগবান! সে-তাহা হইলে তাঁহাকে আর মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? আর এ কথা শুনিবার পরে তিনিই কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন?

সুশীলের বুকের মধ্যে দারুণ অশান্তি তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি পিতা সে সব কথা বিশ্বাস করিয়া লয়েন? যদি তিনি সুশীলকে দোষী মনে করেন? যদি তাহাকে আর কখন ক্ষমা না করেন? তবে সেই বা বাঁচিবে কিরূপে? পিতা যে তাহার চিরজীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আদর্শ। পিতা যে তাহার শুধু পিতা নহেন, একাধারে পিতামাতা দুই-ই। যদি এত বড় কঠিন আঘাতে সেই অগাধ পিতৃ-স্নেহ তাহার বিপর্যস্ত হইয়া উঠে? সুশীল সে ক্ষতি তো সহিতে পারিবে না। বাড়ী ফিরিতে ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ফিরিবার অগ্রহও তাহার যেন সীমাহারা হইয়া উঠিতে লাগিল। অথচ ফিরিবারই বা উপায় কোথায়? ফিরিবেই বা সে কেমন করিয়া?

এই আশঙ্কা-উদ্বেলিত, হুশিয়ার-পীড়িত, উত্তেজিত শরীর-মন লইয়া কোনমতে দুইটা দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিবসারম্ভে শরীর-মন দুই-ই সুশীলের যেন তাহার নিজের বিরুদ্ধেই বিষম বিদ্রোহ করিয়া বসিল। এই অনভ্যস্ত অক্ষম দাসের বন্ধন তাহার যেন অসহনীয় বলিয়া মনে হইল এবং তাহার সঙ্গে মনে পড়িল যে, এই ক্ষুদ্র কার্যের ক্ষুদ্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতে গেলে তাহার পক্ষে কত দিনই যে এই দুঃস্থতা ভোগ অনিবার্য হইবে, তাহাও তো বলা যায় না। মনটা যেন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে একটু কৌতুকবোধও এই চাকরী-স্বীকারের মধ্যে অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সেটুকু দিনে দিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ

আর কোনমতেই তাহার গৃহাভিমুখী চিত্তকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। একবার মরিয়া হইয়া মনে করিল, বিনা টিকিটেই না চলিয়া যাই—কিন্তু অন্যায় কার্যের অনভ্যস্ততার বিবেক ইহাতে কিছুতেই সাহায্য দিতে পারিল না।

বিমলা আসিয়া তীক্ষ্ণ কর্ণে বলিল—“এই পাগলা! হাঁ ক’রে ব’সে ব’সে ধ্যান করছিস্ কি? রান্না কখন চড়বে তনি? তোর মত সবারই ভোঁ আঁর হাওয়া খেয়ে পেট ভরবে না? ভাল এক খাণ্ডা এসে জুটেছে বাপু!”

সুশীল অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সবিস্ময়ে সে মনে মনে কহিল—“এই সব মেয়ে ভদ্রসংসারেরই, পড়িবেও কোন ভদ্রঘরে; কিন্তু ইহাদের কোনরূপ শিক্ষাসহবতের কোন আলাই নাই।—ইহার তুলনার নীলিমা কত ভাল। অথচ ইহার বাপ তাহার বাপের চাইতে অনেক ভদ্র।”

তখন তাহার মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণলতাকে। আহা, নিরীহ বেচারী! সুশীলের বুকেটা ব্যথার টন-টন করিয়া উঠিল। কত মহৎ মন তাঁহার। নীলিমা মায়ের সেই মহত্বের অংশ কি না পাইতে পারে! নীলিমার মহত্বের কথায় নিজের অহুদারতা স্মরণে মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সুশীলকে নিরন্তর দেখিয়া বিমলা বিষম রাগিয়া গেল। ক্রুদ্ধ তর্জনে মুখ খিঁচাইয়া বলিল, “বলি, কানে কথা যাচ্ছে?—শীগগির ওঠ, বলছি। না হ’লে ছিপটা মেরে তুলবো।”

সুশীল ক্ষুণ্ণ স্বরে জবাব দিল,—“আজ আমার ভাল লাগছে না, আজ আর আমি রাঁধবো না।”

বিমলার মুখ ক্রোধে পুরুষ হইয়া উঠিল, “কি আদ্যার গো!—ম’রে যাই আর কি! রাঁধবেন না!—ওঁর ভাল লাগছে না! লাট সাহেব এসেছেন!—আম্পর্ক! তো বড় কম নয়!—মা! ও মা! শুন্তে পাচ্ছো—তোমার আত্ম-গোপাল আজ রাঁধতে পারবেন না, তাঁর মন ভাল নেই।”

গৃহান্তর হইতে গৃহিণীর ক্রোধ-গম্ভীর কর্ণের সাদা আসিল,—“যাচ্ছি কি না চালা কাঁঠ নিয়ে, মন ভাল ক’রে দিবে আসছি। হতচ্ছাড়া ছোড়ার সকলই বায়নাকা।”

রাত্রি ৯টার মধ্যেই এ বাড়ীর রান্না-খাওয়া চুকিয়া যায়। ডাউন প্যাসেজার প্রায় মধ্য-রাতে এখানকার

ট্রেন ছাড়ে। আহা! সমাধা করিয়া আসিয়া ট্রেন-মাষ্টার নিজাববুদ্ধিত নেত্রে টেবলের সামনে বসিয়া চুলিতেছিলেন। ■ মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ ঘটিকা-বস্ত্রের প্রতি চকিত কটাক্ষ স্বতঃই পতিত হইতেছিল। সুনীল আসিয়া বিজড়িতভাবে এক পাশে দাঁড়াইল।

“কি রে? এত রাতে কি করতে এলি?”—বলিয়া নন্দবাবু সম্মুখস্থে তাহাকে সম্বোধন করিলেন। তাহার বিষয় মুখের দিকে চাহিতেই মনটা যেন তাঁহার করুণামতিত হইয়া গেল। এই নিরাশ্রয় তরুণ ও সুন্দর ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে যে তিনি একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশেষ অজ্ঞাত ছিল না। আজ যে একটা বড় রকম আপ-টা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ইহাও তাঁহাকে জানিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনিই তো গৃহিণীর উপর শত্রুতা-সাধনের বদ মতলবেই এটাকে জুটাইয়াছেন।

সুনীল আজ সকল দিককে পরাস্ত করিয়া স্থিরসঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল। সঙ্কোচে কণ্ঠ তাহার রোধ করিতে চাহিলেও সেই নিবেদনটা তেলিয়া ফেলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল,—“আমার আপনি দেখছেন, আমি ঠিক তা নই।—আমার নাম সুনীল-কুমার রায়, আমার বাপ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় অবস্থাপন্ন লোক, দৈববিড়ম্বনার আমার এ রকম বিপন্ন হ’তে হয়েছে। আপনি যদি আমার ৭টি টাকা কর্জ দেন,—আমি বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে পৌঁছেই আপনার টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো।”

নন্দবাবু বিস্মিতনেত্রে সুনীলের গভীরভাবে উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কণ্ঠে অধঃস্রব যে সত্যের সুর বহিয়া দিয়াছিল, তাহার মুখ-চোখের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের মধ্য হইতে সহজ সত্যের যে অমিশ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে নিতান্ত অন্ধ ব্যতীত আর কেহই যে অবিশ্বাস করিতে অপারগ।

উত্তেজনারস্রবমুখে আগ্রহবাক্যকলকণ্ঠে সুনীল পুনশ্চ কহিল, “পারবেন কি বিশ্বাস করতে? আমি ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তুম, আমার আমি কি জানি? এক মাস আপনার বাড়ী রাঁধতে পারলেও হয় তো ঐ সাত টাকা আমার হবে না, আর আমি তা পারবোও না, অত দেরী করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবাকে এ সব কথা জানাতে ইচ্ছা করি না, না হলে—”

সুনীলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। উদ্বেলিত লজ্জা অভিমানটাকে দমন চেষ্টায় সে এইবার বিশেষ-ভাবেই মনোযোগী হইয়া পড়িল।

নন্দবাবু একটি কথাও না বলিয়া বাক্স খুলিয়া এক টাকার করিয়া সাতখানি নোট গণিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

ঢং ঢং ঢং ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া ট্রেন-মাষ্টার সুনীলের হাতে টিকিটখানা দিয়া বলিলেন, “আমার বাড়ী অনেক দূরখই তুমি পেরেছ, সে সব ফুলে যেও।”

সুনীল সাত্রনেত্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুগাঢ় স্বরে কহিল, “আমার আপনি ভুলবেন না। যদি কখন সুযোগ পাই, আমার একবার আপনার কাছে আমি আসবো।”

নন্দবাবু স্নেহ-করণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। হইশেল দিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে নৈশ অন্ধকারাশির মধ্যে সেই দু’দিনের অপরিচিতকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অদৃষ্ট হইয়া গেল।

### চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীর এক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর উত্তানমধ্যবর্তী প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি যত্ন-সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া দুইটি সুন্দরী তরুণী মিলিয়া কথোপকথন করিতেছিল। যুক্ত আনালায় উপর ঝালরদার পর্দা আঁটা, দরজার উপর মোটা কাপড়ের পর্দা ফেলা, ঘরের বার্কেলের বেবো পুরু-পালিচায় সজ্জিত, আশপাশে টেবল, চেয়ার, কোচ, ইহার এক পাশে একখানা বড় সোফার উপরে বসিয়া বিনতা ও সুলেখা।

সুলেখা এখন আর সেই ক্ষুদ্রাকৃতি বালিকাটি নাই। সে এখন বর্ষাবারিপরিপূর্ণা স্রোতধিনীর মতই অভিনব ধারণ করিয়াছে। গোমুখীনিঃসৃত স্বচ্ছ নির্ঝরধারাটুকু এখন যমুনাসঙ্গমের জাহ্নবীরূপিনী সেই হিমগোরতপ্তকাঞ্চনবর্ণ এখন যেন বয়সের উজ্জলতায় উজ্জলতর ও আভ্যাসিত হইয়াছিল। সর্বদলের পূর্ণতা মন্থণতা যেন তাহাকে নিপুণ হস্তের রচনা করা দেবী-প্রতিমার মতই অপকল্প করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচঞ্চল হরিণীনেত্র যেন আজ সর্বদা সর্বদা সর্বদা



নত হইয়া আসিতে শিক্ষা করিয়াছে, গণ্ডেও তাহার এখন মধ্যে মধ্যে লজ্জার লালিমা গোলাপের বর্ণকে গাঢ়তর করে।

তুই জনে কথা হইতেছিল। বিনতা বলিতেছিল, “তুই বলতে পারবি কেন? নিজে রূপের ডালি সাজিয়ে ব’সে আছি কি না, রূপতৃষ্ণা কি জিনিস, তা তো কখন জান্দি না। আমি নিজে কালো মানুষ, আমার নিজেকে নিয়ে তো কোন দিনই আশ মেটেনি, তাই আমি অপরকে নিয়ে সেটে মেটাতে চাই, তুই নিজের রূপেই নিজে মসৃণ হয়ে থাকবি, তোর কি?”

সুলেখা লজ্জাস্থিত মুখে উত্তর করিল, “তাই নাকি হয়? নিজে কালো কি ভাল, তা বুঝি আবার দেখা যায়? না ভাই! তা ব’লে তোমার ও কথাটা ঠিক নয়। রূপে মন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেটা কখনই স্থায়ী হ’তে পারে না, এক দিন না এক দিন মানুষের মন থেকে রূপের মোহ কেটে যায়ই যায়। কিন্তু গুণের আদর চিরস্থায়ী।”

বিনতা সন্দেহ-স্থিত মুখে একটু অমুযোগের সুরে কহিল, “তবে কি তুই বলতে চাস্ তোর হবু-নন্দাইয়ের কোন গুণই নেই? সেটি মাকালফল?”

সুলেখা অপ্রতিভের একশেষ হইয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে এই অমুযোগটাকে সে অস্বীকার করিতে না পারিলেও প্রকাশে আবার উহাকে স্বীকার করাও চলিল না, তাই ঘাড় হেঁট করিয়া জঁষৎ নম্র মধুর হাস্যের সহিত সে কেবলমাত্র কহিল, “তাই কি আমি বলছি?”

বিনতা আবেগের সহিত কহিল, “বলছিস্ বৈ কি, তা শুধুই কি তুই? সন্ধ্যাই তো এই কথাই বলছে, বাবার মন তো খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে,—সেও আমি বেশ টের পাচ্ছি। দিদি তো আমার সঙ্গে বাক্যলাপই ছেড়েছে। জামাইবাবু এ বিষয়ে তো আসবেনই না, কারণ, তাঁর ভাইকে অপমান করা হয়েছে,—দাদার যে কি মতলব, তা সেই বলতে পারে। এ দিকে তো দেখি তুই জনে হরিহর-আত্মা! কিন্তু গরীবকে বন্ধু বললেও নিজের ভগ্নীপতি বলতে হয় তো তাঁরও বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে না।—আচ্ছা, কেন বল ত ভাই, গরীব ব’লে বুঝি বেচারার বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসতেও অধিকার নেই? আমি কালো, আমার বেশের ভাল লেগেছে, সেই তো ওর কতখানি উদারতা।”

সুলেখা বিম্বিত নেত্রে বিনতার ভাব-গন্তীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া বিনতা জঁষৎ অপ্রতিভভাবে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিল।

“আচ্ছা ভাই স্ন! তোরও তো দাদার সঙ্গে কত দিন থেকে বিষয়ে কথা হয়ে রয়েছে, দাদাকে তোর খুব দেখতে ইচ্ছে করে? দেখতে ভাল লাগে? বিষয়ে দেবী হচ্ছে ব’লে মনটা বিরক্ত হয় তো? আচ্ছা ভাই, ঠিক ক’রে বল।”

সুলেখার গালছটি ডালিমকুলের মত লাল হইয়া উঠিল। চঞ্চল হইয়া সে নিজের অঞ্চল হইতে রেশমী সূত্র টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। কোন কথাই কিন্তু সে একটুও প্রতিবাদ করিল না। ইহা দেখিয়া বিনতা স্কোতুকে উচ্ছাস করিল।

বাহিরের দিকে একটা গোলমাল শুনা গেল। অল্পক্ষণ পরে নিতাই চাকরটা উচ্চকণ্ঠে কাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে শুনা গেল—“ওরে, পিসীমাকে ব’লে আয়, ছোটবাবু এসেছেন।”

বিনতা ও সুলেখা একসঙ্গে দুই জনেই এ সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুলেখার পদনখ হইতে উখিত হইয়া মাথার কেশমূল পর্যন্ত একটা পুলকের হিলোল প্রবাহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার রক্তিমার তাহার হিমগুত্র ললাট ও কণ্ঠকণ্ঠাবধি আরক্তিম হইয়া উঠিল। বিনতা তাহার ফুলা চোঁট একটুখানি বাঁকাইয়া সান্ত্বনাময় মস্তব্য প্রকাশ করিল, “ঘরের ছেলে ঘরে এলেন তা হ’লে; আমি বলি, নীলিমা বুঝি তাঁকে ভুলিয়েই বা নিলে।”

সুলেখার কানে এ ব্যঙ্গোক্তিটা বড় ভাল লাগিল না। সে ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগিলেও, কিন্তু ইহাকে প্রকাশ করিতে তাহার প্রয়াস জন্মিল না; একটু লজ্জা বোধ হইল।

সুশীলকে দেখিয়া দ্বারবান, সরকারমহাশয় ও নিতাই খানসামা যতটা বিম্বিত হইয়াছিল, ঠিক ততখানিই সে তাহার লোকেদের দান করিতে ইচ্ছুক হইল না। তাড়াতাড়ি স্থানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া সে নিতাইয়ের সাহায্যে স্থানান্তরিত সারিয়া তাহার স্বাভাবিক বেশে যখন পিসীমার ও তাহার পরই ভুবনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, তখন তাহাকে কিছু রোগা দেখাইলেও তাহার উপর দিয়া কত বড় বে বহিয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন প্রকটিত ছিল না। পিসীমা তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে

বুলাইতে মনে মনে কুপণ বুড়ার আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থা করিলেন। মুখে বিশেষ কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না; কারণ, সেই সর্ব্বশেষে কুপণটার জালা তাঁহার সংসারে যে ভাবে পতিত হইয়াছে, তাহার কাছে এটুকু তো সামান্যই।

সুশীল এ বিবাহের সংবাদে স্তম্ভিত হইল। এ কি দৈববিড়ম্বনা, না প্রকৃতির পরিশোধ? যে দুর্দশার হাত হইতে আশ্রয়লা করিয়া সে ফিরিল, সেই অবস্থায় পতিত হইল, তাহারই বোন বিনতা!

বিনতাকে অমুকুলের পুত্রবধূ হইতে হইবে, মনে করিতেই সুশীলের মনটা বিরক্তিতে একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। না, ■ কখন হইতেই পারে না। বিনতা সে ঘরের সহিত সম্পর্কিত হইলে, তাহাদের সংস্রব রাখা অনিবার্য হইবে। তাহা সম্ভবে না। এ বিবাহ এখনই বন্ধ করিতে হইবে।

তাহার পর শুভেন্দুর কথা মনে করিতে গিয়া সুশীলের মনে পড়িল যে, সেই বা কোন্ ভরসার তাহাদের সেই মলিন সংসারের সংস্রবে তাহার বোনকে টানিতে চাহিতেছে! তাহার পর এ কথা মনে করার জন্ত তাহার মনে মনে হাসিই পাইল। অমুকুলচন্দ্রের পুত্রই তো সে—তাহার পক্ষে আর বিনতাকে বিবাহ করিতে চাওয়া এমনই কি দুঃসাহস?

কতকটা সরোজিনীর অমুরোধে, কতকটা স্বেচ্ছায় সে একবার বিনতার সহিত শেষ চেষ্টায় আসিতে সম্মত হইল।

“বিন্!”—বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই সুশীলের সর্ব্ব-প্রথম দৃষ্টি পড়িল সুলেখার জবাকুসুম সদৃশ আরক্তাভ মুখের উপর। চকিত বিশ্বরের একটা বিপুল আনন্দ শিরায় শিরায় বহিয়া গেল! সুলেখাকে এখানে অতর্কিত দেখিয়া তাহার সারাপ্রাণ যেন আশ্বাসে ও পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে যেন নিজেরও অজ্ঞাতে ভিতরে ভিতরে ইহাকেই খুঁজিতেছিল। নিজের মনকে সামলাইয়া লইবার জন্ত আজ ইহাকে তাহার একান্ত প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই তাহার প্রার্থিতাকে নিকটে দেখিয়া তাহার সুখের সীমা রহিল না। এ ভিন্ন নীলিমার চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

“কি গো দাদা! বাড়ী ফিরলে যে? নীলিমা

যে বড় ছেড়ে দিলে? আমরা বলি, একেবারে গাঁটছড়া বেঁধেই বা বুঝি আসছে!”

বিনতার এই সহজ বিজ্ঞাপন সুশীল যেমনই ভীষণভাবে চমকিত, তেমনই রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যে অপরাধীর লজ্জা রক্তস্রোতে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তা হ’লে ■ তো অমুকুল বাবাকে চিঠি লিখিয়াছে। তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তিনি তো কখনই কিছু বলেন না। সহসা অপরিণীত মানসিক লজ্জার সে সুলেখার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুলেখাও কি সে সব কথা জানে?

বিনতা সুশীলের বিজড়িত অবস্থা দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া উঠিল, “খোকাছেলের বুঝি রাগ হয়ে গেল? হ্যাঁ, রাগ শুধু উনিই করতে জানেন, আমি তো আর জানি নে! এত দেবী ক’রে আসা হলো কেন বল তো? সুলি শুক তোমার পথ চেয়ে ব’সে রয়েছে—বাবুর আর সেই ‘কিপটে বায়ুনের’ ভাতের মায়া কাটে না—সাধ ক’রে কি আর বলতে হয় যে, নীলিমা সেখানে তোমার ‘তুক’ করেছে!”

সুশীলের সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটা দারুণ লজ্জার খোলস খসিয়া পড়িল। সে নিচিন্ত স্নিতমুখে সুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—“কে’ কাকে কি করেছে—সে তো বাড়ী এসেই দেখতে পাচ্ছি!”—বলিয়া সুলেখার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সবল স্নিতমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

“ভাল আছ সুলেখা?”

রঞ্জিতমুখী সুলেখা ষাড় নাড়িয়া এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। বিনতা বলিল—“ভাল এত দিন ছিল না, আজ এই এখনই ভাল হলো। পোড়ারমুখী ক’দিন ধ’রে কেবল কান পেতে পেতে মোটরের শব্দই শুনেছে। বিশ্বের আর কোন শব্দই ক’দিন ওর কানে গিয়ে পৌঁছায় নি।”

সুলেখা বিনতার বাহুল্যে একটা কঠিন চিন্মিটি কাটিয়া চাপা তর্জনে উহাকে শাসন করিল—“খবরদার!”

সুশীলের ভারাক্রান্ত চিত্ত ক্রমেই লঘুতর হইয়া আসিতেছিল। সুলেখা!—তাহার সুলেখা!—তাহার জন্মরাসনের চির-প্রতিষ্ঠিত দেবী—তাহার সঙ্গে কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবে না।—এত রূপ—এত গুণ—এত মেহ, আর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা! ■ দিন বিবাহের



কথা চলিলেও সুশীল কোন দিনই ইহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই। সেই বাল্যে পরিচিতা, ইদানীং কদাচিত্ দৃষ্টা, নিকট-আত্মীয়া হিসাবেই সে এই সুন্দরী মেয়েটির কথা স্বপ্নে রাখিয়াছে। এই ঘটনাতেই সর্বপ্রথম সে তাহাকে তাহার মানসী-প্রেমসীক্ৰুপে কল্পনা করিয়া, মনে মনে বিপুল নির্ভরে তাহাকে নিজের-অত্যন্ত নিকটবর্তী করিয়া লইয়াছিল। আবার আজই সে তাহাকে নিজ চিত্তের দুর্বলতার—চঞ্চলতার রক্ষাকবচ বলিয়া একান্ত বিশ্বাসে আঁড়িয়া ধরিতে চাহিল। তাহার মনে হইল, আগামী পরশ্ব বিনতার পরিবর্তে যদি তাহারই বিবাহটা প্রথম হইয়া যাইত!

বিবাহের ইচ্ছা মনে জাগিতেই অনিবার্যরূপে সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নে আসিল নীলিমা। সেই নির্জন পথপ্রান্তে অবিরল বৃষ্টিধারামধ্যে পরিতাক্তা নীলিমার অশ্রুপ্লাবিত দীনমূর্তি! সুশীল ক্রিষ্ট চিত্তে স্লেখার দিকে পাশ করিয়া দাঁড়াইল।

“কি গো দাদা। দাঁড়িয়ে রইলে যে, বসলে না? না—হার হাইনেসের হুকুম না পেলে বসতে পারছো না? ইওর হাইনেস! দাদা বেচারীকে কৃপা করে একটুখানি বসবার অনুমতি দিয়ে দেন।”

“বাঃ, আমি চ’লে যাচ্ছি”—বলিয়া স্লেখা একটু নড়াচড়া করিল, কিন্তু বাস্তবিকই সে চলিয়া গেল না।

সুশীল অপ্রস্তুতভাবে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল—“তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।”

এই প্রস্তাব শ্রবণে বিনতার স্বপ্ন অধর স-বিরক্তি যুহ হস্তে দ্বিগুণ কুঞ্চিত হইল।—“ব’লে কেল।”

সুশীল অপাঙ্গে স্লেখার দিকে চাহিতে স্লেখা আপত্তি বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে বাইতেই বিনতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—“তোকে যেতে হবে কেন? যা কথা হবে, তুইও উপস্থিত থেকে তা’ শুনেই যা। কথা যা, সে তো আর নতুন কিছুই নয়, আর গোপনেরও তাতে আমার কিছুই নেই।—দাদা, তুমি এই বলবে তো যে, এ বিষয়ে আমার পক্ষে লজ্জা!—আর তোমাদের পক্ষে অপমান?—কেমন এই তো?”

সুশীল ঠিক ■ রকম জেরায় পড়িলে, তাহা ভাবে নাই, তাই কিছু কাল একটু বিপর্যয় থাকিয়া পরে নিজেকে কঠিন করিয়া লইল; দৃঢ়স্বরেই কহিল,—“জ্যা—হ্যাঁ। তা তার চাইতে খুব তফাৎও নয়।”

উত্তরটা সুশীলের স্বভাববহির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বিনতা একটু যেন বিষয়ানুভব করিল। তাহার পর তাহার একজেরী স্বভাবের বশে উত্থলিত ক্রোধাভি-মানে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া গভীর পরবকণ্ঠে “হোক গে যাক্,—তাতেও কিন্তু আমার মত বদল হবার নয়।”—বলিয়াই ক্রোধ-সজল চক্ষুতে তড়িদবেগে উঠিয়া গেল। তাহার দাদা যে তাহার বন্ধুর বিরুদ্ধে এত বড় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে, এ যেন তাহার ধারণাতেও ছিল না। আর কেহ না করুক, সুশীল আসিয়া তাহাকে যে নিশ্চয়ই সমর্থন করিবে, এ বিশ্বাস তাহার অন্তরে দৃঢ় ও বদ্ধমূল ছিল।

বিনতা অমন করিয়া কান্নাতারা চোখে ■ বিদ্ববন্ধে পলাইয়া গেলে সে আশাত সুশীলকে বড় কম বাজে নাই। কিন্তু এ কম দিনের অভিজ্ঞতা তাহাকে এমনই কঠিন করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ মেহের বোনের ঐ সাভিমান বেদনাটুকুর তাহার কাছে আর তেমন আদর ছিল না। গুণ্ডমুর মধ্যে কত দুর্বলতা, কত অস্ত্র-য়ের বীজ নিহিত, আজ সে সব কথা মনে করিয়া তাহার মন কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জোর করিয়াও এ বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব। পিতার প্রতিও একটু অভিমান হইল। এ কি অসম্ভব আবদার রক্ষা? তিনি অসম্মত হইলেই ত সব চুকিয়া যাইত।

প্রস্থানোত্তর স্লেখার চুড়ির ঝংকার সুশীলকে সমঞ্জস করিয়া তুলিল। ব্যগ্রভাবে চোখ ফিরাইয়া সে অসঙ্কোচে ডাকিল, “স্লেখা!”

স্লেখা দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল।

“এস, ব’সো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”

স্লেখা পূর্বস্থানে আসিয়া বসিল। সুশীলের সংকোচহীন ব্যবহারে সেও তাহার নবজাত সমাজ ভাবটা দমন করিয়া লইয়াছিল। স্বভাবে সে তো কখনই সঙ্কুচিতা নহে। বয়োধর্ম ও মাতৃশিক্ষা মাত্র তাহাকে লজ্জাবরণ পরাইয়া দিতেছিল।

তুই ■ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর স্লেখাই প্রথম কথা কহিল, “কৈ, কি কথা আছে বলেন যে? বলচেন না?”

সুশীলের মুখ চিন্তাশ্রান। স্লেখাকে যে কথা জানানো তাহার আজ প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছিল, এবং জানাইবার এমন প্রাপ্ত অবসরও

আপনা হইতে ঘটিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এখন বলার সময় দেখা গেল, বলিবার পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট সঙ্কোচ আছে। নীলিমা-ঘটিত সকল কথা হয় ত সে তাহার বাগদত্তা এই কুমারী মেয়ের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারিবে না। বাস্তবিকই তো আর সে তাহার এখনও স্ত্রী হয় নাই।

সুশীল নিজের কাঁদে নিজেরই জড়াইয়া পড়িয়া বিমূঢ়ভাবে উত্তর দিল, “কি বলা উচিত, ভেবে পাচ্চিনে, লেখা!”—তাহার পর একটুখানি উৎসাহিত ভাবে সহসা প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, লেখা! মনে কর, কেউ আমার খুব নিন্দা করলে—তুমি কি সে কথায় বিশ্বাস করবে?”—এই কথা বলিয়া ফেলিয়াই সুশীল গভীর আগ্রহভরে সুলেখার বিষয়াপন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুলেখা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঈষৎ হাসিল। সে মিষ্ট হাসিতে তাহার চকিত হরিণীচঞ্চল কালো চোখের সবটুকু বিষ্ময়লেখা ধোত হইয়া একটি অতি কোমল স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইল। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে জবাব দিল, “ওধু পেয়ারা চুরি ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করি না,” বলিয়াই সে মুখে সলজ্জভাবে আচল চাপিয়া দিল।

তখন সুশীলও মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে ঘোড়হাত করিয়া বলিল, “ভুলে গেছলেন, সত্যিই তো, ও বিষয়ে যে আপনি আমার ‘আই উইট-নেস্।’ ও কুকীর্তিটা আর আমার এ জন্মে চাপা দেবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু দোহাই আপনার, —ধর্মাবতার! পেয়ারা চুরি করেছিলুম বলেই—‘যা কিছু হারাবে, কেউ বোকাই চোর’—এ সিদ্ধান্ত স্থির ক’রে রাখবেন না যেন।”

দুই জনেই অনেকখানি হাসি হাসিল; কিন্তু সেই হাসির শেষদিকে দুই জনেরই মন দুই রকমে ঈষৎ গভীর হইয়া আসিল। সুলেখার হঠাৎ মনে হইল, যাহার সহিত তাহার আজও বিবাহ হয় নাই, তাহার মুখ হইতে এ ধরণের কথাবার্তা বেশীক্ষণ তাহার শুনা সম্ভব নহে। আর সুশীলের স্বরূপপথে অত্যন্ত সহসা ভাসিয়া আসিল—নীলিমা। তাহার সঙ্গেও কত দিন এমনই কোন হাসির কথায় এমন হাসিই যে সে হাসিয়াছে। আজ সে কোথায়! এই ক্লেশক্লিষ্ট আলোচনাকে সে নিজের মনে স্থান দিতে ব্যথা পায়, ভীত হয়, তাই ইহাদের সে সম্বন্ধে পরিহার করিয়াই

চলিতে চাহে, অথচ ইহারাও যে সময় নাই, অসময় নাই একটা ভৌতিক ব্যাপারের ছায়ার মত তাহার চিত্তকে সর্বদা অনুসরণ করিতেও তো ছাড়ে না এবং সুযোগ পাইলেই মহা উপদ্রবও উপস্থিত করে। এখন এই প্রিয়সমাগমের মধ্যে একে প্রলয় দিতে কোন মতেই মন সায় দিল না। তাই মনটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা কিছু সে বলিয়া উঠিতে গেল। যেটা প্রথম মুখে আসিল, তাহাই বলিল।

“লেখা! লেখা! আমার তোমাকে বড় রকম কার হয়েছে—তারী দরকার। তুমি আমার কাছে থাকলে আমি জগতের সমস্ত বিপদকে—সব প্রলোভন-কেই ঠেলে কেলে দিতে পারি। আমার জীবনে তুমি ক্রবতারা হয়ে থেকে, আমার রক্ষা করো! করবো তো?”

সুলেখা বিষ্ময়ে চমকিয়া উঠিল। এ কি কাতর স্বর, এ কি ক্লিষ্ট মুখ! সে চকিতে উঠিয়া সুশীলের কাছে আসিল। মমতা-মাখা তরল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমার মনে হচ্ছে, আপনার কোন বিপদ ঘটেচে, আমার বলুন, আমার যথাসাধ্য আমি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হব না।”

সুশীলের আন্তর্চিত্তে সহানুভূতির এই প্রলেপ যেন তাহার সকল আলা জুড়াইয়া দিল। এই অপার ধৈর্য-সমুদ্রের নীতল জলে ডুবিয়া যাইতে তাহার সারা মন-প্রাণ যেন আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া হাত বাড়াইল। তাহার মনে হইল, যদি সুলেখা আজ তাহার—সম্পূর্ণ-ভাবে তাহার হইয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার অপেক্ষা ভাল আর তাহার পক্ষে কোন কিছুই হইতে পারিত না। ঐ করুণাক্রুপিনীর বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া সে তাহার জীবনের এই জটিল রহস্যের কথা তাহাকে জানাইতে পারিলে আজ ষাটখানি যায়, কিন্তু কাছে থাকিয়া যে সুদূরবর্তিনী, তাহার কাছে মন খুলিতে চাহিলেও মুখ যে লজ্জার বাধা কিছুতেই কাটাইতে চাহে না।

তখন নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া স্নানমুখে কহিল, “বিপদ আমার আছে, সময় এলে তোমায় তা আমি জানাবো, তখন আমি ক’রে আমার তোমার রক্ষাবাহ বাড়িয়ে দিও। এখন এই তোমায় অনুরোধ যে, এর মধ্যে যদি কিছু আমার সম্বন্ধে শোন, আমার না জানিয়ে তুমি তা’ বিশ্বাস করো না।”—অনুকূল যে কখনই নীরবে থাকিবে না, তাহার পক্ষে কোন ভীষণ প্রতিশোধ সে যে লইবেই, হৃদয়



তাহার মন হইতে একবারও অপমৃত হইতেছিল না এবং মন তাহার যেন ক্রমাগতই একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলেরই প্রত্যাশায় শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল।

সুলেখা মাথা হেলাইয়া তাহার ভাবী স্বামীর অনুরোধে স্বীকৃতি প্রদান করিল। তাহার পর দুই জনে কিছুকণ চিন্তিতচিন্তে নীরবে থাকার পর অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া সুলেখাই কথা কহিল,—“তা হ’লে এখন তো আর কিছু বলবার নেই? আমি এখন বাই? যখনই আবশ্যক বোধ হবে, আমায় আপনি জানাবেন।”

এই বলিয়া স্মিতমুখে সে সুলীলের পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

“ও কি করছো লেখা!”—সুলীল অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। সুলেখার সমস্ত আচরণে তাহার ব্যথিত বক্ষ যেন নূতন একটা অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, এখন সেটা প্রবলভাবেই টন টন করিয়া উঠিতেছিল। তাহার চোখের কোণে যেন গোমুখীর জলস্রোতঃ প্রবল উচ্ছ্বাসে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সুলেখার হাত সে এক মুহূর্ত্ত কালের ■■■ ছাড়িয়া দিতে তুলিয়া গেল। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে করিতে জলভাঙ্গাজন্ত প্রাবণ মেঘের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ওঃ সুলেখা! আমার অন্তরের বিপ্লব তুমি যদি দেখিতে পাইতে!

সুলেখা ঈষৎ লজ্জিতা ও রঞ্জিতা হইয়া হাত ঠানিয়া লইয়া কখন যে চলিয়া গেল, সে বুঝি তাহা জানিতেও পারিল না।

### পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিনতার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পূর্বদিন অমরুপাকে পত্র লেখা হয়, বিবাহের দিন টেলিগ্রাম যায়, কিন্তু সেখান হইতে কোন উত্তরই আইসে নাই। বিবাহের বর ইহাতে উল্লসিত। কতাকর্তা ঈষৎস্থিগ হইলেও অনেকখানি তৃপ্ত। কেবল একা সুলীলের মনেই এ ঘটনা কোন দুর্ঘটনারই পূর্বাভাসরূপে অশান্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অত বড় ধূর্ত যে নিরুপদ্রবে এ দাবীটাকেও অগ্রাহ করিবে, সে যে নিজের চোখে দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বিনতা বিবাহের পর পিতৃ-গৃহেই রহিল। কোথায়ই বা বাইবে? বিনতা ও শুভেন্দুর অবস্থা ইচ্ছা ছিল যে, ভুবনবাবু খরচপত্র করিয়া তাহাদের জন্ত এখনই ■■■ বাসা করিয়া দেন, কিন্তু ভুবনবাবু এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। তিনি শুভেন্দুকে নিজের আফিসে কাজ শিখিবার জন্ত ভর্তি করিয়া লইয়া নিজের কাছেই রাখিলেন। বিনতার মনে প্রথম ধাক্কা লাগিল এইখানেই। তাহার অবিবাহিত জীবনে ও বিবাহিত জীবনে বিশেষ কোন কিছুই প্রভেদ ঘটিল না।

ফুলশয্যার রাতে শুভেন্দুর স্বামিদের প্রথম পরিচয়ই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যে কাঞ্চনবোধে কাচ কিনিয়াছে, সেই একটি দিনেই সে বিষয়ে তাহার চিন্তে ঘোরতর সংশয় জাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা গভীর বিবাদের ঘনমেঘ অন্তরাকাশকে ব্যাপ্ত করিল।

বিনতার বিবাহব্যাপার চুকিলেই সুলীলের বিবাহোৎসব আরম্ভ হইবে, এইরূপই সকলের ইচ্ছা ছিল। এমন কি, সুলীলের নিজের মনেও এ সম্বন্ধে আগ্রহ অপর কাহারও অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের শুভ তিথি দুই মাসের মধ্যে আর পাওয়াই গেল না। অগত্যা এইটুকু বিলম্ব ঘটা অনিবার্য্য হইল এবং সপরিবারে বিপ্রদাস-বাবু আরও এক সপ্তাহের জন্ত ভাবী বৈবাহিক-গৃহের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া প্রায় প্রতি রাতে থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং এমনই কোথায় কোথায় ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সত্যবতী সরোজিনীর সহিত কালীঘাট, সর্বমঙ্গলা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতিতে এবং বিনতা, শুভেন্দু, সুলীল, সুলেখা প্রভৃতি তরুণের দল দক্ষিণেশ্বর হইতে বায়স্কোপ, চিত্রশাখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোন কিছুকেই তুচ্ছ করিল না। প্রভাতে মোটরারোহণে যশোহর এবং সান্দ্রা নদীতে স্নানারত্নমণে দুই এক দিন ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্তই তাহারা ঘুরিয়া আসিল।

শেষ যে দিন স্নানারে করিয়া বেড়ান হইল, ফিরিবার সময় শুভেন্দু ও বিনতা কথায় কথায় কি লইয়া তর্ক করিল এবং তাহার ফলে বিনতা রাগ করিয়া উপরের কেবিনে গিয়া কোচে গুইয়া রহিল, তখন শুভেন্দু গেল তাহাকে সাধিতে। অগত্যা সুলীল ■ সুলেখা মাত্র একা রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সিন্ধুকান্তি নীল আকাশে অগণ্য তারকার দীপালোক স্তম্ভাবাসীর অবনত চিত্তকে উদ্ধৃপানে আকর্ষণ করিতেছিল। ধবলা জাহ্নবী দেবী আহোরাত্র ধীরচক্র-বখিতা হইয়া ইদানীং মলিনা হইয়াছেন, তবু তাঁহার সেই মলিনা-পেরই বা কি অপকৃপ রূপছাতি! বর্ষাবারিরাশি-পরিপুষ্ট নীলধারা মুহুর্তে অক্লান্তে অব্যাহত গতিশালী। নদীতীরে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রচ্ছায়া নর্তিত, বর্জিত ও বিভক্ত হইয়া জলকে আলোকরঞ্জিত করিয়াছিল। ছই তীরে কোথাও শ্রামল বিটপীনীর্ষে জোনাকির সহস্র ভাতি, কোথাও কলবাড়ীতে অভ্রাজ্জল বিদ্যাদালোকের লহরীমালা, কোথাও গৃহস্থ-গৃহে রক্তাভ ক্ষুদ্র সান্দ্র-দীপটুকু। চারিদিকেই যেন আলোকের আর পুলকের একটানা খরস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে।

সুশীল খোলা ডেকের উপর বেঞ্চের পিঠে বকের ভর দিয়া সামনে বুঁকিয়া পড়িয়া নদীতীরের দিকে চাহিয়া বিষম চিন্তে ভাবিতেছিল, বিনতা কি ভুলকেই তার জীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইল! ঐ অসহিষ্ণু প্রকৃতির আছরে মেয়ে কেমন করিয়াই এই বিড়ম্বিত জীবন কাটাইবে।

সুলেখা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—“কি সুন্দর!”

সুশীল নিজের মনকে চিন্তাজালবিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার ঐ ছুটি কথার প্রতিধ্বনি তাহারও জিহ্বাগ্রে ফোটো ফোটো হইল।—কি সুন্দর!—প্রকাশেও সে সহাস্তে প্রব্রু করিল—“কি সুন্দর?”

সুলেখা কহিল—“কেন, এই গঙ্গার জল—আর ঐ গঙ্গাতীর! খুব সুন্দর নয়?”

সুশীল বিকসিতনেত্রে সুলেখার জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল আনন্দজ্যোতিবিভাসিত প্রফুল্ল সুন্দর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্মিতহাস্তে কহিল—“তোমার চাইতেও কি সুন্দর লেখা?”

সুলেখার হিমগৌর ললাট মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তাভা ধারণ করিল। জ্ঞানোদয়াবধি সে তাহার দৈহিক রূপশোভার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন তাহা এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে সুখপ্রদীপ্ত করে নাই। এই স্তম্ভটুকুতেই তাহার যেন নারীজন্ম সফল বোধ হইল। প্রীতি-মধুর চক্ষুতে এক লহমার ঐষৎ অনুরোধের দৃষ্টি হানিয়া

সে কলস্বরে প্রতিবাদ-চেষ্টা করিল—“যান! তাই বৈ কি! আরি তো ছাই!”

সুশীল হাসিতরা মেহনেত্রে একটু মধুরদৃষ্টি আনিয়া তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে চাপাহাসির সহিত কহিতে লাগিল—“ভুলি ছাই? ওঃ, তা হবে! বোধ হয় স্বর্ণভস্ম! ঘুঁটের ছাই ব’লে তো মোটেই বোধ হচ্ছে না।”

ছই জনেই তখন খুব হাসিল। সুশীল বেঞ্চিখানা দেখাইয়া বলিল, “ব’সো।”

সুলেখা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। তাহার পর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন? কোন কথা আছে কি?”

সুশীল প্রথমে ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল, “কথার শেষ আছে কি?” পরকণ্ঠেই তাহার হাসিমুখ ঐষৎ গভীর হইয়া আসিল। সে দিনকার সেই কথাগুলো মনে পড়িয়া গেল। সুলেখা সে কথা ভুলিয়া যায় নাই। নিজের সেটুকু দুর্বলতা প্রকাশ সহসা সে দিন না করিলেই বুঝি ভাল ছিল। যখন বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না, তখন অহেতুক এই নিষ্পাপছন্দয়া সরলা বালিকার চিন্তে ঐটুকু সংশয়ের বীজবপনেরই বা কি সার্থকতা ছিল?

সুলেখা সেই কথাই ভুলিল। বলিল, “সে দিন যে কথা বলবেন বলেছিলেন, সেই কথাই আজ বলবেন কি? তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। সে কথা বলার আর কি তা হ’লে দরকার নেই?”

সুশীল মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার পর সেটা চাপা দিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—“বোধ হয়, আর তার দরকার হবে না। সে ভালই হয়েছে। অবশ্য কোন দিন না কোন দিন এ কথা তোমার আমি জানাবো, তবে এখন নয়। সে এর পরে।”

ইহার পর ছই জনেই নীরবে রহিল। আকাশে তখন চাঁদ দেখা দিয়া অজস্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়া ভুলিয়া-ছিলেন। শুভ্র জলরাশি সেই স্বর্ণরশ্মিবিষণ্ডিত হইয়া চক্রমখিত সুবর্ণপিণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে নদীতীর বিদ্যাদালোকখচিত হইয়া মণিময় কর্ণহারের মতই ছাতি বিকীর্ণ করিয়া অনিতেছিল।

বিনতা শুভেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল। শুভেন্দুর মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তিচিহ্ন, বিনতার নেত্রে ক্রমশঃ সিন্ধুকান্তি।



বাড়ী ফিরিয়া বিনতা সুলেখাকে পীড়ন করিয়া ধরিল, “তোরা যখন দুজনে একা ছিলি, দাদা তোকে কি সব কথা বলছিল, বল না ভাই?” সুলেখা তাহা না বলিলে—“তা গরীব ননদকে বলবে কেন?” বলিয়া তাহার প’রে তীব্র অভিমান জানাইল।

সুলেখাকে অগত্যা এই তখন সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইল। কথায় কথায় সে দিনের সে কথা-গুলিও তাই আর বাদ গেল না। শুনিয়া বিনতার মুখ গভীর হইয়া আসিল এবং কণপরে সে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ কথা শুনে তোর কি মনে হলো? কি আন্দাজ করুলি?”

এ আলোচনা চালাইতে সুলেখার ভাল লাগিতেছিল না, বরং সুনীলের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া অপরূকে এ সব কথা জানাইতে যাওয়ায় সে নিজের মধ্যে একটা অশান্তিই অনুভব করিতেছিল। তাই এই প্রশ্নে জঁয়ৎ অপ্রসন্নমুখে জবাব দিল, “কই, কিছুই তো মনে হয়নি, —আর আন্দাজই বা এর ■■■ আসি করতে বাব কেন?”

বিনতা বলিল, “না করলেই ভাল। আরিও একদিন তা’ করতুম না, লোকে চোকে আগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও এতটুকু দোষ দেখিনি, কিন্তু এই ক’দিনেই দেখছি যে, পুরুষ জাতটাই মন্দ। অবশ্য আমার বাবা ছাড়া—হ্যাঁ, আর জামাইবাবুও।”

সুলেখার মনটা এ কথায় যেন একটু ভার হইয়া উঠিল, সে আর কোন কথাই কহিল না; কিন্তু মনে মনে বিনতার প্রতিই সে ইহাতে একটু অসন্তুষ্ট হইল। তাহার যেমন তুলনা করা! শুভেন্দুতে আর সুনীলে! সুনীলের ছোট বেলার সেই যত কিছু বিপত্তি, সে তো সবই ওই দুর্দান্ত শুভেন্দুরই জন্ত, সে কথা নাকি সুলেখা জানে না! তাহার বাপ নিজেরই যে ভাল করিয়া সে কথা জানিয়া তবে না এই বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিনতা নিজের ভাইকে চিনিল না, অথচ পর সে, সেও জানে সুনীল কত ভাল।

### ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া প্রথম প্রথম কয়েক দিন সুনীলের মন সদাসর্বদাই ভয়চকিত ও ত্রস্ত হইয়া থাকিত। পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে সে সর্বপ্রথম সতম-স্পন্দিত বক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিত—তাঁহার মুখে হাসি আছে কি না। তবে বিনতার এই অযোগ্য বিবাহব্যাপারে হাসি প্রায় তাঁহার মুখের সীমানা-ছাড়া হইয়াই গিয়াছিল এবং অনেক ■■■ এই অচেনা গাভীরাপূর্ণ ক্রিষ্ট মুখ সুনীলের অপরাধভীত সঙ্কুচিত চিত্তকে সংশয়াকুল করিয়াও তুলিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া অতীত দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন সুনীলের চিত্ত হইতে মুছিয়া আসিতেছিল। অমুকুল তবে প্রতিশোধ নইল না? গভীর স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার তত বড় ঊৎসাহী হৃদয়েরও প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিল এবং তাহার ■■■ নিশ্চিন্ত হইয়া সে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিল। অবশ্য নীলিমার কথা সে এত শীঘ্র এতখানি ভুলিতে পারিত না—বদি না এই সময় সুলেখা তাহার ■■■ কাছাকাছি থাকিত। সুলেখাকে সে দেখিতে পার, কদাচিৎ দুই জনে কথাবার্তারও সুযোগ ঘটে। ভুবনবাবু ও বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে প্রতিদিনই তাদের মধ্যে দেখা শুনা ঘটে; সুনীলের সমস্ত মন-প্রাণ তাই এই সুযোগে একান্ত আকর্ষণে তাহার এই চির-প্রিয়তমাকে আশ্রয় করিতে ছুটিয়া গেল। এত দিন ভাবী সম্বন্ধের মধুর সম্পর্কমাত্র স্মৃতির মধ্যে খাড়া ছিল, আজ সে প্রতিমা প্রাণময় হইয়া উঠিল, যখনই নীলিমার সেই আনন্দশূন্য ফুটিহীন নিপ্রভ মুখখানা বৃকের মধ্যে ব্যথার আঁচড় কাটিতে থাকে, তাহার প্রতি নিজের ব্যবহারের স্মৃতি অন্তরে গ্লানির কালিমা মাখাইয়া দেয়, তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে সুলেখার স্বর্ণময়ী মূর্তি স্মরণ করে, সম্ভব থাকিলে সমস্ত এক মুহূর্তকালের জন্তও তাহার সান্নিধ্যলাভ-চেষ্টা করিতে থাকে, তাহার চিত্ত হইতে বেদনার মোচড় প্রায় খামিয়া যায়, কালির লেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া আইসে। এমনই করিয়া তাহার সকল চিত্ত যখন বিগত দুঃস্বপ্ন বিস্মৃতপ্রায় হইয়া সুলেখাময় হইয়া গিয়াছে, নীলিমা সেখানে চকিতোদয় অনধিকার প্রবেশের বিরক্তিতে পর্য্যবসিতপ্রায়, এমনই সময় একদা প্রভাতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল।

সুলেখার জন্ম বিপ্রদাসবাবু ভুবনবাবুর জ্বরভ-  
ওয়ালা এক ভাটিয়া-বড়বণিকের নিকট কতকগুলি  
অলঙ্কার গড়িতে দিয়াছিলেন। সে দিন সেইগুলি গড়া  
হইয়া আসিয়াছিল। দুই ভাবী বৈবাহিকের মিলিয়া সেই  
সকল দেখাশুনা করিতেছিলেন এবং দুইজনেই  
সুলেখাকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে  
সেগুলি কেনন মানায়, তাহারও পরীক্ষা হইতেছিল,  
এমন সময় ডাকহরকরা কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়া গেল।  
তাহার মধ্যে দুইখানির উপর স্বতঃই সকলের দৃষ্টি  
আকৃষ্ট হয়। সে দুইখানি একই হস্তাকরে বাঙ্গালার  
ঠিকানা লেখা, ঠিকানায় বাড়ীর ঠিক নম্বর দেওয়া নাই,  
তাই সেগুলি পঞ্চাশটি ছাপ-মারা হইয়া ডেড-লেটার  
অফিস হইতে ঘুরিয়া অনেকদিন পরে যথাস্থানে আসিয়া  
পৌঁছিয়াছে।

দীয়ার মুকুট একখানা ভুবনবাবু ভাবী বধূ  
পছন্দ করিতেছিলেন, সেখানা সুলেখার হাতে দিয়া  
বলিলেন, “দেখ তো মা, ডিজাইনটা তোমার বেশ পছন্দ  
হয় কি না?” বলিতে বলিতে সর্বপ্রথম সেই  
চিঠিখানা ছিঁড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুলেখা ও বিপ্রদাস দেখিল, চিঠিখানার একটুখানি  
পড়িবার পরই তিনি পাতা উল্টাইয়া লেখকের নামটা  
আগে ভাগে দেখিয়া লইলেন, তখনই তাঁহার মুখ  
বিশেষরূপ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাত দুয়েক পড়া  
হইলে পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া যখন কপালের ঘাম মুছিয়া  
আর্দ্রাঙ্গের সহিত “মাঃ!” করিয়া একটা উৎকট  
যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন কোন  
অন্ততঃশঙ্কায় সুলেখার বুকের মধ্যেও সজোরে ঐ  
কাতর শব্দের একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, তাহার  
কোমল চিত্ত সেইক্ষণেই প্রবল সহানুভূতির সহিত  
তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বপুত্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল,  
গহনাগুলি খুলিয়া নামাইয়া রাখিয়া বাপের দিকে  
চাহিয়া বলিল, “আজ এ সব নিয়ে যাক বাবা! কাল  
ওকে না হয় আসতে বলে দিন।”

ততক্ষণে ভুবনবাবু আবার সেই অকথ্য যন্ত্রণাদায়ক  
ভীষণ পত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। সব চিঠিখানা  
যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখনও তিনি সেই চিঠির  
দিকেই বদ্ধচক্ষুতে চাহিয়া আছেন, সে পত্র যেন কাহার  
অশরীরী মূর্তি! সে যেন কোন অন্তরতমের  
মৃত্যুসংবাদ, সে যে কি,—সে যে কি, সে যার এ  
দুর্দশা ঘটিয়াছে, সেই শুধু জানে!

সুলেখা কাছে গিয়া গারে হাত দিল, নিম্ন মধুরস্বরে  
কহিল, “অশ্রু করচ কি?”

ভুবনবাবু ভয়ার্তচক্ষুতে তাহার দিকে কণকাল  
আড়ষ্টভাবে চাহিয়া থাকিবার পর সহসা প্রায়  
আর্তনাদের মত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, —“মা গো  
আমার! আমি বুঝি, তোকে হারালুম!” বলিতে  
বলিতে দুই হাতের মধ্যে তাহার হাতটা সজোরে  
জড়াইয়া ধরিলেন।

“কেন আপনি অমন করছেন? আমার কেন  
হারানেন? এই যে আমি।” সুলেখা সেই  
ছোটবেলার মত করিয়াই তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া গেল।  
তখন ভুবনবাবুও তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া  
লইলেন, এবং তাঁর চোক দিয়া বর বর করিয়া  
পড়িতে লাগিল।

বাপারটা যে কি ঘটিল, তাহা না বুঝিলেও কিছু  
ভয়ানক কাণ্ড যে একটা ঘটিয়াছে, একটা সহজ বুদ্ধিতে  
কে না বুঝবে? ভুবনবাবুকে কতকটা শান্ত  
হইতে দিয়া বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্রদাস সুলেখাকে বিশেষ  
চেষ্টা পূর্বক বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। তাহার  
পর তিনি মুহূর্তন ও বাক্যহীন ভুবনবাবুকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “চিঠি আমি পড়তে পারি?”

ভুবনবাবু সচেষ্ট ইচ্ছিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া  
যেমন তেমনই অনড়ভাবেই আরাম-চৌকির উপর  
পড়িয়া রহিলেন!—ওঃ, কি তীব্র,—কি অসহনীর  
যন্ত্রণার মুহূর্তও মানুষকে যাপন করিতে হয়! কি  
অসহ, কি অসহ সে জালা! প্রাণপ্রিয়ের মৃতমুখ  
দেখার অপেক্ষাও এ বুঝি অসহতর! তথাপি মাঝ-  
যের কঠিন প্রাণে-তাহাও সহ হইয়া যায়। এ কি  
রহস্য দিয়া গড়িয়াছ মানবচিত্ত হে ভগবান! যেখানে  
ভয়রপদভার সহিত না, সেখানে বজ্রাঘাতও যে সহিয়া  
গেল! ভুবনবাবুর জালাতরা চিত্ত এমনিধারা এলো-  
মেলো কতকগুলি কথা ওতপ্রোতভাবে উঠানাম  
করিতেছিল, সব কথা ভাল করিয়া তাঁহার  
গুছাইয়া আসিতেছিল না, শুধু নিদারুণ শোকের  
মনের মধ্যে বজ্রবলে বাজিয়া উঠিতেছিল—তাঁহার  
আদর্শ ফুরাইয়া গিয়াছে! তাঁহার সুশীল আজ  
বড় কলঙ্কে কলঙ্কিত!

বিপ্রদাস সেই দীর্ঘ পত্র যথেষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত  
পাঠ শেষ করিয়া সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ  
করিলেন, “এত্রে এত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন



রায়? একটা বাজে লোকের বাজে ভয়-দেখান। শ'ত্বেই টাকা পাঠিয়ে দাও আর লিখে দাও যে, এ নিয়ে যদি ফিরে ঘান-ঘান করতে আসে, তা হ'লে ছেলেকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে বিয়ে দিচ্ছিল ব'লে আমরাই ওর নামে উট্টো নালিশ দায়ের ক'রে দেবো। কিছু ভেবো না তুমি, বরং ওটা তুমি আমার হাতেই ফেলে দাও, আমি ওসব ছ কথার মিটিয়ে দিচ্ছি।”

ভুবনবাবু একান্ত বিস্ময়ে তড়িৎস্পৃষ্টের জায় উঠিয়া বসিলেন। বিস্মারিত বিহ্বল চক্ষুতে বিপ্রদাসের স্থির চক্ষুর উপর চাহিয়া তেমনই বিহ্বলতর ভাবেই তিনি সান্ধর্ষ্যে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি মিটিয়ে দেবে?—তুমি?”

বিপ্রদাস কহিলেন, “তা বোধ হয় তোমার চাইতে আমি ভালই পারবো। এ সব কাজ তোমার মতন অমন কোমলহৃদয়ের কৰ্ম নয়।”

বিপ্রদাসের অবিচলিত ভাবে ভুবনবাবুর নিজের বিকলতা যেন একটুখানি প্রশমিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সহসা আবার নুতন করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যের ধুমাসিত যন্ত্রণানল তীব্র শিখায় জলিয়া উঠিল।

“বিপ্রদাস! লেখা—ম'কে আমার... আমি যে তরু-বিহুর উপর ক'রে স্নেহ করেছিলুম ভাই!”

বিপ্রদাসের মুখে বা ভাবে কোন বিপর্যয়ই দেখা গেল না। তিনি যথাপূর্ব শাস্ত্র স্বরেই কহিলেন, “বেশ তো, চিরদিনই তাই করবে। তোমার বউ তুমি তো স্নেহ করবেই, সে আর এমন বিচিত্র কি?”

ভুবনবাবুর ব্যথাহত প্রাণ এ আশ্বাসে কি যে করিয়া উঠিল, তাহা যেন তাঁহার প্রকাশেরও অনেক দূরের বস্তু। ক্ষণকাল নির্ঝাঁকু বিস্ময়ে বিমুগ্ধবৎ থাকিয়া পুনশ্চ একটা বুকফাটা হাহাকাবের মতই কাতর আর্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—“সুশীল আমার এ কি করলে! আমার সুশীল!”

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ আহতগর্ক অপমানাহত শোকাক্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া সতর্কভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন।

“দেখ ভাই! এ নিয়ে তুমি খুব বেশী একটা বাড়াবাড়ি মন খারাপ-টারাপ করো না। বয়েসকালে এমন সব ঘটনা সকলকারই এক সময় না এক সময় ঘটে থাকে। আবার বিয়ে-খাওয়া হয়ে ছ একটি সন্তান-টন্তান জন্মালে ওসব সেরে সুখেও যায়। ■

কি আর ■ ক'রে ধরতে আছে? পুরুষমানুষ কে'না অমন একটু আধটু ভুলচুক করচে সংসারে। সবাই তো আর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আসেনি।”

ভুবনবাবু কি শুনিতেছেন, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। স্নেহের বাপ—তাঁহার ছেলের ভাবী স্বপ্ন, সে এমন অবিচলিত-ভাবে এই এত বড় কুৎসিত ঘটনাটাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিল, যে অপরাধের ক্ষমা বাপ হইয়াও তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

মামুষের মনের মধ্যে এত প্রভেদ! বিস্ময়ের সহিত তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল;—

“তবে কি তুমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবে না? তাকে এত বড় দোষে দোষী জেনেও তার হাতে তোমার অমন লক্ষী-রূপিনী মেয়ে দিতে পারবে?”

বলিতে বলিতে কোঁতে যুগায় তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। উঃ, কি লজ্জা! কি লজ্জা! কি অপমান রে! সুশীল!—সুশীল!

বিপ্রদাস তেমনই বিস্ময়াশ্চর্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলেন, “বল কি রায়! বিয়ে ভেঙ্গে দেবে? বিলক্ষণ! সাত বৎসর ধ'রে যে কথা চলেছে, আজ এক মুহূর্তেই তা ভেঙ্গে প'ড়ে যাবে? বলেছি তো, কম বয়সের ভুল-ভ্রান্তি বয়েস পাকলেই সব সামলে যায়, ওর জন্তেও আবার অত মন খারাপ করতে আছে? এখন যাতে বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়, তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর এ দিকে মিটমিট—সে-ও আমি সব ঠিকঠাক ক'রে নিচ্ছি, ওর জন্তে তুমি একরত্তিও মাথা খরচ ক'রে অনর্থক দুঃখ পেও না,—যত সব ভালাকাতুরের ব্যাপার!”

ভুবনবাবু ধীরে ধীরে সুগভীর একটা আত্মশাস মোচন করিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরে যন্ত্রণার তীব্র হাহাকাব-ভরা যে অগ্নিময় ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা যদিও এই সান্ত্বনায় একটুকুও প্রশমিত করিতে পারিল না, তবে স্নেহের জন্ত তাঁহাকেও যে তাঁহার গুরু অপরাধী পুত্রকে অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে কতকটা ক্ষমা করিতে হইবে, ইহা তখনই মনে মনে স্থির হইয়া গেল।

সে দিনের ডায়ারিতে স্থলিত কলমের লেখায় এই কয়টি কথা লিখিত হইল;—

“চাক্রশি!—কোথায় আহ? লজ্জার মুখ

লুকাও! আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার আশা, আমার আজীবনের সকল সাধনা আজ অতল বিসর্জন দিয়াছি! আমার মেয়ে স্বৈচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া কুবিবাহে নিজেকে অবনত করিয়াছে— আর আমার ছেলে—ওঃ ভগবান! সুশীল! সুশীল! তুমি আমার কি করলে!—কেন মরিলাস না!”

### সপ্তদ্বিংশ পরিচ্ছেদ

গোলমাল এইখানেই মিটিয়া যাইতে পারিত— যদি না সেই দিনের ডাকেই অমুকুলের নিকট হইতে আর একখানা চিঠি শুভেন্দুর নাম লইয়া এই বাড়ীতেই আসিত। সেই চিঠিখানা পড়িয়া শুভেন্দু তখন এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল।—বড়লোকের জামাই হইয়া শুভেন্দু নিজেকে সম্মানিত বোধ না করিয়া বরং পদে পদে অপমানিতই বোধ করিতেছিল। তাহার বিশ্বাস, সে গরীব বলিয়া সকলেই মনে মনে তাহাকে অগ্রাহ করে। ভুবনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর নতুন খিটা পর্য্যন্ত এই অভিযোগে তাহার কাছে অতি ভীষণভাবেই অভিযুক্ত। দুই জন লোক একসঙ্গে দাঁড়াইয়া কোন কথা কহিলেই শুভেন্দুর মনে হয় যে, তাহারা তাহারই কথা বলিতেছে। কেহ কোথাও হাসিলে তো আর রক্ষাই নাই। সে হাসি নিশ্চয়ই তাহাকে উপহাস করিয়া হাসা—বিনতাকে সে সর্বদাই এ কথা শুনাইতে ছাড়ে না এবং তাহার কলে দুইজনে সদাসর্বদা কলহ চলিতেই থাকে। বিনতা কখনও স্বামীর পক্ষ লইয়া পরিজনবর্গের প্রতি অভিমান করে, কখনও ক্রমাগত একই অভিযোগে উত্থাপিত হইয়া বলে—“বেশ করে,—তাচ্ছিল্য করে। যাতে না করতে পারে, সে যোগ্যতা অর্জন না কেন, তখন ওরাও আর করবে না। তাচ্ছিল্যের যোগ্য কি তুমি নও, যে করবে না?”

সুশীলের উপরেও শুভেন্দুর ঈর্ষ্যা বিরক্তির অন্ত ছিল না। সুশীল বড়লোকের ছেলে বলিয়া বরাবরই সে তাহাকে মনে মনে তাঁর ঈর্ষ্যা করিত, এখন নিজে বড়লোকের জামাই হইয়া সেটা তার বর্জিতই হইয়াছে। জামাই আর ছেলে যে কিছুতেই এক হ’তে পারে না, তা সে খাওয়া পরা সকল বিষয়ে একতলাভেও নয়, এই অভিজ্ঞতাটুকুর লাভ হইতে এই ঈর্ষ্যাটাও তাহার মনে নিত্যই প্রবলতর হইতেছিল।

বিশেষতঃ এবার ফিরিয়া অবধি সুশীল কোনমতেই শুভেন্দুর কাছে তিষ্ঠিতে পারিত না। ইহার অবশ্য নানা কারণই বর্তমান ছিল, কিন্তু শুভেন্দু তাহার এই একটা কারণই ধরিয়া লইয়াছিল যে, সে গরীব বলিয়া সুশীলেরও ঘৃণা হইয়াছে, বন্ধু হিসাবে সুশীলের কাছে তাহার এতদিন দর থাকিলেও ভগ্নীপতি হিসাবে নাই। শুভেন্দু তাই মনে এতদিন ধরিয়া গুমরিয়া ছিল।

আজ সুযোগ পাইবামাত্র সে তাহার অপব্যয়ও করিল না। খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া একেবারেই সে সুশীলের উদ্দেশে তার ঘরে গেল। সুশীলের বসিবার ঘরে তখন স্নানার্থে বিনতা দাঁড়াইয়া উদ্ভিগভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল। ভুবনবাবুর শরীর বিশেষ অসুস্থ; তিনি আজ স্নানাহার করেন নাই। সেই কথাই হইতেছিল। স্নানার্থে বলিল, “এক জন ডাক্তার আনা কিন্তু খুবই দরকার ছিল।”

বিনতা কহিল, “দাদা সে কথা বলেছিল, তা’ তাতে বাবার আর তোমার বাবারও কি জানি কেন মত হ’ল না।”

এই সময় শুভেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ব্যস্তভাবে গর্জিয়া উঠিল,—“কই, সে হতভাগাটা কোথায়? কোথায় গেল সে রাঙ্গেলটা? তাকে আমি আজ একবার দেখে নিতে চাই! পাতি ডান শূয়ার!”

এই ভীষণ আক্ষালনযুক্ত আক্রমণে দুই জনেই ভীত হইল। বিনতা কিছু নব্বয়েই কহিল, “কাকে খুঁজচো? মাথাকে? সে তো এ দিকে আসেনি। কি করেছে সে?”

ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে বাজ করিয়া শুভেন্দু বলিল,—“মাথাকে নিয়ে আমি কি করবো? খুঁজছি তোমার গুণধার দাদাকে। পাতি, বজ্জাত, ছোটলোক, জানে না সে, আমাদের সে কি সর্বনাশটা করে এসেছে? গরীব ব’লে এত অত্যাচার? উঃ! দেশে কি আইন-আদালতও নেই? রাজা নেই? আমি ওকে পুলিশে দেবো, জেলখাটাবো, ঘানি টানাবো, পাথর ভাঙ্গাবো—তবে আমার নাম শুভেন্দু চক্রবর্তী!—অগ্নে ছাড়বো ওকে? সাধু পুরুষের ডুবে ডুবে জল খাওয়া বার করে দিচ্ছি এইবার, দেখ না! আমরা যা’ করি—দেশের শাস্তিতে জানিয়ে করি, ধর্মের খোলস পরে লুকিয়ে লুকিয়ে করিনে।”

নারী দুই জন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বিনতা দুই একবার মুখ খুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই বন্ধুটি,



ঘূর্ণিতচক্ষু ও ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার গলা কাঠ হইয়া গেল, কথা কহিবে কি, আতঙ্কে সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

শুভেন্দু দুইটি অসহায় নারীকে নিজের নির্দাক প্রোতারূপে পাওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিতই এ দিকে নিজের বাক্যশ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল—  
“ছোট লোকটা যখনই সেখান থেকে আসতে চাইলে না, তখনই আমি এই সন্দেহ করেছিলুম! গরীবকে দেখিয়ে নিজের ছেলের চাইতে আপন হয়ে এই কুমতলবেই তাদের বুকে চেপে বসেছিলেন! অ্যা, কি অমানুষিক অত্যাচার! আমরা গরীব হ’তে পারি, এঁদের মতন অত পাশও করি নি; কিন্তু এত বড় নৈতিক অবনতি তা ব’লে আমাদের ভিতর হয় নি। আমরা ও সব ভণ্ড তপস্বীদের চাইতে লাঞ্ছিত ও উপরে, তা এই বড় গলা ক’রে বলতে পারি! তপস্বী এ দিকে—”

“বাপার কি শুভুনা! সকালবেলার অমন করে চোঁচাচোঁচা কেন?”—বলিতে বলিতে ঈষৎ অগ্রসরমুখে সুশীল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।—“বাবার আজ শরীরটা বড় ভাল নেই, গোলমাল কানে গেলে হয় তো কষ্ট পাবেন। কি, তোমাদের হয়েছে কি, বিনু?”

“হয়েছে কি? পাঞ্জি! রাঙ্কেল! জানো না কি হয়েছে? হুধ দিয়ে কালসাপ পুষে রেখে এসেছিলুম! একেবারে বড়-বুড়ীর বুকে ছোবল মেরে এসেছ! সরতান!”

এক নিমেষের মধ্যে সকল ব্যাপারই সুশীলের স্বদরঙ্গম হইয়া গেল। একই মুহূর্তে তাহার চোখে পৃথিবীর বর্ণ পরিবর্তিত বোধ হইল, তাহার পারের নীচের মাটি ফুলিয়া উঠিল, তার কানের পাশ দিয়া বেন কামানের গোলা চলিয়া গেল। একটি কথাও না কহিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একবারটি মুখ তুলিয়া চাহিলও না এবং তাই সে দেখিতেও পাইল না যে, তাহারই অনতিদূরে গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুপিতা সিংহী-সদৃশী বালিকার অগ্নিবর্ষী অনিমেঘ দৃষ্টি সেই সঙ্গে সঙ্গে কি তীব্র ক্ষোভের লজ্জার ধরাডাল-শায়ী হইতে চাহিল।—সে বালিকা স্নলেখা।

শুভেন্দু যখন দেখিল, তাহার এতখানি বীরত্বের কেহ প্রতিবাদদাত্তও করিল না, তখন তাহার সাহসও বর্ধিততর হইল। সুশীলের উপর সকল ক্ষোভের আলা মিটাইতে চাহিয়া সে তখন পুনশ্চ ক্রুদ্ধ তর্জনে চোখ

পাকাইয়া বলিল, “ভদ্রলোক জেনে মা-বোনের কাছে বিশ্বাস ক’রে রেখে এসেছিলুম, তা’র এই প্রতিফল দিলে! বিশ্বাসঘাতক! নীচ! কুচরিত্র! পণ্ড!”

সুশীল সবেগে দুই পদ শুভেন্দুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আহত সিংহের জায় উন্নত গ্রীবার আরক্ত মুখ তুলিয়া রোষগুরু স্বরে বাধা দিল, “সাবধান শুভেন্দু!”

“কিসের সাবধান সুশীল? আমার বোনের সর্বনাশ ক’রে, আমার মাকে হত্যা ক’রে, চোরের মতন লুকিয়ে পালিয়ে এসে নিজের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছ, তারই কি আমাকে সাবধান হ’তে হবে?”

“তোমার মাকে হত্যা ক’রে!”

“হ্যা, আমার মাকে! এই চিঠিখানা নিজেই প’ড়ে দেব,—নীলির সর্বনাশ ক’রে তাকে ফেলে তুমি চোরের মতন পালিয়ে এলে, বাবা কেলেঙ্কারীর ভয়ে একটা বুড়োর সঙ্গে রাতারাতি তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু বিয়ে হবার আগেই, মায়ের হার্টফেল করে—নীলিও তখনই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়—এ সব কার জন্ত?—কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে?”

সুশীল সহসা অধোমুখ হইল। স্বর্ণলতা মরিয়াছেন! সেই রাতে! নীলিমা পলাইয়াছে। ‘কার জন্ত’? ‘এ সব’ কার জন্ত? সত্য কথাই! এ সব তারই জন্ত নহে কি? সে যদি সে বাড়ীতে কোন দিনও না ঢুকিত!

সুশীলের এই অসহ্য নীরবতা এই সময় দুই স্থানেই অগ্ন্যুৎপাত করিল, তাহার মধ্যে শুভেন্দু সহসা হিতাহিতজ্ঞানহারা হইয়া প্রমত্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের হাত চাপিয়া ধরিল, চীৎকারশব্দে কহিল,—  
“নীলিকে নিশ্চয়ই তুমি কোথাও লুকিয়ে কেলেচ। তাকে বিয়ে করতে পার না, কিন্তু নিজের বিলাসের সাথী, সেবাদাসী করতে তো আর কোনই অনিচ্ছা নেই। বল সে কোথায়? বার ক’রে দে’ তাকে। কেন, আমরা গরীব ব’লে আমাদের প’রে এত বড় অত্যাচার! কেন আমরা তা সহিব?”

সুশীল কথা কহিল না, মুখ তুলিল না, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতই অমড় অচল হইয়া সে শুক রহিল। এত বড় অপবাদও তাহার সাধার তুলিয়া দিল? এও কি সম্ভব? উঃ, মানুষে এ কাজও পারে?

“তবে এই দেখ, তোকে দিয়ে সত্যকথা স্বীকার

করাতে পারি কি না!”—বলিয়াই শুভেন্দু তাহার কঠিন মুষ্টি বন্ধ করিয়া সজোরে সুশীলের নাকের উপর একটা প্রচণ্ড মুঠোঘাত করিল।

এই কাণ্ডটা সে অত্যন্ত অতর্কিতেই করিয়া ফেলিলেও ইহা দেখিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ স্বরে বিনতাও চীৎকার করিয়া উঠিল,—“বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে! দাদার গায়ে তুমি হাত তুলতে সাহস কর? এত বড় স্পর্ধা তোমার?”

সেই প্রচণ্ড আঘাতে সুশীল একবার ঘুরিয়া পড়ার মত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া নিজের পতন সামলাইয়া লইল। তাহার পর কৌচার কাপড় নাকে চাপিয়া নিকটবর্তী একটা কোচের উপর সে মাতালের মতন টলিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার কাপড়খানা চলির কাপড়ের মতই রক্তে লাল হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চোখের সামনে একটা ভাঁটার মতই বন্দবন্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাহারই মধ্যে সে তাহার প্রায় অন্ধকার চোখের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার সম্মুখে রহিয়াছে সুলেখার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ এবং সেই মুখের মধ্যের চোখ দুইটা যেন দুইটা লাল বাতির মতই কি অস্বাভাবিক জ্বলিতেছে।

\* \* \* \*

সুলেখা তাহার বাপকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, “আজই আমি বাড়ী যাব বাবা! সব শুছিয়ে নিয়েছি, একগুঁই গাড়ী ডাকতে বলো দাও।”

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, “আজই কি করতে যাবি? দাঁড়া, কাল গহনাগুলো আনুক, আর—”

সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, “না বাবা! আমার আজ যেতেই হবে। আমার শরীর ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে। কলকাতার আর এক দিনও আমার থাকা চলবে না। ওসব এর পরে হবে তখন, আমার আগে এখন রেখে এস।”

বিপ্রদাস সকালের ব্যাপারে নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়াও ছিলেন। মেয়ে বা আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, সে ভাবনা তাহার মনে বিলক্ষণই ছিল। সেই জন্তই তাহার এখান হইতে সরিয়া যাওয়ার তিনি আর আপত্তিমাত্র করিলেন না, বলিলেন,—“আচ্ছা, রাখকে তা হ’লে বলি গিয়ে, সে যদি মত করে তো গাড়ী আনাহিগে, তার

আবার আজ মাথাটা কেমন হঠাৎ একরকম হয়ে গেছে। একটা মোকদ্দমা হারার খবর পেয়েছে কি না আজ সকালে—”

সুলেখা একবার তীক্ষ্ণচোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া অরিতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সমস্ত বাড়ীটাই কেমন যেন একটা অন্তর্বিদ্ধ বেদনাতারে ভারাক্রান্ত ও ধমধমে হইয়া রহিল। অথচ কেন যে, তাহার প্রকৃত কারণটা অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। বাবু অমুহু এবং দাদাবাবুর সহিত জানাইবাবুর তরফর একটা ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।—তা হবোই ত, নির্ধনের ধন হইলে জগৎকে সে যে তৃণজ্ঞান করিয়াই থাকে,—এ তো আর কিছু নতুন কথা নয়! তা’ ঠিক, এই রকমই ঘটনা অমুক অমুক সংসারে এর কত আগে আগেই যে ঘটয়া গিয়াছে। তা ছোট দিদিমণিও না কি এবারে ছেড়ে কথা কয় নি, সেও আজ খুব যাচ্ছে তাই করেছে।—বাবুসাহেব গোসা ক’রে তখনই তো করকে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।—গেছেন, যেতে দাও না, পিড়ি চুই চুই করলেই আবার লাজ মুখে ক’রে আপনিই ফিরে আসতে পথ পাবেন না! হতো সেই সময় গর্দানা দেওয়া, তা হ’লে দু’দিন জাজে-গোবরে হয়ে মেজাজ একটুখানি ঠাণ্ডা হতো।—ছোট দিদিমণির যেমন বেয়াড়া সখ, মাকালফলটাকে কি না খামোকাই ইচ্ছে সাথে বেছে নিলে!

চারিদিকে চাকরদাসীমহলে চুপি চুপি এই সকল নানাবিধ আলোচনা চলিতেছিল।

সুশীল সারাছপুর সেই ঘরের সেই কোচখানার উপরেই আড়ষ্ট অতিভূতবৎ পড়িয়া রহিল। একই সময় বিনতা, শুভেন্দু ও সুলেখা তাহাকে একা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শুভেন্দু বিনতা যে কলহ করিতে করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সেই সরব গর্জন তখন সুশীলের কানের বা মনের মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে নাই; কিন্তু আর এক জনের নিঃশব্দ প্রস্থানকালীন সেই একটুখানি নীরব ঘণার চাহনি আজ তাহার বাখাভারাতুর শরীর-মনের উপর যেন সহস্র মণ ভারের মতই বিরাট হইয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। সুলেখা—যে সুলেখা একদিন অপরিচিত বালক সুশীলের প্রতি তাহার বাপের দেওয়া শাস্তিকে সহিতে পারে নাই, সেই সুলেখা আজ তাহার সাত বছরের পরিচিতা



বিবাহপণে বন্ধা, বুঝি এই সাময়িককালের অনিষ্টতার সমধিক স্বেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধা, সেই স্নেখা আজ তাহাকে এইরূপে অবমানিত ও শোণিতাপ্লুত দেখিয়াও অন্যাসে অবহেলায় মুখ ফিরাইয়া চাওয়া গেল! আর চোখে তাহার সে কি সম্বল দৃষ্টি!—উঃ, স্নেখার বুক এখনও লজ্জার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না কেন?

সহসা স্নেখার মনে পড়িল তাহার বাপের কথা! তবে তিনিও কি এই সংবাদেই আজ শয্যালীন হইয়াছেন? আচ্ছা, স্নেখা তখন মরে ঢুকিতেই তিনি না তাহার দিকে তখনই পিছন ফিরাইয়াছিলেন? তাহার সঙ্গে একটি কথাও তো কই তিনি আজ কহেন নাই? লামনে গেলে অমনই চোখ ঢাকা দিয়াছিলেন না!—ঠিক তাই—ঠিক তাই—

নিশ্চয় নীলিমার পিতা তাহার উপর এই অতি হীন প্রতিশোধ লইয়াছেন! স্বর্ণলতাও মরে নাই—নীলিমাও পলায় নাই—মাত্র আরও একটা বিখ্যা ক্রান্ত গড়িয়া তাহাকে নুতনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। স্নেখার সর্বশরীরের শোণিতপ্রবাহ যেন মসহার রক্তরোবে তরল অগ্নিপ্রবাহের মতই তাহার হৃদকে অরতপ্ত করিয়া তুলিল। মানুষ এত ক্ষুদ্র হয়? মন হীন হয়? এত ছোট হয়? উঃ!—উঃ!—উঃ!

ধীরে ধীরে ধীরে আবার আর একটা নিবিড় অভি-  
মানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও কি কাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না? স্নেখার চরিত্রে কবে কি সন্দেহজনক প্রশ্ন পাওয়া গিয়াছিল যে, এক কথায় তাহাকে এত বড় একটা অসামান্যিক অভ্যঙ্গের পাশে পী বিনা বিচারেই সাব্যস্ত করা হইল? আর যে করে করুক, তাহার বাপের এ অবিচার যে তাহার ক্ষে একান্তই অসহ্য! আর স্নেখা—সেও কি এই সে দিনও বলে নাই যে, সে তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না?

ঘরের দরজা খোলার একটুখানি শব্দ হইল। স্নেখা নিজের চিন্তাতারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও সেটুকু কেমন চিন্তা জানিতে পারিয়াছিল; অতি কষ্টে সে মাথা ফিরাইয়া দেখিল, মুক্তদ্বারপথে স্নেখা গৃহপ্রবেশ করিতেছে। সে মুহূর্তে কি আনন্দ, কি আশ্বাস, কি আশাই যে তাহার ভগ্নচিত্তে বিছাচমকে জাগিয়া উঠিল, সে শুধু সে-ই জানে! অতি কষ্টে সে তখন উঠিয়া বসিল। বসিতে গিয়া রক্তপাতভসিত দৌর্যলো

মাথা তার আবার ঘুরিয়া উঠিল; চোখে অন্ধকার বোধ হইল, তথাপি সে তাহাতে জরুপমাত্র করিল না। স্নেখা তাহাকে অবিশ্বাস করে নাই! সে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই! সে তাহার কাছে ফিরায়া আসিয়াছে! আঃ!

স্নেখা আসিয়া টেবলের আর একধারে স্নেখার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের সেই মিষ্ট স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ হাস্যটুকু আর সেখানে নাই। সে স্থির অপলক নেত্রে স্নেখার মুখের দিকে চাহিল, এখনও সেখানে অচপল গাঙ্গীর্ষের সহিত যে একটা অক্ষমণীর যুগার ভাব অমিশ্রিতভাবে দেদীপ্যমান রহিয়া গিয়াছে, তাহা চিনিতে কোনরূপেই বাধে না। স্নেখা বারেক সে চোখের দিকে চাহিয়াই তাই অপরাধীর মত নিজের মাথা নত করিল। প্রথমে স্নেখার দিকে চাহিতে বেরুণ রুণ হয়, তাহারও আজ এই পুণ্যজ্যোতি-  
র্ময়ী বিচারদৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে তেমনই কষ্ট বোধ হইল। এ বিখ্যা কলঙ্কের মধ্যে যতটুকু সত্য, যেটুকু কাপুরুষোচিত, তাহাই যে তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

স্নেখা নিজেই কথা কহিল। স্থিরভাবে সে কহিল, “আমি আজ বাড়ী বাছি। এক দিন তুমি আমার বলেছিলে, ‘আমার সম্বন্ধে যদি কিছু শোন, আমার না জানিয়ে বিশ্বাস করো না।’—আমিও সে দিন তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। যদিও আজ সকালে যে সকল ঘটনা আমাদের হৃৎকেন্দ্রেরই সাক্ষাতে ঘটে গেছে, তার পর আর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার আমার কোন প্রয়োজন ছিল ব’লেই আমি মনে করি নে, কিন্তু তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের হিসাবেই আমি এই শেখবার জন্যে যেতে এসেছি, আর জানিয়ে যেতেও এসেছি যে, যা আমি আজ জেনেছি এবং তুমি নিজেও যাহার কিছু-  
মাত্র প্রতিবাদ না করেই মাথা পেতে যাকে স্বীকার করে নিয়েছ, তার উপর আর আমাদের মধ্যে কখনও কোন সম্বন্ধ থাকতেই যে পারে না, সে কথা তুমিও অবশ্য স্বীকার করবে না এবং আমিও তা করি নে।”

কার এ কথা? কার এ ভাষা? এ ভয়ানক কথাগুলো কে আজ এমন অনাস্রাস-সহজে উচ্চারণ করিতে পারিল? ■ কি সেই স্নেখা? সেই বনচারিণী কপালকুণ্ডলা? সেই শরীরিণী দয়ামূর্তি? আবার এই সে দিনেরই সেই দীয়ারত্নমণের সজিনী, সেই জ্যোৎস্নাজড়িত স্নেহময়ী, প্রেমময়ী নারী?

আর আজ এ কোন্ পাষাণী এত বড় নির্মম বাক্য এমন করিয়া মুখের উপর বলিয়া বসিল? নারীর মধ্যে সর্বত্রই কি দশমহাবিচার দশ রূপ বিস্তারিত? কোথাও সে মোহিনী ভুবনেশ্বরী, কোথাও শিব-বন্ধারূঢ়া করাগবদনা কালী! সুশীল আহত বিষয়ে নির্ঝাঁকু হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

তাহার চোখের সেই ভাষাহীন দৃষ্টি সুলেখাকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল। এতটুকু প্রতিবাদ নাই? এ লোক যে নিশ্চিত অপরাধী, তাহাতে আবার সংশয়ের স্থান কোথায় আছে? ওরে নির্ঝাঁকু, লোভী সুলেখা! এখনও তোমার মোহ বুড়ে না? কত বড় রক্ষাই যে তুমি পাইয়া গিয়াছ, এখনও সে কথা না ভাবিয়া অতীতের পানে, সেই সাধের স্বপ্নের অতীতের পানেই লুকু চোখে চাহিয়া দেখিতেছ—তোমার কি মরণ নাই? ছি ছি ছি, তোমার নারীমর্যাদার অবমাননা করিয়া ফেলিও না! এখনও মনকে তোমার দৃঢ় কর।

তখনও সুশীল তেমনই অনড়, তেমনই স্তব্ধ নতনেত্র। তাহার পানে বারেক রোষতীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিরাগ-শুককণ্ঠে সুলেখা বলিল, “তা হ’লে এই শেষ! তোমার আমার মধ্যে এ জন্মে বোধ হয় আর কখন কোন দিনই দেখা হবে না, তাই বাবার সময় একটা কথা ব’লে যাই, যদি সঙ্গত মনে কর তো শুনো—এর পর যে যতই চেষ্টা করুক, আমি তোমার বিয়ে করবো না, এটা স্থির!—তাই বলি,—তোমার এখন উচিত, সেই যে মেয়ের তুমি সর্বনাশ ক’রে এসেছ, তাকেই ফিরে গিয়ে বিয়ে করা। আর এ করতে তুমি জ্ঞানতঃ ধর্মতঃ বাধ্যও। এ যদি না কর, জেনো, এ জীবনে তো নয়ই, জন্মজন্মান্তরেও তুমি কখন ঈশ্বরের ক্ষমা পাবে না।—মামুষের তো নয়ই।”

সুলেখার মুখে এই প্রস্তাব উচ্চারিত হইবামাত্রই সুশীল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সুলেখার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার সর্বশরীর রোষাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন সত্যই সে অপরাধী—নীলিমার কাছে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। আর এ অপরাধের বিচারক তাহার সম্মুখ-বর্ত্তিনী ঐ মহিমময়ী নারীমূর্ত্তি—ঐ সুলেখাই। এই কঠোর দণ্ডদেশে সে শুক খাকিয়া শুনিল, একটা কীণ প্রতিবাদও তাহার কণ্ঠে, তাহার জিহ্বা উচ্চারণ

করিতে সমর্থ হইল না। তাহার হইল, আদেশ যেন অলঙ্ঘ্য, ইহার পরিবর্তন যেন কো কালে কাহারও দ্বারা আর কখন হইতেই পারে না।

সুলেখা এবার মুখ ফিরাইল। চলিয়া যাই উদ্ভতা হইয়া পুনশ্চ একবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল দেখিল, সুশীল তখনও যেমন তেমনই একই ভাবে বসিয়া আছে। দেখিল, তাহার নাসিকা ক্ষীত, চু-কক, মুখ শুক, দৃষ্টি যেন পৃথিবীর কোন পরপাশে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, এমনই তাহা বিকল বিপর্যস্ত। অসীম করুণার বস্ত্রাধার প্রচণ্ড বেগে সে নিজের অন্তরের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই যেন অমৃত করিল। তাহার মনপ্রাণ উর্ধ্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ঐ লাহিতকে, লজ্জিতকে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা জ্ঞাপন করিতে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু না, তাহাতে যে আত্ম অপরের প্রতি অবিচার করা হইবে। নীলিমা আজ ইহার কলঙ্কলাহিতা, আশ্রয়বিচ্যুতা, স্বজন সমাজত্যাগী, এখনও হয় তো ইহার প্রতীকার আছে কিন্তু আর বিলম্ব হইলে একটি জীবন হয় তো চিরদিনের মতই দ্রবস্থার চরমে গিয়া পৌঁছাবে। না জানি, সে অভাগীর শেষ পরিণাম কত ভীষণাকারই না ধারণ করিতে পারে না—না—সুলেখা! নিজের ক্ষতিকে গ্রাহ করি না। নিজেকে না হয় জন্মের মতই বিসর্জন দি দাও। অত্যাচারিতা নীলিমাকে তাহার অবশ্যপ্রাপ্ত অধিকার ফিরাইয়া দিতে যদি তোমার বুকের একখানা পাঞ্জরা খসাইয়া দিতে হয়, তাও দিয়া কেন। অপরাধীকে ক্ষমা করিও না!—তাই হোক, তাই হোক, দণ্ড তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্য করিতে নিশ্চয়ই সে বাধ্য করিবে এই তাহার পণ। নারী হইয়া নারীমর্যাদাকে সে পদ্ধনিত হইতে দিতে পারিবে না!—না, কখনই না। তাহা করিলে সত্যী নারীর রক্ত তাহার মধ্যে বলুণিত হইবে যে।

মুহূর্ত্তকালমধ্যেই তাহার করুণাদারা মরুভালুমধ্যে কীণ জগদারার মতই বিলুপ্ত হইয়া গেল,—ক্ষমা!—কাহাকে সে ক্ষমা করিবে? বিশ্বাসহীনা চরিত্রহীনকে? সুশীল তাহার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করিয়াছে? অতবড় অন্তায় করিয়া আসিয়া অনাস্রাসে তাহার মন গইয়া খেলা করিতে সে বিধা বোধ করে নাই!—ছি ছি! না, কখনই না!—সুলেখা ফিরিল।



“লেখা। লেখা।—তুনে যাও—আমায় অবিচারে  
বড় দণ্ড দিয়ে চিরদিনের মতন চ’লে যেও না—  
গেলে ভাল করে একবার সকল কথা শোন, বিচার  
রে দেখ।”

সুশীলের আন্তরিক সমস্ত অভ্যর্থনাকে কান্দাইয়া  
মধ্যে তীব্র ক্রন্দনের সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া  
ঠিল।—আর তাহা সুলেখার বুকের মধ্যেই কি  
হইল না? কিন্তু তথাপি সুলেখা দাঁড়াইল না, আর  
কথার সে ফিরিয়াও চাহিল না, কঠিন আদেশের  
সে চ’লিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—“বিচার  
যদি করেছি। নীলিমাকে তোমায় বিয়ে করতেই  
হবে। আর তা যদি কর, তবেই আমার কাছে  
আমরের কাছে তুমি কমা পাবে, এ না হ’লে কখনও  
পাবে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ।”

এই বলিয়া সুলেখা চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি  
সুশীল মুহমানবৎ পড়িয়া রহিল।

### অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার জীবনের সকল আশার অবসানের সঙ্গে  
সেই তাহার জন্ম যে চিতামজ্জা হইতেছিল, অকস্মাৎ  
গলতা নিজের জীবনকে তাহাতেই আহুতি প্রদান  
করিলে অল্পকালের গৃহে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটয়া  
ঠিল। এই মৃত্যুসংবাদটা অত্যন্ত রাগ হইয়া পড়ায়  
সুশীল কোমরতেই আর ঘটয়া উঠিতে পারিল না।  
তার লোকের মধ্যে জানাজানি হইতে আর কিছুই  
ধন বাকি ছিল না, দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে তীব্র  
আলোচনা আরম্ভ হইল এবং পাড়ার এক রসিকা ঠান-  
দি এতদুপলক্ষে ছড়া কাটিতে বলিয়া গেলেন—  
“তুই বারেও হ’লো নাকো পতি-সম্মিলন।  
পোড়া বিধি এই দিলে কপালনিখন।” ইত্যাদি।  
সন্ধ্যার পূর্বে মড়া উঠিল না। জন কয়েক  
সুশীলানী ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া অল্পকাল স্বর্ণলতার  
চাঁদা সার শবদেহটাকে বাশে বাধিয়া তীরস্থ  
কিতে পাঠাইয়া দিল, নিজে সঙ্গে গেল না, গেলে  
গৃহ আগলাইবে কে? নীলিমাকে কেহ না  
জানিতেই সে আপনি উঠিয়া শব-বাহীদের সঙ্গে লইল।  
গভীর রাত্রে চিতা নির্দোষ হইল।  
শবদাহকারীরা অর্দ্ধদণ্ডাবস্থায় শব ফেলিয়া বাড়ী

ফিরিতে উদ্ভত হইলে, নীলিমা তাহাদিগকে বাকি  
কার্য্যটুকু সমাধার জন্ত বিস্তর মিনতি করিল। কিন্তু  
সেই সব নীচচরিত্রের স্বয়ংহীন লোকরা তাহার  
অনুয়ে কর্ণপাত করিল না, কেহ ভয়ভাবে, কেহ  
অভদ্রভাবে হাসিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, অসমাপ্ত-শবদাহ  
ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কেবল এক জন মাত্র  
নীলিমার সম্পূর্ণ অচেনা লোক সঙ্গীদের আহ্বান  
উপেক্ষা করিয়া চিতাধিমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ পূর্বক  
দাহকার্য্য সমাধা করিতে মনোযোগী হইল, সেই শুধু  
গেল না।

স্বর্ণলতার চিরজালাময় জীবনের সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন  
করিয়া দিয়া, তাহার চিতাচিহ্ন নিঃশেষে ধুইয়া  
ফেলিয়া নীলিমা চোখে নদীগর্ভে নামিয়া গান  
করিল। ডুব দিবার সময় তাহার মনে হইল, এই  
সুশীতল জলতল হইতে মাথাটা আর না তুলিলেই তো  
এখনই সব কিছু চুকিয়া যাইতে পারে? কি প্রয়োজন  
আর তাহার এখান হইতে উঠিবার? পৃথিবীর  
তথ্যবস্তু হইতে এই নদীগর্ভ কত শাস্ত, কতই শীতল!  
আঃ!—প্রবল লোভ তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে  
লাগিল।

একবার সে অনেকক্ষণ জলতলে ডুবিয়া রহিল;  
কিন্তু তাহাতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতেছিল,  
বুকে একটা বিষম চাপ যেন সবগে ঠেলিয়া উঠিতে  
লাগিল। কেবলই হাঁপাইয়া ভাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা  
হয়। না, ডুবিয়া মরা বড় সহজ নহে, এ বড় যন্ত্রণাকর  
মৃত্যু! যন্ত্রণার হাত হইতেই যে সে মুক্তি চায়।  
তাহার পর আরও একটা কথা—নারী সে, মরিলেও  
সে দেহ নারীদেহ। কোথায় কি ভাবে ভাসিয়া  
গিয়া সে দেহটা কোথাকার কূলে লাগিবে; জলপুলিসে  
সেটা না জানি কি অবস্থায় টানিয়া তুলিবে।  
মুদ্রাকরাসে হাঁপপাতালে লইয়া গিয়া সেটাকে চিরিবে,  
ফাঁড়িবে। তাহার পর কোথায় ফেলিয়া দিবে না  
কি করিবে। তার উদ্দেশ্যে কতই হয় তো তীব্র  
ব্যাকোক্রিসকল বর্ষিত হইবে! না, তাহার অপেক্ষা  
তো কেরোসিনে পুড়িয়া মরাই শ্রেয়! এমন করিয়া  
আগুন ধরাইবে যে, যাহাতে নিজের আগুনেই তার  
সমস্তটুকু ভস্ম হয়। কাহারও কিছু আর করিবার বাকি  
না থাকে।

নীলিমা যেন এইবার একটা পথ পাইয়া  
হইতে উঠিয়া আসিল। নদীতীরে কেহ কোথাও

ধাঁই। রাত্রির সন্ধ্যা ব্রাহ্মণটির ঘান শেষ হইয়াছিল, বলা যায় না, কি উদ্দেশ্যে সে তখন কোথায় গিয়াছে। নীলিমা কিন্তু ইহাতে বড় অস্তিত্ব বোধ করিল। জনসঙ্গ তাহার পক্ষে এখন যেন বিষ খাওয়ার অপেক্ষাও তিক্ততর ঠেকিতেছিল।

নদীতীর ধরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিক্ হইতে তাহার আসিয়াছিল, তাহার বিপরীত পথে চলিল। বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িতেই আতঙ্কে ও যুগায় তাহার সমস্ত দেহ-মন কুঁকড়াইয়া যেন এতটুকু হইয়া গেল। সেই বাড়ীতে আবার সে কিরবে? কেন—কিসের গোভে? লোকে নিন্দা করিবে? হয় তো কত হর্নাও রটিবে? তাহাতেই বা তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? সে তো মরণপথের বাড়ী। সে মরিতেই বসিয়াছে, তাহার আবার লোকলজ্জা, মান, ভয় কিসের?

নীলিমা লক্ষ্যহীন হইয়াও শুধু নদীতীর লক্ষ্য করিয়াই বহুপথ অতিক্রম করিল। ইহার মধ্যে প্রথম দিকে দুই একখানা ক্ষুদ্র বস্তি ভিন্ন কোথাও অপর কোন লোকালয়ের চিহ্ন সে দেখিতে পাইল না। নদীর গারে চর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে বালিরাশি ধূ—ধূ করিতেছে, তাহার অনেক দূরে প্রায় নদীমধ্যভাগে অতি শীর্ণ ক্ষীণ জলরেখা দৃশ্যকরোচ্ছল তুলিবার মতই তাহা শুভ্র দেখাইতেছে। শ্রান্ত পক্ষী বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু ডুবাইয়া জল পান করিল; চরণশীল গাভী মহিষ দল বাঁধিয়া চড়া তালিয়া জলে অবগাহন করিতে গেল; বস্তির নিকটে কৃষকপত্নীর পল্লীবধু বালিকা গৃহীণগণ ঘট-কক্ষে স্নানার্থী হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। নীলিমা যুগ্মনেজে চাহিয়া রহিল। ক্রমে প্রথম রৌদ্রেতেজে প্রবল পশ্চিমে বাতাসে তপ্ত বালি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণের মতই নীলিমার সর্বদেহের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। তৃপশ্চ বালুকাময় মৃত্তিকা তাহার নগ্নপদ ঝলসিত করিয়া দিল। তখন ক্ষুৎপিপাসার শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া সে একটা সুবৃহৎ তুঁত গাছের তলার বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, যেন অস্তিত্ব বিল কোশ পথও সে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আর একটি পাও হাঁটিতে গেলে সে যেন সেইখানে মুখ খুঁড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। নীলিমার বুক কাটিয়া এক ফোঁটা হাসি তাহার গুহনো গুহনো কোণে

ফুটিয়া উঠিল। যে মরণকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপেই তাহার সাক্ষাৎ লাভে লোকমান কি?—কিন্তু যুক্তির সহিত মন সব সময়ে ঠিক আপোষ করে না। অগত্যা তাহাকে সেই ছায়া-স্বশীতল-বৃক্ষতলাশ্রয়ী হইতে হইল।

আহা, কি সুমিষ্ট ঐ বাতাসটুকু! কি শীতল এই ছায়া! গাছের উপর গলায় চিত্রকরা কয়েকটা চন্দনা কিচির-মিচির শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নীলিমার মনে হইল—কি সুন্দর তাহাদের রূপ! আহা, ইহার একটিকে ধরিতে পারিলে—আবার সেই দুঃখদীর্ঘ যকের তীব্র ব্যঙ্গ হাস্য! হ্যাঁ, মরণের উপযুক্ত সন্ধ্যা বটে!

সহসা মৃত্যু-চিত্তকে অন্তরাল করিয়া দিয়া বাঁচিয়া থাকার সাধ দেখা দিল। সহসা তাহার মনে হইল, মরণেরই বা তাহার এত কি প্রয়োজন ঘটিয়াছে? জগতে এত লোক, সকলেরই যদি বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার থাকে, তবে সেই কি শুধু তাহা পাইবে না? কেন? কিসের অপরাধে?

অপরাধ খুঁজিতে গিয়া কিছুই সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। এক মন্ত বড় অপরাধ সে করিয়াছে বটে, তাহা ক্রপণের ঘরে, হিন্দুর ঘরে, গরীবের ঘরে হইয়া জন্মান। ইহাকে যদি অপরাধ বলিতে হয়, তবে অপরাধের হয় তো এই-ই যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু পাপের জন্ত সে তো নিজের দায়ী নহে। যে পিতৃকর্তব্য-বিচ্যুত নিহঁদয় পিতা তাহাকে—এ পৃথিবীতে আনিয়াছে, তাহার জন্ত দায়ী সে। যে পিতা সম্ভানকে কেবলমাত্র নিজের পোষা জানোয়ারের মতই খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া চারিটি চারিটি আহাৰ্য্য—তাহাও সম্ভবাব খোঁটা দিয়া—প্রদান-মাত্রের পিতৃ-কর্তব্য সমাধা করে, সম্ভানের কোন শিক্ষা, কোন উন্নতির জন্ত কোন দিন এতটুকু চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, যাহার নিজের জীবনই পশুজীবন হইতে সামান্তমাত্র বিভিন্ন—তাহাকে সম্ভানজননের অধিকার দেওয়া সামাজিক দুর্ভলতা—সমাজের পক্ষে তাহা মহা পাপ। সে জন্ত আর যে দায়ী হয় হোক, সে প্রায়শ্চিত্ত কেন সেই সম্ভানকেই শুধু করিতে হইবে? এ বিড়ম্বনার কি কোন প্রতীকার নাই? কেন সেই অপরের কৃত অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মরিতে হইবে তাহাকে? নির্দোষ—নিরপরাধ—সবেমাত্র এই আঠার বৎসর বয়স—এই কি তাহার মহিবার সময়? না, সে মরিতে না—মরিতে পারিবে না।



নীলিমার মরণপ্রত্যক্ষী নিশ্চিন্ত হৃদয় এইবার সত্তর সন্দেশে সন্দেশে ছলিয়া উঠিল। আচ্ছা না হয় সে নাই বলিল! কিন্তু বাঁচিতে হইলে তো তাহার একটা আশ্রয়েরও প্রয়োজন আছে।—যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইয়া বাঁচবে? এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বলিলে তো মরণের বহু দুর্দশা ঘটাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহার মতন মরণে ও রূপে যে অনেক বিপদ-পক্ষের হস্ত লাহিত হওয়ার সম্ভাবনা অগতে বর্তমান আছে, সে কথা তো তাহার অজানা ছিল না। তবে বাঁচবে সে কোথা! পিতৃগৃহে?—পিতার কথা শ্রবণে আসিতেই সত্তরে সে একবার তাহার সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জন প্রান্তরের চারিদিকে তাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। না, কেহ কোথাও নাই। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য্য যেন চারিদিকে পীতাত্ত অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া পৃথিবীকে যেন দহীভূত করিতে ছিলেন, তাহার সাধ্য নিজ নিজ আশ্রয়ের বাহির হয়।

নীলিমার মনে হইল, এখন যদি তাহার বাপের সঙ্গে তার চোখোচোখি হইত তো নিশ্চয়ই সে তখনই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। বাপের বাড়ীর অপেক্ষা মনের বাড়ী যাওয়া তাহার পক্ষে খুবই কঠিন নয়; বরঞ্চ অনেকই সহজ এবং নিঃসন্দেহ শাস্তিকরও। মরিবার ভয়েই বরং সেখানে যাওয়া চলে, বাঁচিবার ভয় নহে।

সাতদিন সে সেই গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া ভাবিত। ক্রমে তাহার চিন্তাশক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। অবসাদগ্রস্ত, শোকাবুল ও ক্ষুধ-পিপাসাতুর শরীর-মন কেমন একটা নেশার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত চেতনাকে অপহরণ করিয়া লইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া কাটাইয়া আবার সন্ধ্যার বাতাসে রৌদ্রতপ্ত লতার মতই কাহারও শুশ্রূষা ব্যতিরেকেও আপনা আপনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

তখন নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যালোক ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর তীর, তীর-বালুকা, জলধারা, পরপার সব একই অন্ধকারাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়া একমাত্র অন্ধকারই সর্বত্র অস্তিত্ব ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝিল্লীর এবং শৃগালের সমুচ্চ চীৎকারধ্বনি না থাকিলে সমস্ত জগতের জীবিতচিহ্ন এই অমিশ্র অন্ধকারে ঘুবি-বা

খুঁজিয়া পাওয়াই তার হইত। নীলিমার পারের তলা দিয়া কি যেন একটা খস-খস শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। সেই খস খস শব্দে তাহার সমস্ত চেতনাপ্রাপ্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া নিজের শরীরের দারুণ দুর্বলতা অনুভব করিয়া সে বিস্মিত এবং কিছু ভীতও হইল। এই শরীরকে টানিয়া তুলিয়া বহিয়া লইয়া আর কি কখন সে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে? সম্ভব তো মনে হয় না। অথচ এক ফোঁটা জল না পাইলে আর তো বাঁচিবার কোন উপায়ই তাহার নাই। মাথার উপর গাছের ডালে কয়েকটা বাছড় খুলিতেছিল, তাহারায় ঝপ-ঝপ করিয়া ডানা বাড়া দিল ও উড়িয়া গেল। একটা কালপেঁচা ঋতিকঠোর তীক্ষ্ণদৃষ্টি চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। একটা শৃগাল কাছ দিয়া বাঁহিতে বাঁহিতে বারেক দাঁড়াইয়া পড়িয়া নীলিমাকে আশ্রয় করিয়া গেল, জীকিত প্রাণী জানিয়া চকিতে ছুটিয়া পলাইল। মহাভয়ে নীলিমা তখন অলিতপদে উঠিয়া অতি কষ্টে এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মরণ যখন দূরে থাকে, আলস্যের অলোর মতনই তখন তাহা অতি উজ্জল মনে হয়, হৃদয়কে সে আকৃষ্ট করে; কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে হইলে ধীরে ধীরে প্রাণ চাই।

কখনও বসিয়া, কখনও চলিয়া অনেকখানি পথ অতিক্রম করিবার পরও যখন কোন লোকালয় পাওয়া গেল না, তখন হতাশা ও অবসন্নতা মিলিয়া নীলিমার হাতপাওলা অসাড় করিয়া দিল। সে তখন জীবনের আশামাত্র বিসর্জন দিয়া সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল; এবং তৎক্ষণাৎ অবসাদপূর্ণ গভীর নিদ্রা আসিয়া তখনকার মতন তাহার সকল যন্ত্রণারই অবসান করিয়া দিল।

যুগ তাজিল পরদিন সূর্য্যের আলো চোখে পড়িয়া। মুগ্ধভাবে অনেকখানি সুস্থদেহে সে অভ্যাস মত উঠিয়া বসিতেই তাহার বিস্মিত দৃষ্টিতে এক অপরিপা দৃশ্য প্রতিভাত হইল।

যেখানে সে শুইয়া ছিল, তাহারই ঠিক পাশ দিয়া নদীর গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। নদীজল সেখানে কিছু গভীর এবং তীরদেশ সমস্ত শ্রাবল ভূগম্পারিত। ধূসরবৎ বালুকামাশি পরপারে সাদা চাদর বিছানোর মতই দৃশ্য পড়িয়া আছে। অদূরে একটা ককচূড়ার গাছ। আপাদ-মস্তক তাহার রক্ত-পুষ্পে ভরিয়া আছে;

নীল-আকাশের নীচে তার পজাবলীমধ্যে তাহার সে লোহিত শোভা বৈচিত্র্যময় ও সুন্দরতম !

নীলিমা নিজের দৈহপ্রতি নেত্রপাত করিল। তাহার অঙ্গে আজও সেই বিবাহরাজ্যে পরিধৃত রক্তবস্ত্র রহিয়া গিয়াছিল। সে রাজা রং আজ অমৃত্তে অবহেলার বলিন হইয়া গিয়াছে, যেন কত দিনেরই পুরাতন। তাহারও মনে হইল, সে রাজিষ্টা যেন কত—কত কালই পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে ! তাহার সেই দাহময় অঞ্চল বধুনাথী স্মৃতি—এ জীবনে যে স্মৃতির আগুন কখন তাহার বুক হইতে নিবিবার নহে ; যে স্মৃতির সুখ তাহার এই মৃত্যুবাণাহত বজ্রাঘ্রদণ্ড ক্ষয়কে অন্ত-নিবেকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই জীবন বধুর রাজি সে যেন কোন্ এক যুগান্তরের অবিদ্যত স্মৃতিমাত্র ! নীলিমা যেন তাহার পর হইতে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়াই এই প্রকার গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন জীবনতরঙ্গী মহাকাশস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অনির্দিষ্ট পথে অহোরাত্রই ভাসিয়া চলিয়াছে ; ইহার শেষ কোন দিনই যেন সে খুঁজিয়া পায় নাই—এবং বুঝি বা পাইতে চাহেও নাই।

সুশীলের কথা এ ছুই দিনে নীলিমার অনেকবার বারে বারেই মনে হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ সে বিষয়টাকে সে ক্রমাগতই তার মন হইতে সবলে বিদূর দেবারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মন যখন তাহাতে বড়ই পীড়িত ও একান্ত রাত্ত বোধ করিতেছিল, সে তাহাকে তখন এই বলিয়া কখন যখন দিয়া কখন বা মিনতি করিয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছিল যে, সে তোমার কে ?—তুমি গরীবের মেয়ে, সে ধনীর সন্তান ! তাহার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? বামন হইয়া কে কবে আকাশের চাঁদ ধরিতে পারিয়াছে ?—আজ এখনও সে সেই বুদ্ধিই প্রয়োগ করিয়া নিজেকে তাহার সেই একান্ত রেশজনক—সেই অত্যন্ত সুখকর চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ঘ্যতাপ প্রথর হইবার পূর্বেই আজ তাহাকে একটা আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। আবার জিজীবিয়া তাহার মনে প্রবল হইয়া দেখা দিল। নদীতে নাহিয়া গানাদি সম্পন্ন করিয়া সে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিল, কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর সে জল তাহার পেটে থাকিল না—বমন হইয়া গেল। তখন আবার সেই দুর্বল চরণ কোনমতে কূলে উঠাইয়া, সমুখ লক্ষ্য পুনরাপি সে চলিতে আরম্ভ করিল।

৫২ (খ) ১০

কি অসীম এ রাজ্যপথ ! ইহার কি কোথাও সমাপ্তি নাই ? এ কি তাহার মহারাজ্য ? নীলিমা যে আর পারেনা। তাহার পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুর সম্মুখে যর রৌদ্র-জাল যেন ধোঁয়ার মত ধূসর, মেঘের মত নিকর কালো হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সেই চলারও আর বিরাম নাই।

দ্বিপ্রহরে অগ্নিতপ্ত ধূলাবাণি উড়াইয়া প্রবলবেগে বড় বহিতে আরম্ভ করিল। যেন শতধারে তীব্র শরাঘাত সর্বদা তার ভেদ করিয়া দিতে লাগিল। কণ্ঠে কণ্ঠে পতনেন্দ্রুখী হইয়াও তুচ্ছকণ্ঠে যথপথে যাত্রীকে দেহ টানিয়া লইয়া চলিল, তখনও নীলিমা গতি বন্ধ করিল না। কিন্তু এইবার বুঝি সব শেষ!—সুশীল !—সুশীল !—

অদূরে ঐ না একটা বাড়ী ! ধূলিমেঘজাল ভেদ করিয়াও তাহার উজ্জল রাজা রং ঐ যে সুস্পষ্টতর দেখা বাইতেছে না ? না না, চলিতেই হইবে—বাঁচিতেই হইবে—বাঁচিয়া থাকিলে হয় তো—হয় তো কখনও না কখনও দেখা হইলেও হইতে পারে। একবার—একবার—এক নিমেষের দেখা—আর একটবার—অন্যের শোধ একটবার—না না, আর দেখা নয়—না না—আর বাঁচা নয়—না না, আর চলা নয়—আর পা উঠিতেছে না—দেহ বহিতেছে না—আর বাঁচিবার উপায় নাই—কোনই উপায় নাই—ওঃ, সুশীল !—সুশীল !—সুশীল !

নীলিমার সংজ্ঞাহারা অচেতন দেহ দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিতপ্ত বাঁচিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া ছরস্র গ্রীষ্মের আগুনে বড় উদ্ভাস ভাবে তপ্ত বালুকারাণি উড়াইয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তাহার মাথার উপর কেবলমাত্র পদ্ম-প্রান্ত চিলের আর্দ্রতর কদাচিত্র এক একবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এ ভিন্ন আর কেহ কোথাও তাহার এ ভয়ানক অবস্থার সাক্ষিমাাত্র থাকিল না।

### উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ইহার পর নীলিমা যখন চোখ চাহিল, তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তখন বর্ণাতিভূতের তার দুই পদার্থের প্রকৃত স্বরূপকে সম্যকরূপে ধারণা করিতেই পারিল



না। চারিদিকেই তাহার বেন সমুদ্রকেই অজানা অচেনা বলিয়া বোধ হইল। সে কোথায় ছিল? কোথায় আসিয়াছে? কেমন করিয়া এখানে আসিল? এ সকলের কোন ধারণাই বেন তাহার মনে ছিল না, মনে করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সবই বেন শূন্যময়। কিছুতেই কিছু মনে পড়িল না। অগত্যা সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

এক জন হিন্দুস্থানী 'দাই' তাহার পরিচর্যা করিতেছিল, নীলিমা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে মনে করিল, কিন্তু কি ভয়ানক তার দুর্বলতা! এমন কি বাক্যস্মরণের সামর্থ্যটুকুও তার মধ্যে বর্তমান ছিল না। ঠোট তাহার নড়িল কি না, বুকা গেল না, শব্দ যে বাহির হয় নাই, তাহা নিজেও সে বুঝিয়াছিল।

আরও কয়েকটা দিন গেল। ক্রমে তদ্বার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, ভীষণ দুর্বলতা অতি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন চোখ চাহিতে আর ততদূর ক্রেশ বোধ হয় না, কানেও সে কিছু কিছু শুনিতে পায়। শুশ্রূষাকারিণীর সহিত দুই একটা কথাও বলিয়া থাকে, কিন্তু দুই একটা শব্দের অধিক একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারে না। এইবারে সে দেখিল, প্রাতে ও অপরাহ্নে একটি বয়ীসী মহিলার সহিত এক জন তরুণবয়স্ক পুরুষ তাহার কক্ষে প্রত্যহই আগমন করিয়া থাকেন—উভয়েই তাহার শরীর পরীক্ষা করেন। শুশ্রূষাকারিণীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপদেশ প্রদানানন্তর প্রস্থিত করেন। মহিলাটি প্রায়ই একটি সুগন্ধি পুষ্প আনিয়া নীলিমার রোগ-শয্যার উপর স্থাপন করেন, বিদায়কালে তাহার মুখের দিকে সম্মুখে দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন দিন একটু স্নেহ জানাইয়া যান। তাহার চলিয়া গেলেও নীলিমা বহুক্ষণাবধি তাহাদের প্রস্থান-পথের অভিমুখে নিম্নে চাহিয়া থাকে। এই শান্ত সৌম্যমুর্তি নারীর মধ্যে বেন তাহার চরিত্র স্নেহ-সুখা অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আইসে। তাহার শুক জ্বালায় নেত্র অশ্রুর জীবৎ আভাস অকস্মাৎ দেখা দেয়, তাহার প্রায়-রুদ্ধ চিত্তে হৃদয় অতীতের স্মৃতির মতই ক্রীণভাবে আগিয়া উঠে তাহার মনের কথা।

ক্রমে নীলিমা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। এখন তাহার সব কথাই মনে পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, সে মরণের খুব নিকটবর্তীই হইয়াছিল, কিন্তু

আবার সেখান হইতে ফিরাইয়া তাহাকে বাঁচাইল কে?

যে দিন করের মধ্যে দুই এক পা করিয়া নীলিমা হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারিল, সেই দিন বথানিয়মে সেই পুরুষ ও বয়ীসী মহিলা তাহাকে দেখিতে আসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহারা যুগোপীয়া, সম্বন্ধে ভাইবোন, জাতিতে আইরিশ,—মহিলাটি এই স্থানের ব্যাপটিষ্ট বিশপের প্রধান কজী। অপর জন হৃদয় সিদ্ধান্তমুখে পাদরীর কার্য করেন, ভগ্নীর অসুস্থতা সংবাদে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

বিস্ ওকবর্ণ অতি মধুর স্বরে তাকা বাদাগার বলিলেন, "বাছা! তুমি যে জীবন পাইলে, এ শুধু দয়াময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া জানিও। এরূপ অসম্ভব ঘটনা বাশাস-ক্রাইস্টের সময়েই শুধু তাহারই দ্বারার সম্ভব হইয়াছিল।"

মিষ্টার ওকবর্ণ বিস্কারিত নেত্রে মন্তব্য করিলেন, "অসম্ভব সত্য।"

নীলিমা কিছুই না বুঝিয়া হতবুদ্ধিতাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কে বাঁচালে?"

বিস্ ওকবর্ণ উর্ধ্বে চাহিয়া মুদিত নেত্রে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই ঈশ্বর!"

মিষ্টার ওকবর্ণ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন, "তাহাতে কোনই সংশয় নাই।"

নীলিমা বখন ঘটনাটার আভ্যোপাত্ত শুনিয়া, তখন ইহাদের বিশ্বাসের সহিত তাহাকেও একমত হইতে হইল। না হইয়া যেন আর কোন উপায় রহিল না। সেই জনমানবপরিশূভ মরুভূমিতে হানে শুণ্ড বালুকা বড়ের মধ্যে শোকাহতা, লাঞ্ছিতা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা, অনাথা বালিকার আসন্ন মরণের ঠিক সন্ধিক্ষণে কে আর এই বিদেশী পুরুষকে অকস্মাৎ প্রেরণ পূর্বক তাহাকে জীয়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন? যদি তিনি ঈশ্বর নাই করেন? যে করুণা নীলিমা তাহার কোন স্বদেশীয় নিকট, এমন কি, নিজের বাপের কাছেও কোন দিন পায় নাই, সেই সংসারের সার, স্থবাসমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ করুণাধারা কে আর এই বৃদ্ধা বিদেশিনীর অন্তরে প্রেরণ পূর্বক তাহাকে সমস্ত নিজগৃহে তুলিয়া আনিয়া সুচিকিৎসায় ও সমস্ত শুশ্রূষায় পুনর্জীবনের সহায়তা করিল? নীলিমার নিম্নলিখিত নেত্র দিয়া প্রবলবেগে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা ঝরিয়া

পড়িল। সে সহসা সেই সেবাত্রাধারিণীর পদতলে নতজানু হইয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গদগদ স্বরে কহিয়া উঠিল, “আপনি আমার মা, আপনার আমি চিরদাসী হয়ে থাকবো।”

মিস্ ওকবর্ণের নেত্রও জলপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার স্বভাবমধুরভাবে নীলিমার মস্তকে পৃষ্ঠে মেহ-হস্ত বুলাইয়া স্নিগ্ধমুখে কহিলেন, “নিশ্চয়ই! তুমি আমার মেয়ে। কিন্তু আমার অপেক্ষা ঈশ্বরের কাছে আর আমার এই ছোট ভাই জর্জের—মিটার ওকবর্ণের কাছেই তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া সঙ্গত। আমি কিছুই করি নাই। সে দিন সেই ঝড়ের সময় যদি আমার ভাই জর্জ তোমার রক্তের প’ড়ে থাকতে দেখে মোটর পারিয়ে তুলে না নিত, তা হ’লে কারও সাধ্য ছিল না যে, তোমার বাঁচাতে পারে। অবশ্য করণার ঈশ্বরই তাকে সে কার্যের সুযোগ দান করেছিলেন।”

মিটার ওকবর্ণ বস্ত্রচালিতের মতই প্রতিধ্বনি করিয়া গেলেন, “তাতে আর সন্দেহ কি।”

নীলিমা তখন অশ্রুপ্লাবিত মুখ তাহার অদূরবর্তী আইরিশ যুবকের দিকে কিরাইল। অবিভক্ত ইংরাজীতে বলিল, “আপনাকে কি ব’লে কৃতজ্ঞতা জানাব, আমি জানি না।”

যুবক মুহূর্ত হাসিয়া উত্তর দান করিলেন, “তুমি শুধু ঈশ্বরের কাছে তোমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাও।”

নীলিমাকে ইংরাজী বলিতে শুনিয়া মিস্ ওকবর্ণ সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি ইংরাজী বলিতে পার। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা গ্রীলোকদের মধ্যে শতকরা একটা হিসাবেও পড়ে না। জর্জ! তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বিপরীত বালিকা নিশ্চয়ই ভ্রম-বংশীয়া।”

নীলিমার প্রতি মিস্ ওকবর্ণের মেহ-বস্ত্র প্রতিদিনই যেন বর্দ্ধিততর হইতে লাগিল। সুখাপ্ত বলকারক ঔষধ ও মনে ভরসা পাইয়া নীলিমার দুর্বল শরীরে অতি শীঘ্র শীঘ্রই বলাধান হইতে লাগিল। এমন কি, জীবনে কখন যে স্বাস্থ্যের সুখ সে দেখিতে পার নাই, লালকুঠী মিশনের কর্মীর পোষাকভা হইয়া সে বাস-খানেকের মধ্যেই তাহা লাভ করিল। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে স্নানান্তে নতুন শ্রাবণসারিধারাপুষ্ট হইয়া যেমন নবীন ও সতেজ হইয়া উঠে, শ্রাবণ পদ্মাবলীতে বিভূষিত

হয়, নীলিমার অবস্থাবর্দ্ধিত, অশ্রুতে সিক্ত, কীণ বেহেলতা তেমনই তাহার নূতন আশ্রয়ের আচ্ছন্নালোকে। উৎকট রোগমুক্তির পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির একটা সুযোগ তাহাকে যেন এবার নূতন করিয়া গড়িল। নীলিমার গৌরবর্ণ রক্তাঙ্গতার পূর্বে পাণ্ডু দেখাইত, এখন তাহাতে যেন গোলাপের আভা মিশ্রিত হইল। তাহার চোখের দুর্বল দৃষ্টি কুঠার মতই নত হইয়া থাকে, এখন তাহাতে প্রাণশক্তির স্ফুর্তি হওয়াতে তাহা উজ্জল ও চকল দেখাইল। তাহার অস্থিমার কীণ মেহ সুপুষ্ট ও স্নানলিত ভাবে স্ফুর্টিত হইয়া উঠিল।—স্বা পদার জোয়ার আসিল।

লালকুঠীর আশ্রয় নীলিমার পক্ষে এক সুখবস্তু। রোগশয্যার প্রায় দুই সপ্তাহ কাটাইবার পর রোগমুক্ত অবস্থায় তাহার এখানে তিন বাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই বাসত্রয় তাহার কাছে যেন আরব-রজনী হইতে ছানিয়া আনা তিনটি রাত্রি। মিস্ ওকবর্ণ তাহাকে বাস্তবিক কন্ডার্নেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত অল্প দিনের পরিচয়ে মানুষকে যে মানুষ এতই ভালবাসিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে, মানুষের এ উদার মহৎ পরিচয় নীলিমার কাছে চির-অজ্ঞাত ছিল। আজ তাহা প্রকটিত হইল—এক বিদেশিনীর মধ্য দিয়া। নিজের দেশকে সর্বাস্বঃকরণে তীব্র যুগা করিয়া সে কারমানে সেই ভিন্নধর্মী ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিণীর প্রতি তাহার সকল কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত করিয়া দিল। নিজেকে ইহার কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সে সেই মেহ-করণার স্রোতকে বর্দ্ধিত ও বেগবানু করিয়া তুলিল। মিস্ ওকবর্ণ নিজের বাক্সের চাবি, হিসাব-পত্র সমুদয়ই তাঁহার পোষাকভার হস্তে তুলিয়া-দিলেন। নিজে তাহার ইংরাজী করানী পিয়ানো শিক্ষার সবিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহাকে তাহার লাটিন শিক্ষার নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং সর্বদা তাহাকে সে বিষয়ে অনন্যোযোগ জন্ত অসুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না। অথচ সে বেচারারও এ সবকিছু কোনই জ্ঞাতি ছিল না, বরং বিশেষরূপ উৎসাহই ছিল। সেটা আবার এত বেশী যে, নীলিমাকে তাহার জন্ত সময় সময় বিব্রত হইতে হইত। অথচ প্রাণদাতাকে যুগাকরে কিছু জানাই-বারও উপায় নাই।

কেবল একটি বিষয়ে নীলিমার এখনও বৈধন্যত সন্দেহ নাই। মিস্ ওকবর্ণ তাহাকে দুই চারিবার



বলিয়াছেন, মিষ্টার ওকবর্ণ তাহাকে প্রায় প্রত্যাহই দুই চারিবার করিয়া খুঁটখুঁট দীক্ষা লইবার কথা মনে পড়াইয়া দেন, ইদানীং তাহার সংশয় মিটিতে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মিষ্টার ওকবর্ণ একটু অসহিষ্ণু হইয়াও উঠিয়াছিলেন এবং লাটিন পড়াইতে বসিয়া দুই বেলাই বাইবেল-বর্ণিত বিষয়ের উপরও অনেকখানি কল্পনা যোগ করিয়া অ-খুঁটানের অ-স্বর্ণ সম্বন্ধে খুবই ভীষণ-ভাবে আলোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি নীলিমার মন হইতে এতটুকু চলচ্চিত্ততা দূর হইতেছিল না। হিন্দুধর্মের সে কোন খবরই জানে না, হিন্দুদের কোন শিক্ষাই কোন দিন সে পায় নাই— তাহার মা-বাপই সে সম্বন্ধে এতটুকু আলোক পাইরা-ছিল কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয়মূল। উচ্চ হিন্দুদের উদার শিক্ষা দূরের কথা, হিন্দুধর্মের অভ্যন্তর বহিরে যে আচারনিষ্ঠাপরায়ণতা মাত্র, তাহাও এখনকার বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিবার-পদ্ধতির মধ্যে বড় একটাই দেখা যায় না। বার-ব্রত, দানধর্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অতিথি-সেবা, তীর্থযাত্রা একাদশবর্তী পরিবারের মধ্যে ত্যাগশীলতা, সংযম প্রভৃতি যে সকল সদাচার ■ সদৃশ হিন্দুসমাজের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচুরতরুরূপেই বর্তমান ছিল, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলিমা যে বাড়ীতে জন্মিয়া যে সঙ্কীর্ণ পরিবৃত্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে, তাহাতে সকল শিক্ষাই তাহার অদম্পূর্ণ। মানুষকে সে হীন, স্বার্থপরতাপূর্ণ, নির্মম—অথবা ভীক, সঙ্কুচিত, অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত—ইহার বাহিরে আর কোন মূর্তিতেই দেখিতে পায় নাই। তাই স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ তাহার মনে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অনেক বেশীই ছিল, কারণ, এটাকে সে ভাল করিয়া না চিনিলেও ইহার একটা লোভনীয় বাহ্যশোভা তাহার ছটো চোখকে ধামিয়া দিয়াছিল। বিন্দুনারীদের মধ্যে জীবনের অনেক অংশই তাহার কাটিয়াছে। ইহাদের ভিতরে আর কিছুই না থাকুক, দয়াদাক্ষিণ্যের কোনই যে অভাব নাই, তাহাতে আর সংশয় কি? সে দেখিত, এই খুঁটখুঁটাবলম্বী সমস্ত জাতটাই কোন্ সুদূরে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর জন্ত একান্ত আগ্রহে চিন্তা করিতেছে। জগতের সর্বত্র তাহারা নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক নিঃস্বার্থ ও সত্যতা প্রচারমাত্রই নহে, অনাথ শিশুদের রক্ষার জন্তও যত্নে প্রচেষ্টা করিয়া

জটিল রাখে নাই। শত সহস্র অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা পূর্বক কত মানবশিশুর অকালবিয়োগ প্রতিরোধ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কত শতকেই চোর, দস্যু ও ভিক্ষাপঞ্জীবি হওয়া হইতে রক্ষা করিতেছে। আর্ন্ত ব্যক্তি ওদের দ্বারা ঔষধপথ্য ও সেবালাভে কৃতার্থ হইতেছে; বিদ্যা, জ্ঞান, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম সফল করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমস্ত মানব-সমাজের জন্তই ইহাদের চিন্তে করুণার অপার বারিষি যেন স্বতঃই উৎখলিত হইতেছে। এ দয়ার ■ জাতি নাই, ধর্ম নাই, পাত্রাপাত্রজ্ঞান নাই—যেখানে অভাব ও অত্যাচার, সেইখানেই ইহাদের সেবাকুশল করুণাম্পর্শ। এই করুণার উৎস ইহাদের নিজ দেশভূমি, আত্মীয়বন্ধু সর্বত্র ত্যাগ করাইয়া অপার জলধিগর্ভ হইতে বাসুদয় মরুস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হেন স্থান নাই—যেখানে ঠেলিয়া না পাঠাইতেছে। এ ধর্ম মানুষকে উদার করে, উন্নত করে, মানুষকে মানুষ বলিতে শিক্ষা দেয়। ইহার অপেক্ষা বড় ধর্ম আর কোথায় আছে? নীলিমার প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল। এই ধর্মই অতঃপর তাহার নিজের ধর্ম হোক, ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সে নূতন ভাবে জীবন গড়িবে। সে জীবন মিস ওকবর্ণের মতই নির্মল নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ ও সেবা-ব্রতধারী হইবে। নীলিমার আশাহত অন্ধকার প্রাণ যেন নব-রবির নূতন রশ্মিলাভে আলোকোদীপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সে মনের মধ্যে কতই না গড়িয়া তুলিল। কিন্তু ঐ যে একটুখানি ■ সঙ্কোচ, মূলে তাহার এতটুকু একটুখানি ছরাশা, সেটুকু যে কিছুতেই ম্লিতে চায় না। সে যে কিসের কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া দাঁড় করায়, তাহাকে তো নূতনের সহস্র প্রলোভনও বশীভূত করিতে পারে না।

সুশীল! সুশীল এ কথা শুনিলে কি বলিবে? সুশীল যদি তাহাকে লোভী বলিয়া, অসহিষ্ণু প্রতি-হিংসাপরাধণ বলিয়া মনে করে, বিধর্মী বলিয়া ঘৃণা করে? ■ অবশ্য বলে যে, তাহার ■ এতই ভাবনা কেন? তাহার সঙ্গে এ জীবনে দেখাই কি আর কখন তোমার হইবে? কিন্তু এ যুক্তিতে জন্ম কোনই সাহসনা খুঁজিয়া পায় না। দেখা যদি কখন না-ই হয়, তথাপি মনে মনেও যে সুশীল তাহাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে, সে স্বত্তিও যে তাহার চিন্তে

অসহ্য দাহ আনি । দেয় । সুশীল তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, সে হুঃখ নীলিমা প্রাণপণে সহিতেছে, কিন্তু তাহার ঘৃণা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে ? না না, তাহা হইতে পারে না । নীলিমার মন হইতে তাহার সকল সাধ সব আশা মুছিয়া যায় । মিষ্টার ওকবর্ণ দিনের পর দিন হতাশা লইয়া ফিরিয়া যান ।

এক দিন—সে দিন মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার পাঠ-সমাপ্তির পর যথাপূর্ব্ব তাহার খুঁটান হস্তার সপক্ষে ঝাড়া দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পরও তাহাকে সংশয়চ্ছন্ন ও চিন্তাকুল দেখিয়া খুব জোর করিয়া ধরিলেন, বলিলেন, “তুমি হিন্দুধর্মে নিজের প্রজ্ঞা নাই বলিতেছ, অথচ খুঁটান হইতেও চাও না, —ইহার ভিতরকার কথাটা কি আমার বলিবে ? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে । সম্ভবত অ্যাংকোরস্,—আই থিক্ ?”

এই সুম্পষ্ট বুদ্ধিবোধায় নীলিমা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল ।  
মিষ্টার ওকবর্ণের মুখের উপর সত্যতাবিকারের একটা হর্ষের দীপ্তি উজ্জল হইয়া উঠিতে উঠিতে সহসা মধ্যপথেই বাতাহত দীপশিখার মতই সেটা নিবিয়া গেল । তিনি সন্দেহগস্তীরমুখে অনুসন্ধিৎসুনেত্রে কণকাল নীলিমার নতমুখে চাহিয়া থাকিয়া পরে অল্প মুহূর্ত্তে কহিলেন, “আমার সন্দেহই তবে সত্য, মিস্ চক্রবর্তী ?”—তাহার পর তথাপি তাহাকে বাক্যহার্য্য প্রতিবাদবিমুখ দেখিয়া সহসা মিষ্টার ওকবর্ণের শুভ্র মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার স্বর উত্তেজিত এবং আবেগপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল । তিনি কহিয়া উঠিলেন, “ও, না—না, ও সকল পূর্ব্ব-দুর্জলতা মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেল । ‘লেট্ দি ডেড্ পাঠ্ বেরি ইট্ ডেড্, এণ্ড অ্যাঙ্কি অ্যাঙ্কি, ইন্ দি লিভিং প্রেজেন্ট্, হার্ট্ উইদ্বিন এণ্ড গড্ ওভারহেড্ ।’—অতীত বিস্মৃত হও এবং ঈশ্বরের কার্য্যে মনোনিবেশ কর, বিগতের পানে আর ফিরে চেও না, মিস্ চক্রবর্তী !”

নীলিমা তথাপি নিরুত্তরেই রহিল । মিষ্টার ওকবর্ণের মর্ম্মস্পর্শা বাক্যগুলো তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গস্তীর বেধবস্তারে সঘনে বাজিয়া উঠিতেছিল ।—‘লেট্ দি ডেড্ পাঠ্ বেরি ইট্ ডেড্ ।’—‘ডেড পাঠ্ ।’—তাহার অতীত তাহার কাছে

তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু নয় । মৃত—একেবারেই মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন-নিবন্ধ—নিঃসার,—প্রাণহীন । কি আছে তাহাতে ? এতটুকু রূপ রস গন্ধ তাহার মধ্যে আছে কি ? না, না—পিছনে ফিরিয়া চাহিবাক্ষী তাহার কোথাও কিছু বাকি পড়িয়া নাই । তবে সে কিসের মোহে হইয়া এই “লিভিং প্রেজেন্ট্”কে এই আশা-আনন্দ-সুখস্বপ্নে ভরা জাগ্রত জীবন্ত বর্তমানকে তুচ্ছ করিতে পারে ? ইহাদের অবহেলার ফিরাইয়া দিয়া সেই মৃত অতীতকেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে ? কি আছে তাহার মধ্যে ? কে আছে তাহার ?—সহসা নীলিমার চিন্তাকুল সমস্ত অন্তরকে বধিত ব্যধিত করিয়া তাহার মাঝখানে ফুটিয়া উঠিল একখানা মুখ—সে মুখখানা সুশীলের । অতীত তো তাহার মরে নাই । সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাপানে অমর হইয়া আজও দেহ-বিচ্ছিন্ন রাহুর মন্তকের মতই মৃত্যুঞ্জয়রূপে বাঁচিয়া আছে । কই, মরণের কূল হইতে এই নবজীবনের মাঝখানে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তো তাহার মনের এই সমুজ্জল স্মৃতিটুকুর এতটুকু উজ্জল্য নাশ বা হ্রাস হয় নাই ! এ যে তেমনই স্মর—তেমনই ভাস্বর হইয়াই আজিও অনিমেবে আগিয়া আছে । এই চিন্তায় নীলিমার চিত্ত বেন চন্দ্রোদয়ে ক্ষীতবন্ধ জলধির মতই সুখোদ্বেল হইয়া-উঠিল । তাহার অন্তরের সেই সুখস্রোতের তরঙ্গ তাহার বাহিরের ও সারা দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল । তাহার সেই সুধাসিকুর আলোড়নে তাহার সুপুষ্ট গণ্ডর সরস রক্তিমার সমুজ্জল হইয়া উঠিল, সেই সুখস্মৃতির স্রবণমাত্রে তাহার চির-হাস্তবিরহিত অধরপ্রান্ত স্নিতহাস্তে উদ্ভাসিত হইয়া রহিল তাহার নেত্রের সলজ্জ জড়িমার অবনত হইয়া আসিলেও তাহার মধ্য দিয়াও সুকোমল দীপ্তি বিভাসিত হইতে লাগিল ।

আইরিশ যুবকের আরক্ত মুখ তাহার সমুখবর্ত্তিনীর আনন্দম্রিত মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শুভ্রতর হইয়া গেল । সুখস্মৃতির আন্দোলনে হর্ষদীপ্ত সেই সমুজ্জল ও সলজ্জ মূর্ত্তি তাহার বুকের মধ্যে একটা বেদনার আঘাত প্রদান করিল । সংশয় নিশ্চিত মতো প্রতি-ষ্ঠিত হইল । তিনি কণকাল নির্দীপ্ত মুহূর্ত্তে নীলিমার অপূর্ব্ব রাজ্যশ্রীবিমণ্ডিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কণপরে জীবৎ জীব্য-বিদগ্ধ প্রেমের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি বাহার কথা কহিয়া ঈশ্বরের ডাক



কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিন কর্ণপাত করিবে বলিয়া আশা কর ?”

■ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া মিঃ ওকবর্ণ পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, “আমার মনে হয় যে, সে বিষয়ে তোমার চিন্তেও নিশ্চয় কিছু সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই তাই—নতুবা তুমি সে দিনের সেই অগ্নি-বৃষ্টির মধ্যে কখনই অমন করিয়া অনাহার-ক্লেশ, চলচ্ছক্তিহীন, অসহ্য ভাবে মরণের সমুদ্রত আলিঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে না। সম্ভবতঃ তোমার প্রণয়ী (ইওর-লাতার) পিতৃবৎসল, পিতার দয়াজীবী (ফাদারস্ চ্যারিটি-বয়) তোমার বিবাহ করিলে ঘোড়ক পাইবে না বলিয়া কোন দিন তোমার সে তার পিতার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে না—সম্ভবতঃ সে তোমার ভালবাসেও না, অন্তের প্রেমে হয় ত বা তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া আছে—সেই অন্ত-পরায়ণ, অথবা ভীক, অথবা তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন—একটা অযোগ্য নরের ■■■ তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শুধুই অবধা বিলম্ব করিতেছ না—সংশয় করিতেছ, ইহা তোমার একান্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা এবং ইহার শাস্তিও তোমার ঈশ্বরের নিকট হইতে অবশ্য পাইতে হইবে।”

নীলিমার সেই বর্ণ-সমৃদ্ধ আনন্দমগ্ন মূর্তি ঘোর বিবাদের কালিমায় লিপ্ত হইয়া একান্ত মলিন হইয়া গেল। ‘অন্তর প্রেমে চিত্ত তাহার পরিপূর্ণ হইয়া আছে’,—তা আছেই তো! সুলেখাই তো তাহার সব। নীলিমা তাহার কে? সেই সুলেখার জন্তই গাত্র-হরিদ্রা অধিবাসের পরেও বিবাহ-রাত্রির মন্ত্রপাঠ করেকটামাত্র বাকি রাখিয়া সে উল্লসিত চিত্তে তাহার উদ্দেশ্য ছুটিয়া পলাইয়াছে। আর সে মুক্তি লইয়াছে কাহার হস্ত হইতে? শতবার চিন্তিত এই অসহনীয় বাথিত চিন্তা আবার মনের মধ্যে আগিয়া উঠিয়া নীলিমার সমস্ত আনন্দ-উৎসের মুখগুলাকে নির্মম করিয়া চাপিয়া ধরিল। হায় সুলীল! এতটুকু ভালবাসা যদি তাহার ■■■ তোমার হৃদয়প্রান্তে পড়িয়া থাকিত! এতটুকু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, কিছুই কি, এক বিন্দুও কি ছিল না? বিন্দুমাত্র না? না, না—তা থাকিলে কেহ কি তেমন করিয়া কাহাকেও ফেলিয়া যাইতে পারে? ওঃ সুলীল! সুলীল! কি নির্ধুর, কি কঠোর তুমি! তোমার সুলেখা—যাক, বুধা কেন আর ■■■ ভাবনা? যাহা গিয়াছে, তাহা

চিরদিনের মতই তো চলিয়া গিয়াছে। যাহা চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা কখনই ফিরিবে না। তবে কেন বুধা সেই হ্রাশা-স্বপ্নের ধ্যানে মগ্নিচকার সন্ধানে আকাশকুসুমের কলনার সারা জীবনটাকেই মিথ্যা অপব্যয় করিয়া ফেলা?

মিষ্টার ওকবর্ণের বাস্তবতা তীব্রবাক্য কাঁটার মতই নীলিমার মনের বুকে বিধিয়া উঠিল—‘তুমি যার কথা ধ্যান করে ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিনই কর্ণপাত করিবে আশা কর?’ না, কোন দিন না।—কোন আশা নাই—কোন আশাই নাই! ওঃ সুলীল! সুলীল! সুলীল! কেন তুমি এমন নির্মম হইলে? কেন তোমার চিত্ত সুলেখায় হইয়া রহিল? যদি সুলেখার সহিত তোমার কোন দিন দেখা না হইত, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহের বাগদান না থাকিত, তবে হয় তো বা তুমি আমার অমন করিয়া অবহেলা করিতে পারিতে না; অথবা তাহাও হয় তো করিতে, বেহতু, তুমি ধনীর সন্তান—আমি গরীবের মেয়ে। উঃ সুলীল! কেন তুমি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে?

গভীর নৈরাশ্রের অনিবৃত্ত হাহাকারে নীলিমার বক্ষ বেন দীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণের শ্লেষোক্তিগুলো তাহার গুপ্ত-হৃদের আচ্ছাদন বড় নির্মম হস্তেই ছিড়িয়া দিয়াছিল। ইহাতে তাহার কলনাসরস চিন্তাধারা আবরণমুক্ত কঠোর মতোয় নগ্ন-মূর্তি বেন ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং ঈর্ষ্যা, শোক ও নিরাশায় প্রাণ সহস্রধা হইয়া গেল।

### চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন নীলিমার চিত্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল! সুলীলের প্রতি মনে পাছে কোন বিরাগ দেখা দেয়, সেই ভয়ে সে পূর্বে তাহার কথা ভাল করিয়া স্মারিতেও ভরসা করিত না। মাত্র তাহার স্মরণ মুখ, তাহার স্নেহের বাণী—তাহার আদরের সম্ভাষণ এইটুকুই স্মরণে আনিয়া নিজের অন্তরকে সুখপ্রদীপ্ত রাখিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিন্তু মিষ্টার ওকবর্ণের সহিত সে দিনের সেই আলোচনার পর সেই আবরণের পর্দাখানা অকস্মাৎ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ■■■ এখন আর আঁখি ঠারিয়া রাখিলে,

লে না। সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় আর তার হাতে নাই। সুনীলের স্বতিতে আর তাহার মনে সুখের লেশ জাগে না—জাগিয়া উঠে প্রচণ্ড ব্যথা-ভরা তীব্র অভিমান। স্বার্থপর ভীক কাপুরুষ সে—তাহাকে বিপর করিয়া তাহারই হাতের মুক্তি লইয়া চোরের মতন পলাইয়া গেল। কি যুগা! ছি, ছি, নীলিমার কে সে যে, নীলিমা তাহার কথা ভাবিবে? তাহার বুধা চিন্তায় নিজের জীবনকে চির-ব্যর্থতার হস্তে তুলিয়া দিবে? এ কি বুদ্ধিব্রংশ তাহার? না, না, এ তাহার দুর্ভিক্ষ; এ দুর্ভিক্ষ যেন কখন না হয়।

মিষ্টার ওকবর্ণ একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার দিদির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ক্লারা ওকবর্ণ নিজেও নীলিমাকে অনেক আশার বাণী শুনাইলেন। খুঁটানের পরমার্থ যে সুরক্ষিত, তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রলোভন নীলিমা দেখিতে পাইল এবং ইহলোকটাকেও তাহার এখন আর পূর্বের মত তুচ্ছ বোধ হইল না। সে খুঁটান হইতে এইবার কৃতনিশ্চয় হইল।

এই উপলক্ষে লালকুঠীতে একটু আনন্দ-সমারোহ পড়িয়া গেল। এখানকার দাসদাসী এবং অনাথা মেয়েরা, তাহাদের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই এই কয় বাসের মধ্যে নীলিমাকে বিশেষভাবে মেহ করিয়াছিল। এত দিন তাহাকে একটু পর পর বোধ করিয়া সকলেই কিছু সঙ্কুচিত থাকিত, এখন তাহাদের মনে হইল, সে যেন তাহাদের আপন জন হইয়া গেল। মিষ্টার ওকবর্ণ আজ কয়দিন হইতে এতদুপলক্ষে এতই আনন্দোত্তেজিত হইয়া আছেন যে, তাহা দেখিয়া নীলিমার অবসাদগ্রস্ত চিত্তেও সময় সময় একটা বিস্ময়-কৌতূহলের উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

বধাকালে শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নীলিমার প্রাণ তাহার মধ্যে তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। উদ্ধ্বস্তে সে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিয়াছে—সুনীল! সুনীল! কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখ, অন্যজন্মান্তরের মতই আজ আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম! আর সে শুধু তোমারই! তুমি যদি আমায় এক বিন্দুও ভালবাসিতে! যদি অভাগিনী বলিয়া—অত্যাচারিতা অনাদৃত্য দেখিয়া তোমার সুখস্পর্হাচিতে এতটুকু তাপের মহত্ত্ব দেখা দিত, তাহা হইলে আমার **না** এমন করিয়া তোমার

কাছে পরের অপেক্ষা পর হইতে হইত না। ইহজীবনে নাই হোক, তবু পর-জীবনে, পরলোকে তোমার পাইবার আশা লইয়া সেই সাধনাতেই **■** অন্যটা না হয় ক্ষয় করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা তো হইল না। আমার **■** তোমার অন্তরে বা বাহিরের কোথাও এতটুকু তিলমাত্র স্থান নাই—বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই—আমার জীবনের মূল্য তোমার কাছে কাণা কড়িও নয়! আমার মৃত্যু তোমার পক্ষে তুচ্ছ অপেক্ষাও তুচ্ছ বস্তু। তবে আমিই বা কেন অনর্থক চিরদুঃখকেই শুধু বরণ করিব? নিজের মঙ্গল-চেষ্টা কে না করে?

কিন্তু দুঃখকে ত্যাগ করিব মনে করিলেও সেই চিরসার্থী হুশিষ্টা নীলিমাকে ত্যাগ করিল না। সুনীলের চিন্তাতে আজও তাহার চিত্তে ক্ষণিক সুখপ্রদীপমাত্র জলিয়া উঠে, আর সবই যেন তেমনই অন্ধকার। আর সেই সুখচিন্তাটুকুও আজ সমধিক সঙ্কোচ-মলিন, লজ্জা-প্রিয়মাণ। নীলিমা যতই তাহার হৃদয়ান্তর সুনীলমূর্ত্তিকে তাচ্ছিল্য অবহেলায় ঘুরে সরাইয়া দিতে যায়, ততই যেন তাহা দৃঢ় হইয়া বসিয়া স্বতঃই আপনার পূজা আহরণ করে। আর সে পূজার অধিকার আজ নীলিমার নাই—প্রাণ তাহার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তাই নূতন জীবনে বিবিধ সুখের উপাদান সম্বন্ধে সে সুখ পায় না।

জর্জ ওকবর্ণের যত্ন আদর দিন দিন যেন সীমাহারা হইয়া উঠিতে লাগিল। মিস্ ওকবর্ণের পীড়া বৃদ্ধির জন্ত তাঁহার করাচি ফিরিয়া যাওয়া ঘটনা উঠিতেছিল না। সহসা একদিন বর্ষায়সী মিস্ ওকবর্ণের পীড়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর এ ঘটনার সকলেরই অপেক্ষা অধিকতর ভীত হইল নীলিমা।

অক্লান্ত সেবা **■** চিকিৎসার ফলে আয়ুর্মান্ ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু আয়ু বাহার নাই! তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। মিস্ ওকবর্ণের পবিত্র জীবনদীপ দিনে দিনে নির্বাকগোমুখ হইয়া আসিল। মহা ভয়ে নীলিমা অনাহারে অনিদ্রায় দিব্যরাত্রি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আলস্য করিয়া রহিল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া জীবন ও আশ্রয়দাতার গুণবায় অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা-ধারা সে ঢালিয়া দিতে লাগিল, কল কিন্তু কিছুই হইল না।



এক দিন মিস্ ওকবর্ণ নীলিমাকে তাঁহার পার্শ্বে একা পাইয়া ক্ষণকণ্ঠে কহিলেন, “নেল! আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?”

নীলিমার যত্নবদ্ধ অশ্রুশাশি এই কথার একান্ত উদ্ভাস বেগে উথলিয়া উঠিল। অশ্রুর বস্ত্রাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া সে শুধু অর্ধফুটস্থরে উত্তর দিল,— “আমি তা’ জানি না।”

মিস্ ওকবর্ণের রোগযন্ত্রণামলিন শুষ্ক অধরে ঘেহের মুহু হাত ফুটিয়া উঠিল, তিনি নীলিমার অশ্রু-আবেগে বিকম্পিত দেহে কৌণ হস্তাবমর্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, “শান্ত হও বৎসে! তুমি বালিকা, তোমার সম্মুখে অপার সংসারসমুদ্র প্রবাহিত, একা অসহায় ইহাতে পার হওয়া বড়ই কঠিন। যদি আমার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা কর, তবে আমি বলি, তুমি ইহার সহায়-রূপে এক সঙ্গী লইও। বিস্মিত হইতেছ? সঙ্গী হিসাবে আমি বলিতেছি স্বামী—যিনি তোমার সকল কার্যের সহায়ক রক্ষাকর্তা হইবেন।”

নীলিমার পতনশীল অশ্রুনিষ্কার সহসা যেন অচল-তার হাওয়া লাগিয়া নিখর হইয়া গেল। কণকাল তাহার বাস্তব-নিষ্পত্তি হইল না। কিয়ৎকণ পরে সে ধীরতর বিস্ময়াভূতভাবে কহিল, “আমার আপনি বিয়ে করিতে বলছেন? আমি যদি বিয়েই করবো, হ’লে নিজের সমাজ, ধর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করে এখানেই বা রইলুম কেন? বিয়ে করিতে আমার আপনি আদেশ করবেন না।”

মিস্ ওকবর্ণের নিম্প্রভ মুখ এই উত্তরে চিত্তাঙ্গান দেখাইল। তিনি কণকাল নীরব থাকিবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্বক কিছু হুঃখিত স্বরে কহিলেন, “নেল! আজ আমার আর কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া আশ্রয় বা পর কাহাকেও প্রবঞ্চনার দিন নহে, সরলভাবে সত্যকে স্বীকার করাই আজ আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাই আমি বলিতেছি,— তোমার মত রূপসী তরুণীর পক্ষে সকল সমাজেই বিবাহ আশ্রয়কার প্রশস্ত উপায়। অবশ্য, আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম, তবে অবস্থা অন্তরূপ হইতে পারিত। এখন তোমার আর ভেদনি ভাবে কে রক্ষা করিবে? তোমার সমাজও করিবে না, আমার সমাজও করিবে না। তাই আমার পরামর্শ লও, যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, বিনা বিধায় তাহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিও না। জানিও—

সুযোগ সমুদয়জীবনে দুইবার আইসে না, কদাচিৎ একবার দেখা দাত।”

এ অবাচিত উপদেশের প্রকৃত অর্থবোধ সে দিন নীলিমা করিতে পারে নাই। তাই সে নীরবেই রহিল। তাহার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধেই বোধ করি অন্তঃ-পর মিস্ ওকবর্ণ তাহার সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা-হৃতব করিয়া আর এসম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিলেন না। কেবল মাত্র মৃত্যুর পূর্ব দিবসে তিনি তাহার ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার মায়ের যে চেন-ছড়া আমি ব্যবহার করিতাম, সেটি তোমার তাবী বধুর তোমায় দিয়াছি, তাহা আনিয়া আমার সাক্ষাতে তুমি নীলিমাকে পরাইয়া দাও।”

নীলিমা কুণ্ঠিত ভাবে এ দান গ্রহণ করিলে আশী-র্বাদ করিয়া মিস্ ওকবর্ণ কহিলেন, “আমার মায়ের মতন গুণবতী হইও।”

জর্জ ওকবর্ণ ভগিনীর হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, “আর এই ক্লারার মত।”

নীলিমা নীরব কৃতজ্ঞতার নত করিল।

\* \* \* \*

মিস্ ওকবর্ণের মৃত্যুর পর কয়েক দিন নীলিমা একান্তই শোকাভিভূত হইয়া রহিল। রকম সে শব্দ-গ্রহণই করিল। এই ঘটনার নিজের মরা মায়ের শোক যেন দিনে সে ভাল করিয়া অনুভব করিতেছিল! আবার যেন জীবনটাই তার শূন্য হইয়া পড়িল। সব যেন এলো-মেলো ও বিপর্যস্ত।

নীলিমাকে আত্মচিন্তায় ফিরাইয়া আনিল দুইজন। ইহার মধ্যে প্রথম ধাক্কা খাইল সে মিস্ গোল্ডেনরীচের কাছে। এই মহিলাটি সম্প্রতি লাল কুঠীর প্রধান কত্রীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফেরৎ হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই সর্বপ্রথম তাহার চোখে ঠেকিল নেটিবের মেয়ের আধিপত্য। মিস্ ওকবর্ণের পার্শ্বে যবে সম্পূর্ণ যুরোপীয় সাজ সজ্জায় সজ্জিত উত্তম গৃহে নীলিমার বাস এবং জর্জ ওকবর্ণ যুরোপীয় সহকারিণীর সহিত তাহার একত্র পান ভোজন মিস্ গোল্ডেনরীচের নিকট একান্ত বিসদৃশ অত্যন্ত স্পর্দাসূচক বোধ হইল। ফলে জর্জের সহিত এ লইয়া তাঁর কিছু কলহও হইয়া গেল। সহকারিণী মিস্ প্যাক্ উড মিস্ ওকবর্ণ ও জর্জের উপর ইহার দারুণ চাপাইয়া দিয়াও নিরুতি পাইলেন না। এ সময় সংসর্গ জোর

তাহার ছাড়ানো উচিত ছিল, নতুবা কণ্ঠে ইতুকা দেওয়া সম্ভব—ইত্যাদি বথেষ্ট কঠিন তিরস্কার সহিয়া তাহার মন নীলিমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমন কি, যে সকল দাসদাসীরা এত দিন নীলিমার প্রতি একান্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কত্রীর মনোভাবের অন্তর্যন্তরে তাহারা পর্যন্ত তাহাকে নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখিতে লাগিল। নীলিমার এখন সর্বত্র হইতে পদে পদে তাঁর তিরস্কার অবমাননা লাঞ্ছনা উপভোগ আরম্ভ হইল। বড় মুখের পরকণ্ঠেই একসঙ্গে সর্ববিধ ভাষণ এবার নীলিমাকে যেন আবার অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতে লাগিল। সে বারংবার বিস্মিত হইয়া ভাবিল, তবে কি সকল সমাজেই তাহার পিতৃ-আদর্শ বর্তমান? তবে কি খৃষ্টান-সমাজেও হিন্দুসমাজের মতই সঙ্কীর্ণচেতার অভাব নাই?

সে দিন মিস্ গোল্ডেনরীচ নীলিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নীলিমা আসিয়া পূর্বের অভ্যাসমত অভিযান-শেষে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিতে বাইতেই তিনি ভীষণমুষ্টিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে বথেষ্ট কটু ভাষা প্রয়োগ করিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, “মিস্ ওকবর্ণ তোমায় ভয়ানক অসঙ্গত প্রশ্রয় দিবে গেছেন, দেখিতেছি। নন্দমার নোংরা জলকে তিনি পান করবার আধারে তুলে রেখে গেছেন। আর তাঁর স্বজাতীরেও এখন পর্যন্ত তাঁর সেই নিঃস্বার্থ কার্যের পোষকতা করিতেছে! আমার মনে কর্তেও শরীর শিহরিতেছে যে, আমি এক জন নেটিব নিগারের সঙ্গে একত্র এক বাড়ীতে বাস করিতেছি। তুমি যদি এখনও ভাল চাও, অরুণাকেন্দ্রের যে কোন কামরা ঠিক করিয়া লইয়া এই মুহূর্তে উঠিয়া যাও।”

নীলিমা সে দিন অশ্রুভারাতুর চক্ষে ও গভীর আহত চিত্তে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একখানা সুকোমল কুসুম আঁটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। একবার সে অশ্রু-অন্ধ নেত্র চারিদিকে ফিরাইয়া তাহার এই কয় মাসের আশ্রয়, তাহার নবজীবনের স্থিতি-স্থখ-ভরা গৃহস্থালীর সমুদয়টি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। স্নেহ-করুণাময়ী মিস্ ওকবর্ণের কথা মনে আসিতেই ছই চোখ দিয়া তাহার পাহাড়ভাঙ্গা বরণাধারার মত অজস্র অশ্রু-নির্ঝর বরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। যে মুখের, যে সম্মানের স্বাদমাত্র সে কোন দিন অনুভব করে নাই, তিনি যে অঘাচিত করুণায় তাহাকে অপরিপাক্যপে

তাহারই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একবার এই সম্মান ও ভোগৈশ্বর্যের আশ্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনশ্চ সেইখানেই আবার দ্রবস্থা। অসম্মানের মধ্যে অবনত হওয়ার অপমান ও দুঃখ তাহার যেন অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তাহার জীবনে যে সুখস্পৃহা আজও একান্ত প্রবল হইয়াই রহিয়াছে, কোন সাধই তো তাহার আজও পর্যন্ত ভাল করিয়া মিটে নাই।

“আমি কি ভিতরে বাইতে পারি?”—এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়াই জর্জ ওকবর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নীলিমা ইতোমধ্যেই ত্রস্তে নিজের মুখের অশ্রুচিহ্ন-মাত্র মুছিয়া কেলিয়াছে, তাহার চোখ দিয়া তখনও অশ্রুবিন্দুর পতন সে নিবারণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিষ্টার ওকবর্ণ নিকটে আসিয়া নীলিমার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, নিঃশব্দে কহিলেন—“কাঁদচো তুমি নেল? কান্নার কিছু কারণ নাই—আমার বোনের কিছু টাকাকড়ি এখানে ছড়ানো ছিল, তারই জন্ত আমার এ কয় দিন বিলম্ব হলো, না হ’লে তো এত দিন আমরা এখান থেকে চ’লেই যেতাম। এখন সে সব মিটে গেছে, আগামী কল্য আমরা যেতে চাচ্ছি।”

নীলিমা ভয়চকিত নেত্রে চমকিয়া জর্জের প্রতি ফিরিল, তাহার মুখ দিয়া আন্তরভাবে বাহির হইয়া গেল,—“আপনিও আমার এখনই ছেড়ে চ’লে যাবেন?”

নীলিমার মনে হইল, তাহার বর্তমান অবস্থা সেই চিরপুরাতন দিনেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সেই নিরাশ্রয়, নিঃস্বর্থ ও অসহায় সে একা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল তাহার পূর্বের সেই আত্মসম্মানটুকুই আর তার মধ্যে বর্তমান নাই—যাহার বলে নিজেদের সে এক দিন স্থানীয়ের উপরেই স্থান দিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্বধর্মত্যাগী, পরপদলেহী, পরের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। মন তাহার যেন কোন অন্ধকারের ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে নারিয়া পড়িয়াছে।

জর্জ ওকবর্ণের গাভীখ্যায় মুখমণ্ডলে সহসা আনন্দের স্মিতরশ্মি প্রতিভাত হইল। তিনি প্রকৃত-স্মিতমুখে কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “তোমার ছাড়িয়া যাইব, সে কথা তো আমি বলি



নাই নেল? ‘আমরা’ কথায় তুমি শুধু আমার সহিত যাইবে, ইহাই কি বুঝায় না? তোমার ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব?”

নীলিমা বিস্মিত স্মিতমুখে ক্ষণকাল তাহার প্রাণদাতা বিদেশী যুবকের আনন্দ-বিকশিত মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিয়া পরে কিছু কুণ্ঠাবিজড়িত বাক্যে কহিল, “আমায় কি আপনি এখান হইতে অত্র কোন মিশনে আশ্রয় দিয়া দিবেন? কোথায় আমার লইয়া যাইবেন?”

মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার চেয়ারের পাশে অপর চৌকিখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, “কোথায় নিয়ে যাব জিজ্ঞাসা করছো কেন নেল? আমার মিশনের বাড়ীতে আমার গৃহেই তোমায় আমি প্রতিষ্ঠা করিতে নিয়ে যাব। সেইখানে পৌছেই তো আমাদের বিবাহ হবে।” এই বলিয়াই জর্জ নীলিমার একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহার করতলে সাগ্রহ চুম্বন করিলেন।

নীলিমা আচম্কা একটা অর্ধস্মৃষ্ট ধ্বনি করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; বর্ষ, জিহ্বা, ওষ্ঠ বাক্যচ্চারণে তাহাকে সাহায্য করিতে যেন একান্তই অশক্ত বোধ করিতেছিল, তথাপি কাম্পিত, রুদ্ধ ও বিজড়িত স্বরে সে কোনমতে কহিয়া ফেলিল,—“এ কি অসম্ভব ও অসঙ্গত প্রস্তাব মহাশয়?”

জর্জও এই কথায় যেন দ্বিগুণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাহার সুনীল স্বচ্ছ চোখে সে বিষম স্পষ্ট হইয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, “আমি তো কোন অসঙ্গত বা অসম্ভব নুতন প্রস্তাব তোমায় জানাইতে আসি নাই নেল! আমার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যায় যে প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করিয়া আমার সাহসী করিয়াছিলে, আমি সেই স্থিরীকৃত বিষয়েরই পুনরালোচনা করিয়াছি মাত্র। তুমি তো এ বিবাহে তোমার অসম্মতি জানাও নাই এবং সে দিন আমাদের মায়ের স্মৃতিপুত অলঙ্কার গ্রহণে আবেদন গ্রহণও তো করিয়াছিলে, তবে এ কয়দিন তোমায় নিতান্ত শোকাবুল দেখিয়া এ বিষয়ে আমি কোন কথা কহি নাই।”

নীলিমার এখন সে দিনের সকল কথাই অর্থগ্রহ হইল, “যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, তবে বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করিও।” সেই উপযুক্ত

স্থানের        ছিলেন তাহা হইলে ইনিই। নীলিমার সর্বশরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। তবে কি তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে—বিদেশীয় বিজ্ঞাতীয় বিভিন্নভাষাভাষী এই খৃষ্টধর্মপ্রচারক পাদরীকে? হিন্দুর মেয়ে হইয়া সে এক জন আইরিশকে বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রী হইবে? নিজের দেশ, নিজের জন সকলই তাহার চিরদিনের মত সত্যসত্যই পর হইয়া যাইবে? নীলিমার চোখ ফাটিয়া যেন জল আসিতে লাগিল।

তাহার পর আবার তাহার মনে হইল, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর তার উপায়ই বা কি? তাহার এমন একটা আশ্রয়ও তো চাই। সে খৃষ্টান, কোন হিন্দু তো তাহাকে আর বিবাহ করিবে না? যদি বিবাহ করিতে হয় তো খৃষ্টানকেই করিতে হইবে। কোন ভদ্রবংশীয় দেশীয় খৃষ্টানের পক্ষেও অনাথা নিরাশ্রয়কে বিবাহ করিবার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে এই পরম রূপবান্ ভদ্রবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত ধার্মিক আইরিশ যুবকের প্রস্তাবগ্রহণই কি ভাল নহে? তাহার মনে পড়িল, ‘সুযোগ বহুযুজীবনে ঘুঁইবার আসে না, কদাচ একবার দেখা দেয়।’ তাহা সত্য! আজ জর্জকে ছাড়িলে কা’ল যে সে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহারই তো একটা স্থিরতা নাই! বিশেষ তিনি তার প্রাণদাতা।

নীলিমাকে নির্বাক দেখিয়া জর্জ একটু অসন্তোষের সহিত কহিয়া উঠিলেন, “আবার সেই দ্বিধা নেল! আমি দেখিতেছি, তুমি এখনও তোমার সেই বিধর্মী পূর্ব-প্রণয়ীকে ভুলিতে পারিতেছ না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই বিছানিছি পশ্চাতে গাহিয়া তোমার মাতা কি? তুমি কি জান না যে, হিন্দুরা খৃষ্টানদিগকে কত বেশী ঘৃণা করে? সে কি আর তোমার হাতের ছোয়া জল খাইবে?” তোমার টুটলে হয় তো সে এখন গজাশ্রান করিবে।”

ঈর্ষ্যাকঠোর নেত্রে জর্জ ওকবর্ণ নীলিমার সহসা পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে আহত বুঝিয়া মনে মনে কিছু উল্লসিত হইল। তাহার মনের ভাবটা এইরূপই হইতেছিল যে, একটা ড্যাম নেটিবের স্মৃতি আর মন হইতে মুছা যায় না? এ কি রকম মন?

কিন্তু জর্জের এই প্রেযাত্মক বাক্য নীলিমার সংশয়-বিধাগ্রস্ত অন্তরে বিরুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করিল।

তাহার সমস্ত মনটা যেন এই কথায় ছ ছ করিয়া জলিয়া উঠিল। কথাগুলো যে নির্ঘাত সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায়মাত্র না থাকিলেও তাহার অন্তর-পুরুষ যেন ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সুশীল তাহার হাতের ছোয়া খাইবে না? তাহার দেহে অঙ্গস্পর্শ হইলে সে গঙ্গানান করিবে? উঃ, উঃ, ভগবান! এ কি অবস্থা তাহার! ■ কি ভীষণ দুরবস্থার পক্ষে সে নিজেকে বিজড়িত করিয়াছে! আর সেই কথা—তাহার পক্ষে সেই মর্মভেদী—প্রাণঘাতী বার্তা তাহাকে হাসি-মুখে শুনাইতেছে কে, না, এক জন পরদেশী।

নীলিমার হৃদয়-প্রাণ তারত্ম্যে তীব্র অস্বীকার করিয়া উঠিল—না—না—না,—সুশীলের ঘৃণাই সে কোনমতেই হইতে পারিবে না!—সে ঘৃণা যে তাহার পক্ষে অসহনীয়। সুশীলকে সে ভুলে নাই। সুশীলকে সে কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না—কখনও না—সুশীল! সুশীল!—সুশীল! ওঃ, সুশীল!

নীলিমার সর্বশরীর খর খর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, যামে তাহার সমস্ত অঙ্গবঙ্গ ভিজিয়া উঠিল, সে হই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া যন্ত্রণার্ত্ত অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। মিষ্টার ওকবর্ণ অবাক হইয়া স্তম্ভিত-নেত্রে তাহার সেই মানসিক দুর্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন। “মনের মধ্যে তাঁহার সুপ্রচুর উন্মাদ জন্মিতে থাকিলেও কিন্তু অতখানি ব্যাকুল কাতরতার প্রতিবাদে তিনি তাঁহা প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইলেন না।

বহুকণ পরে নীলিমা যখন কতকটা সংযত ■ শান্ত হইতে পারিল, তখন অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া সে সুস্পষ্ট দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, “আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার অসুগ্রহ লইতে পারিলাম না। আপনার অসুমানই সত্য, আমি তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, —আর কখনও তাহা পারিব না।”

মিষ্টার ওকবর্ণ সঙ্কোভ বিরক্তিতে অধর দংশন করিলেন, অপ্রসন্ন নীরস কণ্ঠে কহিলেন, “তুমি কি তাহাকে পাইবে আশা কর?”

এ বিজ্ঞপের কঠোর আঘাতে নীলিমার গভীর বিষাদাচ্ছন্ন চিত্ত খন দুঃখের কালো মেঘে ছাইয়া উঠিল। আসন্ন বর্ষণোদ্যত জলধারার মতই সুপ্রচুর অশ্রুগাঢ় ভগ্নস্বরে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “না, কিন্তু

তাহার স্মৃতির পূজা তো করিতে পারিব। তাহাতে তো কেহ বাধা দিতে পারিবে না।”

“তাহাতে আমি বাধা দিব।—এক জন বিধর্ম্মীর ‘স্মৃতিপূজা’ করা খৃষ্টানের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে এখন আর হিন্দু নও, সে কথা তোমার স্মরণ আছে কি? তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে আমি বাধ্য, সে ■ আমায় তুমি ক্ষমা করিও।”

ব্যাধ-বাণাহতা অন্তর্বিদ্ধা বিহঙ্গীর মতই নীলিমা এই নির্ঘাত বাক্যবাণাহত হইয়া যুরিয়া পড়িতে গেল। কি ভয়ানক কথা! ‘বিধর্ম্মীর ‘স্মৃতিপূজার’ আজ তাহার ধর্ম্মহানি হইবে! আর সে বিধর্ম্মী কে? না, সে সুশীল!—ওঃ, ওঃ, ভগবান! এ কি হইল!

মিষ্টার ওকবর্ণ তীব্রদৃষ্টিতে নীলিমার স্মরণাহত মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “বিধর্ম্মীর ‘স্মৃতি-পূজা’ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত খৃষ্টানের কার্য্য কর, প্রভুর আহ্বানে কর্ণপাত কর। আমি তোমার প্রাণদাতা, সে প্রাণে আমারই আজ সম্পূর্ণ অধিকার, আর কাহারও তাহাতে বিদ্মুসাত্ত্বও অধিকার নাই। সে প্রাণ তুমি আমাকেই সমর্পণ করিয়া আমার সহিত একাত্ম হও। ইহা হইতে তুমি স্ফায়তঃ বাধ্য কি না বল? বালাবধি আমি মিশনের কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছি। বিবাহে আমার কোন দিনই অভিক্রটি ছিল না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিশিয়া আমি তোমাতে আকৃষ্ট হইয়াছি—কেন হইয়াছি জানো? আমি দেখিয়াছি, তোমার মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেরণা আছে। ভোগতৃষ্ণা ও সাংসারিকতা তোমাতে বড় কম। আমি এই প্রকারেই জী চাই—তাই তোমার চাহিতেছি। এখন এস, আমরা দুই জনে মিলিয়া একান্তমনে ঈশ্বরের কার্য্য করিব। তোমায় যে পথের মধ্যে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্ত এমন সু-অবসর তুমি কেনই বা ত্যাগ করিবে? জীবন সার্থক করিয়া কেন দয়াল প্রভুর সেবা করিবে না? ছিঃ, ছিঃ, এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর। মানুষ হও! মনুষ্যত্বের অবমাননা করিও না।”

নীলিমার চিত্তে আর যেন শক্তিবিন্দু নাই। তাহার মনে হইল, সে ওই বলীয়ান আইরিশ যুৎকের ফাঁদে যেন এখনই জড়াইয়া পড়িবে, আত্মরক্ষার সামর্থ্য যেন ক্রমশঃই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাইতেছে, অর্জ্জ যেন তাহাকে ক্রমেই সম্মোহন-বিভ্রাৎ বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। সে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ স্থির হইয়া



বসিয়া রহিল। ভালবাসে কোন একটা কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, এমন কি, মনের কথাটাও যেন তার দেখিতে দেখিতে অসাড় হইয়া গেল।

এমন সময় উভয়েরই পশ্চাতে জুতা-পরা পারের গুরু শব্দে দুই জনেই একসঙ্গে পিছনে ফিরিয়া দেখিল যে, মিস্ গোল্ডেনরীচ আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেই স্বাভাবিক সুগোল ও আরক্ত মুখ অধিকতর রক্তোজ্জ্বল। তিনি কোনরূপ ভূমিকা রাখা না করিয়াই ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “মিষ্টার ওকবর্ণ! এটা পবিত্র মিশন হাউস, থিয়েটার-হাউস, এবং স্নায়ু রাখিবেন, আপনি এক জন প্রকৃত পাদরী।”—নীলিমার দিকে চাহিয়া কৰ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আন্তরিকতার ময়লা জল পানপাত্রে তবু রাখলে কখন কখন তাতে জীবনসংশয় হয়েও উঠে—সে জানা কথাই। বা, তুমি এখনই এখান থেকে দূর হয়ে যা।”

নীলিমা নতমস্তকে বসিয়া রহিল। এ অপমানে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, ইহা সত্ত্বেও সে তাই উঠিতে পারিল না। জর্জ ওকবর্ণ বারেক ব্যথিত নেত্রে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া মুহু গভীর স্বরে মিস্ রীচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“আমার পদমর্যাদার কথা আমার স্নায়ু আছে মহাশয়। আমি আমার বাগদত্তা স্ত্রীকে আমার সঙ্গে যাবার প্রস্তত নিতে বলতে এসেছি মাত্র। মেল! আর কি বলব কেন? উঠে চ’লে এস, আমরা এখান হ’তে এখনই চ’লে যাই।”

মিস্ গোল্ডেনরীচের তাত্রবর্ণ মুখ এই কথার স্তোহিত হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা তাঁহার যেন অনলদীপ্ত দেখাইল। তিনি কহিলেন, “আপনার বাগদত্তা স্ত্রী! অসম্ভব! এক জন উচ্চবংশীয় আই-মিশ-ম্যানের সহিত একটা পথের কুকুরের বিবাহ! এ কখনই হইতে পারে না। আজকাল এইরূপেই এ দেশে বৃটিশ-সম্মান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। না, আমি ইহার সমর্থন করিতে পারিব না। মিষ্টার ওকবর্ণ! আমার মিশনের মেয়ে আপনি আমার বিনা অনুমতিতে লইয়া যাইতে পারিবেন না। আমি উহাকে কখনই আপনার হাতে ছাড়িয়া দিব না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সম্পূর্ণরূপেই ইহাতে আমার অধিকার আছে।”

জর্জের ললাটের শিরা সকল ক্ষীত হইয়া উঠিল, তাহার দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। পরে ভীষণ ক্রোধকে

কোনমতে দমনে রাখিয়া তিনি কহিলেন, “আমার বাগদত্তা স্ত্রীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে আপনার কোনই অধিকার নাই।” ক্রোধে তাঁহার আর বাক্য-সৃষ্টি হইল না।

মিস্ গোল্ডেনরীচ সক্রোধ ব্যক্তোক্তি সহাস্তে উত্তর করিলেন, “একটা পথের কুটী যে আপনার মত এক জন ভদ্রলোকের বাগদত্তা, এটা যে কোন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রমাণ করিতে পারিবেন ত? আপনার সাক্ষী কে? আমি অবশ্য আপনাদের মধ্যে একটা অবৈধ প্রণয় স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৈধ বাগদান স্বীকার করিব না এবং সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অবমাননাকর এ বিবাহ বাহাতে না ঘটতে পারে, তাহারই সর্বত্র এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বাধা দান করিব জানিবেন। নীলিমা! এই মুহূর্তে তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, আজ হইতে তোমার আমার নজরবন্দী থাকিবে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এত দূর স্পর্ধা যে নিজের কুক-মন্ত্র ইউরোপীয় যুবকেও বশীভূত করিতে চেষ্টা কর! —মিষ্টার ওকবর্ণ! ওডবাই মহাশয়। এস নীলিমা! তোমার চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসি। বাহিরে রাখা তোমার নিরাপদ হইবে না।”

নীলিমা অচঞ্চল পদে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে হইল, স্বয়ং যুক্তিদেবী আসিয়া যেন তাহার সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। জর্জের স্তোমুখ বাক্যবাণে তাহার সারা অন্তর প্রায় জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জর্জের জিহ্বাসাবৃত্তির পরিপোষক প্ররোচনার চিত্তে তাহার হিংস্র প্রতিশোধম্পূর্ণ উন্মাদ তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রলোভনে সন্দেহ-দোলান্বিত মন সঞ্চালিত তালবৃন্তের মতই সম্মুখে আন্দোলিত হইতেছিল। মিস্ গোল্ডেনরীচের আগমনে ও প্রতিবাদে সে যেন আত্মচিন্তার অবসর পাইয়া সেই আত্মরক্ষার অবকাশও লাভ করিল। দৃঢ়কৈ যুক্তি বোধ করিয়া তাই সে প্রসন্ন শাস্ত চিত্তে উঠিয়া মিস্ গোল্ডেনরীচের অঙ্গ-পর্যবেক্ষণ করিল।

জর্জ ওকবর্ণ তৎক্ষণাৎ সবেগে সম্মুখে আসিয়া পথ আঙুলিয়া গভীর স্বরে বলিলেন,—“এক মুহূর্ত! শোন মেল! আমার প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে, তুমি এইটুকু তুমি স্বীকার কর, তার পরের সমস্ত কর্তব্য আমার। আমার বিবাহ করিতে তুমি প্রস্তুত আছ—এইটুকু মাত্র আমার বলিয়া যাও।”

## পরীকের মেয়ে

নীলিমা গমনোদ্ধত চরণকে সংযত করিয়া লইয়া কপেকের দাঁড়াইল, সামান্যকণ পরেই স্থির অবিচল নেত্র জর্জের প্রতি স্থির রাখিয়া তেমনই অকম্পিত দৃঢ়কণ্ঠে সে উত্তর করিল, “আপনি আমার প্রাণদাতা, আমার চিরস্মরণীয় হইয়া চিরদিনই আমার অন্তরে বিরাজিত থাকিবেন। কিন্তু আপনার প্রত্যবে আমি সম্পূর্ণরূপেই অদৃশ্য। আমি আপনার সহিত যাইব না।”

মিস্ গোল্ডেনরীচ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জর্জের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “উত্তর শুনিলে তো? এখন যদি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগও অত্যন্তই কঠোর হইবে, জানিয়া রাখিও।”

বিমূঢ় প্রায় জর্জকে একা ফেলিয়া রাখিয়া নারী দুই জন বাহির হইয়া গেল।

সকীর্ণ গৃহের অতিশয় সকীর্ণ ও সামান্য শয্যার বন্দিনী নীলিমা নয়নাশ্রুতে ভাসিয়া কাতরচিত্তে ডাকিতেছিল,—“সুশীল! সুশীল! যদি একবার তুমি আমার কথা ভাবিতে! আমি তোমার জন্ত কত সহিলাম, কিছুই তুমি জানিলে না—এই আমার বড় দুঃখ।”

## একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার মধ্যরাত্রি। সেই সুগভীর অন্ধকার-রাশিকে ভেদ করিয়া একখানা বেল ট্রেন সুদূর পশ্চিমাভিমুখে উদ্ভাস গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার গমনপথের দুই দিকে সুনিবিড় বন, তাহার মধ্যে গাঢ় অন্ধকার জমাটবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তৃণ-শুল্কসমতাক্ষাচিত্রিত অসমতল উচ্চাচত সুদূরবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে শিঙা-সলিলা সুপ্রশস্তা ও অপ্রশস্তদেহা নদীসকল আসিয়া আবার ইহার পশ্চাত্তী হইতেছিল, সে সকলই কিন্তু সেই প্রগাঢ় অন্ধকার-মাগরের মধ্যে অস্পষ্টপ্রায়ই রহিয়া যাইতেছে। আর তেমনই অন্ধকারে ভরা ছিল সেই গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর আরোহী একটি যুবকের চিত্ত। পথিপার্শ্বের অন্ধকার-নিবিড় বন বনে জোনাফির পুঞ্জ জলিতেছিল, কিন্তু সেই আরোহী যুবকের অন্তরের কোথাও যেন আলোকের রেখাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাহিরে অন্ধকার, কিন্তু গাড়ীর কামরার তাকোজ্জগৎ বৈদ্যুতিক আলোর প্রভাব যথেষ্টই বহু ছিল। অপর এক জন আরোহী নারিয়া যাই যুবক উঠিয়া একটিমাত্র আলোর উপর ‘সেড’ টা দিয়াছিল। এখন সে আবার উঠিয়া তাহা বিদ্য করিল এবং পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানা পত্র খুলিয়া তাহা মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল—

“ছয় মাস কাল উত্তীর্ণপ্রায়। এত দিনেও তুমি তোমার অজ্ঞারের প্রায়শ্চিত্ত করিলে না? তুমি সংবাদ লইয়াছ যে, নীলিমা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে—আমার তত্বাতে কোনই আস্থা নাই। আমি \* \* \* লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছি, জানিয়া গিয়াছে যে, নীলিমাকে খণ্ডান হইতে কেহ ফিরিতে দেখে নাই। ইহাতে এমন কোন প্রমাণ হয় না যে, সে বাঁচিয়া নাই। তোমার এ সম্বন্ধে দায়িত্ব বেশী, তুমি ধর্মতঃ তাহার স্বামী, কোন্ কর্তব্যবুদ্ধিতে তুমি তোমার জীবন সমর্পণ না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছ? স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহার প্রতি সকল কর্তব্য সম্পাদন না করিলে আমার কাছে তুমি ক্ষমা পাইবে। এমন হইতে পারে যে, এখন তো তুমি আর আমার ক্ষমা চাহিবে না; কিন্তু স্থির জানিও যে, সে হত-ভাগিনীর প্রতি সুবিচার না করিলে তোমার জীবনের স্ত্রাক্ষ-বিচারে চির-অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে। ইতি  
স্বলেখ্য।”

এই পত্রখানা বহুবার পঠিত হইলেও ইহা পুনরায় আর একবার পাঠ করিল। তাহার পর খানা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আর একখানা পত্র বাহির করিল—

“তুমি নিজে \* \* \* গিয়াছিলে, অনুসন্ধান করি হইয়াছে, শব্দাহকারী ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপিত দেখিয়াছিল, উঠিতে কেহ দেখে নাই। ইহাতে যত্ন নিশ্চয় করা অসম্ভব নহে বটে, কিন্তু তথাপি আমার মন বলে যে, সে মরে নাই। সুখহীন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া—আহা, না জানি সে অভাগী কোন্ মহা-বিপদের সাগরে—কোন্ বিষম দুর্গতির মধ্যেই বাঁপ দিয়া পড়িয়াছে!—তুমি তাহাকে রক্ষা কর, আবার বাও, ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর। যদি তাহার ভাগ্যে কোনরূপ অকথ্য দুর্গতিই বাটয়া থাকে, তাহার জন্ত একমাত্র তুমিই যে দায়ী, তাহা তুমি নিজেও তো জানো। তবে কেন অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়া তাহাকে উদ্ধার



## অনুরূপা দেবীর প্রত্যাশা

না ? এ কাজ একমাত্র যে তোমারই, আমিও  
এর হয় তো কতকটা দায়ী, কারণ,  
ইহার মধ্যে না থাকিলে তুমি হয় তো তাকে  
বেই পাইতে চেষ্টা করিতে, অন্ত্য দ্বারা নহে।  
সেই প্রায়শ্চিত্তে আমাকেও স্থান লইতে হই-  
তেছে। আমার বাবার এ সম্বন্ধে এতটুকুও সহানুভূতি  
থাকিলে আমি তো নিজেই একবার সেখানে বাইতে  
পারিতাম। কিন্তু এক দিন এই কথার উল্লেখ তাঁহার  
কাছে যেরূপ তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে, তেমন এ  
জীবনে কখন হয় নাই। ইহার উপর তিনি আমার বিবা-  
হের জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, বলিতেছেন, আমার এই  
সকল 'সেন্টিমেন্টালিটিতে' তাঁহার বিন্দুমাত্রও সহানু-  
ভূতি নাই। তিনি আমার কোন ওজর আপত্তিই আর  
শুনিতেন না, তোমার মত সুপাত্রের হস্তে তিনি  
আমার জোর করিয়াই সম্প্রদান করিবেন ! হিন্দুর  
যেহে বিবাহ কন্টার মতামতের অপেক্ষা রাখে না—সে  
কথা সত্য।—কিন্তু সে বাল্য-বিবাহে। আমি এখন  
আর বালিকা নই, আমার মন এখন অস্ত্রের পরিচালনা-  
ধীন নহে, তিনি এটা বুঝেন না। তিনি প্রবল,  
আমি দুর্বল। আমার মার যেটুকু আপত্তি ছিল,  
এক দিকে আমার বাবার শাসন, অপর দিকে তোমার  
পিতৃঐর্ষ্য সেটুকুকে ক্রমশঃই নাশ করিতেছে।  
কিন্তু এ বিপদে আমি তোমার কাছেই শরণাপন্ন  
হইলাম। তুমি তাঁহাদের এই খেলা-খেলায় মধ্যে  
যোগ দিও না। কারণ, আমি তোমায় নীলিমার  
বানী বলিয়াই মনে করি। তুমি দেশ ছাড়িয়া যাও,  
না হয় বিবাহে অসম্মতি জানাও, যাহা হয় কিছু কর,  
শুধু আমার আশা ছাড়, নতুবা তোমার বাবাকে আমি  
নিজেই আমার দৃঢ় আপত্তি জানাইয়া পত্র লিখিব,  
তিনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আমার নিশ্চয়ই  
বাঁচিতে দিবেন। ইতি

সুলেখা।”

সুন্দর হস্তাক্ষরে সুচারু ছাঁদে লেখা এই ভীষণ  
‘পত্রখানা’ সুশীল ইতঃপূর্বে একবারমাত্র পাঠ করিয়া  
রাখিয়া দিয়াছিল, ইচ্ছা হইলেও আর সে ইহা পাঠ  
করিতে পারে নাই। এখন এই পত্র দ্বিতীয়বার  
পাঠ করিতে বসিয়া তাহার মনে হইতেছিল যে, চোখ  
দুইটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেহ-মন যেন তাহার  
কে আগুন দিয়া দগ্ধ করিতেছে। সমস্তই যেন তাহার  
বিষম জ্বালাময় বোধ হইতে লাগিল। প্রাণটা যেন

ধুধু করিয়া জলিয়া উঠিতে লাগিল। খোলা চিঠি  
সামনে রাখিয়া সে নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। ট্রেন  
খানিয়া স্টেশনে আইসে, আবার সে চলিতে থাকে,  
আবার দাঁড়ায়, আবার চলে। সুশীলের ইহাতে  
দৃকপাতও নাই। সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল,  
তাহার এই জটিল ও ভীষণ অদৃষ্টের কথা। এ যেন  
এক রহস্যময় উপভ্রাস ! এ যেন একটা স্বাস্রোদকর  
হুমুস ! নতুবা মানুষের ভাগ্যে, ভদ্রসন্তানের ভাগ্যে  
কি কখন এমন ঘটনাও ঘটে ? তাহার মনটা অত্যন্ত  
তিক্তভাবে নীলিমার প্রতি বিদ্রষ্ট হইয়া উঠিল।  
তাহার সংশ্বে আসিয়াই তাহার যত কিছু দুর্ভাগ্য  
ঘটিয়াছে। অথচ ঈশ্বর জানেন, তাহার কি অপরাধ !  
অনুকূলের কথা মনে আসিতেই মন তাহার গভীর  
বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। পুতিগন্ধবিশিষ্ট  
মলিন বস্তুর মতই তাহার চিত্তকেও সে চিত্তে প্রবেশ  
করিতে দিতে যুগা বোধ করে। \* \* \* গিয়া সে  
সংবাদ পাইয়াছিল, জ্যো-কন্টার মৃত্যুতে পরম নিশ্চিন্ত  
হইয়া সে নিজের অর্থসঞ্চয়ের প্রতি কার্যমনোবাক্যে  
আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে আপশোষ  
করিয়া ইহার উহার কাছে বলিতেছিল যে,  
যেহেটা যে আহাশ্বকের মত ম’রে গেল, না হ’লে তুবন  
রায়ের কাছ থেকে দশটি হাজার মারে কে ? আর সেই  
মর্শলিই যদি তো দুটো দিন বাদে মরলেই তো হ’তো ?  
নীলিমার নিকক্ষেটাকেও সে সুশীলের উপর ফেলিবার  
চেষ্টা করিয়াছিল। বিপ্রদাস-প্রেরিত লোক সেটা  
অনেক কষ্টে মিটাইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞ  
বিপ্রদাসের অর্থব্যয় সে জন্ত বড় বেশী হয় নাই।

সুশীলের বন্ধ চিঠিয়া একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস  
উখিত হইল। এবার নীলিমার প্রতি বিদ্রোহজ্বালা  
মন্দীভূত করিয়া চিত্ত তাহার জলন্ত হইয়া উঠিল  
সুলেখার প্রতি। তাহার এত দুর্গতি ঘটিল না—  
যদি সুলেখা এমন একরোখা জেদালো স্বভাবের যেরে  
না হইত ! \* ভাল বলিয়া অতটাই ভাল হওয়া আবার  
কাহারও পক্ষেই ভাল নহে। যে নীলিমা বাঁচিয়া  
নাই, তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এমনই  
তাহার অসম্মত জিদ ! তাহার পিতা বিবাহ দিবার  
জন্ত চেষ্টা করিতেছিল, সে শুধু শুধুই একটা খেলার  
বশে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। সব কথাই  
তো সুশীল তাহাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল, সে  
পত্র সে বিশ্বাস নাই। সুশীলের মনটাকে লইয়া

সে এ কি নির্যাস খেলা খেলিতেছে! সে যেন তাহার একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকমাত্র! সুনীলের পীড়িত চিত্ত নুতন ব্যথায় ভারি হইয়া উঠিল। বুক তাহার দীর্ঘশ্বাসে ফুলিয়া রহিল, তবু কৈ, তাহার কথা তুলিতেও পারা যায় না তো? মনে বাহার এত অবিশ্বাস, বাহার প্রাণে এতটুকু সহানুভূতি নাই, স্নেহ নাই, তাহার জন্য বুক এমন তীব্র বেদনার ফাটে কেন? অনায়াসে যে তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা দান করিতে পারে,—তাহারই প্রাণপণ করিয়া বসে, তাহার স্মৃতি মন হইতে একটি মুহূর্তের জন্যও কি মুছিতে পারা যায় না? তাহার এ অবিচারের দণ্ড মাথায় তুলিয়া লইয়া বৃথা চেষ্টায় পাগলের মত দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া কিরিয়াও তাহার এ প্রায়শ্চিত্তের কি শেষ হইল না? আবার তাহারই খেলার খেলায় দেশত্যাগী হইতে হইল। তথাপি তাহারই প্রাণের মধ্যে বেদনার পুঞ্জ ও অশ্রুনিখর আজও অসংবরণীয় হইয়া দেখা দেয় কেন? সেই কঠোরহৃদয়া পাষাণীই যে তাহার কৈশোর যৌবনের ধানের দেবী, তাহার মানব-মন্দিরের করুণা-প্রতিমা। কাহার শাপে তাহার ভাগ্যে সেই মমতাময়ীকে মমতাহীনা করিয়া দিল? তবে তাই দিক—সুনীলকে সে বখন এমন করিয়াই ত্যাগ করিতে চাহে, তখন সে-ও আর তাহার কৃপাকণার লালারিত হইবে না। তাহার দুঃখের জীবন চির-অন্ধকারাবৃতই থাকুক। স্নেহা স্নেহে থাক—সুখী হোক, অপর কোন ভাগ্যবানের হৃদয়লক্ষী হোক সে। সুনীল তাহার পথ ছাড়িয়া চিরদিনের মতনই এবার সরিয়া যাইতেছে।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসিল। \* \* \* ষ্টেশনে এক জন দীর্ঘাকার ইংরাজ পাদরী, বয়সে সুনীলের চেয়ে কিছু বড়, সুনীলের মতই প্রায় সে-ও তখন চিন্তামগ্ন ও স্নেহহীন, সে সুনীলের কামরায় উঠিল। কিন্তু সুনীল তাহার দিকে চাহিয়া দেখা দূরে থাকুক—তাহার অস্তিত্বও জানিতে পারিল না। তাহার মন তখন তাহার পিতার প্রতি একটা অকথ্য অব্যক্ত নিগূঢ় অভিমানের স্মৃতিতে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা তাহাকে এত বড় ভুল করিলেন। এক দিনের তিনি তাহার সহিত এ বিষয়ে এতটুকুমাত্র আলোচনা করিলেন না, একটা ভাল বন্দ কোন কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন না, বাহাতে করিয়া

প্রকৃত ঘটনার কথা সে তাঁহাকে জানাইতে পারে, তাহার একটুখানি স্বেচ্ছামাত্র তিনি তাহাকে এই সাত মাসের মধ্যে দিলেন না, অথচ কি ভীষণ মর্মব্যথাই যে তিনি তাহার অন্তরে দিবারাত্রি উপভোগ করিতেছেন, তাহাও তো সুনীলের অজ্ঞাত নহে। পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন লোক সে অসীম মনোবেদনার সাক্ষী নাই, সেই নির্ঝক নিঃশব্দ মানসিক যন্ত্রণার সহানুভূতিকারী কেহ বর্তমান নাই, সে শুধু তাঁহার নিজের বক্ষশোণিত গুহিয়া লইয়া দিনে দিনে তাঁহাকে কীটদষ্ট ফলের মত ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কেবল মৃত্যুর আশ্বাসের সাড়া সেই আনন্দলেশহীন ও সর্বনিষ্প্রহ মূর্তি হইতে সকলেই অল্পবিস্তর পাইতেছিল মাত্র। সুনীলের প্রাণ যেন তাহার গৃহের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এর চেয়ে পিতা তাহাকে যদি কঠোর তিরস্কার করিতেন, সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া কঁাদিত, তাহার সকল ব্যথা প্রশমিত হইয়া যাইত। যদি তিনি তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিতেন, তাহাকে ত্যাগ করিতেন, সে মরিত, তাহার সকল আলা জুড়াইত। ইহার কিছুই না করিয়া দুঃখটাকেই যে কালানলের মতই নিঃশব্দে নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও সেই প্রাণঘাতী বিষজালায় নিজেকে নিঃশেষে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছেন, এ যে অদ্ভুত! অথচ ইহার কোন উপায় করাও যে আবার তেমনই অসম্ভব। তিনি তাহার সঙ্গে কথা কহেন, দেখা হইলেও আর ত মুখ ফিরাইয়া লয়েন না। কিন্তু সে দেখাই হয় তাহাদের মধ্যে কি কদাচিত! কথা হয় কত সামান্য এক বা দ্বিবর্ণ্যাকের বেশী কথা প্রায়ই কখন আর হয় না। সেই অসীম স্নেহসম্বন্ধ বুচিয়া এই সম্পর্কই কি তাহাদের মধ্যে চিরদিনের মতই দাঁড়াইল? এই যে প্রচণ্ড বাধাটা, দুঃখের গিরিশিখরের মত উন্নতশীর্ষে পিতা-পুত্রের প্রাণঢালা একাত্মার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিল, ইহাকে মধ্যে রাখিয়া বাঁচিয়া থাকা যে দুজনকারই পক্ষে দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা দুজনেই সুস্পষ্ট বুঝিতেছিলেন, তথাপি এ বাধার প্রতীকার করা যেন দুই জনের কাছেই আজ অপ্রতিবিদ্যেয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে যে কিছুতেই আর সরাইতে পারা যাইতেছিল না।—শেষে স্নেহের ঐ কুলিশকঠোর পক্ষে—বাহাতে তাহার নির্কাসনের আদেশ আছে, তাহা



পাইয়া অসংবরণীয় হৃদয়বেগে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। আজ যে, যে কোনখানে যাওয়ার জন্তই তাহার পথ খোলা। পিতার অনুরূপতা পাইবারও কোন বাধা নাই, আর লইবার প্রবৃত্তিও বুঝি ঠিক ভেদনই কম! উঃ, কি এ অবস্থা!

আগন্তুক বিশেষী যুবক যদিও চিত্তাভিনয়-মুখেই এই কামরায় প্রবেশ হইয়াছিলেন, তথাপি স্ত্রীলোকের এই মুহূর্ত্তমান ভাবের কাছে তাঁহার সে অবস্থা যেন কিছুই নহে। ইহার এই মৃদু-বিবর্ণতা ও গভীর অবসাদ-প্রসূতা তাঁহার চিত্তকে যেন অগত্যা পরেই ইহার অভিমুখে স্বতঃই টানিয়া আনিল। তিনি তখন বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, ইহার সকল আত্মীয়জন নিশ্চয়ই একসঙ্গে হয় নৌকাডুবি, না হয় অগ্নিদাহ হইয়া কোন একটা ভীষণ দৈবকলিকপাকে মরিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে কোন আশা রাখিয়া মানুষ এমন আত্মবিশ্বস্ত হইয়া বাইতে পারে না। ইহার সম্বন্ধে মনে তাঁহার কোতূহল ও কল্পনা একত্র জাগিয়া উঠিল। দুই একটা কথা কহিবার চেষ্টাও তিনি করিলেন। ইহার আত্মানে স্ত্রীলোক প্রথমটা চমকিয়া উঠিল, তার পর সে বাহিরের দিকে আরেক চাহিয়া দেখিল, দেখিল সেই সুবিস্তৃত অন্ধকাররাশি। তাহার মনে হইল, উহারা এই যে প্রাণপণে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, এ শুধু তাহারই সঙ্গ হারাইবার ভয়ে। তাহার মনে হইল, তাহার মধ্যে যেন এই অন্ধকার-সমুদ্রের তরঙ্গগুলাই প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজ সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তর সে নীরবেই এড়াইয়া গেল, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার তখন আদৌ ছিল না।

আগন্তুকের দৃষ্টিটা স্ত্রীলোকের সম্মুখস্থিত সেই খোলা চিঠিখানার উপর পতিত হইল। বাঙ্গালা হাতের লেখা পড়িবার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল। কতকটা এই অদ্ভুত ভাবের লোকটির সম্বন্ধীয় কোতূহলের বশেও বটে, আর কতকটা নূতন বিদ্যার পরীক্ষাচ্ছলেও বটে, সেই পত্রের প্রতি তাঁহার চিত্ত একটুখানি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই দৃষ্টিটা একটু বদ্ধ হইয়াই রহিল। উহারই মধ্যের কয়েক পংক্তি পড়িয়াই তিনি সচমকে মুখ তুলিয়া উগ্র আগ্রহে সবেগে কহিয়া উঠিলেন, “তুমিই ‘নীলিমার স্বামী’!”

এই আকস্মিক ও অদ্ভুত প্রশ্নে স্ত্রীলোক আচমকা

চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণেই ইহার খুঁটতায় তাহার মনের মধ্যে প্রচুরতর উত্তাপ জাগিয়া উঠিল। সে-ও তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “এ কিরূপ প্রশ্ন মহাশয়?”

আগন্তুক জর্জ ওকবর্ণ। জর্জ ওকবর্ণ এ কথায় বর্ণপাতমাত্র না করিয়া আপন মনেই বলিয়া ফেলিলেন, “আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। কারণ, আমার নীলিমার তো স্বামী নাই। যার জন্ত আমার সে প্রত্যাখ্যান করলে, সে তার স্বামী নয়, তার ভালবাসার লোকমাত্র। আপনার জ্বরও বোধ করি ঐ নাম?—আমি ভুল ক’রে তাকে নীলিমা চক্রবর্তী মনে করেছিলাম।”

“নীলিমা চক্রবর্তী! আপনার নীলিমা। আপনি কার কথা বলছেন? আমিও জন নীলিমা চক্রবর্তীর অনুসন্ধান করছি যে! আপনি যে নীলিমার কথা বলছেন, সে এখন কোথায়?”

স্ত্রীলোকের কথা যেন আগ্রহে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, উত্তরের প্রতীক্ষা যেন অসহনীয় বোধ হইতেছিল। তবে কি সুলেখার সম্বন্ধই সত্য? এত দিনে কি তবে—

মিষ্টার ওকবর্ণ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, এই যদি নীলিমার প্রণয়ী হয়, তবে তাহার কটিকে নেহাৎ নিন্দা করাও যায় না। নেটিভের পক্ষে ইহার চেহারা ভালই এবং ইংরাজীর উচ্চারণ প্রায় ইংরাজেরই মত। তিনি কহিলেন, “সে নীলিমা এখন \* \* \* মিশনে আছে, প্রায় সাত মাস পূর্বে এক দিন পথের ধারে তাহাকে আমি মরণ-পর অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া আমার বোনের কাছে লালকুঠীতে লইয়া আসি। সেখানে অনেক কষ্টে সে পুনরুজ্জীবিত হয়। আমার বোনের মৃত্যুর পর ইচ্ছা ছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া আমার কর্মস্থলে করাচিতে লইয়া বাইব, কিন্তু সে কোনরূপেই চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। যে জরায়রহীন পাপিষ্ঠ প্রণয়ী তাহাকে জ্যেষ্ঠ-মধ্যাহ্নের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অন-হীন মাঠের উপর মর্দিতে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখনও সে তাহারই প্রাণ দিতে চায়! আশ্চর্য্য উপাদানেই যে জৈবর নারীচিত্ত গঠন করিয়াছেন!—সে আমার স্পষ্টই বলিল যে, তাহাকে সে ভুলিতে পারে নাই—কখন পারিবে!।”

জর্জ ওকবর্ন আর একবার তীক্ষ্ণভেদে দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত ভূতাহতবৎ সুশীলের পাণ্ডুরূপ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সুশীলের শরীরে তখন সংজ্ঞা আছে কি না, এ বিষয়েও তাঁহার মনে সংশয় জাগিল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, লোকটা উন্মাদ অথবা মৃগী-রোগগ্রস্ত হইতেও তো পারে।

গাড়ীর বেগ এ দিকে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ট্রেন নিকটবর্তী হইয়াছে জানা গেল; সহসা সুশীল আপনার সঘন কম্পিত চরণদ্বয় স্তব্ধ করিয়া লইয়া সম্মুখে ভূমে স্থাপন পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্ধের দ্রুত স্পন্দন, যাহা রোধচেষ্টা করিয়া অস্পষ্ট সুরকে ফুটাইয়া তুলিয়া বিনীত শাস্ত সুরে করিয়া উঠিল—“পুরা ঠিকানাটা আমার দিন,আমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। আমি যাহাকে খুঁজিতেছি, সে ঐ নীলিমাই। আর দয়া করিয়া কাহারও নামে একটু পরিচয়পত্র আমার দিবেন কি?”

জর্জ ওকবর্ন বাস্তব হইয়া বলিলেন, “অমন কাজটিও করিবেন না। সেখানে গিয়া কাহারও নিকট আমার নামোল্লেখ করিলে তাহার সঙ্গে আপনার দেখা পর্য্যন্ত হইবে না। আপনি শুধু গিয়া বলিবেন যে, আপনি তাহার বিশেষ আত্মীয়,কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।”

“তবে আমি এই ট্রেনেই নামিলাম। একখানা গাড়ী বা একা অথবা যেরন করিয়া হোক, এ পথটুকু ফিরিয়া যাইব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বড় ভাগ্যে ভাগ্যে আপনার সহিত আজ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। সাত মাস ধরিয়াই আমি ইহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছি।”

“এই নিন ঠিকানা লেখা কাড’। নীলিমাকে বলিবেন, ‘জর্জ ওকবর্ন তাহার প্রতি তাহার অকুজতার এই প্রতিদান দিয়াছে।—এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, সে সুখী হোক, আমার আর কিছুই বলিবার নাই’—ওতরাতি।”

### দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকখানি সুখের পর দুঃখ যখন আবার ফিরিয়া দেখা দেয়, তখন তাহাকে সহ্য করা কঠিনতর হইয়া উঠে। পূর্বের দারিদ্র্যের কথা, পূর্বাত্যাস, বাহ্য বড় সহজেই তুলিয়া যায়। কিন্তু দুই দিনেরই হোক,

আর দশ দিনেরই হোক, সুখের দিন কয়টা তাহার বুকে একটা রক্তীন নেশায় রঙিয়া এমনই মায়াবী বলি বুলিয়া রাখে যে, সে দিনগুলো আর কখন বিস্মৃতির কালো ঘেঁষে ঢাকা পড়ে না। নীলিমা চির-অনাদৃত জীবনের পরেই মস্ত বড় ধাক্কা খাইয়া এমন একটা স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল যে, সে স্থানের সঙ্গে তাহার পুরাতনের কোন সংযোগ ছিল না। তাহা নূতন—একবারে সম্পূর্ণরূপেই নূতন। সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, মেহ, প্রেম, সম্মান সমস্তই সে যেন অপ্রত্যাশিতরূপে অপরিয়াপ্ত হইয়া লাভ করিয়াছিল। এত বেশীই পাইয়াছিল যে, ততটা বেশী সে বরং লইয়া উঠিতেই সমর্থ হইল না। তাহার পর সহসা আবার সমস্তই বদল হইয়া গেল। মিস্ ব্রীচের কঠোর শাসন তাহাকে পুনর্মুখিক করিয়া দিল এবং এই ঘটনার নিজের প্রকৃত মূল্য আজ কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা দেখিয়া সে মনে মনে আতঙ্কে ও যুগায় শিহরিয়া উঠিল—উচ্চবংশজ খাঁটি আইরিশ-পরিবারের সহিত সমকক্ষভাবে বাস করিতে পাইয়া। মিস্ ওকবর্নের নিকট অগীর মেহলাভে ও তাহার উপর জর্জ ওকবর্নের সঙ্গ-সাহচর্য ও পরিশেষে বিবাহ-প্রস্তাব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া সে নিজের বখাও অবস্থা এতদিন রুজিতে পারে নাই। তাহার মনে হইয়াছিল, ইহা বৃহৎ ধর্ম্মেরই প্রস্তাব। এ উদারতা—এ মহত্ত্ব—সমস্তই যেন খুঁটান-জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। যীশুর মানব-প্রেমে ইহাদের চিত্ত স্বতঃই বেন ভরপুর। কিন্তু মিস্ গোল্ডেনব্রীচের তীব্র ‘নেটিব-বিদ্বেষ’ সে বিশ্বাসটাকে অনেকখানিই নাড়া দিয়া গেল। তাহার পর তাহার লক্ষ্য পড়িল, লাল কুঠীর আরও কয়েকটি ইংরাজ মহিলার প্রতি। মিস্ ওকবর্নের সময়ে ইহারাই নীলিমাকে স্নেহে মেহাদর দেখাইয়াছেন; তাহার অনন্তসাধারণ রূপের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন; তাহার বিনীত ব্যবহারে—ধর্ম্মপ্রাণতার সুদৃশ্য ব্যবহার জানাইয়াছেন; আর আজ ইহারাই মিস্ ব্রীচের বিরাগ-ভয়েই হোক, অথবা মিস্ ওকবর্নের অপসরণ-সুযোগেই হোক, তাহার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যবহার দেখাইতেছিলেন। তাহার স্বপক্ষে একটামাত্র কথাও কেহ জ্ঞানের মর্যাদা-রক্ষা হিসাবেও কহিতেন না, নিজেরাও যথাসাধ্য নির্লিপ্ত এবং ওদাস্তপূর্ণভাবে চলিতে লাগিলেন। নীলিমা দেখিল, সকল জাতি এবং সকল



সবাইকেই মানবপ্রকৃতি একইরূপ হইয়া থাকে। ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সর্বত্রই পাশাপাশি হইয়া আছে। কোথাও বা নিছক ভাল এবং কোথাও বা নিছক মন্দ টিকিয়া থাকিতেই পারে না। সকল ধর্মই মানুষকে ভাল হইতে শিখায়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তাহার হইতে যেটুকু গ্রহণকর হয়—সেইটুকুই সে গ্রহণ করিয়া থাকে। নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া সে যেটুকু লাভের আশা করিয়াছিল, সেইটুকু তাহার কুরাইয়া আসিল। সেই সঙ্কীর্ণচিত্ততা—সেই হীন মনেহ—সেই ঘৃণাবিহীন জাতিভেদ! তবে কিসের জন্তই সে তাহার স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিল?

তাহার পর নীলিমার সমস্ত চিন্তা তীব্র ঘৃণায় গুটাইয়া ছোট হইয়া গেল—যখন লাল কুঠীর আশ্রয় ছাড়িয়া তাহাকে থাকিতে হইল, অনাথাশ্রম ও স্কুল-বোর্ডিংয়ের মধ্যস্থ হইয়া। সেখানে মেথর, ডোম, চামার, হাড়ি, মুচি, মুর্দাকরাস প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির একতা সাধিত হইয়া একমানবতার সৃষ্টি হইতেছে বটে! ইহার মধ্যে অবৈধজাত মাতৃপরিত্যক্ত শিশু, বৈধজাত ও সকল ধর্মীর সংমিশ্রণ সমস্তই আছে। আবার ইহারই ভিতর নীলিমার মত ভদ্রবংশীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা, কায়স্থমহিলা, বৈষ্ণবজাতি কেহ জুটিলে তাহাদেরও ভর্তি হইতে হয়। ঘৃণায় নীলিমার যেন গা বমি-বমি করিতে লাগিল। চিরকালের সংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম মিস্ ওকবর্ণের টেবলে খাইতেও যে তাহার মনে ঘৃণার ভাব না জাগিত, তাহা নহে। তথাপি সে স্থানের পরিচ্ছন্নতা ও ইহাদের ভদ্রবংশ আর সব কথা যেন কতকটা ঢাকা দিয়া রাখিত, এখন তাহারই নগ্ন রূপটা স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতে লাগিল। একটা মেথরাণী কুঠীর ‘কমঠ’ সাফ করে, আবার সেই-ই আসিয়া বাবুজিখানায় জাঁকাইয়া বসিয়া কাট্লেট গড়িয়া দেয়, হাতটাও কখন ধোয় না। বাবুজিগুলা একটুখানি মাংস তুলিয়া লইয়া দিয়া করিয়া চাখিয়া দেখিল এবং তাহারই বাকিটা রন্ধন-পাত্রে ফেলিয়া দিয়া সেই উচ্ছষ্ট হাতেই রহিয়া গেল। নীলিমা এগুলি এত দিন না দেখিয়া খাইয়াছিল, চোখে দেখিয়া আহাঃস্পৃহা তাহার আর বিন্দুমাত্রও রহিল না। তবে এ স্থানের ব্যবস্থায় এখন আর তাহার এ সকল আহাঃের বন্দোবস্তও তো নাই; সাধারণ মোটা চাউলের ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, এক টুকুরা মুরগীর ডিম বা কদাচিৎ কোন দিন একটু মুরগীর

মাংস। রান্নাও তেমনই কদর্যা—একটা মুসলমানীর সহিসের দেটা নিকা-করা স্ত্রী, সেই তাহাদের রাঁধিয়া দেয়। একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া এক একখানা কলাইকরা সান্ধি হাতে লইয়া খাইতে খাইতে হয়। খাইবে কি, ঘৃণায় শরীর যেন শিথিল হইয়া আইসে, হাতের আঙ্গুলগুলি পাতের ভাতের গায়ে ঠেকিবে কি, সে যেন খিল ধরিয়া গুটাইয়া যায়। তিন বেলা উপবাসী থাকিয়া অবশেষে অনেক কষ্টে গ্রাস কতক খাইয়া আসিয়া উহা উদ্দিগরণ পূর্বক নীলিমা নিজের বিছানায় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন করিয়া সে কয় দিন বাঁচিবে? না খাইয়া যে মানুষের বাঁচিয়া থাকা চলে না, সে শিক্ষা তো তার এর আগেই একবার হইয়াও গিয়াছে। তাহার এখন আর বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনই বা কি? বাঁচিয়া তো কেবল এই ঘৃণা জীবন বহন করা! তাহার মনে হইল, যুরোপীয়রা যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন কব্জতালি পায়, সেগুলো একেবারেই ফাঁকি। জাতিভেদ উহার নিজেরা খুব বড় রকম করিয়াই মানে। তবে অপরের জাতি নষ্ট করিয়া দেয় বটে!—জাতিভেদ না মানার ইহাই অর্থ দেখা যায়। যাহাদের উহার খুঁটান করে, তা হোক তাহারা ব্রাহ্মণ, আর হোক তাহারা মেথর, তাহাদের এক ঘানিগাছে ফেলিয়া দিয়া করিয়া মিশাইয়া নয়। নিজেরা অভিজাত্যগর্বে অন্ধপ্রায়, নিজেরা আচার-ব্যবহারে এতটুকু চুল কোথাও পরিবর্তন করে না, কিন্তু অভিজাত্য উহাদের চোখে কুসংস্কার মাত্র! নীলিমাও বাহির হইতে উহাদের এই শেখার বুলি শুনিয়া শুনিয়া তাহাই হৃদয়স্থ করিয়া নিজের দেশের সকল সংস্কারকে ‘কু’ ধরিয়া লইয়াছিল। আজ তাহার মনে হইল, যদি এক জন ভদ্র আইরিশ বা ইংরাজ যুবক কোন ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলে ‘ব্রিটিশ প্রেস্টিজ’ নষ্ট হয়, যদি ইহার ফলে সেই সম্প্রতি সামাজিক অবনতি ঘটে, অর্থাৎ ক্রাব বন্ধ হয়, সেই স্ত্রীর কোথাও নিমন্ত্রণ হয় না, সরকার হইতে প্রমোদন বন্ধ থাকে, নিন্দার সীমা পরিসীমা থাকে না, বাপ ত্যজ্যপুত্র করে, তবে হিন্দুরই বা নিজ ধর্মের বা জাতির বাহিরে বিবাহ সমর্থন না করায় এতই কি পাপ? সমাজ থাকিলেই তাহার একটা স্বতন্ত্র ধর্মও থাকে। বিভিন্ন সমাজের দোষ-গুণ সকলেই সচেতন বর্জন-ব্যবস্থা করিয়া থাকে, নতুবা সমাজধর্ম নষ্ট হইয়া

গিয়া আদিকাল দেখা দেয়—যে সময় লোকে বিবাহও করিত না—পরন্তু সম্মানের জন্মাদিও হইত। আজ বড় অসময়েই তাহার মনে হইল, না জানিয়া না ভাবিয়া অনর্থক বড় বড় কথাই মালা গাঁথিয়া বাহারা তরুণ চিত্তকে গরল মাখায়, তাহার তাহাদের মহাশত্রু! ‘মহামানব’ শুধু মুখের কথা নহে। ‘প্রত্যেক মানবের মনে স্বাধীন চিন্তার উদয় না হইলে মুক্তি নাই’—এই সকল বাক্য উদ্ভাদের প্রলাপমাত্র। উদ্ভাদ ব্যতীত কোন সুস্থ ব্যক্তি এমন আশা করিতেই পারে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে ও স্বতন্ত্রভাবে চলিবে। সেটা এক পাগ্‌লা গারদেই সম্ভব ও সম্ভব। সাধারণতঃ হিংস্র-মস্তিষ্ক নরনারীর জন্ত মহাজনের অনু-সৃত পথই অনুসরিতব্য এবং ইহাতেই মুক্তি। নতুবা তরুণ-তরুণী দলের প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা ও স্বেচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে জগতে কোন সুমঙ্গল আনয়ন করিতে পারা একান্তই অসম্ভব।

নীলিমা গভীর বেদনায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ কাটাইয়া অনেক কান্নাই কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মনে পড়িল সুশীলকে। আজই সর্বপ্রথম তাহার মনে হইল, তাহার সম্বন্ধে সুশীলের ব্যবহার হয় তো খুবই নির্দার্য নহে। তাহার বাপ যে কত মন্দ, তাহা কি সে জানিত? কিন্তু উঃ, সুশীল তাহাকে বিবাহ করিলে আজ তো তাহার এ দুর্গতিভোগ ঘটিত না। স্বার্থপর সুশীল নিজের সুযোগটাই দেখিল, তাহার অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহাও তো তাহার দেখা উচিত ছিল?

পাশের ঘরের চন্দ্রমুখী গুহ আসিয়া কাছে বসিল। “কি, এখনও তুমি মুখ গুঁজে প’ড়ে কাঁদচো? তবেই তোমার হয়েছে! নাও, উঠে বসো, মনটাকে ভাল ক’রে ফেলো, কি করবে? যখন এখানে পা দিয়েছ, তখন এই সব তো করিতেই হবে। নিজে রেঁধে যে খাবে, কি আমিই দুটি রেঁধে দোব, তাও তো এখানে উপায় নেই। সে যেমরা মত দেন না, ভারি রাগ করেন, বলেন, ‘ওসব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারি না।’ ওঁদের খাওয়ার-জাতি-ভেদটা নেই কি না, অবশ্য পাশে ব’সে কারু খান না, নেহাৎ বাছা লোকটি না হ’লে; তবে সেক্ষেত্রে ক’রে যে দেয় দিক, তাতে আপত্তি নেই, তাই এটা ওঁদের কাছে বড়ই ছোট জিনিষ। নিজে যা না করি, তাই তো মন্দ কি না? তা ভাই, খেতে খেতে আবার অভ্যাস হ’য়ে যাবে। আমারই কি কম ঘেমা করতো! তাতে আবার

আমি হিংস্রের বিধবা ছিলাম। সাত বছর মাছ-ভাতই খাই নি।”

নীলিমা এই সহানুভূতির বাণী শুনিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল—নিজের দুঃখ যেন সে অকস্মাৎ সব ভুলিয়া গেল। সকৌতুহলে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি এখানে কি ক’রে এলেন? কেন এলেন?”

চন্দ্রমুখী একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল—“কেন এলাম? কপালে ছিল ব’লে। আর কি ক’রে এলাম?—তার ইতিহাস এই—আমি \* \* উকীল প্রকাশ গুহের মেজো ভাস্কর, আমার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন ঐ আমার মেয়েটি সুধারানী, ও আমার সাত বছরের। বাপের বাড়ী এক ভাই ছাড়া কেউ ছিল না, ভাইও তেমন নয়, আর ভাস্কর বাপের বাড়ী বেতেও আমার দেন নি, তাঁর বাড়ীতেই বরাবর ছিলাম। জায়ের আমার বছর বছর ছেলেপুলে হয়, নিজেও মাথার রোগে, মস্তিকার রোগে একেবারে অসমর্থ, সমস্ত সংসারের খরচপত্র—টাকাকড়ির সব তার একরকম আমারই হাতে। খটিতে হতো অবশ্য তাতে বড় বেনী। শরীর যেন বইতো না। এখন পাশের বাড়ী থেকে জানাশুনা হয়ে এঁরা আমাদের ওখানেও বেতে আসতে আরম্ভ করলেন। আমার বোনা শেখার খুব ঝোঁক ছিল; এটা সেটা শিখে নিতুম। বছর দুই ধ’রে এই আসা-যাওয়া, প্রাইজ দেখতে মেয়েদের নিয়ে কুঠীতে আসা, এমনি ক’রে ওঁদের ওপোর ভক্তিতা খুব বেড়ে গেল। আর ওরাও এদিকে ক্রমাগত আমার ভজাচ্ছে যে,—বীণা ভজ, চলে এস, ওখানে থেকে দাসীর মত কেবল খাটুছ, একাদশী করলে কারু মৃত স্বামীকে সম্মান দেখান হয় না, দেহকে অনর্থক ক্রেশ দিয়ে মাত্র পাপ করা হয়। এ শুধু বিধবাদের দুর্বল ক’রে, আধ মারা ক’রে রাখবার জন্ত সমাজের প্রবল অত্যাচার! তার পর দেখ, তোমার মেয়ের এখানে উচ্চশিক্ষা হবে না, হয় ত শিশুকালেই একটা অযোগ্য বিবাহ দিয়ে দেবে। এই সব নানা কথায় মনটাও ক্রমশঃ বিগড়ে যায়। বিশেষ মেয়ের জন্তই মনে করেছিলাম যে, এতে বুঝি এর বিশেষ কোন লাভ হবে! তাই এক রাত্রিতে ওঁদের সঙ্গেই লুকিয়ে পালিয়ে আসি। ওরা আমার দুদিন ধ’রে লুকিয়ে রাখে, তার পর পাদরী এসে আমার ও রাণীকে খুঁটান ক’রে দিয়ে ছেড়ে দেয়। প্রথম প্রথম খুবই আদর



দেখাত। সুধার জন্ত খেলনা, পোষাক, খাবার কতই না দিত। ভাস্কর আবার অনেক হাঙ্গামা করলেন; বল্লেন, বাড়ীতে নিতে আর পারবো না, তবে কালীতে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, ওখান থেকে চ'লে এস। ঐরা বল্লেন, তোমায় নিয়ে গিয়ে ঘেরে ফেলবে।—তয়ে গেলুম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, তখনও তো মতুনের নেশা আমার ছোট্টে নি।—তার পর দেখতে দেখতে উপরের খোলস খুলে গেল।”

“আপনার এখন বাড়ীর জন্ত হুঃখ হয়?”

“তা আর হয় না? সেখানে সবাইকার উপরে ছিলুম। ভাস্কর পর্যন্ত কোন পরামর্শটি না নিয়ে কাজ করতেন না। ছেলেমেয়ে সবই কাকীমা বলতে অজ্ঞান হতো। এক খাটুনী, তা আর এখানেই বা খাটুনিটাই বা কি এত কম? পরসী রোজগার করবো, তবে তো পেট চালাবো? নৈলে তো আর কেউ বসিয়ে খাওয়াবে না তাই! মাইনে তো মোটে সতেরটি টাকা, তাতে হুঃজনের খাওয়া-পরা সমস্ত চালানো কি মুখের কথা? তার উপর যেখানে একখানা ঠেঁট প'রে চলতো, সেখানে নিজের গায়েই এতটি চড়াতে হবে, তার উপর আবার ঘেরে আছে।”—চক্রমুখী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, “চলে কি ক'রে?”

“কি ক'রে? থাকতে থাকতেই দেখতে পাবে। দিনরাত্তে যখনই সময় পাচ্ছি, বেশিন ঘুরাচ্ছি, নয় তো কাঠির বোনা, নয় তো সূচের কাজ করছি। রাণীটার পড়াশুনা এখানে আর খুব বেশী কি হবে? বতটা হ'তে পারে, প্রাণপণে সে তা করচেও। শরীরও ওর ভাল নয়, নিত্যই ভোগে। সেও ক্রুশের কাজটা ভালরকম পারে, ওই সব বিক্রী করি। লেসটা অনেকেই নেয়। কাটা কাপড়ও বড় বন্দ বিকোর না। এইতেই অনেকটা সাহায্য হয়। তা' তুমি কিছু জান তো? না জান তো শিখে নিও, আমি শেখাবো এখন। ■ সব না করলে চলবে কি করে? ■ দিকে অপরিচ্ছন্ন বা কম কাপড়ে চালাতে গেলেও বকুনি খাবে।”

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, ইহার ■ স্বধর্মভাগের কোন প্রয়োজন আছে কি না? তাহার মনে হইল, হিন্দু সমাজ যদি অস্ত্রাজ জাতির উন্নতির জন্ত একটু চেষ্টা করে? প্রত্যেক সহরে এক একটা অনাধারম স্থাপিত হয়, আর নারীশিক্ষার

সুব্যবস্থা করা হয়, তবে খৃষ্টান মিশনের কাজ অনেকখানিই কমিয়া যায়। অনাধ, পতিত অস্ত্রাজের ■ হইতে খৃষ্টান হইলে অনেকখানি সুযোগ পায়, তাই তাহাদের এ বিষয়ে লোভ স্বাভাবিক। হিন্দু থাকিলে তাহারা তো এতখানিও পাইত না।—কিন্তু এই যে উচ্চশ্রমী হিন্দু বিধবা চক্রমুখী গুহ অথবা নীলিমা চক্রবর্তী—ইহারা কিসের লোভে এখানকার প্রলোভন কাটাইতে পারে না? ঘরে ইহাদের না হয় অভাব ছিল, কিন্তু অভাবেই কি শুধু স্বভাব নষ্ট হয়? তাহা নহে। ইহার কারণ, তাহাদের ভিতরে অভাব ঘটিয়াছে শিক্ষার। ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং উন্নত চরিত্রের সাহচর্য্যভাবেই ইহাদের মনে প্রলোভন কাটাইবার মত নৈতিক বলেরই অভাব ঘটিয়াছিল। তাহার উপর ভিন্ন জাতি, ভিন্নধর্মী ও বিভিন্ন সমাজবাসীকে দূর হইতে বড় সুন্দর, বড় উজ্জল, বড়ই মহৎ ■ উদার বলিয়া বোধ হয়। ইহারা আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যবান। ধর্মীর ঘরের দিকে কাকাল যখন চোখ কিরায়, সে কি তাহার মধ্যে কোনই অভাব দেখিতে পায়? নীলিমার অশ্রুত্ব দুই চোখ জলন্ত হইয়া উঠিল। ইহার কি কোনই প্রতিবিধান করা যায় না?

### ত্রিচছারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন মিস্ রীচের অসুস্থতা ■ তাহার পরিবর্তে যিনি কাজ করিতেছিলেন, তিনি নীলিমাকে খবর পাঠাইয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে তাহার এক জন বিশেষ আত্মীয় আসিয়াছেন, তিনি তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাহেন।

নীলিমা তো শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার আবার আত্মীয় কে আছে যে, তাহার সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিবে? তাহার উপর আবার ‘বিশেষ’ আত্মীয়! জর্জেরই প্রেরিত কেহ ■ তো? জিজ্ঞাসায় জানিল, আগন্তুক বাঙ্গালী বাবু, বয়সে তরুণ এবং গায়ের ■ বেশ করসা। তখন “কলিকাতা হইতে” কথাটা তাহার মনের মধ্যে জোর করিল। তাই তো, সে কথাটা যে সে একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল! কলিকাতার এক জন আত্মীয় তাহার আছেই তো। সে তাহার তাই ভুলেছে। সেই হয় তো কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এটাও

যেন বিশ্বাস করা কেমন কঠিন হয়। শুভেন্দু তাহার খবর লইতে আসিবে, তাহার খোঁজ করিবে, ইহাও কি কখন সম্ভব? কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কি-ই বা হইতে পারে? আর একটা সম্ভাবনার কথা চকিত বিদ্যুতের মতই তাহার মনের কোণে উদ্ভিত হইয়া পরমুহূর্তে আবার মিলাইয়া গেল। সে যে ততোধিকই অসম্ভব!

তবু নীলিমার মনে একটু স্মৃতিও হইল। এ পৃথিবীকে তাহার যেন জনহীন মরুভূমি বলিয়াই বোধ হইতেছিল, তবু যেন তাহারই মধ্যে একটিনাত্র জীবের অস্তিত্বও আজ হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

আশা, আনন্দ ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত অনেকখানি সন্দেহ ও আশঙ্কা ক্ষমরে বহন করিয়া লইয়া নীলিমা সংশয়জড়িত দীর্ঘপদে আসিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। দাদার যে প্রকৃতি, তাহাতে সে যে তাহাকে কোন্ মূর্তি ধরিয়া কোন্ ভাষায় সম্ভাষণ করিবে, তাই ভাবিয়া সে যেন কতকটা হতভম্ব হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও অনেক বেশী সজ্জিত হইল, সে তাহার কল্পনাকে পরাভূত হইতে দেখিয়া। কে এ সমুখে তাহার? এ তো সে নয়! শুভেন্দুর উগ্রমূর্তি এবং তাহার ভেতর তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ-বিষে ভরা ভীষ্মকলের হলের মতই বিধান বাক্য প্রত্যাশা করিয়া সেও নিজেকে মনে মনে তরুণযুগ্মরূপে কঠিন করিয়া লইয়াই গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রতীক্ষাকারী আগন্তুককে দেখিয়াই ঘোর বিষয়াভিহত প্রায় হইয়া সে একটা অর্ধফুটধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক পিছন দিকে ছুই চারি পা পিছাইয়া আসিল। শরীরধারী প্রাণীকে দেখিয়া এমন বিষয়াভিহত বোধ করি কেহ ইহার পূর্বে আর কখন হয় নাই।

সুশীল তাহা বুঝিল। সেও আর এক রকমে অনেকখানি বিস্মিত হইয়াছিল। সে যে নীলিমাকে চিনিতে, ইহাকে দেখিয়া এখন সেই নীলিমা বলিয়া চিনিয়া লওয়াই কঠিন। প্রথমবারের মেলপাতে তাহার মনে এ বিষয়ে প্রচুর সংশয়ও জাগিয়াছিল এবং সে তাহা জানাইতে উচ্চত হইয়া পুনশ্চ একবার ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া অবশেষে তখন সাদৃশ্য লক্ষ্যে চিনিলা যে, বহুলাংশে পরিবর্তিতা হইলেও এ সেই নীলিমাই বটে। সে তখন বিস্মিত, বিস্ফারিতনেত্রে উহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই ধূসরপ্রায় অসজ্জিত কক্ষ কেশের রাশি চিকণ-কালো চিকুরজালে পরিবর্তিত হইয়া এখন তাহা

তাহার মাথার উপর নবকৃষ্টি অস্থায়ী স্তব্ধ বর্ণীতে নিবদ্ধ। তাহার সেই রৌদ্রতপ্ত তামাটে বর্ণ এখন আঙনে পোড়া খাঁটি সোনালি মতই সমুজ্জল ও প্রভাদীপ্ত। তাহার গালের, চিবুকের অস্থিগুলি কোথায় যেন লুকাইয়া তাহাদের স্মৃগোল ও স্ফুটল করিয়া তুলিয়া সেই স্তম্ভন ও কোমল গণ্ডে রং যেন ধাক্কা পড়িবার উপক্রম করিতেছে। গায়ে তার গোলাপী ছিটের হাল ফ্যাসনের প্রণালীতে জ্যাকেট শাড়ী পরা। পারে চটীজুতা। এই অপূর্ব রূপদী নারীকে কাহার সাধ্য বিশ্বাস করিতে পারে যে, এ সেই অসুখল চক্রবর্তীর মেয়ে নীলিমা চক্রবর্তী।

তা সুশীলের মনে যদিই বা এক-আধটুকু সংশয় থাকি পড়িয়া থাকিত তো নীলিমারই ব্যবহারে সেটুকু তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। সে যে সেই দরজার সামনে অচলাপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার মুখের উপর এক মুহূর্তে সমস্ত শরীরের তিতরকার সমুদয় রক্তোচ্ছ্বাসটা উথলাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কপাল দিয়া চুল বহিয়া এই শীতের দিনেও যে ঘামের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, অথচ নিজে সে একটা কথা পর্য্যন্ত কহিবার সামর্থ্যশালিনী ছিল না, তাহা বেশ বুঝাই যাইতেছিল।

একটুখানি নড়িয়া দাঁড়াইয়া সুশীল কহিল, “আমি তোমার নিয়ে যেতে এসেছি।”

কণ্ঠে—তাহার আগ্রহ বা অনাগ্রহ—কিছুই প্রায় ধ্বনিত হইল না। শুধু বিষয়ের একটা আনন্দ মাত্র পাওয়া গেল।

এতকণে নীলিমা নিজের নতমুখ উঠাইল, তুলিবার দৃষ্টি তুলিয়া সে কম্পিত দৃষ্টিতে সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল তখন বিচলিতভাবে আবার একটু নড়িয়া উঠিল। কহিল, “আমি তোমার নিতে এসেছি, নীলিমা! আমার সঙ্গে যেতে বোধ করি তোমার কোন আপত্তি হবে না?”

সুশীলের কণ্ঠ এবার যেন করুণা-কোমল হইয়া উঠিয়াছিল।

নীলিমা তাহার পাশের দরজার কবাটটাকে নিজের ধরকম্পিত দেহভার রক্তার অবলম্বনরূপে গ্রহণ পূর্বক একটুখানি চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে তাহার খাস লইতে অক্ষমপ্রায় বন্ধকে, শব্দোচ্চারণে প্রায় অসমর্থ কণ্ঠকে এবং ভাষাহারা জিহ্বাকে



কোনমতে স্বপ্নে আনিয়া অর্ধক্ষুণ্টে উচ্চারণ করিল,  
“আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?”

সুশীল নীলিমার মুখের দিকেই স্থিরনেত্রে চাহিয়া ছিল, সে একটি নিমেষের জন্য মাত্র একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তারপর শাস্ত ও সংযত স্বরে করিল,  
“আমায় ‘আপনি’ ব’লে কথা কইবার তোমার দরকার নেই নীলিমা! আমি তোমায় আপাততঃ কানীতে নিয়ে গিয়ে সে রাত্রির সেই বাকী আধখানা কাজ সেয়ে ফেলবো; তার পর যে রকম হয়, সে সব আবার পরে স্থির করা যাবে।”

সুশীলের কথার ধরণ নীলিমার কানে বড় বেশী পরিবর্তিত ঠেকিল। সে যেন আর কাহার কথা, আর কে যেন বলিতেছে! তাহার পর ঐ হেয়ালিতাবের কথাটারও যেন ঠিক অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, অবাক হইয়া সুশীলের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া সুশীল কিছু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, “বুঝতে পার্ছো না নীলিমা! আমি তোমায় আধখানা বিয়ে ক’রে সেই যে পালিয়ে গিয়েছিলুম, আমার সেই অসমাপ্ত কাজটাকে এবার শেষ ক’রে ফেলতে এসেছি। এক দিন তোমায় যে অপমান করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—সে অবসর আমার দেবে কি নীলিমা?”

নীলিমার পদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের শোণিত-স্কন্ধতায় সর্কশরীর তাহার শিলাকঠিন শীতল ও নিশ্চল হইয়া পড়িল। বকের মধ্যে বেদনার পুঞ্জ জমাট বাঁধিয়া যেন গুরুভারাত্মক মন্দর পর্কতের মতই কণ্ঠ অবধি ভীষণ বলে চাপিয়া ধরিল। তাহারই আন্তরিকতার তাহার মুখ প্রথমে মর্শ্বরশ্মি হইয়া গিয়া, তাহার পর শরৎমেঘের বিচিত্র খেলার মতই মুখ তাহার ক্রমে রক্ত, ক্রমে স্বেত ও পরিশেষে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। বকের মধ্যে খাঁস তাহার যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ কি তাহার অদৃষ্টের পরিহাস, না, না এ পরিহাস সুশীলের স্বেচ্ছাঙ্কৃত নিশ্চয়তা? না, তাহার মুখের দিকে চাহিলে ইহা তো বিশ্বাস হয় না!—

চেষ্টাস্থিতমুখে সচেষ্ট সংঘমে সে প্রাণপণে শাস্ত-কণ্ঠেই কথা কহিয়া সুশীলকে বলিল, “আপনার জী সুলেখা, আর কেউ তাঁর স্থান অধিকার করতেই পারে না। তবে কেন এ কথা আজ বলছেন?”

এইটুকু বলিতেই সেই যেন নিজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। বলা শেষে ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল এ কথার পর কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তাহা দেখিয়া নীলিমার বক্ষোশোণিত প্রায় নিশ্চল হইয়া গেল।

পরে একটা ক্ষুদ্র খাঁস মোচন পূর্বক সুশীল ঈষৎ বিম্বাদিতকণ্ঠে উত্তর করিল, “সে সব চুকে গেছে নীলিমা। সুলেখা আমার চিরদিনের জন্যই বিদায়-দান ক’রে তার সব পাওনা-দেনা মিটিয়ে নিয়েছে। তাই আদেশে আজ আমি সাত মাস ধ’রে তোমায় দেশ-দেশান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার বিশ্বাস, তুমিই আমার জী।”

এতকণে নীলিমার অর্ধমুচ্ছিতপ্রায় চিত্তে সব কথা যেন ভাল করিয়া প্রবেশপথ পাইল। সুলেখার আদেশ! সে বিমুখী হইয়াছে বলিয়াই আজ এই একান্ত অসময়ে, জীবনের এই অত্যন্ত অবেলান্ন, পরিত্যক্তা নিখ্যাতিতা নীলিমাকে সুশীলের অশুগ্রহ পূর্বক স্মরণ হইয়াছে! এ মহত্ব তবে সুশীলের নয়, ইহা সুলেখার! আর এখনও সুশীলের মনপ্রাণ যে সুলেখাময়, সুলেখার জন্যই যে তাহা হাহাকার করিতেছে, সুশীলের ঐ মর্শ্বভেদী বিলাপবানীই তাহার সাক্ষ্য। একটা হিংস্র ক্ষুব্ধ আলাপের বিদ্রোহের বহিঃশিখা নীলিমার মনের বৃকে রুদ্ধভেজে দীপ্ত হইয়া জলিয়া উঠিল! তাহার বৃকের রক্ত সঘনে ছলিয়া, কেনাইয়া, মাতিয়া উঠিল। তাহার সেই হৃদয়-শোণিতের প্রাবন সমস্ত দেহের উপর সতেজে ছড়াইয়া পড়িয়া—তাহাকে যেন রক্তালোকে উদ্ভাসিত প্রভাত-সূর্যের মতই অগ্নিময়ী মনে হইল। আঘাতের প্রথম মেঘপরিবাপ্ত আকাশের মত জলভরা তাহার কালো হৃৎচোখে একই কণ্ঠে অশনি-ভরা বিজ্ঞাতের তীব্র তীক্ষ্ণ আলো যেন চক্ৰমক্ চক্ৰমক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। তাহার পর ক্ষণকাল বাটিকাপূর্বের শুষ্ক, ক্রুদ্ধ, ভূষিত অশনিভরা কালো মেঘের মতই শুষ্ক থাকিয়া সে অগ্নিস্থলিঙ্গের মত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে কহিয়া উঠিল, “কিন্তু আর একটা কথা হয় তো তুমি না জেনেই আজ আমার এই কুপাটুকু করতে এসেছ! আমার বেঁচে থাকার—এখানে থাকার খবর তুমি যার কাছে থেকে পেরেছ, সে কি তোমায় আমার সব কথাই বলে নি?”

সুশীলের মনের মধ্যে একটা অনাগত আশঙ্কার আভাস জাগিয়া উঠিয়া তাহার বুকে কে মেঘমেঘর আকাশের মত ছক্ ছক্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল। সে সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ঈষৎ সন্দ্বিগ্নকণ্ঠে উত্তর করিল, “জর্জ ওকবর্ণ ব’লে এক জন পাদরীর কাছে তোমার খবর আমি পেয়েছি। তিনি—”

“জর্জ ওকবর্ণ! কি আশ্চর্য্য! কোথায় দেখা হলো?”

সুশীল সব কথাই বলিল, পরিশেষে যে কথা জর্জ নীলিমাকে বলিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিয়া এই কথা বলিল, “বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমি তোমায় পাইলে হয় তো এখনও সুখী হইতে পারি। সে দিন তোমায় কেলিয়া না গেলেই আমি ভাল করিতাম। আমি তোমায় যে ভালবাসি না, তা তো নয়!”

■ কি শুনিли, ওরে অভাগিনি! এতদিনে তোর মরিয়া বাঁচা কি সার্থক বোধ হইতেছে না? কিন্তু এ কি এ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! কিন্তু যদি জর্জ কিছুই না বলিয়া থাকে, তবে—তবে—তবে—?

নীলিমার মুখে বেদনার প্রগাঢ় মেঘে তীব্র জ্বালা ভরা বিহ্বল চকিতে চমকিয়া গেল। তাহার মনে হইল—না, সে প্রলোভনে সে কান পাতিবে না, সম্মতান তাহার মনের কানে যে প্রলোভন-বাণী শুনাইতে চাহিতেছে, তাহা শুনিবার প্রয়োজন নাই। বুক তাহার আবার ক্ষুদ্র ঘোষের তীব্র নৈরাশ্রে ধু ধু করিয়া পুড়িয়া উঠিল। আবার একটা আগত অভিমানের মন্দর-মথিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ সমস্ত অন্তর প্রাবিত করিয়া দিয়া প্রবল কলরোলে জীবন-সিদ্ধ মহানারত্ত করিয়া দিল। তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ সহসা অরুণবর্ণ ধারণ করিল,—শ্বেদপ্রচ্ছাদিত কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, “কিন্তু তুমি হিন্দু, আর আমি খৃষ্টান, আমার বিষে করলে তোমার যে জ্ঞাত যাবে!”

এই কথা শুনিয়া সুশীল বজ্রস্তম্ভিতভাবে অণকাল নির্ঝাঁকু-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার জিহ্বা যেন তাহার মুখের ভিতরে আঁটিয়া গিয়াছিল। ঠোঁট দিয়া তাহার একটুও শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইতে পারিল না। ভাষা বুঝি তাহার কণ্ঠের মধ্যে হারাইয়া গেল।

নীলিমা সুশীলের হৃদশা চাহিয়া দেখিল। তাহার মনের কথা বুঝিতে তাহার একটুও

আর বাকী রহিল না। বুঝিয়া তাই ঝড়ের ঝঞ্ঝার মত একটা উন্নত ক্রোধের তরঙ্গ তাহারও বুকের মধ্যে যেন আহড়াপাছড়ি করিতে লাগিল। সে ক্রোধ তাহার নিজের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া আবদ্ধস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভুবনেরই উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সফেন সাগরোন্মিষৎ বুক তাহার ফুলিতে লাগিল। অন্তরেরও অন্তর মধ্য হইতে একটা তীব্র তিরস্কারে নিজের প্রতি স্বয়ং নিশ্চয় হইয়া উঠিল। কম্পিত তীব্র কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, “আমি খৃষ্টান, আমার বিয়ে ক’রে তুমি তোমার হিন্দুত্বে আমার কিরিয়ে তুলে নিরে যাবে, সে সামর্থ্য তো তোমার নেই; বরং আমার সঙ্গে তোমার নিজেকেই নেমে আসতে হবে— তোমার হিন্দুত্ব তুমি হারাবে। কলির ব্রাহ্মণ যে তোমরা! সে ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাদের কোথায়—ধাতে নিজে মুক্ত থেকে অপরকে মুক্তি দেবে, পতিতকে উদ্ধার করবে? হিন্দুসমাজ ত্যাগের সমাজ,—গ্রহণ করবার তো নয়। তাই আমার এই দুদিনের না বুঝবার ভুলে চিরনির্ঝাসন দণ্ড মাথায় ক’রে আমাকে যে বইতেই হবে; আর আমার এখানে কিরে আস-বার পথ নেই! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তার জন্তই বা দায়ী কে? আমি কি আমার ধর্মকে জানতে পাওয়ার কোন সাহায্য আমার সমাজের কাছে পেয়েছি যে, তাকে না জানার জন্ত—অজ্ঞতার জন্ত পাপী হব? গীতা কিনে ক’জন ক’চি ছেলেমেয়ে পড়তে বসতে পারে? তার খবরটা জানেই বা ক’জন? আর ছোট বেলায় অত বুদ্ধি থাকেই বা কার? গৃহে ধর্মশিক্ষা নেই—স্কুলে বৈদেশিক শিক্ষা, তাতে যদি প্রতিকূল অবস্থায় প’ড়ে কেউ হঠাৎ একটা ভুল ক’রে দু’দিনের জন্ত সরেই যায়, আর কি সে ফেরার জন্ত পথ পাবে না? তা যদি না পার, তবে তার তখন উপায় কি? সে তো তাহার নূতন ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছে না? সে যে তাহার পুরাতনের জন্তই বুক ফেটে ম’রে যাচ্ছে—সে যে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্ত নিজের প্রাণোৎসর্গ করতেও অপ্রস্তুত নয়। তবে কেন সে সুযোগ পাবে না?”

সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিল। নীলিমার সম্মুখীন হইয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠে তাহাকে বাধা দিয়া সে কহিল, “নীলিমা! তাই যদি হয়, যদি সত্যি তুমি ভুল শোধরাতে চাও—তবে তুমি অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে



চ'লে এস; আমি আমার সঙ্গ অপরিসীমতাই রাখ-  
লেম, তোমার পুরাতনকেই তুমি আমার ফিরিয়ে  
পাবে। হিন্দুর স্ত্রী হয়ে আমার তুমি হিন্দুকেই ফিরে  
আসবে।”

নীলিমার প্রবল উত্তেজনাক্রান্তি বেন শ্রোতের মুখে  
উপলব্ধের মত—ঝড়ের মুখে তুলার শির মত—তখনই  
মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।  
তাহার রুদ্ধদীপ্ত সতেজ মূর্তি অবসাদের অবসন্নতার  
বেন সহসাই গলিয়া রিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিবেবের  
মধ্যে বিবর্ণা অশ্রুমুখী হইয়া যোড়হাতে ও শান্ত মন  
কণ্ঠে সে কহিল, “তোমার এ দয়া আমার চিরকালই  
স্মরণ থাকবে। কিন্তু তুমি তো তোমার সমাজের  
সমাজপতি নও! তোমার এ দানকে লোকে হয় তো  
না বুঝে, না ভেবে দেখেই লোভের পর্যায়ে ধরে  
নেবে। আর আমি নিজে? আমি জানবো, আমি  
ভিক্ষা পেয়েছি। ভিক্ষা! দয়া!—না, তাতে এখন  
আর আমার তৃপ্তি হবে না। যদি সমাজ আমার  
ফুলের প্রাণশক্তি বিধান করে আমার গুচি গুচ  
করে আমার তার নিজের কোলে ফিরিয়ে নেয়,  
তবেই আমি সেখানে যেতে পারি, নতুবা গায়ের জোরে  
অথবা কপটতার আশ্রয়ে এসে, অথবা মনকে আঁধারে  
—না, এর কোন একটাতেও আমি রাজী নই।”

উত্তেজনায় নীলিমার খাস রক্ত হইয়া আসিয়াছিল  
বলিয়াই বোধ করি সে হঠাৎ কথা কহিতে কহিতে  
ধামিয়া পড়িল, অথবা যে কথাটাকে সে বলিতে চাহে,  
সেটাকে ঠিক গুছাইয়া উপযুক্ত ভাষা দিয়া সাজাইয়া,  
নিজ মনের সমুদয়খানি জালা দিয়া জালাইয়া, তাহাকে  
প্রকাশ করিতে না পারার অক্ষমতার বিপরীত বিব্রত  
হইয়াই ধামিয়া গেল। তাহার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত  
বেদনা ও অভিমানকে সে লোকচক্ষুতে তাহাদের  
প্রকৃত স্বরূপে যদি তুলিয়া ধরিতে না পারে, তবে  
তাহার লঘুভাবে বহিঃপ্রকাশ যে না হওয়াই ভাল!

সুশীল আনতমুখে, এক মুহূর্তকাল চুপ করিয়া  
থাকিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্বক ধীরে  
ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর নীলিমার দিকে  
ফিরিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তা হ'লে তোমার  
জন্তে আমার কিছুই আর করবার নেই নীলিমা?”

নীলিমা অস্ত্রদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের সহসা  
অস্বহিতপ্রায় মনের বলকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত  
প্রাণপণে যুক্তিতেছিল। তাহার গুরুত্বের আহত

আতুর চিত্তে প্রতিহিংসার হিংস্র আগুন জালাইয়া  
দিয়া পর-মুহূর্তেই তাহার দাহ-জ্বালার ঘেন্না নিজেই  
একান্ত অস্থির—বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে  
সে ইতঃপূর্বে যেমন সম্পূর্ণ বলি দিয়া শুধু প্রতিশোধের  
একটা উদ্যম উন্নত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল,  
যে আনন্দ আত্মঘাতী, তাহার মরণ-মুহূর্তে প্রতিশোধের  
পাত্রের অন্ততম মুখের পানে চাহিয়া উপভোগ করিয়া  
যায়, নীলিমাও সুশীলের চিত্তে তেমনই একটা প্রবল  
অনুতাপের তাপ অনুভব করিয়া তেমনই আত্মপ্রসাদ  
উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু অতি সহসা মনের সেই  
সর্বনাশী আনন্দটা তাহার বেন পরিবর্তিত হইয়া  
আসিয়া তাহার পদাঙ্ক হইতে কেশাগ্রাবধি তাহাকে  
দারুণ লোভে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মন তাহার  
কত কি বেন প্রলোভনের মধুর রাগিনী কানের কাছে  
গুঞ্জরিয়া তুলিল। জমাট মেঘের দারুণ গুমোট কাটিয়া  
জলের স্রোত ফাটিয়া পড়ে পড়ে হইল। কিন্তু তখনও  
প্রাণপণে সে নিজের সহিত বৃদ্ধ করিতে ছাড়িল না।  
মানবীর সকল বাসনা-কাহনা সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে সবলে  
পরাস্তব করিয়া, মধ্যে তাহার তীব্র বৈরাগ্যের  
শূন্যতাকে আগাইয়া তুলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া কোন  
প্রকারে অবিচল কণ্ঠে সে উত্তর পাঠাইল, “কিছু না।”

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমা চলিয়া যাইবার  
জন্তই বোধ করি সুশীলের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে  
ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলিয়া  
যাইবার আর কোন আগ্রহই তাহার দিক হইতে দেখা  
গেল না।

কিন্তু এই সুম্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের অপমান সুশীলকে  
বেন মনের মধ্যে একটু তীব্র হইয়াই বিধিল। নীলি-  
মার প্রত্যানোগত ভাবটাকে করিয়া সে ঈষৎ  
চঞ্চল হইয়াও উঠিয়াছিল, তাই তাহাকে অনুসরণ  
করিবার ইচ্ছায় পুনশ্চ ছই চারি পদ অগ্রসর হইয়া  
আসিয়া একটুখানি ব্যগ্রভাবেই কহিয়া উঠিল, “আমার  
কিন্তু আরও একটু কিছু বলবার ছিল।”

নীলিমা কণকাল তদবস্থাতেই অপেক্ষা করিয়া  
তাহার পর সুশীলের দিক হইতে কোন সাড়া-শব্দ না  
পাওয়াতে অগত্যাই অনিচ্ছুক মৃদুভাবে নিজের বর্ণ-  
লেশহীন বিকৃত মুখ তাহার সামনে ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া  
ভাতোদিক মৃদু ও আলিত কণ্ঠে কহিল, “বল।”

সুশীল তখন একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষ  
কহিল, “আমার বিয়ে যদি তুমি নাই কর, নাই বা

করলে; কিন্তু আমার সাহায্য নিতে তো আর দোষ নেই? আমার বোনের মত থাকবে, আমার যথা সাধ্য আমি করবো; আমার সঙ্গে চ'লে এস,—এখানে কি তুমি স্থখে আছ?

এ কথাই রাগ করিবার মত কোথায় কি আছে, তাহা না বুঝিতে পারিলেও নীলিমার বুকের ভিতরে যে একটা ক্রোধের প্রসঙ্গ বহুশিখা ধক্ ধক্ করিয়া স্ত্রীলোকের এই সবিনয় ও সহন্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া উঠিতে গেল, তাহার বহিঃপ্রকাশকে যথাসাধ্য দমনে রাখিলেও নিজের কাছে সে সম্পূর্ণরূপে জরী হইতে পারিল না। বহুকালের পর আনন্দ মুখ এইবার উন্নত করিয়া সে প্রোজ্জ্বল নেত্রে স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্টভাবে বলিল, “যে দিন আমার তুমি আশ্রয়না বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে চ'লে গেছলে, সে দিনের অপেক্ষা আজ কি তুমি আমার বেশী অন্তরের মধ্যে দেখতে পেলেন? এখন তো আমি বাইরে এসে নিজের পথ নিজে তৈরী ক'রে নিরেছি, দেখতেই পাচ্ছ! তবে আমার অনর্থক তোমার মতন এক জন নিঃসম্পর্ক লোকের ভিক্ষা নেবার জন্য আমার অনর্থক তুমি ডাকা-ডাকি করছো কেন? আর তো আমার তার কিছু দরকার নেই।”

নীলিমা এই যে কথাগুলো বলিল, ইহার মধ্যে তাহার বেছাকৃত আঘাত-দণ্ড দেওয়া ছিল না, কণ্ঠে তাহার কলহ-কাকলী ঝঙ্কার করে নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের বুকের মধ্যে ঐ বথার্থ সত্যবাণী যেন তপ্ত শেলের মতই আঘাত করিল। কিছুক্ষণ সে বিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর অত্যন্ত দুঃখিত কণ্ঠে কহিল, “তা হ'লে আমার কাছ থেকে তুমি কিছুই নেবে না?—ধাক্, যদি দরকার না থাকে, তা হ'লে নেবেই বা কেন? আর সত্যকথাই বলি, আমি নিজেই তো আজ পথের কুকুর, আমি তোমার দেবোই বা কি? আর কোথা থেকেই বা অত দেবো?—কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই নীলিমা! আমার বা তোমার বাপের অপরাধে তুমি তোমার সমাজধর্মকে ত্যাগ ক'রে ভাল করনি। শত ক্রটি থাকলেও এ যে তোমার নিজের ধর্ম; তোমার পিতৃ-পিতামহের স্বার্থ সেবিত নিজের সমাজ; এর যা দোষ ক্রটি আছে, তা সে সমাজের বর্তমান লোকে-দেয়ই দোষে। সেই দোষের সংশোধন-চেষ্টা যার যতটুকু শক্তি, তা দিয়ে করাই সমস্ত, তাকে ত্যাগ

করবে কি অধিকারে? আপনার জন মূর্থ অজ্ঞ হ'লেও তাকে কি কেউ ফেলে দেয়?”

সুশীল আর অপেক্ষামাত্র না করিয়া নীলিমার পাশ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নিজের জীবনটাকে তাহার তখন এতই নিরর্থক। অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছিল যে, এমন ভাবে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেও যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। এখানে তাহার যে প্রয়োজন ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহ-জীবনের সকল কার্য্যই যেন আজ সম্পূর্ণ হইয়া গেল বলিয়াই সেই কণ্ঠে অনুভব করিল।

### চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী কিরিয়া স্নেহে তাহার তির্য্যাক্ত কার্য্যপ্রোতে যখন নিজেকে যথাপূর্ব্ব নিমগ্ন করিয়া দিল, তখন বিপ্রদাস বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন। দুর্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট পশুকে যেমন কখন কখন তাহার প্রতিপালকের কাছে নিজের চিরহিংস্র প্রকৃ-তিকে একান্ত বশতায় সংযত ও সংহত করিয়া লইয়া শাস্তমূর্ত্তি ধরিতে দেখা যায়, বিপ্রদাসেরও এই প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অপত্যস্নেহ তাঁহাকে তাহার কাছে তেমনই নির্বীণ্য নিরীহ করিয়া ফেলিয়াছিল। স্ত্রীলোকের তরুণী ভাৰ্য্যা তাঁহার প্রকৃতি দিয়া যে দুর্দান্ত বাঘকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, এই শাস্তমূর্ত্তি ও দীপ্ত-তেজা বালিকা তাহা অবলীলাক্রমে ঘটিয়াছিল। বিপ্রদাসের সকল বঠোরতা এইখানেই বরিয়া পড়িয়াছে। তাই স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় ওই দুর্ঘটনাময় হুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহে যখন জিদ করিয়া ভুবনবাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিতে ভরসা না করিলেও মনে মনে দারুণ অন্তস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। স্নেহের অকোমল স্নেহময় প্রকৃতি তাঁহার অপরিচিত হইলোও অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে তাহার তীব্র বিরাগও তেমনই যে তাঁহার সুবিদিত। সে যদি স্ত্রীলোককে পাপী বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তবে তাহার সে বিশ্বাস পরিবর্তন ঘটান বড় সহজ হইবে না। তাই বাড়ী কিরিয়া মেয়েকে সহজভাবে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া



তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্নের হস্তযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং এ ঘটনাটা সত্যবতীর নিকটে উত্থাপন করারও আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। কারণ, তাঁহার জানা ছিল, এই সকল বাস্তবজগতের গুরুযোচিত দুর্ভাগ্যকে সত্যবতীও মনে মনে ঠিক সহ্যভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।

অনুরূপার ব্যাপারটা মিটাইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। মেয়ে নিকৃষ্টি, আশান্বিতে জলে ডুবিয়া মৃত্যুই প্রাণ দাঁড়ায়, অগত্যা নগদ দুই শত মাত্র টাকাতাই অনুরূপ বিপ্রদাসের ভাবী জামাতার অনুরূপেই পুলিশে এজাহার দিয়া আসিল। মেয়ের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, সে এক খুঁটান যুবাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিল, তাই স্থলীলকে সেই সে কথা জানাইয়া পলাইতে সাহায্য করে, পরে জাতি যাওয়ার ভয়ে পিতাকে অস্ত্র বরে বিবাহ দিতে উত্তত দেখিয়া কান্নাকাটি দ্বারা মরণাপন্ন মায়ের মৃত্যু ঘটাইয়া সেই সুযোগে জগে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ইত্যাদি।

পূর্বে অনুরূপ সন্দেহ ঘটিলেও ইহাই যথার্থ প্রমাণ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। এ দিকের এই গোলমালটা মিটাইয়া ফেলিয়াও বিপ্রদাস ওদিকে ভুবনবাবুকে বিবাহের দিন স্থির করিতে অনুরোধ জানাইয়া সত্যবতীর প্রতিও যথাকার্য্য মনোযোগী হইবার আদেশ দিলেন।

বেনারসীর কারবারী এক খাতিওয়াল একরাশি সাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, কয়েকখানা ভাল ভাল সাড়ী বাছাই করিয়া বিপ্রদাস দ্বীর কাছে অন্তরে পাঠাইলেন—তাহার মধ্যে দুই চারিখানা পছন্দ করিয়া লইবার জন্য। সত্যবতী আপনি পছন্দ করিয়া তাহার পর মেয়েকে ডাকাইয়া বলিলেন, “এই টকটকে লাল সাড়ীতে বড় জরির কাড়ের কাজ দেওয়া সাড়ীখানা তোমার বিয়ের জন্য রাখবোই, তা ছাড়া এর মধ্যে ক’খানা তোমার পছন্দ হয়, দেখু দেখি।”

সুলেখা কাপড়গুলার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, অন্তরিক্তে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া সে স্বরে উত্তর করিল, “কাপড় আমার একখানাও পছন্দ নয় না, কাপড় তুমি সবই ফেরত দাও।”

মা বলিলেন, “সে কি রে? এমন চমৎকার কাপড়, তোমার কিছু পছন্দ হলো না? সোনার তারের ওই নক্সাকাটা সাড়ীখানা সত্যি চমৎকার। এইটে রাপু, আমি ফুলশয্যায় দোব। আটশো টাকা দাম,

তা হোক গে। এই রূপার তারে সোনার কাজগুলা, আর নীল রংয়ের বাদলা সাড়ী দুখানা বাক্স দিতে লাগবে, ময়ুরকণী ২০টাও কিন্তু তোকে মানাবে বেশী। ওখানাও নিতে হবে। সবগুলোই তো দেখছি সুন্দর!”

সুলেখা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া নিজের আসুলে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইতেছিল, তেমনি থাকিয়াই সে ধরা গলায় জবাব দিল, “ও সব কেন বলছো মা; তুমি কি জানো না, আমার বিয়ে হওয়া এ জন্যে অসম্ভব! যা হবে না, তার আর মিথ্যা আলোচনার ফল কি?”

সত্যবতী এবার সাক্ষর্য্যে মুখ তুলিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ও নেত্রে সমস্ত সন্দেহ অতিমাত্রায় ভরিয়া উঠিল, সাক্ষর্য্যে তিনি বিস্ময়বিহ্বলভাবে কহিয়া উঠিলেন, “সে কি লেখা! এ তুমি কি বলছিস্ মা? বিয়ে অসম্ভব! কেন রে? কখন কি হলো এর মধ্যে?”

সুলেখা একটু চকিত হইয়া মার দিকে চাহিল, তাঁহার বড় বড় চোখে ব্যথিত বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া সে সবই বুঝিল, এবং বুঝিল বলিয়াই পিতার প্রতি মনটা তাহার বিষম বিরক্ত বোধ করিল। তিনি কিছুই তাহা হইলে তাহার মাকে জানান নাই। আশ্চর্য্য।

নীরস গুরুকণ্ঠে সে বলিল, “বাবুজীকেই আগে তুমি জিজ্ঞেস করো, তিনি যদি এখনও তোমায় না বলতে পারেন, তা হ’লে আমিই না হয় তোমায় সব বলবো, কিন্তু তাঁরই বলা উচিত।”

এই বলিয়াই সে চঞ্চল হইয়া চলিয়া গেল। মায়ের সেই নিশ্চিত আশাতুঙ্গের তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া তাহার নিজের দৃঢ়তাও যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে মায়ের সঙ্গে আর সহিতে পারিতেছিল না। সে যে মায়ের এক সন্তান।

এ দিকে স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া সত্যবতীও জিদ ধরিয়া বসিলেন যে, একরূপ অবস্থায় ওখানে তিনি কল্যাণদান করিতে পারিবেন না। সুলেখাকে দিন সেই কথাই বলিলেন, বলিলেন যে, সুলেখার পিতা এখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই বটে, তবে তিনি তাঁহাকে যেমন করিয়াই হোক বিষয়ে রাজী করিবেন। কেন, দেশে কি পাত্রে এতই অভাব হইয়াছে যে, সুলেখার মত মেয়েকে অমন অপাত্রে হাতে দিতেই হইবে? সে তিনি থাকিতে যটিবে না। মায়ের মুখের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া

সুলেখার মুখের কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটল না, সে মায়ের দিকে তাহার চিরসিকান্তে ভরা অবিচল নেত্র দুটি তুলিয়া ধরিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি মনে করছো, আবার আর এক জনের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দেবে, আর তাই আনি করবো?”

সত্যবতী মেয়ের মুখের এই সুস্পষ্ট জেরায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেও মনোভাব গোপন করিয়া সহজভাবেই জবাব দিলেন,—“সে কি? এক জনের সঙ্গে বিয়ের কথা হ’লে কি আর তার অন্তের সঙ্গে বিচার হয় না? একবার ছেড়ে শতবারও এমন বিয়ের সম্ভাবনা হইবারই হয়ে থাকে।”

সুলেখা নিজের চোখের দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর তেমনিভাবেই স্থির রাখিয়া কঠিন স্বরে কহিল,—“আর যে যা বলে বলুক, মা, তুমি আমার কথা আর একবারও বলো না। সত্য-সাধীর মেয়ে আমি, আমার আট বছর বয়স থেকে এক জনের কাছে উৎসর্গ ক’রে রেখে আজ যদি তোমরা সে দান ফিরিয়ে নিয়ে অপরকে আবার তাকেই দিতে যাও, তোমরা দত্তাপহারী তো হবেই, আর আমি হবো—অসতী। তা কি ভেবে দেখেছ?”

“লেখা! লেখা!—অমন কথা বলিসনে!” মেয়ের কথায় সত্যবতীর বুকে যেন কে চাবুক মারিল, ঠিক তেমনিই আর্তরব করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন,—“বিয়ে তো আমরা দিইনি, শুধু মুখের কথা শত্রু দিয়েছিলুম, তার জন্ত—”

সুলেখার মুখ লজ্জায় রাজা হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই তাহা একান্ত মলিন হইয়া গেল, সে এবার মায়ের দৃষ্টি পরিহারপূর্বক নত নেত্রে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, “তোমাদের পক্ষে হয় তো সেটা শুধু মুখের কথাই হবে, মা, কিন্তু আমি তো তাকে কেবল মুখের কথাই মনে করতে পারিনি। এত দিন ধ’রে যে বাড়ীকে আমার যত্নরবাড়ী ভেবে এসেছি, যাকে আমার—”

সুলেখার ব্যাকুল কাতর কণ্ঠ অক্ষুণ্ণ হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনাকে সন্তর্পণে জাগাইয়া তুলিয়া সে নিজের বক্তব্য সমাধা করিল। কোন বাধাকেই যেন সে মানিয়া উঠিতে পারিল না;—“যাকে আমার স্বামী ভেবেছি, আমি কেমন ক’রে আবার সে সব বদল ক’রে—আর এক জনকে আবার তারই জায়গায়—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে যেন সেই সম্ভাবনার একান্ত হইয়া উঠিয়া সচমকে বলিল, “তা কোন মতেই হবে না মা, আর কারকে বিয়ের কথা মনে হ’লে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যায়—সে কিছুতেই আমি পারবো না, তুমি বাবাকে সেই কথা বুঝিয়ে বলো। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, তা হ’তে পারে না?”

মেয়ের সেই উত্তেজনাকর সত্যের প্রভাবীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেব চকুতে চাহিয়া চাহিয়া সত্যবতী মূর্ত্তির মতই তরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার প্রত্যেক কথাটি যেন অনির্কলনীয় সত্য, সঙ্করে সুদৃঢ় ও অকাট্য, সে বিষয়ে তাঁহারও আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না এবং সত্য নারীর অন্তর দিয়া ইহার বৌদ্ধিকতাকেও তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না।

ইহার পর সুলেখার মা-বাপে মিলিয়া কি পরামর্শ হইল, জানা নাই, কিন্তু সুলেখার মায়ের পাত্ৰান্তরে কন্তাদানের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল। এক দিন কথায় কথায় তিনি আবার এই কথাটাই তুলিলেন। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, “তা হ’লে সুশীলের সঙ্গেই বিয়ে হোক, তাঁর তো বয়সই তাই ইচ্ছা। বলেন, বিয়ে হ’লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তার খবর নিয়েও জেনেছেন, তাতে তার দোষও তো বেশী নয়—”

তিনি সুলেখা বিজ্ঞানস্পৃষ্টের মতই ছিটকাইয়া উঠিয়া তেমনি জ্বালাত্তরায় অগ্নিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “ও কথা আমার বলো না মা! বিয়ে আমার হওয়া আর নয়! যার মাথায় অত বড় কলঙ্কের বোঝা, তাকে তোমরা কোন্ হিসেবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও?”

মা তখন ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “তবে আমরা কি করতে পারি, তাই বল মা! ওকও বিয়ে করুবি না, অন্তকেও না, এর কি উপায় করি লেখা?”

সুলেখা মুহূর্ত্তেই মাস লইয়া উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল, “তাই তো বলছি মা, এর তো কোন উপায়ই নেই, তাই এমন করেই কাটাতে দাও মা। করবার পথ এর কোন্‌খানে আছে যে, কিছু করবে তোমরা?”

“চিরদিনই আইবুড় হয়ে থাকবি তুই? লোকে তাতে কি বলবে, শুলু?”

সুলেখা ব্যগ্র হইয়া বলিল, “আর যা বলে বলুক মা! তোমার মেয়েকে দ্বিচারিনী তো আর কেউ বলতে



পারবে না। হিঁদুর মেয়ের পক্ষে সেই যে যথেষ্ট।  
■ যে সীতাসাবিত্রীর দেশ মা।”

সত্যবতী বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার একমাত্র মেয়ের বিবাহে কত সাধ, কত আশাই যে তিনি মনের মধ্যে করিয়া ছিলেন। উঃ, পৃথিবীটা কি? যেখানে বেশী আশা, সেইখানেই কি ভেমনি ওজনের মাপে মাপিয়া নিরাশার নিরানন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া জমিয়া উঠিবে? কে জানিত যে, তাঁহার অত আদরের স্নেহের ভাগ্যেই এমন ধারা বিড়ম্বনা লেগা ছিল!

বিপ্রদাসবাবু নিজেরও বিধিযতে মেয়েকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। স্নেহের এ যে একবারেই অস্তিত্বহীন অনাবশ্যক খেরালমাত্র, তাহাও তিনি বহুতর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু স্নেহের সেই শাস্ত্র মুখেই বিনীত অথচ সুদৃঢ় বাণী—“আমি মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি বাবা, তিনি আমার হয়ে আপনাকে বুঝাবেন। আর আমি কিছু বলবো না।”

ইহার আর রত্ন-বন্দা হইল না। মা মনের ক্রোধে অশ্রুপাত সম্বল করিলেন, পিতা ক্রোধকটিন মুখে তরঙ্গার করিতে লাগিলেন, মেয়ে নীরব দৃঢ়তার একনিষ্ঠভাবেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া রহিল। শুধু তাহার সারা চিত্ত অসহ ক্রন্দনের আর্ততার ভুলিভূত হইয়া নীরব হাহাকারে কাদিয়া কাদিয়া বলিতেছিল, “তোমার যত দূরেই চেলিয়া কেলি না কেন, তুমি আমারই! তুমি আমারই!”

### পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীতল বর্ষাধারায় চোখের জলের তপ্তধারা বিশা-ইয়া দিয়া নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি অবসানে ক্লান্তদেহে শ্রান্তচিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই দাসী আসিয়া একখানা খামে মোড়া চিঠি স্নেহের হাতে দিয়া বলিল, “ডাকপিয়ন ভোরের বেলা দিয়ে গেছেলো, আপনি ওঠেননি বলে এতক্ষণ দিইনি।” মুখের দিক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, “জামাই বাবুর চিঠি না দিদিমণি?”

স্নেহের চিন্তামান পাণ্ডু মুখ এই ইঙ্গিতে একবারের জন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার

পরক্ষণেই সেই আকস্মিক তপ্ত শোণিতোচ্ছাসটা একেবারে নিঃশেষে যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়া তাহার সেই বেদনাপাণ্ডুর মুখখানাকে কে বেন হলুদে রং মাখাইয়া দিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে মাটির ঠাকুরের স্মৃতিতে মুখকে যেমন দেখায়—স্নেহের সুন্দর মুখখানাকেও ঠিক ভেমনই প্রাণহীন বলিয়াই বোধ হইল। একটু একটু করিয়া তাহার মধ্য হইতে জীবনের ■■■ যেন লুপ্ত দৃষ্ট হইল। দাসী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, সে এক পা ■ পা করিয়া বেন নিতান্ত অনিচ্ছা-মহরগতিতেই নিজের ■ পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্বক দ্বারে খিল লাগাইয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ যেন চিঠিখানা খুলিয়া কেলিতেও তাহার ভ্রম হইতেছিল না, মনের মধ্যে উৎকর্ষ তাহার জন্ত যতই প্রবলভাবে আগিয়া উঠিল, বাহিরের দিক হইতে হাতের আঙ্গুলগুলো ততই বেন শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহাকে ঐটুকু সহায়তা করিতেও তাদের দারুণ অনিচ্ছা খাপন করিতে লাগিল। তাহার কেবলই ভ্রম করিতে লাগিল, চিঠি খুলিয়া সে হয় তো দেখিবে, সুশীল লিখিয়াছে, নীলিমাকে পাওয়া যায় নাই, আর না হয় তো লিখিয়াছে—তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এখন সে সুশীলের বিবাহিতা স্ত্রী—এই দুটো খবরই যেন স্নেহের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। একে সুশীলের দ্বারা নারী-হত্যায় তাহার আশা—তাহার চিন্তা—তাহার প্রতীক্ষা ইহ-পর্য্যন্ত চিরদিনের মত নিঃশেষ। আর অপরে এ অন্যের মতই তাহার মনের সকল সম্বন্ধের উচ্ছেদ।

কিন্তু হোক তা, চিরদিনের ■■ হারানোর চেয়ে বুঝি সেই ভাল। তবু তো স্নেহে নীলিমার স্বামীর চিন্তা করিয়াও জীবনের বাকি দিনগুলো এক রকমে কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এই চিন্তা করিয়াই মহা স্নেহের সমস্ত জীবনটাই বেন শূন্যময় হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, লোকসমাজে আর সে বুঝি নিজেকে বাহির করিতেই পারিবে না, এমন কি নিজের মা-বাপের সাক্ষাতেও না।

এই পত্র আসার সংবাদে মা আসিয়া যখন ব্যথিত নিঃশব্দ প্রশ্নে দৃষ্টি তরিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইবেন, তখন তাঁহাকে সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা সে কেনা, মতই যেন হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইল না। নিদ্রের সে তোশেষ করিয়াই দিয়াছে; কিন্তু বাপ-মায়ের চোরে, বড় ন্যায়ান্তিক রক্তগার সে কারণ হইয়া ■■ গইয়া

তাঁহা ভাবিয়াই তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। চিঠি-খানা খুলিবার চেষ্টাও এই প্রকার মানসিক অবস্থায় পড়িয়া সে বহুক্ষণ পর্য্যন্তই করিতে পারিল না। যেন তাহার ভিতরে একটা করাল কালসর্প লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, খুলিতে গেলেই সেটা তাহাকে বিষদীপ্ত ফুটাইয়া দিবে, এমন একটা ভয় তাহার করিতে লাগিল।

বর্ষাদিনের ক্ষণিক সূর্য্যপ্রকাশ ইতোমধ্যেই কজ্জল-কৃষ্ণ মেঘব্যাপ্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রী-জগদের ঘনচ্ছায় বিশাল বিশ্বকে সর্কীর্ণতর প্রতীকমান হইতেছিল। গুরু গুরু মেঘ-গর্জনে ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সুলেখা পত্র-হস্তে সেইরূপ গুরু স্পন্দিত বক্ষে মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে ফুটন্ত কদম্বগাছের উপর দিয়া প্রবৃত্ত পবন যেন তাহারই গোপন-সঞ্চিত বেদনা বহিয়া আর্দ্র হা হা রব তুলিয়াছিল। তাহারই নির্মম পীড়নে ফুটন্ত কদম্বকেশর বিরহিণী নারীর অশ্রু-বদ্রিষণের মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির হাওয়া জানালা দিয়া ঝরা পাতা, ধসা পাপড়ি অজস্র পরিমাণে উড়াইয়া আনিল। স্ত্রীলের সে পত্রের বর্ণ এইরূপ—“সবিনয় নিবেদন—

তোমার অনুমানই সত্য, নীলিমা মরে নাই, সে বাঁচিয়া আছে।”—সুলেখার হৃৎপিণ্ড সহসা দ্রুততালে নাড়িয়া উঠিল, আঃ, তবে স্ত্রীলের কার্য্য নারী-হত্যার সহায়ক হয় নাই? ভগবান্!—পরক্ষণেই চলন্ত মেঘের কবলে পতিত সূর্যালোকের প্রভার মতই তাহার সেই আকস্মিক লোহিত সমুজ্জলতা একেবারেই যেন স্নান মসীময় হইয়া গেল। বোধ হইল, তাহার চারিদিক বেড়িয়া একটা প্রলয়-রাত্রির বীভৎস ক্ষয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রমত্ত প্রমথের চরণভঞ্জে তাহার বৃকের পাঁজরাগুলো যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

তাহার পর সুলেখা আবার পড়িল—“সে এখন \* \* \* এর মিশনে বাস করিতেছে। সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আমার প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নাই এবং এখন দীক্ষিত যুশ্চান—”

ই সুলেখার হাত হইতে পত্রখানা স্থলিত হইয়া জলে পতিত হইল। তার মনে হইল, সেও যেন উড়া যাইবে। তার মধ্যে একদিকে হই

দিক হইতে হুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের বজ্রা হকুল প্রাবিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিল। হর্ষ শোক, আশা ও নিরাশা, আশ্রয় নিরুত্তমতা এই উভয়ে মিলিয়া তাহাকে যেন এইক্ষণে পীড়িত প্রকুর করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলিমার ঐ প্রকার একটা ভুল পরিণামই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল, সেই তাহার এ হঃখ নিরাশা, কিন্তু সেটা যে আরও বেশী মন্দ হয় নাই এবং স্ত্রীল যে তাহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিতে পারিল, সেই আনন্দে- তাহার সকল দিনের সকল কষ্টই যেন সে তুলিয়া যাইতে বসিল। চিঠিখানার শেষ পর্য্যন্ত আর সে মন দিয়া পড়িবার দরকারও মনে করিল না। সে কথা তাহার আর মনেই পড়িল না। কেবল এত দিন ধরিয়া সে স্ত্রীলের প্রতি যে সকল নির্মম কঠোর ব্যবহারগুলো করিয়া আসিয়াছে, সেইগুলার কথাই মনে করিয়া এখন তাহার মর্ম্মের বাঁধন যেন চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল এবং সে একটুখানি স্ত্রীর সহিত বিগত বিয়াট শোকের বিপুল অশ্রু একত্র করিয়া দিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আবার তখনই তাহার স্মরণে আসিল যে, আজ সে নিজের কর্তব্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে উত্তত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও যে তাহার সেই ক্ষণিক মোহের অনন্ত স্মৃতি তাহাদের স্নানস্থানে পাষণ-প্রাচীর তুলিয়া রহিয়াছিল, আর কি কখন ইহাকে ভাঙিয়া কেলিয়া তাদের মধ্যের এ ব্যবধান দূর করিতে পারা যাইবে? না না, সে দুঃখা বৃথা। বাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। কখনও না, কিছুতে না, নিজের প্রাণ দিলেও না। কিন্তু—কিন্তু তবু—তবু কি কখন স্ত্রীলের সে দিনের সে নিগ্রহ সে তুলিতে পারিবে? পাপ তো অনেকই, প্রায়শ্চিত্ত তাহার কয় জনে করে? এত মহত্ কাকার? সুলেখার আদেশের এ সম্মান আর কে রাখিত? হায় হায়—কি দুর্ভাগিনী সে, যে এমন স্বামী হারাইল।

### ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন নীলিমার সহিত সাক্ষাতের পর স্ত্রীলের হইল, এ জন্মের মত তাহার সকল কার্য্যই এবার সামাধা হইয়া গিয়াছে, অতঃপর পৃথিবীতে তাহার



আর কিছুই করিবার নাই, এখন এই অনাবশ্যক জীবনের গুরু ভারটা তার বহিরা বেড়াইলেও চলে, অথবা না বহিলেও আর কিছুমাত্র আসিয়া যায় না! বর্ষার নদী গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে শুকাইয়া গিয়া ক্রমেই যেমন তাহার দুই ধারে বিস্তৃত ধূ ধূ বালুকামণ্ডির অভ্যন্তরে মিলাইয়া আসিতে থাকে, সুশীলের শ্রাবণ-ঋতুর মতই কুলপ্লাবী মেহ-প্রেম-ভক্তি-প্ৰীতি-পরিপূর্ণ উদার চিত্তও তাহার উপরকার অপ্রত্যাশিত প্রতিঘাতে একেবারে যেন শুকতর হইয়া পড়িয়াছিল! সর্বস্বত্বের আধার-স্থল এই আনন্দর বিজয়গণ তাহার মনের কাছে এতটুকুও আর বৈচিত্র্য বা আনন্দপ্রদ ছিল না, তাই তাহার সারা চিত্ত যেন নিদাক্ষণ শ্রান্ত ও অবসর হইয়া এখানের কারবার তুলিয়া দিয়া একটা বিরাম-শয্যা খুঁজিতে চাহিতেছিল; আর সে যেন পারিতো-ছিল না।

বাড়ী ফেরার তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, কোথাও দূরে—দূর হইতে দূরান্তরে দেশ, ভূমি, পরিচিত সব কিছুকে ছাড়িয়া পৃথিবীর কোন এক নিভৃত প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া, তাহার সুশীল নাম বিস্তৃত হইয়া, জীবনের এই অন্ধকারময় দিনগুলোকে ক্লম করিয়া ফেলিতে তাহার অপমান-পীড়িত আহত অন্তরাত্মা তারম্বরে তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। বোম্বাই হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া সাউথ আফ্রিকা বা আরও কোন দূরবর্তী সুদূর অজ্ঞাত-অগ্ন্যাত রাজ্যে অসভ্য বস্ত্রদিগের মধ্যে চিরদিনেরই মত আত্মনির্ভরাসন দিতে সে মনে মনে বহুপরিকর হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার পরিত্যক্ত নিজ গৃহস্থিত একটিনাত্র কীণ দীপশিখার প্রতি তাহার অশ্রু-অন্ধতার প্রায় দৃষ্টি-হীন নেত্রের সঙ্কুচিত দৃষ্টি পতিত হইল। যে মাতৃ-প্রতিমা পিসীমা—মাতৃহীন তাহাকে আশৈশব-যৌবন মাতৃস্নেহের অফুরন্ত নিরঙ্কর-ধারা ঢালিয়া দিয়া বুক করিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, সেই একমাত্র বিশ্বস্ত স্নেহই যে আজও তাহার তেমনই অকলুষিতভাবে রক্ষিত আছে। তিনি যে আজও সকলকে সগর্বে মাথা খাড়া করিয়া বলিতেছেন, “কখন না, আমার সুশীল সে ছেলেই নয়! প্রাণ দিবে, তবু সে এতটুকু একটু অস্তায় করবে না—এ আমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলবো!” সেই মহিমময়ী মায়ের কথা কি সুশীল জীবনের শেষ দিনেই কখনও তুলিবে? এ পৃথিবীতে আজ সে নিঃশ্ব নিঃসহায় ককির!

কাহারও কাছে আজ কোন সমলই তাহার নাই, তাই এতটুকু পাওনাই তাহার পক্ষে আজ সাত রাজার মনের মতই অমূল্য বলিয়া বোধ হইল। তাহার পায়ের ধূলাটুকুকে যে যাবার আগে একবার সঞ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। সুশীল তাই বাড়ী আসিল। মনের অতি নিভৃত কোণে আরও কাহার দর্শনা-কাজ্ঞাও হয় তো অতি সূক্ষ্মভাবেই লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু সে কথাটা সে নিজের মনকে ভাল করিয়া বুঝি জানিতে দিগ না, মিলে অভিমানের সহিত বিধাবন্দে হয় তো বা তাহারই জয়পতাকাখানা খাড়া হইয়া উঠিলেও উঠিতে পারে, বুঝি বা মনে সে ভয়ও ছিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া বুক আবার সুশীলের যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। পিতার অবস্থা যথাপূর্ব্ব। তিনি জরা-বার্দ্ধক্যে জড়াইয়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। নিজের যম হইতে আর বাহিরও হইতে পারেন না, চোখে দৃষ্টি একান্ত কীণ, কণ্ঠের কচিং বিরগ ভাষা তমপেক্ষাও কীণতর। সুশীল গিয়া প্রণাম করিতে তাহার ঠোঁট একটুখানি কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও তিনি কহিতে পারি-লেন না। অসংবরণীয় ব্যথায় মর্মান্তিক হওয়ার অভি-মানী বাগক বেত্রাহত অপরাধীর মত ভয়চিন্তে আর্ন্ত-বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া নিজের নির্জন ঘরে আলুখালু বিছানার উপর নিজেকে বিবশভাবে লুটাইয়া দিল। না না, এমন করিয়া আর সে বাচিতে পারে না! অসহ, অসহ, ইহার অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল! ইহার অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল!

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া কেহ সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কাছে আসিয়া সে তখন সংশয়-ভীতকণ্ঠে সহসাই ডাকিয়া উঠিল, “সুশীল!”

সুশীল তাহার এতই কাঁপিতেছিল যে, কাহার যে সে স্বর, তাহাও যেন ঠিকভাবে চেনা যায় না। বিষ্ময়ে মুখ তুলিয়া সুশীল ততোধিক বিষ্ময়ের সহিত অস্পষ্ট-ভাবে উচ্চারণ করিল, “তুদা!”

সুশীলের বুকটা নিম্নিষে ধবক করিয়া উঠিল। না জানি, আজ আবার কি উদ্দেশ্য মনে হইয়াই শুভে-ন্দুর এখানে আগমন! তথাপি মন কিন্তু সুশীলের তেমনভাবে শঙ্কিত হইল না। কারণ, ভয়-ভাবনা, জ্ঞাতক আজ-সবই যে তাহার কাছ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাহারও কোন অস্তায় অবিরে, কোন অসামুখিক অপ্রত্যাশিত অত্যাচারে তাহার ধার

এখন কিছুমাত্র যায় আসে না, তাহার ক্ষতি বাহা কিছু হইবার, সে তো সবই হইয়া বহিয়া ঢুকিয়া গিয়াছে। আর বেশী করিয়া কোথা হইতে কি হইবে?

শুভেন্দু কিন্তু আজ সে ভাব কিছুই দেখাইল না। সে বরং ছুটিয়া আদিয়া সুশীলের পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার পা দু'খানাকে দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আত্মকরণের বলিয়া উঠিল, “সুশীল! সুশীল! আমার বাঁচাও! বাঁচাও ভাই আমাকে!”

শুভেন্দুর এই ব্যবহারে সুশীলের বিশ্বর তখন সীমাক্রম করিল। ইহাকে সে তাহার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া গাণি দিতে দিতে প্রহার করিতে দেখিলেও ইহার অর্ধেকটুকুও আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু এই যে তাহার পায়ের ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতে দেখিল। শুনিয়া, ইহাতে সে যেন একেবারে বিশ্বর-সাগরের তলদেশে তলাইয়া গেল, বহুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন ভাষাই যেন সরিল না, পরে বাক্যক্ষুণ্ণ হইলে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টার সহিত আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “অমন করছো কেন শুভেন্দু? কি হয়েছে?”

শুভেন্দু ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, “পুলিস এসে আমার ধরেছে, চার্জ শুকতর, জাল সহিতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করা—এখনই আমার নিয়ে যাবে, তুমি আমার বাঁচাও ভাই, এ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।” শুভেন্দু গভীর ক্রন্দনে ফুলিতে ও ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল তখনই অতীতের সব কথা ভুলিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া শুভেন্দুর গায়ে হাত দিয়া সম্মুখে সর্বদে তাহাকে সাহায্য দান পূর্বক কহিতে লাগিল, “তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন শুভেন্দু? জাল তো আর তুমি নি, সে অন্যায়সে প্রমাণ হয়ে যেতে পারবে। বড় বড় উকীলব্যারিষ্টারের তো আর অভাব হবে না তোমার পক্ষে—”

সহসা ভূতাহতবৎ সুশীল শুভেন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি পিছাইয়া গেল। কি ভীষণ ও অকথ্য লজ্জা-জ্বালাপূর্ণ ইজিত সেই মুহূর্তেই শুভেন্দুর দৃষ্টিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিল। সুশীলের চারিদিকের বিশ্বসংসার বিরাট লজ্জায় যেন কালো হইয়া মিলাইয়া গেল।

শুভেন্দু আবার উর্ধ্বরে কাদিয়া উঠিয়া সুশীলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। “আমি সাধ ক’রে কিছু করি নি সুশীল! তোমার বোনকে বিয়ে ক’রেই

আমি মারা গেলুম। সেই এ বাড়ী থেকে আমার জোর ক’রে বার ক’রে নিয়ে গেল, তার এখানে থাকতে লজ্জা করে বলে। মোটে আড়াই শো খানি টাকা তোমার বাবা আমাদের দেন, মায় তাতেই বাড়ীভাড়া পর্যন্ত সবই তো চালাতে হয়, এতে কি কুলোয় সুশীল? তুমিই বল না? এ দিকে রোজগার করি না ব’লে বিনতা চব্বিশ ঘণ্টাই আমার খোঁটা দিচ্ছে! তাই তো ব্যবসা করবো ব’লেই না আমার ঐ ২৫০০০ হাজার টাকাটা আপাততঃ নিতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম, লাভ হ’লে ওটা আবার ফিরিয়ে দেব। কিন্তু সংসার-খরচেই যে সব ফুরিয়ে গেল! বিনতাকে খুসী করবো ভেবে তাকে বলেছিলুম যে, ঐ টাকা আমি ব্যবসা ক’রে পাচ্ছি। এমন সময় এই ব্যাপার! এখন কি হবে ভাই? আমি মরতে তোমাদের বাড়ী এসেই জন্মের মত গেলুম! এর অপেক্ষা গরীব হয়ে থাকাও আমার ভাল ছিল লক্ষণে!”

শুভেন্দু হাউ-মাউ করিয়া কাদিয়া উঠিয়া বিনতার উদ্দেশ্যে একটা অকথ্য লঘুভাষা প্রয়োগ করিল। তাহা শুনিয়া সুশীলের সর্বশরীর গভীর ঘৃণা ও বিরক্তিতে যেন বিন্ বিন্ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ইহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেও যেন তাহার অন্তরাত্মা সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। আর তাহারই ভগ্নীপতি!—বোন তাহার মরিল না কেন এর চেয়ে!

সুশীলকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া শুভেন্দু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর ক্রোধ প্রকাশ করিবার ভরসা তাহার মনে নাই। তাই কোনমতে নিজেকে যথাসাধ্য শাস্ত করিয়া লইয়া সে শ্বেষগভীররূপে অনড় অস্পন্দ সুশীলের বুকের উপর সজোরে খড়গাঘাত করিল।

“আমার মরণে তোমাদের আপত্তি নেই, তা আমি খুবই জানি, বরং তা হ’লে নিশ্চিন্ত হয়ে বোনের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিতে পারবে। এ’ও হয় তো তোমরা মনে ক’রে খুসী হচ্ছ, বুঝলুম—তা’ও হ’তে পারে, কিন্তু তোমার অভিযানী বোন কি এ অপমানের পর আর বেঁচে থাকবে ভেবেছ? গর্ভে তার এখন সাত মাসের সন্তান, এ অবস্থায় যদি সে আত্মহত্যা ক’রেই মরে—”

সুশীলের অবিচল দেহ সম্মুখে কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল, অতিকষ্টে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি এতে তোমার কি সাহায্য করিতে পারি? আমার বলো।—”



শুভেন্দু বিজয়ী বীরের মত সমস্ত বারেক স্ত্রীলোক শব-শব্দ মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া বীর-গভীরস্বরে উত্তর দিল, “আমার দোষটা তুমি নিজের ব’লে স্বীকার ক’রে নাও। তোমার বাবা কিছু তো আর তোমার পুলিশে যেতে দেবেন না। তা’ তাঁরই তো টাকা— তিনি মোকদ্দমা তুলে নিলে আর কে চালাবে? এইটুকু উপকার কর ভাই, তোমার পায়ের আঁঁচি চিরদিনের মত গোলায় হয়ে থাকবো ব’লে দিলুম, এ তুমি বরাবর দেখে নিও। আর তোমার বোনের প্রাণটা হয় তো এ’তে রক্ষা পাবে। না হ’লে আমার দোষী জানলে সে নিশ্চয় মরবে কেনো। তাকে কি তুমি চেনো না? অস্ত্রায়ে তার কি বিরাগ!”

স্ত্রীলোক সেই রক্তশূন্য মুখে তীব্র বেদনার সহিত অকথ্যনীর ঘুণার রাশি অসীম হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠে তাহার অতি সহজ শাস্তভাবেই উত্তর বাহির হইল, “আচ্ছা, তাই হবে!”

\* \* \* \* \*

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমলবণে আসিয়া সেলাম দিয়া যখন ভুবনবাবুকে চেক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চেক এবং চেকের উপকার নামসই তাঁহার কি না?”

তখন বিশ্বম্ভূত ভুবন বাবু এ প্রশ্নের কিছুই অর্থ-বোধ না করিতে পারিয়া নিঃসংশয়েই উত্তর দিয়াছিলেন যে, চেক ঠিক তাঁহারই বটে; তবে নাম সইরে কিছু গলদ আছে, উহা নিশ্চিতই তাঁহার হাতের সহি নয়। তাহার পর চেক-বহি বাহির করিয়া দুই জনে মিলিয়া তাহা মিলান করা হয় এবং অকাটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কেহ তাঁহারই চেক ছিঁড়িয়া লইয়া জাল-সইয়ে টাকা বাহির করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মনেও হঠাৎ এই সন্দেহ হওয়াতেই তাহার পুলিশে খবরটা দিয়াছিল। ভুবনবাবু কিন্তু তখন স্বপ্নেও জানিতেন না যে, সেই অনুসন্ধানফলে তাঁহারই এত বড় সর্ব-নাশের ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে!

\* \* \* \* \*

স্ত্রীলোক আসিয়া যখন পুলিশ-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকল্পিত স্থির স্বরে বলিল, “শুভেন্দু নয়, আমিই ■■■ জান করেছি, আমাকেই আপনারা চালান দিতে পারেন।”

তখন সকলেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাহেব বিস্মিত মুহুরে

আশ্চর্যভাবেই কহিলেন, “শুভেন্দু বাবু আমাদের এই কথাই বলিয়াছিলেন বটে, যে, খুব ■■■ এ সই স্ত্রীলোকের। কিন্তু আপনি শিক্ষিত লোক, সে অস্ত্র আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করি নাই।”

স্ত্রীলোক জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, “যেটা পৃথিবীতে সব চেয়ে অবিশ্বাস্য থাকে, কোন সময় সেইটাই হয় তো আবার সব চেয়ে বিশ্বাসের হয়ে দাঁড়ায়—কেনন, এখন তো বিশ্বাস করলেন? আচ্ছা, এখন চলুন তো, কোথায় যেতে হবে।”

পুলিসের কাছে যে ব্যক্তি মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার কাছে দোষ-নির্দোষ বড় সহজে ধরা পড়ে। কণকাল স্থিরনেত্রে স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রধান পুলিস সাহেব বীরকণ্ঠে কহিলেন, “আপনি হয় তো জানেন না, ■■■ চার্কো নিজেকে জড়িত কচ্ছেন, তার মণ্ড কত বেশী!”

স্ত্রীলোক পুনশ্চ সেইরূপ বৃকফাটা উচ্চ হাসি হাসিল, —হাসিয়া কহিল, “জানি বৈ কি! হয় তো যাবজ্জীবনও হ’তে পারে, কেনন, না?—চলুন, চলুন।”

ভুবনবাবু দুই হাতে মুখ লুকাইয়া পাথরের মত স্থির বসিয়া আছেন, ■■■ দ্বারপথে সবই তাঁহার কানে আসিতেছিল। সাহেব ভিতরে আসিয়া পূর্ণ সহানু-ভূতির সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, “আর একবার সেইটা ভাল ক’রে দেখবেন কি?”

ভুবনবাবু তাঁহার মুখের ঢাকা না খুলিয়াই জবাব দিলেন, “না।”

“এ’র জারিন কি আপনি হ’তে চান?”

ভুবন বাবু তদবস্থাতেই উত্তর করিলেন, “না।”

স্ত্রীলোক ■■■ স্থির দাঁড়াইয়া ইহাও শুনিла এবং ইহার পরই বর্জিতোৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলিয়া সেই সকলেই অগ্রবর্তী হইল।

### সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জগতের কৰ্ম্মপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া মানুষ তাহার শরীর মনের কোন অবস্থাতেই কৰ্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না। বত বড় অনিচ্ছা ও অনাগ্রহই তাহার মধ্যে থাকুক, কাজ তাহাকে করিতেই হইবে, তা বাহিরটা তাহার যদি বা নিশ্চেষ্ট থাকে, মানস-জগৎ একটু কণ্ঠেবৎ ■■■ তো সৃষ্টিহীন থাকিবে না।

নিজের বেদনা-বিধুর চিত্তকে কোন উপায়েই যখন আর সান্ত্বনা দিতে পারা গেল না, তখন নিজের সঙ্গে একান্তই বিরক্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুলেখা মাকে আসিয়া বলিল, “অনেক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তন দেওয়া হয় নি, পাঁচ জনে শুন্তে চায়, দিলে হয় না?”

মেয়ের মুখে বহুকাল পরে পূর্বের মতই একটুখানি আবদারের কথা শুনিয়া সত্যবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “কীর্তন ও পূজা আচার কালই আনি বন্দোবস্ত করিয়ে দেব।”

কীর্তনের পালা নির্বাচন লইয়া অনেকখানি গোল বাধিল। মেয়ের ইচ্ছা—মাধুর, কিন্তু ঐ পাণ্ডার না কি বড়ই কাদিতে হয়, তাই সত্যবতী কোনমতেই উহাতে রাজী হইলেন না। তখন মানই স্থির হইল।

যথাকালে প্রস্তুত অঙ্গনে আসর সাজাইয়া কীর্তন-গান আরম্ভ হইল। পাড়া প্রতিবাসী নারী-পুরুষ দলে দলে আসিয়া আসর ভর্তি করিয়া বসিল। তাহাদের সঙ্গে ছোট-বড়, মেজ-সেজ বহু আকারের বহু বয়সের ছেলে-মেয়ে আসাতে ক্রন্দনে, চীৎকারে, কলহে দেখিতে দেখিতে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। কাহার কোণের তিন মাসের থোকার খাড়ের উপর দিয়া কাহারও সজের এক বৎসর বয়সের মেয়ের ছুতা-পরা পা চলিয়া গেল, ফলে আঘাত পাইয়া কচিটা ও মার খাইয়া এক বৎসরেরটি চোঁচাইতে লাগিয়া গেল। কোথাও বসিবার স্থান হইয়া পরস্পরের বাগ-বুদ্ধ ও ঠেলাঠেলি চলিতেছিল। এক জন বলিলেন, “এ জায়গা আমার, তুমি এসে দখল করলে কেন গা?” অপরা কহিলেন, “কেন, জায়গা কি তুমি ইজারা নিয়েছ না কি যে, তোমারই হরে গেছে?”

ইহার পর এ বিবাদ চরমে গিয়া পৌছিল।

সুলেখা এই সকল বিবাদ-বিসংবাদ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার চেষ্টার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, স্থির হইয়া বসিয়া গান শুনা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াই উঠিতেছিল না, তথাপি সে জন্ত সে বিশেষ দুঃখিতও হয় নাই। যেমন করিয়াই হউক, তাহার মনটাকে সে একটুখানি ব্যাপৃত রাখিতে চায় বৈ তো নয়। তা সেটা যে দিক দিয়াই ঘটে যটুক না কেন?

সে দিন জ্যোৎস্না-রাত্রি, আকাশে ভূই এক খণ্ড

৫ম (খ) ২০

পাতলা মেঘ মন্থরগতি করিশিখর মতই স্বচ্ছন্দ্য-বিহারে ইচ্ছামুখে ■■■ ছলাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ফিরিলেও বিশালকায় গজমুখ দেখা দেয় নাই। তাঁদের আে। সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘপথে নানারূপে নানা বিচিত্র আকারে ধরণীর বুকের উপর আলিঙ্গন কাটিয়া রাখিয়াছিল। কীর্তন-সভার চন্দ্রাতপতল স্ফটিক-খাড়ের উজ্জল বর্ষি দ্বারা সমুজ্জল আলোকিত। কীর্তনীগণের কণ্ঠমালা হইতে বেল-মুঁইয়ের ঘন সৌরভ সঘনে উথিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সুকৌশল কখনভঙ্গী ও মিষ্ট ■■■ এবং বিজ্ঞাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির অপূর্ণ রস-রচনা শ্রোতৃবর্গের অনেকেই মনে ভাবাবেশ আনয়ন করিয়া দিয়াছিল। আবার কেহ বেহ তখনও ছুতার-লতার কলহের কাকলী তুলিয়া নিজের সঙ্গে অপরেরও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সঙ্গীত-সুধাপানের পরিবর্তে কৰ্কশ চীৎকারে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সুগৃহিণী এতগুলি শ্রোতীসমাগমে পুলকিত হইয়া এই সঙ্গে আলু-পটলের দরটা জানিয়া রাখিতেছিলেন, কেহ বা রান্নার ফিরিস্তি দাখিল করিয়া নিজের অপরিমিত কার্যশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া গিয়াছিলেন।

সুলেখা যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের ভিড়ে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই, সে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তখন শ্রীমাদিকা গভীর মানের দারে শ্রাম হারাইয়া ■■■ বেদনার গুহরিয়া মরিতেছেন—

“ধনীকে জিউ ধসই, কীণ ধরণীপর গিরত,  
প্রাণ-বঁধুয়ারে মনে পড়ে টুটল মানিনীকো মানে—  
আর মান নাই,—

এখন মান গিয়ে বিরহ এল, ধনীর কৃষ্ণবদন মনে  
হ’ল।”

সুলেখার বড় ভাল লাগিল। বাস্তবিকই তাই নয় কি? অতিমান মতই মনকে অধিকার করিয়া রাখুক না কেন, গভীর শ্রেম তাহাকে যে নিম্নতই দিকার দিতে ছাড়িতেছে না, সে নিজে আহত হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রতিশোধ-স্পৃহায় উহাকেও অন-বরত আঘাত দিয়া পাগল করিতে বসিয়াছে?

গায়কেরা আবার গাহিতে লাগিল,—

“যেমন কাজ করেছিলেন, তাহার প্রতিফল পেলাম,



এখন জ'লে-জ'লে জ'লে মলাম,—

এখন বিরহদাব-দহনে—

জ'লে জ'লে জ'লে মলাম।”—

সুখে খা কুন্ধখাসে শুনিতে লাগিল।

এক জনের কচিছেলে চীৎকার শব্দে কাদিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ছেলে লইয়া ছেলের মা বাহির হইয়া আসিয়া স্বেচ্ছাক্রমে চিনিতে পারিয়া অমুখোদয়ের স্বরে কহিলেন, “ছেলের বড্ড জ্বর এসেছে মা, কোনমতে আর কোণে থাকতে চায় না, যদি সঙ্গে একটি লোক দাঁও মা তো ছেলে নিয়ে বাড়ী যাই। এমন পোড়া বরাত মা, এমন দিনের জন্তে জ্বর যেন বসে ছিঃ!”

সুলেখার আর কীর্তন শুনা হইল না, সে একটা দাসীর সন্ধানে চলিল।

“দিদি! আপনাকে বাবু একবার শীগ্গির করে ডাকছেন গো।”

সুলেখা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “তুই একে একটু আগ-বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর তো বাপু! আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।”

দাসীর নির্দেশমত সুলেখা তাহার পিতার শয়ন-কক্ষে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে শুধু তাহার বাপই নয়, মাও রহিয়াছেন। একপ অঙ্গময়ের আহ্বানে, তাহার উপর মাঝে কীর্তন শুনা বন্ধ করিয়া এমন শুক ও নতমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। বাপের মুখের শুক গন্তীর ভাব দেখিয়া সে মনে মনে ভয়ও পাইয়াছিল।

“বাবা, আমাকে ডেকেছ?”—সুলেখা ধামিয়া ধামিয়া ভয়ে ভয়ে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল। পিতার একপ মেঘ-মণ্ডিত পর্কতের মত শুক গন্তীর মুক্তি সে অনেক দিন দেখে নাই। হয় তো বা একপ জলদ-জাল-মণ্ডিত ভীষণান্ত মুক্তি কখনই দেখে নাই। কি একটা অজ্ঞাত মহাভয়ে তাহার বালিকা-চিত্ত শিহ-রিয়া উঠিল। না জানি, আবার কি অমঙ্গলের এ সূচনা।

বিপ্রদাস কথা কহিলেন, তাহার কণ্ঠশব্দে সুলেখা স্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিল। যেন ২৪ঘণ্টা ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন শুক আকাশে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দে মেঘ-গর্জন হইল।

“সুখে! ভুবন বাবুর পুত্র জাল সহী দ্বারা ব্যাধে—

যে, তাকে বিয়ে করনি, আজ থেকে আমি তোমার জন্ত পাত্ৰাত্ম্যের চেষ্টা করবো, তার সমস্ত স্মৃতি আর থেকে মন হ'তে নিঃশেষে মুছে ফেলে দাও; মঙ্গল-পাপীর স্মৃতিপুজার পুজার অবমাননা কোরো না।”

স্তম্ভিত সুলেখার চক্ষুতে সহসা সমস্ত বিশ্ব যেন আবর্তিত হইয়া উঠিল। বিপুল জগৎ যেন ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া সজোরে এদিক ওদিক হুলিতে লাগিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সমুদয় যেন তাহার স্তম্ভিত নেত্র-সমক্ষে ঘন-ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। সেই স্তম্ভিত নিম্নমুখাবে রূপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই গর্জিত মেঘের মধ্য হইতে নিম্নরুক্ত অশনি ভাঙ্গিয়া যেন তাহারই মাথার উপর পড়িয়াছিল।

ঘব গন্তীর নিম্নরুক্ত, গৃহবাসী তিন জনেরই অন্তরাজ্যে তখন প্রবল বিপ্লবস্রোত বহিয়া বাইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহারা ঐ আকস্মিক ভয়ভীত মুক জড়-প্রকৃতির মতই নির্বাক হইয়া পড়িয়াছিল। এই তিনটি প্রাণীর মনের কথা পরস্পরে বিনিময় করিবার মত ভাষা আজ তাহারা যেন একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়া-ছিল। বলিবার রহিয়াছে বলিয়াই যেন বলিবার ভাষা তাহাদের নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে।

বাহিরের এই ছিন্নভিন্ন মেঘগুলা এতক্ষণে একসঙ্গে জমা হইয়াছিল, এতক্ষণে যেন কোন অদৃশ্য হস্তধৃত বিদ্রোহ বরষার মুহূর্ত্তঃ প্রহার-ব্যথার জর্জরিত হইয়া উঠিয়া তাহারা একান্ত অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঝড়ের বেগে পৃথিবীর উপর আছাড়ি-পাছাড়ি লাগাইয়া দিল। চারিদিক দিয়া একটা উদ্ভার শোকের আর্তনাদ যেন কণে কণেই গুম-রিয়া ফুটিয়া উঠিল। অন্তর্বাহিরের সেই অকুরন্ত ভয়াবহ শোক ও হতাশা লইয়া এই তিনটি প্রাণী নির্বাক ও নিম্নরুক্ত হইয়া কাছাকাছি বসিয়া নীরবে অসহ্য ব্যথা উপভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু একটি কথার আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরের কাছে কোনরূপ শান্তি বা সান্তনা লাভ করিবার শক্তি বা সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত যেন কহারই রহিল না।

\* \* \*

পরদিন অনেকখানি সুস্থ ও সংযত হইয়া সুলেখার সর্বপ্রথম মনে হইল, এ সংবাদ হয় তো বা মিথ্যা।

শুশীল জাল সহী দিয়া টাকা ভাঙ্গিয়াছে, এ কথাই কোনমতেই যেন তাহার চিত্ত সাধ দিতে পারিতেছিল না। শুশীল এত বড় পাপিষ্ঠ! এও কি সম্ভব? বতই

ঘণার সহিত সেই আহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে যায়, ততই যেন তাহার সঙ্গে সেই শেষ বিদায়-দৃশ্যটা চোখের উপর তার সম্মুখে ছবির মতই জ্বল-জ্বল করিয়া জাগিয়া উঠে, দুই কান ভরিয়া যেন সঘন বাজিয়া উঠে,—“সুলেখা! অবিচারে দণ্ড দিয়ে চলে যোয়ো না।” কি সে আত্মশ্রবণ! ওঃ! সুলেখার কান যেন তাহার কাঁজে পুড়িয়া গেল!

কতবারই সে নিজের মধ্যে জোর করিয়া বল আনিতে চাহিল, বিচার-বিতর্ক আত্মপ্রবোধার্থ অনেকই করিল, কিন্তু কিছুতেই আজ আর সে নিজের মনকে বুঝাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অত্যাচার, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অসম্ভব প্রকাণ্ড ভুল! আর সেই দণ্ডিতের জন্ত তৈরি করা দণ্ডটা যেন তাহার নিজেরই বুকের উপর পড়িয়া তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ অস্থির করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

অবশেষে কোনমতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে না পারিয়া, সুলেখা এক সময় সকল বিধাকে পরাস্ত করিয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস তখন অল্পমনস্ক-ভাবে ফুরসীর নলে টান দিতে দিতে কি একটা কথা ভাবিতেছিলেন। হয় তো তারই কথা।—অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে কাছে সরিয়া আসিয়া মুহূর্তে সুলেখা ডাকিল, “বাবা!”

বিপ্রদাস মুখ তুলিলেন, মুখখানা আজ বড়ই স্নান দেখাইল। তা’ দেখিয়া সুলেখা কিছুই আর বলিতে পারিল না।

সে যাহা বলিতে চায়, বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিপ্রদাস নিজেই কথা কহিলেন,—“কি রে লেখা?”

সুলেখা একবার মুখ তুলিয়া আবার তাহা নত করিল, সঙ্কোচ ও লজ্জায় তাহার কণ্ঠ হইতে ভাষা বাহির হইতেছিল না, অথচ এসব বিষয়ে মায়ের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নহে জানিয়া এই একমাত্র উপায়কেই তাহার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

“কি বলবে বল মা! এসো, আমার কাছে এসে বসো।”

বাপের স্নেহ-সন্তোষে ভরসা পাইয়া মেয়ে আসিয়া হেঁটমুখে পায়ের কাছে বসিতেই পিতা তাহার হাত ধরিয়া কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইলেন; স্নেহভরে কহিলেন, “কোথাও যাবি?”

এই কথার স্রবোণ পাইয়া সুলেখা তখন ঘাড় না তুলিয়াই অধোদৃষ্টিতে সম্পষ্টভাষায় একনিষ্ঠাসে কহিয়া ফেলিল, “আমাদের একবার কলকাতায় গেলে হয় না বাবা?”

“কলকাতায়? কোথায়? কেন?” বিপ্রদাসের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

সুলেখা তাহা বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই তাহার মনের সঙ্কোচ আরও অনেকটা বর্ধিত হইল, তথাপি সে কোনমতে এক নিষ্ঠাসে বলিয়া ফেলিল, “তাদের এমন বিপদের সময় একবারটি যাওয়া কি উচিত নয়?”

বিপ্রদাস মেয়ের কথার অর্থ বুঝিয়া হৃৎকগলীর স্বরে উত্তর করিলেন, “তাদের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি লেখা?”

সুলেখার মুখ আরও খানিকটা নারিয়া আসিলেও তাহার সেই নত মুখের নতদৃষ্টি সহসা উজ্জল কর্তন হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, যেন অনেকখানিই সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া একটুখানি স্পষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, “কিন্তু এ তো মিথ্যাও হ’তে পারে বাবা?”

“কি মিথ্যা হ’তে পারে, মা?”

“এই জাল করার কথা?”

“কেমন ক’রে তা হবে মা? নে যে নিজমুখেই দোষ স্বীকার করেছে। খবরের কাগজে এসব কথা যে বেরিয়েছে, তুমি কি দেখনি? দেখতে চাও?”

সুলেখা দুই হাতে তাহার সেই নত মুখ ঢাকা দিল, তাহার সেই হাত দুখানা তখন ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিল—সে অসহায়ভাবে শুধু সবেগে মাথা নাড়িল। ওখনি করিয়াই শুধু তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, না, না, সে দেখিতে চাহে না।—

হুচিহ্নাগ্রস্ত হৃৎকের দিন মানুষের বড় সহজে কাটিতে চাহে না, কিন্তু সুলেখার সে দিন-রাত্রিও অবশেষে কাটিয়া গেল। কাটিল বটে, কিন্তু কি করিয়াই যে কাটিল, সে শুধু সে-ই জানে। এত দিন অত্যাচারিত নীলিমার প্রতি করুণায় সে যে নিজের কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও অবসর পায় নাই, বরং তাহার স্মৃতি দেখিলেই সমস্ত তাহাকে পরিহারচেষ্টা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দিন হইতে জানা গিয়াছে যে, নীলিমার কতি আজ প্রতীকারের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে এত সমস্ত-কর্ত্ত আত্মচিন্তাটাই যেন তাহার কাছে বড়



বেশী প্রবলমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, নিজেরও যে তাহার কত বড় কৃতি হইয়া গিয়াছে, সেই কথাটা ■ দিনের পরে এখনই তাহার কাছে ভাল করিয়া ধরা পড়িল। আর তাহার অসহ্য বিরোগ-দুঃখে প্রাণ তাহার যেন ফাটিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। তাহার উপর আবার এই সংবাদটা যেন তাহার সহ্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। ■ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ে মত অতি কঠোরতায় তাহার মনে প্রাণে আর সহিবার শক্তি ছিল না। সূর্য্যোদয়ের প্রতি এক দিকে যত বড় প্রচণ্ড বিরাগ, আর এক দিকে কি না তেমনই প্রবল ককণা! ইহার মাঝে পড়িয়া সে যেন পাগল হইয়া যাইতে বসিল। সেই বিপন্ন, অপমানিত, ঘৃণিত লোকটাকেই একবারটি চোখের দেখা দেখিবার জন্য তাহার সারা চিন্তা কি বুদ্ধিত ভাবে তীব্র হাহাকারে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে! সে আর্তনাদকে—সে আকাজ্জকে, সে যে কোনমতেই দমন করিতে পারিতেছে না। সে যেন যুগের দিয়া তাহাকে মারিতেছে, অথচ এ কি ভীষণ লজ্জা! ইহা যে লুকাইবার ও স্থান কোথাও নাই।

কিন্তু এক দিন ইহারও কতকটা সমাধান ঘটয়া গেল। হঠাৎ সে দিন ভোরে সে এই চিঠিখানা পাইল। চিঠিখানা অপরিচিত হাতের অক্ষরে লেখা, কিন্তু লেখিকা তাহার আদৌ অপরিচিতা নহে। সে সাগ্রহে পড়িল :—

“স্নেহের ভগিনী সুলেখা!

হতভাগিনী নীলমাকে তুমি তো জান? আমি সেই নীলমা। আমার জন্য তুমি যা করিতে চাহিয়াছ, জগতে দ্বিতীয় কেহ তাহা কখন করে নাই, তাই সে তোমার সেই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার একমাত্র তোমারই নিকট চিরবিক্রীত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

“কিন্তু আমার অবস্থা আমি নিজের বুদ্ধির দোষে অথবা শিক্ষার দোষে কিম্বা ভাগ্যের দোষে—যারই দোষে হোক, এমনই অপ্রতিবিধের ■ জটিলতার করিয়া তুলিয়াছি যে, সে জটিলতার পাক ছাড়াইয়া ইহাকে বাহিরে আনা আজ কাহারও পক্ষে আর সম্ভব নহে। যাক সে কথা, স্বকর্মের ফলভোগ—স্বাহার কর্ম, তাহারই করা অনিবার্য, সে জন্য আমার কাহারও সম্বন্ধে আজ আর কোনই অমুখোপযোগ করিবার নাই। বড় বেশী চড়াবাস দিয়াই এই জ্ঞানটুকু আমি লাভ

করিয়াছি যে, মানুষ স্বকর্মফলেই সুখদুঃখ ভোগ করে এবং অদৃষ্ট স্বাহার জন্মফলেই বাস হইয়াছে, তাহার পরিণাম কখনই ■ হইতে পারে না। এখন আমার বলিবার কথা এই যে, আমি যে দুঃখ পাইতেছি, তাহা না হয় আমারই থাক। আমার সঙ্গে নিরপরাধে তোমরা শুদ্ধ কেনই যে এত বড় দুঃখ ভোগ করিতেছ, ইহা কার ভাগ্যালিপি, তাহা জানি না। আমি যেন তোমাদের জীবনের দুঃখগ্রহ, তাই আমার সংস্পর্শে তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের অনেকগুলো দিন ঘোর দুর্কিপাকের মধ্যে জড়াইয়া বিপ্লবময় হইয়া গেল! কিন্তু বোন! আমি যদি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম, তবে হয় তো এত কষ্ট তোমাদের পাইতে দিতাম না। আমার পোড়া অদৃষ্টের লেখা লইয়া আনিই তাহার যা কিছু বিড়ম্বনা ভোগ করিব, আমার জন্য জগতের আর কোথাও অপর আর কাহাকেও তাহার অংশভাগী করিতে আমার কোন অধিকারও নাই এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি সরিয়া গেলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

“সুশীল বাবুকে আমি আমার জীবনে কদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি না কি তাঁহার চিরপরিচিতা? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে যে, তাঁহার দ্বারা এমন ঘৃণিত কাজও ঘটতে পারে? তুমি না হয় ছেলেমানুষ, মানুষ চিনিবার শক্তি তোমাতে আজও না হয় দৃঢ় হয় নাই, কিন্তু তোমার অভিভাবকরাই বা কেমন? তাঁর নিজের বাপ? তিনিও এই হেয় চক্রান্তে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছেন না কি? হায় হায়! সেই বাপের ও তোমার মনোভঙ্গের ভয়েই যে তিনি আমার বাপের কবলে পড়িয়া সব চেয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন! পিতৃ-বৎসলতার যে তাঁর সীমা দেখি নাই! আমার মত দুর্ভাগ্য জীব তাঁর এ ভক্তি ভালবাসার কোন অর্থবোধ করিতেই যে পারে নাই! বিশ্বাসে, ঈর্ষায়, অভিমানে স্তব্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, না জানি সে কেমনই বাপ, মার 'পরে সন্তানের এত বড় নির্ভর শ্রদ্ধা! কিন্তু কমা করিও, এই কি তার পরিচয়? নিজের সম্মানকে না চিনিয়া তাহার 'পরে এত বড় কঠিন আঘাত তিনি দিতেও ত পারিলেন? ধন্ত তিনি!—তবে কি তোমাদের বিশ্বাসে দেবতাও পিশাচে পরিণত হইতে পারেন? অথবা অত বড়কে ধারণা করা বুদ্ধি স্বাভাবিক নয়। আমিও তো এ বয়সে অনেক দেখিলাম, কিন্তু এমন

পবিত্র হৃদয় কর্তব্যনিষ্ঠ মেহময় দেবপ্রতিম দৃঢ় চরিত্র দেখিলাম কৈ ?

“আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, এ রটনা—আমার বাপের এই ঘৃণ্য রটনা—সর্বৈব মিথ্যা ? বিনা খরচায় কতাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তিনিই তাঁহাকে এই কলঙ্করটনার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া বিবাহে বাধ্য করেন, অসম্মত হইলে আদালতে মিথ্যা নালিশ করার ভয়ও দেখান। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই আমি তাঁহাকে গোপনে পলাইবার সহায়তা করি। কেন করি ? তাঁকে তোমা-ময় জানিয়া। যদি তিনি আমারই কৃতিকারক হইতেন, আমিই কি নিজের সেই তত বড় সর্বনাশের সমর্থন করিতে পারিতাম ? নারী তুমি, তুমিই ইহার বিচার করিও, আর করিতে দিও, তোমার যদি মা থাকেন, তবে তাঁহাকেই। সুশীল বাবুর মা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ছেলেকে এত বড় অবিচার করিতে দিতে পারিতেন না।

“আর কি বলিব ? বড় নির্কোষের কাজই তোমরা করিয়াছ ! সোনার খাদ থাকিলে তাহাকে পোড়াইতে হয়, তেঁমাদের খাঁটি সোনা তোমরা কিসের হাংখে পোড়াইলে জানি না। বেশী পাইলে হয় তো সে পাওয়া বুঝিতে পারা যায় না। যাক, যার যা ভাগ্যে ছিল, তা ঘটয়াছে, এখন তোমার হারানিধি তুমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে ফিরাইয়া লও। আমার আর তাহাতে লোভ নাই। আমার করতলায় রত্ন আমি যে বহুদিন পূর্বেই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সে শুধু তোমারই জন্য। তোমাহীন জীবনে তাঁহার সুখ হইবে না বুঝিয়াই সে কাজ করিয়াছি, নতুবা তিথারী কি কখন অমূল্য রত্ন ত্যাগ করে ?

“আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ লইও। আমার স্নেহ-প্রতিমা ছোট বোনটি ! ঈশ্বর তোমার সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া লউন। ইতি

তোমার অভাগিনী দিদি  
নীলিমা।”

পত্রপাঠশেষে এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধীর হইয়া উঠিয়া স্নেহা প্রাণপণে ছুটিয়া সুপ্তিময় মা-বাপের শয়ন-গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। জোরে ধাক্কা দিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, “মা ! মা ! বাবা ! বাবা !”

একসঙ্গে দুজনেরই ঘুম ভাঙিল। সত্যবতী ধড়মড়

করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কি লেখা ? কি হয়েছে, মা ? অমন করচো কেন ? কি রে ?”

“দেখ কি চিঠি পেলুম,—মা ! মা আমি আজই একনি আমার খন্তরের কাছে যাবো, বাবা, তুমি দুজনেই আমার সঙ্গে চল।”

নীরবে পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একসঙ্গেই দুজনে হর্ষবিষাদে মুখ তুলিলেন। পিতা কহিলেন, “এ তো বুঝলুম, তবে এর জন্তে আমার আপত্তিও তো খুব বেশী ছিল না ; কিন্তু এবারকার এটা যে এর চেয়েও ঢের বেশী শক্ত, জালিয়াতের হাতে তো আর মেয়ে দেওয়া যায় না।”

স্নেহা তাহার স্বভাবের বহির্ভূত একান্ত অসহিষ্ণু ও অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “মেয়ে দাও না দাও, সে সব পরের কথা ; এখন আজিই সেখানে গিয়ে কমা তো আমাকে চাইতেই হবে, আমি যে তার সকল দুর্দশার মূল ! এস মা, শীগ্গির ক’রে তৈরি হয়ে নাও। আমি বলছি, দেখ, এটাও একেবারে মিথ্যা কলঙ্ক, এ কখনই সত্য হ’তে পারে না। আমার উপর রাগ করেই হয় তো—মা, মা, তুমি কিছু বল না মা ! বাবা, তুমিও সবটা বুঝে দেখ।”

### অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত উত্তেজনার পরই একটা সুগভীর অবসাদ বড় অতর্কিতে আসিয়া দেখা যায়। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে সারাদিন অগ্নিতপ্ত খুলি-বালির রাশি উড়াইয়া ঝড়ের বাতাস তাহার বখাস্রাধ্য দাপাদাপি করিয়া নিজেও জলে, পরকেও জ্বালায় ; কিন্তু তাহার পর সন্ধ্যার স্নান শিথ বিয়গতীর মধ্যে সে একেবারে যখন শুক হইয়া থাকিয়া যায়, তখন খাস টানিবার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত যেন তাহার বাকি থাকে না। সুশীল এত দিন তাহার মনের কোঁকে এবং স্নেহের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য-সাধন করিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে কর্তব্য যেই তাহার সমাধা হইয়া গেল, অমনই তাহার বোধ হইল, যেন তাহার এ জীবনের কর্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার তাহার এই নষ্টশ্রী ও কর্মভ্রষ্ট জীবনটাকেও শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই চুকিয়া যাইবে। তাই যখন অকস্মাৎ সেই সুযোগই মিলিয়া গেল, হাজতে



বসিয়াও সে যেন এত দিনে অনেকখানি একটা পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিল। সংগ্রামবিধবস্ত ক্লান্ত মৈনিক যুদ্ধশেষে শান্তি উপভোগে যেমন নিজের অসহ্য ক্ষত-জ্বালাকেও বিস্মৃত হয়, তেমনই একটা সর্বনাশের শান্তি যেন সে নিজের সর্ব শরীর-মনের উপর বড় স্থির মতই এত সর্বনাশের মধ্যেও অনুভব করিল। সে তো খুঁজিতেছিল মরণকেই, তা তাহার অপেক্ষাও তাহার ভাগ্যে এ বড় বেশী পুরস্কার মিলিয়া গিয়াছে! হয় তো বা ইহা ভালই হইল। মরিলেই তো সব চুকিয়া যায়, জীবনের শাস্তিটা তো আর ভোগ করা হয় না। নাঃ, বিধাতা-পুরুষের হাতের লেখার মৌলিকতা আছে বলিতে হইবে।

লোহার শিক দিয়া আঁটা ছোট একটুখানি জানালার দিকে মুখ করিয়া সুশীল মাটির উপর স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, একবার নিজের দীর্ঘবাপী ভবিষ্যতের দিকে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিল; সে আজ গৃহহীন, মেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা-স্নানাহারা, হীনচরিত্র, অপরাধী। সুশীলের গুণপ্রাপ্ত একটা অতি তীব্র আলাময় যুদ্ধহস্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার শীর্ণমুখে কালিমালিপ্ত দুই চোখের তারা একটা অস্বাভাবিক ওজ্জ্বল্যে এক যুহুর্ভ দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। কঠোর বাজে আপনাকে আপনিই অভিনন্দিত করিয়া সে মনে মনে নিজেকেই নিজে বলিল, “জগতে বেশ পরিচয়টা রেখে যাচ্ছিস সুশীল! খুব একটা নাম পেলি। এমন ক’জনের কপালে জোটে।”

সুশীলের মনে পড়িল সুদূর অতীতের একটা সুবিস্মৃত ইতিহাস। সুলেখাদের চাকর গোপাল আশ্বিন দেওয়ার মিথ্যা অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, সে এক দিন ভয়ে-লজ্জায় যেন মরিতে বসিয়াছিল! তাহার মনের মধ্যে বিষয় যেন উথলিয়া উঠিল। সেই মানুষই কি সে?

বন্ধ দ্বার মুক্ত হইল। কারা-প্রহরীর যথারীতি নিত্য কার্য্যে আগমন মনে করিয়া সুশীল মুখ ফিরাইল না, নিজের সেই সহসাজির চিন্তাধারাকে সংযুক্ত করিয়া লইয়া পুনশ্চ আত্মচিন্তায় প্রত্যাবর্তন করিল; কিন্তু সে ধারা সে আর অব্যাহত রাখিতে পারিল না। সহসা এই অর্ধ-অন্ধকার কারাকক্ষে একটি দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার মতই এক রূপসী তরুণী ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

“এ কি, সুলেখা!”

স্বপ্নাভিভূতের ভ্রায় বিস্মিত মৃদুস্বরে কোনমতে কথা কয়টা বলিয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহার পা দুইটা খর খর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং শুধু পা-ও নয়, দেখিতে দেখিতে সেই কম্পনটা তাহার সমস্ত শরীরেই ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না, প্রাণপণ বলে তাহার পা দুখানা তখন সুলেখার দুহাত দিয়া বাঁধা এবং সেই পায়ের উপরেই তাহার মুখখানা সবলে লুকানো। সুশীলের সর্বশরীর সেই স্পর্শ শিথিল হইয়া আসিলেও সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিল যে, সেই মুখখানা হইতে উষ্ণ অশ্রুস্রোত করিয়া পড়িয়া তাহার সেই ধূলি-বলিন শুক কক্ষ পা-দুখানাকে ধৌত করিয়া দিতেছে। সুশীল কিয়ৎকণ কিসকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পর নিজের এই অবস্থায় যেন ফাঁপরে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া বলিল, “ওঠো সুলেখা!”

সুলেখা দ্বিগুণ বলে পা-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর নিজের মুখ বসিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, “আমায় কমা করতে পারবে না?”

সুশীল তখন একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, “তুমি আগে উঠে বসো সুলেখা।”

সুলেখা উঠিয়া বসিল, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যে শ্রাবণ-ধারা বহিতেছিল, তাহা সে রোধ করিল না, নত-মস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবার কিছুকণ শুক থাকিয়া সুশীল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, “তুমি এখানে কেন এলে সুলেখা?”

সুশীলের কণ্ঠে প্রচুর বিষয় ফুটিয়া উঠিল।

সুলেখা এবার আঁচল দিয়া বসিয়া নিজের চোখ দুইটা মুছিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে অশ্রু-স্তম্ভিত ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, “তোমার আমার যা বলবার আছে, সেই কথা কটা শুধু বলে যেতে এসেছি। তুমি দয়া ক’রে শুনবে কি?”

“তোমার বাবা যে তোমায় এখানে আসিতে দিলেন?”

সুশীলের কণ্ঠ তখনও তাহার সেই অকথ্য বিষয়ের ভার বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

“সহজে কি আর দিয়েছেন? দুদিন উপোস ক’রে প’ড়ে থেকে তবে পাঁচ মিনিটের জন্ত দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি”—সুলেখার কণ্ঠ সহসা অস্পষ্ট হইয়া থাকিয়া পড়িল।

“কেন এলে, সুলেখা?”

সুলেখা উত্তর দিল না, নীরবে তাহার গণ্ড বহিয়া জলধারা আসিয়া ঘরের মেঝের উপর বরিয়া পড়িতে লাগিল। সুলেখার বিস্ফারিত সান্ধ্য নেত্র সেই দৃশ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, সে-ও আর কোন কথা কহিল না।

ছোট জানালাটার বাহিরে তখন পবন একটা প্রকাণ্ড নিম-গাছকে অসংখ্যজাতীয় পাখীর দল বহুবিধ কলতানে শব্দমুখর করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার অপর শব্দসমূহকে এখানের দুঃখবেগ করিয়া তুলিলেও ঐ আনন্দ-কলরবটুকুকে ইহার মধ্যে চাপিয়া রাখা যায় না। গাছটির মাথার উপর দিয়া সেটুকু নীল আকাশ দেখা যায়, সেটুকু আজ গভীর নীলিমায় নিবিড় দেখাইতেছিল, ক্ষুদ্র এক খণ্ড পীতাম্বুদ্যলোক যুক্ত জানালার মধ্য দিয়া অনাবৃত ভূমিতে এ গৃহের আগত অতিথিকে বৃষ্টি স্বাগত জানাইবার ভাৱে আসনের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘর গভীর নিস্তব্ধ, সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা কাহারও সফল হইতেছিল না;—যদিও দুজনেই বুঝিতেছিল যে, বলিবার সময় প্রতি মুহূর্তেই নিঃশব্দভাবে গত হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দুই জনেই জানে যে, তাহাদের বলিবার শুনিবার দুই-ই এখনও যথেষ্ট বাকি রহিয়াছে, আর হয় তো এ জীবনে ■ সুযোগ কখনও দ্বিতীয়বারের জন্ত তাহার মধ্যে আসিবে না।

অবশেষে সেই অন্তর্গুঢ় অসহ্য নীরবতা সুলেখাই ভঙ্গ করিল।

“আমার এই বলবার আছে যে, তোমার আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, তুমি এর পর যেখানেই থাক বা যাও, শুধু জেনে রেখো যে, আমি তোমার প্রতীকার পথ চেয়ে বসে রইলাম। এক দিন আমাদের মিলন হবেই;—তা হোক সে এই জন্মে, হোক বা অন্যজন্মে। আমি তোমায় যে অত্যাশংস ক’রে অনর্থক দুঃখ দিয়েছি, সে দোষ তুমি আমার যদি ক্ষমা করতে পার, করো। যদি না পার, তাতেও আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই। এ জন্মটা না হয় তার প্রায়শ্চিত্তেই আমার কেটে যাবে। কিন্তু তোমায় আমি পাবোই পাবো। তোমায় হারালে আমার চলবে না।—যদি এ জন্মে আর দেখা না হয়, জেনো, মরবার সময় তোমায় পাবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও একান্ত কামনা নিয়েই আমি মরেছি। এর আর কোনমতে কখনই কোন পরিবর্তন

হবে না। আর আমার তোমায় কিছুই বলবার নেই।”

“সুলেখা! কেমন ক’রে জানল আমি—”

“নির্দোষী? সে আমি জেনেছি!—নীলিমার চিঠি পেয়ে জেনেছি—”

“কিন্তু এই জাল করা, টাকা ভাঙ্গা, এর তো তুমি কোন—”

“না, প্রমাণ পাই নি,—জানি না, হয় তো তা’ কোন দিনই পাবোও না, কিন্তু এ যে তুমি করো নি, এ আমি প্রথম দিন শুনেই বুঝেছিলুম। এ শুধু আমার উপর আর তোমার বাপের উপর অভিমানে তুমি অস্ত্রের অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়েছ, কেমন? নিশ্চয় তাই!—নয়? তা’ তুমি বলো আর নাই বলো,—এ আমি সমস্ত পৃথিবী এক দিকে হলেও কখন বিশ্বাস করবো না, কেউ তা আমার করাতে পারবে না। কিন্তু কেন তুমি আমার কাছে সে দিন সব কথা খুলে বলে না? কেন বিনা দোষে শুভেন্দুর দেওয়া দণ্ড মাথায় তুলে নিয়ে আমার ক্ষেপিয়ে তুলে?”

সুলেখার কণ্ঠ শেষের দিকে যতই লজ্জা, ততই বেদনার অশ্রুট ও করুণতার হইয়া আসিল। সে একখানা হাত সুলেখার পায়ে উপর রাখিয়া ব্যগ্র ছুটি চক্ষু তাহার মুখের উপর সূখীরে তুলিয়া ধরিল—“কেন আমার ভুল বুঝতে দিলে? কেন বুঝিয়ে দিলে না? ছি ছি, এত শাস্তিও কি মানুষকে দিতে আছে?”

সুলেখা ব্যস্তে সুলেখার হাতখানা নিজের পায়ে উপর হইতে খুলিয়া তাহা হাতের উপর লইল, একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার শুষ্ক অধরপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল—“বলোই কি তোমরা তখন বিশ্বাস করতে? সে যা’ হবার হয়েছে, সুলেখা! যদি আমি যাই, তুমি—”

যে কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, সহসা সে কথা সুলেখা সংবরণ করিয়া লইল। তাহার পিতাকে দেখিতে ইহাকে অনুরোধ করা হয় ত অসম্ভব এবং—এবং হ্যা—নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে নিশ্চয়োজনও!

“আমি তখন কি করবো, কৈ বললে না ত? না তোমায় বলতেই হবে। হ্যা, বলবে বল?”

ঘরের নিকট হইতে সুলেখাদের পুরাতন সরকার ও ষ্টি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “জমাদার সাহেব বলছেন, আর সময় নেই, চ’লে-আসুন দিদি, হয় তো ওরা রাগ করবে।”



জুলেখা চমকিয়া উঠিল দাঁড়াইল, “চললেন! আর আমার মনে কোন ছাপ নেই, তোমার স্মৃতি নিয়ে— যদি দরকার হয়—এ জন্মটা আমি খুব কাটিয়ে দিতে পারবো। আজ যে মানির মধ্যে তোমায় আমরা নামিয়ে দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্তও ত আমাদের একটু আধটু হওয়া চাই! হোক তাই।—কমার কথা তোমায় যে ব’লে ফেলেছিলুম—সে আমার ছেলে-মামুষী—কমা পেনে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কববে না। পার তো কমা আমার করো না।”

“দিদিমণি! জমানার বলছেন—”

“এই যে যাচ্ছি—”

জুলেখা নত হইয়া সুশীলের পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল —“আবার দেখা হবে—হয় এখানে, না হয়—না হয়—ঐ-ঐখানে—”

বন বন শব্দে লোহার শিকল যথাস্থানে আঁটিয়া বসিল। নির্জন স্তব্ধ গৃহে অশরীরিক্রমে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিল, “না হয়—ঐ-ঐখানে—”

### উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সুশীল চলিয়া গেলে কি অসহ্য শোকাহত শরীর-মন লইয়াই যে নীলিমা তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তাহা শুধু সেই জানে, আর যদি কেহ তাহার চিরদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধির মুহূর্তে তাহার ইষ্টদেবতাকে এমনই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে সেই শুধু একমাত্র তাহার এ ক্ষতির পরিমাণ বোধ করিতে পারিবে। শয্যাহীন তক্তপোষের উপর সে অসহ্য ব্যর্থতার অব্যক্ত রব করিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং তাহার পর সে কি করি! তখন নিখিলের সমুদয় বেদনা যেন এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়া তাহার হৃদে নেত্রপথে অজস্র ধারাকারে প্রবাহিত হইতে থাকিল, আর সে করি যেন অফুরন্ত, তাহার যেন আর কোনখানেই শেষ নাই! তাহার করতলগত অমূল্যনিধি, তাহার চির-সাধনার সিদ্ধি, সে যে আজ নিজের হাতে অতল জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, চির জন্মজন্মান্তরের মতই তাহার যথাসর্বস্ব সে বিসর্জন দিয়া দিয়াছে, তাহার এ ছার ও বুখা জীবনেই বা আর এখন প্রয়োজন কিসের! কি লইয়াই এই দীর্ঘ - দীর্ঘতর, সুখহীন, শান্তিহীন, নির্ভর্য, নির্জন

নির্জন জীবনভারকে সে বহন করিয়া বেড়াইবে এবং তাহা করিয়া লাভই বা কোথায়?

নীলিমার মনে পড়িল, এক দিন সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, পূর্ণ সুযোগ সঙ্গেও মরণের দ্বার ঠেলিয়া আবার সেই জীবন্ত জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখনহয় তো সে তাহা পারে। তাহার মনে হইল, এমনই কঠিন প্রাণ তাহার যে, মরণও তাহাকে ছুঁই ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারে না। যে মৃত্যুর উচ্চ নীচ সমুদয় জীবজগৎ সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাকেই সে সমাদরের সহিত বরণ করিয়া লইতে উদ্ভত, অথচ সে-ও তাহাকে আলিঙ্গনদানে যোরতর অসম্মত। এ রহস্য বড় মন্দ নহে! অথবা যে অনা-বশ্তক, মৃত্যুর রাজ্যেও বোধ করি, তাহার মূল্য নাই।

এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে মিস্ রীচের আহ্বান পাইয়া নীলিমা তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিল, শুধু তিনিই নহেন, তাঁহার সঙ্গে সে ঘরে আজ \* \* \* এর পুরোহিত মহাশয়ও উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহার উপস্থিতিতে নীলিমা মনে মনে কিছু সঙ্কোচ বোধ করিল। যেহেতু, মিস্ রীচ তাহাকে আদর করিতে যে ডাকান নাই, সেটুকু তো নিশ্চিত জানা কথাই;— অথচ এক জন অপর লোকের সান্নিধ্যে অনর্থক অপ-মানিত হওয়া কে-ই বা পছন্দ করিতে পারে? এই দুই জনের প্রতিই তাই নীলিমার জালাত্তরা, অসহিষ্ণু চিত্ত সমানভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সে একটা আসন্ন সংগ্রামের জন্তই নিজেকে কতকটা তৈরী করিয়া লইয়া মাটি চাপিয়া দাঁড়াইল। কারণ, নিজের ভিতর-কার অবস্থা হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, আজ যদি মিস্ রীচ তাহার প্রতি কোনরূপ অন্তায় ব্যবহার করিতে যান, তাহাকেও সেই মুহূর্তে তাঁহার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সমর-ঘোষণা করিতে হইবে; শরীর-মনের এত বড় মন্দ অবস্থায় আর কোন কিছুই তাহার সহ্য হইবে না।

মিস্ রীচ তাঁহার স্বতঃই গভীর কঠিন কণ্ঠে কথা কহিলেন; বলিলেন, “মিস্ চক্রবর্তী! তোমার বিষয়েই এঁর সঙ্গে আমার এতক্ষণ কথাবার্তা হইতেছিল। তোমার যেমন চরিত্র, তাহাতে বিবাহই তোমার পক্ষে একমাত্র প্রতিবেদক। তাই আমরা তোমারই মঙ্গলের জন্ত তোমার বিবাহ-বিষয়ে হিরসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব তুমি প্রস্তুত হও, এই সপ্তাহেই মিস্ চিনিবাস পলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে।”

নীলিমার বিবাহ-বিষে বিদগ্ধ চিত্ত ঘোরতর  
বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সে এ  
দিক্ দিয়া আক্রমণের ভয় আদৌ করে নাই। নিশ্চিতই  
সে ভাবিল,—“এই খুঁড়ধর্ম! উদার ও মহৎ বলিয়া  
এরই এত বড় নাম, এতেই এদের এত গর্ব? সে  
যে এ কথা বিশ্বাস করিতেই পারে না। না না, হয়  
তো তাহার বুঝিবার ভুল, মিস্ রীচ যতই যা হউন,  
নিশ্চয়ই এমন কথাটা তাহাকে বলেন নাই।” সে  
প্রায় নিরুদ্ভাসে মিস্ রীচের বাহুগস্তীর মুখের দিকে  
চাহিল,—না, কই না, কিছুই বুঝা যায় না; মুখ সেই  
যথাপূর্ব পাথরের মতই কঠিন ও নির্ভিক্স। তখন  
সাহসভরে সে প্রশ্ন করিল, “বিবাহের কথা আপনি  
কি বলিতেছেন? আপনি জানেন, আমি জর্জ  
ওকবর্গকেই যখন বিবাহ করি নাই—”

“ওঃ, তোমার তো বড়ই স্পর্ধা দেখিতে পাই।  
নেটিব নিগার হইয়া উচ্চবংশীয় আইরিশম্যানকে তুমি  
বিবাহ করিতে চাও না কি! বামন হইকা চন্দ্র ধরি-  
বার উদ্ভাহ হওয়া আর কি! শোন নীলিমা!  
তোমার কু-চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমি আমার মিশনের  
মেয়েদের তো আর নষ্ট হ’তে দিতে পারি না, কাজেই  
তোমায় এক জন শক্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া এই  
মিশনবাদীর বাহিরে পাঠাইতেই হইবে। এমনই  
মায়াবিনী তুমি যে, তোমার হাতে আইরিশ যুবক,  
বাল্গালী যুবক কাহারও কোথাও রক্ষা নাই! কি  
লজ্জা! বাও, এখন নিজের স্থানে যাও, বিবাহের  
পোষাকের কাপড় আনাইয়া দিব, ভাল করিয়া  
শেলাই করিয়া লইও।”

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্তে ক্রোধের অগ্নি  
বাড়বাড়ির মতই দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।  
সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আমার বিয়ে দিতে চান জোর  
ক’রে? যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে আমি কখন  
দেখিও নি, সে-ও আমার নয়। হিন্দুসমাজ এর চেয়ে  
বেশী আর কি ক’রে থাকে? তবু তো তারা আত্মীয়,  
আর তোমরা সম্পূর্ণ পর। যাহাই হউক, বিয়ে আমি  
কিছুতেই করবো না।”

মিস্ রীচের ভূগোলশাস্ত্রের প্রদর্শিত ভূ-গোলের  
মতই সূর্যহৎ এবং সূর্যগোল মুখমণ্ডল কঠোরতর হইয়া  
উঠিল, গস্তীরতর তিনি সবিক্রমে উত্তর করিলেন,  
“তা করবে কেন? তা হ’লে যে প্রজাপতির পাখা  
খসিয়া যাইবে। কিন্তু আমিও বলিতেছি যে, বিবাহ

তোমায় করিতেই হইবে। তোমায় দেখিয়া পছন্দ  
করিয়াছে, আর তোমার পছন্দের জন্য কিছুই আসি  
যায় না। পল তোমায় ঠিক জম্ব রাখিতে পারিবে,  
ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে আখমাড়ার চিনির  
কুঠীতে কুলী খাটার, আর তোমার একটা মেয়ে-  
মানুষকে সোজা করিতে পারিবে না? তা ভিন্ন সে  
মরিসসেও অনেক দিন কুলী খাটাইয়া খুব পাকা  
হইয়া আসিয়াছে। জানেন রেভারেণ্ড মশাই! মিঃ  
চিনবাস পল সেদিন তার অনেকগুলি আপনার  
জাতের বাগ্‌দীকে খুঁটান করেছে, ভারী ভাল লোক  
সে।”

নীলিমা সাপের মত গর্জিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে  
কহিল, “বাগ্‌দীর সঙ্গে আপনারা আমার বিয়ে দিতে  
চান?”

মিস্ রীচ প্রসন্ন আননে প্রতিহিংসার বক্র হাসি  
হাসিয়া পরিতুষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আমরা তো  
জাতিভেদ মানিনে। ব্রাহ্মণ বা বাগ্‌দী আমাদের  
কাছে প্রভেদ কি? তুমিও তো খুঁটান, তোমার  
পক্ষেও সেই একই কথা।”

এ যুক্তি শুনিয়া আর নীলিমার মাথার ঠিক রহিল  
না, সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, “মিথ্যা কথা!  
জাতিভেদ আপনারা খুবই মানেন! আইরিশম্যানের  
বিবাহ বাল্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে হওয়ায় আপ-  
নার এবং আপনাদের অধিকাংশেরই ঘোরতর আপত্তি  
আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্ডার বিবাহ বাগ্‌দীর সঙ্গে হওয়ায়  
আপনার বা আপনার জাতির আপত্তি নাই। কেন?  
আমরা কি আপনাদের সঙ্গে তুলনার তাদেরও অধম  
কিসে শুনি? রংয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বে-  
তফাৎ, আমাদের সঙ্গে বাগ্‌দীদেরও প্রায়ই তাই।  
আপনারাও এ দেশে থেকে খুব বেশী পূর্বের রং বজায়  
রাখতে পারেন না, তাও তো স্বচক্ষে সর্বদা দেখেছেন!  
তবু তা বজায় রাখতে কতই না প্রাণপণ চেষ্টা, কত  
না অসাধারণ যত্ন! পাহাড়ে ঘোরা, মধ্যে মধ্যে  
‘বাড়ী’ ঘুরে আসা। তার পর শিক্ষা, সংযম, চরিত্র  
কোন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যত প্রভেদ,  
আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশের অতি নিম্ন শ্রেণীর  
লোকদের তার চেয়ে কি কম প্রভেদ? আমরা অর্ধো-  
লঙ্গবেশে নর-নারী মিলে—তাও পরপুরুষ পরনারী  
—থেকে অর্ধ-প্রমত্তভাবে উদ্ধাম নৃত্য পারি  
না, পুরুষের উচ্চ স্থলতা এখানেও প্রশ্রয় হলেও



নারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমাদের সমাজ, সমাজধর্মের অধিকতর বিরোধী বোধ করে, সমাজকে সতী-গর্ভজাত রাখতে চায়, এরই ■■■ আমরা আপনাদের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত ব'লে যদি গণ্য হই, তবে ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ তো এখনও গণ্য শেষ করতে পারা যায় না। আমি অবশ্য আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধে মিশ্রিত হ'তে বলিনে, কিন্তু আমাদেরও আপনারা সেই দয়াটুকু দেখালেই তো চুকে যায়। এই রজিন খোলস, এই কথার মালার আমাদের দেশের বে সর্বনাশ হ'তে বসেছে। ছাড়ুন এ সব অভিভাবক-ত্বের ভাণ। এই ভুল পথের ভুল শিকা ছালা ত'রে এনে ছোট ছোট মাথার ইন্জেক্ট ক'রে দেবেন, আর—" উত্তেজনার নীলিমার কণ্ঠগোধ হইল; সে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

রেভারেন্ড গিলবার্ট অটোম্যান এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন। পুরোহিতোচিত দীর্ঘ-গভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠেই তিনি নীলিমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "বৎস! ধৈর্য্যহারা হইও না, তুমি নিশ্চয়ই সেন্ট ম্যাথিউএর সেই মূল্যবান কথাগুলি স্মরণ করিবে যে \* \* \* and gathered the good into vessels, but cast the bad away. And shall cast them into the furnace of fire there shall be wailling and gnashing of teeth—, অতএব স্থিতির চিত্তে সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ। দেখ,—ভুল করা মানবধর্মের বাহিরের বস্তু নহে। To Err is human, এটি একটি তারই বিশেষ প্রমাণ। আর যীশাসু ক্রাইষ্ট এই ভুলক্রান্ত পাপীদের জন্তই সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কাঁটার মুকুট পরিয়া নিদাক্ষণ যন্ত্রণাজনক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণদান করিলেন, তাহা কেবলমাত্র জগতের পাপি-কুলের মুক্তির জন্তই। অতএব তুমি নিজের জীবনের ভুলের জন্ত অনুতপ্ত হও এবং সম্পূর্ণভাবে যিনি তোমাদের জন্ত প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ পূর্বক তোমার জন্ত বিহিত তোমার এই একমাত্র উদ্ধারের পথকে তুমি সর্কান্তঃকরণে গ্রহণ কর। হিন্দুর জাতিভেদে ও খৃষ্টানের জাতিভেদে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। হিন্দু তাহার সহিত সমানধর্মী, সমবর্ণ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যেও আহার পর্বাক করে না, আর আমরা নিগ্রো, বাগ্দি বা তোমাদের

সবার হাতেই নির্বিকার ভাবে থাই। ■ সব সঙ্কীর্ণতা, মিথ্যাভেদবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। পলকে আমিও চিনি, সে তাহার কুলীদের খুব খাটায় ও তাহাদের ■ বাইবেল প্রচার করে। এতে তাদের খুব ভাল হয়। উপার্জনও সে কম করে না। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহে তোমার আত্মারও কল্যাণ হইবে এবং সুখীও যে হইবে না, তা নয়। আর কি আশা করিতে পার? নেটিবের মেয়ে হইয়া এর বেশী কি পাইবে?"

এরই নাম উদারতা! আর এই সমুদ্রত যুরোপীয় উদার সমাজ! এতটুকুমাত্র সঞ্চয় লইয়াই ইহার পরধর্মের প্রতি পদে পদে আক্রমণ পূর্বক পরের শাস্তিপূর্ণ সমাজ-ধর্মকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছেন? যুরোপীয়ের জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপেই বর্ণভেদ, একজন ইংরাজ এক ■ ইটালিয়ানকে বিবাহ করিলে তাহার জাত যায় না, কিন্তু এক জন ভারতবর্ষীয়কে করিলে যায়। আর অবস্থাভেদেও এই জাতিভেদের একটা প্রধান অঙ্গ। গর্ভের ছেলের গরীবের মেয়ে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী যুরোপের—মিশ্রজাতির—আমেরিকানের ঘরে বিবাহে দোষ ■ না। ■ তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধ ■ অবজ্ঞা নিতান্ত ■ নয়। তার পর বিবাহে স্বাধীন নির্বাচনটাও বতদূর হইতে পারে, তাহাও এই জর্জের ব্যাপারেই তো সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে। নিজ সমাজ-মধ্যেও গভী ছাড়াইবার পথ ইহাদের কাহারও নাই। রাজার ছেলের বিবাহ রাজবাংশে হওয়া চাই, সকল ক'নেই বরের ধনৈশ্বর্য্যের মূল্যে আত্ম-বিক্রয় করিতে নিজেকে পণ্যের মতই বিবাহ-বিপণির দ্বারে নিয়মমত সাজাইয়া আনে। পিতার ঐশ্বর্য্যমূল্যে বিক্রয় সহজ হয়। এ সমাজও সেই তো একই সঙ্কীর্ণচিত্তের সমাজ। সমাজ-ধর্ম সর্বত্র কি তবে ■ নহে? রাষ্ট্রের ঐক্যতির মধ্যে অমুদারতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, ■ কি সর্বত্র একই ভাবে বর্তমান নাই? বরং ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু কিছু উদার, সে পরধর্ম হস্তক্ষেপ করিতে চুটে না।—অপর ধর্মে সেটুকুও অঁতাব।

বিরিক্ত-পুরুষ মুখে প্রবাহিত বহান্বয়ের দিকে মুখ তুলিয়া নীলিমা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তবে আপনারা ■ নিজেদের বিজয়বর্কে

বিজিত জাতির বিষয়ে কখনও এবং কোন বিষয়েই ছবিচার করিতে সমর্থ নহেন, এ কথা এখন এ দেশে সবাই জানে। এ দেশের মেয়েরা, স্বজাতির বাহিরে তো দূরের কথা, স্বদেশীর বহির্ভাগেই সাধ্যপক্ষে বিবাহ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন কি, বাহারা মুখে জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও মনের এ সংস্কার সহজে দূর হয় না। বাহা হউক, আমি আপনাদের নিকটস্থিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি। তাহা অপেক্ষা বরং আপনারা আমার বিদায় দিন, আমি অন্তত চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে আমার কুণ্ঠান্তে অন্য মেয়েরা তো আর মন্দ হইতে পারিবে না।”

এই বলিয়া নীলিমা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই মিস্ রীচও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে পদাঘাত পূর্বক সরোষকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “বিদায় তোমাকে নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু তাহার পূর্বে তোমার বিয়দীত তুলিয়া লইয়া তবেই তোমার ছাড়িব। তোমার মত কুহকিনীকে বাহিরে পাঠাইলে অন্নবরষ যুবকবৃন্দের সর্বনাশসাধন করা হইবে, সে কার্য জানিয়া তুমি আমি করিতে পারিব না। শক্ত হাতে তোমার বাধিয়া দিয়া তাহার শাসনে রাখিতে পারিলে তোমার কতকটা ঠাণ্ডা করিতে পারিব আশা হয়। বাও, আর কোন কথা বলিও না; বিবাহের পোষাক তুমি তৈরী না করিয়া লও, আমি চন্দ্রমুখীকে করিতে দিব—বাও—তুমি এখন এখান হইতে দীর্ঘ দূর হইয়া যাও!”

নীলিমা একবার কি বলিবার জন্ত মুখ তুলিতে গিয়াই আত্মসংবরণপূর্বক আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সন্ধান-খাসে তাহার বুক তখন জোরার লাগা নদীতরঙ্গের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, গরলে ভরা সর্প খাসের মতই প্রবলবেগে খাপখাপ বহিতেছিল; ছই চোখ তাহার আঙনের ভাঁটার মত দীপ্ত হইয়া জলিতেছিল। পাছে মিস্ রীচের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরে, পাছে এই প্রবল উত্তেজনার বশে তাঁহার জিহ্বাটা বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বসে, তাই কোনমতে প্রাণপণে সে নিজেকে জোরকরিয়া ঠেলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া গেল, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নিজেকে রাখিতে তাহার ভরসামান্য হইল না। না—খাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। হার স্ত্রী! হার স্ত্রী!

## পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলিমা চোরের মত সন্তর্পণে নিজের মূল্য-বান্ জব্বাদি একটি ছোট পুঁটুলীতে বাধিয়া লইয়া নিঃশব্দপদে দ্বার খুলিল এবং এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া ধীরসতর্কপদে পিছনের বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, এ দিকের ছোট দরজাটা খুলিলেই সে মুক্তি পাইবে, কিন্তু কাছে আসিয়া তাহার সে ভুলটা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল, সেই ক্ষুদ্র দ্বারে একটা বড় রকমের পিতলের তালা লাগানো রহিয়াছে। তখন হতাশায় তাহার সমস্ত মনপ্রাণ যেন বড় বড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, শরীরের সবটুকু শক্তি যেন তাহার কোথায় নিঃশেষ হইয়া চলিয়া গেল, সে সেই কপাটের কাছেই ছই হাঁটু ভাঙ্গিয়া একেবারে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং আত্মনাদের করিয়া মর্মান্তিক বিলাপ-স্বরে কহিয়া উঠিল, “হে ঠাকুর! তোমার ছেড়েছি বলে তুমিও কি আমার ছাড়লে? শেবে কি স্ত্রীলকে ছেড়ে বাগদীর গলাতেই আমার মালা দিতে হবে? আমার এত বড় স্বার্থত্যাগের কি এই এত ছোট পুরস্কার!”

পিছনে কাহার যেন মৃদু পদশব্দ হইল, অননি নীলিমা সতরে আঁতকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা হইতে মাথা অবধি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ধরা পড়িলেই তো তাহার সকল আশারই আঁজ এখনই সমাধি ঘটবে, এ কথা সে ভালমতেই বুঝিয়াছিল। মিস্ রীচের যে প্রকৃতি, অতঃপর তিনি যে তাহাকে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ কি অহেতুক বিধেব! সে ত তাঁর কোন ক্ষতি নাই! ইহাই হিংস্র স্বভাবের গুণ। তার বাপ যা করিতেন, তারও একটা অর্থ আছে—সেটা স্বার্থ। কিন্তু মিস্ রীচের এ অত্যাচারস্বর্থ অধীনস্বকে পীড়ন করার সুখ মাত্র, আর কিছুই না।

“নীলিমা! ভয় পেয়েছ? আমি চন্দ্রমুখী। তুমি কি এখানে থেকে পালাতে চাও? পালাবে? আচ্ছা, এসো, এ পথে ■ যেতে পারবে না ভাই। মেয়েদের বাধ-রুমের দোর দিয়ে তোমার বার ক’রে যেন আমি দিতে পারি;—কিন্তু তার পর?”

নীলিমার সর্বশরীরের সে প্রবল কম্পন তখন পর্যন্তও ভাল করিয়া ধামে নাই, সঙ্গীত তাহার মনকে তখনও পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আছে, তথাপি অন্তের



পরিবর্তে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া এবং তাহ'র মুখের এই আশ্বাসবাণীতে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে উত্তেজনা-রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সাগ্রহে উত্তর করিল, “তার পর বা হয়, আমার হবে, আমার তুমি দয়া ক’রে এই নরক থেকে উদ্ধার ক’রে দাও দিদি। আমি যদি আর কোন উপায় না দেখি, এবার না হয় ম’রে গিয়েও বেঁচে যাব, তবু বিষে করতে আমি কিছুতেই পারবো না; স্বর্গের দেবতাকেও না, তা ঐ বাগ্দী খুঁটানকে।”—

চন্দ্রমুখীর অধরে ঈষৎ সহামুভূতিপূর্ণ হৃৎখের হাসি ফুটিয়া তখনই আবার তাহা অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল, সে শুধু সংক্ষেপে কহিল, “এসো।”

বাহিরের মুক্ত বাতাসে রুদ্ধশ্বাস গ্রহণ পূর্বক নীলিমা চন্দ্রমুখীকে হুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। অঙ্গ গদগদস্বরে কহিল, “দিদি! তুমি আজ আমার ম’র বাড়ী হ’লে! নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্মান্তরের ঐ ছিলে, নয় তো বোন ছিলে ভাই! উঃ, কি হৃদয়গাথাকেই আমার তুমি আজ বাঁচালে বল দেখি?”

চন্দ্রমুখীর হুই চোখ ছলছল করিতেছিল, সে নীলিমার ভয়পাণ্ডুর ও শীতল গণ্ড হুই হাতে ধরিয়া তাহার ভয়, উত্তেজনা ও সংশয়ে শবন্তল ললাটে সম্মেহ চুসন করিয়া সজল গাঢ়স্বরে কহিল, “নিজে ম’রে যে মরণের বিতীষিকাকে চিনেছি রে ভাই! ঐ থেকে কেউ যদি বাঁচতে পারে, মনে হয়, তাতে বুঝি নিজেও একটুখানি শাস্তি পাব। যাও ভাই, দেবী করো না। কিন্তু একটা কাজ কর না হয়, হিন্দুস্থানীর মতন ক’রে শাড়ীটা না হয় প’রে নাও, আর একটা শাড়ী ছিড়ে ওড়না ক’রে মুখে মাথার ঢাকা দাও; আর এই দাই-এই হাঁকা-কলকেটা এনেছি, এটিকেও হাতে ক’রে নাও দেখি। দেখো ভুলে যেও না, হিন্দীতে কথা করো। বাজালীর মেয়েকে একা এত রাত্রে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে বেশী। আচ্ছা, বল হরনি, ই্যা,—যদি কখন নিরাপদ হ’তে পার, তখন আমার একটু খবর দিও,—দাঁড়াও, সব কথা ব’লে দি, এখন বেন দিও না।”

হুই জনে তখন হুই দিকের পথ ধরিল।

কোন দিকে ষ্টেশন, তাহা নীলিমার জানা নাই। মিস ওকবর্গের জীবিতকালে কয়েকদিন গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া সে গহর কোন দিকে, তাহা দেখিয়াছিল, পোষ্ট অফিসেও এক দিন তাহাদের গাড়ী থাকে, ~~করিল~~ ষ্টেশন সেই দিকেই হইবে। উত্তরের

পথকে সে সতয়ে বর্জন করিল, সেই পথ দিয়াই সে এমনই অসহায় অবস্থায় আর এক দিন এ দেশে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেই কথা আজ আবার ভাল করিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ট্রেনের খার্ড ক্লাস টিকিটই সে কিনিয়াছিল। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার পূর্বেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল,—বাহাতে সে গাড়ীতে তাহার উঠা ঘটিল না। সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের একটা খোলা জানালার দিয়া একটা বঙ্গনারীর অনাবৃত মুখ বাহিরের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া ছিল, তাহার ঠিক সাম্নাসাম্নি হইতেই নীলিমার মাথা হ’তেই তাহার অনভ্যন্ত ওড়নাখানা বাতাসের একটা ঐবল ঝাপটায় হঠাৎ ধসিয়া পড়িল, এ দিকে সে তাহা শব্দবাস্তে কুড়াইয়া লইয়া বখানানে স্থাপন করিবার পূর্বেই সেই বাতাসনমধ্যবর্তিনী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে এক-মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর অথচ সুস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন, “নীলিমা!”—এই অতর্কিত সম্বোধনে নীলিমা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের সেই ~~গাল~~ গালফুলের প্রধানা শিকরিয়াই স্লোচনা দিদি।

স্লোচনা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ গভীর, অথচ শাস্তকণ্ঠে পূর্ণ আদেশের স্বরে কহিলেন, “এখানে এসো।”

নীলিমা একবার মনে করিল যে, সে ইহার সম্মুখে হইতে না ~~খুব~~ খুব ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু সে কাজ করিতে আদৌ তার ভরসা হইল না। তাই অনিচ্ছুক ও বিপন্নভাবেই তাহার নির্দেশমত তাহার কামরাত্তেই শেবে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। মনটা তার অতিরিক্ত বিপন্নতায় বিরক্তিতে ভরা। না জানি তার ভাগ্যে আবার কি না কি বিড়ম্বনা ঘটিয়া যায়! এ যে ভাজনা খোলা হইতে আগুনে পড়া ঘটিল! মিস রীচকে এড়াইয়া বাঘের খপ্পরে!—কথা প্রায় একই।

স্লোচনা নীলিমার আপাদমস্তক বার হুই তিন চোখ বুলাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কথা কহিলেন; বলিলেন, “তবে যে শুনেছিলাম, তুমি ম’রে গেছ?”

নীলিমা চিরদিনের অভ্যাসমত এই গভীরপ্রকৃতি শিকরিয়াটিকে ভীতিদৃষ্টি প্রেরণ করিল, মুখে তাহার কথা সরিতেছিল না; কুল থাকিতেও সে কখনও

ইহার সহিত বেশী কথা কহে নাই। এমন কি, পাওনা টাকার তাগিদে তবু বরং তাঁহাকে দেখিলেই তাহার হৃৎকম্প হইত।

স্বলোচনা পুনশ্চ বলিলেন, “দোষ তোমার বাবারই, কিন্তু তার ফলে তুমি আর যা হোক করলেই পারতে, এটা ভাল হয় নি।”

এতকণে নীলিমা তাঁহার তিরস্কারের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল এবং তাহা পারিয়া তাহার মনের সমস্ত সঙ্কোচকে কাটিয়া দিয়া তাহার অন্তরের সত্যভাজ তাহাকে দীপ্ত করিয়া তুলিল, সে তখন একটু যেন সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ও অকুণ্ঠস্বরে সহজভাবে তাঁহাকে বলিল, “কোনটা ভাল হয়নি, স্বলোচনাদি? মা ম’রে যাওয়াতে বাপের কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কেনে স্থান থেকেই আমি নদীর ধারে ধারে চ’লে চ’লে ক’দিন পরে আশ্রয় অবস্থার \* \* এর মিশন-কুটীর কাছে পৌঁছে সেইখানে মাঠের মধ্যে প’ড়ে ছিলাম। তারা নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে আমার খুঁটান করেছে! কিন্তু তাদের মধ্যে আমি মোটে টেকে পারছিলাম, তাই আমি আজ সেখান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতুম বলুন?”

স্বলোচনা আবার চশমার মধ্যে দিয়া ভাল করিয়া নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে আন্তে আন্তে বলিলেন, “তুমি কি খুঁটান?”

“হ্যাঁ, তাই আমি হয়েছিলুম, এই দেখুন না”— বলিয়া সে তাহার পুঁটলী খুলিয়া কাল রং-করা কাঠের ছোট্ট ক্রুণা একখানা বাইবেল বাহির করিয়া তাঁহাকে সেই দুইটি জিনিষ দেখাইল। স্বলোচনা কণকাল নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,— “সুখ পেলে না?”

নীলিমা স্তানমুখে মাথা নাড়িল, “না।”

“কোথায় যাচ্ছো? বাপের কাছে কি?”

নীলিমা এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। বাপের কাছে? হ্যাঁ, সেটা তাহার যাইবার মত স্থানই বটে! যত্নের দ্বারাও তাহা হইলে পৌছানটা সহজ হয়। কিন্তু প্রাণের উপরকার মমতাটাও যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, “না, সেখানে নয়। কলকাতার টিকিট নিয়েছি।”

“সেখানে কি কেউ আছে?”

নীলিমার মুখ তলাইয়া ছোট্ট হইয়া গেল,

বিপর্যয়ে সে নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তরে কহিল, “কেউ না, শুধু—কোথায়ই বা বাব, তাই জন্মেই নিম্ন। ওনেছি, সেখানে না কিছু অনেক উপায় আছে। স্থল আছে, বোডিং আছে, কিছু না কিছু উপায় হয় তো হয়ে যেতে পারে।”

স্বলোচনা কণকাল নীরবে কি ভাবিত হইলেন, তাহার পর একটা ছোট্ট রকম খাস মেরিন পূর্ব-স্বভাবসিদ্ধ গাভীর্ব্যের সহিত কহিলেন, “তোমার বাবা যে দিন তোমার আশ্রয়ের স্থল থেকে ছাড়িয়ে নেন, আমার মনে তোমার জন্মে কষ্ট হয়েছিল।—যা হোক, তুমি আমতে চাও তো আমার কাছে আসতে পার। ইচ্ছা হ’লে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করতে পার, আর সেই সঙ্গে ইনক্যান্টরাসটার পড়াতেও পার। কিছু কিছু পাবে তাতেও। আর কিছু পড়াশুনা করেছিলে কি?”

এই অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বে নীলিমার দলিত হৃদয় যেন সক্রতজ হর্বোক্ষাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া লাগিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার চোখের কোণ ছাপাইয়া পড়া জলের ধারাকে রোধ করিতে চাহিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কেলিয়া কহিল, “আমি ইংরাজী, ফ্রেন্স, — কি, একটু একটু ল্যাটিন পর্যন্ত শিখেছি। —আমার আপনি স্থান দেন তো আমি নিশ্চয়ই বাব,—আপনার কাছে।—কিন্তু আমার বাবা যদি আমার সেখান থেকে জোর ক’রে ধ’রে আনেন, আর আপনাকেও যদি আমার — তিনি অপমান ক’রে বলেন, সেই আমার ভয়। জানেন তো তাঁকে—”

স্বলোচনা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাধা দিলেন, বলিলেন, “তুমি হয় তো জান না, তোমার বাবা যে এখন মুদ্রাশস্যার। ঝড়বৃষ্টিতে পুরাণ বাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে পড়ছিল, তারই মধ্যে থেকে লোহার সিন্দুক টেনে আনতে গিয়ে একটা মোটা কড়িকাঠ ভেঙ্গে প’ড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে। তিনি এখন হাসপাতালে, পরণ্ড আমি এসেছি, সে দিনও তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।”

নীলিমা এই সংবাদে কণকাল স্থির হইয়া রহিল, সে যে এ খবরে খুসী হইল অথবা দুঃখিত হইল, সে কথাটাও সে যেন কয়েক মুহূর্ত্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার পর মনের মধ্যে কিসের যেন একটা দ্রুত তৃপ্তা দেখা দিয়াছে বলিয়াই সে সহসা অশ্রুতা করিল। সেটা যেন সেই



চিরঅত্যাচারী, নির্মম প্রকৃতি পিতার প্রতি সমবেদনা ■ তাঁহাকে একবার শেষ দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বলিয়াই তাহার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। আর এই অভিনব আবিষ্কারে যেন বিশ্বয়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল এবং তাহার পরই কাদিয়া ফেলিয়া সহসা অশ্রু-সজল গাঢ় স্বরে সে কহিয়া উঠিল,—

“বাই হোন, আর যাই করুন, তবুও তো তিনি আমার বাপ,— আমি আগে একবার তাঁরই কাছে যাব সুলোচনাদি।” তার পর যদি যায়গা দেন, তবে আপনার পায়ের তলায় বসে সেই আপনার মত পায়ের জন্তই নিজেকে উৎসর্গ করে দেবো। আমার এ জন্মটার আর ত আমার কিছুই করবারও নেই! কিন্তু একটি কথা সুলোচনাদি। আমি যে একদিন খুঁটান হয়েছিলুম, এ কথা যদি সম্ভব হয়, তবে আমি তা জুলতে চাই, আপনিও দয়া করে তাতে একটুখানি সাহায্য করবেন। আপনি এ কথা কাহারও কাছে বলবেন না, আমিও বলব না। আমি ত আর গৃহস্থ সংসারে ঢুকতে যাচ্চিনে যে, এতে পাপ হবে? সমাজের ■ সংসারের বাইরে থেকেই তো আমি আমার জীবন-টাকে কাটাতে চাই। এতে আর কার কি ক্ষতি হবে? আমি হিন্দু। কারমানে আচার-নিষ্ঠায় আমি হিন্দু হয়েই থাকব, আপনি সে সুযোগ আমার দিতে পারবেন না কি? বলুন, তবেই আমি যাব।”

সুলোচনা কথায় ইহার জবাব না দিয়া শুধু নীলি-মার মাথার উপর নিজের দক্ষিণ হাতখানি রাখা করিলেন।

তখন সম্পূর্ণরূপে আশ্রুতা ও আশাশ্রিতা হইয়া উঠিয়া নীলিমা তাহার সেই কালো রংএর ক্রশ ও কালো চামড়া বাধা বাইবেলখানা তুলিয়া লইয়া জানা-লার মধ্য দিয়া ভূগাক্ত মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিল। গাড়ী তখন রীতিমত ছুটিয়া চলিয়াছে।

### একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ভুবনবাবুর ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল না। বাহিরে ভূতাবর্গ অতি সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিতে থাকিলেও কোন এক জনও এ ■ প্রবেশ করিতে ভরসা করে নাই। কলি-  
রাজপথ ব্যতীত আর সমস্ত প্রকৃতিই যেন

আজ একটা আকস্মিক বিরাট শোকভারে অভিভূত স্তব্ধ ও ভয়ানক। আকাশ ঘোলাটে, বাতাস শুষ্কোট, গাছপালা নিরুন্ন হইয়া আছে। গৃহবাসী ততোধিক স্তব্ধ ও স্থির।

ভুবনবাবু যে সোফায় সচরাচর দৈপ্রহরিক নিদ্রা-বেশ হইলে কখন কখন শয়ন করেন, তাহাতেই অর্ধ-চেতনবৎ বহুক্ষণাবধি পড়িয়া আছেন। আহা! তাহার আজ কয় দিন ধরিয়াই প্রায় ছিল না, আজ আর তাহা একেবারেই হয় নাই, আহা! কথার বলিতে আসিবার প্রবৃত্তি অথবা ভয়সাও এ বাড়ীর কাহারও মনে ছিল না। এই চিরসহিষ্ণু সহনশীল কোমল-প্রকৃতি বনিবের উপর আজ কত বড় বিপদের বজ্রই যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেক পরিজন আজ কেবলমাত্র গোপনে অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছিল। আর সুনীল ■ সেও যে এ বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই বড় প্রিয় ছিল। সকলেরই মনের মধ্যে অশ্রুট অবিখ্যাসে সুনীলের নির্দোষিতা সম্বন্ধে পূর্ণ সন্দেহই যে আজও তেমনই জাগ্রত রহিয়াছে। হুই এক জন স্পষ্টই তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদও করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদে বাহিরের কোন পরিবর্তনই তো ঘটাইতে পারে নাই। কাল সুনীলের বিচারের দিন, এ সংবাদ তাহার ■ নিযুক্ত উকীল-ব্যারিষ্টারের কাছেই সরকার জানিয়া আসিয়াছে।

একখানা ভাড়াটে খার্ডরুশ গাড়ী আসিয়া ঝানিলে গাড়ীর মধ্য হইতে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ক্রিষ্টভাবে নামিয়া আসিল বিনতা। বিনতার সেই সগর্ভ সন্নত চলনের ভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট উন্নত দেহ অনেকখানিই নমিত হইয়া গিয়াছে, পারে তাহার জুতা নাই, কেশ ক্রক, বেশভূষা অসংবৃত, মুখ তাহার অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ, চক্ষু দুইটা অসাধারণ উজ্জল। এই ভয়াবহ নারীমূর্তি দেখিয়া সে বাড়ীর সকলেই যেন সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া সরিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যায়ের কোন একটি ভাষাও সে দিন কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না—কেহ কেহ একটু বিদ্বিষ্টভাবেই মুখ সরাইল। বিনতাও কোন দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া সোজা তাহার বাপের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার দৃঢ় পাদক্ষেপ ■ কাঠিন্যকঠোর মুখভাবে তাহাকে বে দেখিল, সেই ■ মনে আসন্ন আর একটা কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল

গর্জনোন্মুখ বজ্র যেন সেই মেঘবাপ্ত মুখখানার কণে কণে চকিত চপলার মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছিল। সেটা ভাইয়ের জন্ত শোক নহে, পিতার প্রতি সহানুভূতিও নহে; এ সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত অপর আরও কোন একটা নূতন জিনিষ, তাহা যে কোন দর্শকই বেশ বুঝিতে পারিল।

বিনতা ঘরে ঢুকিবার পূর্বেই একবার এবং দ্বারে পা দিয়াই আবার একবার তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল, “বাবা!”

ভুবনবাবুর অসাড় আচ্ছন্নবৎ মনের ভিতরে সে ধ্বনি একটুখানি যেন স্পন্দন মাত্র তুলিল। এই ‘বাবা’ ডাক যেন কোথা হইতে কোন্ স্বদূর হইতে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এ যেন তাঁহার বহু বহু দিন অশ্রুত। এমনই হৃদয়-মনে চমকিত—উচ্চকিত হইয়া তিনি সহসা লোভাকুল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ঘরের দিকে চোখ ফিরাইয়া চাহিতেই সেই অমুজ্জল সন্ধ্যা-লোকে একটি অস্পষ্টপ্রায় নারী-মূর্তি তাঁহার সেই উদ্বেগ-ব্যাকুল চক্ষুতে পড়িল। এমনই গভীর হতাশার হাহাকারে সমস্ত মনপ্রাণ যেন কোন্ পাথারে তলাইয়া ধাইবার উপক্রম করিল। কৈ, কোথায় রে! কৈ কোথায়! কাহার অলীক প্রত্যাশা করিয়া এ স্বপ্ন দেখা! সে কোথায়? আজ সে কোথায়?

আবার স্পষ্ট পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান আসিল—“বাবা!”

“কৈ?” বলিয়া ভুবন বাবু বিস্মিত-স্তম্বিত দৃষ্টি মেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর মূর্তির প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া রাহলেন। মাথার ভিতরটা যেন কি একরকম গোল-মাংস হইয়া গিয়াছিল, তাই এ যে তাঁহার কোন দিনের পরিচিত, কিছুতেই যেন এই কথাটাকে তিনি স্বপ্নে আনিতে পারিলেন না। বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, “কৈ তুমি?”

অভিমানিনী বিনতার বুকের ভিতর বারেকের অতিমানেরই উৎস উথলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বারেকমাত্র, তাহার পরই সে শান্ত দৃঢ়পদে পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আলোটার স্নাইচ টিপিয়া ঘরটাকে আলোকিত করিল, এবং হঠাৎ এই তীব্র আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া পিতাকে সচমকে চোখ টাকিতে দেখিয়াও সে একটুকুও না হইয়া কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্থিরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, “চোরে দেখ, বাবা! এই সইটা কি তোমার নিজের হাতের?”

ভুবনবাবুকে কৈ যেন বুকের উপর বোমা ছুড়িয়া বারিয়াছে, তিনি তেমনই ভয়ানক বিবর্ণ মুখে প্রায় আত্মনাদ করিয়া উঠিলেন, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে সবেগে উচ্চারণ করিলেন, “আবার এ কি খেলা তোমাদের!—আবার আমাকে কেন এমন ক’রে মারতে এলে তুমি?—এর মানে কি?”

বিনতা বাপের চোখের সামনে একখানা বড় ফুলকোপ কাগজ অকম্পিত হস্তে প্রসারিত রাখিয়া, তাহাতে আঁটা প্রথম সইটার উপর তেমনই অকম্পিত অঙ্গুলী রাখিয়া বাপকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল। সেই ভাবই বজ্রের রাখিয়া অস্বাভাবিক স্থির ও ধীরকণ্ঠে সে বাপের ঐ কাতর আবেদনের জবাবে উত্তর করিল, “মানে আমি তোমার এখনই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, বাবা। বেশী সময় তাতে লাগবে না, আগে তুমি শুধু ঠিক ক’রে দেখে বল দেখি, এ সই করা তোমার নিজের হাতের কি না? কৈ, তোমার চশমা কৈ? এই যে—পড় তো, বেশ ক’রে দেখ।”

ভুবনবাবু যন্ত্রচালিত পুস্তলিকার মতই তাঁহার এই চির-স্বস্তভাষিনী ও দৃঢ়প্রজ্ঞিত মেয়ের অলজ্জা আদেশ নিঃশব্দেই প্রতিগালন করিলেন, তাহার পর অনেকক্ষণ পরে কাগজের লেখা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া প্রায় অশ্রুট ও একান্ত ভয়কণ্ঠে কহিলেন, “এত আমারই।”

বিনতার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে এতটুকু একটু সঙ্কল-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ-হাস্ত উদ্ভাসিত হইবার পর-মুহূর্ত্তে তাহা তাহার ঘন মেঘাচ্ছন্নবৎ গভীর মুখের মধ্যেই নিঃশব্দে আবার লয় হইয়া গেল। সেই হাসিটুকু দেখিয়া মনে হইল, যেন একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি মুহূর্ত্তের কলকিয়া উঠিয়াছিল মাত্র।

কাগজের উপরে লেখা দ্বিতীয় সইটার উপর পুনশ্চ নিজের আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া সে আবার কহিল—“এটা?”

বারেকমাত্র বিস্মিত নেত্রের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ করিয়াই এবার ভুবনবাবু মাথা নাড়িলেন, “না—এ আমার নয়।”

তাঁহাকে যেন এতটুকু প্রশ্ন করিতে হওয়াতেই একান্ত অবসন্ন দেখাইল। তিনি ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ফেলিতে লাগিলেন। বিনতা তবুও নিবৃত্ত হইল না, সে ইহার পর পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটা ঐরূপ সইএর উপর আঙ্গুল বুলাইয়া বাপকে ক্রমাগত



ঐ একই প্রসঙ্গ করিয়া বাইতে লাগিল—“এইটে ?—এইটে ?”

নাম সব কয়টাতেই ভুবনবাবুরই সই বাটে, কিন্তু লেখার ছাঁদ ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতে হইতে সব শেষ লেখাটা একেবারেই ছাঁদের। তাহার সহিত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মিলিয়া যায়—এমনই আর একটা হাতের নাম-সই ইহার ঠিক পাশাপাশি কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই লেখাটার উপর চোখের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া আসিতেই ভুবনবাবু নিজের শরীরমনের সকল দুর্বলতাকে পরাস্ত করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন—সেই সইটা তাঁহার ছোট জামাই শুভেন্দুর।—নামও তাহার, লেখাও তাহার। এই লেখকের লেখার ছাঁদ যে ক্রমে ক্রমেই বিশেষ চেষ্টা বহুসহকারে লুপ্ত হইতে হইতে সর্বশেষ লেখাটার প্রায় ভুবন বাবুর লেখার ছাঁদে মিলাইয়া আসিয়াছে, তাহা সব কয়টা সই পর পর দেখিয়া গেলেই বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

ভুবন বাবুর সহসা বোধ হইল, তাঁহার বুকের উপর হইতে যেন ঠিক বিশ মণ ওজনের সূত্রঃসহ ভারি এক খানা পাথরের ভার হঠাৎ কে টানিয়া নামাইয়া লইয়াছে। বহুকালের শ্বাসরুদ্ধকর অসহনীয় রোগ-বিশ্রাণা অকস্মাৎ কোন দৈবী শক্তিতে যেন একটি মুহূর্তেই নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই অত্যন্তকৃত্য কিছুকণ পর্যন্ত তিনি অপরিণীত বিশ্বাসের আবেগে একটিও শঙ্কোচ্চারণ করিতেই পারিলেন না, অথবা তাল করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসও টানিয়া লইতে বা ফেলিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

বিনতা স্থির কটাক্ষে বাপের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণভেদ্য অপলক দৃষ্টি তেমনই করিয়াই সেইখানে মেলিয়া রাখিয়া অকম্পিত স্থিরত্বের সঙ্গে ডাকিল—“বাবা।”

ভুবনবাবুর সর্ব-বিস্মৃত স্বপ্ন-বিভোর চিত্ত যথার্থ সত্যের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার একবার প্রবল শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার সুশীল নিরপরাধ, তাহা সত্য বাটে। ইহার অপেক্ষা বড় কথা আর কিছুই নাই, তাঁর পক্ষে এও ঠিক। কিন্তু তাহার সে নির্দোষিতা প্রমাণ করা এখনও তাঁহার পক্ষে যে প্রায় সমানই কঠিন রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডিত করিতে হইলে, সুসময়—তাঁহার পক্ষে বতাই বাহা হউক, কিন্তু এই নির্দোষী বালিকার ওহাতে কি

দশা ঘটবে? উঃ, তবে কি, বাহা হারাইয়াছে, তাহা আর ফিরানো যাইবে না?—তাঁহার পর তিনি বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কি মহৎ, কত উচ্চ, কতই অসাধারণ চিত্ত তাঁহার ছেলে সুশীলের! পরের জন্য কত বড় ত্যাগ তাহার! আর সেই কি না এ জগতে চিরকলঙ্কিত নাম লইয়া, অসহনীয় লালিত জীবন বহন করিয়াই কি সব শেষ করিবে? এ কি অপ্রতিবিধের অবস্থা দাঁড়াইল! ইহার কি কোন উপায় নাই? এ কি নিজের প্রাণবিনিময়েও আর কোনমতে ফিরানো যায় না? কার কোন মহাপাতকের এ অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত!

বিনতা বাপের মনের লেখা তাহার কালো চোখের আলো দিয়া সুস্পষ্টরূপেই পাঠ করিতেছিল, সে তাঁহাকে বাক্য-বিমুখ ও চিন্তাবিনা দেখিয়া তাঁহার মানসিক চিন্তার প্রকৃতি অনুভবও করিয়াছিল। হাতের কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে অকুণ্ঠিত মুখে মুখ ভুলিয়া সহজ-কণ্ঠেই কহিল—“দাদার উকীলকে ডেকে পাঠাতে বলবো, না আরিই শীল ক’রে কাগজখানা তাঁকে পাঠিয়ে দেব?”

এই নির্জন ঘরের একাকিত্বের মধ্যে নিজের মনের মুখের এই কয়েকটি সহজ কথাঃ—বড় বিদ্যান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকটা এমনই বিশ্বাসাত্মক শিহরিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল, ঐ কথাগুলো যেন তাঁহার মনের মুখের নহে—তাঁহার রূপ ধরিয়া যেন কোন হৃদয়েশী নিশাচরী রাক্ষসী আসিয়া এই দুষ্ট প্রলোভনের জালটা তাঁহার উপর পাতিতে বসিয়াছে। তাঁহার যন্ত্রণাতরাতুর চিত্ত এ সব যেন আর সহিতে পারিতেছিল না, তাই দারুণ অসহিষ্ণুতার বিরক্তিতে তাঁহার মন যেন অকস্মাৎ একান্তই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন সেই আকস্মিক উৎকলিত অসহায় ক্রোধে তাঁহার যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া গেল—সেই গভীর উত্তেজনা তাঁহার দুর্বল দেহে অকস্মাৎ বল আনিয়া দিল। তিনি উঠিয়া সহজভাবে সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চ তীব্রকণ্ঠে কঠোর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, “তুই কি বলছিস, তুই কি বুঝতে পারছিস? তোর ভাইকে বাঁচাতে গেলে তোকে যে স্বাধিবাঁতিনী হ’তে, হবে, তা কি তুই ভেবে দেখেছিস, রাক্ষসি? তুই না হিন্দুর মেয়ে—তুই না সতীর মেয়ে? তোর গর্ভে না তোর স্বামীর সন্তান?”

যে পিতা জীবনে কোন দিন কখন কোন

অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধেই একটি কষ্ট বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই, যে পিতা সন্তানের সকল আদারকেই অস্তায় জানিয়াও নীরবে সহিয়া গিয়াছেন, বিবাহের অন্ত বড় মতভেদেও যাহাকে একটিবারের ■■■ রুঢ় ভাষা ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই, তাঁহার মুখ দিয়াই আজ এমন কঠিন তিরস্কার বাহির হইল! বিনতা তিরস্কৃত হইয়া একবারের ■■■ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাঁহার গভীর অনুযোগে সহসা সে মাথা হেঁট করিল। দারুণ বিষয়ে সে শুক হইয়া গেল। এই পিতৃম্নেহ-কেও সে তার এই কু-বিবাহের পর হইতে স্বামী কথার কতবার সন্ধিগত চক্ষুতে দেখিয়াছে! এই পিতৃ-বন্ধেও সে কি লজ্জার আঘাতই না প্রদান করিয়াছে! আর আজ এই যে সর্বনাশের চিতা—সেই-ই ত তাঁহার বুকে সাজাইয়া দিয়াছে—তবু সেই তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার এত বড় ত্যাগ!—উঃ, বাপ রে! না না, সে উহা সহিতে পারিবে না,—এত বড় ত্যাগ—এত বড় সহিষ্ণুতা—এত বড় নির্মম কর্তব্যপরায়ণতা তাহার মধ্যে নাই!—ওঃ!—অসম্ভব!—অসম্ভব! স্নেহের পত্র সে পিতার নিকট হইতে দেখিয়াছে, তাহার স্বপ্নে তাহার দাদাকে যুধিষ্ঠির করীর মতই দ্রষ্ট-শ্রী ও লালনা-কশাহত বত দূর বাহা করিবার, তাহা তো করিয়াছিল,—আবার কি না তাহার বাকীটুকু তাহারই স্বামী তাহাকে শোধ করিয়া দিল!—না না, না,—তাহাকে এত বড় আত্মবিসর্জন, এমন ভাবে আত্মহত্যা কখনই সে করিতে দিবে না,—দিতে পারিবে না। বরং সে নিজের মরিবে, তবু না।

বাপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া সে প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়-কণ্ঠে তাঁহার তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া জবাব দিল—“হ্যাঁ, আমি হিন্দুরই মেয়ে—আমি সতীকন্যা ও সতী-স্ত্রী, সেই জন্তেই তো আমার স্বামীকে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাই। আর এতে শুধু আমারই অধিকার আছে। তুমি না পারো,—পেরো না, আমিই সমস্ত পারবো।”—

সে ভাঁজকরা কাগজখানা আঁচলে বাঁধিয়া দৃঢ়পদে সে ঘর হইতে সে তৎক্ষণাৎ গমনোত্তম হইয়া ফিরিতে গেল। কি নির্মম, কি দার্দ্র্যাতাপূর্ণ তাহার কণ্ঠ! তাহার সে স্থির পদবিশ্বাস!

“বিনা!”—

—“বাবা!”

“এ কি করছিস্, মা? সে যে তোরই জন্ত এত

মে (খ) ২২

বড় কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল, আর আমি তোর বাপ হয়ে”—

বিনতা ফিরিয়া আসিয়া বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া শান্ত মধুরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল,—“হ্যাঁ বাবা! তুমি আমার বাপ বলেই তো আমার সহধর্মিণীর ধর্ম আমার তুমিই সহায়তা করবে। সেবারও তাই করেছিলে, অস্তায় জেনেও তো আমার সতীধর্ম বজায় রাখতে শুধু ■■■ বিয়েতে বাধা দাও নি। এবারও আমার ধর্ম আমার রাখতে দেবে—সে ছেলেমানুষ, তাই কোন্টো বড়, তা দেখতে পারিনি, কিন্তু তুমি ত সবই জানো? তুমি কেনন করে নির্দোষীকে এমন করে মারতে দেবে? মনে কর, সে বেন তোমার ছেলে নয়, কিন্তু একটা মানুষ। একটা মানুষের ■■■ তুমি আর একটা মানুষের ক্ষতি করতে তো পারো না। সে যে একান্তই অবিচার!”

বিনতা আর তিলান্বিত বিলম্ব না করিয়াই দ্বিপ্র-চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা চলিয়া গেল।

কাছের বাদামগাছে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠে শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পরই শ্রাবল গভীর পত্রান্তরের মধ্য হইতে বিকট স্বরে ‘ঝিঁ ঝিঁ’ পোকা ডাকিতে লাগিল; আকাশের গায়ে গভীরভাবে ছিটানো, কোথাও এলোমেলো ভাবে ঢালিয়া রাখা, কোথাও সূক্ষ্মভাবের সূক্ষ্মজিত আলোর বিন্দুগুলি নিজেদের অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির মধ্যে মানব-ভাগ্য-লিপির অস্তিত্ব দর্শন করিয়াই বেন তাহাদের সাধনা দিতে সুললিতরূপে কয়েকবার অধোমুখে করিয়া পড়িল। সেই নির্জন কক্ষের গাঢ় নিস্তরতা ভেদ করিয়া ভগ্ন-চিত্ত পিতার সেই কোভর্সল কণ্ঠের সমুদয় দুর্কলতা পরিহারপূর্বক বারেকমাত্র ভাসিয়া উঠিল—“চাকশি! দেবি! এ আমার যা-ই হোক, তোমার সন্তানদের সহজে আমি আজ ধস্ত হয়েছি, তুমিও তাদের গর্ভে ধারণ করায় সার্থকজন্মা হ’লে! স্মৃশীল! বিনা! আমিই সকল সন্দেহকে তোরা ক্ষমা করিস্! ভগবান্—তুমিও—ক’রো।”

শুক নিশীথিনীর অব্যাহত শান্তিধারার মধ্যে আর কোন শব্দমাত্র শুনা গেল না, সব শান্ত, সব ■■■। সব স্থির!!



## দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর শেষ আলোক ঝগিটুকুকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিতে পারে নাই, তখনও পশ্চিমগগনের আধমুখ দ্বারপথে জ্বলন্ত একটু রক্তিমচ্ছটা পৃথিবীর দিকে উকি দিয়া চাহিতেছিল। পাখীগুলি রাত্রির মত নীরব হইবার পূর্বকণে একবার তাহাদের শেষ তান ধরিয়া আসন্ন স্থপতির পূর্বে সাক্ষ্য প্রকৃতিকে একবার শব্দময়ী করিয়া তুলিতেছিল। রাজপথের জনতরঙ্গে কিন্তু তখনও কিছুমাত্র ভাঁটার টান ধরে নাই, বরং কন্দকান্ত জনসমূহের গৃহাভিমুখী চিত্তগুলি তাহাদের সকল শ্রান্তি বিস্মৃত করাইয়া শ্রবণ-গতিকে আগ্রহচপল করিয়া তুলিতেছিল। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মোটরকারের ভোঁ ভোঁ, বাইকের টুং টাং, ট্রামের ঘর্ঘর এবং তাহাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া রিক্সা গাড়ীর টুং টুং—এই সকল মিলিয়া একটা ঐক্য-তানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে দিনের আলো থাকিতেই বিদ্যুতের তীব্র আলো অনাগত রজনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নাশ হেতু তখনই জলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই ছান্নারহস্তময় কান্তিবিজড়িত অপরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া সুশীল তাহার সুগভীর চিন্তাশ্রোতে ডুবিয়া গিয়াছিল। বহু বহু দিন পরে আজ আবার সুনিবিড় মৃত্যু অন্ধকারময় গভীর যবনিকা তাহার জীবনের উপর হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া আবার তাহার পরপার হইতে অসুট সিন্ধু গোলাপী আলোকের ক্ষীণ রেখাটুকু দেখা দিয়াছে। বাথার উপর যে নিকষ কালো মেঘের স্তর জমাট বাধিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল, একটুখানি ঐ দমকা হাওয়ার বেগে তাহারই মধ্য দিয়া আবার নির্মল নীল আকাশের একটা প্রান্ত দেখা দিয়াছে। তাহার সঙ্গে সমুজ্জল সন্ধ্যাতারাও দুই একটা বুঝি ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সুশীলের অপরিচূর্ণ কিশোর জীবনের অকাল-বিরাগে বৈরাগী চিত্ত এতটুকুকেই অবলম্বন করিয়া লইয়া যেন আবার একটুখানি আশার বর্ণে অমুরজিত হইয়া উঠিতেছিল। সুলেখার চিত্ত হইতে তাহার প্রতি সন্দেহ অপসারিত হইয়াছে—সে তাহার এত বড় বিপদের মধ্যেও দেখা দিতে আসিয়াছিল, দেখিতে আসিয়াছিল; কমা করিয়া এবং কমা লইয়া গিয়াছে। আঃ!

এত বড় দুর্দশার ভিতরে আজ এই কি কম ঐশ্বর্য!—

রিক্ত নিঃশ্ব পথের ভিখারীর এ যে অমূল্য মহামণিলাভ

সুশীলের বক্ষতার বহলাংশে লঘুতর করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উখিত ■ বহির্গত হইয়া গেল। সুলেখার কমা, ইহা তো সে এত দিন ধরিয়া একান্ত ভাবে চাহিতেছিল, সে পাওয়া তাহার হইয়াও গিয়াছে—আর কিছু—আর কিছু, তা' সে পাইল বা না-ই পাইল! আর যদি কেহ তাহাকে কমা না-ই করেন, সে ক্ষম তাহার দুঃখ করিবারই বা কি আছে? করেন নাই, হয় তো সে ভালই হইয়াছে। করিলে হয় ত তাহার বাঁচিবার, কিরিবার, নিজের সুনাম সুবশ অকলঙ্কিত রাখিবার লোভ তীব্র হইয়াই হয় তো বা—হয় তো বা—দেখা দিত। হয় তো বা—হয় তো বা—এমন করিয়া অন্তরে ■ আত্মোৎসর্গ করা তখন বলাও যায় না,—হয় তো বা সম্ভবও হইত না। আর তাহার কলে? তাহার কলে সেই একই কলঙ্কে তাহার পিতৃগৃহ কলঙ্কে, অপমানে, বিবাদে ভরিয়াই উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মরিতে হইত অত্যাগিনী বিনতাকে। এ শুধু অপরাধী চরিত্রহীন সুশীলই না হয় সবার সব কলঙ্ক একত্র করিয়া লইয়া একাই মরিল! অনেক দিনই ত তাহাদের চোখে তাহার মরণ বটিয়াছে! তবে আর তাহার মরণে সেখানে বেশী কি ক্ষতি করিবে? বাহা অনাগত, তাহাই এ জগতে অসহনীয়, বাহা আসিয়া গিয়াছে, তাহা গৃহীতও হইয়াছে।

সুশীলের লঘু বক্ষ আবার একটা অক্লান্তদ মর্দাচ্ছেদী অভিমানের ব্যথার তারাক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া উঠিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া গৃহতিতির উপর ■ রক্ষা-পূর্বক কতক্ষণই সে ■ স্থির ও বৃদ্ধিতবৎ হইয়াই পড়িয়া রহিল। এই অভিমানের হাত ছাড়াইবার জন্যই সে যে নিজেকে নিঃশেষে শেষ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ইহার ত আর শেষ নাই। এ যে জন্মের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুটিকে পর্যন্ত তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিষের বাতি দিয়া অহরহঃ জ্বলাইয়া রাখিয়াছে, ইহার আর নিষেধ-মাত্র সমাপ্তি নাই। রাবণের চিতার মতই এই অনির্বাক্য অভিমানি তাহার বুকের ভিতরটাকে ছারখার করিয়া দিল, তথাপি ইহার এতটুকু তেজ ত কই করিল না!—অথবা ইহুদ পাইলে অগ্নির তেজ তো বর্জিতই হয়, কমিবেই বা কেন? তার পিতা তো কই তাকে কমা করিলেন না। অন্ততঃ সুলেখার মুখে শুনিয়া অথবা

অপরাধের জন্তও তো না? না, এই দ্বিতীয়টাই যে তার এখন প্রধান অপরাধ! যেমন করিয়া কমা করিবেন?

কারাদ্বারের অর্গলমোচন-শব্দ শ্রুত হইল, হয় তো কেহ দেখা করিতে আসিতেছে। সুশীল মুখ হইতে করাবরণমোচন করিল না। মনে মনে সে যথেষ্ট অসন্তোষ বোধ করিল। হয় তো আবার সেই সুলেখাই। সে কি তাহার সুনামকে ডরায় না? তাহার বাপ মা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন না! নতুবা জানিয়া শুনিয়া কে কাহার বরজ্ঞা অনুভব কতাকে জেলখানার ভিতর ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর সাহচর্য্য পাঠাইতে পারে? বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরের পর্দানশীন মেয়েকে। ইহা কিন্তু সুলেখার অজ্ঞান; অত্যন্ত অজ্ঞান! মরণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কি উহারা তাহাকে এতটুকু একটুখানি শাস্তির মুখ দেখিয়া ধরিতে দিবে না? কা'ল তাহার বিচার, বিচারকলে বাহা ঘটবে, সে তো সবাই জানে। চিরকলঙ্কে দেশ, ভূমি, বংশ, নাম সব ডুবাইয়া দিয়া বৎসরের পর বৎসরের পৃথিবীর আলোক হইতে অপসারণ! তাহার পর—তাহার পর আর কি? এই আনন্দময়ী, উৎসবময়ী পৃথিবীর মধ্যে তাহার সেই অনপনের কলঙ্কের কালিমালিপ্ত মুখ সে দেখাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। তবে আবার এ চিরবিদায়ের দিনে শুধু আর একটি নারীর সুনামকে সে কলঙ্কিত করিয়া যাইতে বাধ্য হয় কেন? সুশীলের মন হইল, এই জন্তই সংসারভিত্তিক যতিগণ নারীকে এড়াইয়া চলিতে আদেশ দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন। সুশীলের জীবনে এই নারীর দৃষ্টিই শুধু শনির দৃষ্টির মত তাহার সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য, সমুদয় আনন্দ-গৌরব ও ভবিষ্যৎ আশাকে গণেশের মুণ্ডের জায় নিঃশেষে শেষ করিয়া দিল। আজ এ পৃথিবীর সকল বন্ধনই যখন কাটিয়া আসিয়াছে, এখনও আবার সেই দুর্গহরুপিণী নারী তাহাকে অহুসরণ করিতে ছাড়িল না!

যে আসিয়াছিল, সে ভিতর হইতে কক্ষদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল এবং অগ্রসর হইয়া আসিয়া একেবারে সুশীলের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণামচ্ছলে তাহার পায়ের তলায় নিজেকে লুটাইয়া দিল। তখন বন্ধনত্র সুশীল সবিম্বরে অহুতব করিল, সে নিশ্চয়ই সুলেখা নহে, আর কেহ, এবং সেই বিম্বরের তাড়নায় মুখ হইতে হাত সরাইয়া সে সেই

দিকে চাহিতেই চিনিতে পারিল, এই যে একরাশি চম্পকফুলের অঞ্জলির মত তাহার পায়ের উপর হইয়াছে, সে সুলেখা নহে, নীলিমা!

দেখিয়া সুশীলের চিত্তে এক দিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি, তাহারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই আর একটা দিক ঠেলিয়া একটা গোপন উল্লাস তাহার অবসাদখিন্ন চিত্তকে একটুখানি পুলকিত করিয়া তুলিল। এইক্ষণেই সর্বপ্রথমবার যেন সে অহুতব করিল, এই নীলিমাকে সে দূরে ফেলিয়া আসিলেও, এই নীলিমা তাহাকে হৃদয় প্রত্যাখ্যান দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিলেও, বিধাতার বা ভাগ্যের কাহার অমোঘ বিধান জানি না, তাহার পরস্পরকে আর বাস্তবিকই একান্তভাবে আপনাদের জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কর্তব্য ইত্যাদি যেখানে যতই বাধা দিক, হৃদয় তাহার নিভৃত কোণে গোপনে কোন্ সময় যে এই নৈকট্য স্বীকার করিয়া বসিয়া আছে এবং সেইখানে তাহাকে অতি সজোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া বুঝি আর একবার কামনা করিতেছিল, সেই যেন এই সন্দর্শনের কলে তৃপ্ত হইল! সুশীল ইহাতে বিম্বিত হইলেও আজ আর ব্যথিত হইল না, বরং তাহার মনে হইল, তাহার পক্ষে এই বুঝি সঙ্গত! সুলেখা তাহার জীবনে চির-আদর্শ থাকিবে, কিন্তু অপরাধের কালি গারে থাকিতে সে তাহার কামনার ধন আর থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ধরিতে গেলে নীলিমাই যখন একরকমে তাহার স্ত্রী।

দুই হাতে নীলিমার পদলুপ্তিত মগ্নক ধরিয়া সুশীল তাহাকে উঠাইল। তার পর বিম্বলেশহীন বলিল—“আর একবার তোমার দেখে যাবার সাধ ছিল, তাও বাকী থাকল না দেখছি! ভাল আছি নীলিমা?”

নীলিমা সুশীলের কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিজের কথাই কহিল; বলিল,—“তুমি সে দিন আমার বা দিতে চেয়েছিলে, আজ আমি তাই আদায় করতে এসেছি, যেখানেই যাও, আমার প্রাণ্য না দিয়ে তো যেতে পাবে না”—এই বলিয়া সে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা সিন্দুর-কোটা বাহির করিয়া মৃদু-মন্দ-হাস্তম্বিত মুখে অথচ প্রায় যেন আদেশের স্বরেই কহিল, “এই থেকে একটু সিন্দুর নিয়ে আমার সীঁথের তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দাও—আর এই লোহাটা এই আমার বা-হাতে—”



“নীলিমা! এ তো ছেলেখেলা! এর কিছু দরকার আছে কি?”

নীলিমা তেমনই প্রফুল্ল স্মিতমুখে সুনীলের মুখের উপর উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নিষ্ঠা কণ্ঠে উত্তর করিল, “তোমার না থাক, আমার আছে যে! আমি নিজের পথ স্থির ক’রে নিয়েছি। তুমি জানো না বোধ হয়, ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়ী ভেঙ্গে চাপা প’ড়ে আমার বাপের মৃত্যু হয়েছে। মরবার সময় খবর পেয়ে আমি হাঁসপাতালে দেখা করি, তাঁ’র অনেক কষ্টে জমান প্রায় হাজার সাতেক টাকা তিনি আমার দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে আমি একটা স্কুল খুলবো, স্কলোচনাদি’ও আমার সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন, বাড়ীঘরের কোন আড়ম্বর আমাদের এখন থাকবে না, শুধু কাজ। হিন্দুর মেয়েদের হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য আমি প্রাণপাত করবো, যা’রা আমার মত অজ্ঞতার দোষে বা প্রলোভনাদি অশু কারনে হু’দিনের ভুলে দূরে স’রে যা’বে তাদের ফিরবার পথ দেবার জন্য একটা স্থান যাতে হয়, তা’র উপায় করবো, এর ■■■ ধনি-দরিদ্রের দ্বারে, দ্বারে ফিরে অর্থ, সামর্থ্য ও সহায়তার চেষ্টায় নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে চাই, অবশ্য নিজেকেও তা’র আগে উপযুক্ত গুরুত্ব কাছে শিক্ষা নেওয়াতে হ’বে। কিন্তু এ সবার আগে আমার নিজেকে একটু সুরক্ষিত ক’রে নেওয়ার দরকার। তাই তোমার কাছে এসেছি—”

সুনীল মস্তমুগ্ধের মত নীলিমার কথাগুলি শুনিতো-ছিল। মনে মনে তাহার প্রতি অজস্র প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ঈষৎ বিস্ময়ে সে উচ্চারণ করিল, “আমার কাছে! কি পা’বে নীলিমা! আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্চো! আমি—”

নীলিমা অকুণ্ঠিত মুখে মুহূ হাসিয়া কহিল, “আমার বা কাম্য, সে দেবার সামর্থ্য তোমার আছে, না হ’লে তাই বা আমি চাইব কেন? আমি যে কাজ নিচ্ছি, তা’তে আমার লোকসঙ্গ করতে হ’বে, এতে নিজের কুমারী পরিচয়ে বিপদ বেশী, আর কিছু বললে সে আমি পারবো না—তা’তে তোমার অকল্যাণ হ’বে, তাই আমি লোকের কাছে নিজের সধবা পরিচয়টাই প্রচার রাখতে চাই, অবশ্য তা’তে স্বামীর পরিচয় কেউই জানবে না। তাই সে দিনের সেই অসমাপ্ত কাজটা যদি আজ সেরে দাও, তা হ’লে আমার পক্ষে বড়ই উপকার করা হয়।”

সুনীলের বক্ষ ■ প্রস্তাবে সঘনে আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠও প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল—গলা ঝাড়িয়া গাঢ় স্বরে সে উত্তর করিল, “আমি তো তা তোমায় দিতে চেয়েছিলুম, নীলিমা! তখন নিলে না, এখন সেটুকু দেবার শক্তিই বা আমার কই? আমি তো আর স্বাধীন নই দেখতেই পাচ্চো।”

সিন্দুর-কোটার ঢাকনি খুলিয়া নীলিমা তাহার সামনে ধরিয়া হাসিমুখে কহিল, “যথাসাধ্য পাণিগ্রহণ, সে তো আমি তোমার কাছে চাইনি, শুধু এই সিন্দুর পরার, সধবা বলার অধিকারটুকুই মাত্র চেয়েছি, এটুকু তুমি অনায়াসেই তো দিতে পারো। আমার বাপ আমার সে দিন তোমায় দিয়েছিলেন, কাজেই সম্প্রদান এক রকম আমার হয়ে গেছে, এখন এই সিন্দুর দিয়ে আজ আমার তোমার স্ত্রী ব’লে স্বীকার ক’রে যাও, তা হ’লেই আমি জানবো, আমি তোমারই। এ জীবনে সামাজিক বা ব্যবহারিক জগতে আমি তোমার আর হ’তে পারি না—সে আমি জানি। কারণ, আমি হু’দিনের ■■■ নিজের ধর্মসমাজকে ত্যাগ ক’রে বিধর্মী হয়েছিলুম, সে তো আমার ভালবার নয়। সেই ■■■ যথাসাধ্য বিবাহ আমার তুমি করতেও পারো না—আমিও তা তোমার কাছে দাবী করি না। এই শাস্ত্রবিধিটাই সেই জন্ত আমাদের মিলন-পথের ব্যবধান হয়ে থেকে এ জন্মের মত আমাদের দুজনকে দূরে সরিয়ে রাখুক। কিন্তু আমি জানবো, আমি হিন্দু, আমি হিন্দুর স্ত্রী, আমি তোমার এবং অনাস্তরে তোমায় পা’বার তপস্শা ক’রে মরতে তো আমি পারবো? এ জন্মের ■■■ আমার একমাত্র কর্তব্য শুধু ঐ, হিন্দু কস্তাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের মর্মকথা প্রচার করা, আর পথপ্রদর্শনের পথের সীমানায় ফিরিয়ে আনা।”

সুনীল কণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিল, একবার চোখ তুলিয়া নীলিমার সমুৎসুকতার ঈষৎভেজিত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার কণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর ঈষৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে মোচন পূর্বক সিন্দুর-কোটা হইতে অঙ্গুলীতে সিন্দুর লইয়া নীলিমার তরঙ্গাক্রান্ত সুগ্রন্থ কেশরাশির মধ্যবর্তী স্থান সরল রেখাবৎ শুভ্র সীমন্ততটে তাহার অরুণাত দীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, তাহার প্রভাত-গগনের মতই সমুজ্জ্বল ললাটে বালার্কবৎ বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দিল।

তাহার পর নীলিমা নত হইয়া তাহার পারের খুলা

লইতেই সে সহসা আবেগমগ্নিত বক্ষে দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার সিন্দূরচর্চিত ক্ষুদ্র ললাটে গভীর স্নেহ প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া গভীর স্বরে কহিল, “তোমার ব্রত সফল হোক! তোমার মহৎ জীবন আমার মত ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতর কার্যের জন্তই সৃষ্টি হয়নি, তাই আমাদের মিলনে বিধাতার অভিসম্পাত রয়েছে গেল, তা থাক—কিন্তু এর পর থেকে তোমার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাগুলি চিরদিনই অফুরন্ত হয়ে থাকবে। বাহিরে আর যদি বা কখনও আমাদের দেখাও না হয়, তবু তুমি জেনে রেখ, আমি তোমার আমার জী ব’লে—শুধু তাই নয়—দেবী ব’লে মনে মনে চিরদিন ধরে পূজা ক’রে যাবো। যদি কখন আমার সামর্থ্য হয়, তোমার আরক্ত কর্ণে তোমার সহায়তাও আমি করতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু হয় তো সেটা আর সম্ভব নয়।”

নীলিমার নবসাজে সূশোভিত আরক্ত সুন্দর মুখ তাহার আত্যন্তরিক হর্ষোচ্ছ্বাসে সমুজ্জ্বলতর ও লোহিতাভ হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে গভীর বলে সংযত করিয়া সে স্নানীর পারের উপর হাত রাখিয়া মৃদু

গুঞ্জে পুলকাস্পর্শে, অথচ সঙ্কল্প-দৃঢ় স্বরে ইহার প্রত্যুত্তরে উত্তর কহিল, “তাই করো—কিন্তু আমার এই মিনতি রইল যে, সম্ভব হ’লেও শুধু আমার আর কখন তুমি দেখা দিও না। অথবা যদি দেখা-ও দাও, তবে আমার এত কাছে এসো না, আমার তোমার বেশী কাছে যেতে দিও না, হৃদয়কে দূরে দূরে সরিয়ে রেখ।—আর এই যে সম্বলটুকু আজ তুমি আমার দিবে দিলে—এ দান আমার পক্ষে এ জনের মতই যেন তোমার শেষ দান হয়—এ’ না হ’লে তো আমার সকল সঙ্কল্প কোথায় ভেসে চ’লে যাবে। শুধু তাই নয়—তাতে স্নেহের কাছে তুমি, আর সমাজের এবং ধর্মের কাছে আমি চির-অপরাধী হয়ে পড়বো! এই-বার তবে বিদায় নিই। শুধু দয়া ক’রে মনে দেখ,—আমি তোমারই জী, আর কায়মনপ্রাণে আমি হিন্দু-জীর্ন ধর্ম পালন ক’রেই জন্মটাকে কাটিয়ে যাব, কিন্তু এ জনে তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই থাকবে না, পরস্পরের কাছে আমরা এখন থেকেই চিরঅপরিচিত পর হয়ে গেলাম—আচ্ছা—এখন তবে বিদায়—”

সমাপ্ত।





# হারানো খাতা

( উপন্যাস )

শ্রীমতী অনুকম্পা দেবী

---

উৎসর্গ

শ্রীমান্ কুমারদেব মুখোপাধ্যায়

কল্যাণভাজনেষু—

পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা,

জীবনখাতার প্রতিপৃষ্ঠা অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রাখিয়া পিতৃ-পিতামহের  
পদাঙ্কানুসরণ পূর্বক অক্ষয় যশের তুল্যাংশ গ্রহণ করিও। কীর্তি দ্বারা  
চিরজীবী হও।

তোমার শুভার্থিনী

ছোট দিদি :



# হারানো খাতা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বার খোল ওগো      দ্বার খোল ওগো,  
দুয়ারে দাঁড়ায়ে দরবেশ,—  
ঘর-ছাড়া মোরে      যে করিল ওরে,  
তারই ঘর খুঁজি দেশ দেশ।

—পরিমল।

সমস্ত দিনের আমোদপ্রমোদ পরিসমাপ্ত করিয়া তখন সপারিষদ রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুর প্রমোদোত্তান পরিত্যাগপূর্বক গৃহাগমনকল্পনায় লাল কঙ্কর-বৃত্ত—ঝাউ, কামিনী, করবী এবং অরোকেরিয়া কুঞ্জছায়াসুশীতল—উত্তানপথ অতিক্রমপূর্বক ফটকের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সবেমাত্র সরসরাগজড়িত শিথিলচরণে সন্ধ্যাদেবী সেই কাননপথে নামিয়া আসিতেছেন।

বসন্তের অপকূপ সজ্জাসজ্জারে সে দিন রাজোত্তানের আগাগোড়া ভরিয়া আছে। কেয়ারি করা ঘুঁই, মল্লিকার আপাদমস্তকের সবটুকুই ফুলে ভরা—গন্ধের পিচকারী দিকে দিকে ছুটিতেছে। রাজা বাবুর বড় সাধের গোলাপ-বাগানে বর্ণ-গন্ধের সমারোহটা সব চেয়ে বেশী। টকটকে লাল ‘মন্টিকুফ,’ বহুদলযুক্ত সুবুহু ‘ভিক্টোরিয়া,’ হলুদে গোলাপ, সাদা গোলাপ এবং মোমে গড়ার মত ছোট ছোট গোলাপী গোলাপগুলি সত্য সত্যই বাগানটাকে আলো করিয়া রাখিয়াছে।

একধারে বিশেষ নামজাদা কলমের আমগাছে মুকুল দেখা দিয়াছে, ওদিকে সখের ঝিলে সাধের তরুণী “পরিমল” ভাসিতেছে; বাবুর দল এতক্ষণ উহাতেই জল-বিহার করিতেছিলেন। এদিক সেদিকে ছুচারিটা কণ্ঠিতিলকপরা উড়িয়াবাসী মালী ক্ষিপ্ৰহস্তে এগাছ ওগাছ হইতে ফুলপাতা ছিড়িয়া লইয়া বাবুদের জন্ত তোড়া প্রস্তুত করিতেছিল। রাজা বাহাদুরের বন্ধুবর্গ অন্তমনস্কভাবে অলসকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন,—

হেলা ফেলা সারাবেলা  
একি খেলা আপন মনে,—  
এই বাতাসে ফুলের বাসে  
মুখখানি কার পড়ে মনে।

ফটকের বাহিরে একখানা মটর গাড়ী ও হাতীর মত বড় কালো ঘোড়া যোতা একখানা বকমকে ল্যাণ্ডো ইহাদের আগমনপ্রতীক করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাবুদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার চামরঝুলান বুটাজরিচমকদার পোষাকপরা সহিস কোচম্যান, মায় যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গালপাট্টাওয়ালা, দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বাগানবাড়ীর দ্বারপালের আভূষিত নত হইয়া সেলাম ঠুকিল।

তখন রাজা নরেশচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“তা হ’লে নলিন! আজ বাড়ীই ফেরা থাক—সন্ধ্যাও তো হয়ে গেছে; আর এক দিন তখন তোমাদের গান শোনান যাবে, কি বলো হে?”

নলিন বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল, সেই সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোকটি ঈষৎ অভিমানভরে অন্তরিকে মুখ ফিরাইয়া ছাড়াছাড়া কথায় জবাব দিলেন, “সে আপনার অভিক্রটি। আমি জানতে কি বলবো বলুন? তবে দেখুন, সব বিষয়ের গোঁ একটা সীমা আছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনি যেন সেই সীমাটা না ছাড়িয়ে যান, এই টুকুই আমাদের মনে করিয়া দেওয়া।”—এই বলিয়া অ একজনের দিকে চাহিয়া নলিনবাবু নিজের যুক্তিটো আর একটুখানি জোর দিবার জন্তই যেন স’মানিয়া কহিলেন,—“কি বল হে ননীবাবু! বাড়াবাড়িই কি ভাল?”

ননীবাবু এইভাবে সম্বোধিত হইয়া এক বিপর্যয় বোধ করিতেছিলেন। এই লোকটি চন্দ্রের খাতুর সহিত আজীবন ধরিয়া বিপরিচিত ছিল। সকল বিষয়েরই চরমে গিয়া

ওই মানুষটির প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বা দোষ এ  
র সে জানিত, তাই ইহার বিপক্ষে মত দিতে  
ও তাহার বাধিল।

নরেশ একটু অসহিষ্ণুভাবে হাস্য করিয়া কহি-  
—“ভাবের উচ্ছ্বাসে সীমা যদি কোথাও ছাপিয়ে  
আমি তাতেও কোন দোষ দেখিনে। মাপ-  
দিয়ে মেপে মেপে যে পথচলা, তার চেয়ে আমার  
অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পার  
ওয়াও ঢের সহজ।”

কথার সুরে ও ভাবে অসন্তোষের আবেগ বুঝিয়া  
সহচরেরা নিজেদের পথ চিনিয়া লইল। ননী বলিল,  
“আমারও সেই মত। আমাদের রাজার এখন  
‘সুবমাকুটীরের’ চাইতে ‘রাণীসদনে’ হাজির হয়ে পড়া  
ঢের বেশী সঙ্গত।”

রাজার প্রবীণ বন্ধুট এতক্ষণ স্রোতের গতি পর্য্য-  
বেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; এতক্ষণে নিজের আসরে  
নামিবার সময় আগত বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া  
হাসিয়া কহিলেন,—“তা বই কি! নাতি আমার  
এখন ঘরে নূতন রাণী এনেছেন, কুটীরবাসী হ’তে  
গেলেন এখন কোন্ হুঃখে! ও সব পঢ়া পরামর্শ তুমি  
কানে তুলো না হে ভায়া, চটপট গাড়ীতে উঠে, গাড়ী  
চুটিয়ে দিয়ে একেবারে সেই পদপল্লবে গিয়ে হাজির  
ওগে। যদি ইতিমধ্যেই সেখানে মানভঞ্জনর অবস্থা  
ট উঠে থাকে, তা হ’লে সেই রাজা পা-হুটি বুক  
ল নিয়ে এমনি ক’রে গাইবে,—

‘ভাঙ্গবো বাঁশি ত্যজবো প্রাণ,  
রাধে! এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,  
নহে,—এই পারের নুপুর বেঁধে গলে—  
আমি পশিব যমুনা-জলে—’

“আরে দাদা, এ যে রীতিমত কেতন সুর ক’রে  
দিলে। তবে না হয় আর একটু ব’সে গানটার শেষ  
ব্যস্ত শোনাই যাক না।”

“ঠাকুর্দা আমাদের বত বুড় হচ্ছেন, ততই যেন  
রসের ধারা প্রাণের মধ্যে থেকে উথলে উঠে  
ডিয়ে গড়িয়ে উপচে পড়চে।”

“ঠিক বলেচ দাদা তাই। এরই জন্তেই না শিং  
এই সকল বৎসবৃন্দের মধ্যে বিরাজ কর্চি,  
চ, যৌবনের ওই সহস্র বাতির মুখ থেকে একটু  
নুঁকিও যদি উড়ে এসে এই পোড়া শল্য-  
ন গতিকে ঠেকে যায়।”

হাসিত কৌতুকহাস্তে শব্দবিরল কানন-পথ  
চুয়া উঠিল।

৫৫ (খ) ২৩

ক্ষণপরে নরেশচন্দ্র বলিলেন,—“কি গ্রহ! আজ  
কি এইখানেই রাত কাটাতে নাকি?”

ঠাকুর্দা আলস্যবিজড়িত ভঙ্গীতে কহিয়া উঠি-  
লেন, “তা যদি বলো ভায়া, তবে বলি,—তোমার  
ঠান্দির স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়ার ঘরটান তো আমার ফুটি-  
য়েই গেছে। আজ এই কুঞ্জবনটার মায়া যেন আমার  
কাটতেই চাইচে না।”

“নিকুঞ্জ কাননে রাধা শ্রামসোহাগিনী,” “আপনি  
এখন রাধাভাবে আছেন নাকি?”

“তা না হয় থাকলে,—কিন্তু এখানে তো  
অপর্যাপ্ত ফুলের গন্ধ ও মলয় সমীরণ সেবন ক’রেও  
তোমার ও রাঙ্গুসে পেট ভরবে না দাদা। সেটার  
সম্বন্ধে—”

“আঃ পাগল! তোরা এখনও নেহাৎ নাবালক  
আছিস, দেখতে পাই! ওরে হরিধন ঘোষালকে কি  
তেমনই কাঁচা ছেলে পেয়েছিস তোরা? এই  
ক্যাথিসের ব্যাগে বা ভ’রে নেওয়া গেছে, সে তোদের  
মতন চারটে জোয়ানমর্দর খোরাক। তার উপর  
এবেলা তোরা মুখুরা বখন সব্বতের গেলাসে চুমুক  
দিচ্ছিলি, আমি সেই স্বযোগে ওবেলার অবশিষ্ট তাল-  
শীস সন্দেশগুলো আর গোলাপজলভরা রসগোল্লা  
গুণ্ডা আঠেক পা ক’রে দিয়েছি।”

“শোন কথা! ঠাকুর্দা বলে কি রে? এ কুন্তকর্ণ  
দাদাটিকে ঘাড়ে নিয়ে পুষতে তাই তোমাদের মতন  
রাজারাজড়াদেরই পোষায়। আমাদের মত হাক  
কাঁধে—”

“ব্যাঃ—আমাকে কি তেমনি ছাবলা পেয়েছিস  
রে! যে আমি নিজের ভার সইবার মতন একটা  
আশ্রয়ও খুঁজে নিতে পারিনে? জান না কি,  
মাধবিকা সহকারতর ব্যতীত অপর কাহাকেও  
আশ্রয় করে না—”

আবার একটা তরল হাস্যতরঙ্গ উখিত হইয়াই  
মধ্যপথে অকস্মাৎ কিসের একটা বাধার চকিত হইয়া  
থামিয়া গেল।

ফটকের পাশেই যে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটি  
অনেকখানি স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন বিস্তৃত করিয়া দাঁড়া-  
ইয়া আছে, তাহারই ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ হইতে একটা  
আকস্মিক ক্ষৌণ্ডর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, “অনাচারে  
প্রাণ ধায়, যদি কেউ একটুখানি দয়া করেন—”

একসঙ্গে সব কয়টা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি  
সেই দিকেই ধাবিত হইল। তা, ব্যাপার এমন  
কিছুই অসাধারণ নয়। সদাসর্বদা যে রকম ছিন্ন-  
বস্ত্রপরিহিত দীন ভিখারীকে ওই রকম জাহ্নগাতেই



দেখিতে পাওয়া সম্ভব, এও ঠিক সেই একই ব্যাপার। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়পরা একটা অনশনক্রিষ্ট কঙ্কাল-শীর্ণ ভিখারী পথিক পথের ধারে দারুণ নৈদাঘ রৌদ্রের তাপদাহ কথঞ্চিৎ নিবারণার্থ গাছের ছায়ার আশ্রয়ে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে নিজের প্রবল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ধনিবৃন্দের প্রচুর ধনৈশ্বর্যের এক কণা মাত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এই তো জগৎ! সংসারের নিয়মই তো এই! সর্বৈশ্বর্যামণ্ডিত রাজসিংহাসনের পদতলে অনশনব্রত ভিখারীর ধূলিশয্যা এ তো আজ নূতন নয়। এ সংসারে জন্মিয়া এই দৃশ্যের মাঝখানেই মানুষের যে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। এ দৃশ্যে মানুষ অহরহই তো ডুবিয়া আছে। এর চেয়ে সহনীয় তাহার বলিতে গেলে আর কিছুই নাই। যে ঐশ্বর্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সে ভ্রমেও কখন মনে করে না যে, তাহার সেই সম্মানের আসন কত হুঃখার্ভের মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া রচিত। কখন ভাবিয়া দেখে না যে, যে দীন-দরিদ্রের বক্ষ আল সামান্য কীটাপুর মতই অনায়াসদর্পণতরে নিজের মোটরের চাকার তলার পিষিয়া দিয়া সে অবিচলিতভাবে চলিয়া যাইতেছে, তার সে দর্পণ শুধুই সেই অবহেলিত নগণ্যেরই কুপার দান। বস্তুতঃ দরিদ্র বড় সহিষ্ণু, সে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ধনীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়; তাই না তারা তাদের এমন করিয়া দলিতে অবসর পায়। এরা যদি একবার নিজের শক্তি বুঝিয়া ধনীর অত্যাচারের প্রতিবিধান চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তবে মহামহৈশ্বর্যময় সিংহাসনও যে সেই দারিদ্র্যশক্তির পদতলে চূর্ণিত হইয়া ধূলিধূসর হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তা হাক্ সে কথা,—সেই ভিখারীটার প্রতি নজর পড়িতেও একটা তাচ্ছিল্যভরা অধরকুঞ্জেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত, যদি না ঠিক সেই সময়েই রাজাবাবুর দ্বারবান ও পদাতিকদ্বয় রাজাবাবুকে সেই অভাগার দিকে চোখ ফিরাইতে হওয়ায় নিজেদের কর্তব্যের ক্রটিবোধে উহার ক্ষালনার্থ সেই হতভাগ্য ভিখারীর দিকে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইত।

“এই বদমাস! এই শালে! হিয়া কাহে বৈঠা হো! জলদি নিকালো হিয়াসে”—এবং ইহাতেও তাহাকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া দুইজনে তাহার দুইটা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টভাষায় “নিকালো শালে,” “ভাগো হিয়াসে,” “তু চোটা হায়,” ইত্যাদি প্রিয় সম্ভাষণও চলিতে লাগিল।

লোকটা উঠিল না, পরন্তু নিঃশব্দে মাি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়াই বড়লো- নিমকহালাল ভৃত্যবর্গের বজ্র-কঠিন হস্ত হইতে পাইল না।

“এঃ চোটা আদমি, চং দেখাতে হো—” এই যত্ননকন চৌবেজী নিজের সরল শালযষ্টিবৎ। ঈষৎ বক্র করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে গিয়া সহসা পিছনে একটা অশ্রুতপূর্ব কঠোর সম্বোধনে বিষয়ে চমকিত হইয়া কিরিয়া দেখিল সেই—“ভুকা, চৌবে, তফাৎ যাও!” বলিয়া তাং দেব অক্ষুণ্ণ মহিমার ধ্বংসকারী, স্বয়ং তাহাদের রাজা-বাবু!

ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা শিকার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নরেশচন্দ্র সেই লাক্ষিত ভিখারীটার নিকটে আসিয়া ব্যগ্র-করণকণ্ঠে বলিলেন, “এক তোমার লাগিয়ে দিয়েছে কি? আহা, তোমার দুদিন খাওয়া হয়নি বলছিলে না? এই নাও,—কিছু দিচ্ছি।”

কোন সাড়া নাই, সন্ধ্যার ছায়ার বৃক্ষপত্রের সমাবেশে ভাল করিয়া দেখা গেল না, তথাপি ষতটুকু দেখা যায়, তাহাতে বুঝা গেল যে, গাছের তলার লোকটা পড়িয়া আছে, বক্ষে তাহার স্পন্দন নাই নরেশচন্দ্রের সর্বশরীরে একটা অতর্কিত ভয়ের বে তড়িৎ হানিয়া গেল,—এই মুষ্টিভিক্ষার কা হতভাগ্যকে, মাত্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাও অপরাধে তাঁহারই অল্পপুষ্টি লোক দুইটা মাি ফেলিল নাকি?

তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে তাহার পাশেই গাড়িয়া বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া আলিতেই তাঁহার অন্তরের সমস্ত মমতাসাগর এক কালে বিমথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া যে মুখখান চোখে পড়িল, তাহা তাঁহার শরীরে মনে ঈষৎ এক অজ্ঞাত শিহরণও আনিয়া দিল।—কত ক্ষীণ, ২ পাণ্ডুর এবং কি ভীষণই সে মুখ।—উঃ কি ভীষণ! মানুষের যে তেমন মুখ হয়, তাহা যেন ইহার পু- ভাল করিয়া তাঁহার অমুভূতিই ছিল না। লহমার সেই অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া সেখানার চাক্ষিত গভীর মমতা, বেদনা এবং আতঙ্কের এই ভাবটাই তাঁহার মনে জাগিল। পরক্ষণেই চিত্তার্ণবিতের জ্বালা দগ্ধমান দ্য সম্বোধন করিয়া “জলদি পানি লে আও”— দিয়া ততোঃধিক বিস্ময়গুস্তিত বন্ধুবর্গের দিবে ডাকিলেন “করুণা! একবার এস তো”

। দেখে যাও তো ।” তাঁহার স্বরে তখন বিশ্বয়ের বর্তমান নাই ।

তার করুণানিধানবাবু সঙ্কোচের সহিত কাছে বলিলেন, “কে তার ঠিক নেই, কি রোগ আছে, কাপড়-চোপড় যাচ্ছেতাই, ওকে । করাটা কি ঠিক ?”

রশচন্দ্র কহিলেন, “তোমরা হাসপাতালের মড়া বাঁট । এ হয় তো এখনও জ্যান্ত মানুষ । একে ত দোষ কি ?”

করুণাবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে সমস্কোচে সেই ভিখারীটার হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “না, তা নয় ; —আমরা ডাক্তার, আমাদের সবই করতে হয়, সে আমি বলছি, তোমার কথাই বলছি । হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে বটে ; তবে বড়ই দুর্বল,—কিছু খেতে না পেলো বোধ হয় বেশীক্ষণ আর বাঁচতে পারবে না ।”

সত্যপ্রত্যাবৃত্ত চৌবের নিকট হইতে জলের লাটাটা লইয়া মুচ্ছিতের মুখে জলের কাপটা দিয়া, নরেশ উহাকে আদেশ করিলেন, “চৌবেজি, বহুত লুদি গরম দুধ লেআনে হোগা ।”—

হুকুম শুনিয়াই চৌবেজীর মনের উগ্ৰা বাষ্পাকারে হর হইয়া আসিল—“আরে মহারাজ ! আপ তো দে দিয়া—লেকিন হাম কাঁহাসে এতা গরম দুধ কা বন্বস্ করে ? ইয়ে আপ্কা ত্রা সহর হায় কি ধো যো—”

নরেশ বিরক্ত হইয়া কি বলিতে বাইতেই করুণাবাবু কহিলেন, “সত্যি তো এখানে একুনি দুধ পার কাথার ? তা কাজ নেই সে চেষ্টায়, আমার কাছে ক শিশি ‘স্টিমুলেট’ আছে, তাই থেকে আউসটাক ল মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই বেঁচে যাবে খন ।”

মূর্ছাহত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পাশ লিল, অল্প পরে চোখ মেলিল এবং পদাতিকের গাড়ীর লণ্ঠনের তীব্র আলোকে স্বপ্নদৃষ্টের অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল । তাহার মুখের নত হইয়া নরেশ ডাকিলেন,—“একটু বল পেলো কিছু ভাল বোধ হচ্ছে ?”

কটি ক্ষণকাল নির্বাকবিশ্বয়ে তাঁহার মুখ করিয়া পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর

ক’রে প’ড়ে থেকো,—দেখ চৌবেজি ! কাল সকালে ওকে একটু দুধ-টুধ খেতে দিতে পারবে তো ? সকালবেলা —এখন বলছি না ।”

চৌবে অসন্তোষের মধ্যেও কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল, “জি হুজুর !”

‘ব্যাস, তা হ’লেই এক রকম চালিয়ে নেবে আর কি । এসো হে রাজা, রাত হয়ে যাচ্ছে । আমাদের আজ আবার একবার বর্ষগদের ওখানে ৯টার সময় যেতেই হবে । কত হলো ? এঃ সাতটা পঁচিশ—এসো এসো ।”

নরেশচন্দ্র বহুর ব্যস্ততা গ্রাহ্য না করিয়া ভিখারীর সহিত কথা কহিয়া বলিলেন,—“দেখ, এই দরোয়ান-গুলো বড় পাজী, ওরা আর একটু হ’লেই তো তোমার মেরে ফেলেছিল, ওদের হাতে দেওয়া আর এই গাছ-তলার ফেলে দেওয়া একই কথা ; তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পারবে ? তা হ’লে দুচার দিন একটু খেয়ে দেয়ে জোর পেরে যেতে পারবে ? দেখ না একটু চেষ্টা ক’রে, যদিই পারো ।”

কথাটা শুনিয়া, নরেশচন্দ্রের সঙ্গীদের মধ্যে গভীর বিশ্বয়ের স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিয়া ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল ; আর সেই মুমূর্ষু ভিখারী— সে যেন এই অপ্রত্যাশিত অবাচিত সম্মান সহ্যহুত্বিত্তে দ্রবীভূত হইয়া তড়িৎ-স্পৃষ্টের স্থায় নিজের সকল দুর্বলতা এক মুহূর্ত্তে বিশ্বত-প্রায় হইয়া গিয়া সচমকে উঠিয়া বসিল এবং কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—“কে আপনি মশাই ? এত দয়া তো মানুষের দেখি নি ! নিশ্চয়ই ভগবান্ নিজে ভেকে আপনাকে এ হতভাগ্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।”

নরেশ চিত্রপুতলিকার স্থায় দণ্ডায়মান চৌবের দিকে ফিরিয়া আদেশ করিলেন,—“বহুনন্দন ! হাওয়াগাড়ী ইধার লেআনে কহো,—ইস্কো হঁসিয়ার হোকে সাম্না আসনপর উঠার দেও ।”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

“ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আজি এসেছি তোমারই দেশে, আমি, অতিথি তোমারই দ্বারে, ওগো বিদেশিনি !”

—রবীন্দ্রনাথ ।

পরদিন প্রভাতরক্তের সমাধাতে খবরের কাগজ হাতে লইবামাত্র গত রাত্রির সেই ভিখারী অতিথি-টার ভীষণ মুখখানা অকস্মাৎ নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে উকি মাঝিয়া গেল । মনে করিতেই সমস্ত শরীরটাই

আবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মস্তব্য রলেন,—“বাপ ! মানুষের নাড়ী এত ঠিক যেন একগাছি চুলের খাইয়ের মত নড়ছে, আছে কি না আছে । এখন ! ওহে, আজ রাতটা এইখানেই চুপ



তাহার ঈশ্বর যেন শিহরিয়া কাটা দিয়া উঠিল এবং নিরতিশয় লজ্জার সহিত মনে হইল যে, লোকে যে বলে তাঁর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি,—তা বড় মিথ্যাও নয়! সত্যই তো ওই রোগজীর্ণ ভয়ানক মূর্তি ভিখারীটাকে যেমন তাহার দ্বারবানেরা অকারণ নিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার জন্ত সেটাকে কিছু খাইতে দিয়া, দুইটা টাকা দিয়া অথবা না হয় হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তো হইতে পারিত। তা নয়, একেবারে পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলের মর্যাদা খর্ব করিয়া সেটাকে নিজেদের সঙ্গে গাড়ী চড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসা হইল। গাড়ীতে আবার সে মূর্ছিত হয়, ধরাধরি করিয়া নামাইয়া নীচের একটা ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়ান, ডাক্তার ডাকা, দুধ, বরফ, বলকারক ঔষধ এ সব তখন না করিলেও কি আর চলিত না? এ লইয়া স্ত্রী একটুখানি চটিয়া উঠিলে তাহার তাহার চেয়ে বেশী চটিয়া তাহাকে কটুবাক্যে তিরস্কার,—আবার তার পরই অর্ধ রজনীব্যাপী চেষ্টার মানভঞ্জন;—নাঃ—এতটা না করিলেও চলিত।

কিন্তু তখন যেটা না করিলে চলিত,—সেটা এখন করা হইয়া গিয়াছে,—এখন আর মনে মনে লজ্জিত হইলেও চারা নাই। যা হোক, ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিতে হইবে। লোকটাকে গাড়ী ডাকাইয়া সরকার মশাইকে সঙ্গে দিয়া হাঁসপাতালেই পাঠান যাক। মধ্যে মধ্যে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিলে কিছু টাকা দিয়া দেওয়া যাইবে।

নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

রোগী তখনও বিছানায় পড়িয়া ছিল। ঘরের সব দরজা-জানালাই বন্ধ ছিল, নরেশচন্দ্র কাছাকাছি কাছাকাছি না দেখিয়া, একহাতে নাকে সুগন্ধি ক্রমাল চাপিয়া স্বহস্তেই একটা জানালার কবাট মুক্ত করিয়া দিবামাত্র প্রভাতসূর্যের এক ঝলক কনকরশ্মি অঞ্জলিতরা স্বর্ণরেণুর মতই সেই তাপিতের শীর্ণ এবং পাণ্ডু দেহের উপর যেন উপহাসের বক্র হাসির মতই ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সেই আলোর ঝিলিক যেন ওই বিশীর্ণ আড়ষ্ট শরীরটাকে ঠেনাঠেলি করিয়া বলিতেছিল,—“এ ঘরে তুই কে’ রে? এর মধ্যে কি তোকে মানায় না কি?”

নরেশ ডাকিলেন, “কি রে, আজ কেমন আছিস?” চমকিয়া চোক মেলিয়া চাহিতেই দুজনকার চোখেই ছরকমে বিশ্বয়ের ঘন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্রের মনের মধ্যে প্রচুরতর করুণার সহিত আর যে ভাবটা অর্ধ জাগ্রত হইল, সেটাকে

ঈশ্বর ঘণা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। ভি একটিমাত্র দৃষ্টান্তসম্পন্ন নেত্রতারকায় নরেশ ও সুসজ্জমূর্তি কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসেরই আলোক করিয়াছিল।

ভিখারীর মুখে ও সর্বদেহে গভীর বঃ মুখের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ নেত্র, ললাট এ অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ঐ অংশটি কোনরূপে হইয়া গিয়া থাকিবে। জীবিত মানুষের মধ্যে ছরবস্থা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু—ওই সর্বহারা ভীষণ অগ্নিদগ্ধ মুখমণ্ডলে আরও কিছুই দেখা যায় না? যায়। বাহা দেখা যায়, বুঝি সেইটে দেখাই আরও ভয়ানক।—তাহা এই যে, এ ব্যক্তির চিরদিনই এ অবস্থা ছিল না। এক দিন সে যে মানুষের মধ্যে—শুধু তাই নয়, সুপুরুষের মধ্যেই গণ্য ছিল; সেই সক্রমণ সংবাদটুই ওই দগ্ধ উপবন তুলা মুখখানার আশে-পাশে বেদনা ব্যথিত ইন্ধিতে আজও সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। যে একটি চক্ষু আজও বর্তমান আছে, সেইটিতে বিশাল ও বুদ্ধিব্যঞ্জক বলা যায়; মস্তকের বিরল কে কি সুন্দর কুঞ্চিত! দেহ যে এক দিন সুগুঠ ও দীর্ঘায়ত ছিল, আজও তাহার করুণ ইতিহাসে অকালজরায় জর্জরিত শরীরে স্পষ্টভাবেই হইতেছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরিতে জগতের অত্যাশ্রু চাক্ষুশের ধ্বংসাবশেষ চোখে যে দর্শকের সমস্ত প্রাণটা মথিত করিয়া চক্রে স্বঃই জল আসে, বিপাতার এই উচ্চাদর্শে গঠিত মূর্তির পরিণামফল দর্শনেও তেমনই করিয়া প্রাণ কাঁদিতে থাকে। নরেশচন্দ্রের কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। তাহার আপনা-আপনি কেমন মনে হইল, আজ অবস্থার মধ্যে এ ব্যক্তিকে তিনি দেখিতেছেন। লোকের ঠিক সে অবস্থাপন্ন হইবার কথা নয়। ইহার কোন অজ্ঞাত গুরুলজ্জনজনিত পাপের কোন অজানিত দুর্ভাগ্যের অভিশাপে, দেব ছাড়িয়া এ একেবারে নরেশ্বরের ধারণ করিতে হইয়াছে। বয়সই বা ইহার কি? তাহার কম হওয়া বিচিত্র নহে। সহানুভূতি ও বিগলিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামটা কি বল তো?”

লোকটি একটু চিন্তিতভাবে নীরব র, একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস মোচন করিয়া মৃদু উত্তর করিল,—“নিরঞ্জন।”

“নিরঞ্জন,—কি? তোমরা?”

লোকটি আবার ভাবিল ও পরিশেষে কহিল  
‘বড়,—আমরা দাসগুপ্ত।’

“আমারও সেই রকম একটা ধারণা হচ্ছিল;  
আমার অবস্থা হয় ত চিরদিন এ রকম ছিল না।

দিন—উচ্চ সমাজেরই একজন ছিলাম তুমি, না?”

নিরঞ্জন একটুখানি যেন উত্তেজনার সহিত, ঈষৎ  
ধন ভীতির সঙ্গে, তাহার উপকারকের স্নেহমণ্ডিত  
মুখের দিকে চকিত হইয়া চাহিল, ত্রস্তভাবে কহিয়া  
উঠিল, “না না, ও সব কিছু অসম্ভব করতে যাবেন  
না, আমি চিরভিখারী—আমার আবার ভাল দিন  
ছিল। ওঃ! সে সব এ জন্মের নয়!”

নরেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। ইহার এই  
দৃষ্টান্তের ভাষা ভয়াবহ জীবনের মধ্যে যে তেমনই  
ভীষণ কোন একটা রহস্য নিহিত আছে, ইহা যেন  
তিনি স্পষ্টচক্ষেই দেখিতে পাইলেন। হয় তো কোন  
দৈব বিড়ম্বনা, হয় তো কোন হত্যাকাণ্ড, হয় তো বা  
রাজনৈতিক কোন কিছু—হাঁ, তাও তো বিচিত্র নয়,  
নাইটিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিডের পরিণাম  
—থাক, এ সব অসম্ভব কোনই ফল নাই, বৃথাই  
মস্তিষ্কশক্তির অপচয় মাত্র। যাই হোক, এ ব্যক্তি  
ভদ্রসন্তান, অদৃষ্টবিড়ম্বিত;—দৈবক্রমে তাহার  
স্বাস্থ্য। থাক দুটো দিন এই আশ্রয়েই, কাজ কি ইহাকে  
হাঁসপাতালে পাঠাইয়া? ডাক্তার তো বলিল যে, ইহার  
শরীরে রোগ বলিতে কিছুই নাই, সৎল যোগের মূল  
কারণ যাহা, তাহারই প্রচুরতায়ই ইহার এমত অবস্থা,  
অর্থাৎ অনাহার ও অযত্নবশতঃ সমস্ত শরীরযন্ত্রেরই  
অত্যন্ত দুর্বলতা ঘটিয়াছে। থাক দুদিন, হয় তো এ  
জীবনে বেচারী অনেক দুঃখই পাইয়াছে! হয় তো দুটো  
দিন বিশ্রামের কাল এর আসিয়াছে, সেই জন্তই হয়  
তো আমার মনেও এমন করুণা আসিয়া  
পড়িতেছে,—

চাহিয়া দেখিলেন, ক্রান্তিভরে নিরঞ্জন আবার  
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

( আমি ) অকৃতী অধম বলেও তো, কিছু  
কম ক’রে মোরে দাও নি।

—বাণী।

কয়েক দিন নিরঞ্জন শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল।  
দৈনন্দিক চিকিৎসক যথারীতিতে দুইবেলাই দর্শন  
এ। যেমন গৃহস্থানী, গৃহস্থামিনী এবং তাহাদের ভৃত্য-  
গণ শারীর-স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অকারণ জেরা করিয়া যান,

সেইরূপ যথাকর্তব্য সম্পাদনার্থ দর্শন দিয়া দু’বার  
ইহার ঘরটাকেও পারের ধূলায় বঞ্চিত করেন না।  
প্রথম দু’ এক দিন তেমন মন দিতে পারেন নাই এবং  
এই দীনহীনের একশেষ ভিক্ষুকটাকে হাঁসপাতালে  
পাঠানর জন্তও তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন। কিন্তু  
ইদানীং গৃহকর্তার রুচিপ্ৰবৃত্তি অস্বাভাবিক সে চেষ্টা  
ছাড়িয়া দিয়া উহার একটা টনিকের ব্যবস্থা  
করিয়াছেন এবং হুবেলা আসিয়াই “কি রে, একটু বল  
পাচ্ছি?” আচ্ছা, ওষুধটা যত্ন ক’রে খেয়ে যা’তো,  
দেখবি কি না কি রকম কাজ করে। নির্দোষনটা  
যা করেছি, সে একেবারে এক্সসেলেন্ট!”—ইত্যাদি  
দু’টা কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেও ক্রটি  
করেন না।

ডাক্তার বাবুর এমন অসাধারণ ঔষধ সেবনান্তেও  
যে সে হতভাগা সারিয়া উঠিতে বিলম্ব করিয়া রাজ-  
বাড়ীর ভৃত্যবর্গের গলগ্রহ হইয়া রহিল, সে যে কেবল  
তাহার জুয়াচুরী-বুদ্ধিরই খেলা, ইহাতে বামনঠাকুর,  
পেঁচোর মা বা হায়াধন খানসামা—ইহারা সর্বদা  
পরস্পরের সহিত সকল বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও  
এ বিষয়ে—সম্পূর্ণরূপেই একমত ছিল। আর ইহাদের  
নাশিক-করিয়াদ শুনিতে শুনিতে এই দুর্ভাগ্য  
অভিধিটার প্রতি, এই বাড়ীর সর্বময়ী কত্রী যিনি—  
তাহার মনটিও বেশ ভাল ছিল না। বাড়ীর গৃহিনীটির  
নাম পরিমল, বরস তাহার বাইশের উর্দ্ধে নয়; কাজেই  
সংসারের কুপোষ ইত্যাদির জন্ত মাথা ঘামাইয়া,  
তাদের চিন্তার সময় নষ্ট করা তাহার ভাল লাগা খুবই  
সম্ভব নহে। তবে দরিদ্রের প্রতি কোন অসখা বিদ্বেষ  
তাহার চিত্তে পোষিত ছিল না, সে জন্ত ঐ অশক্ত  
ভিখারীটাকে বাড়ী হইতে এখনই দূর করিয়া তাড়া-  
ইয়া দিবার কোন বিশেষ আগ্রহ যে তাহার  
মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন কথাও বলা যায়  
না। কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন?—বামুন ঠাকুরের  
দল যখন তখন ভিড় করিয়া আসিয়া রুগ্ন অসন্তোষের  
সহিত সমস্ত গলা ছাড়িয়া জানাইয়া যায়, “এমন  
করিয়া তাহাদের পরে অবিচার হইতে থাকিলে  
তাহারা তেমন চাকরীর মুখে ‘হুড়া’ জালিয়া দিয়া  
যে দিকে ছুঁচক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিয়া যাইবে।  
‘গতর’ মুখে থাকিলে চাকরীর না কি এ সহরে অভাব  
আছে? তাহারা রাজবাড়ী জানিয়া কাজে বাহান  
হইয়াছিল, ভিখারীর সেবা করা তাহাদের পেয়া নয়।  
তা’ও কি একটা সোজাসুজি ভিখারী! না আছে  
তার না’বার চাড়, না আছে তার খা’বার চাড়, ■ মা’  
এমন তো কোথাও দেখা যায় না। তুই ভিখারী



মানুষ, তোর আবার অত কেন? যা' পেলি হাঁস-  
হাঁস ক'রে গিলে-কুটে নিয়ে বর্তে যা। তা নয়,  
পাতের ভাত পাতেই প'ড়ে থাকলো, উর্ধ্বমুখে হাঁ ক'রে  
ঘরের কড়িকাঠ পানেই তাকিয়ে রইলেন, আবার মনে  
পড়িয়ে দিলে তবে থাকেন। অত কার গরজ রে  
বাপু? ওর কত কালেরই মা-বোন পাশে ব'সে ব'সে  
থাওয়াচ্ছে কি না?"

পেঁচোর মা'র গায়ের জ্বালাই সর্কাপেক্ষা অধিক।  
প্রথম যে দিন সে নিরঞ্জনকে দিয়া উচ্ছ্রিষ্ট পরিষ্কার  
করাইয়া লয়, তখন নিরঞ্জনের শরীর একান্ত দুর্বল-  
থাকাপ্রযুক্ত সে বাসন মাজিয়া উঠিয়াই পতনোন্মুখ  
হয়। কপালক্রমে কি না ঠিক সেই সময়টিতেই সেই  
স্থানে নরেশচন্দ্রের অভ্যাস ঘটিল! রাজাবাবুর  
ঘণাপিত্ত তো সবই চলিয়া গিয়াছে। ঐ কদাকার  
মুখপোড়া হনুমান্টাকে নিজে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া,  
এতটুকু বিবেচনা না করিয়াই, নিরপরাধিনী পেঁচোর  
মাকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' কি বকুনিটাই না বকি-  
লেন! শেষে হুকুম দিয়া বলিলেন, ঐ পোড়ারমুখোটা  
যখন জাতে বদ্বি, তখন ওর এঁটোকাঁটা কায়েতবাড়ীর  
দাসীচাকরে কিসের জন্তাই বা ছুঁতে না পারবে? ও  
ওকঠাকুরের মতন এবার থেকে ব'সে ব'সে গিলবে,  
আর ওর পাত কুড়োবে এই ছাই ফেলতে ভান্ডাকুলো  
কাদালের কাদাল পেঁচোর মা।—বিচারটা মশে পাঁচে  
দেখুক একবার!

এই সব নানা কথা শুনিতে শুনিতে উত্থান হইয়া  
উঠিয়া এক দিন সন্ত নাগিশের যন্ত্রণার পরক্ষণেই  
আমীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরিমল তাঁহাকে ধরিয়া বলিল,  
“অনেক দিন তো হয়ে গেল, এত দিনে অবশ্যই গায়ে  
জোর পেয়েছে, এইবার ওটাকে যেতে বল্লেই হয় না?”

নরেশ প্রথমতঃ কথাটার অর্থবোধ করিতে না  
পারায় জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই সহসা ইহার ভাবার্থ  
হৃদয়ঙ্গম হইতেই কহিয়া উঠিলেন, “কার কথা—নির-  
ঞ্জনের কথা বল্চো?”

পরিমল ক্র কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছিল্যস্বরে উত্তর  
করিল, “কি-রঞ্জন তা জানিনে, আমি ঐ হাড়-  
জালানে ভিথিরীটার কথা বল্ছিলুম। ওর জালায়  
বাড়ীর সব বি, চাকরগুলো তো জালাতন হয়ে ছেড়ে  
যতে বসেছে।”

নরেশচন্দ্রের নেত্রে বিরক্তির ঘন-ছায়া পড়িল।  
সন্তোষের সহিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন,  
দেয় কি পাকাধানে ও মৈ দিচ্ছে শুনি?”

পরিমলও কিছু উচ্ছ্রান্তভাবে কহিল, “মৈ দিচ্ছে  
কি করতে তা তারাই জানে। মোট কথা, তারা

বলেচে যে, ও যদি থাকে, তবে ও-ই থাক, আর  
আর তা হ'লে কেউ এ বাড়ীতে চাকরী কর  
থাকবো না। তা সেই কি ভাল, যে খামকা এ-  
ষে-সে ভুতুড়ে লোকের জন্তে বাড়ী শুদ্ধ সব বি-চা  
বামুনগুলো ছেড়ে চ'লে যাবে?”

নরেশচন্দ্র প্রথমতঃ রাগ করিয়া বলিলেন,  
যাগ গে! অমন সব হিংস্রটে পাজীলোকগুলো ব.  
ছাড়লেই আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।”

পরক্ষণেই সেই বিদ্রোহী পরিজনবর্গের অগ্রবর্তিনী-  
স্বরূপে গৃহিণীকে—“বেশ তবে ওকে নিয়েই থেকো”—  
এই কথা মানভরে বলিয়া গ্রন্থানোন্মুখী দেখিয়া সহসা  
বিরক্তি ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার চাবিশুদ্ধ  
আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে কহিলেন—

“এ কি! তারা যার যাবে, তা ব'লে তুমিও বাচ্চ  
কি জন্তে? তুমি তো আর পেঁচোর মা নও যে,  
তোমার তার এঁটো মাজতে হয়,—হারাদন নও যে,  
তার বিছানা পেতে দাও,—তবে, তোমার অত চটবার  
কারণটা কি, আমার বল তো?”

বস্তুতঃ হিন্দাবসত চটবার তাঁর কোন কারণই  
ছিল না। কথাটা কানে গিয়া তাই পরিমলকে ঈষৎ  
লজ্জা দিল। সে দেখাইবার মত কোন যুক্তিও না  
পাইয়া শুধু একটুখানি অপ্রতিভের মূহূর্ত্ত হাসিয়া  
সংক্ষেপে কহিয়া উঠিল—

“যেং,—আমি কেন চটবো? আমার আবার  
এতে কি? তবে অতগুলো লোক সর্বদাই ওর জন্ত  
চ'টে রয়েছে, যখন তখন চ'লে যেতে চায়, তাই, না  
হ'লে—”

নরেশ কহিলেন, “দাও না চ'লে যেতে, কেমন যার  
দেখ না। কখনো যাবে না—কখনো না; সে আমি  
হলপ ক'রে বলতে পারি। এমন দিলদরিয়া মেজাজের  
গিন্নীটি আর ওরা পাবে কোথায় যে যাবে, শুনি?  
তা নয়, ওই যে একটা গরীব মানুষ না খেটে ছবেলা  
হ' যুটো ভাত খাচ্ছে; এইটেই হয়েছে ওদের সরা-  
কার চক্ষুশূল,—তা আমি খুব জানি। যারা নিজেরা  
অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন আরও বেশী ক'রে পরকে  
অভাবের মধ্যে দেখতে ভালবাসে। তাই বা বলবো  
কি, আমার ভদ্রলোক বন্ধুত্বই তো সে দিন ওই  
আমারই চাকরের হৃদ্যবহারে মুচ্ছিত, যরণাপ-  
লোকটাকে একটু বহু দেখানর জন্ত আমার উ-  
এতই মর্শাস্তিক রকমে চটেছিলেন যে, হ'তিন f  
আমার সঙ্গে কেউ আর দেখাটি পর্যন্ত করেন f  
দেখা হ'লেও একটি কথা কন নি। অথচ স্বকণ্ঠে  
সবাই ডাক্তারের মুখ থেকে শুনেছিলেন যে,

ও যত্ন না পেলে লোকটা খুব শীঘ্রই মারা  
বে।”

শুনিয়া পরিমলের মনের মধ্যটা যেন একটা অতি  
লজ্জার কণ্টকে বিধিয়া উঠিল। ছি ছি, সেও  
প্রায় এই মমতাহীন ভদ্রাভদ্র লোকেদের সহিত  
গট হইয়া তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে  
ছিল! তাহার এতবড় করুণার সমুচিত গৌরব  
দূরে থাক, তাহাতে নিজেকে গৌরবাঘিতা মনে  
। করিয়া উঠাইয়া তাহার কার্যকে বাড়াবাড়ি বলিয়া  
অভিহিত করিয়াছে, বাধা দিতে গিয়াছে। স্বামী  
বাধা মানেন নাই বলিয়া নিজেকে তাহাতে হতমান-  
বোধে অভিমান করিয়াছে। মা গো! এমন নীচ  
মনটা তাহার কি করিয়া হইল? নিজের ইতিহাস-  
খানা তখন মন হইতে মুছিয়া কোথায় চলিয়া গিয়া-  
ছিল। যদি তাহার এই উচ্চহৃদয় স্বামীর মধ্যে এত  
বড় দরিদ্র-প্রীতি না থাকিত, তবে এই যে আজ রাণী  
পরিমলকুমারী মিত্র সর্বেশ্বর্যমণ্ডিতা হইয়া সহরের  
বুকের মাঝখানে হীরকজ্যোতির মতই ঝলমল করিতে-  
ছেন, এ কোথা হইতে হইত? আজ সে দরিদ্র  
ভিখারীর প্রতি স্বামীর অতটুকু সহনশীলতাকে ‘বাড়া-  
বাড়ি’ বলিয়া নাক সিঁটকাইতেছে, আর যে দিন সেই  
ব্যক্তি নিজের সামাজিক পদপ্রতিষ্ঠা, রূপ, যৌবন ■  
অতুল ঐশ্বর্য—জাগতিক এই সমস্ত অতুলৈশ্বর্যকে—  
ছাড় করিয়া দিয়া, শত শত রাজা, জমীদার এবং বড়  
রাজকর্মচারীর প্রলোভনীয় উপহারসমেত পরী,  
অঙ্গুরী মেয়েদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই ভিখারিনীকে  
নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সে দিন তাহার  
সেই অনন্তসাধারণ অদ্ভুত কার্যটাকে কতই না বাড়া-  
বাড়ি বলিয়া কত লোকেই না ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত  
করিয়াছিল!—সেই কথা মনে করিতেই পরিমলের  
সমস্ত মুখখানা সহসা টকটকে লাল হইয়া গিয়া গাল  
দুইটা তাহার গরম হইয়া উঠিল। স্বামীর একেবারে  
গায়ের কাছে ঘেসিয়া গিয়া সে তাহার বুকের উপর  
মাথাটা ঠেকাইয়া সলজ্জ অমৃতপ্তকণ্ঠে কহিল, “বেশ  
ফরেছ ওকে এনেছ, তুমি কার না কবে ভাল ক’রে  
থাক! তা ওরা যদি চ’লে যায় যাগ গে,—আমি নিজে  
তই সব কাজ করবো।”

নরেশ প্রীত হইয়া জীর মুখখানা দুহাতে তুলিয়া  
। স্নেহচক্ষে চাহিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলি-  
“এই তো মানুষের মতন কথা। ভয় দেখিয়ে  
বিস্ময় করিয়ে নেবে কেন?”

স্ব একসময় পরিমল স্বামীকে কাছে পাইয়া  
নিজের পূর্বকৃত অবহেলা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উহাকে একটুখানি খুসী করিতে  
চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “নিরঞ্জন একটু সেরে  
উঠছে?”

নরেশ কহিলেন, “হাঁ অনেকটা, তবে লোকটার  
স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে কি না, শীঘ্র যে  
বেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে, সে আশা মোটেই  
নেই।”

পরিমল একটু সহানুভূতি দেখাইয়া আবার কহিল,  
“ওরা বলে, ওর মুখটা না কি পুড়ে গেছে? কি ক’রে  
গেল—আহা!”

নরেশ কহিলেন, “কি ক’রে গেল, সে কথা একদিন  
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দেখেলাম, ও সব বিষয়ে কিছুই  
সে বলতে চায় না। পূর্বকথা—কোন কিছু উঠে  
পড়লেই একেবারে চুপ হয়ে যায়, কাজেই আমিও  
আর জানবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র করি নি। যাই  
হোক, কোন রকম ভয়ানক দৈব-দুর্ঘটনা যে ওর উপর  
দিয়ে ঘটে গেছে, আর তার ফলেই যে ওর আজ  
ওই ভিখারীর অবস্থা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!  
লোকটিকে আজ আমরা যা দেখছি, ও ঠিক  
তা নয়!”

পরিমল বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, “সে  
আবার কি?”

নরেশচন্দ্র ঈষৎ গভীর হইয়া কহিলেন, “সত্যি  
পরি, লোকটা বেশ বিদ্বান ছিল,—‘ছিল’ বলছি  
তার কারণ, এখন ওর মাথাটা ঠিক সহজ অবস্থায়  
নেই,—কেমন যেন একটা টলমলে ভাব। বেশী  
দুর্বলতা, কি বেশী শোক বা রোগ, অথবা ঐ  
আগুনে পোড়া,—এই রকম কোন কিছুতে ওর  
শরীরের সঙ্গে ভিতরটাকেও ঠিক অম্মনি ক’রেই  
দিয়েছে। যেমন শরীরেরও কোন কোন অংশে  
পূর্বেকার সৌন্দর্য্য, ভগ্নরূপের অন্তরালে সূর্য্যাস্থির  
মত উকি মারচে;—মনের মধ্যেও ঠিক তেমনি  
অবস্থা। সেখানেও অর্দ্ধ-সম্মোহ অর্দ্ধ-বিকলতার  
মধ্যে মধ্যে এমন একটা উচ্চশিক্ষার আভাস দেখতে  
পাচ্ছি যে, আমি তো আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কত সমস্ত  
মনে হয়, যেন কোন অভিশপ্ত ঋষি, কি রাজা, কি  
এমনিধারাই কোন একটা বড় লোক, ভাল লোক,  
আজ দুর্দশার চরমে প’ড়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে।  
তাই ওকে সরিয়ে দিতে আমার মন সরে না।”

বলিতে বলিতে ভাবপ্রবণ নরেশচন্দ্রের  
মুখটা যেন চকচকে হইয়া উঠিল, দুই চোখে সহানু-  
ভূতির বাষ্প জমিয়া উঠিল, এবং কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া  
আসিল। স্বামীর এই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত অকৃত্রিম



করণার উচ্ছ্বাসে পরিমলের মনের মধ্যেও একটা সহানুভূতির দমকা হাওয়া জোরে বহাইয়া দিল। শুনিতো শুনিতো সহসা তাহার স্বকোমল নারীচিত্ত মেহে বিগলিত বিমথিত হইয়া তাহার দুই চোখ করুণার অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিল এবং কখন যে তাহা তাহার অপরূপ গুণ বহিয়া স্রুচ্ছিন্ন মুক্তার স্রাব বরিয়া বরিয়া তাহারই কোলের উপরে পড়িতে লাগিল, সে বিষয়ে তাহার কোন হিসাবই রহিল না। মনে মনে সে স্বামীর বিশ্বাসের সমর্থন করিয়া নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল যে, এবার হইতে সেও এই বিরাটগৃহপ্রবাসী পাণ্ডববৎ-অজ্ঞাতপরিচয় লোকটির প্রতি অবিচার হইতে দিবে না, নিজেও করিবে না।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অতীত দিন স্মরি,

পড়িছে ঝরি-ঝরি,—আধিজল।

—তীর্থরেণু।

ইহার পর হইতে নিরঞ্জনর একটু একটু করিয়া কপাল ফিরিল। কর্তার প্রিয়পাত্র হওয়ার অপরাধে সে বেচারার ঔষধ, পথ্য, সেবা কিছুই সমুচিতরূপে জুটিত না; এখন কর্তার মেহলাভ ঘটয়া, তাঁহার খোঁজখবর লওয়ার গুণে সে বেচারী রাজভৃত্যবর্গের হাত এড়াইয়া কিছু কিছু সত্য সত্য ঔষধ-পথ্য লাভ করিতে থাকায় পূর্বাশ্রয় একটু সহজেই শরীরে বল পাইতে লাগিল। এমনই করিয়া কিছুদিন গেলে, একদিন নরেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বলিল, “এখন তো আমি সেরে উঠেছি, আজ্ঞা করেন তো এবার যাই।”

নরেশচন্দ্রের মুখে একটা স্বগন্ধি সিগারে আগুন জ্বলিতেছিল, সজোরে সেটাতে একটা টান দিয়া, সেটাকে দুই অঙ্গুলিমধ্যে ধরিয়া রাখিয়া, মুখমধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি বাহিরে মিশাইয়া দিয়া, তিনি ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার একটুখানি যে উদ্ভ্রা জাগিয়াছিল, তাহা ঐ নিঃপ্রাণ মধ্যাহ্নসূর্য্যে ত্রিপাদ-গ্রামী গ্রহণ লাগারই প্রভাহীন মুখখানার প্রতি চাহিতেই কণমধ্যে কীথায় চলিয়া গেল; তথাপি হয় তো একটু কঠিনস্বরেই বাহির হইয়া গেল,—“কেন, এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?”

কথাটা বোধ হয় জ্যোতার পক্ষে একটু বেশীই

কঠিন হইয়া থাকিবে। কারণ, ইহা কানে বাইবাম সে যেন বেত্রাহতের মতই চমকাইয়া এক পা পিছাই গেল এবং কিছুক্ষণ পর্যান্ত কোন উত্তর দিবার শি বোধ করি তাহার রহিল না। স্বল্পপরে সামলাইয়া লইয়া যখন কি বলিতে গেল, তত নরেশচন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজেই করিয়া ফেলিয়া উহাতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া শোধরাইয়া লইলেন। তিনি সদয়কণ্ঠেই কহিলে “আমার বাড়ীর চাকরগুলো বুঝি আবার তোমা সঙ্গে লাগতে আরম্ভ করেছে? বদমায়েসের খাড়া সব!—”

নিরঞ্জন কহিল, “তা’দের কোন দোষ নেই।—”

নরেশ কহিলেন, “তবে কা’দের আছে তাই শুনি।”

যুহু অপরাধী ভাবে নিরঞ্জন পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলা ছুঁকর বুঝিয়াও বলিয়া ফেলিল, “চিদিনই কি আপনার গলগ্রহ হ’য়ে থাকবো?”

নরেশ পুনশ্চ ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা হ’লে কি করবে শুনি?”

কি করিবে? কই, এ কথা তো নিরঞ্জন একবারটিও ভাবিবার আবশ্যক বোধ করে নাই? কি করিবে? কেমন করিয়া চলিবে? এই যে সব অতি সহজ প্রশ্ন, সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ লোকগুলার মনের ভিতর যে সবে তোলপাড় অহোরহই চলিতেছে এই লোকটির মনের খাতার পাতা হইতে ঠিক কথাটাই যেন আজ বহুদিন যাবৎ নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল। এই সোজা সরল প্রশ্নটাই যে সে নিজের মনের কাছে কোনমতে আর উত্থাপন করিতে পারে না,—এমন কি, অপরে করিলেও যেন কতকটা ভীত হয়। কিন্তু নরেশচন্দ্রের এই কথাটারই বলিবার ভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে সে যেন আজ একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নিরন্তরে মুখ নত করিয়া রহিল। যে কথার উত্তরের পুঁজি তাহার নাই, তাহারই জন্ত বৃথা চেষ্টা সে করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া নরেশচন্দ্র একটু ক্রোধের ভাবে কহিলেন; “আবার সেই রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে পড়ে মরবার প্রতীক্ষা করবে বোধ হয়?”

তারপর ইহাতেও কোন উত্তর আদায় করিতে পারিয়া একটু উত্তেজিত বিরক্তির সহিত বলিয়া উ “বলি, পরের সাহায্য নিতে এতই যদি তে আপত্তি থাকে, তা হ’লে একটা চাকরী করলেও তো হয়। ‘গলগ্রহ’ হবার দরকারই বা যায় কেন?”—

নিরঞ্জন এবার কথা কহিল, বলিল—“হু’একবার করেছিলাম,—মধ্যে মধ্যে আমার মাথার ঠিক না কি না, একবার সেই অবস্থায় যে আফিসে করতাম, তার কি কাগজপত্র নাকি নষ্ট করে তাতেই তারা বিদায় করে দেয়। আরও একটি উকীলের মুহুরীর কাজ পেয়েছিলাম ; হয়—তা ঠিক মনে নেই,—হয় তো বেশী করেছিল, কারণ, যখন থেকে মনে আছে, আমি হাঁসপাতালে ছিলাম।”

এই উত্তর পাইয়া নরেশ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল প করিয়া থাকিলেন, তার পর হাত দিয়া অদূরবর্তী গানের একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন, “এসো, এখানে বসে একটু কথাবার্তা কওয়া যাক।”—এই লিয়া পূর্বোক্ত আসনে আসন লইয়া পুরাতন আলোচনার প্রত্যাভর্তনপূর্বক পুনশ্চ কহিলেন, “আচ্ছা, শেষ চাকরী যে করেছিলে, সে কতদিন চলো?”

নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিয়া উহার কথার উত্তর দিল, “মনে হয় যেন এক বৎসর পাঁচ মাস পূর্বে।”

“এই এক বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে আর কোন কর্ম কাজই করে নি?”

নিরঞ্জন নিরন্তর রহিল। পরে কহিল, “পাগলা দর হাঁসপাতালে মাস এগার থাকবার পর তিন থেকে বেরিয়ে চেষ্টা অনেক করেছিলাম, মার এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য, এ দেখে সহজে কেউ করী দিতেই চায় না। ও ছুটিও যে পেয়েছিলাম—ও অনেক কষ্টে।”

নরেশচন্দ্রের পূর্ব-বিরক্তির সবটাই যেন এক মুহূর্তে ঘোরতর অন্ততপ্ত লজ্জায় গলিয়া পড়িয়া জল হইয়া গেল, নিজের হাত দিয়া ক্ষতচিহ্নিত শীর্ণ কথানা হাত সম্বন্ধে ধরিয়া স্নেহকরণকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আমি তোমার যদি চাকরী দিই? তা’ হলে তুমি আর ‘ঘাই ঘাই’ করবে না?”—তার পর আর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া সাহে কহিলেন, “আর ইতস্ততঃ করো না ; সেই হবে, কেমন না?”

নিরঞ্জন যুক্তকর নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তর করিল, “আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ, তাই কথা তুলেছিলাম। আপনার সেবা চিরদিন আর আপনা হ’তেই যে করতে চাওয়া উচিত

হাসিয়া উঠিলেন, তাহার সেই শিশুর মত সু-উচ্চ হাস্যধ্বনিতে, পার্শ্ববর্তী ঝুম্‌কালতার বিতান-মধ্যে যে একটা পালিত হরিণ কচি ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিবিষ্ট ছিল, সেটা চকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তিনি ইহা আমলেই না আনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “দেখ তাই নিরঞ্জন! এখন ও সব একটা ফাসান উঠেছে বটে, আর অনেক গ্রাজুয়েট দোকানদার,—গ্রাজুয়েট কুলির কথাও শোনা গেছে ;—কিন্তু গ্রাজুয়েট সেবক নিয়ে আমি তো তাই মারাই যাব। নাঃ! ও সব সেবা-টেবার কথা নয়। তার চেয়েও একটা বড় শক্ত কাজে আমি তোমার জুড়ে দেবো মনে করেছি। দেখ, তখন কিন্তু মনে মনে আমার গাল দিও না তাই,—”

নিরঞ্জনের স্বাভাবিক স্নান ও বিমর্ষ মুখে ঈষৎ হাসির তড়িৎ চমকিয়া গেল। সে কহিল, “আমার আপনি যা করাবেন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।”

নরেশচন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, “দেখা যাবে নিক, সেখানে অনেক-বড় বড় হাতী তলিয়ে গেছে। সে বড় বিষম ঠাই।”

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবৈভব, হায় গো, সে সব চক্রের মত ঘোরে ;  
কখন তোমার, কখন আমার, স্থির নহে কারো ঘরে।  
—তীর্থরেণু।

নিরঞ্জন এ বাড়ীতে থাকিয়া গেল। শুধু থাকাই নয়—বাড়ীর আশ্রিত হিসাবে নহে,—কর্মচারী হিসাবে যে রহিল, সে সংবাদটাও উছ রহিল না। তা এ সমাচারটা গোপন না থাকাই শুভকলপ্রদ হইয়াছিল। যতক্ষণ কপর্দকহীন ভিখারী নিরঞ্জন এই সুবিপুল রাজবাটীর একটি প্রান্তে অর্দ্ধমৃত্যাবস্থায় পড়িয়া ছিল, ততক্ষণই তাহার ঔষধপথ্য সেবার সর্ব-বিধ বিশৃঙ্খলা খটিতে পাইয়াছে। কিন্তু এখন তো আর সেই দীনাতীর্ন্যবস্থা নিরঞ্জনের থাকিতেছে না, তাই সংসারক্ষেত্রেও তাহার মূল্য একটা নির্দিষ্ট হিসাবে স্থির হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে তেমন করিয়া অযত্ন অগ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা নিশ্চিত! কারণ, এখন হইতে তাহার কাছে মাস-কাবারে মাঝে মাঝে কিছু বখশিস চাহিলে পাওয়া যাইতে না পারে, এমনও নয়। আবশ্যক অনাবশ্যকে দু-এক টাকা কর্জ লইয়া সুদ তো নয়ই, শোধও



না দিলে চলিয়া যায়।—ইত্যাদিরূপ অনেক স্ফোৰ্গ পাওয়া অসম্ভব বা অসম্ভবতই বা এমন কি? বামুন ঠাকুরের দল প্রথম এই খবরটা শুনিয়া দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে নাসিকা অনেক উচুে তুলিয়া প্রস্ফলিত ছড়া কাটিয়া—‘যত ছিল নেড়া-বুনে, সবাই হলো কীৰ্ত্তনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খতাল।’—ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গহাস্তে রান্না-মহলটা ফাটাইতে চাহিলেও—পূর্বোক্ত বুদ্ধিগুলি মাথায় ঢুকিয়া শীঘ্রই তাহাদের পাকা মস্তিষ্ক মত গম্ভীর করিয়া আনিল।

হারাদেন বলিল, “তা যাই বল, আর যাই কও সৰ্ব্ব-ঠাকুর, মুখপোড়াটা এ দিকে লোকটা ভাল আছে, ওটাকে হাতে রাখতে পারলে মন্দ হ’তো না।”

অমনি সকলকারই মাথায় চট করিয়া কন্দিটা খাটিয়া গেল। সৰ্ব্ব-ঠাকুর হারাদেনের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে একমত হইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছিস্ রে হারু, পোড়ামুখোটা হাঁদা গোছের আছে, কে জানে ওটার অমন পাঁতা চাপা কপাল! ভিক্ষে করতে এসে যে সভাপণ্ডিত হয়ে বসবে, তা’কি ছাই জানি, তা হ’লে কি গোড়া থেকে অমন ক’রে তুচ্ছ করতে যাই? আহা হা, বড় ভুলটাই হয়ে গেছে রে! এখন যে হাতে কামড়াতে ইচ্ছে করতে!”

হারাদেন মুখ সিটকাইয়া কহিল, “বামনাই বুদ্ধি এমনিই বটে! তুচ্ছ করেচি তো হয়েছে কি? আজ থেকে অ-তুচ্ছ করতে লেগে যাও না কেনে! ওর যদি অত কথার হুঁস থাকবে, তা হ’লে পাতে বসে’ তিনটে বেরালে ভাগ বসায়? দেখতে পাও না, কি রকম যেন আলাভোলা।”

সৰ্ব্ব-ঠাকুর নরসুন্দর-নন্দনের এ বুদ্ধিটাকেও সমীচীন বুঝিয়া হঠাৎ তাহাতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, “তা বটে! তা হ্যাঁ রে হারু, ও মানুষকে আবার রাজাবাবু কি চাকরী দেবে বল দেখি? ওই তেঁরূপ, আর ওই তো বুদ্ধি!”

হারাদেনের পূর্বেই বাবুর খাস খানসামা ইহাদের চেয়ে পুরাতন দলের সাতকড়ের সেখানে আবির্ভাব ঘটয়াছিল এবং তাহার কর্ণেও সৰ্ব্ব-ঠাকুরের শেষ প্রশ্ন ও মন্তব্যটা প্রবেশ করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ তীব্রব্যঙ্গে ইহার একটা উত্তরও দিয়া দিল, বলিল—“আমাদের রাজা সাহেবের ভাত পেটে পড়লে, অনেকেরই পোড়া রূপ তাজা হয়ে ওঠে। সে তোরা না দেখে থাকিস্ না দেখতে পারিস্। এই সাতকড়ের সে সবই দেখা আছে রে! অনেক জানোয়ার আছে না, যারা উচুতে উঠতে পেলোও, তাঁদের নজর

উপরের দিকে উঠতে চায় না?—জানিস্ না, দেব মুনিবেরও যে ঠিক সেই দশা!”

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষরূপ তীব্র নিহিত ছিল, সে তৎক্ষণে সন্ধান এ বাড়ীর দাসীদের কাহারও কাছেই অজ্ঞাত নয়, তা নূতন আগন্তুক হোক না কেন। তা সেই স্বরণ করিয়া সকলেই তখন একটু একটু হাসি হাসিয়া লইল।

রান্নাঘরের বি পৈচোর মা বলিল, “ঠিক ব হিস রে সেতো! একটা বাক্যের মতন বাক্য ব, করেছিস্!—সত্যি—বলি, বড়লোক তুমি, বড়লোকের মতন রুচি পিয়বিত্তি হয় না কেনে? দেখেওচি আর শুনেওচি, কত বড় বড় লোক রূপসী-রূপসী মেয়ে নিয়ে দোরে ব’সে হতো দিয়েছে, তা সে সব তখন চক্ষের কোণ ভুলেও চেয়ে দেখলে না, একটা কোথা-কার বাইজী না কি, মোছলমান না রিহদী—তাকেই নিয়ে মাথার মনি ক’রে রাখলে। তারই জন্তে ঘর-বাড়ী, সোনাদানা, গাভী, পাক্কি, কি ছিটি! তা সেও নয় বুঝলুম বাপু বড় লোকের ছেলের অমন হয়ে থাকে, তা ওতে তাদের অত দোষ না। ভগমান ভোগ করতে দিয়েচেন, করবে না?—তা তা নিয়েই থাক, না হয় ও বা আছে তা’ আছি, ওরই সৎ একটা বড় দেখে জমীদার রাজা-টাকার ঘর থেকে ক’রে নিয়ে আর, যে পাঁচজনে দেখে শুনে ধস্তি করুক। পাঁচটা তত্ত্ব-তাবাস আশুক বাক, কু, সাক্ষেৎ আনাগোনা করুক। আমরাও গরীব-দুঃ লোক—ছুটো পরসার পেতোশা ক’রেই না এসেছি এ বড় মানুষের দোরে, তা পাই না হয় টাকাটা সিকেটা! ওমা, এ কোথাকার একটা পথেকুড়ুনো ধুসধাড়ী কালো মেয়ে ধ’রে এনে কি না তাকেই একেবারে রাজ্যিপাটে বসিয়ে দিলে। ষুঁটেবুড়ুনী হলো পাটরাণী। অবাক কাও মা!”

সকলেই এই স্তম্ভব্যে মুখ মুচকিয়া হাসিল।

সাতকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুই আ অবাক কাও’র দেখলি কি রে মাগি! যে অমন গালে হাত দিয়ে বসলি? সে যদি কেউ থাকে তো সে এই বোষের পো সাতকড়ে।—তা হ’লে শোন;—সে এক অজ পাড়ার্গা, চা’ তার জঙ্গল আর জঙ্গল; দিনের বেলা জঙ্গলে হয় হয় ক’রে শেরাল ডাকে, রোতে প্রাণটি হাতে নিয়ে পিলীমটি সামনে ক’রে স জেগে কাটাতে হয়,—কি না কখন বাথ রক্তটুকু না চুমুক মেয়ে চুসে খেয়ে যায়।

রী-বাড়ীর ভাঙ্গা চোরা দরজাগুলো ভররাত  
ধর বাচ্চারা এসে ঢক ঢক ঢক ঢক ক'রে নাড়া  
চাচ্ছে! বাব্বাঃ! সে কি দেশ, না সে দেশে  
দুদর নোকের ছেলের পা দেয়? তা আমাদের  
কলি কি না বিপরীত কাণ্ড!—ওয়ার বাপ-  
দেবও বোধ করি ওয়ারই মতন কুচি  
ছিল, তাই সেই দেশে গেছিলেন তারা  
জমী কিনতে।—তা তাই, তাই বা বলবো কি  
শুনেছি নাকি—সেখানের একটা বুড়ো প্রজার  
ই আমার শোনা—ওয়ার ঠাকুর্দা নাকি বড়ই  
গরীব ছিল, ওই অঞ্চলেরই কোন্ এক বড় লোকের  
বাড়ী না কি সে গোমস্তাগিরি ক'রে খেতো। তারপর  
ওরই হাত দিয়ে কি রকম ক'রে গোলমাল হয়ে না কি  
গানের ঐ সব জমীদারী লাটে চ'ড়ে যায়, আর  
বনামীতে ও নিজেই না কি সেই সব কিনে টিনে নেয়।  
এত বড় অধম্যে লোক ওরা।”

শ্রোতৃবৃন্দ মহোৎসাহে সাতকড়ির বর্ণিত মানব-  
জ্বলের কুৎসা শুনিতেছিল। শ্রোতৃদলের মধ্য হইতে  
পেঁচোর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “তা  
না গা, ওদের সেই জমীদার মনিবের কি হ'লো গা?  
আ বোধ করি খুব গরীব হয়ে গেল? তাদের এখন  
আছে গা?”

“শোন একবার ঝাকা মাগীর ঝাকামী কথা!  
র কে আছে, তারা কি খায়. গাছতলায় শুতো  
ড়ে বেঁধে নিয়েছিলো,—সে-সব ফিরিস্তি না কি  
আ কাছে তারা রাখিল ক'রে দিয়ে গেছে! আমি  
কি জানি রে বাপু? গরীব তারা অবিস্তি হলো  
ই কি! তবে খেতে না পেয়ে মরেই গেল, কি কম  
মখে জ্বান্তো রইলো, সে ইতিহাসের পুঁথিটা  
আমার পড়া নেই। এদের কথাটাই সেই ‘শেয়াল  
জার’ দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম, তাই তোদের  
ছে বলুম,—দেখিস্ তাই, যেন কারু কাছে গল্প  
র বেড়াতে যাস্নে সব! যে তোরা কানপাতলা  
বাপু, একটা কথা তো কারুর পেটেই থাকে  
—ওই যে ছোট দিকের একটা টান আছে না,  
ও তো ঐ কথাই বল্ছিলি কি না—তা সেটা  
কোথেকে, সেই কথাটাই তোদের শুনিয়ে  
বলি? কিন্তু খবরদার! পাঁচ কান যেন না

সুরে এবং চাহনির মধ্য দিয়া মনিববংশের  
বন্ধীয় অনেকখানি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া  
রদিকের হাশু-কৌতুকের সহিত যোগ  
ই সাতকড়ি তাহাদের শুনিবারও বটে,

আবার নিজের বলিবার আগ্রহেও বটে পূর্বকথিত  
কাহিনীর অ-কথিত অংশটা পুনরাবৃত্ত করিল,—

“হ্যাঁ তার পর, হ্যাঁ, দেখ গে, কি বলে গে, বলছিলুম  
কি না—সেই তো দেশ, তা সে অঞ্চলে ওর ঠাকুর্দা  
যখন জমীদার হয়, তখন ওদের আমদানী না কি এর  
সিকির সিকিও ছিল না, ও দিকটা তখন আরও বন-  
বাদাড় ছিল কি না, বাকে বলে সেই ‘অজাগরবিজ্ঞ’ বন।  
তা'ছাড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলা ছিল, খানিকটে  
নাকি নদীর গর্ভে ডুবেই ছিল। ওদের কপালগুলো  
বড়ই জোরালো কি না, হঠাৎ দুটো নদীর স্রোত  
ফিরে গেল,—একটা বেঁকে এসে ওদের জমীদারীর  
পাশ দিয়ে বয়ে চ'লে গেল, তাতে নাকি একদিকে  
ডের আবাদী জমীর সৃষ্টি হলো, আর একদিকে বড়  
বড় সেগুন গাছের চালানের ভারি সুবিধা হয়ে গেল।  
আর একটা নদীর অস্ত্রও কি সব সুযোগ পাওয়ার  
জায়গায় জায়গায় বন আবাদ ক'রে লোক বসিয়ে গাঁ  
সব তৈরী হলো, এই ক'রে নাকি যেখানে  
দু'হাজার ছিল, সেখানে ছত্রিশ হাজার টাকা  
আর দাঁড়ালো। এমনি ক'রে ক'রে ক্রমেই আরও কত  
বেড়ে উঠেছে তা কে জানে? শুন্তে পাই, দুলাধ  
টাকারও উপরে। যাই হোক, বেশীর ভাগ জমীদারের  
জমীদারীই নাকি এই রকমের। শুনেচি, ওদের মধ্যের  
কেউ কেউ নাকি আগে ডাকাত পুষেছে, কেউ  
মনিব ঠকিয়েছে, কেউ কেউ সরকারকে বড় বড়  
রাজতুল্যের সাহায্য ক'রে নিজেরা বড় মানুষ হয়ে  
গেছে। তা এদেরই বা শুধু শুধু দুবলে হবে কেন?  
আবার সে দিন সরকার মশাই বল্ছেন যে, এখন  
আবার অনেকে পুলিশে গোয়েন্দাগিরি করে, খুনীর  
হাতে খুন হয়ে বউ ছেলেকে জমীদার ক'রেও নাকি  
দিয়ে যাচ্ছে! সংসারে কত রকমই যে আছে।”

ইতিমধ্যে বাসনমাজা বি মোহিনীর অভ্যুদয়  
হইয়াছিল, সে মুগ্ধ হইয়া মত্তব্য করিল, “আহা!  
সাতকড়ি আমাদের কত সবই না জানে!”

পেঁচোর মা এই আকস্মিক রসভঞ্জে মহা বিরক্ত  
হইয়া উঠিয়া তাহার পেঁচার মত চোখ দুইটা তেমনি  
করিয়াই পাকাইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া  
উঠিল, “ভদ্র নোকের সঙ্গে সঙ্গে চারটে কালই দেশ  
বিদেশে ঘুরছে, ও না জান্বেই বা কেন্ না? নে'  
দাদা সাতু, তুই ও সব কথা কান দিসনে, তাই,  
ব'লে যা, যা বল্ছিলি। তার পর?—”

মোহিনী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার তুলিল, “আ গেল  
যা, একটা কথা ক'রে মাতুর কয়েচি, না মাগী অমনি  
আগুনখাকীর ~~বলি~~ যেন ছুটে দারুতে এলো! বলি,



সাতকড়িকে বলিচি তো তোর অত গায়ের জ্বালা হলো কেন বল তো? কেন তোর একবার সাতকড়ি নাকি যে, কাকুর একটা ভাল মন্দ কথা কইবার ঘো নেই, অমনি তোমার গায়ে ফোঁকা পড়ে যায়?”

তখন আর যায় কোথা? রণজ্জ্বার দিয়া প্রায় “বুদ্ধ দেহি” ভাবে ফিরিয়া পৈঁচোর মা দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল, “আ মর মাগি! গতরের মাথা খেয়ে শুধু শুধু কি না গায়ে পড়ে এলো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! আচ্ছা আর, তবে একবার ভাল ক’রে দেখে নিচ্ছি, কত বড় তুই, আর কত বড় তোর মুখ; আর একবার আজ দেখচি তোকে—”

অদূর হইতে একটা হাঁক আসিল, “সাতকড়ি! রাজাবাবু তোমায় লীগগির করে ডাকচেন।”

নিভান্ত ভাল মানুষের মত মুখটি করিয়া সাতকড়িও হাঁকিয়া উত্তর করিল, “আজ্ঞে, এই যাচ্ছি—” কোন্দল-পরায়ণদের দিকে চাহিয়া একটু দুঃখিতভাবে কহিয়া গেল, “নিজেদের দোষেই তোরা গল্পটা শেষ করতে দিলি নি, তা না দি’গে যা, মরগে যা ছুটাতে খাওয়া-খাওয়ি ক’রে, এর পর সাতদিন খোসামোদ না করিয়ে তো আর বলবো না।”

এই বলিয়া সে প্রস্থিত হইল।

পিছন হইতে কোপকল্পকল্পারে মোহিনী চৈঁচাইয়া কহিল, “বলুনি তো সেই ভয়ে আমি ম’রে রইলুম আর কি! কি তোর এমন মহাভারত না ভাগবত যে, সে না কানে গেলে নরকে পচে ম’রে থাকবো? খোসামোদ যে করতে জানে, সে-ই ভাল ক’রে করবে এখন; আমরা যদি খোসামোদ করা জানতুম রে, তা হ’লে তোর কেন, তোর মূনিবেরই করতুম। ছেরকালটা ধ’রে না লীত, না গ্রীষ্মি বাসন মেজে মেজে মরতুম না রে।”

পৈঁচোর মা ছুই পাকান চোখে মোহিনীকে ভ্রম করিবার মত আগুন ভরিয়া খোঁপাখোলা এলোচুল আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দাঁত কিড়মিড় করিয়া হুকার ছাড়িল—“দেখ মোহী আবাগী! অমন ক’রে ভাল মানুষদের পেছনে লাগিস্নে বল্চি! কেন, আমি কি তোর বুকে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি নাকি যে, যখন তখন তুই আমায় ঠোঁকর মেরে কথা কইতে আসিস্?”

নিরঞ্জনর চাকরী হইয়াছে, সে খবর এ বাড়ীর বাসিন্দারা এবং যাহারা এ সংসারের সহিত আসা যাওয়া করিত, তাহারা সকলেই জানিল বটে, কিন্তু কি চাকরী যে তাহার হইল, সে খবরটায় যেমন তাহারা পাঁচজনে,—তেমনি নিরঞ্জন নিজে শুদ্ধ

অজ্ঞই রহিয়া গেল এবং তা অমন প্রায় দিন এই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া কাটিল। চাকরী নিরঞ্জনর মনটা একটুখানি প্রকল হইল কিন্তু ফলে দেখা গেল, চাকরীর মধ্যে যে সেই আশ্রয়দাতার বাড়ীর নীচের তলা এই বিশেষ ঘরের মধ্যের নির্দিষ্ট বিছানাটি পড়িয়া অফুরন্ত দুঃখময় চিন্তা-শ্রোতের মত যাওয়া অথবা সেই ঘরের কড়িকাঠ কয়খানায় রাখা,—এ ভিন্ন তো কই তাহার কর্ম-জী কোন সফলতাই দেখা দিল না। আরও দুই দিন অপেক্ষা করিয়া করিয়া একদিন নরেশচন্দ্রে নাগাল পাইয়া সে সসঙ্কোচে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় তো কোন কাজই দেওয়া হ’ল না?”

নরেশ তখন কি কাজে তাঁহার স্বভাবজাত অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতেই মগ্ন থাকিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “ব্যস্ত হইয়া না, ছদ্দিনেই সংসারের কর্ম-শ্রোতে তাঁটা পড়ে যাবে না, কাজ ঠিক থাকবে।”

নিরঞ্জন কিছু বলিবার জন্ত মুখ খুলিতে গিয় আবার বন্ধ করিয়া ফেলিল। কি জানি, বোঁ নীড়ন করিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে হয় সে সেটা আদায় হওয়া অধিকতর দুর্ঘট হইয়া পড় নেহাৎ বিচিত্র নয়! বাবুর যে মেজাজের পনি সে পাইয়াছে, তাহাতে আর যতই ভাল হি থাক না কেন, একটা যে খেয়ালের খেলাও অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, সেটাও অস্পষ্ট ন কেহ জোর করিয়া ‘হাঁ’ বলিলে তাঁহাকে প্রাণ তেমনি জ্বিদের সঙ্গে ‘না’ বলিতে বাধ্য করা হয়, অতএব যেখানে আগ্রহ অধিক, সেখানে অনাগ্রহই কার্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাটা কিছু সম্ভব বটে।

সে নীরবে ফিরিতেছিল, নরেশ ডাকিলেন, “ও নিরঞ্জন শোন,—শোন—”

নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়া রহিল। নরেশ একতারা কাগজ দেখাইয়া কহিল “আমার এই পিপড়ের ঠ্যাং লেখাগুলোকে বুঝে; এর একটা “ফেরার কপি” করতে পারবে?”

হারানিধি বা ওম্নি কিছু কুড়াইয়া মানুষের মুখের যে ভাব হয়, ঠিক তেমনিভর ফুলমুখে নিরঞ্জন তাহার স্বাভাবিক শিথিল গতিকে যৌবনোত্তমপরিপূর্ণ করিয়া এক রকম ছোঁ মারিয়াই যেন নড়ে হইতে সেই কোণ-গাঁথা ফুলক্ষেপ কাগজ লইল এবং সাগ্রহে তদুপরি নিজের নি

স্থিত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে যে হস্তাক্ষর  
স্থিত ছিল, তাহাকে কদর্যা বলিলেও খুব মিথ্যা  
না বলা হয় না। এ বিষয়ে নরেশের মন্তব্যটাকে  
নয় বলিয়া ভ্রম করিবার কিছুমাত্র কারণই বিদ্যমান  
না। কিন্তু বহুকালের অনাবৃষ্টির পর সামান্য এক  
গা জলেও যেমন প্রকৃতির সমস্ত স্নানতা ধুইয়া  
তাহাকে চিকণ ও স্ফামল দেখায়, নিরঞ্জনেরও  
এইরূপ কর্মবন্ধনবিহীন ছন্দছাড়া জীবনের সমুদয়  
এলোমেলো গ্রন্থিগুলো যেন এতটুকু কাজের নাগাল  
পাওয়াতেই একটি ক্ষণের ভিতরে সংযত ও সুসংহত  
হইয়া উঠিল। সে আর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা  
মাত্র না করিয়াই একখানা চৌকী লইয়া বসিয়া  
সাদা কাগজ কয়খানা টানিয়া লইল।

সে দিন অপরাহ্নে পরিমল যখন তার বৈকালিক  
বেশভূষা সমাধা করিয়া আনিয়াছে, তেমন সময়ে  
তাহার নিজস্ব দাসী অন্নদা আসিয়া জানাইল,  
রাজাবাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। পরিমল আসিয়া  
দেখিল, নরেশ কয়েকখানা বই-হাতে তাহার প্রতীক্ষা  
করিতেছেন।

“কি এ গুলো? নতুন কোন গল্পের বই  
বেরিয়েছে বুঝি? তা বাঁধানর এমন ছিরি কেন?”  
—বলিয়া উহারই একখানা টানিয়া লইয়াই পরিমল  
ঠোট উন্টাইল—“ও হরি! আবার এই মাথামুণ্ড  
নিরে আসা হয়েছে? আমি তো বলেছি যে, এ সব  
আর আমার দ্বারা হচ্ছে টাচেনা। মা গো, বড়  
হয় মস্তে যাচ্ছি, এখনও কি না রয়েলরিডার নম্বর  
খার্ড পড়া!”

নরেশচন্দ্র হাসিলেন, “ওর চেয়ে যে আর ওপোরে  
উঠতে পারলে না সৈ! আমার কি সাধ যে  
চারকাল ধরেই তুমি কচি খুকীর পড়া পড়ো?  
না, এবার এই ‘রাজকীর পঠনা’র গভী তোমায়  
পার হ’তেই হবে, পরি!”

পরিমল বই কয়খানা সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া  
দিয়া স্বামীর প্রশস্ত স্থল স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া  
আবদার করিয়া বলিল, “ও আমি আর পড়বো না।”

“কেন পরি?”

“বুড় বয়েসে আর অত শেখা যায় না। দেখলে  
তা, পারলুম না।”

নরেশ বলিলেন, “দেখ, তা’ যদি বলো, তা হ’লে  
যে হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি  
বুড় বয়েসে সামান্য একটু লেখাপড়া শেখা সে  
কিছুই নয়, একেবারে আগা থেকে পাক্সলা  
বিবি ব’নে যেতে পারা যায়।”

পরিমল স্বামীর কথার হাসিয়া ফেলিল, তার  
পর ঈষৎ গভীর হইয়া উঠিয়া বিষম্বরে কহিল,  
“তারা বোধ হয় আমার মতন পাড়ারগেয়ে গরীব  
ঘরের মেয়ে নয়, তাই পারে।”

নরেশ কহিলেন, “তা’ নয় পরি, ও তুমি একে-  
বারে ভুল করলে। অজ পাড়ারগেয়ের ছেলে-  
মেয়েরা সহরে এলে যত বড় সহরে হয়ে ওঠে,  
সহরের বুকের মধ্যে সাতপুরুষে বাস ক’রে থেকেও  
তার সিকিটুকুও পারা যায় না। সংক্রামক রোগের  
মধ্যে সর্বদা যারা বাস করে, তাদের চাইতে  
বাইরের লোকদেরই সংক্রামিত হওয়ার ভয় বেশী  
কি না। যাক, ও সব তর্কাতর্কি তুলে রেখে দাও,  
তোমায় আমি এম্, এ, বি-এল পাশ ক’রে হাইকোর্টে  
ব্যারিষ্টারীর দরখাস্ত পাঠাতেও অস্বীকার করছি, আর  
বিলাত ঘুরতেও নিয়ে যাচ্চিনে;—মাত্র  
খামের উপর চিঠির ঠিকানাটা লেখা, বা ছোট  
ছেলে-মেয়েদের অক্ষর-পরিচয়টা করাবার মতন  
পুঁজিটুকু পর্যন্ত না রাখলে চলবে কেন বল  
তো? এতটুকু চাওয়ারও কি আমার যোগ্যতা  
নাই?”

পরিমলের গাল দুটি ঈষৎ একটু রাঙা হইয়া  
আসিল। নতমুখে সে যত্নস্বরে উত্তর দিল, “চিঠি  
লেখবার তো আমার অনেকই আছে। আর  
ছোট ছেলে—তা যদি ঈশ্বর আমাদের দেন, তাদের  
শেখাবার লোকের এ বাড়ীতে কোন অভাব হবে  
না।”

“আহা, ঐখানেই যে তোমাদের গলদ পরি!  
মা-বাপের কাছে শিক্ষা না পেলে সন্তানের যে প্রকৃত  
শিক্ষাই হ’তে পারে না। প্রথম থেকে মাইনে  
করা মাস্টার গুবর্ণেসের ব্যবস্থার মতন ছোট ছেলে-  
মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা আর কিছুতেই নেই।  
বিদ্যালয়ভাটা একেবারেই তাতে তাদের পক্ষে  
বিশ্বাস হইবে যায়। মায়ের আদরের সঙ্গে মিশিয়ে  
অতি সহজ খেলার মতন যেটা শিখে ফেলে, এক  
জন অপরিচিতের শাসন-গান্ধীর্যের মধ্যে কি  
সে বস্তু পেতে পারে তারা কখনও?”

পরিমল কিছু ক্ষুণ্ণচিত্তে জবাব দিল, “একটু  
আধটু শিখছি তো, কিন্তু ও ইংরেজী বইটাই  
আমার পড়তে মোটে স্মৃতিশক্তি হয় না। মনেই  
থাকে না যে ছাই।—আর কি বিশী উচ্চারণ ও  
বানান! সে যাক,—হ্যাঁ গো, আজ আমার পার্সী  
খিরেটারে নিয়ে যাবে? ‘মোহন-মুরলী’ দেখে  
আসবো।”



নরেশ জীটিকে একটু সন্তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করাই স্বস্তি বোধে সে দিন ঐ পর্য্যন্তই থামিয়া গিয়া জবাব দিলেন, “বেশ তো, বেও।”

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের পরাণ মনের মাঝারে বসত তোলাপাড়া হয়, তার সনে যদি তোমার মনের নাহি থাকে পরিচয়।  
আচরণ তার বিচার করিতে যেও না বেও না তবে,  
তুমি বাহা ভাব কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে,  
■ ত সে রণে তুমি হেরে যেতে, সে তব হয়েছে জরী,  
কতের চিহ্ন বহিছে এখন কতের যাতনা সহি।  
—তীর্থরেনু।

হুঁচারজন বন্ধু আসিয়া একটা পুরাতন দাবী দিয়া সে দিন নরেশকে সম্বোধনপূর্বক বলিল, “ওহে রাজা! তুমি এতবড় ফাঁকিবাজ্ হয়ে উঠলে কেমন করেই বলো তো?”

নরেশ তাদের দাবী বুঝিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া থাকিয়া চাপা বিরক্তিতে মন্দ হাস্তের মধ্যে জবাব দিলেন, “কেন, চা দিতে বলতে দেবী হয়েছে বুঝি? ওরে সাতকড়ে।—”

নলিনবিহারী নামে নরেশের এটর্নী বন্ধুটি মুখ বিকৃত করিয়া গভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, “এইও! খবরদার! একেবারেই বোকা বোনো না! চায়ের তেষ্ঠা আর সরভাজা রাজভোগের ক্ষিধে নিরেই আমরা রাজদরবারে ভোজের আর্জি পেস করাতে আসি নি হে! যে কথা আমাদের দিয়েছিলে, সেইটে রাখছো কবে, তাই এখন বলো দেখিনি, শুনি?”

নরেশ যেন একেবারে আসমান হইতেই পড়িয়া হুই চোখ বিস্ফারিত করিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন,—“কথা দিয়েছিলুম; অথচ রাখি নি—এমন তো কিছুই আমার মনে পড়ে না! ‘জোচ্চোর’, ‘গাধা’ প্রভৃতি অনেক মিষ্টি মিষ্টি বচন তো আমার শোনালে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে দুটো আইসক্রিম আর খান দুচার ক’রে খাস্তা কচুরির সঙ্গে ছানার জিলিপি খেয়ে যাও দিকিন, রাণী-সাহেবার খাস তৈরী। খাসা হয়েছে—”

সাতকড়ি হাজির ছিল, বাবুদের ■ অল-খাবারের ফরমাসের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিধন ঠাকুর্দা ডাকিয়া বলিলেন, “হাককে আমার হুকোটা ফিরিয়ে এক ছিনিম দিয়ে যেতে গ’লে যাস বাবা!”

নলিন নরেশের বাকচাতুর্য্যে কিছুমাত্র ভুলে নাই অসন্তোষের সহিত বলিল,—“সুয়োরানীর খাস মহ তোমার খাসা রকম বজায় থাক, আমাদের সেখ কিছুমাত্র ভাগ চাইনে ভাই! দুয়োর দুয়োর এখনও যে অত ক’রে চেপে রেখে কেনই দিচ্ সেইটে শুধু আমাদের মতন নিরেট বোকাদের কঠিন হয়ে পড়েছে, সেইটুকুই একটু বুঝতে চাই এ দিকে তো খবর পাচ্চি যে, মধু-বাসর সম্প্রদায় কেরা অবধি এই তিন বৎসরে দুঃখিনী সুয়োরানী একেবারেই মহারাজের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখ-দর্শনও নাকি আর ভ্রমজন্মেও করা না,—অথচ তাঁকেও দেবে না নরলোকের মুখদর্শন করতে। এ তো তোমার বিষম জুলুম দেখতে পাই! কিন্তু আর সেটি হচ্ছে না! আজ পাঁচ বছর ধ’রে এই যে খোসামোদ ক’রে ক’রে মরচি, একটি দিনের জন্তও যদি অঙ্গুরীর গলার একটা গানও শোনাতে, তা হ’লেও নয় বোকা যেত যে, কথার তোমার কিছু ঠিক আছে, আরে ছোঃ!”

ননীবাবু নলিনকে চোখ টিপিয়া নিজেই তার হইয়া দরবার করিতে আসিল,—“আঃ খামো না নলিন! অত ব্যস্ত কেন? আমার ছাত্রীর গান শোনবার ■ তুমি অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়েছ বটে; তা সুবিধে হ’লেই রাজা তোমায় কি আর না শোনাবেন? সত্যি রাজা! অত ক’রেই যে সুখমাকে সঙ্গীত বিভ্রুটা আমরা শেখালুম, তা সে যদি এমনি ক’রে সব ছেড়েই দেয়, তা হ’লে অনর্থকই উভয়তঃ এতটা পরিশ্রম ক’রে কি ফলটা হলো বল তো? আগেকার মতন কখন-সখন,—এই আমাদের ক’জনার মধ্যেই সে যদি একটু আধটু গাইতে টাইতে নাই পেলে, তা হ’লে তারই বা বারমাস এক-ঘেরে বন্দিজীবন ভাল লাগে কি ক’রে? এই তিনটে বছর তো আমি বা ঠাকুর্দা পর্য্যন্ত তার ওখানে গেলে ঢুকতে পাইনে। তা ভাই, ছেলে-মানুষের প্রতি এতটা কড়াকড়ি কি করাই তোমার উচিত?”

ঠাকুর্দা হুঁকার নলে মুখ দিয়া একমনে টানিতে টানিতে একবারটি মুখ তুলিয়া ছোট্ট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ছেলেমানুষের পক্ষে বাঁধনটা বড় বেশী কড়া হয়ে পড়েছে বই কি! অল্প একটু ঢিলে দি হয় ভাল—অ—ল্প একটু ”

নরেশ এবার ব্যথিত বিশাল চক্ষু উন্মোচনপূর্বক বৃদ্ধ সহচরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিয়া উঠিলে “আগনিও যোগ দিলেন?—”

তাহার কণ্ঠে অবিচারিতের সুদৃঢ় অভিমান ব্যক্ত  
ল।

হরিধন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া গুণ্ডুণ্ড করিয়া  
লেন,—“আরে, না’ রে, দাদা-তাই! তা’ আমি  
নি, সুখমা যে কত ভাল মেয়ে, সে আমি সবই  
বই কি! তবে কি না,—তবে কি না, এতটা  
যে শিখেছে;—এই তোমারই বন্ধুবান্ধবের  
ছে তোমারই সাক্ষাতে ব’সে ছোটো গেরে শোনালে  
গাতে দোষটা কি? সেই কথাই আমি বলেছি  
ভাই! ওরা যে আমার শুক খেয়ে ফেলে। বলে,  
তুমি তার ওস্তাদ, তোমার কি তার উপর কোনই  
দাবী-দাওয়া নেই? তা’ আমি আর কি বলবো  
দাদু? তাই—”

নরেশ বন্ধুদের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া জবাব  
দিলেন—“আপনি সাফ বলবেন যে তা’ আপনার  
নেই—তা’ হ’লে আপনাকে আর কেউ জালাবে না।”

শুনিয়া তবুও নলিন মুখরভাবে কহিয়া উঠিল,—  
“যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প’ড়ে যায় নব প্রেমজালে,  
—তা’ হ’লে তাকে বিদায় দিলেই পারো। তা ব’লে  
একটা নিরীহ জীবের উপর এতটা অত্যাচারও তো  
সহ করা যায় না! বলি, আমাদের ঘরে তো আর  
নুতনের আমদানী হয় নি।”

নরেশের দুই চোখ রাজ্য হইয়া তাঁর কপালের  
শিরা সাপের মতন মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিল।  
তাঁর সমস্ত শরীরেই যেন একটা প্রবল রক্তের টান  
পড়িয়া তাহার দুই হাতের মুঠা কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ  
হইয়া উঠিল;—কিন্তু তার পরও যখন তিনি অচল  
অটল হইয়া নিজের আসনেই বসিয়া রহিলেন, তখন  
দেখা গেল, মনের মধ্যের একটা অদম্য উত্তেজনার  
স্রোতকে সংহত করিয়া রাখিতে, তাঁহাকে তাঁর  
সম্মুখে কল্পিত বিবর্ণ অধরকে দাঁত দিয়া চাপিতে  
হইয়াছে।

বন্ধুদেরা পরস্পরে দৃষ্টির ইঙ্গিতে পরস্পরকে  
নিজেদের হতাশার খবরটা দিয়া চুকিল। কিন্তু  
একান্ত লোভাতুর নলিনবিহারীর এততেও মন মানিল  
না, সে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিয়া ফেলিল  
“তা হ’লে আমাদের গান শোনানোর আশা যে  
য আসছিলে, সেটা শুধু ছেলে-ভুলোনের মতন  
বই—”

রেশ ইহার পাদ-পূরণ করিলেন—“অলীক।”

তা হ’লে আশা পূর্ণ হবে না?”

রেশ চোখের দৃষ্টি তাঁর সাম্নাসাম্নি সোজা-  
ঠক রাখিয়া শান্তভাবে উত্তর করিলেন—“না।”

“গোড়া থেকে বল্লই হতো।”

“বলেছিলুম অনেকবার, তোমরা সে কথা শুনতে  
চাও কই?”

“তুমি বলেছিলে,—সে আমাদের সামনে গাইবে  
না। কিন্তু ডাক্তার, ননী—এরা সব বলে যে, তুমি  
হুকুম কল্লই সে গাইতে পথ পাবে না। সে তোমার  
নাকি ঘরের মতন ভয় করে।”

“আমি বলবো না।”

“এ সোজা কথা।”

বন্ধুরা বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা খোঁচা  
দিয়া গেল।

“ওহে রাজা! তোমার সেই জাম্বুবান মন্ত্রীটি  
গেল কোথায়? শুনিছিলুম, সে না কি তোমার  
বাড়ীতেই রয়েছে।”

নরেশ কহিলেন,—“আছে বই কি; তাকে যে  
আমি চাকরী দিয়ে রেখেছি। খামা ছেলে সে!”

সব ক’জনেরই চোখে-মুখে বিজ্রপের তীক্ষ্ণ হাসি  
উধলিয়া উঠিল।

“কোন্ কাজে বাহাল হ’লেন, বাছাধন?”

নরেশ ভৎসনার ভাবে চোখ ফিরাইয়া অথচ বৃহৎ  
হাসিয়া উত্তর দিলেন,—“আমার জ্বর মাষ্টার ক’রে  
দিচ্ছি যে তাকে।”

“তা হ’লে তো কারেমী বন্দোবস্তই হয়েছে! কিন্তু  
দেখ’ ভাই! ছেলে মাছুষ যেন অন্ধকারে ও ক্রীমুর্তি  
দেখে আঁৎকে না ওঠেন।”

বন্ধুরা বিদায় হইলে নিতান্ত অগ্রসর মন লইয়া  
নরেশ জ্বর খোঁজে উপরে উঠিলেন। তাহাদের বিদ্রিষ্ট  
ও বিজ্রপবাক্যই তাহার উত্তর সঙ্কলকে অধিকতর দৃঢ়  
করিয়া তুলিল।

পরিমল তখন চুল-বাঁধুনির কাছে পরিপাটি সীঁখি-  
পাটা করিয়া কেশরচনা করাইতে ছিল। আশে  
পাশে আয়না, চিক্রণী, গন্ধ তৈল, ভিজা গামছা,  
আরও কত কি ছড়ান। পিছনে বসিয়া সোনার  
তাগা পরা, হাতখালি, নরুণ পেড়ে ধূতি পরা  
আম্রাকালী সাতগুছির চ্যাটা বিনাইতে বিনাইতে  
বাগবাজারের রায়েদের বাড়ীর বৌ-বিয়েদের মৌখী-  
নহের শত শত উদাহরণ জমা করিয়া দিতেছিল।  
পরিমল উৎকর্ণ হইয়া সে সকল মুখরোচক কাহিনী  
গোত্রাসে গ্রাস করিতে করিতে মধ্য মধ্য দুই একটা  
প্রশ্নও করিতেছিল; যথা—“হাঁ গা, তাদের বোরা  
বিকেল বেলায় বার মাসই বেনারসী, বোখাই সাড়ী  
এই সব প’রে থাকে? কোন দিনই কি বাদ  
দেয় না?”



আম্মাকালী বলিল, “না ভাই, তারা ও সব রোজই পরে। তা’ পরবে নাই বা কেন বলো না? পরসার তো আর তাদের কমি নেই। অন্য লোকেদের যেমন আটপোরে কলের সাজী কেনা হয় না, তেমনি তাদের যে গাদা ক’রে ক’রে ওই সবই কেনা হয়ে থাকে ভাই! তা’ তুমিও কেন বিকেল বেলা একখানি ক’রে পাতলা বেনারসী, পামী, কি জামদানী ঢাকাই পরো না বৌদি! তোমারও তো রাজার ঐশ্বর্য্য, কিনেই বা কোন্ অভাবটা?”

পরিমলের কাঁচা মনে এই সকল অনাস্বাদিত স্নেহের প্রবাহ প্রলোভনের ঘন জাল বিস্তার করিতেছিল। তথাপি সে ঈষৎ বিজড়িতভাবে কহিল, “আমার কি ও সব প’রে থাকলে মানায়? লোকে হয় তো হাসবে, বলবে, ‘কুঁজোর আবার চিং হয়ে শোবার সাধ’!”

প্রসাধনকারিণী অবাচ্ হইবার অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল,—“হ্যাঁ, হাসবে না, বলে ইয়ে করবে! কেন তুমি কি সেও দা-গাছের পেঙ্গী নাকি যে, তোমার গায়ে কিছুই মানায় না? রংটাই তোমার যা শামলা। মুখের কাট টাট কেমন দিয়া! চুপিট ঝাঁপা, মুখখানিও তো তোমার আমি থামা দেখি ভাই! তা’ ভাই, বলবোই বা কি! পরসার হ’লেই তো আর রূপ কিনে আনা যায় না। বড় বড় লোকের ঘরে কটাই বা সুন্দর আছে? বত সব ধনীর ঘরে দেখবে, সবার অঙ্গেই প্রায় ধার করা রূপ, সাবানে-পাউডারে, বিলিতি-রং খড়ির গুঁড়ো, সুরমা, তুরু আঁকবার পেন্সিলের টানে—আর হীরে-মতি-জরি-সিলিক, তার উপরে ইলেকট্রিকের আলোর বিলিক আছে। তুমিও ভাই দেখ না, আমার হাতে যখন পড়েছ, দু’মাসের মধ্যে তোমার গৌরবর্ণ না ক’রে কি আর ছাড়বো মনে করেচ? ওই আপটানটি ভাই! কিন্তু দুটিবেলা জাল ক’রে লাগানো চাই। তোমার ও সাবান ফাবানের শুধু কল্ম নয়—”

এমন সময় অনুরূপা দাসী আসিয়া খবর দিল, “রাজাবাবু শীগগির ক’রে একবার আপনারে ডাকতেছেন।—”

দুই দিকে দুইটা বিহুনী কুলাইয়া অসমাপ্ত বেশভূষার পরিমল স্বামি-সন্দর্শনে ছুটিল। মন অবশ্য এই অ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখা দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিল বই কি। আহা, সেই আসিলেনই যদি, আর একটু পরে আসিলেই যে বেশ হইত।

নরেশ বেশী কিছু ভূমিকা না করিয়াই সোজা

কথায় বলিয়া গেলেন, “দেখ পরি। মিসেস্ বসু কাছে পড়া-শোনা তোমার তেমন তো কিছু এগুচ্ছে না, তাই ভাবছি, তাঁর বদলে যদি এক হ মাষ্টার ঠিক করা যায় তো কেমন হয়?”

পরিমল তার বিহুনী-শুদ্ধ মাথাটি সবেগে ন দিয়া ঠোট ফুলাইয়া জবাব দিল, “একটুও ভাল হয় কেন, মিসেস্ বসু তোমার কি করলেন শ্রী নরেশ হাসিয়া কহিলেন,—“ভয়ে কবো, নির্ভয়ে?”

“তা নির্ভয়েই বলতে পারো।”

“তিনি আমার পাড়া-গাঁয়ের নিরাড়ম্বর সাদা-সিঁদে পরিমলকে সহরের ‘ডানা কাটা’ পরীক্ষার পাশে দাঁড় করাবার বন্দোবস্তে আছেন,—এ ভিন্ন আর কিছুই নয়।”

পরিমল বেশী ফুলাইয়া বাকা চোখে অভিমানের বাণ হানিল,—“ডানাকাটা পরী’ যদি আমি হ’তে পারতুম, তা হ’লে কি না ওই সব খোঁটা আমার তুমি দিতে পারতে? কি আমি করেছি বাপু? ভাল ভাল সাজী, জ্যাকেট গহনাপত্র অত অত সব আমার কিনে দাও কেন? না দিলে তো আর আমি পরতে যেতুম না।”

নরেশ সন্মিতমুখে তার নাকটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন,—“আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করিলেই পারো। যাক, ও সব কথা নয়।—তুমি জানো লেখা-পড়া শেখাটা আমার পছন্দ। শুধু বিলিতি বিবিদের বেশভূষাকেই অশুকরণ করলে চলবে না তো, তাদের সদৃশ্য লিও সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। তা’ ভিন্ন আমাদের দেশের মেয়েরাও কপিন্ধকালে মূর্থ থাকতেন না। বই পড়া কম থাকলেও এবং না থাকলেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সেকালের মেয়েদের অপরিহার্য্য ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সবই ত্যাগ করচো, শিখে নিচো শুধু বিলিতি বিলাস স্খটুকুই। তা করো না, বড় আশা ক’রে তোমায় নিয়েছি যে, আমার সন্তানেরা যেন নির্মল ও নিখুঁত মা পায়, তাদের তা পেতে দিও, পরি!”

পরিমল মুখটা খুবই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

নরেশ আবার বলিলেন,—“যা হোক, আঁি বলতে এসেছি সেটা শুনে নাও; নিরঞ্জন ফাজের জন্ত বড়ই ব্যস্ত করচে। তারই যদি তুমি খানিকটা ক’রে পড়ো, সে মন্দ হ বেচারী ভারি ভদ্রলোক। লেখা পড়াও জানে এক রকম।—”

পরিমল ঘোরতর অপছন্দের সঙ্গে প্রবল বেগে ত্রি তুলিয়া বাক্য সমাপ্তির পূর্বেই বাধা দিল—  
কি তুমি, ওই মুখ-পোড়টার কাছে আমার হবে? কক্ষোনো না, কক্ষোনো না।—ওর আমি কিছুতেই পড়ব না। মা গো! ওটা কে মালুম, তারই যে কিছু ঠিক নেই।”

টা প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাস নরেশের সমস্ত মনের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। আরক্ত মুখে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন,—“পরিমল! ও কথা! দিয়ে বলতে তোমার লজ্জা হলো না? কেমন ক’রে বললে তুমি? এই তোমার উপরে আমার ভবিষ্যৎ বংশের জন্ত আমার উচ্চ আশা পোষণ করতে হয়েছে! যাকে আজ অত ঘৃণা দেখালে, কেমন ক’রে জানলে যে, সেই লোক এক দিন খুবই সুপুরুষ ছিল না? তোমাদের মতন রূপবোবন-গর্কিতা সুন্দরীদের কারকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েই যে ওর ও দশা হয় নি, তাই কি তুমি জোর ক’রে কিছু বলতে পার? সে হবে না—ওরই কাছে তোমার পড়তে হবে।—কাদছো, কানায় শুধু অজ্ঞায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।.....”

বন্ধুদের ব্যবহারে পূর্বাধিই যে বিরক্তি মনের মধ্যে এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় সংঘর্ষে তাহা প্রকট করিয়া ফেলিয়া, অসন্তোষের কালিমাচ্ছন্ন গাট ও গভীর মুখ লইয়া নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ হান করিলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখনও, এখনও মন সে নামে শিহরে কেন?

—অশ্রমতী।

সেই নকল করা কাগজ ক’খানি হাতে করিয়া নরঞ্জন যখন নরেশচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁহার পাঠা-রের দ্বারদেশ হইতে গৃহোত্তানের সবুজ ঘাসওয়ালার ধার পর্যন্ত পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে যেন কোন নূতন মালুম বলিয়াই ভ্রম পারিত। বাহিরের চেহারা অবশ্য বদলাইয়া গিয়া কোন উপায়ই ছিল না, মুখের একটা দিক ক্ষতচিহ্নে প্রায় গহবরের মতই গভীর হইয়া সে দিকের রংটাও যেন কালির মত কালো, টুকুও বসন্ত-ক্ষতের হস্তে এমনই নিশ্চয়ভাবে রিত যে, সেখানে নাক-চোক প্রভৃতি আর

৫ম (খ) ২৫

যে কিছু আছে, তাও ঠাহর করিয়া বুঝিতে হয়।—  
কিন্তু কি আশ্চর্য্য বদলাইয়া গিয়াছিল তাহার ভিতরটা। প্রসন্ন স্মিতহাস্তে সমস্ত মুখখানা তাহার যেন বৈশাখী বড়ের শেষে চাঁদের আলোর রেখাটুকুর মতই স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। মুচ্ছাতুর অন্তরের সমুদায় নিদ্রিত বৃত্তিগুলি সহসা যেন কার বাত্মষ্টির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত আনন্দে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, “তবে তো আমরা মরি নাই রে, মরি নাই!”

নরেশ ঘোর অসন্তুষ্ট মনে নীচে নামিয়া আসিতেই নিরঞ্জনের হাতের বাণ্ডুলটার উপর নজর পড়িয়া গেল।—

“কি, পেরে উঠলে না বোধ হয়? সে তো আমি তোমায় গোড়াগুড়িই ব’লে দিয়েছিলুম”—বলিতে বলিতেই তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উত্তোগ করিলেন। মনটা তাঁহার প্রথম দফায় বন্ধুবর্গ ও দ্বিতীয় দফে জীব উপর বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই উভয় মনোবাদের প্রধানতম ও মূলীভূত কারণ নিরঞ্জনকেও তাই বেশ মধুর মনে হইল না।

কিন্তু নিরঞ্জন বেচারা সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া, সে নিজের মনের গভীর আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া একমুখ হাসির সহিত কথা কহিয়া উঠিল; বলিল—“পারবো না কেন? আপনার লেখা তা ব’লে অতদূর মন্দ নয়।” এই বলিয়া সে অতি সুন্দর হাঁদে লেখা কয়েকখানি কোণগাঁথা কাগজ নরেশচন্দ্রের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সেই লেখাটার উপর নজর পড়িতেই নরেশচন্দ্র যেন আকস্মিক দণ্ডাহতের মতন চমকাইয়া উঠিলেন। এ লেখা!—এ কি তাঁহার পরিচিত?—বড় পরিচিত নয় কি? দুই মুহূর্তেরও অধিককাল শুরু বিস্মিত দুই নেত্র স্থির করিয়া তিনি সেই কাগজগুলার উপর চাহিয়া রহিলেন। এ লেখা কা’র? কোন পুরাতন দিনের সুখ-স্মৃতি ভালো জড়িত হইয়া এর প্রত্যেকটি অক্ষরের ছবি তাঁহার মনোদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ যাহার প্রতিবিম্ব, তাহার আসল রূপটুকু কোথায়? কা’র কল্যাণকর এ? এত পরিচিত, এত আপনার বলিয়া যাহাকে দেখিয়া হৃদ্যদয়ে ক্ষীতবক্ষ জলধিবৎ অন্তর তাঁহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, সে কা’র হাতের লেখা?—কিছুই স্মরণে আসিল না।

মুখ তুলিতেই একটি সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল। নরেশের দৃষ্টি গভীর এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কই, না, এ মুখ, এ যে



তাঁহার চিরদিনেরই অচেনা। অন্তরের কোণে কানোচে খুঁজিয়া কোথাও তো এর ছায়াটুকুও ভাসিয়া থাকিতে দেখা গেল না! তবে এই হাতেরই লেখা এমন পরিচিত সন্দেহ হয় কিসে? শুধুই এটা অমূল্য সংশয়ই নয় কি? না এর ভিত্তি মূল কোথাও কোন গভীর গহবরে নিহিত আছে? কিছুক্ষণ চিন্তাকুল অস্থিতচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে হাল-ছাড়াভাবে নরেশচন্দ্র তাঁহার ভীষণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টির আঘাতে বিপর্যায় নিরঞ্জনের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার তাহারই হস্তাক্ষরযুক্ত কাগজখানা দেখিলেন। তার পর হঠাৎ অসাধ্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহজভাবে অবলম্বন করিয়াই সপ্রশংস ও সন্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন, “বাঃ বাঃ! ভারি সুন্দর তো হে, তোমার হাতের লেখাটি! আমার সেই কাকের ছানা বকের ছানাগুলি যেন মস্তপুত হয়ে নূতন জন্মলাভ করেছে দেখছি যে!”

নিরঞ্জন সঙ্গীত-সলজ্জহাস্তে দৃষ্টি নামাইয়া কুণ্ঠিত বিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু কি কপি করবার আছে?”

নরেশ তাঁহার আগ্রহে অকস্মাৎ অত্যধিক উৎসাহিত হইয়াই উঠিলেন,—“কপি করবার সাধ যদি তোমার এতেও না মিটে থাকে নিরঞ্জন, তা হ’লে ভাই তোমার কাছে কি কৃতজ্ঞই যে হয়ে থাকবে ঐ ‘কর্ণধার’ প্রেসের কম্পোজিটারের দল, সে আর তোমায় কি বলবে! আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমাকেও না হয়ে উপায়ই নেই। যেহেতু ওদের কাছে গাল খেতে খেতে আমি দিনের মধ্যে কতবারই বিষম লেগে মরি। তার ওপরেও আবার আমায় দেখতে পেলেই ম্যানেজার মশাই ভীষণ তাড়া ক’রে আসেন। প্রফ দেখা,—সেও একটা মহামারী ব্যাপার; নিজের লেখা,—সে কি ছাই নিজেই বুঝতে পারি? সাধ ক’রে কি আর এর আর এক রকমের ভয়-ভাবনার আতঙ্কিত হয়ে রবিবাবু বলেছেন,—

“অনেক লেখার অনেক পাতক,

সে মহাপাপ করবো মোচন,

আমায় হয় তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।”

কিন্তু সে তবুও বরং পদে আছে, নিজের লেখার প্রফ তার চেয়েও যে ঢের বেশী শক্ত, সে হয় তো তাঁদের জানা নেই।—বলিয়াই নরেশচন্দ্র হো হো করিয়া ঠাণ-খোলা হাসি হাসিয়া ফেলিলেন।

নিরঞ্জন বলিল, “তা ব’লে আপনার হস্তাক্ষর অত

কদর্য্য ■■■; বাঁই হোক, যখনই দরকার হবে, আমি আপনার লেখা দেবো। ‘ফেরার’ ক’রে দেবো—

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া ঈষৎ গ’ হইয়া উঠিলেন, “নিরঞ্জন! তুমি ইংরেজীও জানো, না? ও কি চুপ ক’রে থাকলে বেলো না ভাই, ক্ষতি কি তাতে? আমি দেখছি মিন তুমি লাইব্রেরী-ঘরে ব’সে একটা কাগজ বাঁধা কি বই পড়ছিলে, সে বইটা হয় ডিবে। কোন নভেল, কিম্বা বায়রণের কিছু।”

নিরঞ্জন তাহার নত মুখখানা চকিতে তুলি চাহিল। তাহার সে মুখে যেন আর রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। স্নান ও শুভ্র অধর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত ব্যথিত বেদনার আর্ন্তচোখে চাহিয়া থাকিয়া পরিশেষে সে যেন অক্ষুট বিলাপের ভাষায় কহিয়া উঠিল, “কি জানি, কেন, আবার ওই সব ভগ্নাত্মের স্মৃতিগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে! মনে করেছিলুম, সবট বুকি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু তর করচে, তা বোধ করি বা যার নি—যার নি—উঃ!—” বলিয়াই সে এমন জোর করিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিল ও স্থলিত পদে পাশের দেওয়ালে দেহের ভর রাখিল যে, নরেশের বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে আর কিছুই বাঁকি থাকিল না যে, পূর্ব্বস্মৃতির মতন জালা ময় এ লোকটির কাছে যেন তার সেই সুমুখু নিঃসহ অবস্থাটাও নয়। এইটেকেই সে যেন সব চেয়ে বে এড়াইয়া চলিতে চাহে বলিয়াই নিভেঁকে শিফি সম্প্রদায়ের সকল সম্বন্ধ হইতে উপড়াইয়া লইয়া একেবারে রাস্তার ড্রেনের ধারে ঠেঁগিয়া ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। উঃ, না জানি কি সে ভীষণ অতীত—স্মৃতির মধ্যে যার এমন দহনশীলতা!

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে,

রূপ না দিলে যদি বিধি

পূজার তরে হিয়া, উঠে যে উথলিয়া,

পূজিব তারে গিয়া কি দি

—মা

বিবাহিত জীবনের এই কয়টা বৎসরে পরিচয় পরিমল পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহা আর যতই বা থাক, একটা প্রচণ্ড জিদ বো।

দন্দেহরূপেই সে জানিয়াছে। স্বামী তাহার দন্দ ভোলানাথ, কিন্তু একটুখানি অবাধ্যতার তাঁর সেই সদাশিব রূপে পরিবর্তিত হইয়া তে দেখা যায়। স্বামীর অসম্পত্ত খামখেয়ালীর মনে করিয়া পরিমলের মনটা অত্যন্ত উত্থাপিত। তাহার মন বিজ্রোহ করিয়া বলিল, সকল ইচ্ছা ও সকল কাজের উপর দখল—এ যে বিষম অত্যাচার! উচিতের দিক্ দিয়া এই দাবী করা যাক না কেন, মানুষ নিজেকে কোন অবস্থাতেই এমন ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না যে, আর এক জনের প্রত্যেক খুঁটিমাটির সকল আদেশকেই সে তার নিজের করিয়া লইতে পারে। অস্তুতঃ হাসিমুখে যে পারে না, সেটা সে নিজেকে দিয়াই বুঝিত। নতুবা জুলুমের ভয়ে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে প্রবল পক্ষের প্রচণ্ড ইচ্ছাস্রোতে মগ্ন করা,—সে তো সংসারশুদ্ধ লোকে বাধ্য হইয়াই করিতেছে। পরিমল রাগ করিয়া অনেকক্ষণ বিছানার বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিল। অভিমান করিয়া মনে মনে আহত হইয়া ভাবিল, লোকে যে বলে সমানে সমানে না পড়লে কোন পক্ষেরই ঠিক মান থাকে না, তা ঠিকই। আমি গরীব, অনাথা ব'লেই আমার উপর উনি কল ভা'তেই অবরুদ্ধি চালান। হতুম আমি গবাজারের রায়েদের মেয়ে কি চৌ-গাঁয়ের জমীদার-দের কেউ, তা হ'লে কখনই আমার উপর এতটা উনিচ্ছালাতে পারতেন না। আমি দুঃখী, আর কেউ কোথাও নেই, মনে কষ্ট হ'লে যে এক-দল বাপের বাড়ী বাবার ভয় দেখাব, তারও আমার উপায়টুকু যে নেই, সে জানেন কি না, তাই না আমার সব কিছুতেই বাধ্য করতে সাহস করেন!”

পরিমলের দুঃখ যেন বুক তার ছাপাইয়া উঠিতে গেল। তার পর মুখ তুলিতেই হঠাৎ নজর পড়িল, তাহার খাটের সাম্নাসাম্নি রক্ষিত কাপড়ের আল-রিটার আয়না আঁটা কবাটের উপর। দুচোখ জলের উপর আরও খানিকটা জলের আমদানী য়া সে সবেগে মুখখানা ফিরাইয়া লইল। তাই এই শরীরে তার খুব খানিকটা রূপই আছে!

বিধাতার পরম করুণার দান,—পার্থিব কোন বিনিময়ে যেটা ক্রয় করিবার উপায় নাই ত কত ধনা গৃহের বিলাসী মেয়েরা অসাধ্য রাধনায় সারাজন্ম ধরিয়া লাগিয়া আছেন তপে সফল প্রযত্ন হইতে না পারায় ভাগ্য ও ভ্রাতাকে মনে মনে অভিশাপ দিতেও ক্রটি না,—পরিমলও সেই বস্তুটার অভাব

আজ যেন বড় বেশী করিয়াই নিজের মধ্যে অনুভব করিল। এতদিন নিজের রূপহীনতার কথা মনে করিবার অবসরটুকুও তাহার ঘটে নাই বলিয়াই বোধ করি সে কথা তাহার মনে ছিল না। বরং ভোগে ও স্বাস্থ্যে যে দরিদ্র-জীবনের অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্য্য সে তাহার এই নবযৌবনোদ্ভাসিত নবজীবনে লাভ করিয়া-ছিল, তাহাই ছিল এতদিন তাহার কাছে পরমাস্বর্গ্যের মতই পরম বিস্ময়কর। কিন্তু আজ সে দিক্ দিয়া নহে, আর একটা দিক্ হইতে—অতিরিক্ত পাওয়ার গুরু বোঝার ভারটা যখন মাথার উপর বড় বিষম বলিয়া ঠেকিতে ছিল, তখন নিঃস্ব দেনদার চারিদিকে হাতড়াইয়া ঋণশোধের একটা সিকি পরসা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া না পাইয়া ধনীর ঘরের লোহার সিন্দূকের দিকে তাকাইয়া মনের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার উপর স্বামীর চাইতেও বড় বেশী অভিমানী হইয়া উঠিল। সে এই বলিয়া তাঁহার দরবারে নালিশ রুজু করিয়া দিল যে, বড় লোকের মেয়ে, যাদের মা আছে, বাপ আছে, মা বাপের রাশিকরা টাকা আছে, তারা কালো কুৎসিত হইলেও তাদের ভাল ঘরে-বরে পড়িতে এতটুকুও আটকায় না যখন, তখন অনর্থক ও অ-দরকারে তাহাদের বাড়ি বাড়ার ভাগ—রূপের বোঝাগুলো না চাপাইয়া সেগুলো আমাদের মতন অধম, অক্ষম ও অভাগা জীবনের জন্ত রাখা কি চলিত না? স্বামী যেমন দয়া করিয়া আমার পথের পাশ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছেন, তা আমার যদি একটুখানি রূপও এই দেহের মধ্যে থাকিত, তো না হয় তাই দেখিয়াই মনে মনে একটু গুমোরও রাখিতে পারিতাম যে, এই দেখিয়াই হয় তো তিনি আমার নিজের করিতে পারিয়াছেন। তাঁর এই অগাধ দয়ার মূল্যে নিঃস্বত্ব-ভাবে বিকাইয়া যাওয়া হইতে হয় তো বা তাহাতে আমি একটুখানিও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম। তিনি অত দিলেন,—একেবারেই যে সমুদয়টুকুই নিঃস্বার্থ-ভাবে দিয়া ফেলিলেন, এর বদলে যে এতটুকু একটু কিছুও ফেরৎ পাইলেন না, এইখানেই যে মনে এচও একটা আঘাত লাগে। এইখানেই যে এই বিনামূল্যের কেনা বাদীরও অযোগ্য যে, সে তাঁর দয়ার দামে বিকাইয়া যায়।—তাই অভিমান উথলানো বুকে পরিমল মনে মনে ভাবিল, যার জোরে পরাজিত দৈত্যের মেয়ে শচীদেবী ইন্দ্রের পাশে মাথা উচু ক'রেই বসতে পেরেছিলেন, মৎস্যগন্ধা জেলের মেয়ে ভারত সম্রাটের মহিষী হ'তে লজ্জা পাননি, সেই রূপ থাকলেও তো আমার একটুখানি মনের ইজ্জতও থাকত। আমার যে একেবারেই দয়া! দেবার তো আমার এতটুকু



কিছুই নেই, কেবল বোঝা বেঁধে নেওয়া মাত্র, মান এতে থাকবেই বা কিসে ?—

রাগের মাথায় সে নরেশচন্দ্রের উদ্ভট দারিদ্র্য-প্রেমকে মনে মনে যৎপরোনাস্তি অপভাষা প্রয়োগ করিল। এমন কি, অন্নদা দাসী, তাহার চুল বাঁধা যে তখনও সমাধা হইয়া উঠে নাই—এই বিষ্মত সংবাদটা জানাইতে আসিলে, তাহারই সহিত সে এ বিষয়ে আলাপ করিতে বসিয়া জোর করিয়া বলিল, “তা ব’লে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি রকমের ‘ভাল’ হওয়াও মানুষের পক্ষে ভাল নয়। যা’ রয় সয়, সকল বিষয়ে সেই মতন চলাই সম্ভব। গরীবকে দয়া দেখাতে হবে ব’লেই কি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে হবে নাকি ?”

অন্নদার সহিত যে তাহার মনিব-পত্নীর মতের এমন সামঞ্জস্যও আছে, ঘৃণাকরেও এ সংবাদটা জানা থাকিলে আর সে বেচারী ইহার সম্বন্ধে বোধ করি পড়সীর বাড়ী বাড়ী গিয়া অনর্থক দশকথা প্রচার না করিয়া বেড়াইয়া তাহার সহিতই উহাদের সম্বন্ধীয় ছ’চারিটা মুখরোচক আলোচনা ঘরে বসিয়াই চালাইতে পারিত। পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সে হাতমুখ নাড়িয়া মনিব-গৃহিণীর স্বপক্ষ সম্পূর্ণ সমর্থন-পূর্বক সোৎসাহে কাহিয়া উঠিল, “ও মা, তা’ আর বলতে রাগীমা! রাজাবাবুর আমাদের পছন্দর ছিরিই যদি থাকবে, তা হ’লে আর আমাদের ভাবনাটাই বা কি? এই দেখ না, কত কত রাজা জমীদার হেঁটে হেঁটে তাদের পারের বাঁধন ছিঁড়ে ফেললে, তা’ তানাদের পরী পরী সব মেয়ে ফেলে উনি কি না কোন পাড়াগাঁয়—মরুকগে, মুখে আগুন লাগুক আমার! ওমা, কি কথা বলতে কি বলি দেখ একবার! এই জন্তই বলে গো, বুড়ো হ’লে বাহাতুরে ধ’রে যায়। কিছু মনে নিও না মা! কার সামনে যে কি কথা হচ্ছে, তোমার দিবি মা; একেবারে নিজস্ব ভুলে গেছি! ছাও বাছা! এখন চুলটো ফিরিয়ে জ্ঞাওসে, অবলার মা আটকে রয়েছে, তাকে আবার পাঁচ বাড়ী তো ঘুরতে হবে।”

পরিমল ঢিলটি মারিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটকেলটি খাইল এবং খাইয়াই সেটুকু সে তৎক্ষণাৎ বুলিল।

আশ্চর্য! এ’ও আবার মানুষকে কানে ধরিয়া গালে চড় মারিয়া মনে পড়াইয়া দিতে হয়? ‘রাজাবাবুর যদি পছন্দর শ্রীই থাকিবে, তবে বাগবাজারের চন্দ্রায়ের সেজ মেয়ে সুন্দরী সাগরিকা, অথবা চৌগায়ের রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়ে সুখলালিতা

সুখলালতা আজ রাজা নরেশচন্দ্রের রাণী হইয়া এই পথে কুড়ান কুরুপা পরিমল এই আদখল লইল কেন? আজ একটা বসন্তকর্ত-কদাকার ভিখারীর প্রতি সমাদরকে সে যে চক্ষে দেখিতেছে, তাহাকে সে আদর দেখা বলিয়া তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করায় রাগে অভিমানে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছে। শত শত ধনী মানী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা সকলকে তুচ্ছ করিয়া দি নির্বাক এবং এমন কি, পূর্ণ যৌবনে অশন-বসনে, অভাবে পরাশ্রিতা, অপরিচিতা এই যুবতীকে আপনি ঘাচিয়া বিবাহ করিয়া এই ধনীর দুলাল তাহাকে যে দিন ঘরে তুলিলেন, সে দিন তাঁর পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকার অধরে ও নেত্রপ্রান্তে, কি ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের হাসি—কি ক্রোধাত্মক হইয়াছিল!—তা, সে কি তা জানেই না? মূর্খ, তাতে পাড়াগাঁয়ে মেয়ে হইলেও এই অপরিচিত ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যময় নগর-নিবাসে, এই খেতাবী রাজার রাজ-প্রাসাদে আনীতা হইবার পর হইতেই পদে পদে যে সেটাকে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। যখন আসিয়াছিল, এ বাড়ীর দাসী-চাকরদের শুক নাকি তাহাকে ও তাহার আচার-ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণালজ্জার, ধরনীগর্ভ প্রবেশেচ্ছা জন্মিতে ছাড়ে নাই, তা অস্ত্রে পরে কা কথা। তার নিজের সংসারে আত্মী জন বেণী নাই। বৌ-ভাত উপলক্ষে দেশের বাড়ী হইতে সংশাশুড়ী ও তাঁর মেয়ে অলকানন্দা এই দুজন মা’লোক এখানে আসিয়াছিলেন। সংমা হইয়াও কে তিনি নরুর পাশে অমন বউ সহ করিতে পারেন নাই, এটাও অকৃত্রিম সত্য সংবাদ। তিনিও নাকি গরীবেরই মেয়ে। চেলি-চন্দন ও ফুলের মালার সাজাইয়া তাঁর গরীব বাপ তাহাকে লক্ষপতি গিরীশচন্দ্রের পঞ্চায় বৎসর বয়সের সময় তাঁর হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু এক হিসাবে যে সেই নিঃস্ব গরীবের মেয়ে অনেক ধনাঢ্য কন্যাকে লজ্জা দিয়া দেশের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, সে তাঁর অনবদ্য সৌন্দর্যের জোরে। সেই জিনিষটারই পরিমলের বিশেষ অভাব ঘটিয়া গিয়াছে। ধনীর মেয়ে না হইয়াও যিনি রাজার মেয়ের নিজের আনমিত রূপের গোরবে, উচ্চ গ্রীব কটাক্ষে, মাটির জগৎকে তাচ্ছিল্যভরে চাহিয়া অভ্যস্ত, তাঁরও কঠিন নেত্রের অবজ্ঞাসূচক এই নিঃস্ব ভিখারিণী পরিমল ঘৃণা-লজ্জায় প মাটিতে মিশিতে চাহিয়াছে। সে সব কথা

বুঝে আজ তাহার মনের বুকে ফুটিয়া থাকে কাঁটার : আবার খচ খচ করিয়া উঠিল। সেই সময়কার দিনের মাতা-পুত্রের আলাপ দৈবাৎ তার কানে সেই কথা কয়টা ব্যথার উপর তীক্ষ্ণ-প্রলেপের র মতই স্থতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। তাহার ক ডাকাইয়া তাঁর প্রায় সমবয়সী বিমাতা পদ্মাবতী গ করিয়া বলিলেন, “দেশে থেকেই শুনেছিলাম তুমি এক চাটগৈয়ে ধেড়ে মেয়ে কুড়িয়ে এনে তবড় মিত্রের বাড়ীর বউ ক’রে দিচ্চো। কিন্তু তখন ষ্পেও ভাবি নি যে, সে মেয়ের রূপের দিকটাতেও এমন কালিঢালা। এ কেলেঙ্কারী করার চাইতে তুমি এত দিন বিয়ে করবে না ব’লে যে পথ নিয়ে চলছিলে—সেও যে ছিল ভাল। সে তবু না হয় বোঝা যায়, এ যে একেবারেই দুর্কোধ্য!”

নরেশচন্দ্র এই ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি-মাত্র বর্ণও ব্যবহার করেন নাই।

সে দিনে কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা এত বড়ই হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাতে তাহার মনকে ধাক্কা দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই গোপনীয় কথার সবটুকুই যখন জানা-শুনা হইয়া গিয়াছে, তখন এত বড় অবমাননা-জনক তুলনাটা স্বরণে আনিয়া এবং এই লজ্জাকর অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বামীর মৌনভাবে সন্তুলিতক্ষণ বোধে তাহার বুকের মধ্যে অভিমানের হুমুল তরঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাঃ—ঠিক তথ্যই ঐ অন্নদা বলিয়াছে। নরেশচন্দ্রের প্রবৃত্তিই—দি নিম্নাভিমুখী না হইবে, তবে সেই বা আজ এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত কেন? রাগ করিবার কিছুই তো নাই। যা সত্য, তা অস্বীকার করিলেও সে মিথ্যা হয় না।

পরিমল নেহাৎই গরীব-ঘরের মেয়ে। আবার শুধুই যে সে দরিদ্রকন্ডা। তাহাই যথেষ্ট নয়, এ সংসারে আত্মজন বলিতে তাহার কোন দিক দিয়া কোন বালাই ছিল না। তার উপর বাস তাহাদের সে এক কোন্ সুদূর পূর্ববঙ্গের অজ পাড়ারগৈয়ে। মলিকাতা সহরনিবাসী আধুনিক সভ্যতা ও নব্য ‘কা’প্রাপ্ত অতুল ধনসম্পত্তির অপ্রতিহত অধিকারী গাবধারী ‘রাজা’ নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পত্নী-লাভ করিবার মত কোনই সুযোগ বা সামর্থ্য যে ‘রকে’ বিধাতা বা মানুষ যে দান করে নাই, ! একেবারে অবিসম্বাদী সত্য! তথাপি যে মঘটনও ঘটয়া গেল, এর জন্ত ভদ্র-ইতর-পথে সকলেই খামখেয়ালী বিশ্বনিরস্তা এবং : সৃষ্টিছাড়া-সৃষ্টিকরা তদপেক্ষাও খামখেয়ালী

নরেশচন্দ্রকেই দায়ী করিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিত।

তা সামাজিক পদমর্যাদা বা ধনরাশি-মণ্ডিত পিতামাতা না হয় না-ই থাক, শিক্ষিত সমাজে স্থানলাভের যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষাই কি ছাই তাহার কিছুমাত্রও ছিল? বিজ্ঞার মধ্যে বাজালা ভাষার অক্ষরপরিচয়টুকু অবশ্য ঘটয়াছিল, আর বুদ্ধির মধ্যে ভাত, ডাল ও দু তিনটা সাধারণ ব্যঞ্জন রান্নার বস্তুটুকু খরচ হয়, সেই পর্য্যন্তই। তার পর রূপ,—তা সে। তাহার নিজের দিক হইতে বেশ স্পষ্ট করিয়া জানা নাই। কারণ, সে যে বাড়ীর মেয়ে এবং যে সমাজের মানুষ, সেখানে আয়না ধরিয়া বসিয়া নিজের রূপের পরিমাপ করার সুবিধা বা প্রয়োজনই ছিল না। মা ছিলেন, মনের পর দিনান্তে একবার করিয়া চুলটা তিনি মোটা চিকণীতে আঁচড়াইয়া একটা আঁটসাঁট শক্ত খোঁপায় বাঁধিয়া দিতেন। শেষের দিকে যখন তাহার রাজা-স্বামীর দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে, সে সময়টার মা ছাড়িয়া রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধ কোন প্রাণীর সহিতই তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধের পাঠই উঠিয়া গিয়াছিল এবং বাহিরের বা অন্তরের অবস্থাও তাহার পক্ষে এমনই প্রতিকূল যে, স্বভাবতঃই নারীর সর্বপ্রধান প্রবৃত্তির ধন যে সৌন্দর্য্য, তাহাকে রক্ষার চেষ্টা তো নহেই, পরন্তু সর্বপ্রবৃত্তি উহারই ধ্বংসকামনাই তাহার চিন্তে তখন প্রবলতর। কাজেকাজেই তাহার প্রতি এই সুখসৌভাগ্য-সেবিত কমলা-বাণীর বরপুত্রটির যে আকর্ষণ, ইহার ভিতর রূপজ মোহের এতটুকু কণামাত্রও যে স্থান ছিল না, এই কথাটা জোর-গলাতেই বলা যায় এবং গুণগ্রাহিতারও কোন প্রমাণ সে সময়ে তো অন্ততঃ পাওয়া যায় নাই। কাজে কাজেই সেই সুদূর চট্টগ্রামের অশিক্ষিতা অত্যন্ত সাধারণ চেহারার দরিদ্রকন্ডা—তাহাতে একান্তই অসহায় অনাথাকে গ্রহণ করার এ পক্ষ হইতে কাহারও কোন সহায়তা লওয়া হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ বলে নাকি, শুদ্ধমাত্র প্রবল অহুকম্পা ও উদারতাই নরেশ-চন্দ্রের পত্নীনির্বাচনের ঘটক হইয়াছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে নরেশের ঘাড় ভূতে ভর করিয়া তাহাকে এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পরিণত যৌবনে অসহায় নারীর যে সকল আপদ ঘটা অবশ্যস্বারী, তাহারই বিড়ম্বনায় সে সময়ে এই পর-গৃহবাসিনী পূর্ণযৌবনা মেয়েটি একান্তই বিব্রত বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। মা-মরার পর তাহার পূর্বকার সকল ব্যবস্থাই কোন্ একটা দৈব



দুর্বিপাকবশতঃ একেবারেই আগাগোড়া কাঁচিয়া যায়। যে নিরাপদ নীড়ে সে বাসা বাঁধিবার করুনা বহুদিন হইতেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া করিয়া আসিয়াছে, আকস্মিক একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের ঝাপ্টা আসিয়া তাহার সেই আশাতরীখানাকে হঠাৎ মাঝ-দরিয়ার মাঝখানেই বানচাল করিয়া দেয়। তার পর এই নিরালস্য জীবন লইয়া সে অকুল-সাগরের ঢেউ খাইয়া খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কূল কোথাও পায় নাই। গ্রামের তাহার নূতন বাসিন্দা, পুরাতন সুবাদ কাহারও সহিত ছিল না, আর থাকিলেও হিন্দুঘরের আইবুড় ধাড়ী মেয়ে যে কোন ভদ্রলোকে গলায় বুলাইবে, ততটা উদারতা পল্লীগ্রামে যখন ছিল—সে অতীত যুগের কথা। কাজেই পরিমল শ্রোতের ফুলের মত কেবলই ভাসিয়া বেড়াইতেই ছিল, কোথাও কূল পায় নাই। পূর্বাশ্রয় যখন খসিয়া পড়িল, ধন-দৌলত সব কিছুই বেদখল যারাই লইল, তাহা শুধু তাহাকেই বাদ দিয়া গেল, এই খবর শুনিয়া এক জন প্রতিবেশী তাহাকে ঘরে স্থান দিলেন। সে সময়ে তাঁহার গৃহিণীটি স্মৃতিকাগারে আবদ্ধ থাকায় নিজে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হইতেছিল। গৃহিণী এই অসহায় মেয়েটির খবর শুনিয়া কর্তাকে জানাইলে তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। কিন্তু মেয়েটি কয়েক দিনের মধ্যেই একটা মধ্যরাত্রে কাদো কাদো হইয়া অস্পৃশ্য স্মৃতিকাগৃহের আগড় চৌলিয়া ব্যাধ-বিভাডিতা হরিণীর মতই ছুটিয়া আসিল এবং গৃহিণীর পারে আছড়াইয়া পড়িয়া কাদিয়া কহিল, “মা, আপনার বাড়ী বড় নিরাপদ মনে ক’রেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু বরং পথে পথে ভিক্ষা ক’রে খাব, তবু এখানে আর থাকতে পারবো না, সকাল হলেই আমি চলে যাব।”

গৃহিণী নিজের ঘরের খবরে অনভিজ্ঞা নহেন; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাবে?”

পরিমল চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল, “যে দিকে দু-চোখ যায়।”

গৃহিণী কুণ্ঠিত মুখে কহিলেন, “সে সবখানেই যে মন্দ লোকের কুদৃষ্টি নেই, তাই বা কি ক’রে জানবে মা? আমি বলি কি, তার চাইতে নিজে একটু সাবধান হয়ে এইখানেতেই থাক। রাত্রে না হয় আমার কাছে এসেই শোবে, সকালে নদী-চান ক’রে আসবে। আমারও বাছারা তবু সময় মতন ছুটি ভাত পাবে, আর তোমারও—তা বাছা যে বয়েস তোমার,

তাতে এই নির্দাকব অবস্থা, এতে তোমার পক্ষে কোথায় যে ভর নেই, সে ত আর বলা যায় না।”

পরিমল অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবি-ভাবিয়া ও এই সংসারভিজ্ঞা গৃহিণীটির স্মৃষ্টি-উপদেশটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে মানিয়া লইতে সমর্থ হইল না। সন্তঃপ্রাপ্ত অপমানের আঘাত তাহার অন্তরের মধ্যে আহত-নারীমর্যাদা ও গুমরিয়া ফিরিতেছিল, সে নিঃশব্দেই উঠিয়া আসি এবং সেই বাড়ীতে দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইবার ভরসা না করিয়াই নিজের পূর্বাশ্রয়েই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই তার বুকফাটান অতীতের সকল-টুকু অসহ্য স্মৃতির মাঝখানকেও সে নিজের নারী-মর্যাদাহানির বহু উর্দ্ধে বরণ করিয়া লইয়া কাদালের মতন কাদিয়া আসিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ঠিক সেই সময়টাতে নাকি ভাগ্যে ভাগ্যে সে বাড়ীর বি ছাড়িয়া যাওয়ার বড়ই গড়গোল চলিতেছিল, তাই এবার সেখানের আশ্রয় পাওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন হইল না। তবে বাড়ীর কর্তা এই জন্ত একটুখানি আপত্তি তুলিতেছিলেন যে, যদি এর পর এই আইবুড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তো কি হইবে? তবে এ আপত্তিটা তাঁর টিকিল না, যেহেতু বাটীর গৃহিণী বাসন মাজিতে তখন বেজায় নারাজ থাকায়,—“নথ” ঘুগাইয়া ঐ বুলিটাকে এই বণিয়া খণ্ডন করিয়া দিলেন যে, “সে [ ] অত ভাবিতে হইবে না। সে তখন একটা বি জুটিলেই উহাকে কোন একটা অছিলায় দূর করিয়া দিলেই হইবে, এখন তো দশদিন কাজ চালাইয়া দিক।” তা বি কিন্তু সেই দশদিনে পাওয়া গেল না এবং মাস কতকের পরেই একটা অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য কাজও ঘটয়া গিয়া দেশশুদ্ধ লোককে একে-বারে বজ্রস্তম্ভিত করিয়াছিল।

কলিকাতা অঞ্চলের এক জন বড়লোক, ওই অঞ্চলেরই কাছাকাছি তাঁর জমীদারী—এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজখবর লইয়া হঠাৎ এক দিন নিজেই উচ্চোগী হইয়া উহাকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য ইহার জন্ত তাঁহাকে বিস্তর অবাচিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহারা ইতঃপূর্বে অনাথাকে অন্ন আশ্রয় দিতে নারাজ ছিল, তাহারাই বিশেষ ক্রমে তাহার এই আকস্মিকপ্রাপ্ত সুখ-সৌভাগ্যের বিযথেষ্ট পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পরায়ুত্ব হন—এমন কি, সেখানের একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্ম অনাহৃত উপদেশে এ বিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর অধ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাপতির এই অ

নির্বন্ধ শত বিব্র ঠেলিয়া ফেলিয়াই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। বৈচিত্র্যময় জগতে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে, লোকে এই বিবাহকারী যুবককে পাগল বলিয়াই স্থির করিল। কচিং কেহ বলিল, দয়ালু কিন্তু তাহারাই মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু অতি কিছুই ভাল নয়।

পরিমলের মনটা সেই সব ভয়াবহ পূর্বস্মৃতির তোলাপাড়ার মধ্য দিয়া কোন্ সময় লঘু হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর জিন্দকে আর ততটা অন্ধ্যা অত্যাচার ও জুলুম বলিয়া তার মনে রহিল না, বরং চিরদিনের বিপন্নবৎসলতা ও অনন্তসংসার দয়া-গুণের আধার বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহার স্বতঃপ্রবাহিত প্রজ্ঞা-কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ বিপরীত স্রোতকে প্রতিহত করিয়া উথলিয়া উঠিয়া নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যকে একেবারেই ছোট করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবিচারের শাস্তি লইয়া স্বামীকে তুষ্ট করিতে মন তাহার উৎসুক ও অধীর হইয়া উঠিল।

### নবম পরিচ্ছেদ

ছোটরে কবিতা ঘুণা কবিছ যে পাপ,  
তোমারে করেছে নীচ তারি অভিশাপ।  
তাদের না কর যদি উচ্চাসন দান,  
যুটিবে না কভু তব 'নীচ' অপমান ॥

—প্রবাসী।

সূর্য্যের আলোভরা অলস-মধুর মধ্যাহ্নে কলিকাতার এই কোলাহলবিরল অংশ প্রায় পল্লীবিজনতা প্রাপ্ত হইয়া একখানি দৃশ্যের মতই প্রশান্ত হইয়া আছে। এই দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটির দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন তাহার নিরালা ঘরে চুপ টি করিয়া একটি চৌকীর উপর খোলা-জানালায় ধারে বসিয়া ছিল।

এই জানালার নীচের বাগানে রং বেরংএর কুম্ভকলি, জিনিয়া আর রজনীগন্ধা একেবারে প্রচুর-তরুরূপে ফুটিয়া আছে। ইহারই ঠিক সাম্নাসাম্নি বাড়ীর সীমান্তভাগের প্রাচীরের গায়ে একটা বক-ফুলের গাছ আধহেলা হইয়া রহিয়াছে; তাহার ডাল-পালার মধ্য হইতে একটা লুকানো পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর শিশু দেওয়ার শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ইহারই ঠিক পাশের অপরাজিতার ঝোপ-টাকে নাড়া দিয়া কয়েকটা শালিক কি যেন খুঁটিয়া থাইতেছিল এবং কিচির-মিচির শব্দে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করিতেছিল, সেটা কিন্তু বেশ

বোধগম্য হইতেছিল না। বাগানের জমীটি নববর্ষীয় কয়েকটি বর্ষণ পাইয়াই নয়নশোভন শ্রামলতায় যেন চিকণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আর্দ্র ভূণ হইতে একটা অতি মৃদু সজল গন্ধ যেন সঙ্কুচিত-ভাবে উথিত হইয়া অনিচ্ছামন্ত্রভাবে বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির বাহ্য জগতের শুদ্ধ আত্ম-সমাহিততাব নিরঞ্জনের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ত অশান্তি ও নিরানন্দে ভরপুর চিত্তটিকে শুদ্ধ যেন তাহার সেই শান্তির মাধুর্য্যে পরিপূরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যেন ইহাদের হইতে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্তি লাভ করিয়া তাহার ভিতরেই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অহোরাত্র, জাগ্রতে এবং নিদ্রাতেও যে সান্ত্বনাবিহীন শাস্তিহীন দুশ্চিন্তা বা দুষ্ট স্মৃতির তাড়নায় তাহার প্রত্যেক দণ্ড পলটুকু পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখভারাক্রান্ত, সে সবই যেন তাহার মনের মধ্য হইতে এই শান্ত-মধুর প্রকৃতির শাস্তিধারা এই মুহূর্ত্তে ধৌত করিয়া দিয়াছে।

ঘরের দরজার কাছে খুঁট করিয়া একটু শব্দ হইল। দোরটা খুলিয়া গেল, পেঁচোর মা মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যটা ভাল করিয়া দেখিয়া তার পর ভিতরে প্রবেশ করিল। একপাশে শয়নের নেয়ারবোনা ষাট, আর একধারে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ আর তারই মধ্যে কয়েকখানা ছোট বড় নোট একখানা লেফাপার মধ্যে খোলাই পড়িয়া আছে। পেঁচোর মা প্রায় নিঃশব্দে সেইখানে আসিয়া উহার মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া আবার তেমনিভাবে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, গৃহাধিকারী ইহার বার্তা কিছুই জানিতে পারিল না। টাকাগুলো তাহাকে নরেশ-চন্দ্রেরই খাজাঞ্চি বেতন হিসাবে দিয়াছিল।

বাবুর খানসামা সাতকড়ি আসিয়া ডাকিয়া উঠিল, “ম্যাষ্টার মশাই!”

প্রথম ডাকে নয়, দু তিন ডাকের পর নিরঞ্জন মুখ না ফিরাইয়া জবাব দিল, “ঐ?”

—“বলি মাইনে পেলেন, তা আমরা যে আপনার অস্থখে বিস্থখে এতটাই করলুম, বলি আমাদের বকশিস কই?”

নিরঞ্জন তদবস্থাতেই উত্তর দিল “নাও না ভাই! ঐখানেই তো আছে।” সাতু এই উত্তরই আশা করিয়া পেঁচোর মার হেয় নীতি অবলম্বন করা অনর্থক বোধে উহা হইতে বিরত ছিল। খাম হইতে নোট করখানা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কত নিই?”

“বা তোমাদের খুসী।”



“তা হ’লে এই পঁচিশের মধ্যে পনের আমার বকশিস নিলুম, আর এই দশটা টাকা আমার কাছেই আমানত রইলো, দরকার হ’লে বলবেন, বার ক’রে দোব। বাড়ীর দাসী চাকরদের কারু কারু যে বেশ একটু হাত-টান আছে, সে তো আর আমার কাছে চাপা নেই, কে কখন গের্ডা দিয়ে দেবে বই তো নয়, কি বলেন ম্যাষ্টার মশাই! রাখবো কি আমার সিদ্ধকে তুলে? তাতে খুব ভাল বিলিতি তৈরী কুলুপ লাগান আছে।”

নিরঞ্জন সব কথা—সব কেন, একটা কথাও—কানে না তুলিয়া অমনি অমনিই জবাব দিয়া চুকিল, “বেশ।”—

বোকারাম ম্যাষ্টারের নির্বুদ্ধিতা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিতে করিতে প্রসন্নমনে সাতকড়ি টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, “বাবু তো পঁচিশটা টাকা দিয়েছিলেন, আর দশটা কোন চিলে এর মধ্যেই ছোঁ মারলে। অ্যা! আমার মুখের গরাস কেড়ে খায়, সে তো সামান্য নয়! বা হোক, সন্ধান করতে হচ্ছে।”

বকফুলের গাছের ডালে সুখসমাসীন পাখীটা একটা তীক্ষ্ণ উচ্চরব করিয়া ডানা-ঝাড়া দিতে দিতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সেই আকস্মিকশব্দে চকিত হইয়া উঠিতেই নিরঞ্জনের কর্ণে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনি প্রবেশ করিল, “ম্যাষ্টার মশাই!”

আহ্বান নারী-কণ্ঠের এবং তাহা যে ‘পেঁচোর মা’ শ্রেণীর কাহারও নহে, তাহা নিরঞ্জনের স্বাভাবিক বুদ্ধিই তাহাকে জানাইয়া দিল। সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধ একটু বিস্মিত ও উত্তেজিতভাবে মুখ ফিরাইতেই এক সুদর্শনা নারীর সহিত মুখামুখী হইয়া গেল। রমণীর সাজসজ্জায় ও হাবভাবে তাহাকে উচ্চ জগতের জীব বলিয়া চিনিয়া লইতে উহার বিলম্ব ঘটিল না এবং এই পরিচয়ে একধারে বিপন্ন, বিরক্ত ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়া নিরঞ্জন যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, হাত তুলিয়া ইহার উদ্দেশ্যে সে একটা ভদ্রতার নমস্কার পর্য্যন্ত জানাইতে সমর্থ হইল না।

ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল বাড়ীর কত্রী স্বয়ং। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল বলিয়াই সে নিজের সেই ভুল শোধরাইয়া লইবার সদিচ্ছায় তাহার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আনিয়াছিল,—কিন্তু সে যে এত কঠিন, এ ধারণা তার একটু পূর্বেও ছিল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে সে চাহিতে ভয়সা করে নাই,

তাহার জুতাখোঁলা পায়ের দিকেই তার চোখ ছিল। বসন্তের গভীরতর ক্ষত চিহ্নের সেখানেও অভাব ছিল না। তার উপর সেই দুর্বল শীর্ণ পা দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে লক্ষ্য করিয়া কিছু দয়ার্দ্ৰ ভাবেই বলিয়া ফেলিল, “আমি আপনার কাছে পড়তে এসেছিলুম, যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, তা হ’লে আজ থাক।”

এই বলিয়াই সে উহার দিকে পিছন ফিরিতে গিয়া পশ্চাৎ হইতে এমন একটা সুর শুনিতে পাইল এবং তাহাতে এমন করিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল যে, যেন সেই ক্ষীণ দুর্বল ও ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একটা আকস্মিক বর্ষার মতই আসিয়া পড়িয়া তাহার পিঠের হাড়ের মধ্যে তার তীক্ষ্ণ ফলাটাকে সবেগে বিধিয়া দিয়াছিল। ভয়ানক মুখের পাংশু ছবি লইয়া আবার সে সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সামনে তাহার কীটদষ্ট পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মতই এক বসন্তক্ষত-বিকৃত এবং আগুনে বা অপর কোন দাহ পদার্থের দ্বারায় অধিকতর বিকৃতিপ্রাপ্ত অপরিচিত মুখ! তবে সেই তাহার পরিচিত স্রবের সেখা কোথা হইতে অকস্মাৎ এই অজানােকে আশ্রয় করিয়া আজ এত দিন পরে আবার এই জাগ্রত মধ্যাহ্নে ভাসিয়া আসিল? সে কি স্বপ্ন না সত্য? পরি-  
মলের বুকের মধ্যে সন্দেহ, আশঙ্কা ও তার সঙ্গেই মিশ্রিত একটুখানি যেন আগ্রহও একসঙ্গে একটা অজানা তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন—স্বপ্ন ইহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে? মানুষ কখন জাগিয়া থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারে? সে উৎসুক নেত্রে উৎকণ্ঠা ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া করিয়াই নিরঞ্জনের নতমুখ দেখিতে লাগিল এবং অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া পর্য্যবেক্ষণ-দৃষ্টিকে ভ্রমিলগ্ন করিয়া ফেলিয়া পূর্ণ অবিধ্বাসে, দীর্ঘ করিয়া একটা শ্বাস গ্রহণপূর্বক কহিল, “বই তো আমি কিছুই আনি নি, বা হোক একটু পড়ান; ইনি ব’লে গেছেন, আপনার কাছে পড়তে।”

নিরঞ্জনের যে কথার স্রব সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই, “আপনি কি পড়তে চান বলুন, আমি পড়াচ্ছি।”

এবার নিরঞ্জন এই কথাটার মধ্য দিয়া অনেকখানিই অনুভব করিল। তাহার চাকরীটা যে কি, এতদিনের পর সেইটাই এবার তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, তা সেটা যে এমন মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে, এ সংশয় সে অভাগার মনের কোণেও কখন উদ্ভিত হয় নাই। নরেশ অবশ্য কালটাকে খুব

কঠিন বলিয়াই স্বীকার করিয়া প্রথমাবধি এতৎসম্বন্ধে তাহার কৃতকার্যতারও সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য দোষ দেওয়া চলে না,— কিন্তু সেটা যে এমনই কঠিনরূপে প্রকাশ পাইবে, তাহা জানা থাকিলে, নিরঞ্জন হয় ত—তা' জানা থাকিলেই বা নিরঞ্জন কি করিতে পারিত? জীবন ও আশ্রয়-দাতাকে সে কি মুখের উপর বলিতে পারিত যে, তাঁহার এই সামান্ত কাজটুকুও তাহার দ্বারায় ঘটা সম্ভব নয়? প্রাণপণে নিজের সকল সঙ্কোচকে সে মনের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের কম্পনকে যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত সসন্ত্রমে উত্তর করিল, “তা হ'লে লাইব্রেরি থেকে কোন বই বেছে দেবেন চলুন; এখানে তো কোনই বই নেই।”

পরিমলের পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্যন্ত প্রবলবেগে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া চলিয়া গেল। সে আবার বুধাই ছুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর পবন ভীষণদর্শন দধি-মুখের রহস্য-জটিলতা যেন উলটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছু না, কোন নিদর্শনই ত নাই! তবে কোথা হইতে, কেমন করিয়া সেই পরিচিত,—বড় পরিচিত কণ্ঠের শব্দটুকু, আজ বারে-বারেই স্মৃতির অতীত, করুণ কঠিন ভয়াবহ অতীতের—মধ্য হইতে তার সমস্ত বিশ্বাসের ধূলি-জঞ্জাল ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে? এ কি তবে পরিমলের কল্পনামাত্র? এ কি সত্য নয়? এ কি তার মনের মধ্যের স্মৃতির তারে যে অবিস্মৃত অতীত আজিও দিনে রাতে সকল সময় সকল সুখ-সম্পদের মধ্য দিয়াও করুণ ও কাতর মূর্ছনার স্বাক্ষর দিয়া উঠিতে থাকে, তারই একটা রেস, আর কিছুই নয়? আবার একটা দীর্ঘতর নিশ্বাস সে মোচন করিল এবং তার পর নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্যই ইহার সাম্রাধ্য ছাড়াইতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, “আজ থাক, কাল বই নিয়ে আসবো,”—এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিজের পরিত্যক্ত আসন-খানার উপর সবেগে বসিয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাসগ্রহণ পূর্বক নিঃশব্দে আন্তরিক আত্মগত কহিয়া উঠিল, “আবার সেই ছায়া! সে নয়—তবু যেন সেই! নাঃ, মানুষ আমার আর থাকতে দিলে না। আবার দেখছি পাগল ক'রে আমার পথে বার ক'রে দেবে।”

## দশম পরিচ্ছেদ

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,  
কাতর সে যে হায়, বিষম বড়ো,  
নাই মা, বধু নাই, খেতে কে দেবে ভাই,  
কে তা'রে দেবে ঠাই, বৃষ্টি পড়ে ॥

—তীর্থ-সলিল।

পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। যদিও শুরু শিক্ষা উভয়েরই পক্ষে এই শিক্ষাদান ও শিক্ষালভ ব্যাপারের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ বা আনন্দের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না; উভয় পক্ষের সবটুকুই শুধু দায়-ঠেলাই থাকিত, সুতরাং ফলও ঠিক তদনুযায়ী প্রচুরতরুরূপে ফলিয়া উঠিতে লাগিল, অর্থাৎ বড় একটাই দেখা গেল না। পরিমল প্রথম দিনের সেই সঞ্চারিত সঙ্কোচকে প্রাণপণে যুক্তি-তর্ক ও সিদ্ধান্তের দ্বারায় কোনমতে তাহার মন হইতে অপসৃত করিয়া-ছিল। নিজেকে সে এই বলিয়াই শান্ত করিতে চাহিল যে, মানুষের মত মানুষ যে কত থাকে; একজনের গলার স্বরের মতন কি আর একজনের গলার স্বর থাকে না? এর হাসি তো দেখি নি; বোধ হয়, এ মোটেই হাসে না, কিন্তু তাঁর,—তাঁর হাসিটিই যে তাঁর সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য ছিল। এর আড়ন সেই রকমই বটে, কিন্তু সে রং, সে চোখ, সে চুল, সেই বলিষ্ঠ দৃঢ় গঠন—সে সব এর কোথায় কি? তার পর তাহার ঠোঁটের কোণে একটি ফোঁটা হাসি এবং চোখের কোণে ফোঁটা ছুই অশ্রু দেখা দিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমিও কি পাগলের বাতাস লেগে পাগল হ'লেম নাকি? কি ছাই ভাবছি? যাকে নিজের চোখে মর্তুতে দেখলেম, পুড়িয়ে পর্যন্ত এলো, তার সঙ্গে কার কতটুকু মিল কোথায় খুঁজলে পাওয়া যায়, সেই ভাবনার মাথা ঘামিয়ে লাভ? মনকে সে কড়া হুকুমে ঠাণ্ডা করিতে চাহিল। সে দিন পড়িতে গিয়াই সে বই খুলিবার আগে ভাগেই মুখ খুলিয়া এবং মুখ তুলিয়া নিরঞ্জনের বিদগ্ধ ও বিব্রত মুখের দিকে করুণচোখে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতরটা যেন করুণার ও বেদনার নিবিড়ভাবে ভরিয়া আসিল, তখন সে গভীর সহানুভূতি ও ব্যথার বিজড়িত চিত্তে তাহার সহিত আলাপ করিতে বসিল। নিরঞ্জন নতমুখে তাহার পাঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ম্যাকমিলানের ছাপা বুল-পাঠ্য বইএর মাপাজোকা রচনার পরিবর্তে তাহার কানে আসিয়া সবিস্ময়ে এই প্রগটা প্রবেশ করিল—



“আচ্ছা মাষ্টার মশাই! আপনার দেশ কোন্-  
থানে ছিল?”—

নিরঞ্জন প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তার পর হাতের  
আঙ্গুল দিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল; আরও  
খানিক পরে সে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল,  
“বসিরহাট।”

“বসিরহাট! তবে তো ঠাকুরবিদের দেশেরই  
লোক আপনি! হারাগচন্দ্র ঘোষেদের জানেন?  
নাম শুনেছেন অবশ্য? সেই হারাগ ঘোষের মেজো  
ছেলেই আমার নন্দাই। তার নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ  
ঘোষ। সে গেল বছর ওকালতি পাশ ক’রে উকিল  
হয়েছে। জানেন তাকে? বড় ভাল ছেলে সে।  
নেহাং ভালমানুষ, যেন গো-বেচারী একেবারে!”—

পরিমলের মনের মধ্যে বোধ করি, মানুষের পরিচয়ে  
তাহার গো-জন্মের আভাসটা একটু বেশী পরিমাণে  
সুব্যক্ত হওয়াটাকেই তাহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া  
বোধ ছিল, সেই জন্যই সে স্নঃযোগ পাওয়া মাত্র  
তাহার এই নিরীহপ্রকৃতির নন্দাইটির প্রশংসা উচ্চ-  
সিতকণ্ঠে করিয়া বসিল এবং ইহার মধ্যে প্রস্তুপ্ত  
রহিল যাহারা ‘গো-বেচারী’ নহে, তাহাদেরই সম্বন্ধে  
ঈষৎ একটুখানি গ্লানির আভাস।

নিরঞ্জন আবার যেন কতকটাই ইতস্ততঃ করিল।  
তারপর সঙ্কুচিতভাবে সে জবাব দিল, “না না, শুঁকে  
আমি চিনিনে, আমি অনেকদিন দেশ-ছাড়া।”

ঈষৎ দমিয়া গিয়া পরিমল তখন ছোট্ট করিয়া  
একটি “ওঃ” বলিয়া নিজের পাঠ্যপুস্তকের পাতা  
উন্টাইতে আরম্ভ করিল এবং তৎপরে পুনশ্চ একটু-  
খানি আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিয়া উঠিল, “আচ্ছা,  
আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন? আপনার মা  
বাবা নেই বোধ হয়? আচ্ছা, তাই বোন নিশ্চয়ই  
আছেন? আর কেউ? আর কোন আত্মীয়?”

একটা দীর্ঘ ও ব্যাখ্যাতারতুর নিশ্বাসের শব্দ  
তাহার সকল উৎসাকেই দমিত করিয়া দিয়া আরও  
একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল,  
—“কেউ না।”

পরিমলের বুকের মধ্যে এই আর্ন্ত স্বরটা এমনি  
ভীষণবলে বাজিয়া উঠিল যে, সেই নিঃসঙ্গ নিঃশেষিত  
মরুভূমির মতই জীবনের ভয়াবহ শূন্যময়তা সে যেন  
তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরেরও অন্তরে অনুভব করিল ও  
তাহার অকৃত্রিম সহানুভূতি একান্তভাবেই এই সর্ব-  
হারা এবং আত্মহারা অভাগাকে বেঁধন করিয়া ধরিল।  
সে যে জানে,—এই নিঃসঙ্গ নির্বাক্ষর পরিত্যক্ত  
জীবনের দুঃখ যে কি বিষম, কি দুর্বিষম—সে যে নিজে

তার ভুক্তভোগী! সে যে নিজের বুকের ভিতর  
হইতে এ অপরিমেয় দুঃখের রিক্ততা ও তিক্ততা  
আজও মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিতেছে! যদি  
যে সদয়চিত্ত এই পথপ্রান্তের মরণশয্যালীন দুর্বস্থার  
চরমে পতিত ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়া সযত্ন সেবার  
জিয়াইয়া তুলিলেন, সেই তাঁহারই উদার অন্তর  
তাহারও জন্য না কাঁদিত,—যদি সেই তিনিই  
তাহাকেও অমনি করিয়াই পথের ধূলার মাঝখান  
হইতে—শুধু তাই নয়—একেবারে নিজের বুকে  
তুলিয়া না লইতেন,—তবে আজ তাহার অবস্থা ইহার  
চাইতেও আর একটু শোচনীয় হইয়া দাঁড়ইত কি না,  
তাও বেশ জোর করিয়া বলা যায় না! স্বামীর দয়া  
যে কি অসীম এবং তাঁহার উপরে তার কৃতজ্ঞতা যে  
কতই গভীরতর হওয়া উচিত, তাই ভাবিয়াও,  
নিজের মধ্যে যে জিনিষটা অপরিপািত হওয়া উচিত  
ছিল, তাহা পর্যাপ্ত নহে দেখিয়া, নিজের প্রতি সে  
বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মনটাকে অল্প দিকে  
ফিরাইতে চাহিয়া তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল,  
“আপনার হাতের লেখাটি তো খুবই সুন্দর! ইংরেজী  
উচ্চারণও খুব কম জানার মত লাগে না। তা হ’লে  
আপনি কেন কাজ-কর্ম না ক’রে অত কষ্ট সহ-  
ছিলেন? কত দিন বাড়ীছাড়া হয়েছেন আপনি?”

নিরঞ্জন এই প্রশ্নগুলো নতমুখে শুনিয়া গেল।  
কিন্তু তাহার ভাবশূন্য নিশ্চল শরীরে ইহার উত্তরের  
কোন চেষ্টা জাগ্রত হইতেছে কি না, তাহার কোনই  
প্রমাণ পাওয়া গেল না। অগত্যা পরিমল তাহার  
কৌতূহলবৃত্তিকে দমনে রাখিয়া নিজের পাঠ্যপুস্তকে  
মনোনিবেশ করিল এবং অনেকখানি পড়া হইয়া গেলে  
বখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার মাষ্টার মশাইএর  
কানে তাহার পাঠের শব্দটুকু পর্যাপ্ত প্রবেশ করিতেছে  
না, এমনি গভীরতর অন্তমনস্কতায় তাহার মনকে  
অভিভূতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তখন সে কিছুক্ষণ  
নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল  
ও তার পরই কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সমস্ত  
শরীরে ও মনে ভীষণভাবে শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি  
সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার  
মনে হইয়া গেল, সে যেন কোন এ জগতের প্রাণীর  
সান্নিধ্যে নাই,—এই যে মানুষটির সামনে সে  
রহিয়াছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যেন কোথাও  
একটু যোগ আছে কিন্তু সে যেন পুরাপুরি এখানের  
নয়। চেহারাখানা এর মোটামুটি দেখিতে মানুষেরই  
মত বটে, গলার স্বরও এই দেশেরই সম্বন্ধ জ্ঞাপন  
করে, কিন্তু না,—তবু না—কিছুতেই ইহাকে যেন

রক্তমাংসের জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না! এ যেন কোথাকার একটা ছায়া, কোন দূরান্তরপ্রস্থিতের একটুখানি মায়ামূর্তি এর মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায়। শুধু সেটুকু—আর বাকি সবখানিই এর অবাস্তব, অসঙ্গত, অনাস্থ্য! পরিমলের মনের মধ্যটা ছমছমে হইয়া উঠিল। এই শব্দহীন,—স্পন্দনেরও চিহ্ন যাহার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট নহ—তাহার সান্নিধ্যকে সত্যে বর্জন করিয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

নরেশ সে দিন অপরাহ্নে তখন বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, পরিমল খবর দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, “দেখ, নিরঞ্জনকে আর কোন কাজ দিবে আমার জন্য অন্ত কোন শিকড়িত্রী ঠিক ক’রে দিতে পারো না? সেই যদি পরিশ্রমই করবে, তা হ’লে যাতে কাজ হয়, সেই রকমই তো করা ভালো।”

নরেশ ইদানীং পরিমলের মুখে মাষ্টার মশাই’এর বিস্তারিত ও বিনয়ের বিস্তার খ্যাতি শুনিতেছিলেন। আজ আবার হঠাৎ এই অনুযোগে কিছু বিস্তারিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কেন, আবার কি হলো?”

পরিমল বলিল, “হয় নি কিছুই, তবে পড়া বড় না কি না, তাই বলছি, উনি বড়ই অন্তমনস্ক, আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়।”

নরেশ নিজেও এটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই জ্বর কথার অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারিয়া ঈষৎ চিন্তিত-মুখে কহিলেন, “আচ্ছা, তা হ’লে ভেবে-চিন্তে দেখি, ওকে কি কাজ দিতে পারা যায়। কিছু না দিলে তো ওকে ওম্নি রাখা যাবে না, সেই যে হয়েছে মহা মুন্সিল!”

পরিমল বোধ করি পূর্বাধি এ বিষয়ে কিছু কিছু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সে প্রস্তাব করিল—“ছাপা-খানার কোন কাজ দেওয়া চলে না?”

নরেশ কহিলেন, “দেখি, তাই না হয় কোন কিছু যদি পারে। বাংলাটা কি রকম জানে বুললে কিছু? ইংরাজী যে মন্দ জানে না, সেটা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু বাংলা যদি তেমন—”

পরিমল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া আসিল ও উহা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, “প’ড়ে দেখ।”

নরেশ কাগজটার ভাঁজ খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর পৃষ্ঠায় একটা কবিতা লেখা। কোতুলী হইয়া পড়িলেন,—

“কাদিতে এসেছি আমি কাদিয়াই চ’লে যাব,  
এসেছি অনন্ত হ’তে অনন্তেই মিশাইব।  
দুঃখের তরঙ্গ তুলি, এসেছি আপনা তুলি,  
খুঁজিব বিরাট বিশ্ব কোথা গেলে সীমা পাব।  
জগতে হবে না সুখী এ পোড়া পরাণ-মন।  
অসীম দুঃখেই আমি ক’রে আছি আলিঙ্গন।  
আপনি নীরবে রহি, আপন যাতনা সহি,  
অপরে করিতে দুঃখী চাহে নাকো এ জীবন।  
ভবের সুখের আশা করিয়াছি বিসর্জন।  
না চাহি কাহারও স্নেহ, কাহারও ভালবাসা,  
রাখি নে রাখি নে মনে পার্থিব প্রেমের আশা  
কারও উপেক্ষার হাসি, সহিতে গগনা রাশি—”

কবিতা অসমাপ্ত। নরেশ পাঠ শেষে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কে লিখেছে—নিরঞ্জন?”

পরিমল মাথা ছুলাইয়া সায় দিল। তার পর বলিল, “আরও দুটো একটা ওঁর টেবিলে প’ড়ে থাকতে দেখেছি, এফটা মোটে ক’টা লাইন লেখা। সেটা আমার মনেই আছে।

পাবো কি না পাবো ফিরে কেন বৃথা এত ভয়?

কেন, কেন এ সংশয়?

যখন দাঁড়াব গিরে তোমার চরণতলে,

আমার গচ্ছিত নিধি ফিরাইয়া দাও ব’লে,

না দিবে পারিবে কি গো ফিরাইতে দয়াময়!

তবে কেন এ সংশয়?

দেখ, মাষ্টার মশাই’এর বউ নিশ্চয় ছিল, ম’রে গেছে, তাইতো ওঁর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না?—কিন্তু জ্বীকে কি রকম ভালবাসে বল তো?”

নরেশ হাসিয়া নিজের জ্বর গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া জবাব দিলেন, “ঠিক যেন মহাদেবের সঙ্গে সমান! জ্বীটিও তো সতী-ঠাকুরণের মতই পতির জন্য দেহ-ত্যাগ ক’রে থাকবেন। তা না হ’লে কি আর অতটাই পারা যায়?”

কথাটির মধ্যে বেশ একটুখানি খোঁচা খাইয়া পরিমলও সেটুকু তৎক্ষণাৎ শোধ করিয়া দিল।—  
“তাই কি আর বলতে পারা যায়? এই সে দিন কালীঘাটে একটি মেয়ে স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ দেখে আর ডাক্তারের মুখে ‘আশাহীন’ কথাটা শুনেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ব’লে তক্ষুনি নিজের প্রাণটা নষ্ট ক’রে ফেলে, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকটি সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন এবং জ্বর অত বড় আত্ম-ত্যাগের মূল্য শোধ করলেন কি দিয়ে জানো?”



বৎসর না ঘুরতেই একটি নূতন বউ ঘরে এনে। এই তো সব তোমরা!”

নরেশ এ ঘটনাটি জানিতেন, কাজেই মাথা পাতিয়া এই নিন্দাটুকু গ্রহণ করিয়া লইতেই হইল এবং হাসিয়া উঠিয়া রহস্ত করিয়া জবাব দিতে হইল, “তা মহাদেবও তো শেষটায় পার্বতীকে বিয়ে ক’রেছিলেন। তাঁরটিরও হয় তো সেই রকমই অংশাবতার হয়েছিল টিল, তার কে কি জানে বলা! আচ্ছা, তা হ’লে নিরঞ্জনকে আমাদের ‘কর্ণধারেরই’ কর্ণ ধরিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমার উক্ত কার্যের এক জুন উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর খোঁজ-খবর করতে হবে।”

পরিমল কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া চাপা হাসির মধ্যে তর্জন করিয়া উঠিল, “যাও।”

### একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল তুমি মহীয়ান,  
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ।

ইন্দ্রিয়া দেবী।

আদিগঙ্গার উপরে ছোট্ট একখানি লাল-রংয়ের দোতারা বাড়ীর গঙ্গার ধারের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ছাদে কয়েকটি ফুলের গাছ টবে সাজান এবং তারই মধ্যে একখানি কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া একটি মেয়ে সেতার বাজাইতেছিল। টবের গাছগুলি সজলসিক্ত, তখনও ভিজামাটির গন্ধটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। রজনীগন্ধা দু’একটা ফুঁই এবং কতকগুলি ভুঁই-চাপা, জিনিয়া আর কস্মিয়া জাতীয় ফুল অল্প বিস্তর ফুটিয়া রহিয়াছে। গোলাপের গাছ দুটো একটা আছে; কিন্তু ফুল তাহাতে একটাও ফুটিয়া উঠে নাই।

মেয়েটির বয়স সতের বা আঠারোর বেশী নয়। রূপ, হাঁ, তা রূপ তাহার শরীরে নেহাৎ কম ছিল না। গোলগাল গড়ন, অথচ একটু ক্ষীণ দেহ, রং আরমানী বিবিদের মত না হোক, তবু সচরাচর বাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে ফরসা রং বলে, তাইতেই একটুখানি জোলুস ছিল। চোক দুটি মাঝারি, নাক, কপাল, ঠোট সবই তাহার মাঝামাঝি, শুধু চুলগুলিতে বড় বেশী বিশেষত্ব ছিল।—কৌকড়ান না হইলেও, রেশমের মতন নরম, কাল ডেউখেলান খোলা চুলগুলি তাহার বাজনার তালে তালে তাল

দিয়া যখন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, তখন অপ-  
রাহের শুভ্র-শুভ্র আকাশের একপ্রান্তে আকস্মিক  
উদ্ভিত প্রাবৃত মেঘের কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া  
দিতেছিল। একেবারেই নিরাভ্রমর বেশভূষণে এই  
সুশ্রী মেয়েটিকে যেন বেশী করিয়াই সুন্দরী মনে  
হইতেছিল; বাজনা বাজানর সখ মিটিয়া গেলে সে  
কোলের উপর হইতে যন্ত্রটাকে নিজের পাশে নামাইয়া  
রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা  
ভুলিয়া দিয়া বেঞ্চির পিঠের উপর নিজের পিঠ চাপিয়া  
একটু আরেস করিয়া বসিল এবং তার পর শুন শুন  
করিয়া একটা গান আপনার মনেই গাহিতে লাগিল।  
বাজনার সুর যখন চড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশের বাড়ীর  
ছাদে যে বৃকটি প্রায় প্রত্যহই তাহার উঁচু পাঁচিলের  
ছোট ছোট ফুকর দিয়া তাহার অদৃশ্য প্রায় মূর্তিটাকে  
একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কৃতার্থ হইবার লোভে  
উকি-ঝুঁকি মারিয়া শেষে বিরক্তমনে আর এক দিকে  
চলিয়া যায়, আজও তাহার সেতারের সুর নিজের  
সেই নিত্যকর্মপদ্ধতিতে জট রাখে নাই। কিন্তু  
গানের এ গুঞ্জন সেই উৎসুক পিয়াসীর কর্ণগোচর  
পর্যন্ত হইল না, এ শুধু এই পুষ্পবাসিত, নিরানন্দ  
ছাদটির বুকেই একা একা নিজের সকল গুচ্ছনার  
মুচ্ছিত হইয়া রহিল। সে একেবারেই যেন আপনাকে  
ভুলিয়া গিয়া অন্তমনস্কভাবে গাহিতেছিল—

“এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে, ফিরে এসো।

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত—

নাথ হে, ফিরে এসো।

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো, ওগো করুণ কোমল এসো,  
আমার সজল জলদ নিষ্কান্ত, সুন্দর ফিরে এসো।”

গানের সঙ্গে যখন প্রাণের অনিষ্টের সংযোগ  
ঘটিয়া উঠে, তখন গানের বাণী আর বাহিরের শব্দমাত্র  
ধাকে না, তাহা প্রাণের কথার পরিণত হইয়া যায়,  
গান তখন ধ্যানের আসন গ্রহণ করে। এই  
গায়িকাও তেমনিতির গুণনক হইয়া গিয়া বেঞ্চির  
পিঠে মাথা রাখিয়া এলায়িতদেহে অর্ধমুদ্রিতনেত্রে  
পায়ের তালে তাল দিয়া যেন গানের বাণী ভুলিয়া  
গিয়া প্রাণের ভাষাতেই ভাসিয়া চলিতেছিল,—

“আমার নিতি সুখ ফিরে এসো,

আমার চিরসুখ ফিরে এসো;

আমার, সব সুখ দুঃখ মন্থন করা—

বাহিত ফিরে এসো,—

এই ছাদে আসিতে হইলে সিঁড়িতে উঠিয়া যে  
দালানটা পার হইয়া আসিতে হয়, সেইখানে ঠিক

সেই সিঁড়ির মাথার জুতাপরা পারের শব্দ হইল। গানের সুরে ■ ভাবে মন ছাইয়া থাকায় গীতকারিণী তাহা জানিতে পারেন নাই দেখিয়া, যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, সে সেইখানেই একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। চুরি করিয়া পাশের বাড়ীর লোকটির মতন গান শোনার জন্য যে রহিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হইল না। বোধ করি, কোন একটা সংশয় বা দ্বিধার পড়িয়াই সে ওই রকম চলচ্চিত্ত বা মানসিক কোন দ্বিধায় দোহলায়মান হইয়াই স্থির রহিল। একবার যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া বাইবার জন্যও মন তার যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার সিঁড়ির ধাপের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানর ভঙ্গীতেই প্রমাণ করিয়া দিল। আবার কি ভাবিয়া কে জানে, সে নিজেকে ফিরাইয়া লইয়া ছাদের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তার পর যেন মনকে আরও একটু শক্ত করিয়া লইয়া একেবারে গট গট করিয়া সঙ্গীত-কারিণীর পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল—

বোধ করি বা একটু শব্দ হইয়া থাকিবে—মেয়েটি তখনই গান বন্ধ করিল। চোখ মেলিয়া ও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই আন্তে আন্তে উঠিয়া বসিল, তার পর মুখের উপর কাঁপাইয়া পড়া চুলের গোছাটাকে ঠেলিয়া দিয়া সেই মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে পড়িয়া গড়া হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া অতঃপর সে চুপটি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রকার ভাল মন্দ একটি সম্ভাবণের কথাও তাহার মুখ দিয়া যেন বাহির হইল না। মনের মধ্যে একটা বড় রকম ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল কি না, তা অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে ওই গানটাই যে সে বিশেষ করিয়া এমন সময়টার গাহিতেছিল, ইহারই জন্য লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ঘুরিয়া আসিয়া ইহার পরিত্যক্ত আসন-খানায় বসিয়া পড়িলেন এবং ইহারই হস্তচ্যুত বাজনাটা নিজের জামুর উপর তুলিয়া ধরিয়া বাজনা-রাখা জায়গাটা ইন্দিতে দেখাইয়া দিয়া উহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, “বসো”।

মেয়েটি উহার পাশের জায়গাটিতে না বসিয়া খানিকটা দূরে খালি মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তখন নরেশ—আগন্তুক নরেশচন্দ্র একবার বিব্রত ও অসুস্থস্বচ্ছন্দে উহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণে সেতারের ঝঙ্কার তুলিয়া অসুস্থতার সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটা গাইবে কি?”

মেয়েটির মুখের উপর কোন ভাবের রেখাই পড়ে

নাই,—তা যা ছিল, সে তার ■■■ ভিতরেই লুকানো ছিল, মুখখানাকে অমন ভাবশূন্য রাখিতে মনের মধ্যে তাহার যে কতখানি বেগ দিতে হইতে-ছিল, তা শুধু সেই জানে, তবে বাহিরের সে চেষ্টাটা তার ব্যর্থ হয় নাই। মাথা হেলাইয়া সে নিজের সম্মতি জানাইলে নরেশ অনির্দেশ্যভাবে তারের উপর অঙ্গুলীর ঘা দিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, “কোনটা গাইবে?”

সে নম্রস্বরে জবাব দিল, “যেটা বলবেন।”

“আমি যেটা বলবো, সেটাই যে তোমার গাইতে ইচ্ছে হবে,—এমন কি কথা আছে? যেটা তোমার ভাল লাগবে, সেইটাই তার চাইতে গাও না কেন সুখমা!”

সুখমা ক্ষণকাল মাথা নত করিয়া কি ভাবিল, তার পর মুখ না তুলিয়াই আন্তে আন্তে গান ধরিল—

“যার যেন মোর সকল ভাগবাসা,—

প্রভু! তোমার পানে তোমার পানে—

তোমার পানে,—

যার যেন মোর গভীরতর আশা—

প্রভু! তোমার টানে তোমার টানে—

তোমার টানে,—

গানটা আরম্ভ করিয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল, এ গানও আজ ইহার সাক্ষাতে তাহার গাওয়া ভাল হয় নাই। আধ্যাত্মিক হিসাবে এ সব খুবই বড় জিনিষ বটে এবং ছোট বড় সবারই এ জিনিষের উপর দাওয়া আছে। কিন্তু মানুষ সব কিছুই বড়র দিকটার চাইতে ক্ষুদ্র অংশটুকুকেই যে বড় সহজে দেখিতে পার—অথবা দেখিতেই চাহে। অর্থ-বিকৃতি ঘটাইয়া এই সর্বস্বান্তকর আত্ম-নিবেদনকে যে, নিজের ভোগে লাগাইতে না পারা যায়, তাও তো নয়! তার চেয়ে সে যদি গাহিত,—

“আমার মাথা নত করে দাঁও হে—

তোমার চরণধূলার তলে,

সকল অহঙ্কার হে আমার—

বুচাও চোখেই জলে!”

না, তাহাতেও তার মনের দুর্বলতা হয় তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা সূচিত না!—উপায় নাই!

গান শেষে নরেশ বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফুল গাছের টবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রশংসাসূচকভাবে বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ ভারি



সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে তো তোমার! সুখমা!  
তোমার সেই চন্দনা কি কি কথা কহিতে শিখেছে?  
কই সেটাকে যে দেখছিনে? ননীবাবু তো তার  
প্রশংসা করতে শত মুখ হ'য়ে ওঠেন।”

সুখমাও তাহার মাস্তবান অস্তিথির সঙ্গে সঙ্গে  
উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; জবাব দিল, “সেটাকে আমি  
খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েচি।”

“উড়িয়ে দিয়েছ! ওঃ, অসাবধানে উড়ে গেছে  
বুঝি? সুন্দর পাখীটা ছিল।”

“সুন্দর ব'লেই তো তাকে তার কুৎসিত বন্দীদশা  
থেকে মুক্ত ক'রে দিলাম। স্বাধীন হয়ে কি আনন্দেই  
সে উধাও হয়ে নীল আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল!  
তার মনে তখন কতই না আনন্দ হচ্ছিল।”

নরেশ মৌন বিস্ময়ে দু' চোখ ভরিয়া সেই  
এতক্ষণকার নির্বাক এবং এক্ষণে উচ্ছ্বসিতমুখী  
নারীর সহসা উজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।  
যেন তাহার মনের আবটা একটুখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে  
পারিয়া চরন-করা এক-গোছা রজনীগন্ধা লইয়াই  
ফিরিয়া তাহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,  
শান্তকণ্ঠে কহিলেন, “সুখমা! স্বাধীন হওয়াই কি সর্বত্র  
বাঞ্ছিত? স্বাধীনতার মধ্যে দুঃখ নেই, লজ্জা নেই?”

সুখমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা  
উঁচু করিয়া বলিল, “আছে, যতদিন না মানুষ নিজের  
উপর বিশ্বাস করতে শেখে, সে আশঙ্কাও ততদিনের।  
কিন্তু যদি কোন দেবতার আশীর্বাদ তাকে স্বাবলম্বনের  
মহৎ শিক্ষায় দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে, তখন—তার পর  
থেকে অধীন জীবনের লজ্জা তার পক্ষে সব চেয়ে বড়  
লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় না কি?”

নরেশ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তার পর  
অতি মৃদু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস স্তম্ভপূর্ণে মোচন  
করিয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তুমি  
আমার আসতে লিখেছিলে কেন?”

সুখমা আবার নতমুখী হইল, নরেশের দৃষ্টি হইতে  
নিজের মুখ সে একটুখানি আড়াল করিয়া রাখিয়া  
শান্ত অথচ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল, “এমন ক'রে আর  
তো আমার দিন কাটচে না, তারই একটা উপায়  
ক'রে দেবার জন্ত আমি আপনাকে বিরক্ত করতে  
বাধ্য হয়েছি। আমার অপরাধ দয়া ক'রে নেবেন  
না। এ মহা পাপকে ধ্বংস ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন,  
তখন তো ফেসতেও পারছেন না। কিন্তু যা ভাল  
হয়, কোন কিছু একটা করুন। না হয় এই খাঁচার  
দরজাটা খুলেই দিন। আমি এমন ক'রে থাকলে  
পাগল হয়ে যাব বোধ হচ্ছে।”

নরেশচন্দ্র এই কথার একটুখানি ব্যথিত হইলেন।  
সহসা জোর করিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ-  
পূর্বক তিনি ঈষৎ আবেগভরে কহিয়া উঠিলেন,  
“আমার নির্লিপ্ততা তোমার দুঃখ দিয়েছে মনে হচ্ছে,  
কিন্তু তুমিই যে আমার কাছ থেকে সে অধিকার  
জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছ সুখমা! আমায় যে তুমি  
বারণ করেছিলে,—তাতেই তো আসি নি।”

সুখমা মুখ তুলিল না! সেই আধ-ফেরানো  
মুখেই চাপাকণ্ঠে সে উত্তর দিল, “ঈশ্বর জানেন,  
তার ■■■ আমি একটুও দুঃখিত নই। আপনার  
অম্লান চরিত্র আমার জন্ত লোকের চোখে আজও  
রান হয়ে রয়েছে, আর সে দাগ নারায়ণের বুকের  
ভৃগুপদচিহ্নের মতন হয় তো চিরস্থায়ী হয়েই রইলো।  
এতবড় অভাগীকে যে শুধুই নিজের দয়াগুণে আশ্রয়  
দিয়ে রেখেছেন,—তেমন কথা বিশ্বাস করবার মত  
উদারতা ■ সংসারে ক'জনের আছে? তার উপর  
এখন আপনি বিয়ে করেছেন। আপনার স্ত্রী,  
বৌ-রাণীর কানে যদি ওঠে, আপনাদের দাম্পত্য  
জীবনের শাস্তি নষ্ট হবে, সে আমি জানি বই কি!  
তা নয়, তা নয়; বিশ্বাস করুন। কিন্তু সত্যি সত্যি  
আর যে আমি পারচি না। আমার এ বন্ধনহীন  
অবস্থা আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না! আপনি  
বুঝতে পারছেন না, আমার এই খাঁচা আমার কত  
বড় অসহ্যই যে হয়ে উঠেছে! এর বাইরে আমার  
কাজ দিন—বা হোক একটা সামান্ত কাজ দিন।  
কাজের অভাবে আমি ম'রে যাচ্ছি। আমি যে  
একটা মানুষ, আমি যে বস্ত্র নই, এই বিড়ম্বনার  
প্রাণ আমার বার হয়ে যাচ্ছে। শুধু গান, শুধু  
বাজনা, শুধু খাওয়া ও ঘুমান, এ কি সহ্য করা যায়?”

সুখমা স্বগভীর নিশ্বাসে যেন তাহার অন্তরস্থ অসহ-  
নীয় যন্ত্রণানলের অনেকখানি বাহিরে প্রেরণ করিয়া  
নীরব হইল, কিন্তু নরেশচন্দ্রের কোমল চিত্তে  
তাহার সেই মর্ম্মবিদারী বেদনার কাতর কণ্ঠ অনেক-  
ক্ষণ পর্যন্তই স্মরভরা বীণার তারের মত আপনা  
আপনি বাজিয়া চলিল। এ যে কত বড় ব্যথার অভি-  
ব্যক্তি, কি হতাশার আবেদন, সে কথা যে তিনি  
জানিতেন।

তিনি একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, “আমি  
বুঝি বই কি বেদানা! তোমার দুঃখ যদি আমি না  
বুঝতুম,—সেই প্রথম দেখার দিনে, একটুকু ছোট্ট মেয়ে  
যখন তুমি, সেই তখন থেকেই যদি না বুঝতুম,—তা  
হ'লে হয় তো তোমায় আজ আমার এত কাছে এনে  
দিতে পারতাম না! আমি জানি,—তোমার দুঃখ

আমি জানি। তোমার আত্মত্যাগ সেও যে কত বড়, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। সে যদি ভুলতে পারতুম, আজ তোমায় আমাকে চিঠি লিখে ডেকে আনতে হতো না। কিন্তু শোন সুসমা! তোমার এই বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আমি ক্রমাগতই ভেবেছি, ভেবে কিন্তু কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পাই নি। দেখ, হয় তো এখনও অনেকদিন তোমায় বাঁচতে হবে। তার আগে রোগ ও জ্বরার আক্রমণে অক্ষম হয়ে সেবার দরকার হওয়ারও কিছুই বিচিত্র নয়। তার পর একটা অবলম্বন না রাখলে চিরদিন তোমার কাঁটবেই বা কি নিরে? কোন একটা পথ তুমি এখনও বেছে নাও।”

সুসমা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না, বা দিবার চেষ্টাও দেখাইল না।

নরেশ তাহার এই নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যে ইহাকে অর্ধ-সম্মতি মনে করিয়া ঈষৎ উৎসাহিতভাবে কহিতে লাগিলেন—“তোমার মায়ের যে ইচ্ছার উপর আমি তোমার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, দেখছি, তোমার মনের সঙ্গে সেটা ঠিক সায় দিচ্ছে না। তুমি সে দিকে মন দিতে পারচো না।—”

সুসমা কহিল, “তাই বা পারচি কই?”

নরেশ ক্ষণকালের জন্য সচিন্তিত নীরব থাকিয়া পরে একটা নিখাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন “কিন্তু একটা মানুষের জীবন যে কোন রকমের কর্তব্যবদ্ধন-শূন্য, নিরালস্য ও ভবিষ্যতের আশাতরসাবিহীনভাবে টেকে থাকতে পারে না, সে তো তুমি ক্রমেই বুঝতে পারচো? তাই অনেক ভেবেই আমি—যাক্ কিন্তু হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য যে সব সমাজে সমাজবিধির নিয়ম একটু শিথিল, সেখানের কোন কোন লোকে—”

যে কথাটা নরেশচন্দ্রের জিভের আগায় আটকাইয়া পড়িতেছিল, সেটা শেষ করিবার প্রয়োজনও হইল না। অকস্মাৎ উচ্চ এবং মর্ম্মভেদী কণ্ঠে, “আপনি এই কথা বলেন!—”

এইটুকু বলিয়া উঠিল এবং তার পরই বক্ষবদ্ধ ঘুরিয়াপড়া পাখীর মত স্থলিত পদে সুসমা প্রায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার বুক চিরিয়া তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া তখন একটা উদ্দাম ক্রন্দন ঝরণার মতই বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে যে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

নরেশচন্দ্র অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারও

বুকের মধ্যে তখন একটা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথার সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। বহুদিনের পুরাতন অঞ্চল অ-বিস্মৃত স্মৃতি মনের মধ্যে যেন নূতন হইয়া আবার ফুটিয়া উঠিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কহিলা তাপস চাহি মোর মুখে—

কোন দেব আজি আনিলে দিবা?

তোমার পরশ অমৃত-সরস—

তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

—কাহিনী।

আট বৎসর আগের কথা;—বর্ষার ঝিপ্ ঝিপে বৃষ্টিতে কাদার রাস্তা-ঘাটের দুর্দশা যেমন হইতে হয় তেমনই হইয়াছে। আকাশ ঘেলিটে, ঢলনামা গঙ্গার জলের মতই তাহারও যেন কর্দমাক্ত ময়লা রং। সূর্য্যের দেখা-শোনা পাওয়াই ভার, রাত্রে চাঁদ তারা যে কত দিনই ওঠেন নাই, তার হিসাব ছিল না। এই রকম সময়ে একদিন চাঁপাতলার গলির মোড়ে একখানা মোটর গাড়ী কণ্ঠে স্রুটে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রবেশপথেই তার কল বিগড়াইয়াছিল, সে আর চলিল না। গাড়ীর আরোহী দুজন ইহাতে বেজার বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ মাদ্রাজী সোফারের সঙ্গে বকা-বকি করিলেন ও শেষটার অগত্যা নামিয়া পড়িতে হইল।

দুজনের মধ্যে এক জন অপর জনকে বলিলেন, “ওহে ননি! জ্বাজ আর তা হ’লে হলো না, চলো, ট্যাক্সি নিরে সিনেমা টিনেমা কোথাও একটা ঘুরে আসা যাক্।”

ননী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “কিন্তু তার গানের খ্যাতি শুনে আপনি যে গান শুনতে আজ আসবেন, এ খবর আমি তাকে পাঠিয়েছি। ডালিম আপনার জন্য যে অপেক্ষা ক’রে থাকবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি যে, থিয়েটারে তোমার গান রাজা বাহাদুরকে মুগ্ধ ক’রে দিয়েছে।”

‘রাজা বাহাদুর’ অগ্রসর ক্রকুটী করিলেন, বলিলেন, “তা ব’লে তো আর কাদা মাখামাখি হয়ে যেতে পারিনে। তা ভিন্ন অত সব বলতেই বা তুমি গেলে কেন? গান অবশ্য ভালই লেগেছিল, যে দিন হয় তখন একদিন শুনলেই চলতো। বিশেষতঃ ওদের



বাড়ী গিয়ে গান শুনতে আমার তেমন প্রবৃত্তিও  
হচ্ছিল না। এ হয় তো ভালই হ'লো।”—

আর কি বলিতেছিলেন, বলা শেষ হইল না,  
পথের পাশের কর্দমাক্ত অন্ধকার হইতে কে এক জন  
বলিয়া উঠিল—“বাবু! বাবু মশাই গান শুনবেন?”

নরেশচন্দ্র কি বলিতেছিলেন, ভুলিয়া গিয়া  
মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওই শোন  
হেননীলাল! গান শুনবার আবার অভাব কি,  
যে তার জন্য এই গলির কাদা ভাস্তে হবে? গান  
স্বয়ং এসেই আমাদের আমন্ত্রণ করচে!—কই কে  
গান শোনাতে চাইছিলে গা? এসো না, গান আমি  
শুনতে রাজী আছি।”

মোটর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অন্ধকার গলির  
ওধার হইতে একটি ছোট মেয়ে এধারে আসিয়া  
দাঁড়াইল। মেয়েটির পরণে একখানি গোলাপী  
রংএর সস্তোষপুরের ডুরে, গায়ে একটি চলচলে  
গোলাপী সিল্কের বাজারে কেনা জ্যাকেট, এক হাত  
কাঁচের ঝুরো চুড়ি, কপালে তেলজলে চকচকানো  
চুলের পাতা নামান এবং তাহারই নীচে একখানা  
বড় গুলপোকার টিপ। বয়স তাহার সাত আট  
বছরের বেশী মনে হয় না। পাতলা ও অপুষ্ট দেহ,  
কিন্তু রংটুকু দিব্য ফুটফুটে এবং মুখখানিও সুন্দর।

এই বৃষ্টির রাতে জনবিরল অপরিচ্ছন্ন গলির  
মধ্যে একা এমন সুসজ্জ একটি ছোট বাঙ্গালীর  
মেয়েকে গান শুনাইতে ব্যগ্রভাবে উত্তত দেখিয়া  
নরেশচন্দ্র কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। সাজ  
পোষাক চেহারায় তাহাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে মনে  
হয়, ভিখারীর মেয়ে কখনই নয়। তবে এমন করিয়া  
সে পথের মধ্যে গান শুনাইতে চাহিল কি জন্য—  
এই কথাই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন।  
এমন সময় মেয়েটি ঈষৎ একটুখানি সঙ্কোচের  
সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু! এইখানেই কি  
দাঁড়িয়ে গান শুনবেন? না আমার বাড়ীতে  
আসবেন?”

ননী এই কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া  
কৌতুকে উচ্ছাস্ত করিয়া উঠিল, “ওহে, রাজা!  
খুকিমণিটি যে আবার বাড়ীতেও ডাকে হে!  
ব্যাপারখানা কি?”

নরেশ কিছু ব্যথিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “তোমার বাড়ী কতদূর? তোমার গান  
শুনলে তোমাকে কিছু দিতে হয়?—না, অন্ধকার  
গান শুনাতো?”

মেয়েটির চোখে জল আসিয়াছে, তাহা নিকটস্থ হইতে গেছে।

মোটরের আলোয় দেখা গেল, সে ঢোক গিলিয়া  
গিলিয়া সেই চোখের জলটাকে দমন রাখিল ও  
কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল, “অমনি ত শোনাইনে,  
পরসা দিতে হয়।”—ক্ষীণ কণ্ঠে ইহা বলিয়াই তার-  
পর হঠাৎ যেন চমক-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুর্ব-  
লতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া  
উঠিল, “অ-বাবু! আসুন না, গান শুনবেন,  
আসুন না। আমি খুব ভাল গাইতে পারি।  
আপনার দিবি—সত্যি বলচি।”

ননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনশ্চ বন্ধকে  
সম্বোধন পূর্বক ইংরাজী ঝাড়িল, “হোয়াট এ লিটল  
উইচ সি ইজ!”—তার পর সেই মেয়েটিকে বলিল,  
“এই বয়েস থেকেই খুব তো তৈরি হয়ে উঠেছ  
দেখছি! ঘরে তোমার আর কেউ আছে বলতে  
পারো, না তুমিই?”

মেয়েটি আবার জলভরা চোখে ঝাড় নাড়িল  
এবং আবার সেই রকম ঢোক গিলিতে গিলিতে  
অশ্রুজলে ভেজা অশ্রুধারা “আমার মা আছে, মা’র  
বড় ব্যারাম—” বলিয়াই হঠাৎ সে দুই করতলে মুখ  
ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। “তৈয়ারি” সে  
যে এখনও হইতে পারে নাই—তাহাই যেন ওই  
রকমে সে ইহাদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিল।

একটি মুহূর্তের মধ্যেই নরেশচন্দ্র সকল অবস্থা  
বুঝিয়া লইলেন। কি দারুণ দুর্বিপাকে পতিত  
হইয়াই এই কচি বয়সের মেয়েটি আজ কি নিষ্ঠুর  
দুর্ভাগ্যের হস্তে নিজেকে ঠেলিয়া দিতে আসিয়াছে,  
সেই ভয়াবহ কাণ্ডটা যেন একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার  
মূর্তিতে নরেশের দুই চোখের সামনে অগ্নিময় হইয়া  
উঠিল। এই সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত জীবন  
শেষ দুর্বস্থা তাহাদের পাপের ভার প্রায় এই রকমেই  
ভরাইয়া তোলে। কোন পতিতপাবন যদি নিজে  
আসিয়া এদের একটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই  
হয় ত এর একটু সত্বপায় হয়! করুণায় একেবারে  
বিগলিত হইয়া পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েটির  
কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী  
কি বেশীদূর? কাছে হয় তো আমি যাব।”

মেয়েটি ক্রমালে চোখ মুছিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া  
বলিল, “ওই বড় বাড়ীটার একতলার একটা ঘরে  
আমি আর মা থাকি, দূরে যেতে আমার ভয় করে,  
আমি পারি না।”

নরেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “চলো।”

সোফার বলিল, “রাজা সাহেব! গাড়ী ঠিক

ননী উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাব করিল, “ওহে, তা হ’লে এটিকে কিছু দিয়ে ডালিমের ওখানেই যাওয়া যাক চলো।”

নরেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকিয়া সঙ্গিনী মেয়েটিকে সঙ্গেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নামটি বল তো?”

সে বলিল, “আমার নাম সুসমা। কিন্তু আমার সবাই বেদানা ব’লে ডাকে।”

“তুমি ক’ বছরের?”

মেয়েটি বলিল, “ন’ বছরের।”

“নয়! তা কিন্তু মনে হয় না। আচ্ছা, গান গেয়ে তুমি রোজ কত ক’রে পাও?”

সুসমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তার পর আবার তেমনি সলিলদ্রুর্ভবে উত্তর করিল, “এই তিন দিনে এক টাকা বার আনা পেয়েছি, তাতে মার এক শিশি ওষুধ বই হয়নি।”

নরেশ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অত কম কেন? একটা গানে কত নাও?”

সুসমা বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, সে এবার আর তাহা গোপন-চেষ্টা না করিয়াই জবাব দিল, “কত আর নিই, যে যা দেয়। কেউ শুনতেই চায় না, অনেকে এমন ঠাট্টা করে যে, আমার গাইতে ভাল লাগে না। আজ তাই সারাদিন আসি নি, এখন মা’র বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—কি করি, তাই এলুম। না হ’লে—”

মেয়েটি আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার ক্ষুদ্র শরীরটুকু হুলিয়া হুলিয়া উঠিয়া তাহার অসহ্য দুঃখ জানাইয়া দিতে লাগিল।

পাপের পরিণাম যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও; তরঙ্গিনীর রোগে রোগে এমন দশা হইয়াছিল যে, চোখে সে যেন দেখা যায় না। সে’ৎসে’তে ঘরের মেজের ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ বিছানার ককাল মূর্তির মত মা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় আত্মনাদ করিতেছে, গৃহসজ্জার মধ্যে দু’ একটি ওষুধের শিশি, একটা জলের ঘটি ও এক পাশে দু’ একটা হাঁড়িকুড়ি ও ময়লা কাপড়-চোপড় পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক ছরবছাপন্ন গৃহের মধ্যে গৃহস্থামিনীর কন্ডা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, এই ঘরের গৃহবাসিনীর সহিত তুলনায় তাহার সাজসজ্জাকে তখন কষ্ট বড় যে কৃত্রিম বলিয়াই বোঝা গেল, সে যেন বাহিরে থাকিতে অসুভবও করা যায় না। মেয়ের সাড়া পাইয়াই সেই ককালবিশিষ্ট মুখ তার ক্রীণ কর্তৃক হইতে প্রবল তীক্ষ্ণ

শ্বর বাহির করিয়া বদ্ধ জন্তুর অন্তরায় হিংস্র গর্জনের অনুরূপে চোঁচাইয়া উঠিল, “পোড়ারমুখি! অ-পোড়ারমুখি! এরই মধ্যে যে আবার ছুটে চ’লে এলি বড়? এবার যদি পরমা না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিস্ তো! এই মরুতে মরুতে উঠেও খেংরার চোটে পিঠের চামড়াখানা তুলে নেবো, জেনে শুনে ঢুকতে আসিস্। পোড়ারমুখি, তোর আবার ভদরআনির অত পট-পটানি কেন্ লা শুনি? লোকে ঠাট্টা করলে ওর লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ওরে আমার লজ্জাবতী লতা রে! এর পরে খাবি কি ক’রে? দাসীগিরি করলেও যুেকোন ভদর-লোকের ঘরে তোকে ঠাই দেবে না, তা জান্চিস কিছু?”—

সুসমা ছলছল চোখে মায়ের কাছে ঘেসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুগাঢ়স্বরে কহিল,—“রাজাবাবু গান শুনতে এসেছেন।”

“ওমা! তাই বল! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, যে আমার মৃতন দীনের কুটীরে আজ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো! ওমা, ও বেদানা! আসনখানা এনে রাজাবাবুকে পেতে দাও মা, পেতে দাও। আঃ, এমন আধমরা হয়েও প’ড়ে আছি যে, উঠে ব’সে আপনাদের মতন মহাজনদের একটু সম্বর্দ্ধনা ক’রে নেবো, সেটুকুও শক্তি আমার পোড়া দেহে নেই।”

নরেশ ও ননীলাল আসন গ্রহণ করিলেন, সুসমার গানও একটার পর একটা করিয়া তিন চারটে শোনা হইয়া গেল। গলা শুনিয়া নরেশের তো বটেই, এমন কি ননীবাবুরও আর এই সন্ধ্যাটাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল না। গান শুনিয়া নরেশ তরঙ্গিনীকে বলিলেন, “সুসমার এমন গলা, ওকে কেন কোমি থিয়েটারে দাওনি?”

তরঙ্গিনী ফৌস করিয়া একটা জলন্ত নিশ্বাস ফেলিল, “দেখুন, রাজা সাহেব! পাপের পথে যতই এগিয়ে গেলুম, পাপের ভারে মন আমার ততই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সুখ খুঁজতেই বাড়ীর বাইরে এসেছিলুম, খুঁজে দেখলুম,—তার একটা কণাও পেলুম না। আমার সেই কুঁড়েঘরে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, এই বাড়ীর তেতালাতেও তা পাইনি, তাই বড় সাধ ছিল, ওকে ও পথে আর যেতে দেবো না। ওর গলার জন্তে বছরখানেক আগে থেকেই ওর জন্তে ওরা দর দিচ্ছিল, আমি যেতে দিই নি। কি মনে করেছিলুম জানেন? আমার সব টাকা দিয়ে ওর জন্তে কোম্পানীর কাগজ কিনে দোবো, তার আরে ওর খাওয়া-পরা চলেবে,



আর ওকে খুব গান-বাজনা শেখাব, বড় হয়ে ও একটা সঙ্গীত-বিদ্যালয় খুলবে, তাই থেকে ওর নামও হবে, পরস্যাও হবে, আর ধর্মও থাকবে। তা হলো না। তা হলো না,—ভগবানের ইচ্ছে নয়—তা হলো না।”

নরেশ এই রূঢ়ভাষিণী নিষ্ঠুরপ্রকৃতির পতিতা মায়ের মনের ভিতরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে সেই মুহূর্তেই তাহার জন্ম অনেকখানি সহ্যভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার টাকা ছিল, তা হ’লে এমন হ’লো কেন?”

তরঙ্গিণী বলিল, “ঠিকিয়ে নিলে মশাই! ঠিকিয়ে নিলে! ভদ্রলোক মনে ক’রে শ্যামলাল পাইনের হাতে দশ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ কিনতে দিলুম। সেই টাকা নিয়েই সে ফেরার হলো! উল্টে তার পিছনে পুলিশ ডিটেক্টিভে কত রকমে কত টাকাই আমার খরচ হয়ে গেল মশাই! ধনে-প্রাণে আমার সে মেরে গেল! তা যদি ধর্ম থাকেন, না হ’লে একদিন ঐ টাকা নেওয়া তার বেকাবে, ওমনি হজম করতে পারেন না।—” আরও অনেক কটুক্তি সে তাহার নিজের ধনের অসৎ পথের অংশীদারের উদ্দেশ্যে ফোয়ারার মতই উৎসারিত করিয়া দিল। তার পর মনের জালা, গালির বজ্রায় অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে পরে কথঞ্চিৎ শান্তভাবে পুনশ্চ নিজের কাহিনী ফিরিয়া আরম্ভ করিল। অনেক আড়ম্বরে নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের সবটুকু খবর দিয়া মোট কথা সে এইটুকু জানাইল যে, সেই চৌধ্য ব্যাপারের পর হইতেই মনের অত্যন্ত আঘাতেই তার বাতজর হয়, তার উপর উকিল বাড়ী, পুলিশ থানার ছুটাছুটি ইত্যাদিতে রোগ বাড়িয়া যায়। উপার্জন বন্ধ, —চিকিৎসার খরচ প্রথমে গহনা, শেষে আসবাব-পত্র বেচিয়া চলিতে থাকে। কালের ধর্ম্মে গহনা-জুয়ার সোনার ভাগ কমই ছিল; বিলাতি সোনা, পাথর, মতি এই সবই কিনিবার সময় দাম লাগে বেশ, বেচার বেলায় সিকি হইয়া যায়। শেষে বেচিতে বেচিতে যখন সবই ফুরাইয়া গেল, কেবল প্রাণটাই বাকি রহিল, ডাক্তারও ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও শুধু পথ্য মেলা পর্য্যন্ত তার হইল। প্রথম কিছুদিন ধার-কর্জ বন্ধ-বান্ধবের দয়াধর্ম্মে চালাইয়া—শেষে সে সবও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অমরুপায়েই স্বমমাকে রোজগার করিতে পাঠাইতে হইল। তাহাকে থিয়েটারে পাঠানই স্থির হইয়াছে,

কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। কাঁদিয়া উঠিয়া পা জড়াইয়া ধরে, বলে, অত লোকের সামনে গান তাহার গলা দিয়া বাহির হইবে না;—বরং সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পরস্যা আনিয়া দিবে, তবু ওখানে যাইতে পারবে না।

তরঙ্গিণী বলিল, “দেখুন রাজাবাবু! মেয়েটার ঐ কথা শুনে আমারও কি আর বুক ফেটে যায়নি? আমিই তো ওকে সেই একরত্তি বেলা থেকে পাপকে ঘেঁষা করতে শিখিয়ে এসেছি। ‘আমার পাপ আমার সঙ্গেই বিদায় হোক, ওকে আমার সে ঘেন কিছুতেই স্পর্শ করে না’,—এই যে আমার ঠাকুরের কাছে একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু কি করবো বলুন, পোড়া পেটের দারে শেষ-কালে তাই আমায় করতে হলো। তা আপনি বলুন তো ও রকম ভিখারীর মতন পথে বার হওয়ার চাইতে এখন থেকেই থিয়েটারে ঢোকা ওর পক্ষে ভাল নয় কি? আপনি বরং দয়া ক’রে ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে একটু ব’লে করে দেন,—দেবেন কি?”

নরেশ স্বমমার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার ভয়ঙ্কর ছুটি চোখের সঙ্গে তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। সেই শিশুর মত বালিকা-চক্ষের ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিটুকু নরেশের পুরুষ চিত্তকে বিপুলবলে আকর্ষণ করিল। আহা! এই কুপথ অনুসরণে একান্ত অনিচ্ছুক এই একান্ত অসহায় জীবনটিকে সে যদি আজ তুচ্ছ করিয়া কেলিয়া যায়, তাহা হইলে সে কি ইহার ভবিষ্যতের সমুদয় পাপ এবং তাপের জন্ত সম্পূর্ণরূপেই দায়ী হইয়া থাকিবে না? তাহার বুদ্ধি—তাহার বিবেক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, “নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়, তাহাকে—শুধু একমাত্র তাহাকেই এই অসহায় জীবটির সমস্ত হৃদয়-জন্ত—এখানে নাই হোক, আর এক লোকের সব চেয়ে বড় দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবেই হইবে। তখন সে বলিবে কি? ঘৃণা করিয়া সে ইহার দিকে চাহে নাই,—এই কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারিবে? ঘৃণা বাস্তবিকই তো ইহাদের তাহারা করে না! তা করিলে ডাক্তার-মের গান শুনিতে এই বর্ষার রাত্রে বাহির হইয়াছিল কিসের জন্ত? অবজায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়া-ছিলাম,—এমন কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে, লজ্জায় কি মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা করিবে না? তিনি যে এর আসন্ন বিপদের ঠিক সন্ধিক্ষণেই তাহার রক্ষা-হস্তের মধ্যেই এই অনন্তসহায় ভীরা দুর্বল কণী

হস্তখানি টানিয়া আনিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে ইহার এতবড় দুর্দশার দিনে ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? না, সে তাহা পারে না।—মহুয্যতের দিক্ দিয়া তো নয়ই, অমাত্য হইলেও নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে কদর্য্য সৃষ্ট কাক,—তারাও সহায়চ্যুত কোকিলশিশুকে নিজের কুলায়ে লালন করে, ফেলিয়া দেয় না।

নরেশ একটু পরেই বিদায় লইলেন, আসিবার সময় সুষমার হস্তে দশটি টাকা দিয়া তার মাকে বলিয়া আসিলেন, “সময় মত তিনি আবার আসিবেন, তাহাদের খরচ তিনিই দিবেন, কিন্তু আজ হইতে সুষমা তাহার মতামুত্তী হইয়া চলিবে এবং তাহাকে না জানাইয়া বাড়ীর বাহির হইতে পাইবে না।”

সুষমার বয়স যদি ন’বছর না হইয়া চৌদ্দ হইত তো তরঙ্গিনী বা ননীবাবু কিছুই বিস্মিত হইত না। তাহা নয় বলিয়াই তুঙ্গনেই একটু একটু বিস্ময় বোধ করিল। কিন্তু তখনই কি ভাবিয়া লইয়া পতিতা করজোড়ে কহিল, “কিন্তু আমারও একটি নিবেদন আছে রাজাবাবু! আপনি দেবতা মানেন?”

“কেন?”

“তা হ’লে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করতে হবে, বেদনাকে আপনি কোন দিনই ত্যাগ করতে পারবেন না।”

নরেশ শুধু বলিলেন, “আচ্ছা।”

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গগন ব্যবধান, তবুও মনঃ-প্রাণ,

না সঁপি যদি বুক না ফাটে

তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস

স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,—

ভাঙিলে সে স্বপন—মরিতে নার যদি—

ব’ল না ‘প্রেম’ তবে কতু তার।

—তীর্থরেণু

সুষমার মা মাসখানেকের মধ্যেই মরিল। তখন সুষমাকে লইয়া নরেশ একটু বিপর বোধ করিলেন। পতিতার গর্ভজাতা কন্তাকে নিজের ঘরে আনিয়া রাখা সম্ভব নয়; অথচ থাকেই বা সে কোথা? তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পাইতেছিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি মমতায় চিত্ত তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়াই উঠিতেছিল, এমন জীবনটি যেমন করিয়াই হোক তাঁহাকে নির্মল করিয়া রাখিতে

হইবে; পাকের মধ্যে জন্মিলেও তাহাকে পক্ষ-রূপে ফুটিয়া উঠিতে সহায়তা করিতে হইবেই। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবানীপুরের প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়ীখানি তাহার নামে কিনিয়া দিলেন। একটি বৃদ্ধা দরওয়ান ও একটি বৃদ্ধা চাকর রাখিয়া তিনি সেই বাড়ীতে এই ভিন্ন জগতের মেয়েটিকে এক রকম বন্দী দশাতেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যি প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াই রাখিলেন না। কারণ, ইহার পরিচর্যা করিতে স্বীকৃতা হইবে, এমন দরের যি, অসৎ শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় তাদের মত অল্পই পাওয়া যায়—এই রকমই নরেশের বিশ্বাস ছিল।

সুষমার মায়ের সাধ ছিল, মেয়ে সঙ্গীত-কলাটা ভাল রকমে আয়ত্ত করিয়া তাহারই চর্চায় শিক্ষার জীবনোৎসর্গ করিতে পারে, নরেশচন্দ্রের ইহা অসম্ভব ঠেকিল না, এই রকমই একটা কোন পথ ইহাদের জন্ত তৈরী করিয়া না দিতে পারিলে এদের জীবনই বা আশ্রয় পায় কোথায়? আজকাল তো অনেকেই মেয়ে-বউদের গানবাজনা শিক্ষা দিতেছেন, এদের মধ্যে যারা পাপের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুপথে জীবিকার্জন করিতে চায়, তাদের লইয়া যদি একটি সঙ্গ তৈরী করা যায়,—অবশ্য বিশেষভাবে পরীক্ষা লইয়া,—তবেই ইহাতে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। তাহারই অন্তঃপুরিকাদের গানবাজনা শিখাইতে পারে। বৈষ্ণবীরা তো অন্তঃপুরে ভিক্ষা লইতে যায়, মিসনরী মেয়েদের সঙ্গে যে সকল দেশীয় খুশ্চান মেয়েরা যিশুর গান গাহিয়া ও শেলাইবোনা, একটু আধটু শিখাইয়া বেড়ায়, তাদের মধ্যেও তো জিনিষ ছিল, ধর্ম্মশিক্ষার ও সঙ্গ-মধ্যের শাসন-সংযম-তার তারাও সংযতভাবে চলিতে শিখিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার অধিকার লাভ করিয়াছে। তেমনি এদের লইয়াও যদি একটা কর্ম্মশালা খোলা যায়, মন্দ কি? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নরেশচন্দ্র ওস্তাদ রাখিয়া সুষমাকে গানবাজনা ভাল রকমেই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিধন ঠাকুরা তাহার তানপুরা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননীবাবু হইল হারমোনিয়ম ও এসরাজের এবং একজন বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী আসিয়া বীণ শিখাইতে লাগিয়া গেল। ইংরাজী বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও হইল। সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নরেশচন্দ্র আনন্দনা ঠেলিয়া ফেলিয়া ধূলা-ময়লা কাটাইয়া ইহার ভিতরকার খাঁটী সোনাটুকু ধুইয়া বাহির করিতে চাহিতেছিলেন। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে দৈবাৎদৃষ্ট একটি বৃদ্ধ সাধুর প্রতি তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধা জন্মিলে তিনি



তাহাকে ইহার নিকট টানিয়া আনিলেন। মেয়েটির ভিতরকার আগ্রহ ও সদিচ্ছা সাধুটিকেও বিগলিত করিল, তিনি সানন্দে ও সাগ্রহে উহাকে যখন তখন আসিয়া সংস্কৃত পরিচয় করাইতে আরম্ভ করিয়া মুখে মুখে নীতিশাস্ত্রের অনেক শিক্ষাদানই করিলেন। ইহাকে পাইয়া সুসমা নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল। এমন মহৎ সঙ্গ ও প্রকৃত গুরু সে তো কল্পনাতেও কখন পায় নাই।

■ দিকে কিছ্র বাহিরে বাহিরে নরেশ ও সুসমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই রটিয়া উঠিতেছিল। নরেশ—অবিবাহিত ধনী ও নিরতিভাবক নরেশ একটা কম বয়সের—সে যে কত কম, সে হিসাব রাখিতে কার গরজ পড়িয়া গিয়াছে—মেয়েকে একখানা সাজান বাড়ীতে রাখিয়া তার উপর বিস্তর খরচপত্র করিতেছেন, তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া সেখানে গানবাজনার মজলিস জমাইয়া তুলে;—আবার সে মেয়েও দেখিতে ভাল, গায় ভাল, বাজায় উৎকৃষ্ট!—এ সব যোগাযোগের মধ্যে সঞ্চারিতঃ মানবকলনা কিসের সন্ধান পাইয়া থাকে! কাজেই চারিদিকে সুসমা সম্বন্ধে যে গুজব রটিল সে তার বেশ অমূলক নয়। নরেশের বাকি বন্ধু বান্ধা, তারা ননীবাবুদের প্রতি তীব্র ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিয়া নরেশকেও তাহার একচোখোমীর জন্ত ঠাট্টা বিক্রপ ও অমূল্যোগ করিতে থাকিল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া সকলকেই অল্প বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহাদের আন্দাজ একেবারেই ভিত্তিহীন, সুসমা তাহার আশ্রিতা।—আর কিছুই নয়। সে নেহাৎ ছেলেকান্না এবং অত্যন্ত নির্মল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “বেশ তো, হোক না সে সতীশ্বরের শ্বেতপদ্ম! আমাদের তাতে তো কোনই আপত্তি নেই। আমরা শুধু তার দুটো গান শুনে আসতে চাই, এই বৈ তো নয়।”

অগত্যা গান শুনাইতে হইল এবং আরও হুচারবার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পার পাওয়া গেল না। ইহাদের মধ্যের দু এক জন গুচ রহস্য করিয়া সুসমার সঙ্গে কথা কহিতে যাইতেই নরেশ চোক রক্ষা করিয়া চাহিলেন এবং সেই হইতে তাহাদের বন্ধুত্বের অবসান হইল। নিজের সম্পত্তির উপরে উহার প্রবল আধিপত্যের চেষ্টা বোধ করিয়া বাকি সকলে কদাচ সুসমার গান শুনিতে চাহিলেও তাহাকে অসম্মানের ভাবে সম্ভাষণ করিতে ভরসা করে না। কিন্তু তবুও সুসমা ইঠাৎ এক দিন নিজের সম্বন্ধে লোকমতটা ভালরূপেই জানিতে পারিল।

সাধুটি বদরীনাথ চলিয়া গিয়াছেন, সুসমার বয়স এখন ষোড়শ পূর্ণ ননীবাবু ও হরিধন এখন শুধু সপ্তাহে একদিন করিয়া আসে, বাকি দুজন একদিন অন্তরে। সুসমার মনটা আজকাল বড়ই শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল; নরেশ ইদানীং আর তেমন ঘন ঘন আসা-যাওয়া করেন না। আসিলেও আর যেন তেমন প্রাণখোলাভাবে তাহার সহিত না মিশিয়া চুপচাপ গানের বুলিই শুনিয়া যান এবং গানের শেষে সবার সঙ্গেই, কোন দিন সকলের চেয়ে আগে উঠিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করেন। কে জানে কেন, সন্মতই হোক আর অসন্মতই হোক, সুসমার প্রাণ ইহাতে ব্যথিত হয়, তাহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগে।

একদিন সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল। কলীঘাটে মহিলা সমিতি হইল। অদেগী সম্বন্ধে কোন ভদ্রমহিলা কি বক্তৃতা করিবেন। নরেশকে পত্র লিখিয়া তাহার অনুমতি লইয়া সে সেই সমিতিতে গেল। সে যেখানে বসিয়া ছিল, কমবয়সী কতকগুলি বৌ-ঝির সেইখানে সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এক জন অপরকে বলিল, “দেখেছি, ওর মুখের সঙ্গে আমাদের ছোট বোদির একটু যেন আদল আসে! কে-ভাই ও?”

“জ্যাকেটটির ছাঁট তো বড় সুন্দর! জিজ্ঞেস কর না, কাদের বাড়ীর মেয়ে না বউ?”

“ওমা, বউ কি বলচিস্ লো! সীতের নাকি সিঁদুর আছে! জান না ভাই—ও কে?”

অবশেষে জানাজানি হইল। সুসমা উহাদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত হইয়া স্বীকার করিল, তার বিবাহ হয় নাই, তার বাপকুলের কেহ নাই। তার বাপের নাম জিজ্ঞাসায় সে নিরস্তর রহিল। তার পর কার কাছে থাকে জিজ্ঞাসায় সে যখন বলিল, একাই থাকে, তখন সেই তরুণী মেয়েরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বুদ্ধি করিয়া প্রশ্ন করিল, “তোমরা কি ভাই ব্রহ্মজ্ঞানী? তাদের ঘরের মেয়েরা মেয়েদের মতন পড়াশোনার জন্তে বোডিং টোডিংও তো থাকে শুনেছি। সেই রকমই কি এখানে এসেছ?”

সুসমা স্নান ও বিপরভাবে ঘাড় নাড়িল।

এই সময়েই একটি প্রোচা উহাদের কথাবার্তার একটুখানি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া তাহাদের সামনে আসিয়া সুসমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া

উঠিলেন, “দেখি কার পরিচয় শোধান হচ্ছে। ওমা! এ যে ওই ‘সুখমাকুটার’র সুখমা গৌ! অবাক কলি তোরা! ও আবার নিজের পরিচয় কি দেবে তাদের শুনি? চল চল, ওদিকে গিয়ে বসবি চল। ছুঁড়ী-গুলোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! হরি বলো মন!—”

নিজদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা কোথায় ঘটিয়াছিল, ভালমতে বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে ঘটিয়াছে, সেইটুকু বুঝিয়া লইয়া সেই অল্পসন্ধিৎসা-পরায়ণা তরুণীর দল ছন্দাম করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঝনঝন্ শব্দে অলঙ্কার বাজাইয়া সভামণ্ডপের অপর প্রান্তে চলিয়া যাইতে যাইতে পূর্ণ কোতুহলে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “কেন গা! ওকে কি আপনি চেনেন?”

প্রোটা হাতমুখ নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওমা, তা আর চিনিনে? ও যে কোথাকার এক খেতাবী রাজার রাখা মেয়েমানুষ। ওর সঙ্গে কি আর তদর ঘরের মেয়েদের কথা কইতে আছে মা?”

সুখমার মনে হইল, তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। আলোকময় জগৎ যেন তমসাবৃত হইয়া গেল।

নরেশচন্দ্রও কিছুদিন হইতে এই সম্বন্ধীয় জালা নেহাৎ কমও ভুগিতেছিলেন না। বন্ধু-বান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুহৃদ ও হিতকামীর দলও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর ভৎসনাপূর্বক এই সর্ব্বনেশে নেশার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। দেশ হইতে বিমাতা হঠাৎ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার মর্ম্ম এইরূপ—  
বিশ্বস্তহুত্রে জানিলাম, তুমি একটা পতিতার সঙ্গে লইয়া উন্নত হইয়াছ, তাহার পায়েই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছ, তাকে রাণীর বাড়া করিয়া রাখিয়াছ। এ সব কি ভাল? অবশ্য তোমাদের মত বড় লোকের ঘরে সবই সাজে, তথাপি বিবাহ না করিয়া শুধুমাত্র হীনসঙ্গে কাটাইলে চলিবে কেন? বংশরক্ষা করা তো চাই। ও সব বা আছে থাক; তা না হয়, এর সঙ্গে একটি বউ আন, সব গোল চুকিয়া যাক। যদি তোমার মত হয়, আমার বোনঝি চামেলীর সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করি। চামেলীকে ছোট বেলায় বোধ করি দেখিয়াছ? বড় হইয়া আরও সুন্দরী হইয়াছে! দিবা ভাগর মেয়ে, তোমার সঙ্গে অসাজস্তু হইবে না।

এই চিঠি পাইবার পর নরেশের দ্বিধাগ্রস্ত মন যেন সম্পূর্ণরূপেই তাহার নূতন চিন্তাধারারই অনুবর্তন

করিয়া একেবারে স্থিরসঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুখমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ধ্যাবেলার একাকিনী সুখমা বসিয়া অর্গানের বাজনার সঙ্গে নিজের মধুর কণ্ঠের যোগ করিয়া গাহিতেছিল—

“ওহে জীবনবল্লভ! ওহে সাধন-হৃদ! ”

আমি মর্ম্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব,

শুধু নীরবে যাব, হৃদয়ে লয়ে প্রেম-মুগ্ধতা তব।—”

হঠাৎ খুব কাছেই জুতা-পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেশচন্দ্র।

তৎক্ষণাৎ বাজান বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়িতেগেল। মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

নরেশ ব্যগ্র হইয়া বারণ করিলেন, বলিলেন, “বেশ মিষ্টি লাগছিল, জান তো, গান শুনতে আমি বড় ভালবাসি। বা গাচ্ছিলে গাও, আমি শুনি।”

সুখমা আজ্ঞাপালন করিল। গাহিতে তার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। সে গাহিতে লাগিল—

“সুখ দুঃখ সব তাজা করিমু প্রিয় অপ্রিয় হে,

তুমি নিজে হাতে যাহা দিবে তাহা—

মাথায় তুলে ।”

গান থামিলে তাহার দিকে একটু নত হইয়া নরেশ কোমলকণ্ঠে কহিলেন—“নিজে হাতে ‘যা’ দেব, তা মাথায় তুলে নেবে কি? ‘তোমার মর্ম্মের কথা’ আমি না জানি তা’ নয়; আজ ‘আমার মর্ম্মের কথা’ আমি তোমায় জানাচ্ছি এসছি, তুমি শুনবে কি বেদানা?”

সুখমা এমন সুর ইহার কণ্ঠে কোন দিনই শুনে নাই। আর এই সব কথা! সে ত্রস্ত বিশ্বয়ে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

নরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন ও তাহার দৃষ্টি হইতে নিজের চোখ সরাইয়া লইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “আমি তোমায় ভালবাসি।”

সুখমা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেশ দেখিলেন, সে হাত দুখানা ধরধর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি দুই হাতে তাহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“অনেকদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি, দূরে স’রে যাবার চেষ্টা করছিলাম, পারলাম না, তুমিও তো আমার ভালবাস—আমার হও। আমি তোমায় চাই।”



সুখমা জোর করিয়া তাঁহার হাতের মধ্য হইতে নিজের মুখ ছিনাইয়া লইয়া পিছু হটিয়া গেল, বারেক মাজে তাহার শান্ত, সন্ধ্যাতারার মত নিষ্ঠ দৃষ্টি দীপ-শিখার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ললাটের শিরা সকল ক্ষুরিত হইয়া ধূমকেতুর মত দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে একটি মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই অসহায় ও অবসন্নভাবে নরেশের পায়ের তলায় জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে দুটি হাত জোড় করিয়া বলিল—

“আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু ইহলোকে আপনিই যে আমার একমাত্র আশ্রয়—আমার দেবতা! আপনার প্রতিও অন্ধা হারালে কি নিয়ে বাঁচবো, আমার তাই বলুন?” বলিতে বলিতে থর থর করিয়া বায়ুতাড়িত পুষ্প-পেলবের জ্বলন্ত ছাখানি ঠোট কাঁপিয়া উঠিল, ঝড় ঝড় করিয়া চোখের জল পাতায় জমা শিশিরের মত ঝরিয়া পড়িল।

নরেশ তাহার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন, “তুমি আমার ভুল বুঝেছ বেদনা! তেমন ক’রে তোমায় আমি পেতে চাইনি। আমি স্থির করেছি, তোমায় আমি বিয়ে করবো।”

বিহ্বল হুটাত মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুখমা উচ্চ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আপনি আমার বিয়ে করবেন! আমাকে! নিশ্চয়ই আপনার মাথার ঠিক নেই; কিন্তু—”

নরেশ মনের ভিতর দ্বিধা লজ্জা অনুভব করিলেও তাহা গোপন রাখিয়া সপ্রতিভভাবেই হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“আমি পাগলও হই নি, নেশাও করি নি, সহজ স-জ্ঞানেই এই প্রস্তাব করছি এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে,—তা আর বদলাবে না।”

শুনিয়া সুখমার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সে তাহার শাপিত ছুরিকার মতই উজ্জল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নরেশের আবেগময় নেত্রের উপর স্থির করিয়া তেমনি নিশ্চয় কণ্ঠে জবাব দিল—“কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই। আমি আপনার স্ত্রী হতে চাইনে।”

নরেশের মুখের ছবি বিশ্বয় ও বেদনাক্রান্ত হইয়া উঠিল “সে কি!—সুখমা! তুমি কি আমার তবে ভালবাস না?”

বন্ধুকের গুলী খাইয়া ছোট পাখীটি যেমন ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়াই মুহূর্তেই সুখমা আবার

নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়া বসিয়া পড়িল। অনা-হৃত চোখের জলকে প্রাণপণে রোধ করিতে করিতে অর্ধব্যক্তভাবে সে কহিল, “আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি না, ভগবানই জানেন! কিন্তু জ্ঞানতঃ আমার শরীর-মন দিয়া এ জন্মে আমি কোন পাপই করি নি, তাই মনের মধ্যে আপনার পূজা করাকে আমার পক্ষে দুঃসাহস বোধ হইলেও তাতে পাপ করেছি বলতে পারি না। আপনি আমার দেবতা,—আমার দেবতারও বাড়া—আমার ঈশ্বর। আপনাকে মিথ্যা আমি কেমন ক’রে বলবো? কিন্তু যদি কখন বদলে আবার মানুষের দেহ—মেঘেমানুষের দেহ—পাই, তবেই তা আপনাকে দিতে পারবো। কিন্তু এ পাপ দেহ—আমি বরং একে খণ্ড খণ্ড ক’রে ফেলবো,—তবু আপনার পায়ে দিতে পারবো না।”

নরেশচন্দ্র এই গভীর বেদনাপূর্ণ আত্মপ্রকাশে গভীরতর সহানুভূতি ও ব্যথানুভব করিলেন। নত হইয়া সুখমার একখানি হাত হাতে লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ আদরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, “তোমার দেহ পাপ-দেহ কিসে সুখমা? কোন পাপই তো এ শরীরে তুমি করো নি, তবে কেন অন্তের পাপের কলুষে নিজেকে তুমি ময়লা ক’রে দেখচো? জন্ম সম্বন্ধে তোমার হাত ছিল না, সে জন্ত তুমি দায়ী নও। তোমার যা সাধ্য, তাতে তুমি উচ্চ সন্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছ।”

সুখমা নিজের হাত যথাস্থানেই বদ্ধ থাকিতে দিয়া মর্শ্বপীড়িতের ব্যাকুল বেদনার সহিত তীব্র বিলাপপূর্ণ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আপনি ভুল করছেন! আমার এ দেহ পাপ-প্রসূত, পাপ-পুষ্ট, এই শরীর দ্বিগুণে আমি আর সব হ’তে পারি, শুধু গৃহস্থের বউ, আর—” সুখমা নীরব হইল।

নরেশ তাহার হাতে একটু অধীরভাবে চাপ দিয়া প্রশ্ন করিলেন, “আর?”

জোর করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া সুখমা নতচক্ষে উত্তর করিল,—“সন্তানের মা হ’তে পারি না। সমাজের কাঁহিরে দেশের, দেশের, ধর্মের, কর্মের আর আর অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্যে আপনারা আমাদের নিয়োগ ক’রে আমাদেরও বাঁচান আর নিজেরাও বেঁচে থাকুন, শুধু ছেনের মধ্য থেকে তুলে অন্তঃপুরে নেবেন না; কার মধ্যে কতখানি বিষ ফে থেকে যার, তার কি কিছু স্থিরতা আছে!”

নরেশ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহা লক্ষ্যে সুখমা আরও একটু জোর দিয়া দিয়া বলিতে

লাগিল—“যেমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী বা পুরুষের বিবাহ করা অনুচিত, এবং দুই ব্যাধিগ্রস্তদের বিয়ে করা মহাপাপ, তেমনি আমাদেরও এই বিধাত্ত শরীরের রক্ত দিয়ে জীবনষ্টির মত মহাপাপ আর সংসারে কোন কিছুই নেই। আমার মায়ের রক্ত আমার মেয়ের মধ্যে যদি—”

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুসমা দু’ হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।—“আর বলবেন না, আমি পারিচি না, হয় তো দুর্বল সামান্য স্ত্রীলোক লোভে প’ড়ে যাব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আমার রক্তের দোষে হয় তো—হয় তো—হয় তো ঐ পাপপথে ঐ হীন বৃত্তিতে—ওঃ ভগবান্! ভগবান্! এমন যেন না হয়।”

সুসমার সুগভীর হতাশার মর্শাস্তিক বিলাপ, মর্শের একান্ত প্রাণকাটা অসহায় আত্মতার মধ্যে মিশিয়া অশ্রুট হইয়া গেল। দু’হাত দিয়া ঢাকা মুখ সে নিজের দুই জাহ্নব মধ্যে লুকাইল।

সুসমা চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু তাহার অন্ধিত এই ভয়াবহ চিত্র নরেশের বুকের মধ্যেও বোধ করি, একটা সংশয়ের আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার এত-ক্ষণকার সতেজ দৃষ্টি ও প্রসন্ন ভাব পরিবর্তিত হইয়া আসিয়া এক্ষণে তাহার স্থলে কেমন যেন একটা সন্দেহাকুল চলচ্চিত্রতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কতক্ষণই এই ভাবে কাটিয়া গেল। দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙ্গান ছিল। তার পেণ্ডুলেটটা একটা ভ্রমরের গঠনের, একটা পদ্ম ফুলের কাছে সেই ভ্রমরটা ক্রমাগত ডানা মেলিয়া আনাগোনা করিতেছে কিন্তু যেন প্রত্যাখ্যাত হইয়া হইয়াই ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারই ব্যাকুল আবেদনের সুরে রাজি দশটা বাজিয়া গেল।

তখন নিদ্রোখিত হইয়া উঠিয়া নরেশচন্দ্র সুসমার দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, “সুদানা!”

“আজ্ঞে!”

“কিন্তু, সুসো! দুটো জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটা কি একেবারেই তুচ্ছ করবার? এ বিয়েতে আমরা দুজনেই কত সুখী হ’তাম, সেটাও ভেবে দেখ।”

সুসমা হয় তো এই কথাটাই তখন ভাবিতেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে ইহার জবাব দিল,—“এ বিয়েতে আপনাকে স্বজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে হবে, সমাজে হের হ’তে হবে, আর তা ছাড়া সব চেয়ে বড় যা’ তা তো আগেই বলেছি। এ অবস্থায় যে সত্যকার ভালবাসে, সে কি কখন সুখী হ’তে পারে?—না মরে

যায়? কেমন ক’রে জানলেন যে, দুজনেই সুখী হবো?”

“তা হ’লে কি তোমার চিরদিনই এই অমর্যাদার মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়াই আমার কর্তব্য ব’লে তুমি স্থির করচো?”

“আমার জন্মই যে এই অমর্যাদার মধ্য দিয়ে, আপনি কি তা এত ক’রেই বদল করতে পারলেন—যে, আরও আশা করচেন? লাভে হ’তে এখন যেটাকে ‘পুরুষোচিত দুর্বলতা’ ব’লে লোকে আপনাকে ককণার সঙ্গে মাপ ক’রে চলে, তখন তা করবে না। আর আমি? আমি লোকের চোখে যেমন আছি তাই থাকবো। শুধু তারা ঘণার সঙ্গে এই কথাই ব’লে আমার সান্নিধ্য ছেড়ে স’রে যাবে, যে ওটা এতদিন রাজা নরেশচন্দ্রের—নরেশচন্দ্রের—” বে লজ্জাকর শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল না, তাহার দুশ্চেষ্ট অধ্যবসায় হইতে উহাকে মুক্তি দিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তোমার কথাই হয় তো ঠিক।”

সুসমা মুখ তুলিয়া বলিল, “আরও একটি ভিক্ষা চাইবো?”

নরেশ শুধু স্তানমুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

সুসমা কহিল, “আপনাকে খুব শীঘ্র বিয়ে করতে হবে। আর যত দিন না আপনি আপনার সেই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন, তত দিন আমার দেখা দেবেন না।”

নরেশ গভীরতর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচনপূর্বক ভারাক্রান্তচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, “আচ্ছা।”

দুজনে পাশাপাশি অর্ধ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাজি তখন গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উঠানভরা টানের আলো যেন থমথমে নিখুম হইয়া আছে। অন্ধনের এক পার্শ্বে পেরার গাছটায় একটা পাখী সেই অশ্রুট চন্দ্রালোককে দিবালোক ভ্রম করিয়া ঘূমতাকা ভাঙ্গাগলায় মিনতি করিয়া বলিতেছিল—“বউ কথা কও! বউ কথা কও!—”

বহির্দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সুসমা দাঁড়াইয়া পড়িল, নরেশচন্দ্র নিতান্ত বিমনা থাকিলেও তাহার এই আকস্মিক অচলতা তিনি অনুভব করিলেন। চলা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে নত হইয়া সুসমা হঠাৎ কান্নাধরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, “অত্যন্ত লোভ হ’লেও বড় হ’য়ে অবধি



কখনও আপনাকে স্পর্শ করে আপনার পায়ের ধূলা আমি মাথায় নিতে সাহসী হই নি। শুধু আজকের মন্তন একটিবার আমার সেই অধিকারটুকু নিতে দিন।”

এই বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে উপড় হইয়া উহার দুই কম্পিত পায়ের উপর মাথা রাখিল এবং বিলম্বে সেখান হইতে নিজের মাথার চুলে মুছিয়া জুতার ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিতে চেষ্টাও করিলেন না, ক্রতপদে বাহির হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

তার পর তিন বৎসরের পরে এই দেখা।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আশা রেখে মনে,—হৃদ্যে কভু  
নিরাশ হ'য়ো না ভাই,  
কোন দিনে যাহা পোহাবে না,—  
হায়, তেমন রাজি নাই।  
রেখে বিশ্বাস, তুফান বাতাসে,—  
হ'য়ো না গো দিশাহারা,  
মাহুষের যিনি চালক,—  
তিনিই চালান চক্রে তারা।  
রেখে ভালবাসা সবার লাগিয়া ভাই,—  
জেনো মানবেরে,  
প্রভাতের মত প্রভা নান করো,—  
জনে, জনে, ঘরে ঘরে।  
—তীর্থরেণু।

কলিকাতা মহানগরী এক্ষণে সুপ্তিমগ্ন। সেই নিয়ত কর্ম-কোলাহলময়ী রাজধানীর মধ্যে এক্ষণে কদাচিত্ একটা শব্দ শোনা যায়। পথ প্রায় জনহীন; ভাড়াটে গাড়ী কচিৎ একখানা স্টেশনের পথে বাহির হইয়াছে, অথবা ফিরিতেছে। একটা মাতাল কোথাও স্থলিতপদে গ্যাসপোষ্টে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। দু'একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী এবং হাতের 'বেটন' এক আধ বারের মত রাস্তার উপর দেখা গেল, তাহার জন্ত কিস্ত গলির মধ্যের কোকেনের দোকানে কোন ব্যস্ততাই দেখা গেল না।

বড় রাস্তার উপরকার প্রায় সকল দোকানই বন্ধ, একখানা ময়রার দোকানের সামনে তখনও আলো

জলিতেছে এবং ভিড়ান তখনও বন্ধ হয় নাই, তার তাড়ু-চালানর ধরধরানি শোনা যাইতেছে। কোন সময় হয় তো একখানা চলন্ত মোটর সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে থিয়েটার-ফেরৎ নরনারীদের হান্তকৌতুক অকস্মাৎ একবার যেন অন্ধকারের বুকে আলো ঠিকরাইয়া পড়ার মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কদাচ পকেটে স্টেথিস্কোপ রাখিয়া কোন ডাক্তার বিশেষ কোন রোগীর জন্য আহুত হইয়া ছুটন্ত মটরে বসিয়া আছেন দেখা গেল।

বড় বড় সাহেবী হোটেলের ও দেশী বিদেশী থিয়েটার বাড়ীগুলার সামনে গাড়ী মোটর কতকগুলো করিয়া তখনও জমিয়া আছে। উদ্দি পরা আর্দ্রাঙ্গীরা সোফারের পাশে বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুনীবদের দল আহার অথবা বিহারে মত্ত, তাঁহাদের কাছে রাত্রির খবর পৌঁছিতেছে না; দুর্ব্যবহার এক শেষ এই গরীব ভূত্যের জাতির। তাদের রাত নির্জন পথের ধারেই পোহাইবার উপক্রম করিতেছিল।

আরও এক জায়গায় কিছু আলো, কিছু শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। একটু বড় রকম বাড়ীর সামনে সামনে এক আধখানা গাড়ী মোটরও দাঁড়াইয়া ছিল। সেগুলো ইংরাজ বাহালী মাড়োয়ারী ভাটিয়া সকল জাতির।

গঙ্গাতীরে এখন কল-কারখানা ও ষ্টীমার-ষ্টীম-লঞ্চের ঝকঝকানি ফোসফোসানি সব নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই তীরের বড় বড় আফিস-বাড়ীর জানালা দরজা সব বন্ধ, নিরালোক এবং শুষ্ক। সারা-দিনের কঠোর শ্রমের পর যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্য-গুলো তাদের বিপুল দেহগুলোকে যেখানে সেখানে মেলিয়া দিয়া ঘুমে এলাইয়া পড়িয়া আছে। কে জানে, কখন বাণীর উর্দ্ধস্বরে সারা সহরকে চকিত করিয়া দিয়া জাগ্রত হইবে!

নিরঞ্জন এই সমস্ত দীর্ঘ পথ নীরবে অতিবাহিত করিয়া আসিল। এক পাশে বিপুলায়তন গড়ের মাঠ, হীরক ও মকরত মণির মালা গলার দিয়া ঘুমাইয়া আছে। 'অঙ্গরজাতীয়' নরনারীর রূপের আলো, পোষাকের চমক সেখানে আর ছিল না। 'ইংরাজের স্বর্গোচ্চান' শুষ্ক স্থির। 'কিন্নরের' কণ্ঠস্বর আর তথা হইতে শ্রুত হইতেছিল না। গন্ধকলোকেয় সকল জাঁকজমক ঘুমে কোলে চাপা পড়িয়াছে। কেবল জলের বুকে জাগিয়া আছে শুধু নৃত্যশীল তারার মালা, আর একখানা মহাজনৌ নৌকার বুকে জাগিয়া জাগিয়া একটা চাটগেয়ে মাঝি তাললয়বিহীন এক অপূর্ণ রাগিণীর স্বজন-তৎপর হইয়াছিল।

নিরঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেই গীত-সুধা উপভোগ করিল—

“এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে,  
চাঁদের হাট মিলাইত গো—  
সে রূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো ও—ও—ও—।”

রস ইহাতে যত থাক না থাক, নিরঞ্জনের অন্তরের পিপাসা অকস্মাৎ যেন তাহাতেই ভরিয়া উঠিল। ওই যে পশ্চিমবঙ্গের নিকটে অনাবৃত উপহসিত, উহাদের পক্ষে একটুখানি দুর্কৌণ্য ভাবার এই জন-সম্পদশূন্য নিঃসঙ্গ রাতে ওই নিরঞ্জন মাঝি নিজের মনের ভাবটি—কাহারও কাছে নয়, শুধু নিজের কাছেই প্রকাশ করিতেছিল—নিরঞ্জনের বোধ হইল, উহার ভিতর দিয়া সে যেন সাহেবের আফিস হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে। এই উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য, এই শব্দ-বিস্তৃতি, এ যে তার বুকের মণি, এই যে তার মায়ের দান। সে কাদালের মত উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু গায়কের তদ্ভাচ্ছন্ন স্বর শুধু ‘রহিয়া রহিয়া’ ঐটুকুকেই ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল। গান আর অগ্রসর হইতে পাইল না।

নিরঞ্জন কিনারায় কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। ততক্ষণে চাঁটগৈয়ে মাঝির সঙ্গীতসাধনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণভাবেই সমুদ্র বিখচরাচর নিরুন্ম, নিস্তব্ধ এবং নিদ্রিত। ভোরের আলো লাগিয়া আকাশের তারাগুলো শুদ্ধ যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। গঙ্গার জল মূচ্ছাতুরের স্রাব পাণ্ডুবর্ণ ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

নিরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল, আপনাকে আপনিই বুঝাইতে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, “কিছুতেই ভুলতে পারচিনে কেন? অথবা নাই বা ভুলেই, মন কেন আমার স্থির হচ্ছে না? আমি তো তার অহিতাকাঙ্ক্ষা করিনি, তার ভালই চেয়েছিলাম। আমার জন্ত—আমার সেবা করতে গিয়ে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে গেল, এতে আমার তো কোন হাত ছিল না? তবে কেন নিজেকে তার হত্যাকারী বলে মন আমার নিজের কাছেও মহাপাপীর মনের মতন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে? জীবন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে? চারিদিকে কেবল সেই ছায়া—সেই ছায়াই কেন দেখছি? তার কণ্ঠ নিয়তই কেন আমার কানে বাজছে? একি হলো আমার? কালীপদ! ভাই! বন্ধু! তোমার শেষ অনুরোধ

রাখতে পারিনি বলেই কি এমন ক’রে পাগল হয়ে যাচ্ছি? চেষ্টা তো করেছিলুম, বিয়ে করবো, স্ত্রী যথা-সাধ্য রাখবো সেই ইচ্ছাই তো ছিল, পারলুম না, সে কি আমার হাত? তবে কেন আমার এ দণ্ড? সব তো হারিয়েছি,—নিজেকে শুদ্ধ, তবে শুধু তাকেই দেখি কেন? এবার আর স্বপ্ন নয়! বাস্তব মূর্ত্তি ধরেই যে সে আমার দেখা দিচ্ছে। কিন্তু—কি কুৎসিত, কি জঘন্য, কি সঙ্কটের পথ দিয়েই তার ছায়া আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে! ওঃ, কার মধ্য দিয়ে,—কার! আর কি কোন রাস্তা সে পেল না? নাঃ, আর সহিতে পারচিনে! পালিয়ে তো এসেছি, আর ফিরবো না, একেবারেই পলাই। কোন্ দিন হয় তো কি বলেই বসবো। নিজেকে তো আমার বিশ্বাস কত! না হ’লে আমি—এই আমি—এই ডবল অনার নিয়ে বি এ পাশ, ফার্স্ট ক্লাস এসে—  
অ্যা—এই কি সেই আমি? নাঃ, নিশ্চয় না। নিশ্চয় সেই আগের আমি ম’রে গেছি। এ তার—কে?—”

নিরঞ্জনের প্রতি লোমকুপটি পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ অবোধ শিশু যেমন ভূতের ভয়ে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনি করিয়া নিজের সঙ্গকে সে একান্ত ভয়ে অসহ্য বোধ করিয়া যেন নিজের কাছ হইতে পলাইতে চাহিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিতেও আরম্ভ করিত, হঠাৎ তাহার কানে যেন দৈববাণীর মতই কোথা হইতে সেই বিজন নদীপুলিনে এক মানবকণ্ঠের স্বরলহরী ভাসিয়া আসিয়া ঠেকিল। আকুল হইয়া কান খাড়া করিতেই বোঝা গেল, সে একটা গান এবং নদীতীরেই, তাহার নিকট হইতে সামান্য একটুখানি দূরে থাকিয়াই কেহ সে গান গাহিতেছে। বংশীরবাকুষ্ঠ সর্পের মতই সে সেই শব্দ লক্ষ্যে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে, শব্দ হইতেছিল কল কল কল। জল কিনারায় অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসিয়াছে, স্রোতের মুখে দূরগামী পণ্যবাহী কয়েকখানি নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাদের দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ছপাংছপ্। নিরঞ্জনের ভয়ানক বন্ধ চিরিয়া চিরিয়া একটা আশ্বাসের আশ্বাস উঠিয়া পড়িল।

গান গাহিতেছিল একজন স্ত্রীলোক এবং ওই বিজ্ঞান কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নিরঞ্জন স্পষ্টই বুঝিল, এ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট দখল আছে। সে গানটা এই—



“যে জানে আনন্দময়ী! তোমাকে।

ও সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে।

যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদের নাই কুল,—

তারা জানে না যে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল;—

সংসার নিরানন্দের ফুল—

শেষে আনন্দময় ফল পাকে।”—

নিরঞ্জন এক পা এক পা করিতে করিতে কোন্ সময় একেবারে ইহার গায়ের কাছে গিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটি ইহার সঘন-নিশ্বাসের শব্দে বারেক চাহিয়া দেখিল; তার পর ঘাড় ফিরাইয়া হাত দশেক দূরের একটা গাছতলার তাহার বিশ্বাসী দ্বারবানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিত মনে যে গান গাহিতেছিল, তাহাই গাহিতে থাকিল। নিরঞ্জনকে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ নাই। সে গাহিল—

“বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে,

ওমা, বিপদ নৈলে জন্মাক্ত জীব ডাকে না তোরে;—

মা, তোর করুণার ফল, বিপদ কেবল,

জাগার অবোধ বালকে।”—

এ গান শুনিয়া নিরঞ্জন চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আচম্কা বলিয়া উঠিল, “একি সত্যি কথা, মাঝি-দান?”

মাঝি-দান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি সত্যি কথা বাবা?”

কম বয়সী মেয়েটির মুখে এই গভীর সম্বোধনটি তাৎপর্য ছন্নছাড়া নিরঞ্জনের আরও মিষ্ট লাগিল। সে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিয়া আবার ছেলে-মামুষের মতন প্রগল্ভ প্রশ্ন করিয়া বসিল। “ওই যে বল্লেন, ‘বিপদ সম্পদের তরে,’ একি সত্যি?”

নারী কহিল, “হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি।”

নিরঞ্জন কহিল, “আপনি কখনও বিপদে প’ড়ে কি এর সত্যতা যাচাই ক’রে নিতে পেরেছেন?”

সে কহিল, “পেরেচি বই কি! বিপদ সঙ্গে ক’রে নিয়েই তো আমি জন্মেছিলুম, কিন্তু দিনকের দিন বিপদ ঘন হ’য়ে এলো, ততই সম্পদও নিকটতর হ’তে লাগলো। শেষে যখন সর্বনাশ এসে আমার গ্রাস করতে দু’হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনি সময় একেবারে তিনি নিজে ছুটে এসেই আমার কোলে তুলে নিলেন। এই যে গাইচি শুধুন না।”—

এই বলিয়া সে পুনশ্চ গাহিতে লাগিল—

“প’ড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাথে,  
যখন কাতর প্রাণে, কুসন্তানে মা’ ব’লে কাঁদে—

তখন, অরার গিরে কোলে নিরে,—

সুত-সুখা দাও তাকে।

মাগো, তবে আর এ সংসারে আনন্দ নাই,—

বলে কে?”

নিরঞ্জন নিষ্পন্দ হইয়া গান শুনি, তার পর বিমোহিতভাবে সে ঐ অপরিচিতা মেয়েটির দিকে মুখ ফিরাইয়া উহাকে বলিল, “তোমার আমার মা ব’লে ডাকতে ইচ্ছা করচে! মা’র মতন তুমি আজ আমাকে, যে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলুম, সেই মহাশিকার মধ্যে হাতে ধ’রে টেনে এনে দিলে।”

মেয়েটি জোড়হাত নিজের কপালে ঠেকাইয়া জবাব দিল, “মা’ হবার যোগ্যতা আমার একটুও নেই; তবে আপনি আমার বাবা হলেন। তা নিজের মেরেকেও তো লোকে আদর ক’রে মা’ বলে, সেই হিসাবে আমার আপনি ‘মা’ই বলবেন। আমার নাম সুখমা। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক এক দিন এখানের খোলা হাঁওরা আর আমার বড় মায়ের রূপ দেখতে আসি। থাকি কি না আদিগঙ্গার ছেলে মা-টির বুকে। আপনিও হয় তো আমার মতই উদ্বেগ নিয়ে অথবা কোন উদ্বেগ না নিয়েই এসেছেন? আপনাকে আমার কিন্তু ভাল লাগছে! হ’লে কি হয়, সকাল হ’য়ে এ’ল, আপনি এখন বাড়ী যাবেন তো? আমিও তা হ’লে এখন বাড়ী যাই।”

নিরঞ্জন মুগ্ধ হইল, একটু যেন সে তৃপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল, “তুমিও খুব বিপন্ন হয়েছিলে বললে না? তোমার কথার ভাবে বোধ হ’লো, আজও তোমার সে বিপদের মেঘ সম্পূর্ণ কাটেও নি। কিন্তু তুমি তো বেশ শাস্তভাবেই সব কথা বল্চো,—সংসারকে শাশানের পরিবর্তে আনন্দ-কানন ব’লেও উল্লেখ করতে তোমার বাধা নেই না! আমি যে তা ভাবতেও পারিনি।”

সুখমা বলিল, “দেখুন, আনন্দ তো বাইরে পাবার জিনিষ নয়, আর কুড়িয়ে বেড়াবারও নয়। ওটাকে নেই নেই ভাবতে ভাবতে ওটা একেবারেই মরীচিকা হ’য়ে মিলিয়ে যায়। আর আছে আছে জপ করতে করতে নিজের মনের মধ্য থেকে সে সহস্রদলে বিকসিত হয়ে ওঠে। আমার সাধুজী আমার এই রকম ক’রেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন। আহা, আবার যদি আমি তাঁকে ফিরিয়ে পেতুম! সংসারে কতই যে শেখবার রয়েছে। কিছুই তো শিখতে পেলুম না। ছাত্র মেয়ে হ’লে

জন্মেছিলুম, তাও আবার একেবারেই অধমের চেয়েও অধম হয়ে!”—

তোর না হইতেই কলিকাতা মহানগরীর নিজা সাড়সরেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকজন গাড়ী ঘোড়া মটর রিক্সা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। এখানে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁটাইতেছে, ওখানে আবর্জনার স্তুপ বোঝাই হইতেছে। দোকান ঘরের দরজা জানালা খটখট খোলা হইতেছে, গল্লামানের যাত্রীরা আসা-যাওয়া করিতেছে। রাস্তাভিখারীরা ঘরের পানে এবং ভোরের কীৰ্ত্তন গাহিয়া বৈরাগী বৈষ্ণব বা বাউলেরা ফুটপাথের উপর চলাচল করিতেছিল। কলের ঝড়ি, মাছের বাজরা মাথায় লইয়া ও দুধের ভার কাঁধে বহিয়া মুটেরা বাজারের দিকে চলিয়াছে। নিরঞ্জনকে এত ভোরে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া রাজবাড়ীর দ্বারবানেরা কিছুই বিশ্বাস বোধ করিল না। এ বাড়ীর সবাই জানে সে পাগল।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাসি খেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,  
ভেবেছিলাম এমনি ক’রে তোমায় দিব ফাঁকি।  
বুকে আমার যে সুর বাজে,—গুঞ্জে যা মর্মমাঝে,  
ভেবেছিলাম সূখের সাজে রাখব তারে ঢাকি।  
—ওইন্দ্রি দেবী।

পড়াশোনা চুকাইয়া দিয়া নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করিতে করিতে একদিন পরিমল হঠাৎ চমকভাজা হইয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, নরেশের মুখ আজ কাল বেজায় গম্ভীর হইয়া আছে এবং তিনি ইদানীং তাঁহার বিদ্যালিক্ষা বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরিমল মুক্তি দিয়া স্থির করিল যে, ওটা ঠিক বৈরাগ্য নহে, ক্রোধই হইতেছে উহার উচিত অভিধান। নিরঞ্জনের ছাত্রাবস্থা হইতে ছুটি লওয়ায় তিনি তাহার উপর এবার একটু বিশেষভাবে চটিয়াছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ তিরস্কারকে সে অত্যাচার বোধ করিয়া মনে মনে নিজের রাগ করিত, অভিমান করিত। কিন্তু তাহার নিহক ভয় ছিল, তাঁহার ওই নিস্তরু ক্রোধের মৌন অভিনয়কেই। সে জানিত, মনের ভিতর হইতে রাগ না করিলে তেমনটা প্রায়ই ঘটিত না। যেহেতু সমস্ত উদার স্বভাবের লোকের মতই নরেশের মনে বড় অল্পেই আঘাত লাগে। পরিমল ভয় পাইল।

‘কর্ণধার’ প্রেসের ম্যানেজার গাদাখানেক কাগজপত্র লইয়া আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব তর্কাতর্কি করিয়া এই সবেমাত্র চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের একখানা ‘তরুণ’ নামক মাসিক পত্র এবং একখানা ‘নবীন জগৎ’ নামক সাপ্তাহিক ছিল। এই সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে দুজনে একটু মতের অনৈক্য ঘটিতেছে। ম্যানেজার সে দিন এমন একটুখানি আভাস দিলেন, তার ভাবটা যেন নরেশ তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক ভাব সর্বদা বজায় রাখিতে চাহিলে উহার এখানে চাকরী করা একটু অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, এই রকমেরই। নরেশ এই বিষয়ে কিছু ভাবিতেছিলেন।

পরিমল আসিয়া প্রবেশ করিল।

“নিরঞ্জনের কাছ থেকে এই একুনি পড়া শেষ ক’রে এলেম। ওর কাছেই আমি পড়বো, তুমি রাগ করো না।”

নরেশ একটা অপ্রিয় আলোচনার পরেই অপ্রিয় চিন্তার (এক শুধু এই একটিই নয়, আরও অনেক-গুলারই) হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার হয় তো মনের মধ্যে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্যভাবই করিলেন। চোখ না ফিরাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কই না, রাগ তো করিনি।”

পরিমল তাঁহার গা ঘেসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, “তা বই কি, রাগ নাকি আবার তুমি করতে বাকি রেখেছিলে! ক’দিন ধরে দেখাই পাইনে, কথাই কও না, আবার বলা হচ্ছে, ‘রাগ করেনি!’ মাগো! এমনি ক’রেই কি তা বলে শান্তি দিতে হয়? ওর চাইতে যে কান মলে দেওয়াও ঢের ভাল ছিল।”

নরেশ নিজের মনের চিন্তা তদ্রূপতায় যে দ্বীর প্রতি কর্তব্যের এতটাই ঝুটি ঘটিতে দিয়া কেনিরা-ছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া মনে মনে লজ্জিত ও ঈষৎ দুঃখিত হইয়া পড়িয়া তাহার হাত দুটি নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া দিলেন ও তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিবার ভাবে কহিলেন, “তাই নাকি? এসো তা হ’লে কান মলেই দিই।” এই বলিয়া তাহার লজ্জার রাস্তা কর্ণমূল দুই আঙ্গুলে ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন।

পরিমল ওইটুকু আদরেই একেবারে গলিয়া পড়িল। তার পর অনেকখানি দানের একটু একটু প্রতিদান কাড়িয়া ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “বল রাগ ভাল হয়েছে বল? রাগ করোনি তো আমি মানুবো না,



আমি জানি যে, তুমি আমার উপর খুব বেশী রকম রাগ করেছিলে। এত শীগগির যে আমার আদর করবে, সে আমি একেবারে ভাবতেই পারি নি।”

নরেশ তখন আদরের গৌরবে গরবিনীকে আর একটু ‘উপরি’ পাওনা পাওয়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আহা, এমন জানলে না হয় একটু রাগ ক’রেই থাকতুম যে! তা আমার রাগটা কেন হয়েছিল বলা তো? আচ্ছা, দাঁড়াও মনে করি। নাঃ, পারলুম না। তুমিই মনে ক’রে দাও দেখি। কিছু দেণ, যেন মিথ্যে ক’রে যা’ তা’ একটা বলে দিও না।”

পরিমলও এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিতে হাসিতে লুটো-পুটি থাইয়া শেষে বলিল, “উনি রাগ ক’রে জ্বল করবেন আমার, আবার উণ্টে তার হিসেব নিকেশ করতে হবে আমাকেই। এ মজা তো বড় মন্দ নয় দেখি। ঈস, আমি বলবো কেন?”

নরেশ গাভীর্ঘোর ভাগ করিয়া বলিল, “বেশ মশাই, বেশ! না হয়, বলবেন না। না হয় এবার থেকে আমার রাগের হিসাব রাখবার জন্তে আর একটা হিসাব-নবিশই রেখে দেবো, তার জন্তে আর হয়েছে কি।”

পরিমল আর এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তার পর অনেক কষ্টে হাসি থামিলে পর স্বরণ করাইয়া দিল যে, সে দিন সে নিরঞ্জনকে কাছে আর পড়িবে না বলিয়াছিল এবং তার পর হইতেই নরেশের মুখ বেজায় তার তার দেখা যাইতেছে।

নরেশ তখন যেন চমকভাঙ্গা হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, “ওহো, তাও তো বটে! তা হ’লে এখন তাকে নিয়ে কি করা যাক-বলো দেখি? তা ওকে তুমি যদি বরখাস্তই করলে, তা হ’লে না হয় ওকেই আমার রাগ করবার হিসাব রাখবার জন্তে রাখাই থাক না কেন? একটা কাজ তো ওকে দিতে হবে।”

হাস্তের কলঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিমল বেদম হাসি হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তাই দাও। আমি হরির লুট মেনেচি, তুমি ওকে যাতে নিজের কাজে লাগাও তারই জন্তে! তা হ’লেই তোমার হিসাবের কড়ি আর বাধেও খেতে পারবে না।”

নরেশচন্দ্রও প্রথমটা তাহার হাসিতে যোগ দিলেন, তার পর একটু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “সত্যি কি নিরঞ্জন বড় বেশী অন্তমনস্ক?”

“তুমি দিন কতক পরীক্ষা ক’রেই দেখ। আমার মাথা খাও।”

নরেশ কহিলেন, “তাই দেখবো, প্রেসের ম্যানেজার বোধ হয় চলো। যে ক’দিন নতুন না পাই, ওকেই সঙ্গে নিয়ে চালাবো।”

পরিমল পরম পরিতোষ লাভ করিল, সম্বন্ধটা অন্য রকম না হইলে হয় তো বলা যাইত, প্রাতর্কাক্যে তাঁহাকে রাজা হওয়ার জন্ত আশীর্বাদ করিল—এ ক্ষেত্রে তা অবশ্য করিল না; কিন্তু বিশেষ রকম বদ্ব করিয়া সে স্বামীর কপালের ঘাম নিজের শান্তি-পুরে সাড়ীর আঁচল দিয়া মুছিয়া দিল। ‘কত ঘামচো?’ বলিয়া ঘরে ইলেকট্রিক পাখা খোলা থাকার সঙ্গেও নিজের আঁচল ঘুরাইয়া তাঁহাকে হাওয়া দিতে লাগিল এবং আরও পতি-সেবার কি কি খুঁটিনাটি সমাধা করিতে মনোনিবেশ করিয়া দিল, তার খবরে কাজই বা কি?

কিন্তু দু’দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, নিরঞ্জনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা তার যতই থাক না কেন, বুঝি আনন্দও একটুখানি কোথায় যেন ছিল। সেই আপনাতোলা অসহায় ও নিঃসঙ্গ জীবটিকে সে যে ঘণ্টাখানেকও একটুখানি কাজ দিয়া রাখে; এইটুকু হইতেও সেই কস্মহীন দীর্ঘ অবসরের ক্লান্ত জীবনটিকে বঞ্চিত করা তার কাছে হঠাৎ যেন চৌর্যের মতই অপরাধজনক ঠেকিল। আর এই অবসরে এই বিপুল রাজপ্রাসাদের অসংখ্য দাসদাসীবর্গের দ্বারায় উৎপীড়িত উপদ্রুত মানুষটিকে সে যে কতকটা রক্ষা করিয়াও চলিতেছিল, সেইটুকুকে হারাইয়া ফেলার তার মন আজ পীড়া বোধ করিতে লাগিল। আহা, ভাগ্যচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে কি নিপীড়িত—কি ভীষণরূপেই নিপীড়িত সে; আর কি তাকে পীড়ন করিতে দিতে আছে? নিজের স্বামীর মহত্ব অনুভব করিয়া সেদিন এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, রাত্রে নরেশ শয়ন করিতে গেলে, সেও তৎক্ষণাৎ আর এক দিক দিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। নরেশের মন যদিও সে সময় পত্নী-সন্তাষণের ঠিক অনুকূল ছিল না,—বড়ই চিন্তামান ও ভারাক্রান্ত—তথাপি স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন পূর্বক তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, “এসো।”

স্ত্রীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটুখানি ক্রটি বোধ থাকার কুণ্ঠাতেই তাহার ‘পরে সময় সময় আদরের মাজাটা কিছু বেশী করিয়াই বঞ্চিত করিতে

সেখানে নিজের শরীর-মনের আলসকে প্রশ্রয় দেওয়া বুঝি একেবারেই চলে না।

পরিমল আসিয়া টিপ করিয়া তাঁহার পারে একটা প্রণাম করিল, আর এক দিনকার একটা অবিস্মৃত এমনি দৃষ্টই স্বরণ করিয়া নরেশের ক্ষুণ্ণ অমনি প্রমত্তবেগে ছলিয়া উঠিল, তিনি কষ্টে সংযত হইয়া উহা চাপা দিবার জন্য, উহাকে নিজের বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাধিয়া ধরিলেন।

“ঈশ!—আজ হঠাৎ এত ভক্তি কেন?”

“অভক্তিই বা কবে ছিল? ভক্তিভাজনকে ভক্তি করবো না?” বলিয়া পরিমল স্বামীর আদর-টুকু নিঃশেষে উপভোগ করিয়া লইল। নরেশ তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—“আমি বলবো, কেন প্রণাম পেলুম?”

পরিমল বলিল, “বল তো দেখি, কেমন বলতে পার?”

“আদর খাবার জন্যে।”

“যাও, হ্যাঃ,—তা বই কি? আমি একুণি চ’লে যাব।” পরিমল এই অল্পযোগ জানাইলেও নিজের পাওনা-গুণা ছাড়িয়া যাইবার কোন ভরা দেখাইল না।

“তা হ’লে নিরঞ্জনকে চেলাগিরি ছাড়িয়ে দিয়েছি ব’লে? ঠিক কি না?”

“না, তাও না।—ভাল কথা! নিরঞ্জন তোমার কাজ করতে কেমন বল তো?”

“চমৎকার! নিরঞ্জন যে এতটাই বিদ্বান্, তা আমি কখন মনেও করতে পারি নি। ইংরাজীতে, বাংলায়, হিসাবে পত্রে, সকল দিক্ থেকেই ওর সমান শক্তি। বি, এ, এম, এ পাশ না করলে কখনই অমন হ’তে পারে না,—অন্ততঃ অতদূর পড়াও চাই। কে জানে ওর কি রহস্য! এ কি কোন দিনই জানতে পারা যাবে না?”

কথাগুলো নরেশচন্দ্র পরিমলের চেয়ে বোধ করি নিজের মনকেই শুনাইতে চাহিয়া বলিলেন,—

“যতই ওকে দেখছি, ততই যেন নূতন নূতন বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি! ও যেন একটা জীবনবৃক্ষ সারনাথ বা সাক্ষির ভগ্নস্তূপ! বাহিরেরটা সব মাটির টিপি হয়ে গেছে। কিন্তু যতই খুঁড়ে তোল, অভিনব অভিনব ভাস্কর্যের আবিষ্কারে মন যেন বিশ্বয়সাগরে কুলহারা হয়ে যায়! ও’কে? কে জানে ওর পরিণাম কেমন ক’রেই অমন হলো!”

সহসা বিদ্যুৎসুরণের মতই কোন কথা স্বরণে আসিয়া পরিমল স্বামীর বক্ষে চঞ্চল হইয়া মুখ তুলিল,

“দেখ, ওর একখানা ডায়ারি আছে। আমি দেখেছি, ও ব’সে ব’সে তাতে কি সব লিখে রাখে। সেইখানা পেলে হয় তো ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যেতে পারে।”

অবিশ্বাসের মূহু হাস্তে নরেশচন্দ্রের অধর কুঞ্চিত হইল। “তুমি যেমন পাগল!—পাগলের আবার ডায়ারি! আর থাকলেই বা ও আমাদের সে দেখাবে কেন? তাই যদি দেখাবে, তা হ’লে তো সব বলতেই পারতো।”

পরিমলের মনের মধ্যে যাই থাক, তাহা প্রকাশ না করিয়া যুখে সেও স্বামীর কথার সার দিল, সংক্ষেপে বলিল, “তা বটে।” কিন্তু সেটা ঠিক তার মনের কথা নয়।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মনের আবেগে উড়িতে চায়,

অক্ষম পাখা পড়িয়া যায়,

বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

—তীর্থরেণু।

নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যগ্নিত করিতেছিল স্ব-মার এই চিঠিখানা।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

পূজ্যতমেষু!

সে দিন ডাকহীরা আনিয়া সব কথা অপনাকে আমার বলা ঘটে নাই এবং সামনে বলার ভরসা না রাখিয়াই তাই আজ পত্রে সে কথা জানাইতে বসিয়াছি। এই-সাহস, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার ঐচ্ছিক সঙ্কল্পে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শিশুপুলের শত অপরাধের চেয়ে বেশী স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিতে পারেন নাই। আর আপনি তো আমার সহস্র অপরাধকেও সহ্য করিয়া লইয়াছেন, তাই ভরসা, আরও না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।.....

সে দিনও আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আমার বর্তমান জীবনযাত্রার পদ্ধতি আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতেছে। পাখীকে খাঁচার পুরিয়া মাহুবে তার স্বাধীন জীবনের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বিলাসে আদরে তাহাকে ভরাইয়া দিয়াও যেমন তার স্বাধীনতার স্বতিকে ভুলাইয়া দিতে পারে না, মাহুকের মনকেও তেমনি তার পক্ষে হুতাপ্য শান্তির ও অজস্র সুখের নীড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও বুঝি তাহার উদ্ভাস উন্মুক্ত



স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও রোধ করিতে পারা যায় হয়। তার মন যখন কর্মের উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন বিশ্রামশয্যা তার পক্ষে কণ্টকারণ্যের স্থান-ধিকার করে। তার পরেও যদি জোর করিয়া তাহাকে সেখানে পড়িয়া থাকিতে হয়, তো সে কাঁটা শুধু তার শরীরকে নয়, তার মনকে শুদ্ধ তীক্ষ্ণ ধারে বিধিয়া বিধিয়া রুদ্ধিরাক্ত ও অসাড় করিয়া দেয়, (তাই অধীন জাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দিনে দিনে দুর্বলদেহ ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়া অনিবার্য্য)।—আমারও সেই অবস্থা। শুধু নিজেকে লইয়া দিন কাটান নয়, নিজের কাছে নিজের দাম এতটাই কম হইয়া গিয়াছে যে, সে কি বলিব,—এটা যদি আমার কোন তৈজস পত্রের সামিল হইত তো এটাকে জঞ্জালের সঙ্গে বাঁটাইয়া আমি কোন্ কালে আদি গঙ্গার ভাসাইয়া দিতাম।

আমার কাজ দিন,—কোন—কোনও একটা কাজ দিন। কোন বালিকা-বিজ্ঞানরের চাকরী আমি পাই না কি? বেশী না জানি ‘ক’ খ’ও তো ছোট মেয়েদের শিখাইতে পারিব। কোন ভদ্র পরিবারে গান শিখাইবার অধিকার কি আমার আছে? যেখানে আমি আদরের সহিত অভ্যর্থিতা হইব, সেই আমার স্বজাতি-বর্গের মধ্যে পা দিবার কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ভরে কাঁপে! অথচ আমি জানি, সেইখানেই আমার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। যদি তাদের মধ্যে একটা জীবনও আমার দ্বারা রক্ষিত হয়! জানি, আমার মত পুণ্যসঞ্চয়-হীনার পক্ষে সে পুণ্যের প্রলোভন নেহাৎ সামান্য নয়। কিন্তু আমার তাহাতে ভরসা হয় না। মনের মধ্যে আমার প্রৌঢ় দেখা দিলেও বরসে আমি আজও তো কুড়ির সীমা ছাড়াইতে পারি নাই। নিজের উপরে বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইলেও পরের উপর এখনও যে ভর রাখিতে হয়। তদ্বির যাহাদের আমি পাপ-পথ হইতে ফিরাইয়া আনিব, তাদের আশ্রয় কোথায়? সেও যে একটা মস্ত বড় অভাব রহিয়াছে। লম্বার মনেই কিছু এত বড় বৈরাগ্য জাগিবে না যে, কালীবাসিনী হইয়া ভিক্ষার কুলি তুলিয়া লইতে পারিবে।

তা হ’লে আমার পথ কি? আপনি যদি অনু-মতি করেন, আমি নিজেই একবার সে পথটা খুঁজিয়া দেখি? প্রথমে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দেখি, যদি ভদ্র পরিবারে কর্মে পাই, অত্র চেষ্টা আমি করিব না। আমার মত অপবিত্রার পক্ষে নিতান্ত স্পর্ধা হইলেও চিরদিনই আমার বড় লোভ হয় যে, উহাদের পবিত্র

সঙ্গে নিজের এই শূন্য নিরালস্য জীবনটাকে আমি একটুখানিও আমি পবিত্র করিয়া লই। মিশনরী মেমরা ও তাদের আরারা যেটুকু পায়, জানি না সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আমার মত হীনজনের আছে কি না?—কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? বলুন, অনুমতি দিন, আদেশ করুন,—ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি? শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।

আপনার সেবিকাধমা

সুসমা দাসী।

নরেশের মনের মধ্যে এই মিনতি ও বেদনাতরা আবেদনখানির প্রতি পংক্তিটি যেন বিছার কামড় মারিতেছিল। মাতুষের ভাগ্যানিস্তার প্রতি একবার অভিমান হইল, অমন একটি জীবনকে কেন তিনি এমন ব্যর্থ করিবার জন্য অস্থানে পাঠাইলেন!—নিজের অক্ষমতার ‘পরেও রাগ ধরিল; সে যদি উহার রক্ষাতারই গ্রহণ করিয়াছিল, তবে তাহার যশ অকল-হিত রাখিতে পারিল না কেন? লোকচক্ষে তাহার মর্যাদাকে এমন নির্দয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া তাহার একেবারেই উচিত হয় নাই এবং পরিশেষে সেই অসহায় বালিকাকে তাহার বন্ধিগৃহে একাকিনী দুর্বল জীবনবহনে বাধ্য করিয়া নিজে সে শত উদ্দীপনা ও আনন্দের জীবনে এই যে সরিয়া রহিল, এর মধ্যেও যে কত বড় কাপুরুষতা বিস্তারিত রহিয়াছে, তা’ ভাবিয়াও লজ্জার মাথা তাহার হেঁট হইয়া আসিল। আরক কৰ্ম্ম সূচাক্রমে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে বাহার মাথো কুলাইবে না, সে তেমন কাজের তার মাথা পাতিয়া লয় কেন?

বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কয়দিন পরে এই পত্র লিখিয়া দ্বারবানের হাতে পাঠাইয়া দিল।

শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন—

সুসমা!

তোমার পক্ষে তোমার আগ্রহ ও উদ্বেগের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে তোমার আর নিবৃত্ত করিতে পারি না। তুমি বুদ্ধিমতী; নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে তোমার বিচার আমার চেয়ে তুমি নিজে ভালই করিতে পারিবে। তোমার অন্তরের পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা আমার অবিদিত নয়; তোমার আমি সর্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস করি। যাহা সম্ভব এবং বোধ করিবে, তাহাই করিও। যখন যে সাহায্যের আবশ্যক, অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইতে দিখা

করিও না। ঈশ্বর তোমার কুশলে রাখুন এবং মঙ্গল করুন, এই আন্তরিক আশীর্বাদ করি।

তোমার চিরন্তনতারা

নরেশচন্দ্র।

সুখমা এই পত্র পাঠ করিবার পূর্বে একবার এবং পরে আর একবার দেবনির্মাল্যের স্তায় সম্মুখে ও প্রজ্ঞায় উহা নিজের মাথায় ঠেকাইল। পাঠশেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি চিঠিখানি নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তারপর গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া সে একেবারে তাহারই মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিল। যে অসুখমতি পাইবার কয় দিন দিবারান্ত্রে সে বারিপ্রত্যাক্ষী উর্জমুখী চাকরের স্তায় আশাপথপানে চাহিয়া ছিল, সে প্রত্যাশা তো পূর্ণ হইল। কিন্তু কল্পনা—সুন্দর ও মধুর কল্পনা বাস্তবের বেশে যখন দেখা দিবে, তখন তার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য যদি ঠিক সেই মানসরূপে দেখা না দেয়, যদি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দেখা দেয়, তবে সে যে সহিতে পারা দায় হইবে! এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপরে হঠাৎ সুখমার স্মরণ হইল যে, তার প্রাণে সবই সহিয়া যায়। তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইয়া সে নরেশচন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদান করিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

পুজ্যতমেবু!

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া কৃত-কৃতার্থা হইলাম। এইবার চিরদিনের স্বপ্ন সফল করিতে সচেষ্ট হইব। কেমন করিয়া কাজ আরম্ভ করিব, কিছুই জানি না। আপনার অবস্থা অনেক বড় ঘর জানা আছে, কিন্তু সে সব জায়গায় হয় তো আমার প্রবেশ নিষেধ। কারণ, পরিচয়পত্র তো দিবার কিছুই নাই এবং দিলেও কুফলের পরিবর্তে কুফলেরই আশঙ্কা অধিক। কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমার পরিচিত করিয়া দিতে পারেন কি? যদি সম্ভব ও সম্ভব হয় করিবেন।

আপনার সেবিকাধমা

সুখমা দাসী।

এই পত্র পাইয়া নরেশচন্দ্র আরও একটু বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, এই প্রথম চেষ্টায় সুখমা অকৃত-কার্য্য হইবে। তাহার হতাশাকাতর মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করিয়া লইয়া তিনি তাহার জন্ত

অত্যন্ত উষ্ণ ও দীর্ঘ একটা নিখাস মোচন করিলেন। তার সেই যে মুখ আধ অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত-মানসিক সংগ্রামে বিধ্বস্ত অথচ সুদৃঢ় চিত্তবলে বলীয়ান সেই যে দুটি চোখের দৃষ্টি দীর্ঘ দীর্ঘ কালের লেখাকেও পরাভব করিয়া দিয়া তাঁহার মানসনেত্রে যখন তখন ফুটিয়া থাকে, তাঁহাকে জাগ্রতে বা নিদ্রিতে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়, আর একবার তাহাদের মধ্যে তীব্র হতাশার মর্ম্মভর যন্ত্রণার শিখা তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। সে দিনের ত্যাগে আত্মপ্রসাদ সব কিছু ক্ষতিকেই জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এ যে শুধুই আঘাত ও অপমান। অথচ জীবনের এই লক্ষ্য-ধরিয়াই যে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে,—ওধু খেঁচার নয়—ইহারই জন্ত বাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে,—আর তাই করিতে গিয়াই যে আরও বিশেষ করিয়াই লোকলোচনের ও জন-রসনার তীক্ষ্ণ ও নির্দয় সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে পথ হইতে অপরীক্ষিত ভাবেই বা তাহাকে ফিরিতে বলা যায় কেমন করিয়া?—বিশেষ সকল দিকের পথই যাহার সঙ্গীর্ণ!—কিন্তু কেমন করিয়াই বা ইহার আকাজকা পূর্ণ করা যায়? যখন মুমূর্ষু সুগন্ধা নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার আশার কথা জানাইয়াছিল, ভবিষ্যতে সুখমা একটি সমীত-বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক গৃহস্থ-কল্যাণের শিক্ষার অধ্যায়সর্গ করে, এই সাধ তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখন সেটাকে নরেশচন্দ্রও খুবই সম্মত ও সহজ বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন এবং সেই পথেই তিনি উহাকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছেন। তখন ভুলিয়াও তাঁহার মনে সংশয় জাগ্রত হয় নাই যে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে নিঃসঙ্গ সুখমাকে জনসমাজে কলঙ্কিত হইতে হইবে এবং তাহার পক্ষে তখন শিক্ষয়িত্রীর আসন পাওয়া অধিকতরই কঠিন হইয়া পড়াও সম্ভব। সে ভুল ভাবিয়া বহু বিলম্বিত হইয়া। বা হোক, এখনকার বেটুকু সহুপায়, নরেশচন্দ্র তাহাতে আলস্য করিলেন না। সুখমার পত্রের উত্তর না দিয়া তিনি নিজেই প্রথমে এক বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন। সেখানের মহিলা-অধ্যক্ষ, পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে নরেশের যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু দ্বিধার অবসর নাই। তিনি ছ'একটা বাদ দিয়া আর সব কথা উহাকে খুলিয়া বলিলেন। মহিলাটি বিশেষ গাভীর্ঘোর সহিত পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিয়া লইয়া গভীর-মুখে উত্তর দিলেন, “মাপ করবেন মশাই! আমাদের



স্কুলে বিশেষ ভদ্রসংসারের গ্রাজুয়েট মেয়েদের ভিন্ন কাজ দেওয়া হয় না।”

নরেশ অন্তরে অন্তরে লজ্জান্বিত করিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, “যদি সেই মেয়েটি বিনা বেতনে এখানে দু’এক দিন মেয়েদের গান বাজনা শিখিয়ে যায়, তাতে আপনার আপত্তি আছে?”

প্রবীণা মহিলা অবিচলিতস্বরে জবাব দিলেন, “সে রকম আমাদের নিয়ম নয়। চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ রকম সার্টিফিকেট অন্ততঃ দু’তিন জন বিজ্ঞ ও বিশেষ-রূপ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হ’তে না আনুলে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কাকেও মিলিতে দেবার নিয়ম নাই।”

সুখমার জীবন-চরিত্রের সঙ্গে এই আপত্তিটার অকাটা ও সুদৃঢ় সংযোগ দেখিয়া নরেশচন্দ্র সেখান হইতে নিরন্তরে প্রস্থান করিলেন।

আরও দু’এক স্কুলে প্রায় একরূপ উত্তর লইয়া তিনি ওদিকের চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ছোট খাট অর্ধঅচল প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বিনা বেতনের সঙ্গীত-শিক্ষারিত্রীর সম্বন্ধে অবশ্য অতটা তাচ্ছিল্য ঘটা হয় তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু বড়দের কাছে হতাশ হইয়া নরেশের আর ছোট দরবারে হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ তাঁহার মনে হইল, যদি উচিতের দিক ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বাধ্য করা বা লোভে ফেলা অসুচিতই হইবে। কারণ, সুখমা-জাতীয় জীবনের বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি অপরিণতমতি বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া কতদূর সমীচীন, তাহা ভগবানুই জানেন। সুখমা যদি তাঁহার এমন পরিচিত-তমা না হইত, তবে নিজেই তো তিনি ইহার বিরোধী হইয়া উঠিতেন। বড়ই সমস্তার বিষয়।—এদের পথ দিতে হইবে, কিন্তু সে পথ দিতে গিয়া আবার অন্তের পক্ষে এতটুকু না তাহা পিচ্ছিল হইয়া পড়ে, তার উপরও যে দৃঢ়বদ্ধ দৃষ্টি রাখার একান্তই আবশ্যক।

নরেশের এক উদারমতালসী বন্ধু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ‘বিশ্বপ্রেমিক’ নাম দিয়াছিল; আসল নাম তাঁর, বিশ্বপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। নরেশের মোটর আমহাষ্ট্র ট্রাউটের মোড় ফিরিতেছিল, বিশ্বপ্রিয় চীৎকার শব্দে ডাকিল, “রাজাবাহাদুর!”

নরেশ মনে মনে যেন ইহাকেই খুঁজিতেছিলেন, উল্লাসে ব্যগ্র হইয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলে গাড়ীখানা যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণে বিশ্বপ্রিয় নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল, “কোথায় চলেছেন?” নরেশ গাড়ীর দরজা নিজে খুলিয়া ধরিয়া উহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আপনার কাছেই। আর্মবেন একটু?”

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

না হয় দেবতা আমাতে নাই।—

মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা

সাধকেরা পূজা করে তো তাই?

একদিন তার পূজা হ’য়ে গেলে,

চিরদিন তার বিসর্জন,

খেলার পুতলি করিয়া তাহারে

আর কি পুজিবে পৌরজন?

—কাহিনী।

বিশ্বপ্রিয়কে নরেশ সুখমা-সম্বন্ধীয় সমস্তার কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বপ্রিয় সব কথাই নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিল, কিন্তু সুখমার সঙ্গে নরেশের যে কখন কোন অসৎ সম্বন্ধ ছিল না, এই কথাটা সেও মনে মনে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। রাজা নরেশের যে প্রবল প্রতাপাধিতা ‘উপসর্গ’টির জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীর অনেকখানি আত্মীয়-রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ যথার্থ বড়লোকের ছেলের দলে স্থান লাভ করিবার নেহাৎই অযোগ্য নহেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সকলের মত বন্ধুসমাজে তাঁর ‘নিজ জনের’ পরিচয় করাইয়া দিতে উহাকে পাশে লইয়া কি বাজালা, কি ইংরাজী আর কি পার্শী থিয়েটারে রিজার্ভ বক্সে বসিয়া অভিনয় না দেখায়, বাগানের মজলিসে তাহার ‘মজুরা’ না করানোর ধনী মহলে যে নিন্দার সীমা ছিল না, এ সব তো আর লুকানো কথা নয়। আজ হঠাৎ একেবারে জলজ্যাস্ত সেই জীবটিকে বেমানুম উড়াইয়া দিতে চাহিলে সে উড়িবে কেন? বন্ধুদের মধ্যে নরেশের আড়ালে অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে—অবশ্য যাদের একটু বাক্য-রসোপভোগসামর্থ্য ছিল—উল্লেখ করিতে হইলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে ‘বসন্তসেনার চারুদত্ত’ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বিশ্বপ্রিয় নিজেও কখন কখন যে না করিয়াছে, তা নয়। অতএব সে স্থির করিল, বিবাহিত নৃতনের আত্মদপ্রাপ্ত নরেশ সুখমাকে পুরাণ ও জীর্ণ বস্ত্রের স্তায় ফেলিয়া দিতেই ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রবল অনুকম্পাপরবশ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল—“কিছু ভাবনা নেই, আমি

তার জন্ত ভাল দেখে কাজ ঠিক করে দেবো। গান শেখাবার কাজের আবার ভাবনা। লোকে একটা শেখাবার লোক পায় না।”

নরেশ বিশ্বপ্রিয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চিনিত। সে নিশ্চিত হইয়া বাড়ী গেল এবং সুমমাকে লিখিল, স্কুলে সুবিধা নয়, তবে ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে কাজের জোগাড় শীঘ্র হইবারই সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাইলেই জানাইব।

শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল এবং বিশেষভাবে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও অগত্যা এক রকমে মনস্তুষ্ট করিয়া লইয়া নরেশ সুমমাকেও সেই খবর তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। সে চিঠি পাঠাইতে তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উখিত ও পতিত হইল।

কিন্তু সুমমার ইহাতে যেন আনন্দের আর অবধি রহিল না। কান্দালে যেন কি নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে, এমন করিয়াই সে নেহাৎ সাত বছরের মেয়ের মতন আহ্লাদে প্রায় নাচিয়াই উঠিয়াছিল। এক বিলাতফেরৎ-পরিবারে তাহাকে দু’তিন ঘণ্টার দু’এক রকম বাজনা শিক্ষা দিতে হইবে। বাড়ীতে কেবল স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন ধনাঢ্য ও নব্যতন্ত্রের ছেদী-কন্ডা, স্বামীটি বাঙ্গালী।

সুমমা উঠি পড়ি করিয়া রান্না-খাওয়া সারিল, বরাবর সে নিজেই রান্না খায়। নরেশ প্রথমাবধি ইচ্ছাপূর্বকই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিলাসিনীর গর্ভগ্রন্থতা সুমমা বিলাসসুখকে তুচ্ছ বোধ করিতে শেখে, সেই শিক্ষাই তিনি তাহার জন্ত সর্বপ্রযত্নে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সুমমারও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তিবোধ ছিল না।

আহার সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি সে বেশভূষা সমাপ্ত করিয়া লইল। সুমমা বড় একটা লোকসমাজে বাহির হয় নাই। ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া জীবনের মধ্যে এই তার প্রথম। কাপড়ের ট্রাকটা খুলিয়া ফেলিয়া সর্বপ্রথম তাহার ভাবনা হইল, কি পরিয়া সে আজ বাহির হইবে? যত দিন সুমমা ছোট ছিল, চাঁদনির বাজারে কেনা ফরিদপুরী ছিটের ফ্রকই একমাত্র তাহার জন্ত কিনিয়া দেওয়া হইত। বৎসরে একবার পূজার সময়ে একটা সিল্কের পোষাকের মুখ সে দেখিতে পাইয়াছে। তের বৎসর বয়স হইলে প্রথম সে সাড়ী পরার জন্ত আবেদন জানায়, তার পর হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর সবচেয়ে মোটা ও কম দামী সাড়ী, টাটা মিলের মার্কিনের সেমিঙ্কের সঙ্গে সে আটপোরে

পরিবার জন্ত পাইয়া আসিয়াছে। পূজার এক খানা ঢাকাই, শান্তিপুরে, নেহাৎ অল্প দামের বাজে বেনারসী এই রকমই কিছু পাইত। সেখানি সে দু’একদিন পরিয়া সময়ে তাঁজ করিয়া গুছাইয়া তাহাতে দু’একটি কর্পূরের চাক্তি আনাইয়া দিয়া রাখিয়াছিল। এই শেষ তিন বৎসর নরেশ তাহাকে পূজার কাপড় কিনিয়া দেন নাই, ধরচের টাকা এই তিন বৎসর তাহার নামে মণিঅর্ডারে আসে। রাজবাড়ীর সরকার বা দরওয়ানেরা আর তাহার মাসকাবারী বাজার করিয়া দিয়া যায় না। কাপড় সে পূর্বের মতই কেনে, পূজার সময় নিজের চাকরদের কাপড় কিনিয়া দেয়, নিজের জন্ত কেনে না। মনে মনে এই কথা বলিয়া মন তাহার বিষম হইয়া থাকে যে, ওরা আমার চাকর, তাই ওদের আমি দিচ্ছি, আমি ধীর দাসী, তিনি যখন আমার দিলেন না, তখন আমার কাজ কি?

তাই আজ বহুকাল পরে ধূলাপড়া ট্রাকের ডালা তুলিয়া সে চূপ করিয়া তার অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারটির পানে অনেকক্ষণই চাহিয়া থাকিল। এক একটি সাড়ী জ্যাকেটের তাঁজে তাঁজে যেন তার এক একটি অতীত বৎসরের স্মৃতির স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সে ঠেলিয়া উহাদের যেন নাড়া দিতেও তার বুকে বাজিতেছিল। তার পর অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া এক একটি করিয়া সে সেগুলিকে মাটিতে নামাইতে লাগিল। এই গোলাপী ডুরে সাড়ীখানি সর্বের প্রথম বৎসর তিনি নিজে হাতে করিয়া দিয়াছিলেন। সুমমা কান্দালের মতন সেখানিকে গায়ে বুকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বারংবার উহাতে চুম্বন করিল। যেন ইহাতে আজও সেই দাঁতার হাতের সৌরভটুকু পর্য্যন্ত লাগিয়া আছে,—এমনি আগ্রহে উহার ভ্রাণ লইল। সে কাপড় পরা চলিবে না—উহা আবার সময়ে সাবধানে যথাস্থানে রক্ষিত হইল। আর একখানি সাড়ী ও তার সঙ্গে জ্যাকেটটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুমমার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। কালীঘাটের মহিলা-সমাজ সেই জ্যাকেট সাড়ী। গভীর ঘুণার ক্রুরজনক জঘন্ত বস্তুর জায় সে ভাল পাকাইয়া সে দুটুকু বাস্তব মধ্যে দু’আঙ্গুলে ধরিয়া ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে দিনের দুই স্মৃতি তার দেহ যে দিন ভস্মাবশেষ হইয়া যাইবে, সেই ছাইএর মধ্য হইতেও বুঝি মিলাইবে না। নিজের জন্ত যত নূ হোক, সে যে তার অপ্রিয়দাতার কত বড় গ্লানির মূল, সে দিন বড় আঘাতেই সে পরিচয় যে সে পাইয়াছে! তার আগে



স্বপ্নেও যে তেমন সম্ভাবনা তার মনের কোণেও কখন জাগে নাই! জাগিলে—কি করিত? বলা যায় না। তার দেবতার চিত্তে তার জন্ত ব্যথা বোধ যে বিশেষভাবেই আছে, অন্ততঃ এটুকু জানিবার পূর্বে এত বড় লজ্জাকর দুঃসংবাদটা তার কর্ণগোচর হইতে পারিলে নিঃসন্দেহ সে নিজেকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিত না। কিন্তু এখন? আত্মহত্যার অধোগতি তার এই অধোগতিতে প্রাপ্ত জীবনের শেষ সঞ্চয় করিয়া লইতে যত না মারাত্মক হয়, তার চেয়ে বেশী মনে লাগে, তার শোচনীয় মৃত্যু নিশ্চয়ই নরেশকে যে বেদনা দিবে তাই ভাবিয়া।

একখানি ভোমরাপেড়ে শান্তিপুরে সাদী ও একটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরিয়া নিজের গলায় পরা একমাত্র সম্পত্তি এক-নর সুরু গোট হারটুকু জামার উপর তুলিয়া দিতে দিতে হঠাৎ কি মনে হইল। ছোট আরসিখানি পাড়িয়া সে নিজের মুখ দেখিল। তার পর আবার কি ভাবিয়া, সেই জ্যাকেট সাদী ও হারটুকু খুলিয়া ফেলিয়া আটপোরে মোটা সাদীর সঙ্গে একটি পাবনা-ছিটের চেককাটা রংজলা হাতাবড় জ্যাকেট পরিয়া সাজসজ্জা সমাধা করিল। হাতে রহিল দুই গাছি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও হাতের সঙ্গে আঁটিয়া বসা সোনার চুড়ি। এক সময় উহাদের বরফির মতন কাটুনি ছিল, কিন্তু এখন সে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে ও দু'একগাছার মুখ ছুটিয়া গিয়াছে।

নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পাইয়া সুখমার আনন্দের আর অবধি রহিল না। এত দিনে যেন জগৎ সফল হইল বলিয়া তার মনে হইল। মায়ের শেষ ও প্রধান ইচ্ছা কে অংশতঃ পূর্ণ হইতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়াও তাহার মনে সুখ ধরিতেছিল না। মা যে নিজের পথ হইতে সযত্নে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাহার আজিকার এই আনন্দময় জীবনের পথটুকু প্রস্তুত হইবার সুযোগ দান করিয়া গিয়াছেন, এই মনে করিয়া সে তাহার উপর একটুখানি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। নতুবা মায়ের উপরের অভিমান যে তাহার কত বড়, তাহা সে নিজেও যেন পরিমাপ করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিজেদের পাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধে অপর জীবনকে কলঙ্ক-কালি মাখাইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষে কঠিন বন্ধুর ধূলিশয্যায় শোয়াইয়া দেয়, তাদের অপরাধের তুলনা আর কোন কিছুরই সঙ্গেই কি হইতে পারে? মানুষ নিজেকে লইয়া তার যা খুসী করিতে হয় করুক; কিন্তু আর অন্য জীবনকে নিজের পথে আনয়ন করিতে কোন

মতেই অধিকারপ্রাপ্ত নহে। সেই মা'র কাছেই বোধ করি, জীবনে এই প্রথমবার সেই মাথা নোয়াইল এই বলিয়া যে, যতই হোক, যখন এই জাতীয় নারীর গর্ভেই পূর্বজন্মের মহাপাপে তাহাকে স্থান লইতে হইয়াছিল, তখন ভাগ্যে তার মায়ের মনে ওই ধর্মজ্ঞানের বীজটুকু রোপণ করিয়া ভগবান তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলেন; নহিলে আজ তার কি গতি হইত?

চাকরীর প্রথম ধাক্কা খাইল, সে চাকরী করিতে মূনিবাড়ী সর্ব প্রথম পা দিয়া! কর্তী এবং তাহারই ছাত্রী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি মিসেস্ গুহ;—তা জানেন বোধ হয়? আপনাকে আমি মিস বা মিসেস্ কি বলবো, অমুগ্রহ ক’রে আমার আপনি ব’লে দেবেন। বিশ্বপ্রিয়-বাবু সে কথা শুনাকে কিছুই তো বলেন নি?”

সুখমার ললাটে অচিন্তিত লজ্জার অঙ্ককার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে নতমুখে উত্তর করিল, “আমার নাম সুখমা দাসী।”

“কিন্তু পদবীটা না জান্লে, আপনাকে আমি কি ব’লে উল্লেখ করবো, তারই জন্ত সেটা জানার—”

“না না, আমার আপনি সুখমাই বলবেন, সেই আমার বেশী ভাল লাগবে।”

দ্বিতীয় দিনটা অমনি কাটিল, তৃতীয় দিবসে আর একটা সমস্তা দেখা দিল।

মিসেস্ গুহ মানুষটি বড়ই সাদাসিদ্দে, ভালমানুষ গোছের লোক। মনের মধ্যে তাঁর ছল-চাতুরী বড়ই কম। সে দিন সে আন্তরিকতার সহিতই সুখমাকে জানাইল যে, তাহার গান-বাজনা শুনিয়া তাহার স্বামী ও তাঁর এক জন বড়লোক মক্কেল বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আগত সপ্তাহের প্রথমেই তাঁদের বাড়ীতে একটা বড় রকম ‘পার্টি’ হইবে। তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা, সুখমা সে দিন নিমন্ত্রিত সভায় গান ও বাজনা শোনায়।

সুখমা এ কথা শুনিয়া একটু পরে ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিনয়ে উত্তর করিল, “আমার মাপ করবেন, আমি সে পারবো না।”

মিসেস্ গুহ একটু ভুল করিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “কেন পারেন না? আপনাকে তো তেমন ‘নার্ভাস’ ব’লে বোধ হয় না।”

সুখমা মৃদু হাসিয়া কহিল, “তা নয়, আমি অপরিচিত পুরুষদের সামনে গাইবো না, তাই বলছি।”

মিসেস্ গুহ একটু জিদ করিয়া বলিলেন, “তাতে

দোষ কি? গান গাওয়া কি কোন মন্দ কাজ? ওনার ভারি সাধ হয়েছে যে, অতিথিদের আপনার এই চমৎকার গান শোনান।”

সুখমাকে সম্মত করিতে পারা গেল না।

দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিল। সুখমা নিজের মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বয়স্কা ছাত্রীর শিক্ষাকার্য্য অতি সত্বরে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইটুকু করিতে যে সুখ, যে আত্ম-প্রসাদ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতেছিল, বঙ্গ বিহারের শাসনভার হাতে পাইয়াও তাহা লাট সাহেবেরা পাইয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মাস-কাবারে যখন চল্লিশ টাকার হিসাবে দশ দিনের মাহিনার সে ১৩।/৫ হাতে পাইল, বুক যেন গোরবে তাহার ফুলিয়া উঠিল। নিজের স্বাধীন এবং সংপথের উপার্জনে সে এখন হইতে নিজেকে পোষণ করিতে পারিবে। প্রথম মাসের টাকায় মা কালীর কিছু পূজা পাঠাইয়া দিল এবং ভিখারীর জন্ত কিছু রাখিল।

হাইকোর্ট বন্ধ ছিল; বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া বসিয়া চাখিয়া চাখিয়া কোন সুপের পদার্থ পান করিতে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ বাজনার শব্দ ভেদ করিয়া সুখর সঙ্গীত-হরী কানের তারে ঝঙ্কার দিল। উৎকর্ণ হইয়াছিলেন দু’জনেই, কিন্তু অল্প পরে সুখের সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “এ কি! কে গাইচে বল তো? আশ্চর্য্য যে!”

মিঃ গুহ বলিলেন, “গাইচে আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী সুখমা দাসী। আশ্চর্য্য বল্লে কেন? হ্যাঁ, তা বলতেই পার।—হোয়াট অ্যান্‌ এক্সকুইজিট রীচ ভয়েন্স! কিন্তু—”

বন্ধু এ সব কথাগুলো কানে না তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ এমনই সুরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন যে, মিঃ গুহর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

“কি হয়েছে? গলা ওর খুব ভাল নয়?”

বন্ধু সহাস্তে উত্তর দিলেন, “কে বল্চে ভাল নয়? তা নয় মাই ফ্রেণ্ড! আমি তোমার জোর কপালের জন্ত তোমায় ‘কন্‌গ্রাচুসেট’ করচি। ‘রথ দেখা এবং কলা বেচা’ এক সঙ্গে তা হ’লে দুইই বেশ চালাচ্চো? আচ্ছ মন্দ নয়।”

“রেখে দে’ তোর হেঁয়ালি! তুই কি চিনিস ওকে?”

সুখের ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, “তা আর চিনি, সুখমা দাসী। আমার ‘নেকটুজোর নেভার’। প্রমাণ শুনেই সে তাই ধরে ফেলেছি। কি ক’রে বাগালে দাদা?”

“আপনিই এসেছে। আচ্ছা, ওর ব্যাপারখানা কি বল তো শুনি?”

“বল্চি! রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনেছ?”

“উঁ হঁ, কই মনে ত পড়ে না। তার?”

“হঁ।”

“তার পরে?—”

“চিরন্তনী। খুব ধুমধাম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাওনা-বাজনা, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মোটর দাঁড় করিয়ে রাখা। তার পর আর কি, ‘প্রস্থানং কুরু কেশব।’ কিছুদিন একলা একলা স্বর-সাধনা ক’রে ক’রে ইদানীং বোধ হয় পেটের নাড়ীতে কিছু টান ধরে থাকবে, তাই শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্তে এই...স্ট্রীটে এসে পৌছেছেন। তোমার কিন্তু আমার ভারী হিংসে হচ্ছে।”

মিঃ গুহ বিস্ময়সহকারে মন্তব্য করিলেন, “কিন্তু ধরণ-ধারণ তো সে রকম মনে না। আমার সামনেই বার হ’তে চায় না।” বলিয়া গান শুনাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া সুখের ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া বলিল, “আরে রেখে দে ভাই, ঢের দেখেছি। ও সব ওদের চাল। ওরাই ‘ছুঁচ হয়ে ঢুকে’ আবার ‘ফাল হয়ে বার হন’। খুব দাঁও লেগেছে রে ভাই, খুব দাঁও! আমি তো এ পর্য্যন্ত কখন ‘অরে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি।’—কিন্তু সেই সঙ্গেই ‘মন প্রাণ যা’ছিল তা দিগে ফেলেছি।”

কয়েকদিন পরে সুখমা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ী ও তার বিশ্বাসী দরওয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ড্রইং রুমে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর খালি, মিসেস গুহ সেখানে নাই। অকৃত্রিম ব্যাপৃত আছেন মনে করিয়া নিজের আসনের কাছে আসিয়া সেই তাঁহাকে নিজের আগমন জানানু দেওয়ার ইচ্ছায়, যেমন এসবাজ তুলিয়া লইয়াছে, অমনি পাশের ঘরের পর্দা নড়াইয়া মিসেস গুহর পরিবর্তে বাহির হইয়া আসিলেন, মিঃ গুহ।

সুখমা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল, তাহার এ ঘরে অবস্থান না জানিয়াই গৃহস্থানী অসুস্থ এই ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে দেখিতে গাইয়া এখনই প্রস্থান করিবেন। কিন্তু নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া কৃত্যোগ করার পরিবর্তে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তিনি তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সম্বোধন করিতেছেন।—

“শুভমর্গিং মাদাম! আমার গাফিলিতে আপনাকে অনর্থক এই কষ্ট পেতে হ’লো। মিসেস গুহ আজ



বোনের বাড়ী গেছেন, কিরতে তাঁর রাত হবে, তিনি বলেছিলেন, আদালিটিকে ব'লে রাখতে যে, আপনি আসা মাত্রে এই খবরটা জানায়, আমার সেটা কিন্তু আদৌ মনে ছিল না, মাপ করুন।” মিঃ গুহ ক'ণা প্রার্থনা শেষ করিয়া অঙ্গুলি-ধরা চুরোট চৌটে চাপিয়া সেকহাণ্ডের জন্ত নিম্নের হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সুখমা তাহা স্পর্শ করিল না। সে রাগে গুম্ব হইয়া গিয়া কঠিন হইয়া রহিল, তার পর অন্তরিক মুখ ও চোখ রাখিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে এই কথা শুধু বলিল, “চাকরদের একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বলবেন।”

মিঃ গুহ বড়ই বিপন্নভাবে জবাব দিলেন, “বেয়া-রাটা আজ ছুটি নিয়ে গেছে, আদালিটা এই মাত্র খেতে গেল, মালীটাও বাড়ী নেই, আপনি বসুন না একুনি ওরা খেয়ে নিয়ে আসবে, ওরা এনেই গাড়ী আপনাকে আনিবে দেবো।”

অগত্যাই ভয়বিপন্ন সুখমা স্পন্দিতবক্ষে ও শক্তিমুখে দূরের একটা আসনে আলগোছ ভাবে বসিয়া পড়িল। স্পষ্ট করিয়া ইহার অবাধ্যতা করিতেও তাহার ভরসার কুলাইল না।

মিঃ গুহ চুরোট টানিতে টানিতে সুখমার আপাদ-মস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। মনে কিছু বিষয় ও দ্বিধা জাগিতেছিল। রাজা-রাজ্জড়ার অমুগ্ধীতার মত রূপ তাহার শরীরে থাকিলেও বেশভূষার সম্পূর্ণ বিপরীতই যে প্রমাণ করে! পৃথিবীর সব চেয়ে মোটা ও অ-সুখস্পর্শ পোষাকে তাঁহার স্ভৌল গঠনের সবটুকুই যেন চেষ্টা করিয়া ঢাকা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, বাকলবসনা শকুন্তলা যেন তাহারই সম্মুখে! আবার মুগ্ধ মন সুরেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করিল—“ওসব ওদের লীলা-কলা, ঠাট-ঠমক,—তা বুঝতে পারচো না!”

মিঃ গুহ তখন বিধাশূলভাবে উহার সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিলেন—

“একটা গান না, চমৎকার গলা আর হাত আপ-নার।” এই বলিয়া তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সত্য-সত্যই সুগঠিত ও সুসলিলিত হাত দুটির পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি চোখে না দেখিয়াও অনুভব করা যায়। সুখমার সলাট হইতে বক্ষ অবধি সেই অনুভূত মুগ্ধ দৃষ্টির সজ্জা রং মাখান হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া উহাকে বেশী প্রশ্নর দিয়া ফেলা হইবে বোধে সে অত্যন্ত বিনীত ও যত্নপূর্ণ উত্তর দিল,

“আজ থাক, একটা গাড়ী যদি আমার বরা ক’রে আনিবে দেন।”—

মিঃ গুহ যথাপূর্ব বসিয়া থাকিয়া উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলেছি তো চাকররা বাড়ী নেই, এনেই গাড়ী পাবেন। ততক্ষণ না হয় এসরাজটা একটু বাজান না। আমরা কি শোনবার যোগাই নই?”

এরূপভাবে এক জন অপরিচিত পুরুষকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেখিয়া সে যত বিস্মিত, ততই আহত হইল। আশ্চর্য্য দৃষ্টি কিরাইয়া বারেক ইহার দিকে চাহিয়াই সে পুরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমার ক্ষমা করবেন; কিছুই আমি আজ পারবো না।”

মিঃ গুহ তখন আর এক পথ ধরিলেন।

“সুরেশ্বরকে আপনি জানেন? সুরেশ্বর বোস? আপনার পাণের বাড়ীতেই থাকে।”

সুখমার রাঙ্গামুখ সাদা হইয়া গেল। বুকের ভিতর ধক করিয়া উঠিল; অস্পষ্টভাবে সে বলিল, “না”—

“সে কিন্তু আপনার অনেক কথা বলে। আপনার গান শুনেই চিন্তে পেরেছিল। আদি গঙ্গার উপর .....রোডে ‘সুখমা-কুটারে’র ঠিক পাশেই হলদে রংয়ের বাঁহাতি বাড়ীখানা তার।....”

সুখমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ধড়ফড় করিতে লাগিল। উঠিয়া পলাইয়া বাইবার প্রবল ইচ্ছার তার পা তাহাকে টানিতে লাগিল, এই অপরিচিত পুরুষের চোখে তার মর্যাদা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে কথা সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল এবং এও বুঝিল যে, তাহার অমন পরিচয় না পাইলে কর্মমই তিনি তাহার সহিত এই ভাবের সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেন না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল।

“দেখুন, সংসারে এই রকমই নিত্য ঘটচে। সব মানুষ যদি ভদ্র হতো, তা হ'লে আর ভাবনা কি? কিন্তু তা ব'লে আপনার এ বয়সে এই রকম খেটে খাবার দরকারও তো দেখতে পাই নে কিছু। সবাই অবশ্য রাজা নরেশচন্দ্র না হ'তে পারে, কিন্তু আমা-দেরও যে মনে কোনই সখ নেই, তাও তো নয়। যাতে তোমার কোন দিকে কষ্ট না হয়, হাতে ছ'পয়সা জমে, ছ'খানা গহনা-গাঁটি গায়ে পরতে পারো, তার ... আমাদের বিশেষ চেষ্টা থাকবে। আর এই এক জোড়া মুক্তোর হল এনেছি—”

চেরার ঠেলার শব্দে মিঃ গুহকে উত্তিত বোধ

করিয়ে তাড়িত-স্পর্শের জ্বালা লাগে দিয়া উঠিয়া দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতই স্থব্ধা উর্দ্ধ্বাসে ছুটয়া পলাইল। কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া—তার কোন হুঁস না রাখিয়াই সে বাড়ী ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিল। ইতিমধ্যে পিছনে একবারও চাহিয়া দেখিল না। তার পর সদর রাস্তার আসিয়া যখন পড়িতে পড়িতে গ্যাস পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন কাহাকেও অনুসরণ করিতে না দেখিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল ও তখন মনে হইল, অত জোরে না ছুটিলেও হয় তো বা চলিত। বাস্তবিক তো কেহই তাহাকে ধরিতে আসে নাই। অপর কেহ দেখিতে পাইয়া থাকিলে কি না জানি মনে করিয়াছে? তার পর কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, শুষ্ক অধর ও কণ্ঠ কোনমতে একটুখানি রসসিক্ত করিয়া লইয়া সে ক্ষতপদে সে দিকে চোখ যায়, চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখনও তার মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ তুমুল হইয়া রহিয়াছিল।

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

“কাঁদাল বলিয়া করিও না হেলা—

আমি পথের ভিখারী নহি গো।”

—রবীন্দ্রনাথ।

মানুষের হৃদয়রহস্য যে দেবতাদেরও অপরিজ্ঞাত, —এ কথা অস্বীকার করা চলে না এবং বোধ করি, অস্বীকারও কেহ করে না! কিসে যে তার সুখ, আর কত অল্পেই যে তার দুঃখ, সে বুঝিয়া ওঠাই ভার। নিরঞ্জন যত দিন পরিমণের কষ্টকতা করিতেছিল, অস্বস্তির তার যেন অন্ত ছিল না। এমন কি, একদিন অশান্তি তার সীমা ছাড়া হইয়া গিয়া বাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতেও উত্তত করিয়াছিল। আবার যখন আপনা হইতে সেই দুঃখ কার্যটা তার ঘাড় হইতে নামিয়া পড়িল, অমনি বুদ্ধিতে পারা গেল যে, যেটাকে সে অসহ্য পীড়ন বোধ করিতেছিল, ঠিক সেইটিতেই যেন তার সব চেয়ে বড় সুখের উপাদান অলক্ষ্যভাবেই নিহিত ছিল। বিগত-জীবন প্রিয়তমের মূর্তি মানুষ প্রাণপণে স্মরণে আনিয়া তাহারই ধ্যানস্থ হয়, অথচ প্রাণও কাঁদে। ওই সম্মানিতা ছাত্রীটির সর্বাবয়বে কোনও হারা-নিধির পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভব করিতে থাকিয়া তাহাকে সহ্য করা যেমন নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন, আবার

তেমনই বুরি তাহার মধ্যে একটা ছরস লোভও তাহারও অজ্ঞাতে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রচণ্ড অধিকারস্থাপন করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে পূর্বে বুঝে নাই, পরে বুঝিল। পরিমল যে আর তাহার নিকটে পড়া লইতে আসে না, এক দিকে ইহাতে সে খুসী হইয়াও আর এক দিকে কিস্ত হইতে পারিল না। আবার নিজের মনের এই ক্রটিটুকু লক্ষ্যে আসিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মনকে কঠিনভাবে সে পীড়ন করিয়া বলিল,—

“খবরদার! পাগলামী ক’রো না; তোমার স্বপ্ন তোমার মধ্যেই থাক, বাইরে তার ছবি যেন কোন মতেই না ফুটে!”

প্রেমের অন্ন স্বপ্ন কাজ হাতে লইয়া সে ক্রমে তার প্রায় সবটুকুই নিজের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিল এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তার এত দিনের যে শক্তি, যে অধ্যাবসায় পক্ষাব্যাহার হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাই আবার জাগিয়া উঠিল। একবাক্যে সবাই স্বীকার করিল যে, এমন উদ্যোপনা, সহিষ্ণুতা, কর্মক্ষমতা আর ভীক্ষুসী সর্বদা এ সব কাজে পাওয়া যায় না। যারা এত দিন তাহাকে অপ্রকাশ্যে উপহাস ও প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, তা’রাও লজ্জা পাইল।

বস্তুতঃ মানুষের শক্তির আধার কখন যে খালি হইয়া যায়, আবার কিসে ভরিয়া উঠে, তার কোন সময় ঠিক করা নাই। উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাবে কত উৎকৃষ্ট বীজ অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়, অথবা বপন করাই ঘটে না। নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া যেন তার হারানো শক্তি এই আশ্রয়ে আসিয়াবধি খুঁজিয়া পাইতেছিল। পরিমলের সঙ্গে মাসখানেকের মেলা-মেশায় তার মরিচাধরা বুদ্ধির কৃপাণে শান পড়িয়াছে; এবার কাজের মধ্যে ডুবিতে পাইয়া, তার উপরের সমস্ত ধূলি-জঞ্জাল যেন ধুইয়া গেল। এখন সে আর তত অসুমনস্ক হয় না, মাসমাহিনার টাকাগুলো দিতে আসিলে খাজাফিকেই উহা জমা রাখিতে বলিয়া গোটাকতক শুধু চাকরমহলে বাটিয়া দেয়। হরে খানসামার দল মুখ বাঁকাইয়া উহা গ্রহণ করে, ও নিজেদের মধ্যে তাঁর সমালোচনা করিয়া বলে, “বাছা হুঁ আমাদের এবার ঢালাক হচ্ছেন দেখি যে!” আর এক জন বলেন, “হবে নাই-বা কেন? এখন যে পেটে রাজা-সাহেবের তাত পড়েছে। ও-ভাতকে হজম ক’রে চলতে পারা কঠিন-রে ভাই; ওর জোরে অনেক ‘পৌটাচুরির বেটা চন্দনবিস্মাস’ হ’বে উঠলো! তা দেখিস-নে?”



যে খাতাখানার কথা সে দিন পরিমল তার স্বামীর কাছে বলিতেছিল, সেখানার মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন নিবিষ্ট হইয়া কি লিখিত। সেটার আরম্ভ ছিল, এই রকম—

“এই মলাট-ছেঁড়া চার পয়সা দামের খাতাখানা হাতে পেয়ে আজ হঠাৎ ডায়রি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। মনে যে পড়লো, তা সেটা কিছু আর বিচিত্র নয়! কত-কালেরই যে অভ্যাস ছিল। কিন্তু নয়ই বা কেন? আমার এ জীবনটার সকলই যে বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে পূর্ব-সংস্কারগুলো এখনও যে কেমন ক’রেই না ম’রে গিয়ে বেঁচে আছে এবং সুযোগ পেতেই মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে, এইটাই তো যোর আশ্চর্যের বিষয়! নিজেরই আমি অবাক হ’য়ে গিয়ে ভাবছি যে, তা হ’লে আমার দ্বারা এখনও আমার পৃথিবীর কোন কোন কাজ-কর্মও চালিয়ে নিলে। ঠিক! আশ্চর্য্য, তারি আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু!

“আচ্ছা, আমি আগে কি ছিলাম, সেটাও একটু একটু ক’রে মনে করবার চেষ্টা করা বোধ হয় নেহাৎ মন্দ নয়! যা’ ছিলাম, আর এখন যা’ হ’য়ে দাঁড়িয়েছি, এ থেকে আমিই আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে, তা আর পাঁচ জনে কেমন ক’রে পারবে? কিন্তু সে পারবার কিছু দরকারও তো নেই। সে লজ্জা আমি আমাকে যে কোন মতেই দিতে পারবো না।—না, না, আমার অতীত! আমার সোনার স্বপন! আশার আনন্দে উৎসাহে সম্মানে ভালবাসায় ভরা, আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের অতীত! যত মাধুর্য্য যত আকর্ষণই তোমার মধ্যে থাকে থাক, তুমি শুধু আমার ধ্যান-ধারণার মধ্যেই লিপ্ত হয়ে থাক। পথের ভিখারী নিরঞ্জনের কাছে তুমি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মত গোপন আকাজকার ধন হ’য়েই থাক, ঐট ককেশ বন্ধুর শুক বর্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে আমি তোমার আঘাত করবো না, লজ্জা দেব না।

“নিজের কথা ভাবতে গেলেই মনে হয়, এর আগে যে জন্মটা আমার চলছিল, সেটা যেন শেষ হয়ে গিয়ে এখন আর একটা নতুন জন্ম চলছে। আর বস্তুতঃও তো তাই! আমার সে জন্মে আমার চেহারাখানা ঠিক কার্তিকের মতন নাই থাক, ঘর পরে সবাই যে আমার রূপের তারিফ করেছে, সে তো আমি নিজের কানেই শুনেছি। আর এখন, আমার দেখলে লোকে শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কেঁদে ফেলে—পালিয়ে যায়, সেও আমি জানি। জন্ম আমার ঠিকই বরনে গেছে, তবে

এবারে জাতিস্বর হয়ে জন্মেছি ব’লেই এত জালা! পুরানো কথা মধ্যে যেমন কিছুদিন ভুলে গিয়েছিলেম, তেমনি বরাবরের একেবারেই যদি ভুলে যেতেম, সে যেন ঢের ভাল হতো। তবে দুঃখ এই যে, জন্ম নতুন পেলেও এবারে আর কচি ছেলেটি হয়ে জন্মে মা’র বুকে ঠাঁই পেলেম না। আর একটু একটু ক’রে বাড়ন্ত গিয়ে ছেলেরা যে অবসরটুকু পেয়ে নেয়, সেও আমার ভাগ্যে ঘুটলো না।—একেবারে এই বাজপড়া তাল পাছের মতন আমাকে নিয়ে আমার এই নবীন জন্ম আরম্ভ হলো!

“আচ্ছা, বাড়ী ছিল আমাদের চট্টগ্রামের যে দিকটার, সে সবই তো দেখছি ঠিক ঠিক মনে পড়ে যাচ্ছে! মধ্যে কিন্তু এসব কথা এমন ক’রে মনে করতে পারতাম না। আমার ঠাকুরদা মশাই শুনেছি, নেহাৎ নির্কিরোবী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর এক বিধাসী (!) আমলার কারসাজীতে পড়ে সমস্ত জমিদারীটি হারিয়ে ফেলে মনের দুঃখে এইখানে এসে বাস করতে থাকেন, এই আমার মা’র কাছে শুনেছি, তার আগে তিনি গাজন-হাটের এগার আনির জমিদার ছিলেন।

“আমার বাবাকে আমার বেশ স্পষ্ট ক’রেই মনে আছে। করসা রং, দেড়হারা পাতলা লম্বা চেহারা, খুব গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, কি উদার মনই তাঁর ছিল! আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। একবার স্বর্ঘ্যাস্ত খাজনার দারে ঐ গাজন-হাটের তালুক—তখন আর তা এগার আনি নেই,—তার বোলমানীই তখন গিরিশচন্দ্র মিত্রেরই হয়ে গেছে—সেই তালুক লাটে ওঠে! বাবা খুব সামান্ত দামে তাঁর সেই নিজের পৈতৃক বিষয় একজন চাপরাসীকে দিয়ে কিনিয়ে রাখেন এবং পরের দিন নিজের হাতে পত্র লিখে দ্বারা তখন তাঁর স্বাস্থ্য বিষয় অস্ত্রায় ভাবে ভোগ করছিল, তাদেরই খবর দেন যে, কেনবার টাকাটা পেলেই তিনি ওদের তালুক ফিরিয়ে দেবেন। হলোও তাই। আমার আজও সেই কথা মনে করতে আহলাদে আর গৌরবে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে! আমি সংসারে এসে কার জন্তে কি করলুম?

“পিতৃহীন হয়েছিলেম, নিতান্ত অসময়ে। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় পড়তে গেছি, বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হলো! ভাই বোন আমার আর কেউ ছিল না। মা’র পক্ষে বড়ই কর্তকর। ছুটির সময়টুকুই তাঁর কাছে থাকি, বারমাস তিনি একলা।

“কল্কাতার হোষ্টেলে যারা বাস করেছেন, আমাদের মতন পাড়ারগেয়ে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চলে ছেলে গেলে তাদের সেখানে যে কত বড় দুর্দশা বটে, সে হয় তো তাঁদের জানা আছে! কোন্ সময় অন্তঃমনক হয়ে একজন ‘কেডারে ভাঙে?’ ব’লে ফেলেছে,—আর রক্ষা আছে! খোঁজ ক’রে ক’রে তাই, নিজের স্বজাতি (?) দেখেই ভাব ক’রে ফেলা যেত এবং আমার এক ঘরের পড়সী হলেও পশ্চিমবঙ্গকে ‘দূরে পরিহার’ চেষ্ঠাতেই ব্যস্ত থাকতেন। কারণ, আমাদের পক্ষে তাঁরা ছিলেন একটু ‘দুর্জন’।

“কালীপদ আমার বিশেষ অনুরক্ত হয়ে দাঁড়ানো। জীবনে সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করতে যাওয়া,—আর কি বনিষ্ঠ যোগই যে সে হয়েছিল! এত ভালবাসা বোধ হয় আর কারকেই কখন বাসতে পারি নি, আর না,—বাসতে পারবোও না। এখন কি আর সে ভালবাসার শক্তিই আমার মধ্যে আছে? মন ছিল তখন একটা কাদার তালের মতন, তাকে রকম বেরকম ক’রে ছাঁচে ঢেলে নিলেই হলো, এখন হয়েছে সে একখানা নিরেট পাথর। তাকে ভাঙাও যায় না, গড়াও যায় না।

“কালীপদ আমার প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল বটে; তবু আমার মতন নয়। সে তার জীবনের মস্ত বড় কথাটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আমি হ’লে তা’ পারতুম না। যাকে ভালবাসলেম, তার সঙ্গে যদি একটা মস্তবড় আড়ানই রেখে দিলেম, তা হ’লে আর প্রাণে প্রাণে যোগ হবে কোন্‌খান দিয়ে? গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যদি একটা প্রকাণ্ড পাহাড় গাঁথে ওঠে, তা হ’লে যুক্তবৈদীর সব মহিমাই যে তুচ্ছ হয়ে যায়! কালীপদের যে আমার না জানানো গোপন কথা ছিল, সে আমি জানতে পারলেম, একেবারেই অসময়ে।—যে দিন পুলিশের লোকে আরও ক’জন ছেলের মধ্যে তারও ঘর তোলপাড় করে’ একটা ছোট্ট রকম বোমার সরঞ্জামের সঙ্গে তাকেও ধ’রে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ও কোমরে বেঁধে নিয়ে চ’লে যায় সেই ঘোর দুর্দিনে। আমাকেও দুদিন একটু টানটানি করেছিল; কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ বুঝে শেষটা ছেড়ে দিলে।

“‘পদ’র সঙ্গে শেষ দেখা তার আন্দামানে যাবার আগের দিন। দেখা হ’তেই খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে, আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। হাত তার বাঁধা! দণ্ডিত অপরাধী পাছে কিছু ক’রে বসে—

তার কিন্তু সে মৎলবই নয়। খুব প্রফুল্ল হয়ে সোৎসাহে অনেক কথাই সে অনর্গল ব’লে গেল। তারপর সর্ব্বের শেষ অনুরোধ আমার এ জন্মের মতই সে জানিয়ে দিলে।

“‘রমেশ! তোমার তো আজও বিয়ে হয় নি, তুমি সুখদাকে বিয়ে করতে পারবে না? তা হ’লে এ জন্মটার মতন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘানি ঘোরাই এবং বাস্তব নীত্রেই আর একটা নূতন জন্ম পাওয়া যায়, তারই চেষ্ঠা দেখি।’

“আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘সুখদা কে?’

“‘কেনু তোমার তো আমার বোনের কথা আমি বলেছিলাম। সুখদা তারই নাম। ধরো, এই আমার মতনই তাকে দেখতে।—পারবে না?’

“আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করলেম, ‘কেন পারবো না, ঈশ্বর সাক্ষী, তোমার বোনের জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থেকে।’

“‘পদ’ খুসী হয়ে আমার তার বাঁধা হাত দিয়ে জীবনের শেষ আলিঙ্গন চুকিয়ে দিলে। সেই শেষ। জীবনের প্রথম প্রভাতে যা পেয়েছিলাম, জীবনের প্রথম প্রভাতেই তাকে হারিয়ে ফেলেম। বিশ্বাসের গভীরি দিয়ে বেঁধে সে যাকে আমার স’পে দিয়ে গেল, তাকেও আমি নিজের পাপে নষ্ট ক’রে ফেলেছি—হারিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্জনকার স্বতিই আজও আমার বুকে আঙুন হয়ে ঠিকরে পড়চে, উকা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! তুলতে আঁকও একজনকেও তো পারি নি!—আর কি কোন দিন পারবো?

“—কে আসি? তিনিই কি? কেন তাকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে? সুখদা যদি রাগী হতো, তা’ হ’লে তাকেও ঐ রকম সুন্দর দেখাতে পারতো। মানুষে মানুষে মিল থাকে দেখেছি, কিন্তু এতটা মিল এর আগে আর ত কখনও দেখি নি!”

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এ তো নষ্টে তপদল ভেসে আসা ফল ফল  
ব্যথাভরা মন এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিও।

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রবল মানসিক উদ্বিগ্নে ও উত্তেজনার স্রোতার সে  
রাজে অর আসিল এবং দিন দুই সে সেই অন্ধের কণ্ঠে  
মনের কণ্ঠে বিছানা লইয়া রহিল।



নিজের উদ্দেশ্যে তার ঘেন ঘণা ধরিয়া গিয়াছিল। এমন কালামুখ তাহার যে—সে কি কোথাও বাহির করিবার উপায় নাই? যাক, তবে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিষেভরা সাপের মত এ জন্মটা তার লোকচক্ষের বাহিরে, শুধু তাদের নিঃশ্বাস আলোচনার মধ্যেই কাটিয়া যাক! মনে পড়িল,—নরেশ সে দিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, “স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নাই? লজ্জা নাই?” সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গলদস্ত্র নেড়ে দু’হাত জোড় করিয়া আত্মগতই কহিতে লাগিল, “দেবতা আমার! দেবতা আমার! তোমার দিব্যদৃষ্টি যে সে দিন এত স্পষ্টভাবে আমার এই অপমানগুলি দেখতে পেয়েছিল, তা তো আমি জানি নি! কেন তবে আমার অজ্ঞতার আন্ধার গ্রাস করলে?” তার পর সবিস্ময়ে সে ভাবিল, যে পৃথিবীতে নরেশচন্দ্র আছেন, মিঃ গুহর মত লোকেও সেখানে কেমন করিয়া জন্মায়।

ডাকের পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। সুসমার নামে কাল-ভদ্রে একখানা পত্র আসিলে সেখানা নরেশচন্দ্রের নিকট হইতেই আসে। আজও সেই বিখ্যাসেই পরিপূর্ণচিত্তে সাংগ্রহে পত্রখানা লইয়া মাথার ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ সুসমার লক্ষ্য হইল, উপরে হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের নহে এবং খামখানা অন্য হাঁদের। চিঠি লিখিবার লোকের বাংলাই তাহার কোনখানেই তো নাই, কে লিখিল তাহাকে এই চিঠি! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মোটা খামখানা সে মাথার কাঁটা দিয়া খুলিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত হাতের লেখা, আর সম্পূর্ণরূপেই অবমাননাজনক ইহার বর্ণবিবৃতি! ত্রুষ্ক এবং বিন্মিত হইয়া চারি পৃষ্ঠা চিঠির শেষে নামের স্বাক্ষরটা উল্টাইয়া দেখিতে গেল। সেখানে লেখা আছে—“তোমার একান্ত দর্শনাভিলাষী সুরেশ্বর বসু।” চিঠির উপরে এ বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর নম্বর দেওয়া রহিয়াছে। তখন মিঃ গুহর কথা তাহার স্মরণ হইল। তাহার প্রতিবেশী সুরেশ্বর বোসকে সে চেনে কি না, ঐ প্রশ্ন তিনি তাহাকে কয়েক দিন করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর মিঃ গুহর বন্ধু। প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার বক্ষঃস্থল অবধি জ্বলিয়া গেল। অতি সামান্য প্রতিবাদে সে মর্দিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া তাহা গদির তলার তদবস্থাতেই রাখিয়া দিল। সে পত্রে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তাহার আভাস দু’চার পংক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সে দিন মিঃ গুহর মুখে সে কথা শুনিতেও তো তার বাকি নাই। রাজা নরেশচন্দ্র তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছিলেন

এবং বাহা হইতে একগুণে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ-স্বচ্ছন্দ্য তাহার উহাকে রাখিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি অনেক কথাই সেই পত্রে লেখা আছে। পত্রখানা নরেশকে দেখান উচিত বোধেই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল না!

কানাই সিং বিস্তর রাগারাগি করিয়াও তাহাকে রাখাইতে না পারিয়া বিষম ক্রোধে গজগজ করিতে উঠিয়া গেল, “তা হ’লে হামিও আজ আর কুটি বানাবে না। এমন ক’রে রোজ রোজ উপোস দিলে যে তোরা জান বার হয়ে যাবে খুঁকি বউরা! খোড়া কুচ তো আদমী মুহেমে দেয়।”

তার পর নিজের তৈরী আটার কুটি আলুর তরকারি বানাইয়া এক ঘটি জল ও থালার খাবার আনিয়া তার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল, “লে’ এখন উঠে বৈঠকে খালে বাবা; দুটো খালে!”

সুসমার চোক দিয়া এতক্ষণের পর তাহার চোক নাক জালা করিয়া অকথা যন্ত্রণারূপি তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া বাহির হইল। নিজের যে অরুণ্ডদ মর্মব্যথা তার মনের ভিতরে জন্মাট বাধিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রচণ্ডবেলে আঘাত করিতেছিল, এই একমাত্র মেহ করিবার বুড়া সাথীটির এইটুকু মেহাভিব্যক্তিতে সেই অব্যক্ত দুঃখ তাহার ব্যক্তের সামান্য ফিরিয়া আসিল। সে খাবার কোলে করিয়া ক্রমাগত চোকই মুছিতে লাগিল।

কানাই সিং সাক্ষ্য দিয়া বলিল, “খেয়ে লে বউরা, খেয়ে লে, তোরা অসুখ কুচ্ছু বাড়বে না, আমার কথায় বিশোয়াস কর। কচি বাচ্চা, কত উপোস করবি বল দেখি?”

অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া সুসমা তার পুরাতন বন্ধুর যত্নের দান মোটা কুটির দু’একখানা খাইয়া তখন বুঝিতে পারিল, এটুকু পাওয়ার তাহার বিশেষ প্রয়োজন বটিয়াছিল। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া সে তখন মেহকারীকে একটু খুসী করিবার জন্ত তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, “সিং-জি! আজ্ঞা তোমার বউ মেয়েরা সেখানে গেলে তোমার কুটি গড়ে দেয় তো? সেখানে তো নিজে রাখতে না?”

কানাই সিং একগাল হাসিয়া জবাব দিল, “আরে নারে বউরা! সেখানে হামি কিসের দুখে নিজে রাখতে যাবে? কিস্মতিয়া, ববুয়া হামার বড়া পুতৌ নানুকিয়া মাই সবকোই কুটি পেকিয়ে দেয়, হামি বৈঠে বৈঠে খাই। সেখানের কুটি বড়া মিট লাগে।”

পানীয়ে মিঠা । আচ্ছা কব্ না কব্ সেহাতি খেতে পারবে, সে তো না জানে কুছ !”

সুধমা অকস্মাৎ কি যেন একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা ঐটুকু পরিতাপের বেদনার মধ্যে জলিয়া উঠিতে দেখিতে পাইল। সে একেবারে কাঁজালের মতন ব্যাকুল হইয়া ছুচোকঁভরা আগ্রহ লইয়া কানাই সিংহের মুখের পানে চাহিল।

“সিং-জি! আমার তুমি ফেলে যেও না! বরং আমার সঙ্গে ক’রে তোমার দেশে নিয়ে চল, তাই নিয়ে চল সিং-জি! যাবে?”

কানাই এই কাতর ও ব্যগ্র আবেদনে পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাবেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আগ্রাস্তমুখ দন্ত বিকশিত করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “হামার বাড়ী গিয়ে কি তুই থাকতে পারবি খুঁ কি বউয়া! সে যে মাটির বাড়ী, তার ফুসের চাল। কি করবো গরীব আদমী! রাজাবাবু তোকে যেতে দেবে কেন?”

সুধমা উত্তেজিত আবেগে অধীর হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “খুব দেবেন, খুব দেবেন। আমি কোথাও স’রে যেতে পেলো তিনিও যে রাজমুক্ত হ’ন, —কেন দেবেন না? কিন্তু আমি গেলে তারা কি আমার ঢুকতে দেবে, সিং-জী? আমি কোথায় থাকবো?” সুধমার অর্ধেকটুকু উৎসাহ এই চিন্তা-ভাব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটার টানের মতই চলিয়া গেল।

কানাই সিং জিব কাটিয়া জন্তুস্বরে “সে কি রে বাবা! কেন, তুই কার কাছে কি কছুর করেছিস রে?” বলিয়া সম্মুখ আদরে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে খটাখট্ খটাখট্ করিয়া অসহিষ্ণুভাবে কাঁহাকে কড়া নাড়িতে শোনা গেল। রাজাবাবুর পত্রবাহক বিশ্বাসে ছুজনেই জন্তু হইল। নতুবা এমন সুখজনক আলোচনার মধ্য হইতে কানাই সিংকে এত নীচ্র কেহ উঠাইতে পারিত না।

খানিক পরে উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাবাবুর লোক নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব সুধমার দুদিনের কাজ কামায়ের কৈফিয়ৎ কাটিতে আসিয়াছেন। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে, ববুয়ার এখন বড় অসুখ, দেখা কিছুতেই হইবে না, তাহাতে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শেষকালে কানাই সিংকে বিরক্ত দেখিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহাকে বদলেন, দেখা করাইয়া দাও তো এটা পাইবে! কানাই তাহাকে উত্তম মধ্যম কাড়িয়া দিত, শুধু পাছে ববুয়ার

মনিবকে চটাইলে ববুয়া তার উপর রাগ করে, তাই সে পারে নাই। এই বলিয়া বুদ্ধ কান্দো কান্দো গলায় সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “অমন নোকরী তুই করিসনে খোঁকী! হামি রাজাবাবুকে বলবো, তোর টাকার আটচে না, আর কিছু বেড়িয়ে দিতে। হামার রাজাবাবু তেমন নয়।”

কানাই সিংহের আনিত সংবাদে এ দিকে সুধমার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া সে দ্বারের দিকে সত্বর দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধ্বাসে বলিয়া উঠিল, “কিছুতে না, কিছুতে না, সিং-জী! দেখ, যেন সে আমার বাড়ীতে না ঢুকতে পারে। তুমি যে করে হয়, তাড়াও ওকে, তাড়াও।—যদি এখানে এসে পড়ে—শিগ্গির যাও।”

বিস্মিত কানাই সিং কি বলিবার জন্ত মুখ খুলিতে গেলে, দারুণ অর্ধৈর্ষ্যের সহিত সে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, “আঃ যাও না সিং-জী, একুণি হয় ত এখানে এসেই উপস্থিত হবে।”

কানাই সিং প্রস্থান করিলে ছুটিয়া আসিয়া সুধমা ঘরের সব কয়টা দরজা জানালার খিল আটিয়া দিল। তার হাত-পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে।

বিশ্বপ্রিয় বাবু পরের দিন সকাল বেলায় আসিয়া নিজের নাম-ছাপা কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন, “সবিনয় নিবেদন,—রাজাবাহাদুরের অকুরোধে আমিই আপনার জন্ত মিঃ গুহর বাড়ীর চাকরী জোগাড় করিয়াছিলাম, যদি সেখানে কোন অসদত কিছু ঘটিয়া থাকে, তার জন্ত আমিই প্রধানতঃ দায়ী এবং আমিই তার জবাব দিতে বাধ্য। সে আমার সব কথা জানাও উচিত। অতএব যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মিনিট কতকের জন্ত আপনার বাহিরের ঘরে আপনার কোন বিশ্বাসী লোকের উপস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটতে পারে।”

পত্র লেখার স্বরূপে বিশেষতঃ পূর্বেই নরেশের পক্ষে তাহার ‘বন্ধু’ বলিয়া ইহার উল্লেখ থাকাতো সুধমা কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার ধারের অব্যবহারে পতিত আসবাবহীন বৈঠকখানা ঘরখানায় বিশ্বপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বিশ্বপ্রিয় তাহাকে নমস্কার করিয়া স... সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সবিনয়ে কহিল, “মিঃ ... কাছে কাল রাতে শুনলুম, আপনি আর তাঁর স্ত্রীকে



বাজনা ~~কোঁকিল~~ যাচ্ছেন না। আপনার না যাবার কারণ জানতে কল তিনি এখানে এসেছিলেন, আপনি দেখা করেন নি, অপরন্তু আপনার চাকরের হাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন।”

সুখমা আসিবার সময় নিজের রুমচুলুঙাকে টানিয়া মাথার উপর কুণ্ডলী করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছিল, চোখে এক জোড়া চোক ওঠার সময়কার নীল চশমা ও গায়ে একখানা মোটা রূপার সে নিজেকে লুকাইবার ইচ্ছার ঢাকা দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দিকে চোখ পড়িতেই বিশ্বপ্রিয় যেন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। রাজা নরেশের আশ্রিতা যে এতটাই ছেলে মানুষ, এ ধারণা তাঁর মোটেই ছিল না। আরও বিশ্বয়বোধ হইল তাঁর নিরাভয় ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া।—এ যেন একটি নেহাৎ সাদাসিধা স্কুলের মেয়ে। একে আর কিছু যে মনে করিতেই পারা যায় না।

ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে সুখমা উত্তর করিল, “তিনি বা বলেছেন, সবই সত্যি। শুধু তাঁকে অমুগ্রহ ক’রে ব’লে দেবেন, আমি তাঁর বাড়ী আর চাকরী করবো না, তাঁরা যেন দয়া ক’রে আমায় বিরক্ত না করেন।”

অমুমানের সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপ্রিয় কিছু হুঃখিত, কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুহু মুহু বলিলেন, “রাস্কাল! আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নেবো। কিন্তু আপনার কাছে আমিই অপরাধী হয়ে পড়লুম। আচ্ছা, এবারে আমি বিশেষ জানাশোনা ভদ্রঘর দেখে আপনার জন্ত খুব ভাল চাকরী ঠিক ক’রে দোব, দেখবেন।”

সুখমা নতমুখে বলিল, “আমার আর চাকরীর ইচ্ছা নেই।”

বিশ্বপ্রিয় সলজ্জে মাথা-হেঁট করিলেন এবং তার পর নত মুখেই কহিলেন, “সংসারে মিঃ গুহ অল্পই জন্মায়, জানবেন।”

সুখমা কহিল, “তা, আমি জানি, কিন্তু আমার স্থানও যে বড়ই স্বল্প-পরিসর। ক’জন আমার বাড়ী ঢুকতে দিতে রাজী হবেন?”

এই অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক আত্মভাব্যক্তিতে বিশ্বপ্রিয় একদিকে যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে তাঁহার আলোচনার পথও মুক্ত হইয়া গেল। তিনি তখন ঘরের মধ্যের দ্বিতীয় চৌকিখানি টানিয়া দিয়া সুখমাকে বলিলেন, “বসুন, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমি একটুখানি আলোচনা করিতে চাই। আপনার বিষয়ে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আমার বতটা জানা আছে, আর নিজেও

যেটুকু আজ আপনাকে দেখেও আমি বুঝেছি, তাতে সাধারণ সমাজ আপনাকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবে না ব’লেই আমার বিশ্বাস। আমি সব কথা জানিয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করবো এবং ধ’রে নিচ্ছি, তাতেও যদি না কৃতকার্য্য হ’তে পারি, তা হ’লে—”

বিশ্বপ্রিয় একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে সুখমা জিজ্ঞাসা করিল, “আমার সমস্ত খবর পেলেও কি ব্রাহ্মসমাজ আমার তার মধ্যে স্থান দিতে প্রস্তুত হবে?”

প্রশ্নের ধরনে, আর ঐ ‘সমস্ত’ কথাটার উপর জোর দিয়া বলাতে বিশ্বপ্রিয় মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু যেন আমতা আমতা করিয়া এক রকমে জবাব তৈরী করিয়া লইলেন—“দৈবায়ত্তঃ কুলে জন্ম’ সমাজ সে কথাটা জানে বৈ কি!”

সুখমা নিজের অস্পষ্ট হইয়া পড়া কণ্ঠস্বরকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল, “জন্মগত অপরাধের কথা নয়। যে অধিকারে মিঃ গুহ আমার অবমানিত করাকে অপরাধ বা পাপ বোধ করেন নি, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কি আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি বদল করতে পারেন? অথবা আমি বা আছি, লোকের মনে তাহাই থেকে যাব, অথচ যে দেবদেবীদের আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, শুধু বাহিরে স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে তা করিনে?—আর যে নিগুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার ধ্যান বা ধারণা কাছেও গিয়ে পৌছতে পারে না, সকলের মধ্যে সর্গর্ভের স্বীকার ক’রে নিতে হবে যে, তাহারই উপাসক আমি? এত পাপের মধ্যে আবার এতবড় একটা প্রতারণা কেন করতে যাব? হিন্দুসমাজে মেশবার অধিকার আমার নাই থাক, ওবুও মনে-প্রাণে যে আমি হিন্দুই।”

এর পর আর বিশ্বপ্রিয় কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দু’একবার ক্ষীণ ভাবের প্রতিবাদ-চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূতবোধে শেষে অনেক চেষ্টা করিবার পর নিজের সকল দ্বিধা ও লজ্জা সংবরণ করিয়া তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিতই মোরিয়াভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—

“এই সামান্য ক্ষণের কথায় বার্তার আপনাকে আমি চিনেছি। রাজার কথা,—সত্য কথাই বলবো—পূর্বে আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন আমি আপনার তেজস্বিতার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছুই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস ক’রে নিতে পেরেছি। আপনি আমাদের সমাজে আসতে চান; আমি আপনাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা ক’রে

আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হবো। আপনি যদি ব্রাহ্মধর্মে না আসতে চান; তা' হ'লে আপনাকে নিরাপদ ও সম্মানের স্থান দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আত্মদানের সহিতই আপনাকে সিবিগ ম্যারেজ অ্যাক্টের হিসেবে বিবাহ করতে সম্মত জান্বেন। আপনার মত মহিলার এ অবস্থায় থাকা অসুচিত এবং ধারা থাকতে দেয়, তারা অপরাধী।”

সুখমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঠাকে ঘোড়াতে নমস্কার করিল, কৃতজ্ঞতার সজলকরণধরে সে কহিল, “আপনি আমার যে কথা আজ মুখেও বলতে পারলেন, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা' আমার চিরদিন মনের ভিতর গাঁথা থাকবে। কিন্তু আমি যে কোন সমাজের লোকেরই জ্ঞী হবার যোগ্য নই। আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আপনারা শুধু নিরপেক্ষভাবে অবলম্বন করেন, এই আমার শেষ ভিক্ষা।”

বিশ্বপ্রিয়রও আর বলিবার কথা যোগাইল না। তখন দুজনেই বিদায় লইল।

### বিংশ পরিচ্ছেদ

“হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত—

অথবা সে হ'তে বলী

ভয়ে আসিত না ভালবাসিত না—

চরণে যেত না দলি।”

—তীর্থ-সলিল।

অশান্তির আগুন যখন জ্বলিতে আরম্ভ হয়, ঠহার যেন আর শেষ দেখা যায় না। কোথা দিয়া ও কেমন করিয়া যে রাজা নরেশচন্দ্রের সহিত সুখমার বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবরটা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল বলা কঠিন, কিন্তু কলিকাতার ধনী-মহলে যাহারা ও-সকল সংবাদ রাখিয়া থাকেন এবং নরেশচন্দ্রের সুন্দরী আশ্রিতার সম্বন্ধে যাদের বিশেষ একটু আগ্রহ মনের মধ্যে এতদিন চাপা ছিল, তাঁদের মধ্যে দু'এক জন ধনী লোকের মোটর সুখমার দরজায় থাকা মারিয়া গেল। বেহ বা পত্র—কেহ বা বন্ধু পাঠাইলেন। কানাই সিং হুকুমবরদারী করিল। রাজার পত্রবাহক ভিন্ন সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হুকুম ছিল,—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাধিয়া আনা কানাইয়ের স্বভাব, কানাই সে বিষয়ে কোন ক্রটি দেখাইল না।

শেষে ডাক্তার করুণানিধান বাবু দেখা করিতে আসিলেন। ইহার সম্বন্ধে কি করা উচিত, ঠিক না পাইয়া কানাই সিং মুনিবকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্সিলে লিখিয়া দিলেন,—“সে যে কাহারও সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা স্বতন্ত্র। তিনি সুখমার বাল্যকালে কতবার রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে আশ্রিয়া তার গান শুনিয়া গিয়াছেন, রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন যে! তা তখন হইতেই তিনি সুখমার পাগল, কেবল নরেশের বন্ধুত্বের খাতিরেই এতদিন চূপ করিয়া ছিলেন। তাঁর জ্ঞী এখন মারা গিয়াছে।—সুখমার রূপ ধ্যান করিয়াই তিনি আর নুতন করিয়া সংসাজিতে পারেন না।” কানাই সিং দ্রব্য কুরুভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, “আজ নয়, আপনি কাল আসিবেন।” এদের উদ্দেশ্য সেও এখন বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সুখমার কার্যে তার বুক অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহা চূর্ণ হইতে বসিল, তাহা সে মর্মে আহত হইল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিষয়টিতে নিজের খাটিয়ার বসিয়া পড়িয়া সবেমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে “সীতারাম। সীতারাম!”—এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল—“সিং-জী!”

মুখ ভার করিয়া কানাই গিয়া নিরুত্তরে কাছে দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের মেজের বসিয়া সুখমা চোক মুছিতেছে, বোধ করি কাঁদতে-ছিল। তাহাকে দেখিয়াই সে আহত-শিশুর স্তায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মর্মবিদারী স্বরে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, “সিং-জী, ভাইয়া! আর তো আমি এ দেশে থাকিতে পারাচিনে, আমার তোমার দেশে তুমি নিয়ে চলো।”

কানাই সিং এই দুদিনের ব্যাপটরে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াই ছিল। সে যেমন খীত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া কথিয়া উঠিল, “বউয়া! তুই কাঁদিস্ নে, তুই হামার বেটা আছিস্, বেটীসে বড় করে হামি তোকে মেরিছি, হামি তোহর হুকুম পেলে ওই দুখমন্-বাবুদের নাক ভেঙ্গে দিতে পারি। তুই হুকুম দে, দেখি তোকে কোন্ জানোয়ার কাঁদাতে আসতে পারে।”

সুখমা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল “না কানাই ভাইয়া! কারকে আমি কিছু বলবো না, ওদের দোষ কি? ওরা চিরদিন আমাদের মত লোকেদের সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রে আসতে পেরেছে, পারছে, ওরা তাই জানে। আমাদের মধ্যেও যে মানুষের প্রাণ আছে, ইজ্জতবোধ আছে, তা তো কোন দিন কেউ ভাবতে শেখে নি।



সমাজ তো আমাদের রক্ষার কোন উপায় করেনি, কেউ তো আমাদের দোরে দোরে গিয়ে উদ্ধারের উপদেশ শোনায় নি, আমাদের নিয়ে শুধু পুতুল খেলা-তেই পেরেচে। আমরা যে মানুষ, সেটুকু শুদ্ধ ভুলে গিয়েছে। ওদের বলবার আছে কি? এর জন্য আমরাও যে দায়ী। শুধু ওরাই নয়, আমরাও যে ভুলে গিয়েছিলুম, আমরাও মানুষ।”

কানাই সিং রাগিয়াই ছিল, সে তেমনি উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “রাজা বাবুরই তোমার খবর না লেওয়া খুব কষ্টের হচ্ছে। আমি এখনি গিয়ে সব হাল শুঁকে জানিয়ে আসছি।”

“সিং-জী ভাইয়া! আমার একলা রেখে তুমি যেও না, তবে আমার শুদ্ধ সঙ্গে ক’রে নিয়ে চলো।”

কানাই যেন এতক্ষণের পর নিজে আশ্বস্ত হইয়া উদ্ধাকেও আশ্বস্ত করিতে চাইয়া বারবার কহিয়া বলিতে লাগিল, “তাই চল বউয়া! তাই চল। আমার রাজাবাবু তোকে দুহু পেতে দেবে না; এমন ক’রে থাকিলে তুই মরিবে যাবি।”

বেলা তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। রুদ্ধতার ঘরের মধ্যে পাথার হাওয়ার গ্রীষ্মতাপ কিছুই অনুভূত হই-তেছিল না বটে; তবে বহির্জগতে তখনও পচা ভাদ্রের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ বেলা অবশ্যনের পথে আলস্ত-প্রথ গতিতে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিল, যাইবার জন্য তার বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না। পশ্চিমাকাশে সূর্যের দেখা নাই; কিন্তু প্রবলপ্রতাপাবিহীন রাজ-চক্রবর্তী রাজার শাসনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন তাঁহার শাসনপ্রভাব কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শাসিত প্রদেশকে প্রভাবান্বিত রাখে, তেমনি তাঁর মহিমাভাল তখনও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গৌরব বিস্তৃত করিতেছিল। নরেশচন্দ্র নিজের আশ্রিত-ঘরে দু’একজন কর্মচারীর সহিত কাজকর্ম দেখিতেছিলেন; এইবার উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় কানাই সিং দ্বারে দাঁড়াইয়া বার-কতক কাসিয়া নিজের ‘পরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া লইল এবং তার পর দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া ডাকিল, “মহারাজ!”

“কে? কানাই সিং?—যুগল! পালমশাই! আজ আমি এইবার উঠি, কাল আর একবার ঐ খসড়াটা ভাল ক’রে দেখে শুনে দেওয়া যাবে।”

নরেশ কানাই সিংয়ের কাছাকাছি হইয়া নিম্ন-জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের খবর ভাল তো কানাই সিং?” হাতে চিঠি আছে কি না, উদ্বিগ্ন চোখে দেখিয়া লইলেন।

কানাই সিং দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল,

“খবর কাঁহা কুছু আচ্ছা হার মহারাজ! বউয়াজী বহুত তকলিবসে হার। হাম উন্কো মাথ করকে হিরা লে আয়া।”

“নিয়ে এসেছ! তাকে!”—নরেশ যেন ভয়ঙ্কর-ভাবে চমকিয়া উঠিলেন।—“কি হয়েছে তার? আমার খবর দিলেই হোত।”

কানাই সিং সুষমাকে সত্যসত্যই ভাগবাসিয়া-ছিল, একেই সে সুষমার প্রতি ‘মহারাজের’ ব্যবহারকে প্রশংসা করিতে কোনমতেই সমর্থ হইতে-ছিল না, তার উপর ইহার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য অথচ সুষমার অর্থাভাবে অবমাননাজনক চাকরী করিতে যাওয়া, বিশেষ তাহারই পরিণামে এত দুঃখ-ভোগ, তাহার মনকে অত্যন্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়া-ছিল। এক্ষণে সুষমার আগমন-সংবাদে নরেশকে বিপন্নভাবাপন্ন দেখিয়া সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। মনিবের মর্যাদা তুলিয়া গিয়া সে অভিমান-পরিপূর্ণ বিরক্তিতে জবাব দিল, “মহারাজ! হুকুম করমাইয়েতো হাম হামারা বউয়াজীকো আপনা দেশপ’র—যাহা হামারা বেটা পুতৌ হার, হুঁয়াই লে চলে?—লেকেন গরীব পরবর!—গরীবকা বাচ্চা কো উপর এইসা বেথেরাল হোকে রহ্না ঠিক বাত নেই হার!”

ভৃত্যের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নরেশচন্দ্রের চিন্তা-বিপন্নতা গভীর লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। আত্মাচিন্তায় বিরত হইয়া তখন আন্তে আন্তে উদ্ধাকে প্রশ্ন করিলেন, “সুষমা কোথায়?”

গাড়ীর মধ্যে ফটকের বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কানাই সিংয়ের সহিত অগ্রসর হইলেন।

পিছনে কর্মচারী দুজনের মধ্যে যুগল তখন নিম্ন-স্বরে অপর জনকে সম্বোধন করিল, “ব্যাপারখানা শুনলেন তো পালমশাই! বাইজী সাহেব যে বাড়ী চড়োয়া হ’য়ে এসে উপস্থিত হ’লেন দেখছি! আসা যাওয়া কমেছে কি না, অমনি গেরো কষতে বাড়ী বয়ে ছুটে এসেছেন।”

পালমশাই চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া মুচকি হাসির সহিত টিপ্পনী কাটিল, “ভাই রে! ওরা হ’লো জলের কুমোর; ওদের দাঁতের মধ্যে যার গর্দানখানা গিয়ে পড়েচে, সে কি আর কখন তা’ বার ক’রে নিতে পারে? এতো তোমার রাবব-বোয়াল নয় যে ফের উগ’রে দেবে!”

“এইবারেই আমাদের রূপসী-রাণী ঠাকুরগটির সিংহাসন টলমলে হ’ল বোধ হয়! যা হোক ভাই

আমার কিন্তু একবারটি ওর রূপখানা কোন রকমে দেখে চক্ষু দুটো সার্থক ক'রে নিতে হবে। শুনেছি নাকি মাগীটা আরমানী বিবি?"

পাল কহিল, "দুঃ ছোড়া! আরমানী কেন হ'তে যাবে?—সে যে, আদত কাশ্মীরী।"

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

যোরে পুষ্প দিলে ব'লে পুড়িছে অন্তরে  
পুড়িয়া মরুক পুষ্প দিব কেন তাবে?

—মহাভারত।

পরিমল মুক্তার মালা জড়ান খোঁপার উপর একটি পাতাশুক দান্দা গোলাপ পরিয়াছে, গায়ে তার পাতলা গোলাপী বেনারসীর হাতখোলা জ্যাকেট, তাহাও বোম্বাই মুক্তায় খচিত এবং মুক্তার ঝালরগুলি তার নব কিসলয়চিকণ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে ভরা মন্থন বাহুর উপর অতি সুন্দর ভাবে দোল খাইতেছিল। কানের হীরা কয়খানা সন্ধ্যা-শুকতারার মতন উজ্জ্বল এবং গলায় একাবলী মুক্তার হার তেমনি স্থূল ও সুগোল। গোলাপ-ঝাড়ের বুটাকাটা সন্ধ্যাকাশের মতই সমুজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত সাড়ীর আঁচল হালক্যাসানে হীরার পিনবদ্ধ, হাতে একখানা পালকের পাখা,— এই রকম সাজগোজ করিয়া সে সন্ধ্যা আকাশের শোভা দেখিতে ছাদে উঠিয়াছিল,—অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু ডাকিতেছেন। পরিমলের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকল ভূষা তখনই সার্থক হয়, যখন এই সাজান দেহ তার যথার্থ আদরের পাত্রের আদরের স্পর্শ ও প্রশংসার দৃষ্টি লাভ ক'রে।

“কি গো! কি ভাগ্যি আজ যে এমন অসময়ে গরীবের গরীবখানায় রাজামশাইএর পারের ধুলো পড়লো? বলি কোন্ দিকের সূর্য্যি আজ কোন্ দিক দিয়ে অস্ত গেলেন?”—বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারই দিকে উদ্বিগ্নমুখে অগ্রসর স্বামীর মুখ সে দেখিতে পাইল এবং তাহার আনন্দোত্তেজনা ও সুখাবেগে স্পন্দিত হৃদয় যেন অকস্মাৎ স্রোতোহত হইয়া থমকিয়া গেল। উদ্ভূত অধরের সরস হাস্ত এবং ব্যগ্র বাহুর সাগ্রহ আমন্ত্রণ নিরুদ্ধ রাখিয়া সেও উৎসুকনেত্রে উহার হাস্তলেশহীন গম্ভীর এবং উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভরসা করিয়া যেন কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না।

নরেশ এক বার তাহার দিকে চাহিয়া ‘এসো’ বলিয়াই নীরবে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গলার স্বরে কোন কিছু অভাবনীয় ঘটনার আভাস পাইয়া পরিমল চমকিয়া উঠিল, শঙ্কিতমুখে উৎকণ্ঠিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ'য়েছে?”

নরেশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই পরিমলের দিবানিদ্ৰা উপভুক্ত বিছানাটার একধারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরিমল নিকটে আসিতেই নিজের পাশে তাহাকে জায়গা দিয়া সন্দেহশঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পরিমল! আজ আমাদের মস্ত বড় পরীক্ষার দিন। তুমি যদি আজ অকপটে আমার সাহায্য করো, তবেই আমি রক্ষা পাই।”

পরিমল কোন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, “কি করবো বলো?”

নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবেন, তিনি যেন তার ভাষাই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাঁহার উৎসাহ ও দৃঢ়তাপূর্ণ চিত্ত অকস্মাৎ যেন এই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। পরিমলের অবস্থাও এই সময়টুকুর মধ্যে যেন উহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কি শুনিবে, সে যে তার কোন আন্দাজই করিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেশ তাঁর বক্তব্য কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“একটি অনাথা মেয়ে সংসারে অনেক নিগ্রহ ভোগ ক'রে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, তুমি যদি তাকে দয়া ক'রে একটুখানি আশ্রয় দাও।”

বুকে চাপিয়া ধরা প্রবল আতঙ্কটা যেন একখণ্ড স্বচ্ছ লঘু শব্দ-মেঘের মতই সরিয়া গেল। স্বামীর বিষম চিন্তিত মুখের উপর কোতুকপূর্ণ সহাস্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে ভৎসনার স্বরে কহিয়া উঠিল, “ও মা গো! কি মানুষ তুমি! আমি বলি, কি না জানি হ'য়েছে!” বলিয়াই স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাঁর গলাটা ছ'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া স্তব্ধের আবেগে গলিয়া পড়িয়া বলিল, “তা ব'লে অতটা হিংস্রটে আমার তুমি মনে ক'রো না! এত লোকে তোমার বাড়ী আশ্রয় পাচ্ছে; আর সে মেয়ে-মানুষ ব'লেই আমি বুঝি তাকে রাখতে দিলে হিংসের বুক ফেটে ম'রে যাবো, এই তুমি মনে করলে? বেশ তো, রাখ না তাকে;—একনি থেকেই রাখ না। কোথায় আছে সে?”

নরেশ জীর নিবিড় আলিঙ্গনের এবং অজস্র অন্ততপ্ত আদরের মধ্যে অপরাধ-বিরত হইয়া পড়িয়া



তাহার দিকে না চাহিয়াই চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “এর সব ভার তোমায় কিন্তু নিজের হাতে এখন থেকে নিতে হবে! আমি না বুকে এত দিন ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর তার ফলেই আজ ওর এই বিপন্ন দশা। তুমি এবার ওকে সেই দুর্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার স্বামীর তুলার প্রায়শ্চিত্ত করবে, যেমন পরি-রাণি!”

পরিমল নিজের আনন্দ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহল ভরিয়া কি কথা বলিতে গিয়াই যেন কোন্ নূতন পথের চিন্তাধারায় আর এক ঘরে চলিয়া গেল। হঠাৎ সে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “মেরেটির নাম কি?”

স্রীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নরেশ যেন একটুখানি থতমত খাইয়া চোক গিলিয়া বলিলেন, “সুখমা তার নাম, সে—

পরিমলের আদরভরা বাহুর বাঁধন শিথিলমূল হইয়া তাহার স্বামীর কণ্ঠ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া পড়িল। শুক ফুলের মত হইতে যেমন করিয়া কঠিন ফলের গুটি বাঁধিয়া উঠে, তেমন করিয়া তাহার আনন্দবিকশিত প্রফুল্ল মুখের সমুদয় রেখা যেন সেই মুহূর্ত্তই অত্যন্ত কঠোর হইয়া দেখা দিল। সে নরেশের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া দৃষ্ট-ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া অরিতকণ্ঠে কহিল, “আমার বদলে যদি রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে, তা হ’লে কি আজ আমার কাছে যে কথা বলতে পারলে, সেই কথা তার কাছেও তুমি তুলতে পারতে? নিতান্ত গরীব ব’লেই না আমার তুমি তোমার রক্তিতার সঙ্গে একত্রে বাস করবার কথা বলতে দ্বিধা পর্য্যন্ত করলে না।—কিন্তু জেনো, গরীব হ’লেও আমি ছোট লোকের মেয়ে নই, যে, একটা চুচরিয়া স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে পারবে।”

নরেশ এই অপ্রত্যাশিত স্কন্ধ স্বরের তীব্র তিরস্কারে যেন অধাক হইয়া গেলেন। সুখমার পরি-  
■ যে ইহারও নিকট কিছুমাত্র গোপন নাই, মায় তাহার নামটা শুদ্ধ—এ খবর তাঁর জানা ছিল না, তাই এই কথার ঘায়ে তাঁর যেন সকল আশাই এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেও লজ্জায় স্তিমিত হইয়া ক্ষণকাল সুখমা সম্বন্ধে নিজের অবিমুগ্ধকারিতার অহুতাপ দ্বিকারে নীরব হইয়া থাকিয়া পরে আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

“তুমি যদি আমার একটুও ভালবেসে, এতটুকুও

শ্রদ্ধা ক’রে থাক পরিমল! তা হ’লে নিজের অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমার এই বিপদের দিনে আমার সহায় হও। পরের মুখে অনেক কথাই শোনা যায়, তার মধ্যে অনেক অসত্যও থাকে; আগে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে জেনে শুনে তার বিচার ক’রে তবেই রায় দিতে হয়। সুখমাকে আমি এতটুকু কচি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক রকম মানুষ ক’রেছি। তার জন্ম অপরিজ্ঞা মায়ের গর্ভে; কিন্তু নিজে সে অতি পবিত্র, তাকে একপাশে একটু স্থান দিলে তোমার বাড়ী নিতান্তই কলঙ্কিত হবে না;—যে সব বি-চাকরাণীদের তোমার বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাদের সঙ্গে ওর তুলনাও হয় না।”

পরিমল স্বামীর বেদনাক্লান্ত ও অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একবারটি যেন নিজের মনের মধ্যে একটা ঘোর-র দৌর্বল্য অনুভব করিয়া ফেলিয়া-ছিল। পরক্ষণেই কিন্তু তাহার সেই সব পুরাণো কথা মনে পড়িয়া গেল। সৎ-শাস্ত্রী, বৈমাত্র-নন্দ, অন্নদা বি সবারই যে এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তাহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীটির সংবাদ তাহাকে শুনাইয়া দিতে এতটুকুও বিলম্ব করিতে পারে নাই। শাস্ত্রী এমন কথাও আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইয়া-ছিলেন যে, “নরেশের তো বিয়ের সাধে বিয়ে করা নয়; নেহাৎ লোক দেখাবার জন্য একটা বউ এনে ঘরে পুঁতে রাখা। সুখমা ব’লে তার যে বাইজি আছে, তার মতন সুন্দরী নাকি বাংলাদেশে আর জন্মায় নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয়, তাই নরেশ এমন কুৎসিত ও ছঃখীর ঘর দেখে বউ এনেছে। সেই তো সর্বোৎসাহময়ী কি না, তা এই পরিমলকে কোন্ দিন না কোন্ দিন তার বাদী হ’তে না হ’লেই এখন বাঁচা যায়।”

সেই হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ শর পরিমলের মস্তকের মধ্যে যে বেদনাই ছিল। তাই নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকিয়া সে শাস্ত্র অথচ অবিচলিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, “তোমার এত বাগান, এত বাড়ী রয়েছে, সে সবার অধিকার তো তুমি ওকে দিলেই পারো, শুধু আমার যেটুকু ভুল ক’রে দিয়ে ফেলেছ, সেইটুকু ছাড়া।—ও যদি স্বর্গের দেবীও হয়, তবু আমার কাছে ওর এত-টুকুও জায়গা হবে না।”

এবার নরেশের মনও বেজায় গরম হইয়া উঠিল। বিরক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি কথার উপর জোর দিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “কি তার অপরাধ?”

পরিমল দেহ ঝুঁ ও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া

উঠিয়া উজ্জল চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর মুখে নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া ধরিল, স্পষ্টস্বরে কহিল, “তার অপরাধ এতই প্রবল যে, তাকে দেওয়া ভালবাসা ফিরিয়া নেওয়া অসম্ভব বোধে তুমি আমার মত তুচ্ছকেও তুচ্ছ বোধ করতে পারো নি। কিন্তু সেইখানেই মস্ত বড় ভুল করেছিলে। রাজার মেয়েরও যেমন, ভিখারীর মেয়েরও তেমনি, মন ব’লে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বৃকের ভিতরে একই রকম ভরা আছে। তুমি যাকে ভালবাস, তাকে আমার পাশে ব’সে ভালবাসবার সুযোগ আমি তোমায় কিছুতেই দিতে পারবো না। যদি তাকে এ বাড়ীর কর্তৃত্ব দেবে ব’লেই স্থির হয়ে থাকে, তা হ’লে হুকুম করো, আমিই না হয় বাগানে গিয়ে থাকিগে। এক বাড়ীতে ভদ্র-কস্তার আর পতিতার মেয়ের থাকা চলবে না।”

নরেশকে একেবারেই স্তম্ভিত বাক্যহীন দেখিয়া নিজের উদগত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া লইয়া রোষক্লক ও উচ্ছ্বাসিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, “কিংবা বাগানও যদি তার হাওয়া খাবার জন্তে দরকার প’ড়ে যায়, কাজ নেই আমায় তা দিয়ে। তার চাইতে দেশের বাড়ীতে নতুন মায়ের কাছে আমায় বরং পার্টিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক’রে দাও, আর ততক্ষণের জন্তে শুধু মোমার তাঁকে—”

নরেশ একটা স্তূর্দীর্ঘতর নিশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্লক কণ্ঠে কহিলেন, “পরিমল! বিপন্ন আশ্রয়ার্থীকে তোমার দয়ার মধ্যেই সঁপে দিতে চেয়েছিলাম, সেটা এমনভাবে নেবে জানূলে সে চেষ্টা করতেই আসতেন না। ভাল, তাকে একবারটি নিজের চোখেই দেখ,—ভাল মন্দ লোক তো চোখে দেখেও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ডাকি তাকে?”

পরিমল ছ’হাত তুলিয়া ছ’চোক ঢাকিয়া মাথা নাড়িল।—“আমার স্বামীকে আজও যে আমার কাছ থেকে তুলিয়ে রেখেছ, আমি তার মুখ দেখবো না।”

## ষাণ্মিশ পরিচ্ছেদ

রমণী কাদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে  
কহিল পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে

মোরে তুলে?

—কথা।

হে অনন্ত জ্যোতির্ময় বুদ্ধিবে কি তুমি!  
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি।  
সাধকে কি সিদ্ধি তরে, ইষ্টদেবে পূজা করে,  
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় নাক তার?  
চির সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার।  
জান না আমার আঁম জানাতে না চাই।  
আমি যেন যুগে যুগে এই সুখ পাই।

৩ইন্দ্রি দেবী।

নীচের তলার একটা ঘরে সুবমা একাকিনী মেজের উপর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যেন একগাছি ছিন্ন লতিকার মতনই বসিয়া পড়িয়াছিল। রাজা নরেশচন্দ্রের এই সুবিপুল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদ-ভবনে প্রবেশ করিয়াই তার সমস্ত মনটা যেন লজ্জার অল্পতাপে সঙ্কোচে ও থিকারে ওটাইয়া অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ও নিরুপায়তার তাড়নার সে কানাই সিংয়ের প্রস্তাবিত এই কাজটা করিয়া ফেলিবার পরক্ষণ হইতেই তার মনের মধ্যে কিসের একটা অস্বস্তির ঝড়, তুফান তুলিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত গৃহস্থের সুখনিদ্রার অবসরে তাহাকে দ্রুতসর্ব্বস্ব করণোদ্দেশ্যে চৌধ্যবৃত্তি করিতে আসিয়াছে, এমনি একটা দ্বিধা ও আতঙ্ক যেন তাহার লোভের মধ্য দিয়া উকি মারিয়া উঠিতেছে “বলিয়া- তার বোধ হইল। যতক্ষণ নরেশ তাঁর দ্বীপ সম্রাতি আনিতে গিয়াছিলেন, তার মধ্যে একটা অকথ্য লজ্জা। অত্যন্ত তীব্র সঙ্কোচে সুবমার যেন উঠিয়া সে বর সে বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। ছিছি, ছিছি, কেন সে মরিতে এ বাড়ীর পবিত্রতার মধ্যে—উহাদের দাম্পত্য-সুখের মাঝখানে নিজের এই কলঙ্কলাঙ্ঘিত পাপছায়া ফেলিতে আসিয়া দাঁড়াইল? সে কি গৃহস্থ-ঘরে পা রাখিবার যোগ্য!।

নরেশ আসিয়া সঙ্কোচে মুছচরণে গৃহে করিলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সুবমার ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিম্নিয়েই নিব্বিয়া গেল। সে মুখ তুলিল না, নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না, কোন প্রশ্ন না করিয়াই যেমন ছিল,



তেন্নি নিজের ও নিষ্পন্ন হইয়া রহিল। শুধু এত-ক্ষণের পর একটা প্রবল রোমনোষ্যতা ভিতরে ভিতরে তাহার বক্ষকে মথিত ও কর্ণকে পীড়িত করিয়া অতি তীব্র বিস্ফোরকের মতই বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

বহুক্ষণ এমনি ভাষাশূন্য অসহ্য নীরবতার মধ্য দিয়া নিজেকে বেদনাকে প্রশমিত হইয়া আসিবার অবসর দান করিয়া এবং তার পর নিজের মনের মধ্যের চক্রাকারে মথিত ক্রোধ কোভা নৈরাশ্যের জ্বালাকে কথঞ্চিৎ দমনে আনিয়া নরেশচন্দ্র যথাসাধ্য সৌম্যভাব অবলম্বনের চেষ্টা পূর্বক বলিলেন, “চলো সুসমা! তোমার এখনকার মতন বেলগাছিয়ার বাগানে নিরে যাই।”

সুসমা এই কথাটুকুর মাঝখান দিয়া যেটুকু বা-  
কি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়া লইয়া এইবার তার  
নৈরাশ্য, তার বেদনা-বিহ্বল চক্ষু দু’টি সুদীর্ঘে উঠা-  
ইয়া নরেশচন্দ্রের গভীর ও স্থির সঙ্কল্পপূর্ণ দুই চোখের  
উপর স্থাপন করিয়া বলিল, “কানাই সিংয়ের দেশেই  
আমাকে পাঠিয়ে দিন, তার বুড়ী মা আছে, মেয়েরা  
বড়িয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আমি বেশ থাকতে  
পারবো। আপনার বাগানবাড়ীতে আমি আর যাবো  
না।” সুসমার কণ্ঠে ভৎসনার ভাব প্রকাশ পাইল।

সে কথা কানে না তুলিয়াই নরেশ কহিলেন—  
“বেদনা! আমার স্ত্রী হয় তো ঠিকই মনে করিয়ে  
দিয়েছেন, আজও হয় তো আমি তোমার ভালবাসি।  
অথচ এই আমার জন্তই তুমি বিশ্বের ঘুণা ও লাঞ্-  
নার তরঙ্গে প’ড়ে, হাবুডুবু খেতে খেতে অসহ্য  
অনাদৃত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছো, আর আমি নিজেকে  
নিরে গৌরব ও সুখ সম্ভোগ করছি! না, আর  
তা হবে না। আজ ঠায়েই তোমায় আমি বিয়ে  
করবো। বলতে তো কেউ কিছুই বাকি রাখে নি,  
আরও তাদের যত খুসী নিন্দা করুক না। আমি  
কারু কথাই আর শুনবো না, তুমি আমার স্ত্রী।”

সুসমা নরেশের কথার ভঙ্গীতে ও তাঁহার দৃঢ়  
কণ্ঠশব্দে অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সভয়চক্ষে  
তাঁহার ক্রোধ ও আবেগোত্তেজিত মুখের দিকে  
বারেক চকিত কটাক্ষ করিল, তার পর তাঁর পায়ের  
কাছে পড়িয়া আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে বলিল,  
“না, না, সে আমি হ’তে দোব না। আমি এই-  
বার জন্মের মতন চ’লে যাচ্ছি, আর কখনো আমার  
নামও আপনি শুনতে পাবেন না, এবারকার কথা  
শুধু ভুলে যাবেন।”—সে কঁপিতে কঁপিতে উঠিয়া  
দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

নরেশ তাহার কাছে একটুখানি আগ্রসর হইয়া  
দাঁড়াইলেন, স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, “তুমি ভুলে যাচ্ছো  
বেদনা! তোমার কখন ত্যাগ করবো না ব’লে বে  
তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।  
বিবাহ ভিন্ন অন্য রকমে তোমার আশ্রয় দেওয়া  
আমার পক্ষে ক্রমেই যে কত কঠিন হয়ে উঠছে, সে  
তুমি দেখচোই তো? অতএব ভালমন্দ যাই হোক,  
এই আমাদের পথ, এর পরিণাম বা হবার হবে—  
উপায় কি যার?”

সুসমা তখন তাহার বিবাদসমাজের অশ্রদ্ধোত্ত  
মুখখানি উন্নমিত করিল; দুঃখের অশনিপ্রহারে  
কাটিয়া পড়া ব্যথা চাপিয়া সেই অশ্রুপ্রবাহের  
মধ্যেই অত্যন্ত করুণ একটুখানি হাসিয়া সে তৎক্ষণাৎ  
উত্তর দিল, “আরও একটা উপায় আমার আছে, সেটা  
ভুলে যাবেন না। অপরের অত্যাচার থেকে বাঁচার  
সেটা আমি নির্বাচন করতে ভরসা করিনি বটে;  
কিন্তু যিনি রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হ’ন, তা হ’লে  
অগত্যা এই সেই পথটাকেই আমার বেছে নিতে হবে।  
আমি মরবো।”

নিরতিশয় ব্যথা ও লজ্জাভ্রতব করিয়া নরেশ  
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা হ’লে তুমি কি  
বলো? স্রোতের মুখে তোমার ভাসিয়ে দেব?”

সুসমা তাঁহার গভীর ও শোকাহত মুখের দিকে  
চাহিয়া যত্ন ও শাস্তভাবে জবাব দিল, “সামান্য কিছু  
টাকা দিন; কানাই সিংয়ের দেশেই আমি যাব।”

নরেশ চলিয়া গেলেন, কিছু পরে আসিয়া দেখি-  
লেন, সুসমা একা নয়, তার সঙ্গে নিরঞ্জন অত্যন্ত  
আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কি কথাবার্তা কহিতেছে।

নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নিরঞ্জন এক  
ঝলক আনন্দের হাসির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া  
উঠিল, “এ যে আমার আনন্দময়ী—”

সুসমা ত্রুণ্তে বাধা দিল, “আমার অমন কথা  
বলবেন না,—আমি আপনার অতি দীনহীনা মেয়ে!”

নরেশ নিরতিশয় বিশ্বাসের সহিত কহিলেন,  
“তোমাদের দুজনে চেনা-শোনা হ’লো কি ক’রে?”

শুনিয়া হঠাৎ নরেশ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে  
এক ক্ষীণ আলোক-রেখার সন্ধান পাইলেন। হাত  
ধরিয়া বলিলেন, “নিরঞ্জন! যাকে তুমি মা ব’লে  
উল্লেখ করতে যাচ্ছিলে, একান্ত অসহায়্য জেনে অনেক  
মনলোকে তার সঙ্গে কুব্যবহার করতেও দ্বিধা করছে  
না। তারই রক্ষার ভার তুমি যদি নাও, তা হ’লে  
আমি নিশ্চিত হ’তে পারি। আমি তোমার চিনেছি,  
তুমি আমার এ কার্যের বেশী উপযুক্ত।

আমার নিজের মধ্যেও একটা লোভের আগুন জলন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি ওকে 'মা' বলেছ—তুমিই ওকে আমার কাছ থেকেও রক্ষা করতে পারবে। আমি তো ও-চোখ নিয়ে প্রথম থেকে ওকে দেখি নি।”

নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহে আনন্দের সহিত তার এ নতুন চাকরী এক মুহূর্তেই স্বীকার করিয়া লইল। তখন স্থির বিজলীর মত চোখ দুটি নরেশের সত্যচিন্তা-ভারবিমুক্ত ঈষৎ প্রসন্নমুখে স্থাপন করিয়া সুসমা কহিল, “কিন্তু কার তার ওকে নিতে হচ্চে, সেটা আমার বাবার আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত যে?”

এই বলিয়া নরেশকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া সে নিজেই নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, “আমি এক জন অতি হীনজীবী পতিতার মেয়ে, বাবা! সমাজে আমার জায়গা নেই ব’লে, অত্যন্ত ছোট বেলা থেকে রাজাবাহাদুর দয়াকরে আমার একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে লালন-পালন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষে যা হয়ে থাকে, সেই ধরে বিচার করে, লোকে আমার জন্ত ওঁর দেবচরিত্রেও কালি মাখাতে ছাড়ে নি। স্বাধীনভাবে কোন চাকরী নিয়ে থেকে ওঁর দেওয়া আশ্রয় ছাড়লে হয় তো কালে আমার ও ওঁর নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়বে, এই আশা করেছিলুম, হিতে বিপরীত হ’লো! ভয় পেয়ে আজ এখান অবধি—আমার দুপ্রবেশ জেনেও জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছিলাম। আমি হয় তো সকল সুখের রাহ।”—বলিতে বলিতে আকস্মিকোদ্ভূত বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া সুসমা চুপ করিয়া দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করাতে তার চোখের জল গোপনেই সাদা পাথরের মেজের কঠিন বক্ষ আর্দ্র করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরঞ্জন সব কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বলিল, “মা! সমাজ-বন্ধনের মধ্যে জাতি, নীতি, কুল, গোত্র এ সমুদয়ের নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু তার বাইরে সম্যাসী সম্প্রদায়ে শুধু চাই চরিত্র ও ত্যাগ। তোমার ক্ষুদ্র ইতিহাসে ও-দুটি জিনিষই প্রভূতপরিমাণে দেখতে পেলুম। আমরা মারে-ছেলেতে যদি কোন সেবাপ্রসন্ন, যদি কোন পুণ্যক্ষেত্রের সম্যাসিপরিচালিত কর্মশালায় সম্যাসগ্রহণ করে কাজ নিই, তা হ’লে তোমার মা কি ছিল, -সে প্রশ্নও যেমন অনাবশ্যক হয়ে যাবে এবং তোমার—

নরেশ গভীর আবেগ ও আনন্দোত্তেজনার

৫ম (খ) ৩১

নিরঞ্জনকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিল, “ঠিক বলেছ নিরঞ্জন! সুসমার মত মেয়েরা যখন সমাজের জন্ত নয়, তখন ওদের জন্ত কোন সামাজিক জীবের আশ্রয়ও সুসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথাবার্তা কইবো। ওদের মতন মেয়েদের জন্ত একটি সম্যাসিনী-পরিচালিত আশ্রম করতে পারার বোধ হয় খুবই দরকার আছে।”

নিরঞ্জন উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “এক আমার মনের এটা একটা মস্তবড় কল্পনাই ছিল। মিসনরীরা যেমন পথে কুড়নো (কাউণ্ডলিং) ছেলে-মেয়েদের আশ্রম করে রাখে, ঠিক তেমনি হিন্দুসমাজ থেকে কেন করা হবে না? যে সব পতিতা নারী বা পতিতার মেয়ে, সুপথে ফিরতে চায়, তাদের আশ্রয় কোথায়? এই সুসমা-মারের মতন নিষ্পাপ হয়েও যারা মারের পাপের ফলে সমাজের বাইরে, অথচ সংপথে থেকে দৃঢ় তপস্তার ক্ষয় করতে সমর্থ, তারা কেন সে সুযোগটুকু পাবে না? বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধারীদের আড্ডা রক্ষামন্দির যে নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই। এদের দ্বারাও কত কাজ যে করিয়ে নেবার আছে। যে কাজ মিসনরী মেয়েরা এবং তাদের আশ্রিতা পালিতারা করচে, সে সবই এরা পারে; আর হুতোকাটা, তাঁতবোনা, সেবাপ্রসন্ন করে দুঃস্থের স্ব-সেবা ইত্যাদি আরও কি কিছু কম করবার আছে? তবে কেন এত শক্তি অনর্থক অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে? পথভ্রষ্টের জন্ত কি পথ সহজ করে কেউ দেবে না?”

সুসমা দুজনকার পায়ের গোড়াতেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া আনন্দসজলচক্ষু কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের কদাকার মুখের দিকে চাহিল; গাঢ়স্বরে কহিল, “বাবা! আমার ওই রকম করেই তুমি এইবার সার্থক করে তোল। এখন মনে হচ্চে, তা হ’লে আমার মতন হতভাগ্য জীবনেরও দরকার তো কোথাও আছে!”

নিরঞ্জনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া সুসমা চলিয়া গেল। এক দিক দিয়া অতুল শান্তিতে এবং আর এক দিক হইতে একটা তীব্র ব্যথার নরেশচক্রে প্রাণটা যেন হাহা করিয়া উঠিল! এত দিন পরে সুসমা যে তার প্রকৃত পথের সন্ধান ও সে পথের বথার্থ আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারই আনন্দ,—আর তার সঙ্গেই এত দিনের পর সুসমার সকল সম্বন্ধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার ব্যথা একটু তীব্র হইয়াই মনে



বাজিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা দুজনেই যে  
বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া অন্নান ও অপ্রতিহত  
রহিলেন, ইহার গৌরবও তাঁহার সেই ক্রিষ্ট চিত্তকে  
কম সাধনা দিল না।

### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য যদি না বর্জন করে তোরে,

আমিও তোমার করিব না বর্জন।

—তীর্থরেণু।

সে দিন নরেশ বধন চলিয়া গেলেন, পরিমলের  
বোধ হইল, স্বামীকে যেন সে স্বদূর কালের মতই  
হারাইয়া ফেলিয়াছে, হয় তো বা চিরকালের জন্যই  
তাঁহাদের এই ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, অতঃপর  
কোন দিনই তাঁহাকে সে আর নিজের কাছে কিরিয়া  
পাইবে না। সে নিজের স্বর্ণহস্ত-খচিত গোলাপী আঁচল  
মুখে চাপিয়া ব্যথায় আকুল আচ্ছন্ন হইয়া ফুলিয়া  
ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কল্পিত  
হইয়া বিদীর্ণপ্রায় অন্তরের মধ্য হইতে তাহার অভি-  
মানপুষ্ট অভিযোগ উঠিয়া আসিল। কান্নার অধীর  
হইয়া সে মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে  
লাগিল, “হৃৎখীর চেয়েও হৃৎখী আমি, সে তো তুমি  
দেখতে পাওনি। তাই ভেবেছ, কতকগুলো সোনা-  
দানা চাপিয়ে দিলেই গরীবের মেয়ের বুঝি বুক ভরিয়া  
দেওয়া যায়, না? আমার মতন ক’জন বাপের  
ভালবাসা পায়? আমার কি ব্রহ্মভরা মস্ত  
লোক তাইই ছিল! আমার মা;—আর তিনি?  
তাঁর কাছেই কি আমি কম পেয়েছিলাম? দাদার  
বন্ধু, কিন্তু দাদার চাইতেও যেন তাঁর যত্ন আরও  
বেলীই ছিল। তাঁর মারের কথা মনে হ’লে যে এখনও  
আমি কান্না চাপতে পারিনে। আমায় তুমি গরীব  
ব’লে, কালো ব’লে, এত তুচ্ছ ভাববে যদি, তা’ হ’লে  
কেন আমার রাগী করতে নিষে এলে? আমি না  
■ সেখানে প’ড়ে থেকে মরেই যেতুম। আমার মতন  
পোড়াকপালীর মরণই ভাল ছিল যে। আজ যদি  
আমি আবার তোমার হারাই, তা’ হ’লে বেঁচে থেকে  
আমার হবে কি?

আবার—সে আবার বর্তমান আঘাতের  
নিরুদ্ধবেদনায় ভরা অতীত স্মৃতির স্বরূপে অজস্র  
কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। কিন্তু তার পরই তার মনে  
হইল, হয় তো এককণ তাঁর স্বামী তাঁর ভালবাসার  
জনকে পাশে লইয়া তাহাকে ফেলিয়া কোথায়—কত

দূরেই চলিয়া যাইতেছেন। নিজের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং  
স্বজনতন্ত্র অতীত আবার যেন নিজের ভ্রমাবহ  
মুর্খিখানা লইয়া মনের মধ্যে উকি মারিয়া গেল।  
অমনই সেই প্রচণ্ড অভিমান যেন বস্তাধারায় ভাসিয়া  
গেল। সে সহসা বিদ্যাদবেগে বিছানা ছাড়িয়া  
উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু  
সেখানে মোটর প্রভৃতি বাড়ীর কোন গাড়ী প্রতীক্ষা  
করিতেছে না, খিড়কীর স্তম্ভে শুধু একখানা ভাড়াটে  
গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। পরিমল ইহা দেখিয়া ঈষৎ  
আশ্চর্যচিত্তে কিরিয়া যাইতেছিল, সহসা নজরে পড়িয়া  
গেল, নীচে সেই ভাড়া গাড়ীর অভিমুখে একটি  
কৌণারী ও স্তন্যরী মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।  
ইহাকে দেখিয়া সে স্তম্ভা বলিয়া মনেও করে নাই,  
কিন্তু যখন তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া নির-  
ঞ্জনও সেই গাড়ীতে উঠিল এবং পরমুহুর্তে নরেশ  
আসিলেন ও নিরঞ্জন হাতে একটা চিঠির খাম  
দিয়া বলিলেন, “এই চিঠি দেখালেই তারা সমস্ত  
ঠিকঠাক ক’রে দেবে। স্তম্ভা! তুমিই সম্পূর্ণ  
নিরাপদ হ’তে পারবে জেনেই নিরঞ্জনকে আমি  
তোমার দিলুম। দেখচি ওর মতন বন্ধু আমার  
আর জগতে কেউ কোথাও নেই।”—তখন সেই  
নিবাড়স্বর বেশধারিণী ও বালিকাকৃতি মেয়েটিকে  
স্তম্ভা জানিয়া পরিমল অত্যন্তই বিস্মিতা হইল; এবং  
তার পর তার মনে হইল, রূপই বা তার এমন  
অসাধারণটা কি?

লোকের রটনা যে কতটাই অবাস্তব হইতে পারে,  
তাই দেখিয়াও সে অবাক হইল। সে যে এত দিন  
শুনিয়াছে, রাজা তাঁর অর্দ্ধেক রাজ-ঐশ্বর্য স্তম্ভার  
চরণেই ঢালিয়া দিয়াছেন। হীরার তার পা ভাঙি  
এবং রূপ নাকি তার সেই হীরার চেয়েও উজ্জল!  
তার জ্বরগায় এই সাদাসিধে নিরলঙ্কারা স্তম্ভাকে  
বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। স্বামীর হৃৎখিত কণ্ঠ  
ও অভিমান বাক্যও পরিমলের ঈর্ষাবিক্ত অন্তরে এই  
স্বপ্নোগে লজ্জার স্ফটী বিদ্ধ করিতে ছাড়িল  
না।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়া কাহার নীতল স্পর্শ  
এবং চাপা কান্না অনুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “কে?”

পরিমল ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া  
হুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, অকপরিপ্লুত  
কাতর স্বরে বলিল, “আমার উপর তুমি নির্দয় হইয়া  
না। আমি যে সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি।”

নরেশ জীর মুখ-চুখন করিলেন, তাঁর বুক ভরিয়া

একটা নিশ্বাস উঠিল। বলিলেন, “পরিমল! সুখ-  
মার কথা তুমি কি ভুলে যেতে পারবে?”

পরিমল মাথা হেলাইয়া জানাইল, সে পারিবে।  
লজ্জায় সঙ্কোচে কথার উত্তর সে দিতে পারিল না।

“সে জন্মের মতই আমার সংস্রব ছাড়িয়ে গেছে,  
তোমার কল্পনা থেকেও অন্ততঃ তাকে তুমি মুক্তি  
দিও, আমরা যেমন ছিলাম, তেমনই থাকবো।”

নিরঞ্জন সুখমাকে লজ্জায় নরেশচন্দ্রের বাগানে  
ঘাইবার জন্তই বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ সে বলিল,  
“ওই বাগানের রাস্তার ধারেই আমি আধমরা হয়ে  
পড়েছিলাম, রাজাবাহাদুর আমার ওইখান থেকেই  
ভুলে নিয়ে আসেন। বাগানের দরওয়ানগুলো ঠিক  
যেন বমদূত।”

সুখমার এ কথা শুনিয়া কি মনে হইল, সেই জানে,  
সে সহসা বলিয়া উঠিল, “দেখুন, বাবা! আমার সেই  
ছোট্ট বাড়ীটিতে অনেকগুলি দরকারী জিনিষপত্র  
আছে, আজ আমরা সেইখানেই ঘাই চলুন; কাল  
তখন সব গোছগাছ ক’রে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে  
একেবারেই।”

ভিতরের কথা না জানিয়া নিরঞ্জন সহজেই সম্মত  
হইল। যেখানে এক দিন তিথারী নিরঞ্জন নরেশের  
রূপালাভ করিয়াছিল, সেখানের ভূতাবগ্ন হয় তো মনি-  
বের অসাক্ষাতে আজও তাহাকে তেমন করিয়া না  
মানিতেও পারে। নরেশের পত্র থাকিলেও মাহুকের  
প্রকৃতিকে কি-হকুমে রদ করা যায়? তাই সেখানে  
তাহার কিছু উপজাত হওয়া সম্ভব জানিয়াই নিজের  
বাড়ীতেই সে ফিরিতে চাহিল। নিরঞ্জন সঙ্গে  
থাকিতে মনে যথেষ্ট সাহস ছিল।

এখানে আসিয়াই কিন্তু অপ্রত্যাশিত কল্যাণে  
আনন্দে সে মুর্ছা ঘাইবার উপক্রম করিল।—এ যে  
তার সেই ছোট্ট বেলাকার ইষ্টগুরু সেই সাধুজী!  
আজিকার বড় দুর্দিনে অবাচিতরূপে আসিয়া তাহারই  
প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবর্ণনীয় আনন্দের আতি-  
শয্যে শিশুর মত চঞ্চল উৎফুল্ল হইয়া চোখে জল ও  
মুখে হাসি লইয়া সুখমা বারবার বলিতে লাগিল,  
“ঠাকুর গো! আপনি নিশ্চয়ই তগবান্! আমি যে  
কারমনোবাক্যে আপনাকেই ডাকছিলাম, তা আপনি  
জানলেন কেমন ক’রে?”

সাধু কহিলেন, “বেটা! আমি যে তোমার  
নিজের দরকারেই খুঁজতে এসেছি যে! রাজাবেটা  
যদি হুকুম দেয়, তা হ’লে আমি তোকে আমার  
‘অশরণালয়ের’ সেবার্মের ভারটা দেবার সঙ্গে  
ক’রে অযোধ্যাধামে নিয়ে যাই।—সেখানে

হুতিনজন জমীদারের সাহায্যে আর তিকার  
দিয়ে আমি এক মস্ত কাঞ্জের ছোট্ট বীজ বপন করেছি।  
জানিস বেটা! বদরীনারায়ণে গিয়েও তোর কথা  
আমার মনে জাগছিল। পথে এক তোর মতন  
পাজাবী মেয়ে হাতে পেলুম, তার মা বেটা আমার পা  
জড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে  
পালালো,—বল্লে, মেয়টি যাতে ধর্মপথ পায়। বিস্তর  
ভেবে ভেবে তোদের কথাই আজ পাঁচ ছ বছর ধরে  
গেয়ে গেছে কিছু টাকার জোগাড় করলাম। এর  
মধ্যে আরও হুতিনটি ছোট ছোট মেয়ে আমার  
কথা তাদের মারেরা আমার দিয়ে গেছে। পথের  
ধারে মস্ত সন্মানো একটাকে কুড়িয়েছি। দুজন বুড়ো-  
মাহুকের জিন্মার তাদের রেখে তোকে এই নিতে  
এসেছি। কি হবে বেটা! গান-বাজনা শিখে?  
হরিকে ডাকবার জন্ত নিজের স্বভাবদত্ত কণ্ঠ বড়টুকু  
আছে, তাই যথেষ্ট! কাজ কর; জগতে এসেছিস, জন্ম  
সার্থক কর। যে যেমন জন্ম পেয়েছিস বেটা, তারই  
আবার বড় ক’রে নেওয়া যায়। সবাই কিছু সংসার  
আর এক জনের বউ হবার জন্মারনি।

কুড়ি সাজিয়ে খেলা নাই বা করতে পেলি? ছেলে  
মা না বল্লেই কি তার মা হওয়া যায় না? যাদের  
দুঃখের জন্ম, লজ্জার জন্ম, জন্মেই যারা সব হারান—  
এমন কি, নিজের ধর্ম পর্যাঙ্ক—তাদের মা হবে কি  
চিরদিনই ওই সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিদেশী  
মায়েরাই? তোরা দখল ক’রে নে রে বেটা, দেশের  
ওই অনাদৃত অংশটাকে তোরা নিজের জোরে দখল  
কর। ক’রে চরিত্রবলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে টেনে  
আন। এ একটা কম অভাব নেই ত দেশের!”

ঠিক নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং তাহা  
শুধু কল্পনা মাত্র নয়, বাস্তবের মূর্তিতে তাহার দেখা  
পাইয়া সুখমা কি নিখিই হাতে পাইল, তাহা বলিবার  
নয়। সে মুখে শুধু পুনঃপুনঃ আনন্দাক্রান্ত হইতে  
হইতে বলিতে লাগিল, “উঃ, যদি আমি আজ না  
আসতুম! যদি আমি আজ না আসতুম!”

সেই দুঃসহ ক্ষতির কল্পনামাজে সুখমার প্রাণ  
ধেন বিছাৎপুষ্টের স্তায় চমকিত হইয়া উঠিতে  
লাগিল।



## চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ মসীঢ়ালা কালীতর তার  
লয়ে প্রজাগণে, পুর-পরিহার  
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার  
বিষাক্ত তার মজ।

—কথা।

নিরঞ্জন চলিয়া গেলে পরিমল তার যে এতখানি  
শূভতা বোধ করিবে, তা বোধ করি তার স্বপ্নেও জালা  
ছিল না। ইদানীং পড়ার দায় না থাকায় সে বেশ  
প্রসন্নচিত্তেই যখন তখন খুঁজিয়া পাতিয়া তাহার সঙ্গে  
একটু গল্প-গুজব করিতে আসিত। সেই অবসরে  
তার ঘরের বিছানার, আহারের ও পরিচ্ছদের তত্ত্বা-  
বধান করাও তার একটা কাজের মধ্যেই হইয়া  
দাঁড়াইয়াছিল। এই অপ্রিয়দর্শন ভগ্ন-দেহমন  
লোকটির মধ্যে পরিমল যেন তার পূর্ব-স্মৃতির একটু-  
খানি সৌরভ পাইত, তাই তাহার পরে তাহার পূর্ব-  
বিরাগ দিনে দিনেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ  
সুখমা আসিয়া তাহাকে চিলের মতন ছেঁ। মারিয়া  
লইয়া যাওয়াতে হয় তো সে তার উপর একটু বেশী  
করিয়াই চটিত—যদি না এর মধ্যে জড়িত থাকিতেন  
তাহারই স্বামী। নিঃসঙ্গ পরিমলের অবসরকাল-  
ক্ষেপের একটুখানি অবলম্বন নিরঞ্জনকে যে তাহার  
স্বামীর পরিবর্তে টানিয়া লইয়াই তাহার ঘাড়ের  
সুখমারূপী প্রেতিনীটা বিদায় হইয়াছে, এই কথা মনে  
করিয়া নিরঞ্জনকে তার এতই প্রজ্ঞা হইল যে, সে  
বলিবার নয়। হাজারবার করিয়াই তার তখন মনে  
হইল যে, কথায় যে বলে—যাকে রাখো, সেই রাখে—  
তা বাপু এ ঠিকই!—ভাগ্যে উনি ওটাকে রাস্তা  
থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাই না আজ নিজে বেঁচে  
গেলেন, অন্ততঃ আমি তো বাঁচলুমই। ও না থাকলে  
আর কার ঘাড়ে যেত, আমার ঘাড়ই সে ভাঙতো  
নিশ্চয়।

যে সময়টার সে নরেশচন্দ্রের খাওয়া-দাওয়ার  
তত্ত্বাবধানের নীচে নামে এবং কোন কোন  
দিন একবার করিয়া নিরঞ্জনেরও খোঁজটা খবরটা লয়,  
তেমনি সময় সে দিন নিরঞ্জনের বিজন ঘরের মধ্যে  
প্রবেশ করিয়াই তাহার নজরে পড়িয়া গেল, একখানা  
মলাটি ছেঁড়া পুরাতন খাতা। এই খাতার প্রথম  
পৃষ্ঠার ছত্র কয়েক মাত্র সে এক সময়ে পড়িয়াছিল,  
যখন সবে মাত্র এর আরম্ভ। এতদিনে না জানি  
মাঠারমশাই-এর ডাইরিখানা কতদূর অগ্রসর হইল,

সেই খবরটি জানার অদম্য কৌতূহলে পরিমল সেখানা  
চুরি করিয়া লইল। নিশ্চয়ই এইবার সে এই ছদ্ম-  
বেশীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে! তবে এই, যে  
ডায়েরি, এ সত্য সত্যই কি ডায়েরি—ডায়েরি-ছলে  
লেখা একটা উপভাস নয় তো? নরেশের বিশ্বাস,  
নিরঞ্জন একটা ছদ্মবেশী বড়লোক। কিন্তু পরিমলের  
মনে নিরঞ্জন সম্বন্ধে খুবই যে একটা কিছু প্রকাণ্ড  
ধারণা জমিয়া আছে, তা নয়। তার বিশ্বাস, সে একটু-  
লেখাপড়া জানে, বসন্তে স্বাস্থ্যহার হইয়াছে, হয় গাঁজা  
খায়, না আধ-পাগলা।—সে লোকটা আবার  
ডায়েরি কিসের লিখিবে? তবে গাঁজা-খোর হইলে  
যে উপভাসিক হইতে নাই, তেমন তো কোন বিধান  
দেখা যায় না! অল্পবিজ্ঞা এবং মস্ত অবসর-লাভ  
বরং এ বিষয়ে কিছু সুযোগই তো ওর কাছে।  
অন্যাসেই এখানা একখানা উপভাস হইতে পারে।  
বেশ তো, না হয় তাদের মাসিক পত্রিকার খোরাক  
হইবে।

পরিমল এই খাতাখানার প্রথমার্ধ শেষ করিয়া  
যখন বাকি অংশ পড়িতে আরম্ভ করিল, তার চোখে  
তখন নিরঞ্জনের তেমন সুন্দর ছাঁদের পরিষ্কার লেখাও  
যেন কতকগুলো অস্পষ্ট কালির আঁকের মতই,—যেন  
কতকগুলো পোকার ছানার মতনই কিলিবিলা করিয়া  
উঠিতেছিল। তার মাথার মধ্যে যেন একটা  
গুরু বেদনা, সর্বশরীরে যেন হাতুড়ি দিয়া  
পেরেক চোকার ব্যথা;—চোখের দৃষ্টি কখনও  
কাপসা, কখনও জ্বালাময়,—আবার কখনও  
বা প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রুর বস্তার সম্পূর্ণ-  
রূপেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তাহার  
অতীত জীবনের নতুন ভাগেরও বেশী তো দুঃখের মধ্য  
দিয়া অতীত হইয়াছে, কিন্তু এত যন্ত্রণা-ভোগ যেন  
তাহার সে সব ভয়ানক দিনেও ঘটে নাই। এ কি  
অসম্ভব সম্ভব হইয়া আজ তাহাকে দেখা দিল?  
এ কি সত্য? এ কি স্বপ্ন নয়? এ কি কোন  
বাছুকরের খেলা হইতে পারে না?—এও সম্ভব?  
এও সম্ভব?—

সে খাতায় কি ছিল? এমন কিছুই না! শুধু  
একটি দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী মাত্র। সংসা-  
রের খাতা হইতে ছিঁড়িয়া পড়া কয়েকখানি হারানো  
পাতা। সে পাতা ক'খানি এই রকম!—

“জীবটা যেন এলোমেলো হুস পড়েছে। এর  
গ্রন্থি যেখানটার ছিল, সে আর খুঁজে পাওয়া যায়  
না,—জট পাকিয়ে গেছে কি না। লোকে আমার  
কথা জানতে চায়, তাদের কাছে বলবো কি, আমার

নিজের কাছেই সবটা যেন খাপছাড়া গোলমালে ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনেই কি ছাই ছিল কিছু? আমি যে কোন্ দেশের লোক, নামটাই বা কি ছিল, অক্ষরপরিচয় আমার কোন দিন হয়েছিল কি না, এ সবই তো ভুলে বসেছিলাম। মনে পড়লো কবে? তার বছর দেড়েক বাদে হবে বোধ করি? আচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের আশ্রয় আমি ছেড়ে আসি কোন্ সময়টার? মনে পড়ে না। ই্যা, ভাবতে ভাবতে এই পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে, তাঁর ওখানে থাকতে থাকতেই আমি একটু একটু বই-টাই পড়তে পারছিলাম। এক দিন সাহেবের ছোট ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইছি, তাই শুনে মেমসাহেব সাহেবকে ডেকে আনেন। তাঁরা আমার ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করে কি একটা যেন বই দিলেন, গড়-গড় করে বুঝি পড়ে গেলুম। ভারী খুসী! ছেলেমেয়েরা তো আমার ঘিরে আনন্দে হাত ধরাধরি করে নাচতেই লেগে গেলো!

তার পর থেকে আমার ভারী খাতির। সাহেব তো তাঁরা নন, সিন্ধুদেশের লোক। চেহারার আর পোষাকে আমার ওদের ইটালিয়ান বলে বোধ হয়েছিল, তুদিন পরে বুঝলুম আমার ভুল। আমার বুদ্ধির দশা ঐরকমই যে হয়ে পড়েছে। কে বলবে যে, এই আমিই এক দিন নাকি ডবল অনার নিয়ে বি এ, পাশ করেছিলাম সন্সার ওপোর হয়ে!

হার রে—“ধন জন মান, পদ্মপদ্মে জলের সমান” এ যে দেখছি তারও চেয়ে বেশী!—বিজ্ঞে বুদ্ধি এ-গুলো তো ভিতরের জিনিষ, সে তো আর লুঠ করে নেওয়া যায় না, যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তাও ফুরায়। আর দেহের রূপ! সে যে কেমন করেই একেবারে ছবছ একখানা পোড়া কাঠের মূর্তি নিতে পারে, সে যে দিন প্রথম দেখি, ঐ সিভিল সার্জন মালখানী সাহেবের বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে সীতার হাতের কোটার বসান আয়না দিয়ে, সে দিনের কথা, —এই তো দেখছি বেশ মনেই আছে! সে কি যজ্ঞপাই মনের মধ্যে বোধ করেছিলাম। তার পরই বোধ করি আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় ও সেই সময় পাগলীর ঝোঁকে কেমন করে বেরিয়ে পড়ে পালিয়ে আসি। সে তো মনে নেই! তার জন্তে এখনও আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে, সে যদি মানুষের মধ্যের সকল দুর্বলতারই উর্দ্ধে উঠতে পারে, তা হলে তো আর কথাই থাকে না, সে তো তখন পুরুষোত্তম পদ পায়। আমি যদি সেই জিনিষ হতে পারতাম, আমার জীবন

খত্ত হয়ে যেত। পারি নি, তাই এই দুর্দশা। সে দিন যে আমিকে আমি চিনতুম, সে আমিকে আর দেখতে পেলুম না। সে আমার যে মৃত্যু হয়েছিল, সে আমার আত্মীরে। যে আমার আশান-বাটে বিসর্জন দিয়ে গেছে, সে আমি যে আর বেঁচে নেই। শ্রাদ্ধাধিকারী নেই বলে শ্রাদ্ধ না হয় হয়নি; কিন্তু তার নাম যে মরার হিসাবের সঙ্গে লেখা হয়ে গিয়েছিল। এ জগতের সঙ্গে যে তার কার-কারবার চুকে গ্যাছে, সেই সব কথাই ওই আয়নার মধ্য থেকে এক নিমেষের ভিতরে এই নূতন দেখা আধপোড়া ভীষণ মুখখানা আমার বলে দিলে, আর চোঁচিয়ে উঠে আমি মূর্ছা গেলুম। আর ওকে দেখিনি—কোন দিনই দেখিনি। দেখলে হয় তো এখনও অজান হত পড়ে যেতে পারি। কি জানি কেনই আমি ওকে সহিতে পারিনি,—একেবারেই সহিতে পারিনি। যেন মনে হয়, ঐ আমার সেই পুরানো অতীতকে—হারানো অতীতকে—আমার কাছে থেকে ডাকাতী করে কেড়ে নিয়েছে। এখন এ মুখ নিরে, যদিই আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, আমার কি তারা তাদের সেই পূর্ব-পরিচিত রমেশ বলে আদর করে ডেকে নের? না পাগল বলে পুলিশ ডাকে? এটা আমার জানতে ইচ্ছে করলেও এ পর্যন্ত পরখ করবার ভরসা আমার হয় নি। লোভ হুঁ একবার মনে জেগেছিল, কিন্তু কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগলো। আমি যে মরা মানুষ! আগুনজ্বা চিতা থেকে চুরি করেই না হয় বেঁচে উঠেছি। তা বলে যারা আমার মৃত্যুতে দেখেছে, তাদের সামনে যাব কেমন করে? ভয়ও হয়, লজ্জাও করে। আবার চেহারাখানাও যদি আগের কোন্ চিহ্ন ধরে থাকতো, তা হলেও নয় একটা যাহোক কথা ছিল। যদি কোনও দিন যাই তো সেই ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে করে। কিন্তু তখনই কি পর্যাপ্ত হবে? তা ছাড়া আমি গিয়েই বা করবো কি? আমার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সে কি আর আজও আমার জন্তে পড়ে আছে? তা ভিন্ন সংসারে বন্ধন বলতে তো আমার কোথাও কিছুই বাকি নেই, সে সব যে চুকিয়ে নিয়েছি। নাঃ, দরকার নেই আর জাল প্রতাপটাদের দ্বিতীয় গ্রহসনে।

“আচ্ছা, মানুষগুলোর আসল অবস্থাটা কি? ভেবে ভেবে তার তো কোন কুল কিনারাই আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। গাছ থেকে না পড়ে সে মানুষের পেটের থেকে জন্মায়, তা ভিন্ন আর সবই তো তার গাছের ফলের মতই অনিশ্চিত। কোনটা তো ফুলের মধ্যেই লয় পাবে, কোনটা অঙ্কুরেই শুকিয়ে



যাবে, কেউ তার বড় হয়ে ক'রে পড়বে, আবার কেউ বা টেকে থেকে পেকে উঠবে। তা, তাও যে ক'কে কাকে ঠোকরাবে, আর কে' বা পড়বে দেবতার নৈবেদ্যে বা রাজভোগে, তারই নাকি কোন ঠিকানা আছে? মানুষগুলোও যেন তেমনি এক একটা গাছের ফল, কুলহারী তরঙ্গ, পথ-হারানো পথিক। হ্যাঁ, মানুষ ঠিক যেন পথ হারানো পথিকই বটে! কোথায় ওদের বাড়ী-ঘর, কোথায় ওদের যাত্রা-পথের শেষ—তার তো কোন নিকেশই আমি দেখি না! কেবল ঘুরে ঘুরেই পরিশ্রান্ত। একটা গান অনেক দিন আগে শুনেছিলেম, কি কিসে যেন পড়েছিলেম—

‘মন! চল নিজ নিকেতন,

সংসার-প্রবাসে, প্রবাসীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণ?’ কিন্তু ‘নিজের নিকেতন’ কোথায় তার? জন্ম থেকে জন্মান্তর সে তো সেই অনাদি কাল হ’তেই এমন ক’রে ‘প্রবাসীর বেশে’ ‘ভ্রমণ’ করছে। একি অকারণ? উদ্দেশ্য নাকি শেষকালে সেই ‘নিজ নিকেতনে’ পৌছান। কিন্তু ক’জন লোকে আজকে পর্যন্ত সেখানে পৌছতে পারলো, আমার যে বড় জানুতে ইচ্ছে করে? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি বুঝি কোন দিনই তা পারবো না। নিজের এ জন্মের বাড়ী-খানাকেই মনে হচ্ছে যেন কত দূরেরই পথে। যেতে গেলে যেন সে পথ আর কখন ফুরবেই না;—তা’ নিজের সেই অসীম অনন্ত পথের শেষ ধারে যে সত্যিকারের বাড়ী আছে, সেখানে আমার পৌছে দেবার সাধি কি আর আমার আছে? তা’ হ’লে শুধু এ জন্মেই নয়, চিরজন্মেই এমন ক’রে পথে পথে ‘প্রবাসে প্রবাসে’ ঘুরেই মরতে হবে দেখছি! ওগো! ও, পারের বন্ধু! এই অফুরন্ত পথ কি আমার কোন দিনেই শেষ হবে না গো?

“আচ্ছা, সংসারে কি কেউ সুখী হয়? হুঁচর-দিনের কথা বলছিনে, অন্ততঃ তার আধখানা জন্ম ধ’রে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কেউ করতে কি পেরেছে? আমি তো মোটেই এটা বুঝে উঠতে পারি নে।—ধর, ছোটবেলায় সুখ তো বড় মন্দ থাকে না, কিন্তু লোভ তাতেও বাধা দেয়। যা চাই, তা পাইনে,—পাওয়ার ইচ্ছার শেষ রাখেন নি যে ভগবান! কাজেই সুখের পদ্মও যে কাঁটার উপর ফুটে থাকে। তার পর বিচারন্ত হইলেই সুখের ঘরে শূন্য বসলো। ক, খ শেষ হতে না হ’তেই শটকে নামতা, সঙ্গে সঙ্গে এ, বি, সি, ডি’র ঠাণ্ডা। তার পর অক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক রাখাই গোল হয়ে পড়ে। তার পর এই মহাসমরে জরী হয়ে উঠতে পারলে,—

ভগবান করুন আমার মতন কার্কে আজন্মের ভ্রম এমন ক’রে যেন ব্যর্থ না হয়। কিন্তু খুবই সুখী হতেও আমি বেশী লোককে দেখিছি, তাও তো আমার মনে পড়ে না। শুধু কোটির মধ্যে দু’একজন। যারা পরের জন্ত নিজেকে ছেড়ে দেন, তাঁরাই বোধ করি স্বার্থ সুখী হ’তে পারেন—অন্ততঃ হওয়া তো উচিত।—তার মধ্যেও রাজা নরেশ কিন্তু সুখী নন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। গুর সব হাসি-খুসীই মথের, মনের মধ্যে অশ্রুর নিঝর কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে। কেন? সে অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু যা আমার মনে হলো, সেইটুকুই আমি আমার হেঁড়া খাতায় লিখে রাখলুম।

“আচ্ছা রাণী-মা—আমার যিনি ছাত্রী, তাঁকে আমার কি মনে হয়? তিনি সুখী না অসুখী? না; সব মেয়েরা সুখী বেশী না হ’লেও প্রায় অসুখী হ’তে পারে না।—মন ওদের ক্রুদ্ধ নয়, নিষ্ঠুর নয়, খুব স্বার্থ-পরও নয়। কিন্তু তবু একটা তফাৎ আছে। সেটা কি, সে যিনি তৈরি করেছেন, তিনিই জানেন,—তার বিশ্লেষণ করতে গেলে হয় তো হেরে যাবো, তবু একটা কিছু যে প্রভেদ আছে, তা’ স্বীকার করতেই হবে।—তিনি ঠিক রাজা নরেশ নন। এ জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ ডোবেও না, ওঠেও না, ভাঙেও না এবং নতুন ক’রে কিছু গড়েও না। স্থিতিস্থাপকভাবে এরা একরকম কাটিয়ে যায় ভাল। বড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এদের শক্ত ডানা আছে।—কিন্তু একে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে কেন? সর্বান্তঃকরণেই আমি আশীর্বাদ করি, ভগবান গুঁকে রাজরাণী ক’রেই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন না, গুর সুখ যেন স্থায়ী হয়।

“সুখদার কথা মনে হ’তে আবার অনেক কথাই যেন মনে পড়ে গেল। সে সব পুরানো গাওয়া গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে আছে, তারা যেন সুরবাহারের সুরের ঝঙ্কার উঠতেই আপনি এসে ধরা দিলে! সুখদার কথা আরও যে আমার বলবার আছে। তাকে কোথা থেকে, আর কেমন ক’রে পেলাম, সে কথা তো এখনও বলা হয় নি, আবার হারাতেও যে বেশী সমর লাগেনি, সেটুকুও তো বাকী রাখা না। সবটুকুই আমার মনের ভিতর একবার ভাল ক’রে শুছিয়ে নিই। তার পর? তার পর এ খাতা-খানা আর এক দিন গদ্যর ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই ভোরের আলো লাগা ঘুমন্ত গদ্যর ভাসিয়ে দিয়ে আসবো তখন। চাই কি, সেই অবসরে আর একবার আমার সেই “আনন্দময়ী মেয়েটি”র সঙ্গেও দেখা হবে যেতেও পারে।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু! এলেম কোথায়!  
বরষ গত হ'ল, জীবন বহে গেল,  
কখন কি যে হ'ল জানিনে হায়!  
আসিছু কোথা হ'তে, যেতেছি কোন্ পথে,  
ভেসেছি কালশ্রোতে ভূণের প্রায়।  
মৃত্যুসিন্দুপানে চলেছি প্রতিক্ষণ,  
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন,  
জীবন অবহেলে, আঁধারে দিচ্ছি ফেলে,  
কত কি গেল চ'লে, কত কি যায়।

—অজ্ঞাত।

“কালীপদর বাড়ী যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যার বড় দেয় নেই। ও যে অত গরীব ছিল, তা আমি কোন দিন জানতে পারি নি। সামনের দরজার একটা পালা ভেঙ্গে বোধ করি কোথায় চ'লে গেছে, আর একখানা বাতাসে ঢক ঢক শব্দ করছে। বাড়ীখানা এক সময়ে যে গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় লোকেরই বাড়ী ছিল, সে আজও তার বিরাট বপু দেখেই বেশ বোঝা যায়। হ'লে হবে কি, আজ যে তার এ গাঁয়ে সবার চাইতেই দশা মন্দ, সেও তো আমি একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেম।

“উঠানে তুলসীমঞ্চ প্রদীপ দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটুকু পলার জড়িয়ে প্রণাম করছিল, আমার দেখতে পেয়েই সেই আঁচল সে গারে টেনে দিলে, মুখের চেহারা থেকেই জানতে পারলুম যে, সে আমার কালীপদর বোন সুখদা।

“সুখদার মা যত পারলেন কাঁদলেন, জন্মের মতন দীপান্তরিত ছেলের কথা উল্লেখ ক'রে তার আচরণের নিন্দা করলেন এবং যারা তাকে লম্বুপাশে গুরুদণ্ড দিয়ে তার চেয়েও অধিকতর পাশে পাশী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যেও তিনি খুবই আশীর্বাদ করতে পেরে উঠলেন না। তার পর অনেক বিলম্বে আর সব কথা চুকিয়ে দিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কথা ভুলেন।

“সংসার তো, আর চলে না বাবা, বা কিছু ছিল পদ'র মোকদ্দমার ধ'রে দিলাম, আইবড় মেয়ে ঘাড়ে, কি করি এখন?”

“আমি আগে হ'তেই ভাবছিলাম যে, কেমন ক'রে কথটা আমি বলবো? অবশ্য পদ'র বোনকে চোখে দেখে বলবার ভাবনাটা আমার একটুখানি পরেই গেছলো। কারণ, কুৎসিত না হ'লেও সুখদাকে দেখতে ওতই সাধারণ যে, সে দেখেই যে আমি ঘুরে

পড়ি নি, তাই ভাবত: তার মা বিশ্বাস করতে পারবেন। এখন আরও একটু স্বযোগ পেয়ে নিঃসঙ্কোচেই ব'লে ফেলুম, “তার জন্তে ভাববেন না, কালীপদ যাবার আগে তার তার আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমিও তার কাছ থেকে নিয়েছি।”

“পদ'র মা কেমন একটু সন্দেহের সঙ্গেই আমার মাথা হ'তে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা কইলেন। একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, ‘তুমি আমার মেরেকে বিয়ে করবে? এতগুলো পাশ করেছে, অতি সুন্দর তুমি, পদ'র মুখে শুনেছিলাম, তোমার বাপ ছিলেন জেলার হাকিম। তুমি কি আমার মতন দুঃখীর মেরেকে—’

“আমি হাসি চেপে রেখে জবাব দিলাম—‘পদ আমার তার তার দিয়েছে, বিয়ে বার সঙ্গে হয় হবে, সে তো একুণ্ঠিই হ'চ্ছে না। তবে ভাল পাত্র আর কোথাও না পান তো আমাকেই তখন দেবেন, আমারও তাতে কোন আপত্তি নেই।’

“তার পর সুখদা মায়েক হকুমমতন আমার জলখাবার নিয়ে এসে রেখে দিয়েই চ'লে গেলে, আমি বলুন, ‘সুখদাকে দেখতে অনেকটাই কালীপদর মতন, তাই আমার আরও আপত্তি নেই।’

“সুখদার মা এবার যে কাগাটা কাঁদলেন, তার মধ্যে আধখানা দুঃখের এবং আধখানা সুখের। সেই ছেলেই তো তাঁকে মহাদেবের মতন জামাই দিয়ে গিয়েছে!—এই কথাটা এ ক্রন্দনের মধ্যে প্রধান হয়ে রৈলো।

“মাস পাঁচেক পরে পড়াশোনা সাক্ষ ক'রে এসে বসলুম।

“ওইখানকারই সবজন্মের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বছর পার হয় চ'লে আসছিল। মেয়ে আমি দেখেছি, চাক্ষুসীকে দেখতে বোধ করি ভালই হবে, বা একটু বেশী মোটা। তা ধনীর ছালালীরা ওরকম হবেন বই কি! গণে গণে, অলঙ্কার বস্ত্র, এবং আসবাবপত্র জবাবু হাজার মাত্রে টাকা মেয়ের প্রতি খরচ করবেন, কথটাও নাকি খার্য গিয়েছিল। আমি বাড়ী এসে বসতেই তিনি লোক দিয়ে পাকা দেখার দিন ঠিক ক'রে ব'লে পাঠালেন।

“মা খুব খুসী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হঠাৎ বিধাদ হলো। মাকে সুখদার কথা ভেঙ্গে ব'লে জানালুম যে, এ বিয়ে করা চলে না। তাদের আমি কথা দিয়েছি। মা'র মনে যে আঘাত লাগলো, সে আমি বুঝেছিলাম। মা আমার সন্তানের জননী,



কুটুম্বিতার সাধ একটা নারীজন্মের লক্ষ্যে উদ্ভূত।  
যাই হোক, তবু আমার কথা বজায় রাখবার জন্তে  
তঁার ধনী কুটুম্বের সাধ তিনি ছেড়েই দিলেন।

“জজবাবু নিজে এসে আমার ডেকে বসেন, ‘জানো  
তুমি,তোমার মা’র নামে ‘ব্রিচ অফ্ কন্ট্রাক্টের কেস’  
করতে পারি।’

“তা’ অবশ্য আমি জানতাম না। আর যতই  
কিছু পড়ি না কেন,আইন তো আর পড়ি নি, জানবো  
কেমন ক’রে? একটু ভেঁকা হয়ে রইলুম। তিনি  
তখন আমায় কাবু দেখে অনেক কথাই বলেন এবং  
তক্ষুনি গালি ফিরিয়ে নিয়ে আমার ‘আশীর্বাদ’ ক’রে  
যেতেও যে রাজী আছেন, তাও জানিয়ে দিতে দেবী  
করলেন না। ততক্ষণে আমার জড়তা কাটলো।  
আমি বল্লম, ‘আমি আর এক জনকে কথা দিয়েছি;  
তারা গরীব অনন্তোপায়, তাদের বঞ্চনা করলে ঈশ্বরের  
দরবারে আমি দোষী বেনী হবো। আপনার ভাবনা  
কিসের?’

“কথাটা খোসানোদেরই হাতে চালা। তাতেই  
খাতিব রাগ বাড়িলেও মাতাটা কিছু যে কম থাকলো,  
সে বোধ করি উহারই । তিনি কষ্ট পরিহাসে  
ক্লান্ত প্রশ্ন করলেন, ‘তিনি ক’র মেয়ে শুনি?’

“আমি বিনীতবচনে জবাব দিলাম, ‘তার বাপ  
ছিলেন কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, একমাত্র তাইএর  
রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে,  
বুড় মা ছাড়া অপর কেউ নেই।’

“জজবাবু যেন আঁৎকে উঠেই উঠে দাঁড়ালেন।  
রাজদ্রোহের নামেই বোধ করি তঁার জংকল্প উপস্থিত  
হয়ে থাকবে! এবার স্পষ্ট পরিহাসেই বল্লেন, ‘তা হ’লে  
কুটুম্ব নির্বাচনটা করেছ ভাল! যা হোক সময় থাকতে  
খবরটা পেয়ে ভালই হলো, এনাকিষ্টের দলে মেয়ে দিয়ে  
কি শেষে ধনে প্রাণে মারা যেতাম।’

“মা’র অনুমতি নিয়ে কালীপদর মা বোনকে মা’র  
আশ্রয়ে এনে দিলাম। ভাবী পুত্রবধুর মুখ দেখে  
মা যে আমার খুব উল্লসিত হয়ে উঠেন নি, সে তো  
আমি বুঝতেই পেরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের  
মাতাপুত্রে কোন আলোচনাই আমরা হ’তে দিই নি।  
মন তার কল্পনার স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাইবে  
বই কি! নিজের ছেলের মন্ত নামওলা খবর, আর  
সুন্দরী বউ কোন্ মা কবে চায় নি? অথচ কর্তব্যের  
ধাতিরে কত কি-ই না করতে হয়। ক’জনের মাই  
বা ভরাবুকে বউ ঘরে ভুলতে পেরেছেন। স’য়ে যাওয়া  
দরকার,—চুপ ক’রে সবই সয়ে যাওয়া,—যা পাই  
তাকেই যথাসাধ্য ভাল মনে করা—এইটুকুই যে মন্ত

বড় দরকার। ঐটুকু না পারলেই যে মানুষ একে-  
বারে গেল।

“সুখদারা রুয়ে গেল,—আমি চাকরীর খোঁজ-  
খবর ক’রে বেড়াচ্ছি, আরও দুটো একটা পাশ-টাস  
দেবারও ইচ্ছে আছে। বিয়ের জন্ত সুখদার মা  
ছাড়া আর কারও যে বিশেষ কোন ভরা আছে,  
তার তো কোন লক্ষণই দেখি নে। আমার—হ্যাঁ,  
তা, আমার যে একেবারেই ছিল না। তাও বলতে  
পারিনে, আবার ছিলই যে, তাও বলবার ভরসা  
আমার নেই। বিয়ে জিনিষটা সম্বন্ধে খুব বেশী  
তলিয়ে আমি কোন দিনই ভাবি নি। গোটা কয়েক  
পাশ করার সঙ্গে ও’ও বেন একটা দার চোকান।  
কিন্তু সুখদাকে আমার ভালই লাগছিল। ভাল-  
বাসা একে বলতে হয় বলা, আর তো কখনও  
ভালবাসি নি, কাজেই ও নিয়ে তর্ক আমি করতে  
পারবো না,—তবে ভালবাসার বর্ণনা যেখানে যত  
পড়েছি, তাদের সঙ্গে এ ভালবাসার সম্পর্কটা বড়  
বেনীই অল্প। সুখদা থাকে মা’র অন্তঃপুরে, আমি  
থাকি হয় সদর বাড়ীতে, না হয় ত কলকাতায়।  
বাড়ীর মধ্যে গেলে কখন কখন সুখদাকে এক আধ-  
বার দেখতে পাই। একটু গম্ভীর গম্ভীর চালে সে  
হয় তো মারেরের দুজনের পূজোর যোগাড় করছে,  
না হয় তো পান সাজবার সরঞ্জাম নিয়ে ব’সে গেছে,  
মধ্যে মধ্যে পড়াতে ব’সে মা তাকে ‘বোকামেরে’ ব’লে  
অভ্যুযোগ করচেন, তা’ শুন্তে পেয়ে হাসি চেপে  
আমি বাইরে পালিয়ে এসে হেসে ফেলেছি। আঁহা,  
মা আমার ওপোর যা খুসী হচেন, ‘গাধা পিটে  
ঘোড়া বানানো’ মুখের কথাটি তো নয়! সুখদার মেধা  
জিনিষটা বড়ই নাকি কম! অন্ততঃ মা’র তো সেই  
রকমই বিশ্বাস।

“বেনী দিন গেল না। বাবার চাকরী, তঁার  
অসময়ে মৃত্যুর সুপারিষে আমি নাকি পেতে পারতুম,  
কিন্তু ইচ্ছা হ’লো না সেটাকে কাজে লাগাতে।  
তা’ ভিন্ন সেই সবজজবাবু নাকি আমার সম্বন্ধে  
সরকারের কান ভারী ক’রে রেখেছেন, এমনি একটা  
গুজবও শোনা গেল। আমি নিজের টাকা দিয়ে  
একটা আয়ুর্বেদিক ঔষধের দোকান খুলে বসলাম।  
দেশে এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন,—মকরধ্বজে  
স্বরকির গুঁড়ো মেশাতে না জানায়, তঁার কিছুমাত্র  
পশার ছিল না। তাঁকে দিয়ে খাঁটি মকরধ্বজ তৈরিটা  
শিখে নেবার চেষ্টা করতে লেগে পড়া গেল। তাঁকে  
আমার সহায় ক’রে কস্তুরী তৈরব বা মহা-মৃত্যুঞ্জয়  
রসে কস্তুরীর বদলে আদা-বাটা বন্ধ ক’রে, দেশের

লোক যাতে খাঁটি জিনিষটা পায়; আর বিলিতি ওষুধের মতন নিঃসঙ্কোচে মারাত্মক রোগীকে খাওয়াতে পারে, তারই উঠে পড়ে লাগবো মনে ক'রে ছিলাম। তা কপালে তো দেশের সেবা করবার পুণ্য সঞ্চিত করা ছিল না, হবে কি ক'রে?

“আমার কবিরাজখানার সত্যাকার মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম—করাতের গুঁড়ো নয়,—নিখুঁত নেপালী কস্তুরী এবং যত রকম গাছ-গাছড়া পাওয়া সম্ভব ছিল, ক্রমে ক্রমে যোগাড় ক'রে তুলছি, এমন সময় এমন মারাত্মক হ'রে, আমাদের দেশে বসন্ত মড়ক দেখে দিলে যে, তাঁর কাছে আসল নকল সব রকমের কস্তুরী ভৈরব বা মৃত্যুঞ্জয় রস ভয় পেয়ে পালিয়ে রইলো। হরিনাম সহজে তো কেউ নেয় না। তা এক দিনের মধ্যে অমনি পচিশবারই তো ঐ নাম গানটা কানে শোনা তো যেতই, মুখেও বলতে হ'রেছে বই কি, পাড়া পড়সীর খাতিরে। মা আমার জন্মে ভয় করলেও নিজে নির্ভয়ে পড়সীর সেবার ছুটে যেতেন। আমার এঁটে উঠতে না পেয়ে কপাল চাপড়ে খুন হ'তেন, কিন্তু তবু জোর ক'রে বারণ করতেন না, কৈদে বলতেন ও নিজের কাজ ক'রে রাখচে, বারণ আমি ক'রবো কি ক'রে? বিপদ তারণ তো আছেন, তাঁকেই প্রাণপণে ডাক্টি।”

“প্রথমে এ বাড়ীতে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগলো, সুখদার মাকে। তাঁর সেবা আমরা তিন জনেই করছিলাম, কিন্তু দুজনেই আমরা এক দিনের আড়াআড়িতে দুজনকারই মাকে হারিয়ে ফেললাম। সুখদা মেরে মাহুয, সে লুটাপুটি ক'রে তার হারানো জিনিষের জন্ত চেষ্টা করে কৈদে শোক প্রকাশ করলে, কিন্তু বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি ব'লে আমার বড় কতি আমার শুধু নিঃশব্দ চোখের জল দিয়েই সাক্ষ্য ক'রে নিতে হলো। তার উপর যে মুহূর্তেই জগতে আমার আর কিছুই জন্মের ও প্রিয় ছিল না, সেই সব চেয়ে আদরের মুখেই আমার নিজের হাতে,—ভাবতে গেলে সমস্ত মন ভরে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। পেরেছিলুমও তো!

“সুখদার জন্মেই ভাবছিলাম যে বাড়ী ছেড়ে দুজনে কোথাও পালাব নাকি। এমন সময় আমার পালাবার শক্তি হরণ ক'রে আমার সর্বশরীর ব্যোপে বসন্তের গুটি দেখা দিল। সে কি যন্ত্রণা! উঃ সে কি যন্ত্রণা! বোধ করি শরশয্যা পেতে শুলেও তেমন করে সর্বশরীরে তার কলাগুলো বেঁধে না। হাজার হাজার ছুঁচ দিয়ে যদি সর্বশরীরের মাংসের মধ্যে ফোঁড় তোলা যায়, তাতেও কি অত বেশী যন্ত্রণা দিতে

পারে? উপকথার রাজার যেমন চোখে ছুঁচ বেঁধা ছিল, আমার চোখেও বেন তাই হলো। বিশেষ ক'রে ডান চোখটার। রোগের খেলালে যন্ত্রণার আত্মনাদে কেবলই মরা মাকে আকুল হয়ে ডেকেছি আর সঙ্গে সঙ্গেই কার অশ্রুজলে ভেজা কাতর স্বর কানে গেছে, ‘মা, মা, মা শেতলা! ভাল ক'রে দাও মা!—মা, মা, মা, ভাল ক'রে দাও মা!’

“বতরুণ জ্ঞান ছিল, সুখদাকেই অনুভব করছিলাম, দেখবার তো চোখ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাকে মিনতি ক'রে ব'লেও ছিলাম, ‘পালিয়ে যাও সুখদা! কেন অনর্থক প্রাণ দেবে, আমি তো গিয়েইছি।’ সে কৈদে উঠে বলেছিল, ‘এক সঙ্গেই যাই চলো, একলা আমি দাঁড়াবো কোথায়?’

“এই প্রথম আর শেষ কথা আমাকে সে বলেছিল। এর পরের কোন কথাই আমার আর মনে নেই। আমার বধন জ্ঞান হলো, তখন আমার সকল স্বত্তি লুপ্ত গেছে, তাই মনে নেই, কতদিনে কত অল্পে আমি আমার সেই মরণ-শয্যা থেকে বেঁচে উঠেছিলাম?

“হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারদের কাছে পরে শুনেছি, ডাক্তার যে দিন বজরা ক'রে আসতে আসতে অলস চিত্ত থেকে আমার মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে আমার জীবন্ত দণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা করেন, তার পর থেকে প্রায় ছয় মাস পরে আমার গায়ের বা শুকিয়ে আমার বাঁচবার আশা দেখা দেয়। এতকাল ধ'রে হাঁসপাতালের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র প'ড়ে আমি যত্নের সঁকে যুক্ত করেছি। প্রাণ জিনিষটা তো কঠিন বড় কম নয়! আচ্ছা, এই যে আমি গিয়েও বেঁচে উঠলাম, পর থেকে কি আমার পুনর্জন্ম হলো না? আমি কি আর সেই আগের আমিই আছি? মরে যে গিয়েছিলুম, তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। পোড়াতে যারা এনেছিল, তারা আমার নিকট-বন্ধ কেউ যে নয়, তা চিত্তের তুলে দিয়ে প্রস্থান করার প্রমাণও হচ্ছে। কিন্তু কি ভয়ানক আয়ুর জোর আমার। আর অমন নির্জন ‘শ্মশান’-ঘাটেও কি না বড় ‘বান্ধব’ জুটে গেল! সেই গলা পচা বসন্তের রোগী তুলে এনে, একবেলার পথ বয়ে এনে, এই যে ছ মাস ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচালেন, এ কি বড় সহজ কথা! আমার প্রাণটাকে যদি একটুও মায়া করবার দরকার থাকতো, তা'হলে তাঁকে আমার রোজ সকালে উঠে হুল-চন্দনে পূজা করাই উচিত ছিল, কিন্তু তা না থাকলেও তাঁর দয়ার যে শেষ হয় না, আমার স্বীকার তো করতেই হবে।



তাঁর পায়ের তলার পড়েই এই নূতন জন্মটাকে আমার ক্ষয় ক'রে যাওয়াই উচিত ছিল বই কি! কিন্তু তখন কি আর মাথার কোন ঠিক আছে? কে আমি, কি করছি, কোথায় যাব—সবই যে ভুল হয়ে গেছলো। ছ মাসের পর প্রাণের আশা! তারও পর পাঁচ ছয় মাস প্রায় পাগলামীর বিকারে কেটে যায়। ভাল ক'রে উঠতে বসতেও পেরেছি নাকি ন'মাস দশমাস পরে। সবশুদ্ধ বৎসর দেড়েক আপনা ভোলা হয়েছিলুম, অর্থাৎ জীবধর্ম ছাড়া মানুষের ধর্ম বড় কিছুই আমার মধ্যে ছিল না। তবে নিরুপদ্রব ব'লে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে আমার ভগবান আমার নিজের হাঁসপাতালেরই এক প্রান্তে ঠাই দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কপালে যে বিস্তর বিড়ম্বনা লেখা আছে, হবে কি—মহুস্বত্র ফিরে আসতে না আসতে এই মুখের ছবি আমার পাগল ক'রে এবার পথেই ঠেলে বার ক'রে দিলে।

তার পরের কথা আরও যেন খেঁহারা খাপ-ছাড়া। আসল কথা এই যে, তখন তো আর আমার কথা বলবার জন্ত ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডার বা চাকর-বাকর কেউ সাক্ষী হয়ে বসেছিল না। কোথায় কোথায় গেলুম, কবে যেন একবার ভাল হয়ে কোন্-খানে চাকরী করি! শীতকালটা থাকি ভাল, আবার নাকি পাগলামী ঘাড়ে চাপে, তারা তাইতে তাড়িয়ে দেয়। এমনি কি কি ঘটেছিল, ঠিক ঠিক মনে না থাকলেও একটু একটু স্মরণে আসে। শেষে যেখানে চাকরী করি, তারাই আমায় পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেয় বুঝি? তা' সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি আর পাগল হই নি, তবে নূতন ক'রে জরে পড়ে এমন দশা হলো যে, আর খেটে খাবার শক্তি-টুকুও ছিল না। দু'চার দিন ভিক্ষে ক'রে কিছু কিছু পেটে দিই, দু'চার দিন না খেয়েই কাটে, তার পর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এই যে রাজা আমার আমার আগের জন্মের মতনই মান দিচ্ছেন, এর কি আমি একটুখানিও যোগ্য?

“আজ্ঞা, তা' হলে মানুষের সব চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যটা কিসে? সব হারানো, না জ্ঞান হারানো? বোধ করি জ্ঞান হারানোর মতন পাপের ভোগ আর কিছুতেই নয়। সবই তো আমার এই জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞানই যদি না রইলো, তা'হলে আমার “সব”কে যে আমি হারিয়েছি, তাই বা আমি জানতে পারলুম কই? দুঃখ জিনিষটা যে সর্বথাই পরিত্যাজ্য তাও তো নয়। দুঃখকেও ভোগ করতে একটা সুখ আছে। আমার

যে মা, আমার ইহজন্মের আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তাঁর বিরোগদুঃখকে যদি আমার মন নিশ্চিন্ত ক'রে মুছে ফেলে দেয়, তা'হলে আমার পুত্র জন্ম সার্থক হবে কোথা দিয়ে? না না থাক,—হে ভগবন্! আমার এই অসীম দুঃখের পর্বত তুমি ভেঙ্গে দিও না। যদি কেউ দুঃখের মধ্যে বিস্মৃতির কামনা করে, জেনো, সে ভুক্তভোগী নয় ব'লেই তা করতে পেরেচে। আমার দুঃখ! আমার ব্যথা! আমার মনে তুমি পদ্মের মৃণাল হয়ে ওঠো, গোলাপের কাঁটা হয়ে থাকো,—তোমার যেন আর তুলি না। কিন্তু এই দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে আমি শিখলুম কোথা থেকে, বলো দেখি? সেও একটি দুঃখী মেয়েরই কাছে। সে আমার মেয়ে হয়েছে। কিন্তু তাকে আমি মোটে চিনি। নাই বা চিনলুম, এ ভবের হাতে কেই বা কা'কে চিনচে? বার সঙ্গে যখন মেলা যায়, গঙ্গার ধারে গাছতলার ভোরের পাখীর মতন সে একটি আনন্দের গান গাইছিল। দুঃখ থেকেও যে আনন্দের রস ছড়িয়ে পড়ে, আর তা আজলা ভরে পান করা যায়, তা সেই দিনেই বুঝে নিয়েছি। নাঃ! আর যা' হই, পাগল আর হবো না। এইটেই দেখছি বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

“একটা জায়গায় বড়ই আমার খটকা লাগে। সুখদার মুখ যেন এ বাড়ীর রাণীর মুখে কে এনে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর গলার শব্দও তারই চুরী করা!—এ' কেমন ক'রে হলো? আজ্ঞা সুখদা মরে গিয়েছে ব'লে যে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটাই কি ঠিক? কিসে জানলুম? কেউ কি আমার বলেছিল? কিন্তু বলবেই বা আমার কে? আমার পুরণো জগৎ থেকে কেউ তো আমার এই নূতন জগতে দেখা দিতে আসে নি। তা'হলে সে কি শুধু আমার মনেরই কল্পনা? তা'হলে কি আমার সব চেয়ে বড় কর্তব্য আমি এমন ক'রেই অবহেলা করলুম? সুখদার তা'হলে কি হলো? সে তো কম দিনও নয়। চার বৎসর। এই চার বৎসর ধ'রে নিঃসহায় সুখদাকে কে দেখলে? খবর নেবো,—কিন্তু কেমন ক'রে? আমি যে মরে গেছি। মরা মানুষের চিঠি পেলে জাল ব'লেই লোকে উড়িয়ে দেবে! নিজে যাব? বিশ্বাস করবে কেউ? আবার হয় তো পাগলা গারদে ভর্তি হবো। বাড়ী ঘর টাকা কড়ি ছিল তো সবই,—তা কি তার থাকতে পেয়েছে, না আমার জাতিরাই দখল করলে? যদি জানতে পারতুম আমার সুখদা এই রাণী পরিমলের মতনই

কোন দয়ালু স্বামীর হাতে পড়ে সুখে আছে, আমি বাঁচতুম যে তা'হলে, আমি যে তার ভার নিইছিলুম।

“—কাল সংবাদপত্রে দেখলুম, যুদ্ধজয়ের জন্য রাজনৈতিক অনেক অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! আহা, আমার কালীপদ যদি আবার ফিরে আসে! কিন্তু তাকেই বা সুখদার কথা আমি কি বলবো?”

### ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,  
জিনিব আজিকার রণে  
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ!  
হৃদয় দিব তারি সনে!  
—কথা।

নরেশ নিজের পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাবিতেছিলেন তিনি সুসমারই কথা। সাধুজী ও নিরঞ্জনর সঙ্গে সুসমা অযোধ্যা যাইতেছে। সেখানে সাধুজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন, তাহাই সুসমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থল। নরেশ অনেকখানি হাঁপ ছাড়িলেন। ঐ দুজন লোককে তিনি এ কার্যের যথার্থ উপযুক্ত শুদ্ধচিত্ত বলিয়াই জানেন। মনে মনে তাঁদের কার্য সফলতার কামনা করিলেন, মনে মনে সুসমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “এ জন্মটা তোমার এই রকম ক’রেই কাটিয়ে নাও, এবার যেন নিরাপদ হও, শান্তি পাও।”

উহাদের আরক কর্মের জন্য সাধুজী তাঁহার নিকট টাকা চাহিয়াছেন। তিনি একখানা চেকবই টানিয়া লইয়া দশ হাজার টাকা সহ করিলেন, টাকাটা সমিতির ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া কথা কহিলে নরেশ চমকিয়া উঠিলেন, অশ্রু-পরিপ্লুত এবং কি ভাঙ্গিয়া-পড়া সে কণ্ঠস্বর!

“আমায় একবার সঙ্গে ক’রে সুসমার বাড়ী নিয়ে যাবে? তার কাছেও একটু ক্ষমা চেয়ে আসবো,—আর—আর—যাকে—যাকে না চিনে—না জেনে—”

“পরিমল! কি বল্চো তুমি? তুমি সুসমার বাড়ী যাবে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে?”

পরিমল রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, “শুধু তার কাছেই তো নয়; তার চেয়েও বেশী অপরাধী আমি যার কাছে তাঁর পায়ের ধূলা

না নিয়ে এলে আমি যে আর স্থির হ’তে পারছি নে।” —পরিমল সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশ চোঁকি হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িলেন— “পরিমল! পরিমল! কার কথা বল্চো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।”

ক্রন্দনবিবশা পরিমল একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত্তে কাঁদিত্তে বলিতে লাগিল, “তুমি কি ক’রে বুঝতে পারবে? তুমি তো চেনো না।—কিন্তু আমি, আমি কি ক’রে তাঁকে অত অবর করছিলাম! আমি কি ক’রে তাঁকে চিন্তে পেরেও চিন্তে পারি নি? গরীব নিরঞ্জন ব’লেই না অমন ক’রে তুচ্ছ করতে পেরেছিলাম! তিনি যে আমারই মায়ের আনা রোগ বেঁটে নিজে রোগে পড়েছিলেন, তাঁকে যে মরা মানুষ মনে ক’রে আমিই দাহ করতে নিয়ে যেতে দিয়েছি। উঃ, আমি কি! আমি কি! আমি কি!”

হাবড়া ষ্টেশন প্রাটফর্মে পা দিয়াই নরেশের সঙ্গে সাধুজীর দলের সাক্ষাৎ ঘটয়া গেল। সাধু সানন্দে চোঁচাইয়া উঠিলেন, “এই যে রাজা আমাদের তুলে দিতে এসেছেন!—জয়োহুস্ত!”

সাধুজীর সঙ্গে আগত শেষ করিয়া নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল নিরঞ্জনর দিকে। নিরঞ্জন এত লোকের মধ্যে তার মতন একটা নগণ্য লোকের এতটা খাতির অশোভন হয় দেখিয়া নত হইয়া নরেশের পদধূল লইতে গেল, নরেশ তাহাকে উত্তপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে একেবারে বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম কোপে হাসিয়া ধমক দিলেন, বলিলেন, “ফের বদমাইসি!”

তার পর ইঁহারা ষ্টেশনের একপ্রান্তে একটু ভিড় ছাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। নরেশ বলিলেন, “নিরঞ্জন! মুক্তেশ্বর রায়ের নায়েব-দেওয়ান হরিশচন্দ্র মিত্র যে মহাপাতক করেছিলেন, তাঁর সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ সম্পত্তির অর্ধেকটা—অর্থাৎ যেটা তিনি মুনীরের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেটা আমি বিষয়ের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়া দিতে এনেছি,—কোন কথা শুন্বো না, নিভেই হবে। তোমার বাবা রত্নেশ্বরবাবু সেই সম্পত্তি হাতে পেয়েও একদিন আমার বাবাকে ছেড়ে দেন। সেই উপলক্ষে তিনি চিঠিখানি লেখেন, আমি বড় হয়ে সেখানি সমস্তে তুলে রেখেছি। তার বৎসর মাত্র পূর্বে সেই চিঠি পেয়েই আমি তোমার খোঁজে চট্টগ্রাম গিয়ে জানতে পারি যে, মাস কয়েক পূর্বে তুমি মারা গেছ—এবং তখন আর কোন পথ না পেয়ে—যদিই



এতে আমাদের পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয়, ভেবে তোমারই শেষ চিহ্ন ব'লে তোমার পরিত্যক্তা—

নিরঞ্জন পি টলিয়া সে বসিলা পড়িতেছিল, নরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া নিকটস্থ বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন। গৈরিকধারিণী সুখমা দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের হৈরাণিপূর্ণ কথাবার্তা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল; নিরঞ্জনের শুক্রবার ১১ অগ্রসর হইতে গিয়া সে সান্ধ্যে দেখিল,

নিকটস্থ মেয়েদের বিশ্রামাগার হইতে ক্রতপদে বাহির হইয়া আসিয়া, একটি তাহারই বয়সী ১২ সেই আধপাগলা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে পড়িয়া অশ্রু-পরিপ্লুতমুখে বাষ্পগদগদস্বরে কাদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—“রমেশ দাদা! আমার কি আপনি চিন্তে পারছেন না? আমি তো মরি নি,—আমিই যে সেই পোড়ারমুখী সুখদা।”

সমাপ্ত

---

# নারীমঙ্গল

( স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ )

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

---



# নারীমঙ্গল

## স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

নর এবং নারী লইয়াই মানব-সমাজ। ইহাতে একের বিহনে যখন কেবলমাত্র অন্ধকে লইয়া সমাজ গঠন অসম্ভব, তখন একের সম্বন্ধে কোন কথা ভাবিতে বা বলিতে গেলেই অপরের সম্বন্ধেও সেই সঙ্গে চিন্তা বা আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এক জন বৈদেশিক প্রণীত বলিয়াছেন,—“নর এবং নারী সমাজ-রূপ পক্ষীর দুইটি পক্ষ, ইহাদের এক জনকে বাদ দিয়া অপরকে যখনই উড়িবার চেষ্টা করিতে দেখি, (উন্নতির) তখনই আমার মনে দারুণ ক্রেশ বোধ হয় এবং সফলতার সম্বন্ধেও সন্দেহান্বিত হই।”

আমাদের দেশের শাস্ত্রকাররা নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে স্বামীর সহধর্মিণীরূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। এই “অর্ধাঙ্গিনী” এবং “সহধর্মিণী” শব্দ দুইটির দ্বারায় তাঁদের সমগ্র অধিকার যেরূপ সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়রূপে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। আবার শুদ্ধ মাত্র এই ব্যক্তি জগতেই নহে, সমুদয় বিশ্বকাণ্ডে যে এই উভয় শক্তির সম্মিলনমূল, তাহী সমস্ত দর্শন-শাস্ত্র শতমুখে প্রচার ও প্রমাণ করিতেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, ভক্তের শিব-শক্তি, এমন কি একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক এবং অদ্বিতীয়ের দৃঢ় প্রচারক বেদান্তশাস্ত্র, তাহাতেও ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা-বিজৃম্বিত অথচ পরিদৃশ্যমান জগদ্ব্যাপারের তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে মায়ার শরণাগত হইতে হইয়াছে।

অতএব শুদ্ধ জীব-জগতেই নহে,—সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের মূলেও সেই দ্বৈতত্বাবের লীলা,—অবিচ্ছেদ্য এক কোথাও নাই। এই জন্তই পৌরাণিক পরম মহেশ্বর অর্ধনারীশ্বর এবং মহাশক্তির পদতলে মহাশিব শব্দরূপী। এতদ্বারা শাস্ত্রকারগণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই দুই পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে, একেরই দ্বিধা বিভক্ত—দুইটি রূপমাত্র।

অতএব এই নব্য-শিক্ষার যুগে পুরুষ যখন নৃতনের মধ্যে মগ্ন হইতেছে, তখন তাহার অর্ধ—নারী সমাজেও যে এই নব্য-তত্ত্বতার স্রোতঃ প্রবলভাবে আঘাত করিবে, ইহা কিছুই বিচিহ্ন নহে; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক,—ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই যে নূতন স্রোতঃ দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ স্রোতঃ দেশের নদীর নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বৈদেশিক বস্তার অত্যধিক প্রাধান্য। এই নূতন স্রোতঃ বেগবতী ধারা আমাদের বর-দ্বার ভাসাইয়া না দেয়, সেই দিকে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। যেহেতু নর এবং নারীর পরস্পর সম্মিলনে গঠিত হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ, জীব-জগতের জননীগণের স্থান ঘরের ভিতর অংশে এবং পুরুষের বাহিরে। গলা ফাটাইয়া ইহার প্রতিবাদ-চেষ্টা করিলেও,—এই প্রকৃতিদত্ত অধিকারের পরিবর্তন ঘটবে না। কাজেই প্রাধান্য যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন স্বতঃই একটুখানি ব্যস্ত হইতে হয়।

“স্ত্রীশিক্ষা” বলিতে আজ কাল আমরা সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুল-কলেজে লেপা-পড়া শেখানকেই বুঝি। আজ কাল এই প্রকারের শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং দিন দিন ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে। এই সব মেয়েরাই অদূর-ভবিষ্যতে এক দিন গৃহিণী এবং জননী হইবেন। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা বাহা কিছু সমস্তই যে তাহাদের এই দুইটি প্রধানতম কর্তব্যসম্পাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া নির্বাচিত হওয়াই উচিত, ইহা স্কুল-দৃষ্টিতেও বুঝা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণ এ বিষয়ে একবারেই উদাসীন এবং দেশের গণ্য-মান্য জননায়কবর্গও—এত বড় চিন্তনীয় ব্যাপারে একান্তই চিন্তাশূন্য। এই কথাটা কি কেহই ভাবিয়া

দেখেন না যে, যত উচ্চ শিক্ষাই প্রাপ্ত হউন, — নর এবং নারীর কর্মক্ষেত্রে কখনই ঠিক এক হইতে পারে না। উভয়ের শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তি যে পরিমাণে বিভিন্ন, উভয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ও সেই হিসাবেই কতকটা বিভিন্ন রাখিতেই হইবে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্পকলা, উত্তমরূপে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণভাবে কিছু গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্র এবং সন্তান-পালন প্রভৃতি গৃহকার্য্যই স্ত্রীশিক্ষার—প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। রাশি রাশি অপ্রয়োজনীয় বই পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করাই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। এই অনাবশ্যক বইএর বোঝাপড়ার পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া ছেলেদের স্বাস্থ্য, ক্ষুধা এবং তাহার চরম ফল আয়ু কপূরের মত উবিয়া যাইতেছে; এইরূপ পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য লাভণ্য ক্ষুধা ও সজীবতা জন্মের মত অপব্যয় হইতেছে। বাল্যবিবাহে অকাল-মাতৃত্বে মেয়েদের শরীরের অবস্থা তো এর চেয়ে বেশী মন্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া তোর পাঁচটা (মর্নিং স্কুলে) হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত নতুবা বেলা ৯টা হইতে ৪টা অবধি, নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া গাড়ী-ঠাসা হইয়া অনর্গল শুষ্ক কঠোর পাঠ্যভ্যাসের মধ্যে যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদের শরীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। ছেলেদের তবু পথ চলার অধিকার থাকায়,—অনেকটা মন্দ ফল সত্ত্বেও আলো-বাতাসের সহিত একটা সম্পর্ক থাকে; মেয়েদের তর্জি গাড়ীতে মেয়ে উঠানো-নামানো করিতে করিতে অনেকখানি সময়ই বন্ধ থাকিতে হয়। অবশ্য সকলেই কিছু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নহেন। টিফিন (জল-খাবার) পেট ভরিয়া, অথবা সুপাচ্য বা সুখাদ্য, এই অন্ন-সমস্তার দিনে কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে। ঘরেও সাত-সকালে বাচ্চা-কাচ্চা সামলাইয়া, মায়েরাও কিছু পরিপাটীরূপে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন না। খাণ্ডের মধ্যে এ দরিদ্র দেশে ডাল-ভাত-তরকারী প্রধান সম্বল। উহা চিবাইয়া খাইবার অবসর নাই—গাড়ী আসিয়া পড়িবে। অজীর্ণ রোগ হইবার কিছু অপরাধ আছে কি? তার পর স্কুলে ও স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেও সেই রাশিকৃত পড়ার চাপে পড়িয়া হাবুডু বু খাওয়া। এইরূপে অবসরভাবে, গৃহস্থ-কন্ডার উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, মেয়েটি এক আধটি পরীক্ষার পাশ করিল এবং ভগ্ন-দেহ, পুঁথিগত বিজ্ঞা ■ স্কুলের পাঁচটা বিভিন্নাবস্থার সঙ্গিনীদের কল্যাণে বেশ একটু

মৌখীন কুচি লইয়া একটি দরিদ্র পরিবারের অর্দ্ধ শিক্ষিত কেরানীর গৃহে চলিয়া গেল। এ অবস্থায় মেয়েটির জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য সকল বিষয়েরই দু'একটি ব্যতিক্রম থাকে, আমি তাহাদের কথা ধরিতেছি না; সাধারণতঃ ঐ ভাবের অর্থাৎ এই পুরুষোচিত ভাবের শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রাপ্ত—আধুনিক সহরে মেয়েদের কতকগুলি গুণের সহিত কতকগুলি দোষও যে জন্মিতেছে, ইহাকে অস্বীকার করিতে গেলে, সামাজিক সত্য ব্যাধির ঠিক মূল-তত্ত্বানুসন্ধান করা হয় না এবং যে যোগের প্রকৃতি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি থাকে, তাহার প্রতীকার প্রায় অসম্ভব। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রের তো এই প্রকারই বিশ্বাস।

নবশিক্ষিতা মেয়েদের সেকালে (অশিক্ষিতা আমি বলিব না, যেহেতু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেকালে মেয়েদের স্কুল, কলেজে না গিয়াও এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যাহা শিখাইতে আধুনিক এম্-এ ক্লাসেরও শক্তি নাই। উদাহরণস্বরূপে রানী ভবানী, বিজ্ঞানাগর-জননী, গুরুদাস-জননী, ভূদেব-জননী এবং ভূদেব বাবুর পত্নীর নাম করা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিস্তৃত জ্ঞানী ও বিদ্বান্ স্বামী তাঁহার স্কুল-কলেজে না পড়া ক্রীর উদ্দেশ্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পারিবারিক প্রবন্ধে যে উৎসর্গ-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত বঙ্গরমণীরই পাঠ করা উচিত। উহাতেই প্রমাণ পাইবেন যে, যাহারা নব্যশিক্ষা ব্যতীত, যথার্থরূপে নব্যশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত স্বামীর জীবন এতদূর সুখময় করিতে পারেন, তাঁহারা কখনই অশিক্ষিতা ছিলেন না। আরও এক কথা, ফল দেখিয়াই বৃক্ষের শক্তিমত্তা প্রমাণিত হয়। সে কালের ঐ সব বাল্যো বিবাহিতা, উচ্চ-শিক্ষার বহির্ভূত মায়েদের গর্ভে যে সবল, সুদীর্ঘজীবী, অসাধারণ শক্তিমান সন্তান স্থান-লাভ করিয়া দেশ ও জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কোন নব্যশিক্ষিতার সন্তানকে তো আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে দেখিলাম না! শিক্ষাও তো — আজ অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। 'তবে কালোহরং নিরবধিঃ'—পঞ্চাশ বৎসরেই হতাশ হইবার কারণ নাই; এবং যখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—অর্থাৎ নানা কারণে আর সেকালের সে সংঘততম পারিবারিক জীবন ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে, তখন অতীতের জন্মন রুদ্ধ রাখিয়া জীবন্ত ও আগ্রত বর্তমানের সমস্তারই যথাসম্ভব সমাধান-চেষ্টা করা কর্তব্য।) — মেয়েদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের কিছু প্রভেদ জন্মিয়া



হাইতেছে। আমি সেই সময়েই দু-একটি কথা বলিব। জগৎ বৈচিত্র্যময়, প্রকৃতি বিভিন্ন। “ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ”—সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন, এমন আশা বাতুলেই করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভিন্নরুচির দোহাই দিয়াই নব্যশিক্ষার কয়েকটি ক্রটির বিষয়ে কথা কহিতে ভরসা করিতেছি।

নব্য-শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনা যায়, উহারা ঠিক পূর্বের মত ধর্মভীরু হয় না। (অবশ্য এ স্থলে সমাজপ্রচলিত ব্রত উপবাস, পূজা-হিক ও অন্যান্য প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নৈতিক চরিত্র নির্ভর করে কতকটা বংশ, পিতা-মাতা ইত্যাদিরই উপরে এবং অনেকটাই শৈশবশিক্ষার শৈথিল্যজাত কুসঙ্গে।) ইহার কারণ, আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষার কোনই বালাই নাই। ঘরেও ছেলেমেয়েকে স্কুল পাঠাইয়া—মা-বাপ নিজেদের সকল দায়মুক্ত বোধ করিয়া, ও সকলের যত্নাট রাখেন না,—অথবা, তাঁহাদেরও তো ঐ একই দশা! বালিকাব্রত, শিবপূজা প্রভৃতি অনেকটা অবসরের অভাবে, কতকটা আলস্ট্রে, একটু বয়স বাড়িলে বৈদেশিক শিক্ষা ও সমগ্রভাবে, তুচ্ছ বোধে পরিত্যক্ত হয়;—অথচ উচ্চাঙ্গের ধর্ম-চর্চারও ব্যবস্থা নাই। কাজেই ছেলেদের মত মেয়েরাও ধর্মজ্ঞান (আচার-বিচার ও পূজার্চনা) বর্জিত হইয়াই বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও উপাসনার বিধি আছে—কিন্তু হিন্দুসমাজের তো মা-বাপ নাই। কাজেই হিন্দুসমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের পক্ষে পক্ষ্যাপূজার্চনা বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে! ব্রত-উপবাসাদিতে যে নিরম-সংঘমেয় প্রয়োজন, তাহাদের চরিত্রগঠনে সেইটুকুরও আর তাহারা সহায়তা প্রাপ্ত হয় না।

নব্যশিক্ষিতাগণ পুরাতন দলের তুলনায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কতা এবং অসরলা—এ নিন্দাটাও তাঁদের ঘটিতেছে। স্কুল এবং কলেজে শিক্ষিতা হইলেই যে মেয়েরা কুটীলা হইবেন, এমন কথা বলি না। তবে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে ইহা এতই সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে যে, এ সম্বন্ধে আর বেশী স্পষ্ট করিয়া কোন কথা না বলিলেও চলে। প্রাচীনারা পরকে এক মুহূর্তে আপন করিতে পারিতেন, নবীনারা আপনকেও বহুদিনে নিকটতম করিতে তো পারেন-ই না,—পরস্পর পর করেন। ইহার অনেকখানি সত্য! ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা নিজের প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া, হাতে ঢালাই করা নিস্তির তৌলধরা কৃত্রিম শিষ্টাচারের আশ্রিত

হইতেছেন। তাঁহারা বয়স্কার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে জানেন না। যাহারা তাঁহাদের বিশ্রুতা-লাপ কান পাতিয়া শুনিবেন, তাঁহারা তাহাতে পৃথিবীশুদ্ধ সজীবনিজ্জীরের সকল সংবাদ শুনিতে পাইবেন,—শুনিতে পাইবেন না শুধু তাঁদের নিজেদেরই সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির আন্তরিক খবরটুকু। তাই একালের বন্ধুত্ব, বন্ধুর সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক, শুধু একটা “আহা”তেই পর্যাবসিত হইয়াছে। উহাতে আন্তরিকতা ও হৃদয়তা নাই। এখন দিন দিন গুণা গুণা এফ-এ-বি-এ এমন কি এম্-এরও অভাব নাই। ইহাতে অহঙ্কতাগণ নিজেদের বিচ্ছালোকে নিজেরাই বলসিতনেত্রা হইতে অবশ্য লজ্জিতা হইবেন, তবে “অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী” এই যা ভয়! খুব বেশী উর্দ্ধে খুব বেশী মেরে উঠেন না; এবং যাহারা উঠেন, তাঁহারাও রক্তশীল সমাজের নহেন। তাঁহাদের ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং সাহেবীআনার প্রভাবান্বিত আধুনিকতা লইয়া একপ্রকার দিন কাটিতে পারে, যেহেতু তাঁদের সমাজবিধি অনুসারে পরের ঘরকে প্রায়ই তাঁদের আপন করিতে হয় না এবং বিবাহ করা-না-করাটাও অনেকটা নিজেদেরই হাতে।

নব্য মেয়েদের গৃহকর্মে অক্ষমতা ও তাচ্ছিল্যটা অবশ্য অনেকটাই অবস্থায় পড়িয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহার জন্য খুব বেশী দোষ দিবার নাই। স্কুল হইতে আসিয়া স্কুলের পড়া সারিয়া,—তার উপর ইদানীং যেমন সকলকার সব কত্যাগুলিকেই চৌষট্ঠিকলাকুশলা করিয়া তোলায় চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সে বেচারাদের এই ঘোর কলিয় অরুগত ক্ষীণপ্রাণে আর কতই সামর্থ্য যে, ইহার উপর আবার রন্ধনাদি কার্যাকরী বিচ্ছালোকে মনোযোগী হইতে পারে? তবে যখন এ শিক্ষা না হইলে নয়, তখন মায়েরা যদি যত্ন ও সহানুভূতির সহিত এ বিষয়ে সচেষ্ট হন, তবে অন্ততঃ ছুটির দিনেও একটু আধটু রন্ধন শিক্ষা দিতে পারেন। এ ভিন্ন পান সাজা, ছোট ভাইয়ের লালন-পালন, বাপের অল্প-স্বল্প সেবা, মায়েদের সামান্য কিছু সাহায্য—এগুলির নিত্য অভ্যাস না রাখাই অরুচিত। এই সব প্রীতি-ভক্তির সমাবেশেই বাল্যালীর মেয়ের নিজস্ব জীবন গড়িয়া উঠিতে সাহায্যলাভ করে। বন্ধের শিক্ষাওরু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গৃহকর্তাদিগকে, বিবাহের বয়ঃক্রম হইবার পূর্বেই প্রত্যহ একটু একটু করিয়া রন্ধন এবং গৃহস্থ-গৃহের উপযোগী অত্যাবশ্যক গৃহকর্মে নিযুক্ত করিতেন। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, যেমন বিদ্যালিক্ষা পক্ষে—তেমনি এ বিষয়েও প্রতিযোগী

পরীক্ষা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকিত। ছোট মেয়েদের দ্বারা বাপ-ভাইকে পরিবেশন করিয়া খাওয়ানর অভ্যাস করাইলে, উহাদের নিজেই ভালটা খাই—এ লোভটি জন্মিতে পারে না। পীড়িত, ভাই-বোনের কতকটা শুশ্রূষা ও তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান ইহাতে ভবিষ্যতে সন্তানপালন সম্বন্ধে যেরূপ প্র্যাকটিক্যাল (কার্যকরী) জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব, তেমন স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সতেরখানা বই পড়িলেও হইবে না। অবশ্য এ সব বিষয়ে যিনি শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষা যেন অসম্পূর্ণ না হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, ঘাড়ে পড়িলে আপনিই সব শিখিয়া লইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে এবং এ যুক্তির মধ্যে আদৌ সহনীয়তা নাই। ঠেকিয়া শেখার বিড়ম্বনা অনেক। যথাকালে বীজ বপন করিয়া সময়ে জলসেচন করিলে অফলা হইবার অথবা কুফল লাভের আশঙ্কা খুব কমই হইয়া থাকে। বিশেষ ভাগ্যালক্ষীর চিরচাকল্যের অপবাদ সনাতন কাল হইতেই শ্রুত হইয়া থাকে। এ জন্ত ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে কিছু কিছু কার্যকরী বিজ্ঞা সকলেরই শিখিয়া রাখা উচিত। এ দেশের ছেলেদের শিক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে থিয়োরিটিক্যাল (ভাবপ্রবণ) যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল (কার্যকরী) নহে, বলিয়া আমাদের দেশের অনেক দেশ-হিতৈষী মহাত্মা আজকাল আক্ষেপ করিতেছেন, এ কথা অনেকেই জানেন। আমার মনে হয়, ছেলেদের মত—না, বরং অধিকতর ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইবে, যদি আমাদের মেয়েরা কার্যজগৎ ছাড়িয়া কেবলই ভাবলোকের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন। শুনা যায়, ইয়োরোপীয় রাজপরিবারসমূহ সন্তানসন্ততিবর্গ সৌভাগ্যলক্ষীর অচপল আর্জগত্যে সন্দিহান হইয়া স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্ত কোন না কোন একটা কার্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমাদের বর্তমান সম্রাট নাবিকের কার্যে সুশিক্ষিত। মোগল সম্রাট আকবর শাহ, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি এবং মোগল রাজকন্যাবর্গও কেহ টুপী প্রস্তুত, কেহ আলোখ্য-লিখন, সুগন্ধি প্রস্তুত ইত্যাদি অর্থকরী বিজ্ঞা শুধুই শিক্ষা করিতেন এমন নয়,—তদ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করিতেন, এ কথা ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

বিলাসিতাবুদ্ধি এক্ষণে আমাদের সমাজের প্রতি স্তরেই হইতেছে। এ জন্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে চাহি না। তবে স্কুল-কলেজে সকল শ্রেণীর একবয়সী মেয়েদের সর্বদা মেশামেশির জন্ত, একের দোষগুণ বত লীভ অস্ত্রে

মে (খ) ৩৩ -

সংক্রামিত হয়, অন্ততঃ ততদূর হইতে পারে না। এই হেতু এই বিষয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর একটুখানি দৃষ্টি রাখা আমার সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ধনিকভাগগণ ‘শ্রাময় লেদারের হিলওয়ালা লেডী স্’ ‘রেশমী ষ্টকিং’ লম্বা চোড়া বিচিত্র ফিতার স্কল ও জ্যাকেট, ব্রুক, পেটিকোটের নিত্য নূতনতর ফ্যাসানের আমদানী করিতে থাকিলে বেচারা গরীবের মেয়েদের কচি মনেও সংক্রামক ভাবে ঐ সকলের উপর লোভ জাগ্রত হওয়া খুবই অস্বাভাবিক নহে। বিলাসিতা জিনিসটার দোষই ঐ। বাহা একের পক্ষে অনায়াসলভ্য এবং সহজ-ভাবেই আচরণীয়, অস্ত্রের পক্ষে হয় তো বা উহার ফল অশেষ অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। নিম্ন-জগাদিতে বাহা বাটবে, তাহা কতকটা অপ্রতি-বিধেয় (হয় তো তাহারও প্রতিবিধান আছে)। কিন্তু শিক্ষাকেই স্কুল-কলেজে সকল মেয়েরই পরিচ্ছন্ন অপ্রচলিত অনাড়ম্বর অর্থাৎ সকল অবস্থার মেয়েদের পক্ষে যাহা পাওয়া সম্ভব, তেমন বেশেই আসা সম্ভব। (বেশভূষা, যানবাহন ইত্যাদির অত্যধিক আড়ম্বরে আজকাল ধনি-দরিদ্রের প্রভেদটা অত্যন্তই সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। অনেকেই তো ভাবিয়া দেখেন না যে, এই প্রভেদই ইউরোপীয় মহা অনর্থের—অর্থাৎ বন্সেভিজমের মূল।) এ স্থলে বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষয়িত্রী নিজেই উহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবেন। এক্ষণে এক-এ বি-এ পাশ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনে অপর গুণগণা দেখার প্রথা রহিত হইয়াছে। সেই হেতু মেয়েদের পক্ষে বিলাসিতাবর্জন বৈদেশিক-তার প্রবল প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মেয়েদের শিক্ষাভার যাহাদের হস্তে, তাঁহারা নিজেরাই তো জগদব্যাপারে একান্ত অপরিণতবুদ্ধি স্কুলের মেয়ে। নিজেদের সন্তঃপ্রাপ্ত পুংখিগত বিজ্ঞামাত্র সঞ্চয় করিয়া আসিয়াই, শত শত অপরিপক্বমতি বালিকার জীবনগঠনের সহায়তা করিতে হয়। আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে স্কুল এবং গৃহের উভয়পক্ষীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষেই কিছু চিন্তা করিবার আছে। যে জন্ত বালিকার মাতৃ সামাজিক অকল্যাণের হেতু বলা যায়, তাহারই কিছু কিছু ক্রটি এই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাকুলের হস্তে শত শত কন্ডার মাতৃত্বত গুস্ত করার সংঘটিত হইতেছে না কি?

শিক্ষাদান কার্যটি নিতান্ত হাসিখেলার জিনিষ



নহে। বিজ্ঞান যেমন মহাদান, তেমনি মহা-  
ব্রত। জগতের সমুদয় মহৎ কার্যই অনায়াস বা  
অস্বাভাবিক নহে; পরন্তু কষ্টসাধ্য। যুগযুগান্তরে  
এবং শুধুই এ দেশে নয়, দেশ-দেশান্তরেও, এই  
শিক্ষাদান কার্য ত্যাগ-সংযত-জীবন তাপস-তাপসী  
সম্প্রদায়ের হস্তেই স্তম্ভ ছিল। বৈদিকযুগের  
ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধযুগেও সহস্র  
সহস্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণীই মানব-সমাজের শিক্ষাগুরু  
পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন (তখন ধর্ম এবং বিজ্ঞা  
স্বতন্ত্র বিভক্ত ছিল না।) ইয়োরোপখণ্ডেও ধর্ম  
এবং লোকশিক্ষা সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীপণের ত্যাগ-  
দীক্ষিত চিত্তাশ্রম করিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল।  
আজিও চির-কৌমাৰ্য্যাবলম্বিনী খৃষ্টানকুমারীকুল  
শুধু স্বদেশেরই নহে, দেশদেশান্তরেও, সহস্র সহস্র  
অনাথ অনাথার রক্ষয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। এই  
সেদিনেও মাতাজী তপস্বিনীর অধীনে আদর্শ হিন্দু  
বালিকা বিজ্ঞান-গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু  
কালধর্ম্মে তপস্তা সঙ্গীর্ণতর হইয়া গিয়াছে—একের  
অবর্তমানে তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া কঠিন।  
এই সকল আঠার কুড়ি বৎসরের বালিকাগণকে  
সেই সকল শিক্ষা ব্রতধারিণী মহাতাপসীগণের  
সহিত তুলনা করিতে আমি বসি নাই; এবং  
ইহাদের কাছে তেমনটি দাবী করিতে যাওয়া  
শুধু নির্গমতাই নয়, বাতুলতাও। কিন্তু কথা  
এই যে, আমাদের দেশে যে মেয়ের ঘরে একটি  
বয়স্ক সপত্নীপুত্র আছে—হয় তো তাহার বিবাহও  
হইয়া গিয়াছে—সে মেয়ে বিয়ের কনে আসিয়াই  
বুঝ পুত্র বা পুত্রবধূর সম্মানে (বা স্নেহে) তাহাদের  
মাতার যোগ্য কতকটা শ্রোতা সাজিয়া বসে,—এমনও  
তো ঘটিতে দেখা যায়! আর সেই যে পারে, সুখী সে-ই  
হয়। তেমনি এই বয়স্ক বালিকা এবং জগতের মধ্যে  
একটি উচ্চতম পদে আরুঢ়া, এই মেয়েগুলিকেও তাঁদের  
উচ্চপদের মর্যাদা রক্ষার্থেও কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার  
করিতেই হইবে। নিজেরা স্নেহসম্পন্ন হৃদয়বতী ও  
বিলাসবর্জিতা হইলেই, তাঁরা এই ঘোর দায়িত্বে  
পরিপূর্ণ পদলাভের উপযুক্ত হইতে পারিবেন।  
ইংরাজীতে যাহাকে “প্লেন লিটিং এণ্ড হাই থিঙ্কিং”  
বলে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উচ্চাসন যিনি গ্রহণ করি-  
বেন, এই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। (অথবা ইহা  
সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই জীবনের আদর্শ হওয়া  
উচিত বলাই সম্ভব)।

অবশেষে প্রধান কথা এই যে, নানাকারণে মানুষের  
ব্যয়ের দিকটাই অপরিপাণ্ডরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

মহার্য্যতার যেমন সীমা নাই, তেমনি শেষও নাই।  
নিজের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি সুশৃ-  
ঙ্খলার সহিত সংসার চালাইতে পারেন, আজিকালি-  
কার এই ঘোরতর সমস্তার দিনে “গৃহলক্ষী” অভিধান  
তাঁহারই লভ্য। গৃহসংস্কারে গৃহিণীর সাহায্য নহিলে  
চলে না। অশনে, বসনে সর্বত্রই স্ফটিকের প্রয়ো-  
জন। দয়াদর্শ আত্মীয়তাটাই শুধু না বাদ পড়িয়া  
যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অথবা থাকিয়া, যদি  
সাধ্যমত স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে পারেন, তবেই  
তাঁহার সুশিক্ষিতা নামের যোগ্য,—নতুবা এমন  
অকলা বিজ্ঞার আদর বাড়িবে না। ইংরেজীমানার  
প্রকোপে আমাদের চলিচলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া  
উঠিয়াছে। ইহার হস্ত হইতে ছেলে-মেয়েদের রক্ষা  
করিবার জন্য—ম্যালেরিয়া বা হুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে  
দেশরক্ষার চেষ্টার মতই চেষ্টা একান্তই প্রয়োজনীয়  
হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা জাতীয় জীবনের যেটুকুও  
বা হৃদয়ের বাকী আছে, তাও থাকিবে না।

পূর্বেও মেয়েরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। তাহাতে  
নারীমনস্তপিসম্পাদন পূর্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের  
একটা সঞ্চয়ও থাকিত, কিন্তু এ যুগের নারী-  
বিমোহন বাবতীর বস্ত্রজাতই ভূয়া। অলঙ্কাররূপে  
ইহারা ক্রয়কালীন বহুমূল্য এবং বিক্রয়কালীন মূল্য-  
হীন;—মুক্তা-চুণী বা কাঁচ-পাথর এবং অধিকাংশই  
রেশম-পশম ও লেশ-চিকনের গাঢ়। এই সমস্ত  
সম্পত্তি তো নহেই, অধিকন্তু বিপত্তি এই যে, এই  
সকল রাশি রাশি আবর্জনার বিনিময়ে দেশের কোটি  
কোটি টাকা জলস্রোতের মত বৈদেশিক বিপণিজাত  
হইতেছে। তাও আবার এই হা-অরের দিনের মুখের  
অগ্রগ্রাস শস্ত্রের মূর্তি ধরিয়া। অথচ এ সব কথা যে  
বাঙ্গালীর মেয়ে না জানেন, এমনও তো নয়। এক দিন  
বিদেশী শিল্পবর্জনের (বয়কটের) প্রতিজ্ঞার ইহারাই  
অগ্রণী ছিলেন। এক্ষণে নিজেরা ভুলিয়া নিজ নিজ  
সন্তানকেও অসহায়ভাবে বৈদেশিক বিলাসিতা-  
সমুদ্রে মগ্ন হইতে সহায়তা দিয়া ধীরভাবেই করিতে-  
ছেন। বিজ্ঞাসা করি, সে দিনের অপেক্ষা আজ কি  
এ দেশে সুদিনের অভ্যুদয় হইয়াছে? যদি শিক্ষার  
চিত্তোন্নতি না হইয়া, স্বদেশের, সমাজের, স্বজনের এত  
বড় হ্রবস্থার, অবনতির দিনে কাহারও প্রতি কোনই  
কর্তব্য করিতে না শিখায়, তবে কি ফল সেই  
বিফল শিক্ষার গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কোন  
স্বনামধন্য ভারবাহী জন্তুবিশেষের অবস্থা লাভে?  
চলিত কথায় বলে, ছুট্টগোরুর চেয়ে শূঁচ গোয়াল-  
ভাল। তাই বলি, কেবলমাত্র দুখানা ইংরেজী

বাংলা উপন্যাস বা ইতিহাসের দুপৃষ্ঠা উন্টাইলেই—মাসিকপত্রে দুটা প্রবন্ধ লিখিলেই—নারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না। নব্য-শিক্ষিতাকে বিবি বাঁনাই-লেই চলিবে না, দেবী করিতে হইবে। শিশুচিত্ত কাদার তালের মত,—উহাদের যে ছাঁচে গড়িবে, উহারা নির্দিষ্টারে তেমনি গঠিত হইবে। আমরা যদি শিব (শিব-মঙ্গল) গড়িতে আর কিছু গড়িয়া ফেলি, সে দোষ তাদের নয়, আমাদের।

সন্তানের শিক্ষার জন্য মা-বাপকে অত্যন্ত সচিৎ সংযত হইতে হয়। যে আদর্শ তাহাদের সম্মুখে খাড়া করিবে, সে আদর্শের দেবতা তাঁহাদের নিজের হওয়া চাই। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ পরের চাইতে নিজের দৃষ্টান্তই সমধিক শিক্ষাপ্রদ। আমি যদি অনাচারী হই, আমার ছেলেকে সদাচারী হইতে বলিবার পুরা সাহস আমার বুকে আশ্রয় পাইবে না। আমার চিত্ত যদি গুরুজনে বিদ্বিষ্ট হয়, নিজ সন্তানের বশুতা আমি দাবী করিতে যাইব কোন্ মুখ দিয়া? আবার বলি, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া অথবা গৃহশিক্ষকের হস্তে সঁপিয়া দিয়াই নিজ কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিবেন না। বাহাতে উহারা স্বধর্ম-ভক্ত, পরধর্মসহিষ্ণু, স্বজনপ্রেমিক, স্বদেশাহরক্ত, দরিদ্র-সেবক ও অনাড়ম্বর পবিত্র-চরিত হইতে পারে, অর্থাৎ মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারে, তেমন করিয়াই উহাদের শিক্ষা দিতে প্রাণপণ করুন। এ কার্যে পিতার অপেক্ষা মাতার সহায়তারই প্রয়োজন সমধিক। আর এইখানেই তাঁদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার সাফল্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এইখানেই মাতৃত্বের মহা পরীক্ষা। আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদকে আশীর্বাদ করিতেছি, এবং সবার জন্যই মঙ্গলময়ের নিকট কার্যমনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করিতেছি, যেন এই মহাব্রত,—এই মহাব্রত তিনি আমাদের বার্থ না করেন, যেন ‘মা’ নামে কলঙ্ক স্পর্শ না করে।

আমি স্কুল-কলেজের বিরোধী নহি। বরং নর-নারী-নির্কিংশেষে ইতরভেদ সকলেরই জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী; এবং ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ অর্থাৎ কলেজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করি না, কিন্তু উহার বর্তমান ব্যবস্থার সন্দেহ নহি; এবং পূর্বেই বলিয়াছি যে, নারীজন্ম শুধু বি-এ এম-এ পরীক্ষা পাশেই সার্থকতার চরম ফললাভে সমর্থ—এ বিশ্বাস আমার নাই। অতএব আমার বিশ্বাস মতে মেয়েদের জন্য এখন আমাদের অনেক

বেশী ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে,—উহাদের মঙ্গল-মঙ্গল ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অমঙ্গলের ভ্রান্ত পথে যদি পাঠান হইয়া গিয়া থাকে, ফিরাইয়া আনিয়া স্তম্ভলের পথে স্তম্ভাভা করাইতে হইবে। নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারে বাঁধা নিয়মে কনে-দেখানর মামুলা শিক্ষা দিলেই চলিবে না—উহাকে স্বামীর সহধর্মিণী—সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীবের অঙ্গাঙ্গিনী এবং ভদ্রপেক্ষাও উন্নত দৃষ্টিতে জীব-জননী রূপে দেখিতে হইবে। যদি ইহার উপযুক্ত রূপে তাহাকে গড়িয়া দিতে না পার, তবে ‘মেকি টাকা’ চালানোর মত ‘খেলো’ জিনিষ দান করার অপরাধে ইহ-পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও। কারণ, এই যে বিদেশী চণ্ডের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন্য বিহিত হই-রাছে, ইহা সংশোধিত, পরিবর্তিত না হইলে, আমা-দের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ পুণ্যই সুখোজল বলিয়া আমার তো বিশ্বাস হয় না—অবশ্য যদি না আমি ভ্রমে পড়িয়া থাকি।

২.

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে দলে দলে ইংরাজী-শিক্ষিত ছেলেরা খুঁটান হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। অনেকে আন্দাজ করেন, ইহার কারণ, সেই সময়-টাতে এ দেশে উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব সাধারণের নাগাল পাওয়ার অবস্থার স্ফলভ ছিল না (খুব সম্ভব, জিনিষটা ঠিক সাধারণের জন্য সৃষ্ট নয় বলিয়াই)। অথচ সাত সজ্জ তেরো নদী পার হইয়া আগত খুঁটান পাদরীরা তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের চর্চাটা খুব ছোৱের সন্দেহ করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ঘরে শালগ্রাম-শিলার ভগবানের অর্চনা হয়। পূজার মন্ত্র এই—“সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্র্যতিষ্ঠদশাস্ত্রম্।” ছেলে বিশদার্থ জানে না। পাদরী বাললেন, “নোড়াহুড়ি ফেল সাগরের জলে।” ছেলে দেখিল, নিজের ঘরের পূজা-মন্দিরে সেই নোড়াহুড়ি।—ফেলিয়া দিল। আত্মীয়েরা কপালে করাঘাত করিলেন। প্রতিবেশী বলিলেন, “জাতি-ভ্রষ্ট!” তেমন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা সর্বত্র হইল না, বাস্তবিকই পূজা ঐ শিলামূর্তির নহে। পূজা যিনি মহতের চেয়েও মহৎ, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, (অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্) সেই সর্বভূতাবি-বাসের। শিলা বা প্রতিমা তাঁহার প্রতীক বা ‘সিম্বল’। ইহা ব্যতীত অধিকারি-ভেদে উপাসনা-ভেদের ব্যবস্থা এই সনাতন হিন্দুধর্মে যথেষ্টই আছে,—



যাহাতে স্বধর্ম-ত্যাগ ■ পরধর্ম-পীড়ন ব্যতিরেকেও, অনায়াসে এই ধর্মবৃক্ষের ছায়ায় বিচরণ পূর্বকই ঐশ্বর্য লাভ করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির অভ্যুদয় হইল। মুদ্রাসক্তির কল্যাণে শাস্ত্র-সকল সাধারণের দৃষ্টাপ্য রহিল না। এখন দুপাতা বাঙ্গালা ও আধ পাতা সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াই যে খুসী গীতা উপনিষদের বাণী অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেছে। এক্ষণে আর স্বদেশে বা বিদেশে ( নিত্যন্ত মূর্খ ব্যতীত ) হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম বলিয়া অবজ্ঞা করিবার পথ নাই; এবং নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার ক্যাসনও বদল হইয়াছে। তাই বলিয়াই কি দেশে ধর্মের আবহাওয়া জোর করিয়াছে বলিতে হইবে? ‘ফলেন পরিচীয়ে’ এই যে কথাটা আছে, যে কার্যফলেই কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তার পরিচয় কিছু পাওয়া গেল কি? অজ্ঞতার এবং বিজ্ঞতার সম পরিণাম দাঁড়াইল না কি? শাস্ত্রের অপ্রচার বা শাস্ত্র অনধিকারী করার যদি দেশে অজ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে আজ যখন শাস্ত্র স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই আয়ত্তাধীনে আসিল, তখন জ্ঞানের উজ্জলতর জ্যোতিতে দেশবাসীর অন্তরগুহা আলোকিত হইল না কেন? জ্ঞানীর যে লক্ষণ, ‘সমহুঃখ-সুখমস্ত সম লোষ্ট্রাশ্বকাঞ্চন’—তাহা আজ-কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয় জন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুঁজিয়া মিলে? জ্ঞানীর এ পরিচয় পুঁথিগত হইবার উপক্রম করে নাই কি?

লোকে বলিবে, “তুমি যে কুরুক্ষেত্রের অর্জুন খুঁজিতে আরম্ভ করিলে!” অথচ সেই কুরুক্ষেত্রেও একটি ভিন্ন দুইটি অর্জুন ছিল না। আমি বলিব, ‘তবে আর ভগবানের অতবড় গীতাখানা প্রচার করিয়া ফললাভ কি হইল?’ বস্তুতঃ, শিক্ষাপ্রচার জিনিষটা শুধুই ব্যক্তিবিশেষের জন্ত নয়; সাধারণেরই জন্ত। যিনি স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত, স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানী, তিনি ভগবানের প্রেষ্ঠ বিভূতি,—পুরুষসিংহ! তাঁরা লোক-শিক্ষা দিতে আসেন, নিতে আসেন না। শিক্ষা-প্রচার অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সর্বসাধারণের জন্ত। ইহার ফল যদি তাহাদের মধ্যে প্রকটিত না দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা সুপ্রচারিত হয় নাই।

বীজ বপন করিলে বৃক্ষ হয়। এই কথাটা সাধারণ ভাবে মিথ্যা না হইলেও, অখণ্ডনীয় সত্যও নহে। ‘বীজ বপন না করিলে কখনই বৃক্ষ জন্মিতে পারে না’,—এই হেতুই ইহা আংশিক সত্য; কিন্তু

বীজ বপন করিলেই যে বৃক্ষ জন্মিবে, এমনও তো কোন প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ, বীজ-বপনের পূর্বে জমীটি তৈয়ারি হওয়া চাই। জমী উর্বরা হওয়া প্রয়োজন। জমী নিড়াইয়া জলসেকে আর্দ্র হইলে, মৃত্তিকা খননপূর্বক বীজটি পুঁতিতে হইবে ( বীজের মধ্যেও ফলোৎপাদিকা শক্তি নানা কারণে নষ্ট হইতে পারে )। তার পর অকুরোদগম হওয়ার পর হইতে বিবিধ উপায় ও যত্নে সম্ভান-স্নেহে উহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া, লালন ও পালন করিতে হয়। তবেই হয় ত কালে উহার ফললাভ সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এই যে অজস্র শাস্ত্রপ্রচার, ৩রামকৃষ্ণ, ৩বিবেকানন্দ, ৩ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৩ভাস্করানন্দ, জ্ঞানানন্দ, আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার প্রভৃতির এবং আরও অনেকা-নেক মহাত্মা মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী সকলই যেন ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে, ইহার কারণ ধর্মবীজ-বপনের জমীর অবস্থাটা মোটেই ভাল নাই—কারণ? কারণ, তাহাতে যে সব আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তদ্বারা উহার সমস্ত উর্বরতা শক্তিকেই উহা গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সোজা কথা এই যে, আমাদের দেশে এই যে ধর্মভাবের হ্রাস দেখা যায়, ইহার প্রধান এবং প্রবলতম কারণ, আমাদের রাজ্যের দেশের ধর্মহীনতা। ইরোপ আজ আমাদের জীবনের আদর্শ! সেই ইরোপ আজ অধ্যাত্ম বিচার জটিলতা-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া, জড়-তত্ত্ববাদের গুণগানে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, দেখিতে গেলে, ইরোপে এক্ষণে ধর্ম-চর্চার স্থান জড়বিজ্ঞানেরই অধিকৃত হইয়াছে। ধর্মচর্চা যৎকিঞ্চিৎ এতটুকু। সেই অবশেষটুকু পাদরী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নির্বাসিত। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশকে ইরোপের মস্তশিষ্য বলিতে পারা যায় না। শিষ্যের ধর্ম—গুরু পদাঙ্কানুসরণ, আবার কখন কখনও শিষ্যের কাছে উপদেষ্টা গুরুও পরাভব প্রাপ্তির কথা শুনা যায়, ( যেমন কোন কোন বিষয়ে জাপানীরা ইরোপকেও পরাস্ত করিতে পারিয়াছে )। এ দেশে ইহাকে বলে গুরুমারা বিদ্যা। কিন্তু এ দেশ কি তাহার গুরুদেবের অনুসরণে স্বদেশের সর্বপ্রকার হিতের জন্ত সর্বস্ব পণ করিতে, জড়প্রকৃতিকে ক্রীত-দাসীত্বে আনয়নপূর্বক অভূতপূর্ব অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার সকল করিতে, ঐহিক সুখ-সৌভাগ্যের চরমশিখরে নিজ দেশের উত্তরপুরুষকে আরোহণ করাইতে, অপরিসীম অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও অসাধারণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে? তবে, ইহাকে শিষ্য কেমন করিয়া বলিব? অগত্যা দাস-

বলাই সম্ভব। দাসের ধর্মই এই যে, সে প্রভু-জাতির অনুকরণ করাতেই জীবনের চরম সার্থকতা অনুভব করিয়া থাকে;—স্বাধীন স্বাভাব্য কখনই বেশী দিন রক্ষা করিতে পারে না। এক দিন সমস্ত মানবজাতির পরিচালক, জাগতিক সর্বপ্রাচীনতম সভ্যতার প্রচারকগণ যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে জাতি যে আজ বাহিরের মতই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়াই দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা তাহার সর্বশরীর ও মনেই আজ কুটিয়া উঠিতেছে। তাই আজ ইয়োরোপীয় ভীষণ ধর্মহীনতা আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত। আর অর্ধমৃত অক্ষমদের মধ্যে যেমন সংক্রামক রোগেরও প্রতিষেধ সম্ভব হয় নাই, তেমনই ইহাও অপ্রতিবিধের হইয়া উঠিয়াছে। মহাপুরুষগণ দর্শন দিলেন,—আশা দেখা দিল। তাঁদের জলদম্ভস্বরে আহ্বান আসিল, ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত’। উত্থানশক্তি বারেকের জন্ত স্পন্দিত হইল;—কিন্তু হায়, মোহাচ্ছন্ন রোগীর ক্ষণিক মোহাপনোদনেরই জ্বায় কি অচিরস্থায়ী সে আশা!

তবে সত্যই কি আর আমাদের এ দেশে উন্নতির কোনই আশা নাই? দিনে দিনে পরাস্তকরণে রত, পরপদসেবী এ জাতি কি জগতের যে কোন স্বল্পজীবী দাসজাতির মতই ধীরে ধীরে কালের তরঙ্গমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে? হিন্দু বলিতে কিছুই কি আর তাহার বাকী থাকিবে না? অসম্ভব! এই মহাজাতির উপর দিয়া অনেক প্রলয়-ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে শাখা, মহাশাখা পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তথাপি এ মহাবৃক্ষ কেহ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে নাই। আজও পারিবে না।

আমাদের দেশেরই কোন শাস্ত্রকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

‘অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে।’

কয়লাকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতার নাশ হয় না।

ভক্তবীর তুলসীদাস ইহার জবাব গাহিলেন,—

‘সদগুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,  
জ্ঞান করে উপদেশ।’

তব, কয়লা কি ময়লা ছুটে,  
যব্ আগ্ করে পরবেশ ॥’

কথা এই যে, ‘জ্ঞানের অগ্নি যদি অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে সেখানে যত বড় কয়লাই থাক্ না কেন, সে তাহাকে দহন করিয়া, নিজের উজ্জ্বলতার দ্বারা উহাকেও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবেই।’ অঙ্গার শত ধৌতি দ্বারাও নিজের স্বভাব যে ত্যাগ করে না, তার কারণ

এই যে, ঐ উপায় উহার পক্ষে ঠিক পথ নহে। অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহার নিজস্ব পথ উন্নতির বথার্থ পথ প্রাপ্ত হইলে, সেই অঙ্গারই আবার উজ্জ্বলতম আভা ধারণ করিতে সমর্থ। এই যে অজ্ঞানান্ধকারন্যূনের উপায়, ইহাই জ্ঞানাগ্নি। গীতাকার বলিয়াছেন,—

‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন!’

এই জ্ঞানের পথকে অনুসরণ করিলে, জীবনের জটিলতার গ্রস্থি স্বতঃই খুলিয়া যাইবে। কর্তব্য এবং অকর্তব্য খুঁজিবার জন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শ নবযুগের রাঙ্গাবাতি (ডেন্জার সিগ্‌নাল)-ধারী ভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না; নিজের হৃদিস্থিত হৃদীকেশই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। অতএব হউন নর, হউন নারী,—প্রকৃত জ্ঞানের পথ, ধর্মের পথ (ধর্ম ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়) অন্বেষণ করিয়া লউন। জগতে খুঁজিলে মিলে না, এমন কিছু আছে কি? আবার দেখুন, জ্ঞানের পথ কোন দিনই কাহারও জন্ত রুদ্ধ নাই। কোন পথই প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্ত কোন দিনই রুদ্ধ থাকে না। শুদ্ধমাত্র অধিকারিভেদে পথভেদ আধ্যাত্মিকারগণ নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। তবে মানুষ নিজেকে সহজে নিয়াদিকারী বলিয়া নিজের মনের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; তাই বিষমঙ্গল উচ্চ পথে আরোহণ করিতে যায় ও অপারগতার শেষে পথপ্রদর্শকের প্রতি গালি পাড়িতে বসে। বেদ যখন শ্রুতি ছিল, তখন খুব সম্ভব মন্ত্র অশুদ্ধি ও বিকৃতি ভয়েই সাধারণভাবে জ্ঞী-শূদ্রের তাহাতে অধিকার ছিল না, কিন্তু উহার প্রধানতম অংশ—জ্ঞানকাণ্ডে, গীতার, পুরাণে, ষড়্‌দর্শনে সমুদয় বেদ্যুদ্বে, পূর্ণ জ্ঞানমার্গে কাহাকেও তো অনধিকারী করা হয় নাই; এবং এক্ষণে তো চারিদিক হইতেই এই জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠিবার স্ববন্দোবস্ত করাই হইতেছে। তবে এই মহামণিময় রত্নমুকুট শিরে ধারণ করিবার আগ্রহ ও আবেগ কই? হউন নর, হউন নারী, এই শুভের পথে, সত্যের পথে আজ আপনারা একান্ত উত্তম, একান্ত আগ্রহে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। তবে এক কথা, এই জ্ঞানমার্গ-বলয়নের প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া লইবেন যে, যে পথটি অবলম্বন করিলেন, উহা স্পথ কি না। ভিত্তি-মূল শিথিল হইলে অট্টালিকা যতই সুচারু-নির্মিত হউক, তাহার পতন-ভয় ততই অধিকতর। ধর্মহীন শিক্ষাও তেমনি লোক-সাধারণের পক্ষে প্রকৃত শুভের পথ না হইয়া, বিপথেই পরিণত হইয়া থাকে।



শাস্ত্র ধর্মের তত্ত্বকে গুহানিহিত ( ধর্মস্ত তৎ নিহিতং গুহায়াং ) এবং সেই গুহাপ্রবেশের পথকে দুর্গম পথ, ( দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি । ) এবং ক্ষুরস্ত ধারণার সহিত উপমিত করিয়াছেন । অতএব সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ-  
■ আত্ম-সুখপরায়ণতা যে শিক্ষার বীজমন্ত্র, সে শিক্ষা সেই “গুহা-নিহিত” দুর্গম পথের শিক্ষা যে নহে, ইহা অত্যন্তই সুস্পষ্ট । আর সেই সব যে শিক্ষা, উপনিষদ তাদের “অবিজ্ঞা” নামে অভিহিত করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, ‘অক্ষং তমঃ প্রবিপশন্তি বেহবিজ্ঞা-মুপাসতে ?’ অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ শিক্ষা ভগবৎসান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায় । এক্ষণে একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইদানীং যে শিক্ষা আমাদের কল্পাপুত্রের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর যা থাকুক, ধর্ম-তত্ত্বলাভের কোনই পথ নাই । অনেকের মুখে শুনা যায় যে, বয়স হইলেই আপনি ধর্মে মতি হইবে । কথাটা কি বেশ সঙ্গত ? অবশ্য দৃষ্টান্ত সব বিষয়েরই দু’দশটি না পাওয়া যায়, সংসারে এমন কোন কিছুই নাই । মহাপাপীদের একটি কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে সহসা মহাপুণ্যাশ্রয় পরিণত হইতে দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু সেও সেই ব্যতিক্রম । তত্ত্বের আরও এক কথা, পতন-শক্তি যাহাদের অতিশয় বেগবতী, উঠিবার ক্ষমতাও তাহাদেরই মধ্যে প্রচুরতর । মোট কথা তাহারা শক্তিমান ; বাঁকা পথে অগ্রসর হইতেও তাদের বাধে নাই—সোজা পথেও না । সাধারণ ভাবে দেখা যায়, চিরদিন অর্থের ও কামের সেবা করিয়া, সহসা জীবনের শেষকর্ণে অকস্মাৎ এক দিন ধার্মিক হইয়া উঠা স্বাভাবিক নহে । তাঁদের যতটা ধার্মিক দেখায়, তার মধ্যে সাড়ে চৌদ্দ আনাই প্রায় শারীরিক ক্ষমতা-হাস-প্রাপ্তির পরিণাম মাত্র ! এই জন্যই আধ্যাত্মিক সর্ব-প্রথমে ধর্মের স্থানই নির্দিষ্ট । ধর্ম-শিক্ষার চরিত্র গঠিত হইলে, অর্থোপার্জন ও কাম্যোপভোগ এবং পরিশেষে আজীবন ধর্মোচরণের ফল-লাভ মোক্ষ-প্রাপ্তি ইহাই সনাতন বিধি । হিন্দুর আশ্রম-ধর্ম এই নিয়মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল । বাল্যাবধি মধ্য যৌবনে দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা ছেলেরা দীর্ঘায়ু-  
■ নীরোগ-শরীর হইত । ধর্ম-সংযুক্ত বিদ্যালাতানন্তর গঠিত-চরিত্র যুবকগণ গার্হস্থ্য ধর্মের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত । মেয়েদের যদিও গুরুগৃহপ্রবাসের ব্যবস্থা ছিল না, (বৌদ্ধযুগে দু’এক স্থলের কথা শুনা যায় মাত্র) ; তথাপি স্বগৃহে বাস করিয়াই তাহারা ত্যাগ-সংযতস্বভাবা, পরসুখে আত্মসুখাসুখী নিমজ্জনকারিণী

জননীগণের সহায়তায় সেইরূপেই ত্যাগ-ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন । ব্রত-উপবাস, অতিথিসেবা, পিতার ছাত্রবর্গের প্রতি সমুচিত ব্যবহার, রোগীর শুশ্রূষা, প্রতিপাল্যের প্রতি আত্মীয়-ভাব পোষণ—এ সকলের অপেক্ষা কোন্ শিক্ষা মহত্তর, কেহ বলিতে পারেন ? ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কুচ্ছসাধন, আজ যাহা আমাদের কল্পাগণকে আমরা নিতান্তই নোংরা জিনিষের মত পরিত্যাগ করাইতেছি, ত্যাগ-ধর্মের দীক্ষার পক্ষে তাহার স্থান নিতান্তই ভুচ্ছ করিবার মত ছিল না । মানুষ হঠাৎ এক দিনে বীজগুপ্ত হইয়া দাঁড়ায় না । যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, এক শুকদেব ব্যতীত আবহমান কাল হইতে সকলকেই সেই কথ করিয়াই পড়াশোনা আরম্ভ করিতে হইয়াছে । উর্দ্ধে উঠিবার ■ একটির পর একটি করিয়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয় । তা যিনি যতটা উপরে উঠিবেন, তাঁহার উঠিবার সোপানের সংখ্যা ততই অধিক । আবার এও ঠিক, মানুষ বড় অভ্যাসের দাস । ভাল মন্দ সে যেটুকুই শেখে, শৈশব হইতেই শেখে । বার তের বছরের বোমাগুলি তাঁদের বাপের বাড়ী হইতে যে শিক্ষা লইয়া খণ্ডর-ঘরে পদার্পণ করেন, সেগুলি তাঁহারা চিরজন্মেও কি আর ভুলিতে পারেন ? তা যদি হইত, তাহা হইলে ছেলের বিয়ের সময় ভাল ঘরের মেয়ে লোকে খুঁজিয়া বেড়াইত না । মানুষ স্বভাবতঃই বড় আলস্যপ্রবণ,—জীবনের গতিও নদী-স্রোতের মতই নিয়গামী । জীবের সাধারণ ধর্ম আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিই । ■ বিষয়ে সামান্য কীট ইত্যাদির সহিত তাহার প্রভেদ নাই । তবে যে মানুষ আজ জীবশ্রেষ্ঠ, সে শুধু নিজের সেই নিম্নাতিমুখী প্রবৃত্তিকে, কঠোর নিয়ম-সংযমের সুকঠিন আল বাধিয়া, সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ফিরাইতে পারিয়াছে বলিয়াই । এই বাঁধ ■ শক্ত হইবে, নদীর স্রোতঃ ততই হইবে উর্দ্ধমুখী । নতুবা আসল মানুষের নগ্নমূর্তি—সে তো অসত্য জাতির মধ্যে কতকটা, প্রমত্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছু এবং উন্মাদের ভিতরে অনেকখানিই প্রকটিত । কি বীভৎস সে রূপ !

তবে কথা এই যে, এখন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ■ সহজ অঙ্গটা, অর্থাৎ উহাদের মধ্যের অধ্যবসায়-শক্তি, গবেষণা-শক্তি, সম্মিলন-শক্তি, স্বদেশ ও স্বদেশীর জন্ত আত্মত্যাগ-শক্তি ব্যতীত আর যে চাকচিক্যময় বাহ্য রূপটা, সেটার প্রলোভন এতই যে, তার ■ বড় সর্বনাশই আমাদের ■

প্রচ্ছন্ন থাক, উহাকে ত্যাগ করিবার শক্তিও আজ আমাদের মধ্যে নাই।

এখন যদি উহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া আবার সেই পূর্বতন কালের গোবরলিপ্ত গৃহাঙ্গনে ফিরিয়া যাঁতে অমুরোপ করা হয়, তো সে কথা বাতুলের প্রলাপের সহিত উপমিত হইয়া, একটা ভ্রমল ভাস্কর্যের সৃষ্টি করিবে মাত্র। অতএব সেকালের নিয়ম ভাল ছিল, কি ছিল না, সে তর্ক তুলিয়া বুঝা কালক্রমের প্রয়োজন নাই। এখনকার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজনীয়, সেই সম্বন্ধে কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমার বিশ্বাস (পূর্বেও বলিয়াছি), আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার দিকটাকে এতখানি শিথিল করিয়া রাখিলে, তাহাদের সঙ্গে বড় বড় শত্রুতা করা হইবে, জার্মানীও ইংরেজের সহিত তেমন শত্রুতা করিতে চেষ্টা করে নাই।

\* কুসংস্কার ■ দূর করিয়া সেকালে পচা, পুরান, ঘুণধরা আচারের গুণ্ডা হইতে নিজেকে ত্যাগ করে, — মেয়েদেরও ক্ষার করিবার ■ আমাদের দেশের একদল চরমপন্থী বন্ধপরিবার হইয়া আছেন। সংবাদপত্র ও

\* কুসংস্কার বলিতে যে কতটা বুঝায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। প্রতিমায় চিত্র স্থির রাখিয়া ভগবৎ-আরাধনা, অভ্যাস স্থির রাখার জন্য দীক্ষা-গ্রহণ, শাস্ত্র-শাসনে সম্মাননা, সন্ধ্যা-উপাসনা প্রভৃতির সমস্ত উপস্থিত হইলে আহার-সংযম, হিন্দু আচার-বিগর্জিত গৃহে পান-আহার না করা, দৈব-ঔষধ নামে ব্যবহৃত (বহু স্থলে) অসাধারণ রূপে ফলপ্রাপ্ত নানাবিধ ঝাড়লি কবচ প্রভৃতিতে সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপন—এ সকল তো নির্দোষ ছিলই; অধিকন্তু গুরুজনের প্রতি আনুগত্যটাও আজকাল এই দলের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়া দেখিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তিব্যতীকৃত সমাজ গড়িবার না তাজিবার মন্ত্র? ব্যক্তি দ্বারা কখনই কোন জিনিষ গঠিত হয় না। ঈশ্বর যখন বহুধা, তখনই সৃষ্টি;—এবং যখন এক, তখনই লয়, এই ‘ইন্ডিজুয়ালিজম্’ বা ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার অগ্র-বিস্তার ফল সারা ইয়োরোপই ভোগ করিতেছে। তবে সেটা সম্পূর্ণ সফল হইয়া উঠিয়াছে কিস সাঙ্গাভ্যে। ইহার দু’একটা ক্ষুণ্ণ প্রাপ্তে এ দেশের চিরন্তন বিচার-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়াছিল। তাহারই অবশেষাবী ■ ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান গুপ্তহত্যা, নারীহত্যা পাপেও পঙ্কিল হইয়া, দেশের উদ্বোধিত শক্তির অকালে অপব্যয় করিয়া ফেলিল। ইয়োরোপের পক্ষে ■ কিছুই নয়;

মাসিকপত্রিকার উপভোগ প্রবন্ধে ঠিক ঐ খুঁটান বিশনারীদের সুরেই ইহা গাও আঙড়াইতেছেন—‘নোডাভুড়ি ফেল সাগরের জলে।’ অধিকন্তু খুঁটান বিশনারীদের চেয়ে এঁদের পরিচিত ভাষার আত্মবান মাহুষের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে বেশী;—এবং এই পণ্টাই না কি সংসারের সকল ব্যতী-পথের চাইতে সব চেয়ে সোজা পথ, তাই তাঁদের কথার ■ কাজের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লোকাভাবও ঘটিতেছে না। এই যে হিন্দুমানীর অচল্যতন-চূর্ণের কনকট দিয়া তৈরী রাস্তা, এর শেষে কোন দেবারতন তো নাইই,—চার্চ, মসজিদ, প্যাগোডা, ■ কি একটা ব্রহ্ম-মন্দিরও দেখা যায় না। এ পথ একেবারে উদ্ধারভাবেই খোলা পথ। এ পথের ব্যতী ছেলে-মেয়েদের ব্রত, উপবাস, পূজার্চনা, প্রার্থনা, উপাসনা—কোন কিছুই করিতে হয় না। ■ বা বীণখুঁটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে কোন সুদলমান বা খুঁটান ছেলেমেয়েদের ■ লজ্জা হইবেনা; কিন্তু নব্যতন্ত্রের হিন্দু-সন্তানদের রাস বা কুকের প্রতি মনে মনেও কোন শ্রদ্ধা সঞ্চিত থাকিলে, তাহা সবচেয়ে গোপনের চেষ্টা করিতে হয়। নিজের ধর্ম, নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার, নিজের দেশের রীতিনীতি,—এ সকলই বিদেশীদের কাছেই নয়, বিদেশী-ভাবাপন্ন আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রতিবেশীর সাক্ষাতেও গোপন-চেষ্টায় পলে-পলে আরক্ত গুণ্ডা হইতে হয়। অর্ধোড়ক শব্দটা

কিন্তু হিন্দুর পক্ষে এ মহাপাপ। ধর্ম-শিক্ষার শিথিলতা দ্বারা দেশের ছেলেদের পক্ষে এ-সবও সম্ভব হইতেছে। নব্য-শিক্ষার এই ব্যক্তিব্যবস্থা এতই ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে, বাংলার একখানা প্রধানতম সংবাদপত্রে কোন নব্য শিক্ষিত গ্রন্থ কখনো লিখিতেও প্রস্তরপ্রাপ্ত হইয়াছেন—‘এতে বিশ্বাস বা কোভের কোন কারণ দেখি না। এ যে যুগ-লক্ষণ। এ যে বড় আশারই কথা। এখন আর তরুণের দল সবাই বাবা খুড়ো মাঝা মেসো পিসে মাপ্টারমশাই বা ঘুণধরা শাস্ত্রের কথায় ওঠ-বোস করতে সম্মত নয়।.....বিনয় মানে দাসত্ব নয়।’

‘বিনয় মানে দাসত্ব’ না হইতে পারে; ঐক্য, অসংযমে, ধৃষ্টতার কোন্ উচ্চল নিহিত আছে, তাহা আমাদের মত সেকালে লোকেদেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আচ্ছা, ‘বাবা, খুড়ো, মেসো, পিসেকে’ না হয় অসম্মানই করিলাম, সেটা সহজ বটে। কিন্তু বনিবের বেলা ■ ব্যবহারটি করিব, সেটি তো কই জানা রহিল না?



এখন বোধ হয় সব চাইতে ইতর ভাষায় দাঁড়াইয়াছে। ছত্রিশ জাতে একসঙ্গে ছোঁয়াছুঁয় করিয়া না খাইতে পারিলেই এখন “ছোট প্রাণ” বলিয়া পরিচিত হয়। শিক্ষিত বা শিক্ষিতা কেহ ঐরূপ করিলে লোকে বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।

এর উপর অবস্থার চতুর্গুণ বায়ে ঋণগ্রস্ত ও অসুখী জীবন-যাপন নব্যশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইতেছে,—এ কথা পরম্পরই কিছু কিছু জানা এবং শুনা আছে। জিজ্ঞাসা করি, সেও কি এই ধর্মশিক্ষার নৈখিল্যজাত নহে? ধর্ম মানুষকে কি শিক্ষা দেয়? বিশেষ বিশেষ মাজনুদের কথা ছাড়িয়া দাও, ধর্ম মানুষকে মানুষ হইতেই শিখায়। মানুষের পক্ষে মানুষের ধর্মই তাহার স্বধর্ম। এখন মানুষ বলিতে দ্বিপদবিশিষ্ট জীববিশেষকে বুঝাইলেও, মানুষের মধ্যে যে বস্তুটা মানুষ্যত্ব, সেটা শুধুই ওই আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি জৈবধর্মই নহে। প্রাতে উঠিয়া সাহেবী অনুকরণে চা-বিস্কুট সেবন, মধ্যাহ্নে সাহেবী কায়দায় টেবিলে বসিয়া ডিনার খাওয়া, অপরাহ্নে খোলা গাড়ী বা মোটরে হাওয়া খাওয়া, মজার আপায় সাধারণ সকলকার সহিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, এবং মধ্যে ঠিক নিজের সম্মুখ নরনারী লইয়া বিলাতী ধরণের আহার-বিহার ■ আমোদপ্রমোদ করা (সমকক্ষ হইলেও সেকলে সঙ্গীর্ণ কচিগ্রস্তা অসত্যাগণ ইহার বাহিরে নিজ দোষেই বাদ পড়িতে বাধ্য হন)—এ ভিন্ন যদি কখন উচ্চ ইংরাজ-সমাজে নিমন্ত্রণ ঘটিল তো কুইন মেরীর সঙ্গে ঠিক সমান পোষাকে সজ্জিত হওয়ার জন্য সর্বস্বপণে সচেষ্ট থাকাই মানুষের জীবনের আদর্শ নয়। যাহারা ঠিক এই নক্সামত চলেন না, অর্থাৎ আহারের বিষয়ে কক্ষিৎ সংযত, তাঁহারাও অন্ততঃ মহারানী কুণ্বেহারিকেও মজার লজ্জা দিতে যে বিশেষ ব্যগ্র নন, তাও ঠিক বলিতে পারি না।

মেয়েদের এই বিবিয়ানীর নেশা কাটাইতে হইবে। এই সর্বনেশে মোতাত ছাড়াইবার প্রধান উপায় ধর্মচর্চা। স্বধর্ম নিষ্ঠা ব্যতীত কি জ্ঞী, কি পুরুষ কাহ্নও চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফূরণ হইতেই পারে না। জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীর্ণতা দূরীভূত হয় না। আধুনিক মতে যে ইংরাজের সর্বপ্রকার অনুকরণেই চতুর্গুণ প্রসাধনতাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজের ধর্মনীতি অথবা রাজনীতি এবং সমাজনীতিও যে কতখানি সঙ্গীর্ণ ভিত্তির উপর সঙ্গীর্ণরূপেই সংস্থিত, তাহা ইংরাজ-চরিত্রাভিজ্ঞ

দূরদৃষ্টিম্পন্ন মনীষিগণের সহিত আলাপে এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেই জানিতে পারেন। আমি এখানে একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করিলাম। এ সময়ে মেহেরপুরে চাকরী করার সময়ে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কুক্ এবং আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটা গরমের দিনে কি একটা মোকদ্দমার তদারক্ গিয়াছিলেন। অনেক কোশ পথ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া আসিলে একটু বিশ্রামের পর পিতৃদেব ঠাণ্ডা হইবার জন্য মুখে চোখে ও কানে বারবার ঠাণ্ডা জল সিকন করিতে লাগিলেন। ঐ সাহেবটি আমার পিতার সহিত বিশেষ মজদুবৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? ওরূপ করিলে কি শরীরের ক্ষতি দূর হয়?” পিতৃদেব উত্তর করিলেন, “মুখে ও কানে জল দিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। আপনি করিয়াই দেখুন না।”

ইহা শুনিয়া সাহেব অঙ্গলি পাতিয়া জল লইলেন; এবং মুখের কাছে সেই অঙ্গলিপূর্ণ জল লইয়াও গেলেন; কিন্তু তার পরই কি ভাবিয়া সেই অঙ্গলি ফেলিয়া দিয়া, একটা নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “না, আমি ওরূপ করিতে পারি না; যেহেতু কোন ইয়োমোপিয়ান করেন না।”

স্বদেশীয়েদের অসাক্ষাতে এবং এক জন বিদেশীর সাক্ষাতে অতি সামান্য বিষয়েও নিজ সমাজে অপ্রচলিত এই সামান্য পরানুকরণের দ্বারা নিজের শ্রান্ত শরীরকে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য হইতে এই যে তিনি স্বচ্ছন্দে বঞ্চিত করিলেন, এবং এত বড় সঙ্গীর্ণ মতটাকে প্রকাশ করিতে এতটুকুও বিধাগ্রস্ত হইলেন না, এর কারণ উহার জেতার জাতি। পরের ঠাকুরের চাইতে এঁদের নিজের কুকুরটার উপরেও শ্রদ্ধা বেশী। আর সে শ্রদ্ধা প্রকাশকে এঁরা গোরবের চক্ষেই দেখেন। যেহেতু এঁদের মনে আত্মসম্মান-বোধ জিনিষটা খুব স্পষ্টভাবে জাগ্রত আছে। আর ঐ টুকুর অভাব আছে বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েপুরুষে নিজের ধর্মকে, নিজের সমাজকে পদে পদে বিদেশীর কাছেও লাজনা-কষাইত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হইতে অর্দ্ধপ্রবীণ পিতা সকলেই অর্কাটীন, অঙ্গ, কুসংস্কারাক্ত; এবং নব্য শিক্ষার মূল-মন্ত্রই এই যে, পরানুকরণ করিতেই হইবে। যদি কোন ছেলে একটা ভাল পদ পাইলেন, দুইচারি শত টাকা

বাধা মাহিনা হইল ( আর বিলাত-কেরং হইলে  
 তৌ আর কথাই নাই। ) তৎক্ষণাৎ (অধিকাংশ  
 স্থলে) একটা বাবুজি, সাহেব-বাড়ীর ফেরৎ তক্কা  
 লাগান ছ'চারিটা খানদামা, একখানা সাহেবি-  
 কামদার সাজান বাংলা গোছের বাড়ী (কলিকাতা  
 হইলে সাহেবদের সহিত ভাগ করিয়া চৌরঙ্গী  
 অঞ্চলের সাহেবী হোটেল বা ভাড়া-বাড়ীর একটা  
 ফ্ল্যাট) এবং নিজের সাহেবী, ও জীর শুধু সাদী  
 খানা বাদ আর সমস্তই হাল ক্যাসানের মেম-  
 সাহেবের সঙ্গে সমান হিসাবে জুতা, মোজা, ব্রডস,  
 পেটিকোটের, চায়না বাসনের গাদা দিয়া নব-  
 জীবনের মনোচরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়েরা  
 যারা তিন পাতা ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁদের  
 স্বপ্ন, স্বপ্নমাজ—কোন কিছুই ঋণ স্বীকার করিতে  
 হয় না। তাঁহারা এ বিষয়ে স্থানে স্থানে পুরুষদেরও  
 পরাজিত করিতেছেন। তা মেয়েরা শিক্ষিতা  
 এবং স্বাধীনা হইয়া কি দেশের ও দেশের কোন  
 কাজে লাগেন? উঃ! সমস্তে বিভা শিক্ষা করিয়া,  
 সে শিক্ষার সাধারণ্যে প্রচার-চেষ্টার দরিত্রের পর্ণ-  
 গৃহে এঁদের অভ্যাস ইহারা কি কখনও করনা  
 করিয়াও দেখিয়াছেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাগ্রহে শিখিয়া  
 প্রতিবেশী দরিদ্রগণকে সে অমূল্য জ্ঞানদানে  
 এঁদের কোনই আগ্রহ আছে? চিকিৎসা-বিভা  
 যথাক্রমে আরম্ভ করিয়া ( বিশেষতঃ হোমিও-  
 প্যাথি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা ) রোগাতুর,  
 দীন-হীন স্বদেশীকে আসন্নমৃত্যু ও রোগ-বন্ত্রণার  
 হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা ইহারা জীবনের  
 পুণ্যতম ব্রতরূপে পালন করিতে চাহিতেছেন?  
 লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ স্বদেশীর মুখের অন্নগ্রাসস্বরূপ  
 বিদেশী পণ্য বর্জন করিতে কি ইহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ  
 হইতে পারিয়াছেন?—স্বদেশীর প্রতি অজ্ঞার ব্যব-  
 হারের প্রতীকারকল্পে স্বদেশীয় মহাপ্রাণ নেতার  
 দ্বারা আহুত অনুরুদ্ধ হইয়াও এ দেশের সহস্র-সহস্র  
 শিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের দেহ-বিলাসের এত-  
 টুকু ব্যতায় ঘটিতে দিয়া, দেশমাতৃকার সেবাত্রুত  
 গ্রহণ করিতে কি কিছুমাত্র চাকল্য প্রকাশ করিতে-  
 ছেন? না,—কিছু না! কেন? যেহেতু, তাঁদের  
 মধ্যর মনুষ্যত্ব আজ ধর্মশিক্ষার অমৃত-নিবেক  
 অভাবে অচেতন মূর্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে।  
 মানুষের মধ্যে যে শক্তি মনুষ্যত্ব, তাহা সর্ব-ভূতাবি-  
 ষ্টিত চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। আধার যদি মলিন  
 হয়, অভ্যস্তরের অতি উজ্জল আলোকরশ্মিও বাহির  
 হইবার পথ পায় না। আমাদের অন্তরের

আলোকও আজ তাই আমাদের লোভাতুর চিত্তের  
 ঘন বেঠনীমধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আমাদের  
 অমানুষ্যে পরিণত করিতেছে। আমরা শিক্ষা  
 স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শুদ্ধমাত্র বৈদেশিক  
 বিন্যাসিতার সঙ্গে স্বদেশীয় আলমুময় ভাবে জীবন-  
 যাপনকে সংযোগ করিয়া, এক অপূর্ণ-সৃষ্ট জীব  
 পরিণত হইতেছি। ধর্ম আমরা মানি না; কর্ম  
 আমাদের লোকহিতকর, বা আত্মহিতসাধক নয়,  
 মাত্র আত্ম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান জ্ঞান। আমাদের  
 না ব্রহ্মতত্ত্ব, না বস্তুতত্ত্ব,—শুধু বিলাসতত্ত্বটাই শিক্ষা  
 হইতেছে ভাল করিয়া। যে দেশে অসীম-শস্যায়  
 বঙ্গল-বসনে বনবাসিনী ঋষি পত্নী ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা  
 দিতেন, সে দেশের মেয়েদের আটপোরে নিত্য  
 সজ্জায় একটা ইজের, গেঞ্জি, একটা সেমিজ, দুইটা  
 পেটিকোট, একটা বডিস, একটা ব্লাউস, একখানা  
 (অধিকাংশ স্থলেই) শান্তিপুরে, বড়জোর করাচি-  
 ডাকার ১২ হাতি সাদী, একখানা কুমাল, একজোড়া  
 চটিজুতা,—এ তো চাই-ই। আর পোষাকীর হিসাব  
 রাখিতে স্বয়ং একাউন্টেন্ট জেনারেলও পারেন  
 কি না সন্দেহ! নব্যশিক্ষিত পিতামাতার ছেলে-  
 মেয়ের (বেবি ও মিসিবাবার দল) অসনে বসনে,  
 শয়নে ভ্রমণে ইংরাজ-বাচ্চার সহিত বর্ণ ব্যতীত  
 আর কিছুতে খুব বেশী প্রভেদ নাই। ঘরের মধ্যে  
 খুশ্চান বা অর্ধ-খুশ্চান আরার সাহায্যে তাঁরা  
 বাজালা বুলি শিখিবার পূর্বাধিই ইংরাজী বুলি  
 শিখিতে অভ্যস্ত। বাবা, মা, দাদা, দিদি—সকল-  
 কারই আটপোরে পোষাকের মত অষ্ট প্রহরের  
 ভাষাও ইংরাজী। যারা অতটা দূরে উঠিতে  
 অক্ষম, তাঁদের একটা কথার মধ্যে অন্ততঃ আধ-  
 খানার চাইতে একটুখানি বেশী বেশী ইংরাজী  
 বুকুনী দিয়া শোধান করা। যাদের আর সহস্রার্ধ  
 বা তাও নয়, তাঁদের চাল দেখিয়া কে না সন্দেহ  
 করিবে যে, পিছনে অন্ততঃ মহারাজা বর্ধমানের  
 সিকি আরেরও সম্পত্তি একটা আছেই। গাড়ী-  
 ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের  
 সাহিল। মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিন—এ তো  
 ইচ্ছা করিলে ভূমি-আমিও চড়িয়া বেড়াইতে পারি।  
 আবার জুর্ভাগ্যক্রমে যাদের বাড়ীতে পশ্চিমে বড়ো  
 হাওয়া এখনও এতদূর জোর করিয়া উঠিতে পারে  
 নাই, তাদের মধ্যেও অশান্তির জের নেহাৎ কম  
 নয়। বুড়াবুড়ীর দলকে (সম্ভবতঃ উত্তরাধিকারিণী  
 অর্থ লাভের আশাতেই) স্পষ্ট লজ্বন করিয়া  
 নব্যরা নিজেদের বিজয়-নিশান উড়াইতেও সঙ্কুচিত;



মনের মধ্যে এই অধীন্যতাটা হ্রাস বাড়ী খোঁচা দিতে দিতে জন্মটাকেই ব্যর্থ বোধ করাইতেছে। এই অবস্থার একটি মেয়ে, ভাস্কর সম্পর্কীয়ের নিমন্ত্রণে কতকটা আধুনিক সুখ-সম্পদে পূর্ণ গৃহে আগমন করিয়া, মনের ছুখে বলিয়াছিলেন—

“এমন একখানা বাড়ী যার নেই, এমন করে যে স্ত্রীকে রাখতে পারে না, তার গলায় মালা দেওয়ার চাইতে দড়ি দেওয়াই ভাল।”

অতঃপর হিন্দুনারীর কি এই আদর্শ দাঁড়াইবে? বিলাসিতা যদি দেশের এত বড় দুর্দিনেও দেশের মেয়েদের জীবনের এতখানি সারাংশ হইয়া দাঁড়ায়, বাহাতে দেশের চরকার কাটায়, মিল্লর তৈয়ারি মোটা সূতার মোটা সাড়ী পরিয়া মিলওয়ালাদের এবং তত্ত্বাবহ কুলের প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে না পারেন, নেতৃত্বের প্রস্তাবমত বিলাসিতা বখাসাধ্য বর্জন প্রতিজ্ঞায় বন্ধপরিকর হইতে না পারেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে, বিলাস-অলসিতা জীবন-ধাপনই ভারত-নারীর পুণ্যময় ত্যাগমহত্ব মহৎ চরিত্রের স্থানাধিকার করিতেছে না?

এ দেশে একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী নব্য নারী নারীমহিমাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতেছেন। পতি-পুত্রের অস্তিত্বকেও যে এ দেশের নারী কত বড় প্রেমের বলে, ক্রমার বলে সহনীয় করিয়া চলিতেন, আজও চলেন, ইহার মহিমা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। ইহার মধ্যে শুধুই দুর্দলের অনুপাতাই দেখিয়া থাকেন। তাঁদের জন্তও তাঁরা ইংরাজী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ-প্রথা চালাইতে চান না। কি? \* আমার মনে হয়, ঐ সকল স্থলদৃষ্টিসম্পন্ন নব্য লেখকেরা অধিকাংশই বিপত্নীক বা নিতান্ত গোবেচারী স্ত্রীর স্বামী। নতুবা ইবসেনের নোরা সাহিত্য-জগতে বা রঙ্গমঞ্চে মত্তবড় হিরোইন, বা বীর-চরিত্রা হইতে পারেন;—নিজের বরকন্নার মধ্যে ইহার আবির্ভাব, যত বড় সংস্কারকই হোন, কেহই পছন্দ করিবেন না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই—যাঁরা চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছেন, হয় তো মনে পড়িবে,—উহাতে যাহাকে ‘বিশুদ্ধ’ সৃষ্টি-রূপা ও স্থিতিরূপা ■ পালনে, তথা সংহতিরূপান্তে—ইত্যাদি শ্লোকে, সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, সেই তিনিই আবার অন্তত ‘দ্বিঃ সমস্তা সকলা জগৎ’—

■ তখনও যে কথাটা অসম্ভব ছিল, আজ তাহাও সম্ভবপর হইয়া আসিয়াছে। (১৩৩৫)

এই বাক্যে জগতের সমুদয় নারী-শক্তির কেন্দ্ররূপে স্তূত হইয়াছেন। অতএব নারীকে যে এ দেশে চিরদিনই অবলা ভাবে দেখা হইত না, এ কথা বলা চলে; এবং নারীও যে বাস্তবিকই অবলা নহেন, তাহা দরিদ্রের জীবনে নিয়তই স্পষ্টতাক্ষ। জাঁতাপেয়া মোট বহা, কুলী মজুরের কাজ করা—নারীর শ্রমের কোন্ কাজটা না আজও সর্বত্র গরীবের মেয়েতে করিতেছে? ইয়োরোপে, যেখান হইতে মেয়েদের সুখালস জীবনের ছাঁচ তৈরী হইতেছে, সেখানে কি? সেখানে দুই-শত চারিশত টাকার নবাবের বেগম হওয়া চলে না, এবং ইয়োরোপীয়ের জীবন সেইখানেই অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছে। ছোটবেলা হইতে কপ্পে অভ্যাশ থাকিলে, ক্লাস্তি ■ অবসাদ না বুঝিয়া, উহা হইতে স্বাস্থ্য ও আনন্দলাভ হয়। মরদা-মাথা অভ্যাশ রাখিলে, ডিস্‌পেন্সিয়া দূর করিবার জন্ত ডাক্তারকে ডায়েল-ডাক্তার ব্যবস্থা করিতে হয় না। [অবশ্য তেমন তেমন গোরার ডাক্তারও আছেন, যাঁরা অনেকক্ষেত্রে বাটনা-বাটা বা কড়াই ভাগ্য প্রেসক্রিপশনও করিয়া বসিবেন।] অভিজাতবর্গ সর্বত্র সমান হইলেও, কি দৃষ্টান্ত দেখাইল এই জর্মানী-ফ্রান্সের ধনি-সম্প্রদায়, করাসী মেয়েদের যত সৌখীন না কি পৃথিবীতেই ছিল না। সেই মহা-বিলাসিনী করাসী-মহিলারা মেথর-ডোমের কাজ হইতে মোটর এঞ্জিন এবং আকিস আদালত পর্যন্ত অত বড় রাজ্যটাই প্রায় চালাইল। রুসিয়ার ও জর্মানীর রাজকুমারীগণ কাপ্তানের পোষাক পরিয়া সৈন্যদল গঠিত করিলেন। আমাদের দেশের অবস্থায় আমরা পতিত দরিদ্রের বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান দিয়া, ঔষধ-পথ্য বিলাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে, নিজের মধ্যের পঞ্চদ্রষ্ট মনুষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারি না কি? মুসলমান বাবুর্জির হাতের চপ কাটলেট খাইলেই তাহাকে জাতে তোলা হয় না। তার রোগ-শয্যা সেবা করিতে সাহস হইবে কি? তার ঘরের পাশে শতশত অন্নহীন, বস্ত্রহীন—আর সর্বাপেক্ষা ছুঃখের বিষয়, অন্ন-বস্ত্রের চেয়েও যাহা সমধিক দুঃখপ্রাপ্য বস্ত, সেই অমূল্য রত্ন-স্বরূপ বিদ্যাহীন মূর্খের দল কি জল-আচরণীয়, কি অনাচরণীয় জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে পণ্ডবৎ বিচরণ করিতেছে,—তোমার ঘরে দাসত্ব করিতেছে. তাদের তুমি মানুষ করিতে কতখানি চেষ্টা করিতেছ? এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য? তাদের বিদ্যাদান, সুনীতিদান মানুষ হইতে সহায়তা দান, যদি করিতে পারো,

তবেই তাদের জাতিদান করা হইল। নতুবা নিজের পাকশালার পক্ষাশ মণ ভাতসিদ্ধ করিবার তার দিলেও সে যে নীচ—সেই নীচই থাকিবে, এবং তাহার স্পৃহে অগ্রগ্রহণে তোমার মহিমা কিছুই বৃদ্ধি পাইবে না। এ কি তুমি পারো না, এ কি তোমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য? তুমি না বিশ্ব-শক্তির অংশ? বিশ্বেশ্বর না তোমার অন্তর-মন্দিরের চিরাধিষ্ঠাতা, তোমার শরীর মনের প্রত্যেক অণুপরমাণুটি পর্য্যন্তই না সেই সর্বভূতাত্মিকাদেশের অধিষ্ঠান-গৌরবে গৌরববর! তবে কি, না তোমার সাধ্য? তাঁর মহান শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন তুমি ধর্মকে সহায় করিলে পারো না কি?

তার পর 'দ্বিঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ' সমস্ত জগতের নারীশক্তিই যে মহাশক্তির অংশ। অতএব নব্য বঙ্গের মেয়েদের ফুলের বিছানা বা (স্ত্রিংগের গদী) পাতিয়া স্তম্ভপূর্ণে শোয়াইয়া রাখিবার কিছু মাত্র আবশ্যক করে না। তাঁদেরও জোর গলায় বলা চলে, 'উত্তীর্ণ জাগ্রত'—এবং উঠিলে ও জাগিলে বরপ্রাপ্তিও যে তাঁদের পক্ষে খুবই সুদূর-পর্য্যন্ত দুরীণ-স্বপ্ন, তাও আমার মনে হয় না। আমি দেখিতেছি, পতিত জাতির শিক্ষা, অর্ধ-পতিত জাতি অর্থাৎ আমাদের নিজের ঘরের চাকর বাকরের উন্নতিসাধন, বিলাসিতার হ্রাসে অযথা ধনক্ষয় নিবারণ, অনাবশ্যক বিষয়ে বৈদেশিক অমুকরণ প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক কার্যের সমাধানই পুরুষের চেয়ে মেয়েদের হাতে। নিজের নিজের ঘরের ও সমাজের সেই সব জাল জঞ্জালগুলি যদি অন্ন-বিস্তার ঝাড়া-ঝুড়ি করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে আলো-বাতাস বড় কম পাওয়া যায় না। আর এই ভগ্ন-স্বাহার দিনে সেই কি সামান্ত লাভ?

৩

আজকাল স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রবন্ধ ছোটবড় সকল মাসিকই ভরিয়া থাকে দেখিতে পাই। পুরুষ লেখক ও নারী লেখিকা কেহ বা উদ্যম স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে, কেহ বা বিপক্ষে, মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইটি দল হইয়া পড়িতেছে। অথবা ইহা নূতন নয়, জগতের সকল ক্ষেত্রে সেকেলে ও একেলে, প্রাচীন ও নবীনের অভ্যাস আবহমানকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে, এবং চলিতেই থাকিবে। ইহা আশার কি নিরাশার কথা, তা অবশ্য আমি

না, কিন্তু সেকেলে বা প্রাচীনের সম্মুখে ধ্বংস ভোগে এ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গেল না। তবে এ যুগের পর কি হয়, বলা যায় না। আমার পূজ্যপাদ ঔপদেব বলিতেন, 'যাহা প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলের নিদান, তাহার অপক্ষয় না। যাহা অমঙ্গলের হেতু, তাহাকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।' যদি স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে সামাজিক ও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, যদি প্রাকৃতিক বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অজাবধি এই যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুরুষের অধীনতার বাস করিতে হইত না। নিসর্গতঃ নারী-পুরুষের কার্যক্ষেত্র ভেদ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। স্বীকার করি আর নাই করি, শারীর বলে নারী ঠিক পুরুষের সমান হইতে পারে না। অবশ্য এক জন খাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, এক জন কন্দম্বদেবী, এক জন জোয়ান অফ্ আর্ক, এক জন চাঁদ মুলতানা জন্মিতে পারেন; কিন্তু পুরুষের পৌরুষের উদাহরণ তো আর ওরূপ হৃদয়জনেই সীমাবদ্ধ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সর্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে। বলিবে, ও সব ক্ষেত্রে নারীকে কখনও স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। মানিলাম,—কিন্তু এই কিছুকাল ধরিয়া তো অনেক মেয়েই ছেলেদের সঙ্গে কলেজে বেটাছেলের শিক্ষা লাভ করিতেছেন; হুঁ একটা চাকরীও করিতেছেন। পাবার বেলায় কিন্তু তাঁদের নিকট হইতেও সেই একঘেয়ে প্রেমের গল্প, কবিতা বা এক আধটা বৈদেশী গান ভিন্ন আর কি পাওয়া যায়? যা সম্ভব নয়, তা বলিতে গেলে চলিবে কেন? তার চেয়ে যেটা সম্ভব ও শোভন এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিপ্লবেরও বিরুদ্ধে, তেমন তাৎক্ষণিক মেয়েদের দাবীটা উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেইরূপ সুবিবেচনার সহিত সেটা পেশ হওয়াও চাই।

আমাদের যথার্থতঃ চাই কি? চাই উন্নতি। উন্নতি কাকে বলে? উন্নত হইলে মানুষ কি পায়? কিসের আশা করে? উন্নত জীবের জীবন সুখময়, না দুঃখ-বিড়ম্বিত? উন্নতির দ্বারা যদি পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সে উন্নতির আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে কি না? এই সকল বিষয় অতি উত্তমরূপে ও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, তার পর নারী-পুরুষের



শিক্ষা ও কার্যক্ষেত্রে একীকৃত করা বর্তব্য। জী-  
শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াও নরনারীর কার্যক্ষেত্রে  
একীকৃত করা অনুচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া  
থাকেন; এবং তাঁহারাষ্ট আজিকালিকার দিনে  
অর্ধাচীরের দলভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।  
কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আবহমান কাল ধ'রয়া  
নবীনের পাশ্বে প্রবীণের, বিজ্ঞের পাশ্বে অজ্ঞের,  
আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের একটা স্বভাব-নির্দিষ্ট  
স্থান রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবী যথেষ্ট দ্রুত চলিয়াও  
ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই।

যাহা হউক, পুরুষোচিত জী-শিক্ষা ও মেয়ে-  
পুরুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে সেকালের যুক্তিটা  
কিরূপ—একবার নিজের চোখ দিয়া স্বেচ্ছা দেখা  
যাক :—

মেয়ে-পুরুষে যদি সমান শিক্ষা লাভ করিয়া  
একই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তবে ঘর-সংসারের  
অবস্থা কিরূপ হইবে? এখনও সেকালে শিক্ষার  
কল্যাণে বুড়ী ও আধ-বুড়ী মা, খুড়ী, মাসী, পিসী  
গোটাকতক জীবিত আছেন, এবং বোমা বা মেয়েদের  
চাকরী করিতে যাইবার সময় তাঁরা না হয় দিতেও  
প্রস্তুত। কিন্তু যখন আর একপুরুষ পরে তাঁদের  
তিরোভাব ঘটবে, তখন শুধু এই বোলসেভিক-বুগের  
চাকর-চাকরাণীর হাত দিয়া কি ঘর-সংসার করা  
ও ছেলে-মেয়ে মানুষ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে?  
সেকালের আদর্শ চাকর-চাকরাণীরা অনেকটাই  
ছেলে-মেয়েদের মাসী পিসী বা দিদির স্থলাভিষিক্ত  
হইয়া যাইত, এখন ত দেখিতেছি, তাহারা শুধু  
বাহিরের লোকই থাকিয়া যাইতেছে। অবশ্য  
ইহার উত্তর পক্ষেই দায়ী,—বয়স মনিবের  
পক্ষই অধিকতর দোষী। দেশে যে অবিদ্য,  
বিলাসিতা ও আলস্যের স্রোতঃ বহিতেছে, ইহারাও  
তাহার প্রকোপে পড়িয়াছে। স্বামি-স্ত্রী যদি একই  
শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া একই কার্যক্ষেত্রে যুগিয়া  
বেড়ান, তাহা হইলে তাঁদের কল্যাণ-পুঞ্জের অবস্থাটা  
কেমন হইবে, তাঁরা শুধু সেই কথাটাই ভাবিয়া  
কুল কিনারা খুঁজিয়া পান না। অনেকে বলিবেন,  
কেন, তখন সংসারের আশ বাড়িবে, এক জনের স্থলে  
দশ জন দাসদাসী রাখা যাইবে। সেকালেরা বলেন,  
আরও যেমন বাড়িবে, ব্যয়ও তেমন বাড়িবে,—  
তবে আর লাভটা কি দেখিতে পাইলাম? লাভের  
মধ্যে এখন ছেলেরা বাপের নিকট শিক্ষা ও মেয়ের  
অবকাশ বেশী না পাইলেও, মায়ের কাছে পায়,  
—তাদের সেই সুখটুকুও হুয়াইবে। স্বামী জীর

হাতের অন্ন-ব্যাঞ্জে তৃপ্ত হ'ন, নীরস কর্মক্ষেত্রে  
প্রাণান্ত শ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া প্রেমময়ী পত্নীর  
মিষ্টবাক্য এবং শিষ্ট সেবার শ্রমোৎসাদন করেন,  
সেইটুকুই হারাইবেন। স্বামি-স্ত্রী দুজনেই এক  
বা বিভিন্ন আফিসে কেরানীগিরী করেন, না হয়  
স্কুল-মাষ্টারী করেন, না হয় ওকালতী বা ডেপুটী  
ম্যাজিষ্ট্রেটী করিলেন ধরা গেল,—সন্ধ্যার সময়  
বা পরে দুই জন দুই দিক হইতে শান্ত-ক্লান্ত, ও  
হয় জঙ্গসাহেবের নিকট, না হয় কালেক্টর সাহেবের  
নিকট, না হয় আফিসের বড় বা ছোট সাহেবের  
নিকট তিরস্কৃত হইয়া আসিয়া দেখিলেন, বি  
হাতবাক্তা লইয়া চম্পট দিয়াছে; বামুন ঠাকুর  
বা বাবুজি মহারাজ হয় ত তাহার সঙ্গে। আর  
একটা চাকর তাড়ি খাইয়া বেহুঁষ হইয়া পড়িয়া  
আছে। ছেলে-মেয়েগুলি ক্ষুধার কাঁদিতেছে।  
একটার খুব অর। এমন অবস্থায় সেই শিক্ষিতা  
ও রোজ-গেরে জী কি করিবেন? 'জনম অবধি'  
স্কুল-কলেজে পড়া ও চাকরী করার পুরুষের মতই  
তো! তাঁহার সংসারের খুঁটিনাটি কার্যের শিক্ষা  
অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে? না, তিনি সব্যসাচী  
হইয়া জন্মিয়াছেন? উনানে আগুন দেওয়া হইতে  
রাগাবাগা, পথ্য-সেবা সমস্ত জোগাইয়া রোগা ছেলে  
লইয়া রাত জাগিয়া আবার পরদিন প্রাতে সেই  
সমস্ত করিয়া আফিস ছুটিবেন? কর্ত্তা-গৃহিণীর  
মধ্যে আফিস কামাইটা করিবেন কে? যদি  
করার উপায় না থাকে,—রোগা ছেলেটিকে কার  
কাছে দিয়া যাইবেন? প্রতিবেশী মেয়েদেরও তো  
আফিস আছে, কলেজ আছে, কিছু না কিছু  
আছেই আছে। তা ভিন্ন পরোপকার করার চালও  
তখন চলিবে কি?

যখন এই ভাবের জী-শিক্ষার ও স্বাধীনতার  
প্রচলন হইবে, তখন ত আর এখনকার মতন ইহা  
মাত্র কুমারী মেয়েদের বা ব্যক্তিগণের মধ্যেই  
সীমাবদ্ধ থাকিবে না। এত পরিশ্রমে এ দেশের  
মেয়েদের রাংয়ের শরীর গলিয়া যাইবে  
না তো? আমার ভোঁ সন্দেহ হয়। তার পর দাসী-  
চাকরের হাতে অসহায় মাতৃত্যুক্ত শিশুর পালন  
যেরূপ হয়, সেটা যে সাধারণের অবিদিত বিষয়,  
তাহা তো মনে হয় না। অবশ্য শিশুপালনে স্নদক্ষা  
আমার হাতে দিয়া ছেলে মানুষ করার মত অধিক  
অবস্থা সবারই কিছু হইবে না। একটি লেডী  
ডাক্তারের মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম—

“ক্যাম্বোলে যখন পড়ি, তখনই আমার বড়

মেয়েটি জন্মিয়াছিল। ঘরে কেহই নাই, একটি পশ্চিমা দাইয়ের কাছে মেয়ে রাখিয়া যাই। মেয়ে দিন দিন যেন জড়ের মত হইয়া যাইতে লাগিল, চুপ্‌চাপ্‌ থাকে,—হাসে না, খেলে না, আমারও অবসর কম; মনে কার, অত কাঁছনে ছিল, বেশ শান্ত হইয়াছে। এক দিন হঠাৎ স্কুলে গিয়াই ছুটি হইয়া গেলে, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, মেয়েটি ঘুমাইতেছে। ইচ্ছা হইল, কাছে গিয়া একটু আদর করি। তুলিতে গেলাম, মেয়ের ঘুম তাঙ্গিল না। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করিলাম,—একটি প্রতিবেশিনী ছেলে মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসিলেন; ছেলে-মেয়েরা গোলমাল করিতে লাগিল—তাহাতেও খুকীর ঘুম তাঙ্গিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া, আবার তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম, মেয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। যতই নাড়াচাড়া করি, মেয়ে জাগে না। ভয় পাইলাম। নিজেরও সন্দেহ হইল, এবং ডাক্তারও বলিলেন, ‘কোনরূপ মাদক দ্রব্য এই প্রকার অবস্থা ঘটাইয়াছে।’ দাইকে অনেক পীড়াপিড়ি করিতে শেষে সে স্বীকার করিল যে, সত্য-সত্যই সে খুকীকে রোজই একটু করিয়া একবার আফিম খাওয়ায়। বড় কাঁদে—কিছুতেই সামলাইতে পারে না, কি করিবে না খাওয়াইয়া? অল্পদিন আমি যতকণে বাড়ী ফিরি, ততকণে মেয়ের নেশা কাটিয়া আসে—ওধু ঝিমানো অবস্থাটাই থাকে, আজ অসময়ে আসায় এই বিপত্তি। ডাক্তার বলিলেন, ‘আমাদের অপেক্ষা করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে।’ বাস্তবিকই যথাকালে খুকীর সেই কুস্ত-কণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই দিনই দাইটিকে তড়াইলাম।”

তার পর? “তার পরে এমন ধারাটা ঘটে নাই বটে, তবে বুঝিতেই তো পারেন,—মা-হারী ছেলেরা একটু দূঃখেই মানুষ হয়। ঠাকুরমা, দিদিমাও ঘরে নাই—তবে সকাল-সন্ধ্যায় যতটা পারি দেখি।”

অবশ্য এমন অনেক মা সংসারে আছেন, যারা কলেজে না গিয়াও, চাকুরী করিতে বাহির না হইয়াও, ছেলে-মেয়েদের দাসী-চাকরের হাতে ফেলিয়া রাখেন। অনেক ঘরে দেখা যায়, ছেলে দাসীর জিন্সায় শোয়, খায়, কাপড় পরে এবং খেলা করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চাকর বা দাসীরা ছেলেদের লইয়া গিয়া রান্না মহলে চাকর মহলে বা রান্নার ধারে তাদের গা খালি করিয়া ছাড়া দেয়। ছেলেমেয়েরা যত পারে কয়লা মাখে, ধূলা মাখে, যা-তা বুড়াইয়া খায়, পথের অভ্র ছেলেমেয়ের

সঙ্গে মেশানি করে, তার পর বাড়ী ফিরিবার কালে কলের কাছে লইয়া গিয়া তাদের গায়ে, হাতে খানিক জল ঢালিয়া, জামা-জুতা চড়াইয়া দিয়া ঝি বা চাকর তাহাকে বেশ ফিটফাট অবস্থায় বাড়ী ফিরাইয়া আনে। তা হোক না কেন সে অরোক্ষী, হোক না কেন তখন পুরা শীতকাল। মা দেখিলেন, তাঁর সখের ফ্রকটি ঝির তদারকে বেশ ভালই আছে। ভিতরের খবরও আর হঠাৎ জানা যায় না,—দৈবাৎ যায়। এই তো বিয়েদের মায়ী-মমতা! আর তা হইবেই বা না কেন? বিশেষ যত্ন দিন না এ দেশে নিরক্ষর সার্বজনীন হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তব উহাদের বোধগম্যও তো হইবে না। নিজেদের ঘরে নিজেরা যেভাবে কাটাইয়াছে, তাহাই তো তাহাদের আদর্শ। পূর্বে কতকটা বাধ্যতার স্বপ্ন ও এক স্থানে বহুদিন থাকার তাহারা মূনিব বাড়ীর চালচলন কিছু কিছু শিখিয়া লইত; এখন সে দিন নাই, পাঁচ বাড়ীর তরকারী চাখিয়া বেড়ানই এখন লোকজনের ক্যাসন হইয়া উঠিয়াছে। এক বাড়ীতে ঝির হইয়া থাকে না, মায়ী-দয়্যাও হয় না, শেখও না কিছু। কাজেই আমার মনে হয়, মেয়েদের যদি পুরুষের সঙ্গে ঠিক এক শিক্ষা ও একই ভাবের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁদের মাতৃর একান্তই ক্ষম হইবে। যদি তাঁহারা সুগৃহীণী ও সু-মাতাই না হইতে পারিলেন, তবে স্ত্রী-শিক্ষার সার্থকতা কি রহিল? শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর উপার্জনের সহকারিণী হইয়া সংসারের অনাটন যে বিশেষ কম করিতে পারিবেন, আমার তা মনে হয় না। যেহেতু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যেমন এক দিকে আর বাড়বে, তেমন অপর দিকে ঝি, চাকর, রাধিবার বামুন এবং উহাদের হাতে সমস্ত ভার দলে একগুণে দুগুণ খরচও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। তার উপর, এখন ঘরের মধ্যে যেখানে একটা সেমিজ-সাড়ীতে চটিয়া যায়, সেখানে আফিসের পোষাকে অনেকগুণ বেশী খরচ পড়িবে। পুরুষ কেরানীর একটা ধুতি পিরাণ উড়ানিতে, ছেঁড়া জুতার কাজ চলে। মেয়ে কেরানীর একটা ইজারগেঞ্জি, সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস, সাড়ী, জুতা, মোজা কমাল—এ নহিলে পুরুষ-মহলে বাহির হওয়া চলেই না; অধিকন্তু, নারীস্বভাব-সুলভ সেগুলি সৌখীনও কতকটা হওয়া চাই। কোথাও যে এ সৌখীনত্বের ব্যতিক্রম নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু বিচারটা লোকে সমষ্টি ধরিয়াই করে।



যেমন যেমন পদার্থাদ্যাদার বুদ্ধি,—এই পোষাকে-  
পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে অর্থব্যয়েরও ভেদনই  
বুঝি হইবে, ইহা নিশ্চিত, এবং অসঙ্গতও  
নহে। পুরুষ সবডেপুটী, ডেপুটী, সবজজ  
উকীল যা পরিবেন,—ঐ-ঐ পদস্থা নারীর পোষাকে  
অন্ততঃ তার হুণ্ড খরচ তো পড়িবেই,—বেশী না  
হইলেই বাঁচি! পুরুষের একটা স্ট্রট হইলে সাত  
দিন চলিয়া যায়—মেয়েরা কখনই এক কাপড়ে দু  
দিনের বেশী বাহির হইবেন না। নানা কারণে  
মেয়েদের রোজগার তাঁর স্বামি-গৃহের সচ্ছলতা বৃদ্ধি  
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ  
আমার মনে হয়, মানুষের মনটাও গৃহে অর্থাগমা-  
পেক্ষা জীবন নিকট স্নেহ-সহানুভূতির অধিকতর  
প্রত্যাশী। এক সঙ্গে দুজনে খাটিয়া আসিয়া আছাড়  
খাইয়া পড়ার চাইতে, কর্তৃকৃত শরীরে প্রেমময়ী  
পত্নীর হাতের স্নেহ পাওয়া—তার মাহিনার টাকার  
চেয়ে স্বামীর পক্ষে অধিকতর লোভনীয় হওয়াই  
বেন স্বাভাবিক বোধ হয়। জগতে এমনও অনেক  
হতভাগ্য আছে, তারা হয় তো টাকাকেই সারাৎসার  
ভাবে,—তাদের পরিচর্য অবশ্য আমার জানা নাই।  
আমরা যা দেখিগাম, দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই  
বুঝিয়াছি—জীব-শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।  
বিকৃত শিক্ষার ফল সু-ফল হইতে পারিবে না।  
নারীকে পত্নী ও মাতা থাকিতে দিয়া, তাঁহার বত  
কিছু উচ্চশিক্ষার [High Education বিশ্ববিদ্যা-  
লয়ের আধুনিক শিক্ষাকেই শুধু আরি উচ্চ (মহৎ)  
শিক্ষা বলিব না। অনেক আধুনিক শিক্ষিত অর্থাৎ  
পাশ-করা ছেলেমেয়ে দেখিয়াছি, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি  
এই শিক্ষা পাইয়াও এতই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া গিয়াছে  
যে, পাশ না করা অনেককে তার চেয়ে অনেক  
বেশী উচ্চশিক্ষিত বলিয়াই মনে করি। যে শিক্ষার  
মহুবাতির সম্যক বিকাশ হয় না, তাহা ঠিক উচ্চ-  
শিক্ষা নহে। পাশ-করান বিদ্যামাত্র।] পুরুষোচিত  
স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হোক,—আমরা অর্থাৎ  
সেকালেরা কোনই আপত্তি করিব না। শিক্ষিতা  
■ স্বামীকে সুখী করিবেন, সন্তানকে সুপালন  
করিবেন ও সুশিক্ষা দিবেন,—তা না হইলে জীবিকার  
কোন উপকারিতাই রহিল না। অশিক্ষিতা ও  
সুশিক্ষিতার প্রভেদ কি রহিল, যদি সেই মায়ের  
ছেলেমেয়েদের কোনমতে অনাথের মত “নাচিয়া  
বাঁটিয়া” পরের হাতে মানুষ হইতেই হইল?  
পুরুষের সহিত সম্বন্ধতা করাই কি অতঃপর জীব-  
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল?

হু'এক জনের লেখায় দেখিলাম, “যদি মেয়েরা  
গৃহস্থালীর কার্য না শিখিলে দোষ হয়, পুরুষের  
বেলায়ই বা হয় না কেন?” ইত্যাদি। হইবে  
না কেন? অকর্মণ্য পুরুষের নিন্দা বৈ কোথাও  
থাকি নাই, তবে তা লইয়া যে পুলিশ কেস হয়  
না, তার কারণ, তাকে সংসারের ■ উপার্জন  
করিতে হয়; কাজেই তার কাছে একাধারে  
সমস্ত গুণ সর্বদা আশা করা যায় না। হাড়ভাঙ্গা  
খাটুনির পর হাড় জুড়াইবার একটুখানি অবসর  
দেওয়াও হয় তো ভদ্রতা বলিয়া বোধ এত দিন মেয়ে-  
দের মনের মধ্যে ছিল। যে সব মেয়েরা বাহিরের  
কাজ করেন, তাঁহারাও বা সংসারের কতখানি  
কি পারিয়া উঠেন,—সে খবরটা লওয়াও নেহাৎ  
মন নয়। [অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম কোথাও  
থাকিতে পারে; কিন্তু হু'এক জনের কথা ধর্তব্যই  
নয়। পুরুষের মধ্যেও “ভোলানাথ” শ্রেণীর লোক  
খুবই বেশী দেখা যায় না।] আর এ না পারার  
জন্য আমি মেয়ে-পুরুষ কাহাকেও খুব বেশী দোষও  
দিই না। কলিযুগের অন্নগতপ্রাণ নরনারীর  
স্বাস্থ্য বেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাদের কাছে  
অত্যন্ত বেশী আত্মরিক বলের আশা করাই  
অভ্যর্থ। অতিরিক্ত শ্রম এ দিনে আর কাহারও  
ঘারায় চলিবে না। সুখাত্তের একান্ত অভাব,  
পানীর জলের দূষণীয়তা, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধগৃহে  
বাস, সহরের ধূম, ধূলি ও রোগ-বীজাণু-পূর্ণ বায়ু-  
সেবন, সব চেয়ে ভেজাল খাদ্য, মহার্ঘ্যতা এবং  
আধুনিক যুগের “বস্ত-ভদ্রতা,” তার উপর বর্তমান  
শিক্ষাপ্রণালীর জীতাকলে পিষ্ট, দুর্বল শরীর,  
অন্নায়ু, অসুস্থ, ছেলে-মেয়েদের সব দিক সামলাইয়া  
বাঁচিয়া থাকা যে কত বড় কঠিন ব্যাপারে  
পরিণত হইতেছে তাহা একটুখানি মনোযোগ  
করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এর উপর যর বাহির  
সমুদায় সামলাইতে গেলে, বেচারীরা দু'দিনের  
আরু যে এক দিনেই শেষ করিবে। বিশেষতঃ,  
সধবা মেয়ে, যারা সন্তানের মা হইবেন, তাঁদের  
আবার এর উপর কত বড় এক-একটা ঝাঝ  
আছে। পুরুষ “ভোলানাথ” প্রকৃতির যেমন হয়,  
অনেক মেয়ে “কপালকুণ্ডলা” প্রকৃতিরও  
তেমনি দেখিতে পাওয়া যে না যায়, তা'ও নয়।  
জগতে সকল প্রকৃতিরই নারী-পুরুষ জন্মান  
স্বাভাবিক, এবং এতে উভয়েই নিন্দাভাজন হওয়া  
সঙ্গত। কিন্তু প্রকৃতিকে তাই বলিয়া কে কবে পরা-  
ভব করিতে পারিয়াছে? এ ■ লেখক-লেখিকারা

দেখিতেছি একেবারেই ভাবে ভোর! মেয়েদের পক্ষ লইতে হইবে বলিয়া এতটাই লইয়া বসেন যে, শেষে সেই সহানুভূতির দাপটে মেয়েদেরই লজ্জায় পড়িতে হয়। মনে হয়, যেন কতকটা প্রচ্ছন্ন মোসাহেবীর ভাষা আসিয়া পড়িতেছে। ও জিনিসটাকে সবাই কিছু পছন্দ করে না; অনেকে মন্ত পর্যাভূত করিতে পারে না এবং মনে মনে সন্দেহও করিয়া থাকে।

আমার মনে হয়, যদি চেষ্টা করিতে হয়, তবে যেটা মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব, সেইটার জন্তই করা উচিত। বা করিলে স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে, ধর্মোন্নতি ঘটিয়া মানুষ্য লাভের সহায়ক হয়, সেই শিক্ষার প্রবর্তন সমবেত চেষ্টা ও যত্ন লওয়া কর্তব্য। মানুষ কখনও পরাম্ভকরণের দ্বারা স্বাধীন হইতে পারে না। ভিন্ন জাতির, ভিন্ন সমাজের অমুকরণে সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতে গেলে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভব; অন্ততঃ, তার ফল ঠিক সফল হয় না। যেহেতু, সেই পূর্বোক্ত প্রাচীনের একটা দল কোন কঠিনমূল গুণাবিশেষের দ্বারা একেবারেই তো মরে না। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাক—যদিই সেই দলটাকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ-পূর্বক একেবারে আগাগোড়া নুতন করিয়া সমাজটিকে গড়া যায়, তা হইলে হয় তো একটা বিরাট স্বৈচ্ছাতন্ত্র-সমাজ গড়িয়া উঠিবে মাত্র; কিন্তু সেটা ঠিক ভারতবর্ষীয় হইবে না।

এদেশের শাস্ত্রে ও সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য লেখাপড়া করিয়া বর্জনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে যথেষ্টই গালি পাড়া হইতেছে; কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত না হইয়াও কি ভারতীয় নারী যে কোন দেশের মহিলাগণের অপেক্ষা কোন বিষয়েই অবনত ছিলেন? রাজপুত-কম্পাগণ পুরুষ যোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রে ‘প্যারেড’ না করিয়াই এমন শিক্ষা লাভ করিতেন, বাহাতে শত্রু-হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্ত যোদ্ধা-বেশে অস্ত্রধারণ করিতেও তাঁদের বাধিত না। ধর্মশিক্ষা এতই প্রগাঢ় ভাবে হইত যে, স্বধর্ম সম্মান-রক্ষার জন্ত সুখসাধপূর্ণ অতৃপ্ত মানবজীবনকে গুরু তৃণখণ্ডের দ্বারা অনায়াসে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিতা ছিলেন না। সেই সকল মনুষ্য-শাসিতা স্বাতন্ত্র্য-বর্জিতা বা বড় বড় সাম্রাজ্য পালনও করিয়াছেন, আজও অনেক মেয়ে পুরুষোচিত শিক্ষা না পাইয়াও শুধু

মেয়েলী শিক্ষার মধ্যে থাকিয়াও স্বেচ্ছা ভাবে ও মৌদারী চালাইতেছেন, অবশ্য তার পুরুষ কর্মচারীদেরও সাহায্য লইতে হয়। নারী-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এমন নয় যে, নারীকে পুরুষের সঙ্গে চুলে চুলে আঁচলে আঁচলে গ্রহি দিয়া বেড়াইতে হইবে।

আমার তো মনে হয়, হুকুম দিয়া বাহিরের স্বাধীনতাই লোপ করা যায়; অন্তরের স্বাধীন বৃত্তিগুলির উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তা যদি পারিত, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং এই সে দিন মাত্র যে বিপ্লবময় যুগের অবদান হইল, সেই সকল যুগেই প্রাথমিক নারী শৌর্যবীর্যশালিনী মহিমময়ী মহিলাগণের অভ্যুদয় হইতে পারিত না। কারণ, নারী-স্বাতন্ত্র্য-বর্জনের আদেশ তো আর আজ দেওয়া হয় নাই। সে তো সেই আদিযুগেই হইয়া গিয়াছে। মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত হইতে নিষেধ করিয়া শত্রু তাঁদের স্বাধীনতার পথে যে কাঁটা গাড়িয়া দিয়াছেন, এমন তো প্রমাণ পাই না। পিতা, পতি, পুত্র সং হইলে, তাঁদের মধ্যে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও মনের স্বাধীন ক্ষুধা আবার সেই রকমই হইতে পারে। আসলে, সমস্ত সমাজকেই উন্নত হইতে হয়, নতুবা নয় কিংবা নারী কাহারই শিক্ষা সমান হইতে পারে না।

আমার কথা এই যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হউন,—পারেন তো পুরুষের চেয়ে অধিকতরই উচ্চ-শিক্ষিতা হইতে চেষ্টা করুন; সে খুব সুখের কথা। কিন্তু তাঁর পুরুষ পুত্রই কাজ নাই, সংসারের কর্তার তিনি সহধর্মিণীই থাকুন। ছেলেদের গর্ভধারিণী মাত্র না হইয়া “মা” হোন। আর ইহাতেই সংসারের শান্তি নির্ভর করিতেছে।

তবে কি এই অর্থ-সমস্তার দিনে মেয়েদের উপার্জনের কোথাও কোন প্রয়োজন নাই? তা’ যথেষ্টই আছে, এবং পূর্বেও ছিল। সমাজের নিয়ন্ত্রণে এই প্রথা চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে। যে সমাজ যতটা উন্নতিলাভ করে, ততটা উন্নতিলাভ করে, ততটাই বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ এক দিন জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংস্কারক তাঁর দূরদর্শন-শক্তির দূরীক্ষণ-সাহায্যে অনেকখানি বিবেচনার সঙ্গেই নর-নারীর কার্যক্ষেত্রে এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সকল দেশেই জাতীয় উন্নতির সহিত সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা একান্ত ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। যে জাতি যতটা বেশী উন্নতি লাভ



করিয়াছিল, তারই সমাজে ততটা বেশী আটাঁআঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইজ্জত থাকিলেই লোকে সেটা রাখিবার চেষ্টা করে। যার নাই, সে কি রাখিবে? আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে—‘নাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।’ আমাদের এখন সত্যকার মর্যাদা ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়াই পাঁচ জনের পাঁচটা দৃষ্টান্ত দূরে বসিয়া দেখি, আর সেই তালে তাল দিয়া নাচিয়া উঠি। আমার মনে হয়, মেয়ে-পুরুষের এতদূর পার্থক্যের বাবস্থাটা উন্নতির চিহ্ন নহে, উহা উন্নতাবস্থা হইতে অবনত হওয়ারই লক্ষ্য। মেয়েরা যদি পুরুষের সহিত চাকরী লইয়া টানাটানি না করে, তবে কেমন করিয়া এই অর্থ-সমস্যার দিনে সমস্তাপূরণ হয়? অনাথা বিধবাগণ আত্মীয়-গৃহের “লাখি ঝাঁটা” খাইতে এ যুগে তো স্বীকৃতি নহেন,—জীরা করিবেন কি? আমরা বলি, আপনার লোকের লাখি-ঝাঁটার চাইতে মনিবের লাখি-জুতা মিষ্ট লাগিলেও তাহার কিছুই খাইয়া কাজ নাই। পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া এই চাকরী-সমস্যার দিনে চাকরীর চেষ্টায় না কিরিয়া যে জিনিসটা এ দেশে এখন প্রধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যে জন্ত অনেক দূরদর্শী হিতকামী লোকে ছেলেদেরই পাশের পড়া ও হাতের চাকরী ছাড়িয়া আসিয়া বোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন, সেই কুটীর-শিল্পের (Cottage Industry) দিকে তাঁহারা মনোযোগী হইলেই তো পারেন? পূর্বেও ভদ্র-ঘরের মেয়েরা খুব মিহি সূতা তৈরি করিত। আজও চেষ্টাযাত্রা তাদের হাতে অতি সুন্দর সূতা বাহির হইতেছে [আমার একটি সহোদরা জমীদার-পত্নীর কাটা সূতা দেখিয়া জ্বোলারা বলিল, ‘এমন সূতা আমাদের হাতে বাহির হয় না। আমার কস্তা নিজের হাতের কাটা সূতায় তাই ও বোনপো-দের জন্মদিনের কাপড় বুনাইয়া পরিতে দিয়াছে এবং সেও কিছু মন্দ হয় নাই।] ইচ্ছা করিলেই অনেক মেয়ে শুধু সূতের জন্ত নয়, প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যেও এই কার্য ও এইরূপ অন্যান্য অনেক কার্যই ঘরে বসিয়া বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। ইহাতে আত্মীয়ের বা কালেক্টর সাহেবের বা বড়বাবুর ছোটবাবুর কাহারই অধীন হইয়া থাকিবার প্রয়োজন ঘটিবে না, অথচ হাতেও ■ পরমা আসিবে, দেশেরও মঙ্গল।

তবে কি সবাই ঐ একই কাজ লইয়া মাতিবে,

বলিতে চাও? পারিলে তো ভালই হইত, তা তো আর সম্ভব নয়! এত ধৈর্য্যও সবার নাই। আর এ দিকে সবারই শক্তিও সমান থাকে না,—প্রবৃত্তি তো থাকেই না। অনশিক্ষিতা অধিকাংশের জন্তই এই পথ উচিত পথ বলিয়া মনে করি। শুধু চরকা-স্তাই নয়; কাটা কাপড়ের, বোতাম তৈরির, মোজা, গেঞ্জি, জুতার ফিতা বুনিবার কলের দাম খুব বেশী নয়, সেই সব কল আনাইয়া, তাহারই সাহায্যে এসেণে শিল্পবৃদ্ধির চেষ্টা এবং নিজেদেরও অভাবমোচন হইতে পারে না কি? অনেকে এ সব যে করে না তাও নয়,—উপার্জনও বেশ হইয়া থাকে মনে হয়। এখনকার দিনে ভাল ভাল কাট-ছাঁটের জাকেট, রাউন্ড, বডি, ফ্রক তৈরি করিতে শিখিলে, প্রত্যেক পাড়ায় বোধ করি দুখানা দোকান চালাইতে পারা যায়। দর্জিরের তো ডাকিয়া ডাকিয়া কখন সহজে পাওয়াই যায় না,—এতই তারা কাজে ব্যস্ত! অথচ কাজ তাহারা কতই জবজবাবে করে, প্রায়ই কাপড় নষ্ট করিয়া দেয়। আমার মনে হয়, অভাবগ্রস্ত মেয়েদের এটি একটি ভাবিবার বিষয়, এবং এ বিষয়ে দেশে অভাবও রহিয়াছে। কেরাণী উকীলের স্তায় দর্জি সস্তা হইয়া পড়ে নাই, কাজেই বিশেষভাবে কাহারও অন্ন কাড়িয়া খাওয়া হইবে না।

মেয়েদের কতকগুলি পদের প্রয়োজন এ দেশে ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে; যথা লেডী ডাক্তার। আমার মনে হয়, এ পদে আরও মেয়ে চাই এবং তাঁদের উন্নতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। লেডী ডাক্তার এখনও সর্বত্র সুলভ নহে; অথচ ইহাদের প্রয়োজন-নীতি কতই অধিক। বালিকা-বিদ্যালয়ের ■ লেডী প্রিন্সিপাল, টীচার প্রভৃতিরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তবে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাটার উপর আমাদের একটুখানি আপত্তি আছে। আমাদের মতে, মেয়েদের যখন নৈসর্গিক ব্যবস্থায় পুরুষ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র থাকিতেই হইবে, না থাকিয়া যখন উপায় নাই, [মনে করুন, সব মেয়েই তো আর কুমারী হইয়া থাকিবেন না, পরের চাকরী করিলেও যদি বা ছুটি থাকে তো উকীল ব্যারিষ্টারের তো মোটেই ছুটি নাই। অঁতুড় ঘরে বসিয়া তো আর মকেলের জন্ত ‘বহস্’ করা চলিবে না, আর যদি পশ্চিমের বাড় আরও বেগে বহে, বিবাহ-প্রথা এ দেশেও উঠিয়া যায়,

সমাজ-বন্ধন ভাঙিয়া চূর্ণ হয়, তথাপি নারীরও হৃদয়। যে একেবারেই সমূলে বিনষ্ট হইবে, এমন ভরসা হয় না।] তখন তাঁদের শিক্ষা, সহবত—সমস্তই কতকটা নারীভাবাপন্ন করাই কি ভাল নয়? [অবশ্য যারা চির-কৌমর্য-ব্রতাবলম্বিনী হইবেন, সে কর্তব্যের কথা এ স্থলে বলা হয় নাই। তাঁরা বেরূপ ইচ্ছা চলিতে পারেন এবং চলিয়াও থাকেন। বিচার সমষ্টি ধরিয়াই করিতে হয়]। পতির পত্নী এবং সন্তানের মাতা যখন তাঁহার হওয়া অনিবার্য, তখন গৃহিণী ও জননীর কর্তব্য না শিখিয়া তাঁহার উপায় কি? ঐ দুইটি পদের কর্তব্য কি এতটাই সামান্য যে, সে সম্বন্ধে কিছু না শিখিলেও উহার সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়? তবে সংসারে এত অশান্তি কেন? পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রীকে সন্তোষ করিয়া হাবভাবময়ী পরকীয়ার প্রতি লুক্ক হয় কেন? সন্তান বালাবধি ধর্মশিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার অভাবে কুসন্তানে পরিণত হয় কেন? পত্নী এবং মাতা যদি অশিক্ষিতার পরিবর্তে অক্ষা-বিজ্ঞার শিক্ষিতা হইলেন, তাহাতেই বা তাঁহার পতি-পুত্র কতখানি লাভবান হইবেন? তাই বলি, মেয়েরা বিদ্বানী হউন; কিন্তু তাঁরা মেয়ে থাকুন, তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই—এইটুকুই তাঁদের কাছে অমরোষ। জগতে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা-লাভই যে উন্নতির চরমোৎকর্ষ, এমনও মনে করিবার কিছু দেখি না। বাহাতে প্রকৃত উন্নতিলাভ হয়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই—সেই শিক্ষালাভের উপায় অন্বেষণ করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চ জ্ঞানতা, স্বচ্ছাচার কাহারও প্রক্ষেপেই অমুকরণীয় নহে। আজ সেই উদ্দাম স্বচ্ছাচারিতার ইরোরোপীয় সমাজই সমগ্র ইরো-রোপীয় জাতির মধ্যে চিত্তাশীল মনীষিগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া তুলিতেছে—তাঁদের রচনার মধ্য দিয়া তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তাহারই মোহে বাহিরের বাতাসে মত্ততার মত নাই! জানি, পুরুষের তিতর স্বচ্ছাচারিতা নারীর চেয়ে অধিক, [অবশ্য এটা ভ্রমসমাজেই; নতুবা নিরসমাজের নারী-পুরুষে প্রায় সমান স্বচ্ছাচারী। তাড়ি থাইয়া মাদল বাজাইয়া অকৌলঙ্গ নর-নারীর উদ্দাম নৃত্যও দেখিয়াছি, আর আজ একে নিকা, কাল তাকে সাজা করিতেছে, তাও নিত্য দেখিতেছি।] এটা সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্তই হয় তো বা পুরুষেরই স্বার্থপরতাপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা গঠিত। আমি বলি, তাই যদি হয়, তথাপি এই অনাচারেরই

বিরুদ্ধে মেয়েরা আপত্তি করেন কোন্ মুখে? “তুমি যদি বাইজী লইয়া বাগানে চলিলে, তবে আমিও একটা বাবুজী লইয়া রাস্তার বাহির হইব।”—অতঃপর মেয়েরা এইরূপ কথাও কি বলিতে চাহেন না কি? এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুরুষের উচ্চ জ্ঞানতার প্রশ্রয় আমি আদৌ দিতে চাহিতেছি না, এবং পতিতা নারীর জ্ঞান পতিত পুরুষও সমাজের অঙ্গ হইতবৎ—ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে আমার আদর্শ ও উপ-দেষ্টা আমার পিতামহদেবের জীবনচরিত হইতে তাঁহার মতামত তুলিয়া দিতেছি; \* তাহাতেই আমার বক্তির প্রামাণিকতা জানা যাইবে। কিন্তু সমাজের একটা অংশে দুর্বলতা বা অসংযম আছে বলিয়া যে অসুবিধাকেও সেই দিকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, আমি এ হীন প্রতিশোধের পক্ষপাতী নই। “মানুষ অত্যাচার বুঝতে পারলে, তার অন্তর নির্মিচায়ে নিজের ক্ষতি করে ও অনেক সময়ে প্রতি-শোধ নিতে চেষ্টা করে থাকে—এটিতে তার ধর্ম-অধর্ম দেখবার (!!) বা নিন্দা-প্রশংসা কিছু করার নেই। এতে শুধু দেখতে পাওয়া যায়, উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষুব্ধ বিজ্রোহে আত্মহত্যা। এ আত্মহত্যা দেহের নহে—মনের। কিন্তু এই যে বিজ্রোহ, এই যে প্রতিশোধম্পৃহা, এটিতে কি বিশেষ ভয়ের কারণ আছে?” ইত্যাদি। আমি অবাক হইয়া তাবি,

■ কোন সুশীলা পতিব্রতা পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কস্তার ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত পতি পরদার-মতি হইতে উপদংশরোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই রোগ পত্নীতে সংক্রামিত করিয়াছিল। ধৈর্যশীলা এবং লজ্জাশীলা ব্রাহ্মণ-কস্তা ঐ প্রকৃত রোগের কথা কখন কাহাকেও বলেন নাই, পতির কুচরিত্র গোপনে রাখার জন্ত নিজে অসহ যন্ত্রণা বৎসরের পর বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ শুনিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে বিশেষ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন—“পরদাররত স্বামীর সহবাস না করিয়া পতির কুপথ পরিত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্ত হিন্দুনারীর ব্রত ধারণপূর্বক দেবারাধনায় থাকাই ধর্ম। কোন ইউরোপীয় রাজকুমারের দেশ-ভ্রমণকালে বাইজী-সংস্রব প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার রাজবংশীয়া পত্নী দীর্ঘকাল পৃথক্ আবাসে বাস করিয়া নারী-মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।” ভূদেব-চরিত দ্বিতীয় ভাগ অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।



অপরিণত বালিকা, বিশোরী ও বুবতীবৃন্দের তরল চিত্তে এ কি আগুন জ্বলান! মাগুকের ■■■ স্বভা-  
বতঃ দুর্বল, সুখস্পৃহ ও নিয়গামী—‘জীবনান্ত গতি-  
মিত্যঃ নিয়গান্ত নিসর্গতঃ।’—সেখানে “নিয়মের”  
“সংযমের” “কোন প্রকার বন্ধনের” প্রয়োজন নাই,  
এ কি স্থিরমস্তিষ্ক নরনারী অস্ত্রের সহিত বিশ্বাস  
করিতে পারেন? এই বন্ধন শুধু কি নারীর উপর  
অস্ত্রায় করিবার জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে? এমন  
তো মনে হয় না, প্রমাণও নাই। সকল নারী ও  
নরই সমাজবন্ধনের অধীন। বন্ধন নহিলে সমাজ  
বলিয়া পদার্থই তো থাকে না; আহ্নি কাল দেখা  
দেয়। নারীর মধ্যে যদি শক্তি থাকে, যথার্থতাই  
তিনি যদি ধার্মিক ও তেজস্বিনী হন, যদি অস্ত্র  
হইতে বিতৃষ্ণায় হীন সঙ্গ করিতে না পারেন, তিনি যুদ্ধে  
পরাজিত হইয়া নিজগৃহে আগত মহারাজ যশোবন্ত  
সিংহের মহাবীর জ্ঞায় স্বধর্মত্যাগী (কল্লিয়ার পক্ষে  
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন মহাপাতক) স্বামীর সহিত অপরিচিতব্য  
ব্যবহার করিতে পারেন; নিজে কিন্তু পাপাচরণ  
দ্বারা প্রতিশোধ লইতে পারেন না। বলিবে, এ  
দেশের সতীত্বের আদর্শ ইহাতে হয় তো খর্ব হইবে,  
■■■ পতিগণ ইহাতে লাঠী লষ্টবেন। আমি সে  
কথা বিশ্বাস করি না। অবশ্য এ দেশে নারীর  
সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের আদর্শ অপরিণতই ছিল।  
ব্যভিচারী স্বামীকেও স্ত্রী বহু স্থলে ভক্তি-প্রীতি করিয়া  
থাকেন, দেখা বা শুনাও যায়; কিন্তু সেটা কি  
শুধু পুরুষের জ্বরদস্তিরই ফল, না তার মধ্যে ক্ষয়-  
বৃদ্ধিরও কোন খেলা আছে? শুধুই লোকলজ্জা,  
না নারীর নিজেরও কোন স্বার্থ, কোন সুখ ইহাতে  
নিহিত থাকে?—সেই সকল নারী এবং তাঁদের  
হাতে পূজা পাওয়া পুরুষেরা হয় তো ঐ তেজস্বিনীকে  
দোষ দিবেন, কিন্তু ধর্ম যে তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন  
না, তাহা জোর করিয়াই প্রমাণ করা যায়। যেহেতু,  
যেমন নরের, তেমনি নারীর পতিত বা পতিতা  
কাহাকেই যে সমাজ-অঙ্গে সন্তান-সন্ততি উপহার  
দেওয়া সম্ভব নহে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত। উভয়ের  
মধ্য হইতেই বিষদ্রষ্ট সন্তানের জন্ম হওয়া স্বাভা-  
বিক; এবং সে বিষ সমাজ-অঙ্গে সঞ্চারিত  
করিতে কাহারই অধিকার নাই। বলিবে, তবে  
পুরুষের পাপ সমাজ সহিয়া লইতেছে কেন? আমি  
বলিব, সমাজ আজ কোথায়? যখন প্রকৃত জীবন্ত  
সমাজ ছিল, তখন না কি পুরুষের পাপেরও যথা-  
সম্মত বিচার ও শাস্তি হইত। শাস্ত-সকলের মধ্যে  
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরুষের

পক্ষেও শাস্ত্রাণের শৃঙ্গ-সংসর্গ, অগম্যাগমন ইত্যাদি  
মহাপাতকের মহা-প্রাশ্চিত্তের বিধান কি কঠোর-  
ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিয়া লইবেন। নিজ-  
ভার্যাকে ক্রোধবশে ব্যভিচারিণী বলিলে, কস্তার  
বিস্র করিলে, জীধন দ্বারা জীবন ধারণ করিলে,  
এমন কি, অসুস্থ জীব প্রাতি শারীরিক অস্ত্রায়াচরণ  
করিলেও পুরুষ প্রাশ্চিত্ত হইতেন। পুরুষের  
শাস্তি যদি সমাজ-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল,  
তবে নারীর পাপের শাস্তি এখনও কেন সমাজ  
হইতে উঠিয়া যায় নাই? একেবারেই কি উঠে  
নাই? কতকটা গিয়াছে বৈ কি? যাত্রা অতই  
খবর রাখেন, তাঁরা এটাও কি রাখেন না? আজকাল  
অনাচার-ব্যভিচারের ■■■ কে কোথায় সমাজে  
“একবারে” হইয়া আছে? তবে পুরুষের পাপের  
চেয়ে নারীর পাপকে আমিও সমধিক নিন্দিত  
ঘণিত বলিয়া মনে করি;—নারী মাতা—সন্তানকে  
তাহার শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়;  
সন্তানের বালা, এমন কি, কৈশোর-শিক্ষা অবধি  
তাঁহারই হস্তে। তাঁহার সকল কার্যই সর্বদা  
সাগ্রিয়া বশতঃ সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।  
তাঁহার শরীর-মনের পবিত্রতা সমধিক পরিমাণেই  
ধাকার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে  
পারেন না।

যে মন্দ আছে সে আছে, তার ■■■ আমি  
মন্দ হইতে চাহি না। বরং যদি ক্ষমতা থাকে,  
মন্দকে ভাল করিবার কোন উপায় করিতে পার,  
কর। কিন্তু সে উপায়—পুরুষের প্রতি প্রতি-  
শোধে পুরুষ হওয়া নয়; অভিমানে আত্মহত্যাও  
নয়। এই যে আত্মহত্যা রোগের সংখ্যাতীত  
আবির্ভাব হইয়াছে, ইহার মূলেও কি আজকালের  
ধর্মহীন নীতিহীন কৃষিকা ও মেয়ে-পুরুষের এই  
সব উত্তেজনামূলক প্রবন্ধপাঠের কার্যকারিতা  
নাই? আমার মনে হয়, কিছু আছে। বস্তুতঃ সকল  
কার্যই দূরদর্শনের সহিত সহিষ্ণুভাবে কর, কোন  
কার্যই তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি করিতে নাই।

আমাদের সমাজে নরী-নিগ্রহ নাই—এমন  
কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমি এ কথা বলি  
যে, ‘যতটা রটে, তার কিছু কিছু বটে’ অত্যধিক  
(too much) কিছুই ভাল নয়। অশ্রীণ  
বুদ্ধের সময় ও বিছু পরে পর্যন্ত যেখানে যে কিছু  
সন্ধিৎ ব্যাপার ঘটত, ইংরেজেরা অশ্রীণের বাড়ে  
তার দায় কেলিত। তেমনি নারীর দুঃখ আছে বলি-  
য়াই ■■■ তাদের সকলই দুঃখ, আর পুরুষের সবই দুঃখ,

তারাই ভয়ানক অত্যাচারে জর্জরিতা, আর পুরুষ, নিজের স্বার্থের খাতিরে তাদের নিজের 'সেবা-দাসী' করিয়া রাখিয়াছে, এমন সব কল্পনা সংসার-নভিজতার পরিচায়ক মাত্র—কল্পনা-কুশলতার পরিচায়ক। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাটা দোষ রাখিয়া, করা হয় না, গুণানুসারেই করা হয়। পরে ■■■ ত জাতীয় উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দোষ-গুণের প্রাবল্য দেখা দেয়;—সেগুলি ধৈর্যের সহিত বিবেচনা-পূর্বক সংশোধন করিয়া লইতে হয়। তার চেষ্টা না করিয়া তার উপর নিজেদের কল্পনাকে উদ্ভাস করিয়া দিয়া কতকটা টানিয়া আনা অভাবের সৃষ্টি করিলে হৈ-টৈ লাগে মন্দ নয়, কিন্তু সমস্তার সমাধান হয় না। পুরুষকে জাতি তুলিয়া গালি দিয়া নিজেদের জ্ঞা-রসনা-সম্বন্ধীয় নিন্দার সপক্ষে ভোট দেওয়া হয় মাত্র। সমাজের সব প্রথারই নারী-নির্যাতন উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না। যেমন এই বর-পণ প্রথাটি ভাল নয়; কিন্তু বর-পণ্য প্রথাটার সৃষ্টি হইল কোথা হইতে? না, এ দেশের মেয়ের পিতৃ-ধনের উপর কোনরূপ অধিকার নাই, অথচ বিবাহের সময় 'দেয়া বরাদ্দ বিহুবে ধনরত্নসম্বিতা' ইত্যাদি বাক্যে কিছু ধনরত্ন দিবার আদেশ আছে। বরের বাপ সেই দাবীটার উপর জোর চালায়, সে-টা কি ঠিক নারী-নিগ্রহ? না নরনিগ্রহ? এবং অনেক স্থলে কন্ডার পিতা সুযোগ পাইলেই মেয়েকে কঁাকি দিয়া থাকেন, এও দেখা যায়। সেই অস্তায়টুকু ঘটে বলিয়াই বরের বাপের দ্বারাতেও এই বরপণ আদায় করা রূপ অস্তার কার্যটি অহুষ্ঠিত হয়। এ পণ আদায় কেহ মেয়ের কাছে করে না, এবং শস্তর-বাড়ীতে বধু যে নিগ্রহ ভোগ করে, তাহার সাড়ে তিন ভাগ বধুর শাওড়ীরই হস্তে। আমি ■ দেখি, পুরুষের অপেক্ষা অপ-রের উপর অস্তার অত্যাচার করিতে নারীর শক্তিই অধিকতর কার্যকরী। এ প্রথার যদি উচ্ছেদসাধন করিতে চাও, ধর্মমূলক জীশিক্ষার প্রবর্তনজন্ত সচেষ্ট হও। এ দেশে শিশু-মৃত্যুর হার বড় বেশী বলিয়াই জানা বাইতেছে, তাহার ফলে জাতীয় ধ্বংস অনি-বার্য। বাহাতে জননীগণ সুস্থ, সবল ও শিশু-পালনে অভিজ্ঞ হইয়া এ দেশের এই শোচনীয় মহা-মারী নিবারণ-চেষ্টার প্রাণোৎসর্গ করিতে পারেন, সেই শিক্ষা ও ত্যাগের ■ যত্নবতী হউন। সংসারে যদি অর্থ-সচ্ছলতা না থাকে, মহাত্মার মহাবাকীতে কর্ণপাত করুন,—সমস্ত অবসরকালে চরকা, তাঁত, কাটা-কাপড়ের কাজ, বিবিধ শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করুন। ধাত্রী-বিষ্ঠা এমন ভাবে শিক্ষা করুন,

বাহাতে 'কেস্টা' সামান্য একটুখানি ■ হইলেই অমনি পুরুষ ডাক্তার না ডাকিতে হয়। [ ■ এক জন প্রায় পুরুষের সমকক্ষা নারী এ যুগের পূর্বযুগে কলিকাতার ছিলেন, এখন এক জনও নাই। ] এত পরিমাণে শিক্ষিতা নেভী ডাক্তার পাওয়া যাক, বাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই তাঁহারা সুলভ হইতে পারেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের ■ অনেক সময় ■ আয়াসে নিতান্ত অযোগ্য টিচার পাওয়া যায়; ইহারই বা প্রাচুর্য কোথায়? উন্নতি কৈ? নারী যে সকল অধিকার অর্জনশীলী পূর্বে পাইয়াছিলেন, তাহারই মর্যাদা কি পূর্ণমাত্রায় রাখিতে পারিয়াছেন যে, অধিকতর দাবী করিবেন? কেহ বলিবেন,—যদি মেয়েদের ডাক্তারী ও মাষ্টারী করাতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাদের ব্যারিষ্টারী বা কেরানীগিরি করায় অমত কিসের? তার উত্তর এই যে, যে কার্যে ■ অধিকার ছিল এবং তার সর্বপ্রত্যক্ষ কারণও বর্তমান দেখা যায়, সে কার্যের সংস্কার বা উন্নতিতে আপত্তি করিবে, এমন যুড় কে আছে? ধাত্রীবিষ্ঠা-শিক্ষা চিরদিনই নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। পূর্বে এ বিষ্ঠা নিয়ন্ত্রণীয় মেয়েরা শিক্ষা করিত, আজ না হয় এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরাও করিতেছেন। এটাকে অনধিকার-চর্চা কেহই বলিতে পারেন না। আর নারী-শিক্ষা পূর্বেও মা-ঠাকুরমাতেই দিতেন, কোথাও কোথাও শিক্ষিতা বৈষ্ণবী বা প্রবীণা বিধবাগণও বাড়ী বাড়ী গিয়া পুরাণ-কথা প্রভৃতি মৌখিক শিক্ষা, কেহ বা বর্ণশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন—ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর শিক্ষা ও তাঁহার ইজ্জতরক্ষা নারীর নিকট হইতেই হইয়াছে এবং হওয়াও সম্ভব। অতএব এই সম্বন্ধীয় উন্নতি যতটা হয়, ততই মঙ্গল। একান্ত কতকগুলি মেয়ের—যত দিন না মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা পুরুষদিগের সহিত পৃথকভাবে ব্যবস্থিত হইতেছে, তত দিনের ■ এই পুরুষোচিতভাবে ব্যবস্থিত কালৈজিক শিক্ষা গ্রহণ ও তাহাতেই পাল করার প্রয়োজন—তাও মানি, [ এ স্থলে বলিয়া রাখি, আমি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একেবারেই বিরোধী নহি। মাত্র, শরীরের 'পক্ষে' যাহা কার্যকরী হইবে, ভবিষ্যজীবনে ফলপ্রসূ হইবে, তেমন শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষ মাত্র ] এবং সকল মেয়েরই বিষ্ঠা-বুদ্ধি বা জ্ঞান-পিপাসা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই গৃহের বন্দ্যোণ, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু ইহার মূলে যদি ধর্ম-শিক্ষা ও বিনয়শিক্ষা থাকে, তবেই সে সমুদায় শোভন



হয়। বিজ্ঞা যখন বিনয়ের জননী, তখন বিপরীত প্রমাণ দেখাইলে চলবে কেন? আর সেই শিক্ষাটা আগাগোড়া পুরুষোচিত না হইয়া মেয়েদের জীবনযাত্রার উপযোগিতাবে কতকটা বিহিত হয়, এইটুকুই আমরা চাই ও উচিত বলিয়া মনে করি। ইদানীং কেহ কেহ নারীকে 'দেবী' বলার বিশেষ বিরোধী। অথচ এ দিকে আবার ইহার বিপরীতে অর্থাৎ "দিন্কা মোহিনী রাতকা ডাকিনী" এই তুলসী দৌহাকেও তো ইহার। অবমানজনক বলিয়াছেন? অতএব তাঁদের সাপও বলিবে না, সাপিনীও বলিবে না, তবে কি বলিবে? তাঁরা বলেন, 'আমরা দেবী হইতে চাহি না, নারী হইতে চাহি।' আমিও তো তাই বলি, যদি সত্যই নারী হইতে চাহেন তবে নারীর কর্তব্য শিক্ষা গ্রহণ করুন; নারীর ব্রত, নারীর ধর্ম পালন করুন; নারীর কর্তব্য

সম্পাদন করুন।] দেবীত্বে ও "মহিমাবিতা" নারীত্বে বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। নারীর ভাগ, সংঘম, নিকাম সাধনা ■ আত্মবিস্মৃত প্রেমকেই লোকে 'দেবীত্ব' দান করিয়া থাকে, তার রক্ত-মাংসের শরীরটাকে তো নহে। আর এইগুলিকে ছাটিয়া দিলে নারীরও যে সকল মহিমা বিলুপ্ত হয়! 'মহিমাবিতা' নারী সংসার-বাসিনী,—তিনি পিতার কন্যা, স্বামীর সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী; 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিত্র' প্রিয়শিষ্যা ইত্যাদি এবং তাঁর সম্ভানের মা। তিনি স্বতন্ত্রা, স্বাবলম্বিনী ও স্বার্থপর। সীতা, সাবিত্রী, সত্যী, অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী ইহাদের সকলেই পতিব্রতা ও নারী-কর্তব্যে মহিমময়ী ছিলেন—তাই না আজ তাঁরা লোকচক্ষে দেবী! নতুবা তাঁরা তো আর দশভুজা বা শতশীর্ষা ছিলেন না।

সম্পূর্ণ

# ত্রিপুরেশ্বরী

( ঐতিহাসিক নাটিকা )

## প্রস্তাবনা

( নারী ও বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত )

প্রলয়ের কালে যখন কারণজলে ডুবল ধরা  
( তখন ) পুরুষ হ'লেন পুরুষ-হারা  
বিশ্ব হ'ল জ্যাংস্তমরা  
আবার, এ জগত উঠলো জেগে  
আত্মনারীর বীণার তানে  
তাই, নারী বেধার সম্প্রীতি  
( জেনো ) নারীর বাস সেখানে ।  
যে দিনে নারীর মুখে বেদ-বেদান্ত হ'ত গীত  
সে দিনের নরের মস্তে মৃত হ'তো সঞ্জীবিত  
দেখ, মহিষ-মর্দিনীর কোলে  
জন্ম নিলেন তারকারি  
আর, বাম্বো-কি-বাস অমর হ'লেন  
বাগ্‌বাদিনীর সেবা করি  
পদ্মবোনির আরাধনায় হয় তো জীবের মুক্তি বটে,  
পদ্মালয়ার করলে পূজা বিশ্বনাথের কীর্তি বটে,  
নারীর মুখের তিরস্কারে সৃষ্টি হ'ল তুলসী-পাখা,  
কালিদাসের অমর কীর্তি সেখানে সেই নারীর কথা,  
স্মরণ রেখ এই কথাটি বিশ্বপতির অর্দ্ধ যিনি  
শক্তি তিনিই সকল জীবের,  
তুচ্ছ তিনি নন কখনই । [ প্রস্থান ।

## প্রথম দৃশ্য

[ স্থান—ত্রিপুরাধিপতি সিংহভূজের অন্তঃপুরে শয়নকক্ষ,  
ত্রিপুরেশ্বর শব্যায় অর্দ্ধশায়িতভাবে বৈপ্রহরিক  
বিশ্রাম করিতেছেন । এক জন কিসরী  
ব্যঞ্জন করিতেছে, অপরা  
পদসেবানিরত ]

রাজা । ( স্বগত ) কি হবে অনর্থক এই  
বলকরে ? এই সূখের পৃথিবী, এই অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ  
রাজসম্পদ, এমন অলোকসাবিত্রী প্রেমময়ী জীবন-  
যজিনী, আনন্দময় হর্ষভ জীবন, এ সমস্তকে অনাবশ্যক

বৈরিতায় এক মুহূর্তে ধ্বংস ক'রে ফেলার লাভ কি ?  
মন্ত্রিদলের প্ররোচনার আরা কানরাজ-প্রেরিত গোড়-  
পতির বহুমূল্য উপচৌকনগুলি গ্রহণ করাই তখন  
স্বপ্নতা হয়েছিল ! কিন্তু এখনও তার প্রতীকার আছে ।  
সেই রত্নরাজি ফিরিয়ে দিয়ে সক্রিয় প্রস্তাব করলে  
নিশ্চয়ই গোড়েশ্বর তা' সমর্থন করবেন । এখনই তার  
ব্যবস্থা করিয়ে কেলি—ইহাই সঙ্গত ।

( ত্রিপুরেশ্বরের প্রবেশ )

ত্রিপুরেশ্বরী । মহারাজ ! মহারাজ কি শত্রু  
শিরের লয়ে এমনই গাঢ় নিদ্রায় নিম্জিত আছেন যে,  
এই উচ্চ আহ্বানও তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না ? ধস্ত ।

রাজা । ( মনে মনে ) প্রেমময়ীর আজ এমন  
কঠোর স্বর ! এমন কর্কশ ভাষা ! এ কি হ'ল !

ত্রিপুরেশ্বরী । ( অঙ্গস্পর্শপূর্বক ) সুধনিজা পরি-  
ত্যাগ করুন, বিশেষ প্ররোজনীর কথা আছে ।

রাজা । ( চক্ষু চাহিয়া ) কি হয়েছে মহারাণি ?

রাণী । শুনিলাম, গোড়পতির সহিত সক্রিয়  
প্রস্তাব হইতেছে ? এ কি অবিদ্যাস্ত জনরব মহারাজ ?

রাজা । অবিদ্যাস্ত কেন দেবি ?

রাণী । অবিদ্যাস্ত কেন ? মহারাজ ! আপনার  
পূর্বপুরুষগণ কি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ছিলেন না ?  
আপনি কি তাঁদের বংশধর নছেন ? আপনার ত্রিপুর-  
বিজয়ী ত্রিপুরারিসম সহস্র সহস্র শিক্ত সৈন্তদল তো  
কৈ আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই ? আপনি তো  
বার্দ্ধক্যজীর্ণ জরাজর্জর ও রোগহর্ষল নছেন ! তবে  
কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব রাজেন্দ্র, যে স্বয়ং যে  
বিবাদের সূচনা তৈরী করিয়া দূরদেশ হ'তে তাদের  
আমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, এখন সেই অবিমুখ্যকারিতার  
জন্ম অমৃতপ্ত হয়ে সেই দারসমাগত অতিথির যথোচিত  
স্বাগতস্বীকৃতিমোদিতভাবে অত্যাধিকারী সশস্ত্র না ক'রে  
পাণ্ডার্থ্যদানে সম্পন্ন কর্তে ইচ্ছুক হয়েছেন ? এ যে  
একান্তই অবিদ্যাস্ত মহারাজ !

রাজা । ( লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, পরে কহি-  
লেন, ( বৃথা এ অসুযোগ মহারাণি ! অনর্থক



আত্মপ্রাণভয়ে ভীত হয়েই যে আমি আমার যুদ্ধাভি-  
যুধী সৈন্তদলকে বিমুখ করছি, এরূপ সন্দেহ করো না।  
নারী তুমি, জানো না যে, পরাক্রান্ত গোড়াধিপতির  
সেনাবল কি অপরিমিত, তাঁর ধনবলও আবার সেই  
জনবলেরই অনুরূপ! সেই অসীম সৈন্ত-সাগরের  
তুলনায় আমার সৈন্তগণ সমুদ্রের নিকট গোপ্পদের  
মতই নগণ্য। কোন্ ভরসায় আমি ঐ উন্নত সাগর-  
সদৃশ বিশাল গোড়াবাহিনীর অসম্ভব প্রতিরোধ-চেষ্টায়  
আমার নিরপরাধ প্রজাবলকে উৎসাহিত ও বিনষ্ট  
করবো?

রানী। কোন্ ভরসায়? উত্তর-সারথি পার্থ  
কোন্ ভরসায় অনন্তসহায় একা সেই সঙ্কুচিত সমুদ্র-  
বীচিমালা সম তুলিত অসংখ্য মহাপরাক্রান্ত কোরব-  
বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন? কোন্ ভরসায়  
সুরক্ষিত লক্ষ্যপূরীর প্রাসাদ-তোরণে অশিক্ষিত বক্ত  
বাহিনী সঙ্গে রঘুকুলপ্রদীপ ছল্লজ্বা সাগর লজ্জিত  
অবরোধ করেছিলেন? ত্রিপুরেশ্বর! সেই ক্ষাল-  
শোণিত কি তোমারও শিরাসমূহে প্রবাহিত হচ্ছে না?  
নারী আমি? না মহারাজ! আমার সংশয় হয়,  
বিধাতা নরদেহে তোমাকেই আমার পরিবর্তে নারীত্ব  
প্রদান করে কৈলেছেন!

রাজা। (সোহিলে) অর্জুন ও রামচন্দ্র এক-  
বারই জন্ম লয়েছিলেন, কোথায় কত উচ্ছে তাঁদের  
স্থান আর কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি!

রানী। (স্বগত) তোমার ভীকৃত্য লইয়া তুমি  
এই রত্নপর্বাঙ্কে শয়ান থাক, আমার ত্রিপুরসৈন্তকে  
আমি তাদের মরণার্থ হারাতে দিব না। (দাসীদের  
প্রতি) তোরা চ'লে যা।—

[ দাসীদের সমস্তমে প্রণামানন্তর প্রস্থান।

(মহারাজের চরণে মস্তক রাখিয়া)

শুনুন মহারাজ! যতক্ষণ না গোড়সেনা ত্রিপুর-  
সীমান্ত পরিত্যাগ করে চ'লে যাচ্ছে,—ততক্ষণের জন্য  
আপনি আমার বন্দী। আজ্ঞা দিন আপনাকে  
বন্দী করতে—মহারাজ! দাসীর এ অনুরোধ রাখুন!

রাজা। (আদর করিয়া) তোমার অনুরোধ  
কি ঠেলতে পারি? তথাস্ত! আমি তোমারই বন্দী।  
[ ত্রিপুরেশ্বরী সিংহিনীসদৃশ অটলচরণে কক্ষ-বাহিষে  
আসিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন ]

রানী।—কে আছিস?

রাজা।—এ কি! এ যে সত্যই আমার বন্দী  
করলে!

প্রতিহারীদ্বয়। কি আদেশ মহারানী!

রানী। বিনা অহুমতিতে কেহ বেন এই কক্ষের  
দ্বার মুক্ত না করে। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের আদেশেও  
নয়।—এ তাঁহারই আজ্ঞা।

প্রতিহারীদ্বয়। যে আজ্ঞে—স্বয়ং রাজ্যেশ্বরের  
আদেশেও নয়—

### দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ত্রিপুরা-রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর।

কাল অপরাহ্ন, মূলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, যুবরাজের  
প্রমোদ গৃহ। পুষ্পান্তরণা রাগবধু বিজয়াদেবী  
বীণাধরে বর্ষারাগিনী আলাপ করিতেছেন,  
যুবরাজ তানপুরা লইয়া সঙ্গত করিতেছেন।

(বিজয়ার গীত)

বাদল রাতে বরিষে ধারা  
ঝরে, ঝরে, ঝরে, অঝোরে পাগল-পারা।  
চপলা উঠে হাসিয়া,— গভীর ধ্বাস্ত নাশিয়া,  
মত্ত দাঙ্গরী, ডাকিছে ফুকারি,  
বাতাস হাহা করে আপন-হারা।—  
তারই ব্যাকুল স্বরে, পরাণ কেমন করে,—

(সহসা কক্ষমধ্যে মহারানীর প্রবেশ)

রানী। (ভীতস্বরে) কুঞ্জ, বিজয়া! এই কি  
তোমাদের প্রেমলাপ ও সঙ্গীতালপের উপযুক্ত  
কাল?

[ উভয়েই চমকিয়া যন্ত্র ফেলিয়া দিলেন ও সলজ্জে  
উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বদ্বাঞ্জলি হইলেন ]

রানী। গোড়সৈন্ত নগরবরোধ করতে আসছে,  
সে সংবাদ রাখ কি ত্রিপুর-যুবরাজ?

যুবরাজ। (গভীর লজ্জায় সবিনয়ে) জানি না!  
কিন্তু গোড় হ'তে আমাদের আর অমঙ্গলাশঙ্কা নাই।  
মহারাজ কল্যাণ প্রভাতেই সন্ধির প্রস্তাব করে দূত  
প্রেরণ করবেন।

রানী। থিক্ থিক্ কাপুরুষ! কেন মাতৃগর্ভে  
তোমার মৃত্যু ঘটে নি? শোন কুঞ্জ! গোড়সেনা  
নগরদ্বারে পৌছিবার পূর্বেই ত্রিপুর-সৈন্ত তাদের অন্ত  
দ্বারা বধাবিহিত সংবর্ধনা করবে। আমি এ যুদ্ধের  
সেনাপতি। সাহস থাকে, আমার পশ্চাতে এস, না  
থাকে, এইখানে বন্দী থাক, যুদ্ধান্তে মুক্তি পাবে।  
—বিজয়া!

রাজবধু। (নিকটে আসিয়া) আর্যো! আমার  
আপনার সঙ্গে নিন; আপনার দত্ত শিক্কা আর  
আমার সার্থক হোক।



রাণী। (সম্মুখে) বীরপুত্রের জননী হরো!  
এস মা!—

যুবরাজ। মা! আমি কি তোমার গর্ভে বাস  
করি নি? যতই অসাধ্য হোক, তবু তোমার আদেশ  
যখন, তখন হোক জয়, হোক পরাজয়, এ বুকে যাত্রা  
তো করতেই হবে।

রাণী। হোক জয়, হোক পরাজয়!—কেন এ  
প্রিয়ার?—না না, হৃদয়ে অনন্ত বল, অনন্ত  
অসীম ভরসা লয়ে এস, অনন্তরও অনন্তলহ'তে স্মৃতি  
প্রত্যয়ে বল, হবে জয়, নাহি পরাজয়!—

[সকলের প্রস্থান।]

দূর দৃষ্টি

এপুর-সৈন্তগণ।

উঠিয়া সৈন্তদল দেখিতেছিল, দূরে  
কাশ জুড়িয়া ধূলিকাল উড়াইয়া  
সর্বজয়ী বিপুল সৈন্তদল  
বগরদ্বারাভিমুখে ছুটিয়া  
আসিতেছে।

এখনও গোড়সেনার মূর্তি স্পষ্ট  
থায় না, কিন্তু অধ-ধূয়োখিত  
যে অসংখ্য মুণ্ডলহরী চেনা যাচ্ছে।

সৈনিক। উঃ, মনে হচ্ছে, যেন একটা  
পর্যন্ত-প্রাচীর সচল হয়ে ছুটে আসছে!

সৈনিক। অথবা একটা প্রবল জলপ্রাণ!  
দেখতে সেটা এসে এখনই সমস্ত

কি তার করাল জঠরতলে গ্রাস করে নেবে।

।। দাবানলও বলতে পার। ঐ শোন,

তাদের অশ্বগজদের হেঁচা ও বৃহিত

শব্দে পাওয়া যাচ্ছে। ওঃ, কি পরিভ্রাণ!

শিশুর মতন অসহায়ভাবে ঐ বৈদেশিক

প্রবল তরঙ্গে মর্দিত হয়ে মরতে হবে,

বাধা দিবার সামর্থ্যও নেই! ক্ষত্রিয়ের

কি ভীষণ লজ্জা! কি পরিভ্রাণ!

ঠে। কি ভীষণ লজ্জা! কি অপমান!

নকেই কোঁক হইতে অসি মুক্ত করিল)

রাজার আদেশ, শত্রুকে শত্রু দ্বারা নর,

অভিনন্দন করতে হবে, কিন্তু আমরা

নট-ভাটের কার্য আমরা কেন ক'রে

রতে জানলে তো! শত্রু-সম্ভাবণের

আমাদের জানা আছে।

বীরধর্মের বিরোধী আদেশ।

সে। যদি এ আদেশ আমরা না মানি,  
তাঁতেও আমাদের অপরাধ হয় না। প্রভুর  
আদেশ যেখানে ধর্মের হানিকর, সেখানে রাজাদেশ  
অগ্রাহ্য।—ধর্ম রাজারও উপর।

৩য়। ধর্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য করলে  
অভ্যর্থন হয় না? তা'হলে—

(নেপথ্যে) না, ধর্মবিরোধী রাজাদেশ অগ্রাহ্য  
করলে অভ্যর্থন বা অপরাধ হয় না। পুত্রগণ!  
তোমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক! বীর, শত্রুকে তার  
সনাতন পথেই অত্যাধনা করতে অধিকারী।  
সৈনিকবৃতি গ্রহণ করে ভাটবৃতি করতে তোমরা  
কখনই বাধ্য নও।

(বর্ষ-চন্দ্রাবর্তী বীরেন্দ্রাণী-বেশে ত্রিপুরেশ্বরীর  
প্রবেশ, যুবরাজ ও যুবরাজীও তজপ যোদ্ধা-বেশে  
তাহার পশ্চাতে প্রবিষ্ট হইলেন)

রাণী। ত্রিপুরাধিষ্ঠিত ত্রিপুর-বিজয়ী দেবাদি-  
দেব মহাদেবের ভক্ত ত্রিপুরবীরবৃন্দ! তোমরা কি  
নৈদেশিকের সগর্ব-পদলাঞ্ছিতা ধরণীর ধূলির  
উপর মাথা লুটিয়ে তাদের স্পর্ধিত মস্তককে  
আরও উচ্চতর দেখতে চাও? অথবা দেবী  
ত্রিপুরার নিকট উৎসর্গিত, চতুর্দশ দেবতার নিকট  
নিবেদিত ও তাঁদের প্রসন্নতার চিহ্ন-পরিচায়ক  
পবিত্র বজ্রমাংসে উদর পূর্ণ করে তাঁর প্রত্যাশ-  
মত শত্রুকে বধার্থ বীরধর্মীমুখোদিতভাবে তীক্ষ্ণ  
অস্ত্র দ্বারাই সমুচিত সম্বর্জন্য করবে?

বীরগণ। (সমকণ্ঠে আঘাত-মেঘের মতই গজিয়া  
উঠিয়া) —অস্ত্র দ্বারা সম্বর্জন্য করতে চাই না।

রাণী। এস তবে, দেবতার প্রসাদ গ্রহণে বল-  
বীর্ধ্য ও সাহস সম্বদ্ধিত করে নিয়ে এই বর্ষা-নিশীথেই  
আমাদের বুদ্ধযাত্রা করতে হবে। নির্ভীক  
আক্রমণকারীরাই বিজয়লাভ করে থাকে, ইহা  
জেনে রাখ।

১ম ও ২য় সৈনিক। মহারাজ আমাদের সেনা-  
পতিত্ব নেবেন, কৈ, তাঁকে তো দেখছি নে মা?

রাণী। তিনি অদৃশ্য, আমিই তোমাদের এ  
যুদ্ধের সেনাপতি।

৩য়। মহারাজ অনুহ—

রাণী। সৈনিক! এখন কুলগৌরব-রক্ষার সমস্ত  
বিশেষ ও স্বাধীনতা রক্ষার মনোযোগী হও,  
পরিচর্যার প্রশস্ত পাল প'র

সকলে।

মহারাজী চন্দ্রা



(গীত)

চল রে চল রে চল রে তোরা জীবন-আহবে চল,  
বাজবে সেথা রণভেদী আসবে প্রাণে বল।

জীবন-আহবে চল

বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে

লাগুক জীবন দেশের কাজে,

জীবন গেলে জীবন পাবে, হবে এ জীবন সফল

চল চল চল।

[ গাহিতে গাহিতে সকলের গ্রন্থান। ]

চতুর্থ দৃশ্য

তোরণ-বাহরগ।

[ ত্রিপুরেশ্বরী, কুঞ্জকা, বিজয়া, ত্রিপুর-সৈনিকগণ ও  
বহুতর নাগরিক, যুবা, বৃদ্ধ, বালক ও  
নারীগণ সশস্ত্র প্রবেশ করিল ]

সমবেত কণ্ঠে—জয় চম্পামহারানীর জয়!

জয় মা ত্রিপুরেশ্বরী!

(গীত)

হও গো ধন্য দেশের জন্ত জীবন করিয়া পণ,  
জননীর তরে সঁপি অকাতরে জীবন-ধৌবন-ধন,  
তাহে যত্ন বরিতে হয়, হোক না কিসের ভয়,  
অমর কেহ তো নয়, ভয় এ জীবন,  
জীবন কর রে পণ।

যদি অদেশের হিতে প্রাণ পার দিতে জন্ম সফল হবে,  
যাবৎ এ ক্ষিতি রহিবে কীর্তি অক্ষয় যশ রবে,  
দিবে নম্বর প্রাণ, লও অবিনশ্বর মান,  
যে জন কীর্তিমান, চিরজীবী সেই তবে,  
গুণু বাঁচিয়া কি ফল তবে?

যদি প্রাণ পেতে চাও মান পেতে চাও

অর্পহ প্রাণমন,

দেশের জন্ত দেশের জন্ত জীবন করিয়া পণ।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজকক্ষে মহারাজা সিংহভূজ আসীন।

রাজা। কৈ, কোথাও কোন শত্রুটি পর্যন্ত  
নাই। পুরী একেবারে জনহীন শ্মশানের মতই  
হক নিঃসাড়। মহারানী ত্রিপুরাবাসী নরনারী  
কই দেখছি এই মহাহবে আহতি দান করতে

স্বনিকা-পতন

দেখছি বাদ দেন নি। উঃ, কি হৃদমনার ভেদ ও  
অহমিকা ঐ নারীর! সিংহিনী বা সিংহবাহিনী কি  
যে ভঁকে মনে করবে, ভেবে পাইনে। নারী হয়ে এত  
বড় রক্তপিপাসিনী আমি আর কখনও কাকো  
দেখি নি এবং তুনিও নি। হায় আমার ত্রিপুরা!  
অসহায় ক্ষুদ্র ত্রিপুরা! শত্রুনিষিদ্ধ জীনাগকের হাতে  
পড়ে তুমি অনর্থক আজ ধ্বংস হতে বসেছ—

ঐ উষাদেবী তাঁর রক্তপদ্মপ্রভ চরণ ফেলে ধীর-  
মহর-গমনে: পুরীকান-উপকূলে দেখা দিলেন। ঐ  
লোহিত-রক্তরাগ! উঃ, এ যে আমার সহ হচ্ছে  
না! এ কি আমার ত্রিপুর-প্রজার রক্তশ্রোতের  
প্রতিচ্ছবি? হয় তো এতকণে প্রবল শত্রুসেনার হস্তে

কুবীর হস্তে পড়বে—এই

নর-নারী সকল মর্দিত, ধর্ষিত,  
ঐ উজ্জল রশ্মিচ্ছটা! ও কি শত্রু-  
প্রতিবিম্বিত হয়ে অমন ভীকৃত

সুখ্য অবসানের পথে ঢলে পড়  
সুখসুখ্যও এতকণে অস্ত্রাচলগামী  
উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার! এ

অন্ধকারেই ত্রিপুরার চির-ভবিষ্যৎ  
(নেপথ্যে ঘোর কোলাহল)

গৌড়সেনার জয়-কোলাহল! আর  
শত্রুসৈন্য শূন্য পুরী অধিকার করতে আসে  
কি হৃদেব! আমি কি এমনি জালবদ্ধ যুধি  
শত্রু-হস্তে নিহত হবো? ওরে অকর্মণ্য ভীক  
ধন, তোর ভীকৃত্য এই বৃষ্টি সমুচিত ফল! ন  
সে অক্ষয়কীর্তির অগ্নান যশের অধিকার নিয়ে  
প্রার্থিতভাবে প্রাণ দিলে, আর তুই—(কে  
নিকটতর হইল) নাঃ, একখানা তরবারি  
নেই, ওঃ!—ওঃ! পাষাণি! পাষাণি! এ কি  
নিশ্চয় প্রতিশোধ! (দারমুক্ত হইল) ন  
অবিম্বাকারিতার এই ফল! এ কি! এ কি

(আলুলারিতকুন্তলা দীনবেশিনী)

চম্পাদেবী আসিয়া নতজানু হইলেন—

রাণী। রাজন্! গৌড়সৈন্য

হস্তে ধ্বংস হয়েছে। ত্রিপুরা

একণে এই রাজজোহিনীর যত্নে

পূর্বক রাজধর্ম রক্ষা করুন।

রাজা। (উঠিয়া) দেবি

(নেপথ্যে) জয় মা ত্রিপুরা

চম্পামহারানীর জয়।